ভারতী

ও



শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

দশম খণ্ড।

১২৯৩ সাল।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ভারতী

ও



শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

দশম খণ্ড।

১২৯৩ সাল।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ভারতী।

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ।

বাছা ১

সারা দিন কেন এ সংশয় ?
  সত্য যাহা রবে তাই
  মিথ্যার নাহিক ঠাঁই
মঙ্গল রহিবে শুধু অমঙ্গল নয়।
  তবে কেন সদা মোর
  প্রাণে এ ভয়ের ঘোর
এই বুঝি মুখানির নিভে তোর হাসি !
উজল নয়নে বুঝি বহে অশ্রুরাশি !
বৃথা বৃথা সারাদিন বৃথা আকুলতা !
অন্তরের শূন্য মূলে জড়িত এ ব্যথা।
  দুঃখ বিষ কেবা কহে
  সে সুধা, গরল নহে,
অনল সে দহে সোনা আনে পবিত্রতা।
আঁধার লইয়া আসে প্রভাত বারতা।
  আসে যদি দুঃখ শোক
  আসুক তাহাই হোক,
না হয় ও হাসি-মুখ হবে অশ্রুময়।
  চপল হাসির পাকে
  যা কিছু পঙ্কিল থাকে
বিমল অশ্রুতে ধুয়ে হয়ে যাবে ক্ষয়।
  সুন্দর যা রবে তাই
  মন্দের নাহিক ঠাঁই
মঙ্গল রহে গো শুধু অমঙ্গল নয়
বৃথা তবে সারাদিন বৃথা এ সংশয়।

বাছা, ২

শুধু এই হাসি খুসী শুধু ধুলা খেলা
কাটি দিবে জীবনের সুদীর্ঘ এ বেলা ?
শুধু এই হাহাকার, শুধু অশ্রু ব্যথা
হৃদয়ের আঁখি পাতে রহিবে কি গাঁথা ?
কিছুই কি নাহি আর প্রাণ যাহা যাচে ?
থাকুক তাহাই তব—পরাণের কাছে।

বাছা, ৩

 যতনে সোহাগে হৃদিমাঝে
 সুখেত রেখেছ চিরদিন
 দুঃখ সে যে নিরাশ্রয় অতি,
 আতুর মলিন দীন হীন !
 কেহ তারে চাহে না যে বাছা,
 দিও তারে একটুক স্থান।
 উজল সুখের মাঝে মাঝে
 হেরি যেন মলিন বয়ান।
 হাসিত রয়েছে সারাদিন
 যেন বাছা তার সাথে সাথে—
 বিমল দুখের অশ্রুজল
 নেহারি ও নয়নের পাতে।
 মধু তোর প্রফুল্ল মুখানি
 সুমধুর আরো অশ্রুজল,
 খর-সুখ স্নিগ্ধ অতি তায়
 অশ্রু ধোয়া বিষাদ কোমল।

সুখ সে যে শুধু সুখটুকু,
তাহা ছাড়া নহে কিছু আর,
দুঃখ বটে দুখের পরশ,
তবু সে রতন মনি সার।
সে গরল পান করি উঠে
পরাণ সুধায় যায় ভরে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জেগে ওঠে
ক্ষুদ্র এই নয়নের পরে।
সুখ শুধু মানুষের ধন
দুঃখ করে দেব নিরমাণ,
তবু ত চাহেনা কেহ তারে
দিও বাছা একটুকু স্থান।

৪

বাছা,
ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি যেন চির ফুটে
ও মুখের সরলতা যেন নাহি টুটে।
ও প্রাণের পবিত্রতা শুভ্র নিরমল,
করে যেন বাপিতের হৃদয় উজল।
অশ্রু জল বহে যদি বহে যেন তবে,—
সান্ত্বনা দিবার তরে দীন হীন সবে।
প্রাণের বাসনা এই শুধু কথা নয়,—
মঙ্গল আশীষ ইহা শুভ অলোময়।
ভুলে যদি যেতে চাও ভুলো কথা গুলি,
ভোল যদি কে বলেছে তাও যেয়ো ভুলি।
এ আলোক শুধু যেন আঁখি-পথে থাকে,
পাপ তাপ হতে তোমা দূরেদূরে রাখে।

ফুলজানি* ।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিশপুরের বোসেদের বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিয়াছে। পাততাড় কাঁকে ছেলের দল প্রভাতের মৃদু শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছে। বাঁহাতে দোয়াত ঝুলিতেছে, আর ডাইন হাতের ত অবসরই নাই। তিনি চালাকদাস ঘটক চূড়ামণির মত দণ্ডে দণ্ডে মুড়ি মুড়কিভরা কোঁচড় আর আহ্লাদ ভরা মুখের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিলেন। দুই একটা কাক ফলারে বামুনের মত প্রভাতের কোলাহল কচকচি ছাড়িয়া ছেলেদের সঙ্গ লইল। পল্লীগ্রামের মানুষ তেমন সেয়ানা নয়, কিন্তু সে গুণের জন্য পাড়াগেঁয়ে কাকেদের সুখ্যাতি কেহ করে না। সহরে মানুষ গুলোর মধ্যেও তেমন কেজো জীব ত আমি কাউকে দেখিনে। প্রমাণ হাতে হাতে। মাথার উপর কাকা শব্দ শুনিয়া যাই ছেলেরা উর্দ্ধে চাহিতেছে, অমনি কোঁচড়ের জলপান কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অতএব কাক মহাশয়ের কলকৌশল নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই।

---

* এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি 'বালকে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

গুরু মহাশয় রামধন ভট্টাচার্য্য একটা ছেঁড়া বড় মাদুর পাতিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে বেত হাতে বসিয়া আছেন। ছেলেরা আসিতেছে, আর প্রথমে গুরু মহাশয়ের কাছে হাতছড়ি খাইয়া পাততাড়ির ঢাকা খুলিয়া ছোট ছোট মাদুর গুলি সারি সারি বিছাইয়া বসিতেছে। কেহ বা বেহাত হইয়া মুড়ি মুড়কি ছড়াইয়া ফেলিতেছে। গুরুমহাশয়ের চেহারাখানা বড় জমকাল। আজ্ কাল ভাল মানুষের চেহারার কথা লিখিতে হইলে গৌর বর্ণ না বলিলে লোকের ভাল লাগে না, কিন্তু গরিব গুরুমহাশয়ের তামাটে রং আর মাথায় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী টাক—চুলের সম্পর্ক মাত্র নাই। তা ভাল না লাগিলে কি করিব? বেশের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাঁর সুমার্জিত পৈতা গাছটী। ছেলেরা কানাকানি করে রোজ গুরু মহাশয় একটা বেলের আটা উহাতে লাগাইয়া থাকেন।

গুরু মহাশয়ের চেহারায় ছেলেদের প্রধান লক্ষ্য, তাঁহার চক্ষু গোল গোল লাল চক্ষু। লোকে বলিত, তিনি নাকি গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বেত হাতে গুরু মহাশয় সেই জবা চক্ষু যার উপর স্থাপিত করেন, কিছুতে তার আর নিস্তার নাই। বোসেদের কুমুদ, বয়স তার সবে পাঁচ বছর; সে বড় খুসী হইয়া হাতছড়ি লইতে গেল। গুরু মহাশয়ের অন্য মনস্ক চক্ষুর পূর্ণজ্যোতি তাহার উপর পড়িল—সে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন গুরুমহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন—আচ্ছা! বল্ত হাত ছড়ি নিবি না শল্লি নিবি।"

কুমুদ বাম হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কান্নার সুরে বলিল—"শল্লি নেব।"

অমনি শ্যামা, রামা, শঙ্করা ভুজো—কুমুদের সমবয়সীর দল—জলপান ও লেখা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমস্বরে আপত্তি করিল—

"কেন গুরুগোশাই, আমরা এলুম আগে, আর কুমো এলো পরে, ওর শল্লি হবে কেন?"

গুরু মহাশয় নিমেষের জন্য বিহ্বল হইলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের "কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তা" কত ক্ষণের জন্য? তিনি লাল চক্ষু আরও লাল করিয়া আপত্তিকারীদিগকে এককালে "শল্লি" ও "হাতছড়ির" গুরুতর প্রভেদ অনুভূত করাইলেন। বুঝাগেল, "শল্লি" দারুণ গুঁতোয় ও "হাতছড়ি,' তীব্র বেতাঘাতে পরিণত হইতে পারে। পাঠশালাময় ট্যা ভ্যাঁ পড়িয়া গেল। সর্দ্দার পোড়োরা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। কেননা গুরু মহাশয় বড়ই রাগিয়া উঠিয়া প্রহার-লোলুপ দীর্ঘ বেতখণ্ড চণ্ডীমণ্ডপতলে জোরে জোরে আস্ফালিত করিতে ছিলেন।

ঝড় থামিয়া যায়, আগুন নিভিয়া যায় তা গুরুমহাশয়ের রাগ কতক্ষণ? সর্দ্দার পোড়ো নরেন্দ্র এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া "মহামহিম" লিখিতেছিল এবং বোসেদের বড়

বাবুর নাম ফাঁদিয়া কর্জ্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, গুরুমশায়ের রাগ একটু কমিয়াছে অমনি কাছে আসিয়া তামাকু সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্য্যের মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন—"ভাল তামাক সেজে আনিস্‌রে ব্যাটা! তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না হয় আন। আর দেখিস্‌ যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস্‌নে।"

পুরন্দর দুই লাফে পাঠশালা ত্যাগ করিল। তখন গুরুমহাশয় প্রসন্ন চিত্তে ছেলেদের দিকে চাহিলেন। হুঁকাটা হাতে করিয়া বলিলেন—"হুঁকোর জল পুরতে যাবি কেরে?"

"আমি যাব মশায়" "আমি যাব মশায়" রব চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ১০। ১২ জন উমেদার আপনাদের স্থান ছাড়িয়া গুরু মহাশয়ের সম্মুখে হাজির হইল, এবং পরস্পর পরস্পরের হুঁকার জল পূরার অসামর্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিল। গুরুমহাশয় কায়স্থদের ভোলাকেই যথোপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, কেননা সে জল সমান করিয়া আনিতে পারে।

মধো বলিল—"হুঁকো এঁটো করে মোশাই, তাই জল সমান হয়।"

তারিণী বলিল—"ও হুঁকোয় মুখ দিয়ে সূর্য্যির দিকে জলছিটোয় আর রামধেনুক দেখে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মোশাই।"

গুরু মহাশয় আবার বেত্রাস্ফালন করিলেন। মধো এবং তারিণী-প্রমুখ ক্ষুব্ধ উমেদারগণ পিঠ বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল। তখন ভোলা একাকী দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বেত্রাঘাতের ভরসায় কাঁপিতেছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্ট ভাল—হুঁকো উচ্ছিষ্ট করিতে নিষেধ মাত্র করিয়াই গুরু মহাশয় তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাজে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে জল খাবারের ছুটী হইল। পুরন্দরকে হাঁকিয়া গুরুমশায় সুধাইলেন—"পুরোরে পুরো তোর নাকি বিয়ে?" পুরো মাথা হেঁট করিয়া মৃদু হাসিল—তাহার হইয়া ছেলের দল গুরু মহাশয়কে জানাইয়া দিল যে শুভদিন নিকটবর্ত্তী—আর গাঁয়েই বিয়ে, কনের নাম ফুল। ভট্টাচার্য্য একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"বেশ বেশ! তা পুরো, তোর মাকে বলে আজ্‌ ভাল রকমের একটা সিধা আমাকে দিস্‌—বুঝ্‌লি কথা?" পুরন্দর ষোল আনা সায় দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিল।

পাঠশালার নিকট দিয়া বাগদী বুড়ী লাঠি ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া যাইতেছিল। ছুটী প্রাপ্ত ছেলের দল দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বুড়ী ভাবিল, ছেলে গুলো যদি একসারি পিপীলিকা হইত, তবে অনায়াসে সে শত্রুকুল পদতলে দলিত করিতে পারিত। কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর বিধির বিধান—বুড়ীকে দেখিয়া আনন্দে ছেলের দল করতালি দিল, তার উদ্দেশে গাহিল,

বাগদী বুড়ী গুড়ি গুড়ি—
দাঁতনেই খায় তালের নুড়ি !

বুড়ী প্রথমে সে গান যেন শুনে নাই, এমনি ভাণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিল। কিন্তু সে রাগিয়া গালি না দিলে শিশুদের আমোদ সম্পূর্ণ হয় না। সুবুদ্ধি মধো পিছন দিক হইতে আসিয়া বুড়ির মাথায় ধূলি মুষ্টি ছড়াইয়া দিল। তখন বুড়ী শিশুর দলকে তাড়া করিল এবং তাহাদের পিতৃ মাতৃকুল উদ্দেশে অভিধান ছাড়া অনেক সুকথা কীর্ত্তিত করিয়া আপনার পথে চলিয়া গেল। এইরূপে ছেলেদের প্রাতঃকালীন বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হইল।

মধ্যাহ্নে স্নানাহার করিয়া রামধন ভট্টাচার্য্য আবার পাঠশালায় আসিয়া বসিলেন—এবার একটী উপাধান সঙ্গে। গুরু মহাশয় বসিয়া হেলান দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আরামে তামাক্ সেবন করিতেছিলেন এবং তাঁহার সেই ক্ষুদ্র বালক সেনা সদসৎ উপায়ে, অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য যে ঘুঁটে, চাউল, তরকারি রাশির সমাবেশ করিয়াছে হৃষ্ট চিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সর্দ্দার পোড়ো পুরন্দর আসিয়া বলিল যে ভোলা আর মধো একজোট হইয়া তাল পুকুরের বটগাছে কোকিলের ছানা পাড়িতে গেছে। অমনি পুরন্দর তারিণী আর দুখীরামের উপর আদেশ হইল গুরুমহাশয় করিতে করিতে ছোঁড়া দুটোকে ধরে নিয়ে আসুক। সর্দ্দার পোড়ো তিন জনের সঙ্গে পাঠশালার সকল ছেলে ভাঙ্গিয়া চলিল। সেই চৈত্র মাসের দুপুর রোদে আঁব বাগানে ছুটাছুটি করিয়া আঁব পাড়িবার লোভ সকলেরই মনে জাগিতেছিল, অতএব ছেলে মহলে ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। এ দিকে আজ পুরন্দরের কল্যাণে শ্রীল শ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য্য গুরুমহাশয়ের গুরুতর ভোজন হইয়াছিল, তাঁহার উদর সন্নিহিত উপাধান কাজেই ক্রমে মাথার নীচে স্থান পাইল। দেখিতে দেখিতে নিশ্চিত মনে গুরুমহাশয় নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে সেই গোল গোল জবা চক্ষুদুটী মুদ্রিত করিলেন।

ততক্ষণ তাল পুকুরের তালবনের ঘন শীতল ছায়ায় বসিয়া কায়স্থ কুলতিলক ভোলা সভয়ে চারিদিকে চাহিতেছিল, আর সুবুদ্ধি মধো নিকটেই প্রকাণ্ড বটগাছে উঠিয়া ভাবিতেছিল; কোন ডাল দিয়া গেলে কাকগুলো তাহাকে দেখিতে পাবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেদের সঙ্গে নির্ব্বিকার অবধূতের যাঁহারা তুলনা করেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। নির্ব্বিকার ভাব যে উভয়ের মধ্যেই যথেষ্ট সাধারণ তাহাতে বড় মতভেদ নাই, কিন্তু আমার আপত্তি স্বার্থের কথা লইয়া। অবধূতের

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—আর শিশুর আমার বোধ হয়—আত্মময় সর্ব্বভূতেষু! শিশুর সবই আমার! যদি আসল কথা ধর, ছেলেদের মত স্বার্থপর কেহ নহে।

পুরন্দর নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে গুরু মহাশয়কে ভোলা আর মধোর পলায়ন সম্বাদ দেয় নাই। কিন্তু তার আগে সকাল বেলাকার গোড়ার কথাটা বলি।

গ্রামের ছেলেরা যখন প্রভাতে পাঠশালে যাইতেছিল, ছোট ছোট মেয়েরা তখন ফুল তুলিতে চলিয়াছে। যখনকার কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখনকার স্ত্রী-শিক্ষার সুরু কুসুম চয়ন হইতে। সুশীলা, বিমলা, মনোরমা, করালী, কালীর সঙ্গে পুরন্দরের ভাবী পত্নী ফুলকুমারীও চলিয়াছে। গ্রামে ফুল বাগান মোট একটী—বোস বাবুদের বাগান—তাও গ্রামের বাহিরে। ছোট ছোট মেয়েগুলি সেই চৈত্র প্রভাতে মৃদু শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে চলিয়াছে—বায়ু সংস্পর্শে তাহাদের ক্ষুদ্র অলক রাশি ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। সকলেরই হাতে ছোট ছোট ফুলের ডালা। ক্রমে তাহারা তাল পুকুর ছাড়াইয়া আঁব বাগানে পৌঁছিল। কোকিল মহাশয় তখন পঞ্চমে সুর চড়াইয়াছেন—দইয়াল কাঁঠালগাছের তলায় বসিয়া লেজ নাবাইয়া সিস্ দিতেছিলেন, আর আর পাখীরা কোলাহল ছাড়িয়া বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে যাত্রা করার উদ্যোগ করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিক লাল হইয়া আসিতেছিল।

বাগানের মাঝামাঝি আসিয়া বালিকার সারি হঠাৎ থামিল। ছোট একটী গাছে স্তবকে স্তবকে আম ফলিয়াছে—একটু উঠিলেই পাড়া যায়। সুশীলা সকলের আগে, সে লোভ তাহার অসম্বরণীয় হইল। সে সকলকে ডাকিয়া বলিল।

"আগে ভাই আঁব পাড়ি আয়,—এই বেলা কেউ কোথাও নেই—তার পর ফুল বাগানে যাব এখুনি।"

সকলে দাঁড়াইল—ফুলের ডালা রাখিল,—ফুলকুমারী কেবল তাহা করিল না। বিমলা বলিল, "কিলা ফুলি, ভয়ে যে শুকিয়ে গেলি—অত ভয় কিসের? ডালা রাখ্!" ফুল বাস্তবিক ভয়ে ঘামিতেছিল, ঢোক গিলিয়া বলিল—"আমি যাই, মা বক্‌বে।" কালী ছাড়া আর সবাই নাসা কুঞ্চিত করিল। করালী বলিল—"সবারই মা আছে লো ফুলি সবারই মা আছে! অত যদি ভয়, ফুল তুলতে আস্‌তে নেই।"

ফুল নতনয়নে অনুযোগ সহিতে লাগিল, এক একবার দীন নেত্রে কালীর দিকে চাহিতে লাগিল। কেননা সে সই! সই দুঃখ বুঝিলেন। রাগিয়া বলিলেন, "তা ও যদি আম না পাড়ে, তোর কিলা করালি! মর্ চোপা দেখ্! চল্ সই আমিও যাই!" এই বলিয়া কালী নিজের ডালা তুলিয়া লইয়া ফুলের হাত ধরিয়া ফুল বাগানের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সুশীলা তখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া গাছে উঠিয়া আম ছিঁড়িতেছিল, আর আর সকলে তাহা কুড়াইতে ব্যস্ত। সুতরাং ঝগড়াটা

পুষ্পোদ্যানটী বিশেষ যত্নে রচিত। তখনও বাঙ্গালা ইংরেজের হয় নাই বিলাতী ফুল পত্র তখনও দেশী বাগানে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বাগানে যুই, বেলা, চামেলী, গোলাপ ফুলের গাছই বেশী, মাঝে মাঝে বকুল, আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতির বড় বড় গাছ ছোট ছোট ফুল গাছ এবং লতিকা রাজির উপর মুরব্বি আনা করিতেছে। ফুলে বাগান সব ভরিয়া রহিয়াছে দলে দলে ভ্রমর মৌমাছি পরিমল লোভে তাহাতে বিচরণ করিতেছে। মালীরা এখানে ওখানে কাজ করিতেছিল— কচি মেয়ে দুটী নিঃশঙ্ক চিত্তে সেখানে প্রবেশ করিল।

কালী পথে পরামর্শ করিতে করিতে আসিতেছিল, যে তারা দু জনে সব ফুল আজ্ তুল্‌বে সুশীলারা যেন একটীও না পায়। ফুলকুমারী তাতে সহজে রাজি হয় না। সইকে বুঝাইল—"ঠাকুর সবারই সমান ভাই—সব ফুল তুল্‌লে ওদের ঠাকুর যদি রাগ করে শাপ দেন।" কালী এ যুক্তির বল অস্বীকার করিল না, কিন্তু বেশীর ভাগ ফুল যে তারা তুলিবে ইহা সে সইকে প্রতিশ্রুত করাইল।

ফুলের চেয়ে কালী এক বছরের ছোট কিন্তু তার চেয়ে একটু শক্ত সমর্থ। বেশী ফুল সেই তুলিল—ফুলও অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী পুষ্প আহরণ করিল। কিন্তু তাতে তার অনুরাগ ছিল না—ভারি বিপদে পড়িয়াই তাহা করিতে হইল। কি করে এ দিকে সইয়ের জেদ্ না শুনিলে সে রাগ করিবে ওদিকে সবারই ঠাকুর সমান, যদি শাপ দেন! কাজেই ফুল তোলা শেষ না হইতে হইতেই মানুষ ফুল এক গা ঘামিয়া উঠিল। তাহার টুকটুকে মুখখানি ক্লান্তিতে লাল হইয়া উঠিল। সই তবু ছাড়ে না। বাগানের ফুল তোলা শেষ হইলে প্রস্তাব করিল, দীঘির জলথেকে গোটা কত পদ্মফুল তুল্‌তে হবে! সর্ব্বনাশ! ফুল সইয়ের এ অনুরোধ কি রূপে পালন করিবে, সে ত সাঁতার জানে না! আর সইই বা কেমন করে কাপড় ভিজিয়ে সাঁতার দিবে। ফুল ভাবিয়া অস্থির হইল। কালী হাসিয়া বলিল—"সত্যিই সই তুই বড় ভীতু—তা তোকে জলে নাব্‌তে হবে না লো। দেখ্‌ত আমি কেমন সাঁতার দি। তুই বাঁধাঘাটের উপর বটতলায় বসে দেখ্‌বি তখন—বোন্।"

দুজনে বাঁধাঘাটের দিকে চলিল—কালী আগে, ফুল পাছে। একে অপরাজিতা লতা, অন্যে লজ্জাবতী, বাতাসে কেহ নাচিয়া উঠে, কেহ মুদিয়া যায়। বটতলায় আসিয়া কালী কাপড় ছাড়িবার উদ্যোগ করিল।

ফুল জিভ্ কাটিয়া বলিল—"ছি সই উলঙ্গ হয়ে সাঁতার দিবি—কেউ যদি দেখে? সইমা শুন্‌লে রাগ্ করবে।"

কালী নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—"হাঁ, কেউ দেখ্‌তে পেলে ত? এখুনি এলুম কাপড় ছেড়ে, আবার তোর কথা শুনে কাপড় ভিজুই আর কি? কে আস্‌বে এখানে—সব-

বলিতে বলিতে কাপড় ছাড়িয়া সইয়ের গায়ে ফেলিয়া দিয়া কালা জলে লাফাইয়া পড়িল।

ছোট্ট কাল কাল মেয়েটী—কৃষ্ণ হংসের মত সহজে সাঁতার দিয়া চলিল। দীর্ঘিকার অগাধ কালো শান্ত জল রাশিতে ঈষৎ চাঞ্চল্য সঞ্চার হইল,—হয়ত ক্ষুদে মেয়েটীকে বুকে করিয়া তাহার অগাধ হৃদয়ে পুর্ব্ব স্মৃতি উথলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কালী বহু দূরে গেল—মাঝে মাঝে হাসি মুখে সইয়ের দিকে ফিরিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিল। সই কিন্তু তাঁহার হাসির উত্তরে হাসিতে পারিতেছিলেন না, তাঁর প্রাণটা যে করিতেছিল তা আর কি বলিব? কালীর প্রত্যেক গতিতে ফুল ভয়ে ম্রিয়মান হইতেছিল, তাহাকে এইরূপে সাঁতার দিতে দেখিলে লোকে কি বলিবে ভাবিয়া তাহার লজ্জার সীমা ছিল না। কিন্তু সইকে বুঝালেও ত সে বোঝে না—হেসেই উড়িয়ে দেয়! ফুলের ভারি মুস্কিল উপস্থিত—কি করে শুক্‌নো শুক্‌নো মুখখানি সইয়ের দিকে স্থাপিত করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—মাঝে মাঝে চকিত দৃষ্টিতে এ দিকে ও দিকে দেখিতে লাগিল।

শেষে তার বড় ভয় করিতে লাগিল। মাথার উপরে প্রকাণ্ড বটগাছ—তাহার সহস্র জটা মেলিয়া নিঃঝুম দাঁড়াইয়া আছে—কখন কখন মৃদু সমীরে তার দুই চারিটী পাতা শব্দ করিয়া কাঁপিতেছে—ক্বচিৎ একটী পাখী উড়িয়া আসিয়া তাহার ডালে বসিতেছে। প্রভাত রবির প্রথম কিরণ এই মাত্র তার নবীন পাতা রাশিতে পড়িয়া উজ্জল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে কালী কমলের-দলে পৌছিয়া ফুল ছিঁড়িতে লাগিল—অমনি কি জানি কেমনতর একটা ভয়ে ফুলকুমারীর শরীর কণ্টকিত হইল।

ফুলের মনে হইল—তার পিটের দিকে কে দাঁড়াইয়া—সত্যই ত! সে স্তিমিত নেত্রে অবসন্ন দেহে দেখিল, লাঠি হাতে রুক্ষ শ্বেতকেশ বাগ্‌দী বুড়ী তাহার পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে—তার চোক ঘুরিতেছে। বুড়ী বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে, তার মধ্যে ফুল সম্পষ্ট শুনিল ডাইন বুড়ীটা কি একটা মন্ত্র আওড়াইতেছে! ক্রমে বুড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল—তাহার ভাষা স্পষ্টতর শুনা গেল। "মর ছুড়িরে—ভদ্দর লোকের মেয়ে গুলো কি বজ্জাত!" তার পর ফুলকে দেখিয়া সে একটু থামিল। কাছে ঘনাইয়া আসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—"না ও দত্তদের ফুলকুমারী ওর মা বড় ভাল, ছুঁড়িও ভাল, আমায় কখন রাগায় না ওকে কি মারতে পারি! আহা এমন মেয়েটার কপালে এত দুঃখু—বাবা নেই, বিয়ে দেবে কি না পুরো ছোঁড়ার সঙ্গে! বুড়ী আর দাঁড়াইল না। ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু তাহার কর্কশ কণ্ঠ পশ্চাতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফুল স্পষ্ট শুনিল সে যেন বলিল—"শাঁপ আছে ও বিয়ের সুখ হবে না!" ঠিক্ সেই কণ্ঠে বট বৃক্ষ শিরে কে যেন উচ্চারিত করিল! "শাঁপ আছে—এ বিয়ের সুখ হবে না!" ভয়ে ফুল এক গা ঘামিয়া উঠিল, ইচ্ছা চীৎকার করিয়া সইকে

ডাকে, কিন্তু কথা কণ্ঠে রহিয়া গেল। নিশ্চেষ্ট হইয়া সে সইয়ের কাপড়ের উপরে শুইয়া চক্ষু মুদিল। সেই মোহাবস্থায় তাহার তন্দ্রা আসিল। স্বপ্নের ঘোরে ফুলকুমারী চারি বৎসর আগে পিতার অন্তিম শয্যার করুণ চিত্র দেখিল। বাপ্ যে তার আর তার মার হাত ধরে বলিয়াছিল—"তোমাদের অকুলে ভাসিয়ে চল্লাম"—সে কথা ফুল আজ আবার শুনিল। বেশীর ভাগ শুনিল, পিতা যেন বলিতেছেন—"শাঁপ আছে, এ বিয়ে সুখের হবে না!"

অতৃপ্তি।

প্রথম সর্গ।

ঘুমঘোর।

(উদ্যানে অদূরে ললিত ও বনবালাকে দেখিয়া আপন মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে—)

সখি। সুগভীর দ্বিপ্রহর নিশা
ঘুমে ঘোর স্তব্ধ দশদিশা।
ঘুমন্ত কানন প্রাণে প্রাণে
ঢালে চাঁদ জোছনার হাসি,
ঘুমো ঘুমো আধো ফুটো আঁখে
স্বপন দেখিছে ফুল রাশি।
সখির যে ঘুম নাই তবু—
এ দেখি বিষম বড় জ্বালা,
এখনো কাননে পতিসনে
করিছে সে কুসুমের খেলা।
ঘুম ঘোরে শ্রান্ত-ফুলগুলি
তবুও সে দিবে না ঘুমাতে,
গাঁথিয়ে মালিকা সে ফুলের
পরাইছে স্বামীর গলাতে।
সারা দিন গেয়ে গেয়ে গান
অবসন্ন বীণার পরাণ,
নয়ানে লেগেছে ঘুম ঘোর,
স্বপনে থাকিতে চাহে ভোর,
সে স্বপন ভাঙ্গায়িয়ে সখি
তবুও দিতেছে তাহে তান,
ঘুমো ঘুমো আধো আধো সুরে
বীণাটি গাহিছে তবু গান।
ঘুমন্ত বীণার তানে সখি
মিলাইয়া আপনার তান,
ললিতের মুখ পানে চেয়ে
সেই এক গাহিতেছে গান।

গান।

"না দেবতা এ দেখি স্বপন!
বাস প্রভু স্বরগে তোমার
আমি ক্ষুদ্র বালিকা ধরার
হেথায় কি করে বল দেব
পাইনু তোমার দরশন?
না দেবতা এ বুঝি স্বপন!

যায় বুঝি এ স্বপন ছুটি
এই বুঝি জাগিয়া বা উঠি,
পাইব না দেখিতে তোমারে
বুঝি আর এ ঘুম ভাঙ্গিয়ে।
আকাশের দেবতা গো তুমি
আকাশে যাইবে হারাইয়ে।
কেন প্রাণ করিছে এমন
দেবতা গো বুঝি এ স্বপন।"

তৃষিত বালার কানে কানে
ললিতও যে ঢালে প্রেম গান,
কি একটি মোহময় ভাবে
ভোর করি তাহার পরাণ।
ললিতের এক ঐ গান
শুনিয়া কি সারা দিবানিশা,
তবু তার মিটিবেনা সাধ
তবু তার পূরিবে না তৃষা ?
সারাদিন বুঝি সখি-হৃদে
জাগে ডর জাগে অভিমান,
শুনিবারে ললিতের মুখে
বুঝি শুধু এক ঐ গান।

উত্তর-গান।

"চিরদিন তোরি তরে পাতিয়াছি এ হৃদয়,
এ স্বপন ভাঙ্গিবে না স্বপন যদি বা হয়।
জনম জনম ধ'রে, এ প্রেমে হৃদয় ভ'রে
ভ্রমিব আমরা উভে এলোক ওলোকময়।
এস্বপন ছুটিবেনা, এ প্রণয় টুটিবে না
পৃথিবীর আর যত সব যদি হয় লয়।
অমর আত্মার পাতে রবে ইহা সাথে সাথে
স্বরগের ধন ইহা নাহি ইহে মরভয়।"

না ফুরাতে শেষ কথাটি যে
না মিলাতে অধরের তান,
কেমন সুধীরে ললিতের
নিমীলিত হোল দু-নয়ান।
ঘুমন্ত সে সোয়ামীর কোলে
সজনীও পড়িল ঢলিয়া,
কুসুম শয়ানে ধীরে ধীরে
দুজনে বিভোর ঘুমাইয়া।
নিশীথের স্তব্ধতার সাথে
মিলাইয়া গেল গীত তান,
কি জানি এ কি মায়ার ঘোরে
সহসা বিঘোর বন-প্রাণ!
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দোঁহে
তেমনি রয়েছে সব যেন,
কাননে এখনো গীত ধ্বনি
উথলিছে মনে লয় হেন।
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বালা
হাসি তবু অধরে ফুটিয়া,
এখনো গাহিছে যেন গান
বীণাটি সে ভূমেতে লুটিয়া।
এখনো যে ঘুমন্ত বালিকা
বীণাটি ধরিয়া এক হাতে,
আর হাতে মালা একগাছি,
ঘুমায়েছে পরাতে পরাতে।
ললিতের প্রাণে প্রাণে যেন
উথলিছে সুখের উচ্ছ্বাস,
হৃদয়ের লুকান হরষ
অধরেতে হয়েছে বিকাশ।
সহসা অধর হতে তার
কেন গেল হাসিটি নিভিয়া ?
হাসি মাখা মুখানির মাঝে
অমন বিষাদ কেন রাজে!
সুখের স্বপন মাঝে সখা
উঠিল কেন রে চমকিয়া ?

জাগরণ ।

(ঘুম হইতে উঠিয়া)

ললিত। কেন হৃদি আকুল এমন
কি দেখিনু একি এ স্বপন !
সুখের প্রতিমারূপী মরি
কোথা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া ?
কিছু যে লাগে না ভাল আর
সংসারের ধনজন জায়া।
বনবালা ঘুমন্ত বালিকা
একি তুই সেই বনবালা ?
প্রেমময় সৌন্দর্য্য জ্যোতিতে
হৃদয় যে ছিলি করে আলা ?
কোথা তোর সে মোহন রূপ !
আজ কেন তোরে দেখে হায় ?
প্রেয়সি লো নয়নে আমার
দারুণ আঁধার হেন ভায় ?
আজ কেন ও মুখানি দেখে
নেভে না এ প্রাণের অনল !
বুক ফেটে কেনরে এমন
নয়নে উছলে অশ্রু জল ?
কি যেন চাহিছে এ পরাণ
তোর প্রেমে পূরাতে না পারে,
জানি না সে কে সুখের দেবী
হৃদয় এ চাহিছে যাহারে !
ঐ হোথা ঐ যে দাঁড়ায়ে
সে আমার হৃদয়ের জ্যোতি !
অজানা কি সুখ-পিপাসায়
হৃদয় বিহ্বল হেরি অতি।
কেন তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী বালা
ডাক মোরে বার বার ক'রে।
হেথায় যে একটি লতিকা
বাঁধিয়াছে মোরে প্রেম ডোরে।
এ হৃদয় আশ্রয় হইতে
কেমনে গো নিঠুর আঘাতে,
ছিঁড়িয়ে ফেলিব তারে দূরে
বাঁচিবে কি সে আর তাহাতে ?
যাও দেবি যাও দূরে তুমি
তোমাকে চাহি না আমি আর,
বনবালা তুই প্রেমময়ি
আয় বুকে আয় লো আমার !
হৃদি হতে দিব ফেলে তোরে !
নিরাশ্রয় অসহায় বালা !
সহিতে পারিবি কিরে তুই
দারুণ সে নিঠুরতা জ্বালা।
একাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
অভাগিনী যাবি শুকাইয়া,
ভাবিতেও পারিনে যে আর
শত বজ্রে জ্বলে উঠে হিয়া।
বনবালা হৃদয়ের রাণি
আয় হৃদে আয় লো আমার,
ঢাল ঢাল তৃষিত পরাণে
তেমনি রে প্রেম-সুধাধার।
ঢাল প্রেম, মোহ সুখোচ্ছ্বাস
ঢাল প্রাণে প্রমোদ উল্লাস,
ডুবায়ে দে হৃদয়ে আমার
সুধার সাগর মাঝে বালা,
যাক নিভে যাক নিভে যাক
প্রাণের এ পিয়াসার জ্বালা।
হৃদয়ের দেবী ছিলি তুই
হয়ে থাক হৃদয়ের দেবী,
তোরে ছেড়ে কোথা যাব বল,
মুছিব এ নয়নের জল—
তোমারি চরণ রাঙ্গা সেবি।

বিদ্রোহ।

(গত ভাদ্র-আশ্বিনের সংখ্যা হইতে আরম্ভ)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোন কবি গাহিয়াছেন—

"প্রতি দিন শত আঁখি পরে—
কত ফুল ফোটে আর ঝরে,
একদিন একটি সে ফুল,
করি শুধু কবিরে আকুল
বাঁচিয়ে থাকে সে কবিতায়,
অন্যে যবে মৃত্যু কোলে ধায়।
প্রতি দিন শ্বেত পীত রাঙ্গা
কত শত মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
আকাশে ভাসিছে স্তরেস্তর,
একটি রঙ্গিন শুধু থর
ধরি তার রাখে চিত্র কর।
ধরা মাঝে থাকে সে অমর।
একটি সে মধুর তাকানি
আধো ফোটা দু একটি বাণী,
কোনক্ষণে কখন কে জানে,
কেমনে আসিয়া পড়ে প্রাণে,
কেমনে বাজে গো কাণে হায়,
সহসা সে প্রেমেরে ফুটায়"।—

মধুর ভাবায় জ্বলন্ত সত্য! একজনের জীবনের পথে কত জন প্রতিদিন আনা গোনা করিতেছে সে তাহাদের প্রতি চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু একদিন একজনের এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে, একটি সামান্য কথায় তাহার অনন্ত জীবনে যেন বিপ্লব জাগিয়া উঠে।

রাজা যে কি মুহূর্ত্তে কি মায়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন "ও হাতে পদ্মও মলিন হইয়া পড়িয়াছে" সেই কথা গুলি সেই অবধি সঙ্গীত হইতেও মধুর স্বরে বালিকার কাণে বাজিতেছে, সেই কথায় তাহার ছোট্ট প্রাণের মধ্যে একটা নূতনতর সুখের উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে।

তাহাকে যে আর কেহ কখনো সুন্দরী বলে নাই তাহা নহে,

তাহাকে সুন্দরী বলে, যে যখন তাহাকে দেখে সুন্দরী বলে। সম্প্রতি ইদরে আসিয়া অবধি জালুর নাতি ক্ষেতিয়া ত অষ্টপ্রহর তাহাকে সুন্দরী বলিতেছে, ক্ষেতিয়ার এই অতিরিক্ত স্তুতিবাদ বালিকার নিকট এতই বিরক্তি জনক যে, সুন্দরী বলিলে বিরক্তির বদলে যে আবার আহ্লাদও হইতে পারে ইতি পূর্ব্বে তাহার সে জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না।

আজ তাহার যতই মনে পড়িতেছে "ও হাতে পদ্মও মলিন"—ততই তাহার হৃদয়ে একটা সুখের উৎস ছুটিতেছে, আর ততই তাহার মনে হইতেছে, এ কথা কেন বলিলেন? রাজা কি সকলকেই এইরূপ বলেন? ফুলের মত কি কেহ সুন্দরী হয়? এ বুঝি উপহাস?" হউক উপহাস—কি উপভোগ্য উপহাস, এ উপহাস তাহার হৃদয়ে যে নূতন আনন্দ রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে! আজ সে যাহা দেখিতেছে তাহাতেই তাহার আনন্দ হইতেছে—তাহার প্রতিই তাহার ভালবাসা জন্মিতেছে! অন্য দিন ক্ষেতিয়াকে দেখিলেই সে পালাইবার চেষ্টা করিত, আজ তাহাকে পর্য্যন্ত দেখিয়া সে আহ্লাদ প্রকাশ করিল, তাহার সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল, এমন কি, সে যখন উথলিত হৃদয়ে তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল, তখনো রাগ না করিয়া বালিকা হাসি-মুখে তাহা শুনিতে লাগিল। ক্ষেতিয়া তাহাতে এতদূর আহ্লাদিত এতদূর আশ্বস্ত হইল, তাহাতে তাহার এতখানি সাহস বাড়িয়া গেল—যে আজ সে অসঙ্কোচে বলিল— "জোয়ানি, মোর গরু ছাগল তোর হইবে, মোর ঘর তোর হইবে, মুই তোরে শীকার আনিয়া দিব, মুই তোরে গহনা পরাইব, তুই মোর ঘর করিবি?"

এটা তাহার বিবাহের প্রস্তাব। সুসভ্য ও অসভ্যের প্রথা আর কি এখানে অনেকটা একই রকম। বলা বাহুল্য সাধারণঃ অসভ্যদিগের মধ্যে আমাদের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। তবে আজ কাল স্থানে স্থানে যে ব্যভিচার দেখা যায় সে আমাদের সংসর্গের ফল।

বালিকা তখন বড় রাগিয়া উঠিল, বলিল—"দূর হ তুই" বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, মায়ের সঙ্গে মিশিয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল, কাজের মধ্যে দশ শ-বার শিশুর মত মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

মা বলিলেন "এত্তটা বড় হইছে তবু দেখ না ছেলে মানুষ! যা তোর দাদারে খাওয়ায়ে আয়" সুহার অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দাদার কাছে গেল, দাদা খাইতে খাইতে তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন, সে আনমনে শুনিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল "ও হাতে পদ্মও ম্লান" মাঝে মাঝে হৃদয়ে একটা বিদ্যুৎ বহিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সে নদীতে স্নান করিতে গেল, আগের দিনের মত

ঘাটে গিয়া সেই পদ্মগুলি ধরিতে আজো তাহার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কে জানে হঠাৎ আজ তাহার কেন এ বাধ বাধ ভাব !

বালিকাদের হঠাৎ বিবাহের পরদিন যেমন যুবতীর লজ্জার ভাব আসিয়া পড়ে, আগের দিন যে সকল পরিচিত পুরুষের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিয়াছে,—তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেও যেমন ঘোমটা না টানিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ কি এক সঙ্কোচ কি এক লজ্জার ভাবে বালিকা বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। কে জানে কেন তাহার এ লজ্জা ! সে ত শুধু ফুল কুড়াইতে যাইতে চায়—শুধু ফুল তুলিতে ! আর কোন কারণে নহে, আর কাহাকে দেখিতে নহে, নিশ্চয়ই নহে, তবে কেন তাহার এত লজ্জা ! সে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রাজা মন্দির ঘাটে স্নানে আগমন করিলেন, বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ঘাটে যাইবে কি তাড়াতাড়ি সে কূলে উঠিয়া পড়িল, কূলে উঠিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল—তাহার সঙ্গীরা যখন স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল তাহাদের সহিত গৃহাভিমুখী হইল।

সেই দিন হইতে প্রতিদিনই সে নদীতে স্নান করিতে যায়, যে দিন রাজাকে দেখিতে পায় তাহার দেব দর্শনের আনন্দ জন্মে, সেই প্রাণভরা আনন্দ লইয়া মনে মনে সে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করে, যে দিন রাজা স্নানে না আসেন সে দিন ম্লান নিরানন্দ ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু তাঁহার দর্শনের আনন্দের ন্যায় অদর্শনের এই নিরানন্দও তাহার নিকট উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়, কৃপণের সম্পত্তির মত এই সুখ দুঃখ সে হৃদয়ের নিভৃতে লুকাইয়া লুকাইয়া ভোগ করে, ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবে না। সে যে রাজাকে ভাল বাসিয়াছে, এই ভালবাসাই যে তাহার সুখ দুঃখের কারণ, এ সুখ দুঃখ ভোগে তাহার অধিকার আছে কি না, এ ভালবাসা তাহার উচিত কি অনুচিত—এ সকল কথা তাহার কখনো মনে আসে না,—কেনই বা আসিবে ? দেবতাকে কে না ভালবাসে, কেনা তাহার দর্শন পাইতে চায় ? কিন্তু দেবতাকে ভালবাসিয়া কে আবার সে ভালবাসার ঔচিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করে ? সে কথা না কি কখনো কাহারো মনে উদয় হয় ?

বালিকার ওসকল কথা কিছুই মনে আসে না, রাজার দেবমূর্ত্তি সে কেবল সর্ব্বদাই নয়নের উপর দেখিতে পায়। তাঁহার সেই কথাগুলি কেবল বীণার মতন তাহার কর্ণে বাজিতে থাকে, তাঁহার দর্শন অদর্শনের সুখ দুঃখ মাত্র সে কেবল তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করে, ইহা ছাড়া আর সে কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু ভাবে না। এই বিশুদ্ধ দেব প্রীতিতে যে কিছু অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে যে কলঙ্ক লুক্কায়িত থাকিতে পারে, ইহা সে সরল বালিকার বুদ্ধির অতীত, সুতরাং ইহা তাহার মনের ত্রিসীমাতেও পৌঁছে না।

ইহার পর কয়েক মাস চলিয়া গেছে, বালিকাদের কুটীরের নিকটে ভীলগ্রাম যাইবার রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্বাভাবিক নিকুঞ্জ মধ্যে বালিকা প্রায় রোজই

বেড়াইতে আসে, আজও আসিয়াছে। পাহাড়ের একটি অংশ হইতে জল চুঁয়াইয়া এই নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় হইয়াছে, বালিকা সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া বসিল, জলাশয়ের স্ফটিক জলে তাহার মুখখানি প্রতিবিম্বিত হইল। তাহার এলোচুলের রাশি মুখের আশে পাশে পড়িয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিতেছিল, বালিকার কি মনে হইল কে জানে সে হাতে পাকাইয়া সেই ঘন চুলের রাশ এক রকম করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। কেহ তাহার চুল বাঁধিতে আসিলে সে ভারী বিরক্ত হইত, মা যদি কোন দিন জোর করিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়া, কপালে একখানি আয়নার টিপ বসাইয়া, কাণে দুটি চাঁপা গুজিয়া সাজ সজ্জা করিয়া দিতেন, ত সমস্ত দিন সে মুখ গোমসা করিয়া বসিয়া থাকিত। সাজগোজে তাহার স্বাভাবিক কেমন বিতৃষ্ণা, ছেলেবেলা উলকি পরাইবার নাম করিলে সে মহা কান্না কাটি জুড়িয়া দিত—সেই জন্য এতদিন তাহার উলকি পরা পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহা হয় নাই বলিয়া তাহার বাড়ীর সকলের বিশেষতঃ তাহার মায়ের বড়ই দুঃখ, অমন সুন্দর রঙ্গে যদি উলকির ফলন না পড়িল তবে রংই মাটী? কিন্তু আজ বালিকা চুল বাঁধিয়া মাটীর একটা টিপ তৈরি করিয়া কপালে পরিল, দুইটা বাবলার ফুল তুলিয়া কাণে দিল—পরিয়া জলে মুখ দেখিতে লাগিল—কি জানি দেখিতে দেখিতে কি মনে হইল—আপন মনে বলিল—

সুন্দরী! ছি এই বুঝি সুন্দর! বলিয়া টিপটা মুছিয়া বাবলা দুইটা খুলিয়া ফেলিল, চুলগুলি এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া খানিক পরে সে গুণ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিল, ক্ষেতিয়ার কাছে গানটি শুনিয়া শুনিয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

সখিরে, ক্যায়সে বাজাওয়ে কান!
ও নহি রে গীত তান, মুঝ অনুমান!
বাঁশরীক হিয়া ভরি, নিঠুর কানাইয়া মরি
অনুখণ স্মৃতিখন হানয়িছে বাণ!
টুটয়িল সরম আকুলিল মরম
চূর চূর অন্তর প্রাণ!
ও ক্যায়সে নিরদয় কান!

অল্পে অল্পে সেই গানের গুণগুণানি স্পষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে সুর হইতে রেখাবে, রেখাব হইতে গান্ধারে, গান্ধার হইতে মধ্যমে, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ধৈবতে, ধৈবত হইতে নিখাতে উঠিয়া পড়িয়া খেলিতে খেলিতে সেই পাপিয়া কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী স্তব্ধ অরণ্যের শিরায় শিরায় তরঙ্গিত হইয়া দিক বিদিক উথলিত করিয়া তুলিল, বালিকা আপন মনে শুধু গাহিতে লাগিল। সহসা সে চমকিয়া গান বন্ধ

করিল, হঠাৎ মনে হইল—জলাশয়ে যেন কাহার ছায়া। ফিরিয়া দেখিল রাজা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। বালিকা বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা এখানে একাকী আসেন নাই, সঙ্গে গণপতি, গণপতি বলিলেন—"দূর হইতে মনে হইতেছিল—এ কোন দেব কন্যার কণ্ঠধ্বনি স্বর্গ হইতে উচ্ছসিত হইতেছে। সত্য যে এখানে কেহ গাহিতেছে তাহা মনে হয় নাই,"

সত্যই এই গীত ধ্বনি তাঁহাদিগকে কুতুহল করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছিল। রাজা এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জে সেই সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি বনদেবীর মত তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল, হরিতাচার্য্যের কথা রাণীর কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি মনে মনে বলিলেন—"ভাল বাসিবার সামগ্রী বটে" আর কিছু নহে, শুধু বলিলেন—ভালবাসার সামগ্রী বটে। একথা তাঁহার এই প্রথম মনে হইল, তাহার সৌন্দর্য্য তিনি এই প্রথম অনুভব করিলেন। অনেক সময় মিথ্যা ক্রমে সত্য নির্ম্মাণ করে। সন্দেহ বিশ্বাসের মূল গঠিত করে। এরূপ কথা রাজার মনেই আসিত না, যদি রাজা না জানিতেন যে ইহা অন্যের মনে আসিয়াছে।

এই সময় ক্ষেতিয়া কাঠের মোট মাথায় এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরণ্য হইতে বাড়ী যাইবার সময় বিকালে প্রায়ই সে এখান দিয়া হইয়া যাইত, কেন না সে জানিত সুহার বিকালে এখানে থাকে। আজ বালিকার নিকট রাজাকে বন মধ্যে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, তীব্র স্বরে সুহারকে বলিল, "সুহার বাড়ী যাইবে না?" অন্য সময় হইলে সুহার তাহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিত, কিন্তু আজ কে জানে কিছু বলিতে সাহস করিল না—আস্তে আস্তে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। রাজা তাহার পরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কথা আছে প্রণয়ী অন্ধ, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেখিয়া ভাল বাসে না। কিন্তু প্রণয়ীর দিব্য চক্ষু ইহাই ঠিক। সহজে অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, প্রণয়ীর নিকট তাহা সুস্পষ্ট। রাজার নিকট ক্ষেতিয়া সুহারকে দেখিয়া বড়ই মুষড়িয়া গেল, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না—যে সুহার রাজাকে ভাল বাসে। রাজা বালিকাকে যে কোন গুণ জ্ঞান করিয়াছেন তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না, নহিলে এত দেশ থাকিতে রাজার প্রতি তাহার মন পড়িবে কেন। ভীলের চক্ষে সেটা নিতান্তই একটা অসম্ভব ব্যাপার। বালিকা তাহার কথায় যতই বিরক্ত হউক কালে তাহাকে যে বিবাহ করিবে এইরূপ তাহার একটা ধারণা ছিল—কিন্তু আজ সে দমিয়া গেল, বাড়ী গিয়া তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার পর সে বাড়ী হইতে বাহির হইল,

শিখরপাড় গ্রামের সেই ভীল গুণী ভীলগ্রামে এখন বাস করেন, তাহার নিকট সে যাত্রা করিল। গুণী তাহাকে নানা রূপ প্রশ্ন করিয়া বালিকার সম্বন্ধে যতদুর জানা যায় আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে সব বাহির করিয়া লইয়া অবশেষে বলিলেন—"রাজা মেয়েরে গুণ করিয়াছে।" ক্ষেতিয়া তাহাতে একমত হইল। গুণী বলিল "জিনিষ জিনিষ—ফুল ফুল, রাজা একদিন মেয়েরে ফুল দিয়াছিল?" ক্ষেতিয়া তাঁহার গণনায় বিস্ফারিত চক্ষু হইয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল,গুণী বলিলেন—'সে ফুল গুণকরা ফুল তাহাতেই মেয়ে বশীভূত হইয়াছে'।

ক্ষেতিয়ার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। গুণী একটি শিকড় তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"ইহা লও; সেই ঘাটে যে ফুল ভাসিয়া যাইবে সেই ফুলে তিনবার এই শিকড় বুলাইয়া তাহা কন্যাকে দিবে, একদিনে না হউক প্রত্যহ দিতে দিতে কন্যা বশীভূত হইবে, আর রাজা যে মায়াফুল কন্যাকে দিয়াছেন, তাহা কোথায় খুঁজিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে, গোপনে লইও যেন কন্যা না টের পায়।"

গুণীর আর কোন গুণ না থাক মনুষ্য চরিত্র যে কতক পরিমাণে তাহার আয়ত্ত ছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। ভালবাসা দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে একজন বশীভূত হইবে, এ উপদেশ সাধারণত বিফল না হইবারই কথা। তবে সকলস্থলে যে একই উপদেশ খাটেনা ইহাই মাত্র তাঁহার বুঝিবার ভুল। যদি তিনি দেখিতেন বালিকা ভীল নহে—তাহা হইলে হয়ত এরূপ উপদেশ দিতেন না।

ভীল আহ্লাদিত চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল—সমস্ত রাত তাহার ঘুম হইল না,—প্রাতঃকালে নদী তীরে গিয়া দেখিল পুরোহিত স্নান করিতেছেন—তিনি স্নান করিয়া উঠিয়া গেলেন, সে আস্তে আস্তে তাঁহার পূজার ফুলগুলি তুলিয়া লইল, তুলিয়া তাহা মন্ত্রপুতঃ করিল। বালিকা নিয়মিত সময়ে অন্য ঘাটে স্নানে আসিল, তাহার সঙ্গে আর একজন ভীল কন্যা মাত্র, আর কেহ ছিল না। তাহাকে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে নিকটে গিয়া সেই ফুলগুলি ধরিল—বালিকা তাহার পানে চাহিল, নয়নে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল—ভীল বলিল—"তোমার জন্য আনিয়াছি—তুমি ফুল ভাল বাস?"

বালিকা বলিল—"আমি ফুল ভালবাসি কে বলিল? এখানেও বিরক্ত করিবি"—বলিয়া ফুল লইয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিল—কাল সে তাহাকে কিছুই বলিতে পারে নাই—আজ তাহার শোধ লইল। ক্ষেতিয়ার মনে বড় কষ্ট হইল, চোখে জল পড় পড় হইয়া আসিল, এমন সময় রাজা স্নান করিতে আসিলেন—বালিকা তাহার চোখের জল দেখিতে পাইল না, সে জল হইতে উঠিয়া উপরে গাছের মধ্যে দাঁড়াইল, তাহাকে কেহ না দেখে সেই যাহাতে দেখিতে পায়। ক্ষেতিয়া তাহা বুঝিল, নিরাশ চিত্তে সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—রাজা স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন, সুহার কখন চলিয়া গেল, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের কাছ দিয়া ভীলগ্রামাভিমুখে চলিল, ...

যাইবে। পুরোহিত তাহাকে ডাকিলেন—তিনি দেখিয়াছিলেন তাহার ফুল বালিকা ছুঁড়িয়া উপরে উঠিল। ক্ষেতিয়া দাঁড়াইল, দেখিলেন তাহার মুখে হৃদয়ের গভীর দুঃখ। জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষেতিয়া (পুরোহিত তাহাদের চিনিতেন) ও তোমার কে ?

ক্ষেতিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিল, খানিক পরে বলিল—"মোর কেউ না, মুইডা বিয়ে করিতে চাউল"—

কোথায় অসভ্য ভীল, কোথায় সুন্দরী মোহিনী যুবতী, তাহার এরূপ আকাঙ্ক্ষায় অন্য লোকের হাসি আসিত। কিন্তু পুরোহিত তাহার এই দুর্লভ বাসনায় দুঃখিত হইলেন বলিলেন—"বৎস; কন্যা তোমাকে বিবাহ করিতে চাহে না বুঝি ?

ভীল বলিল—'না'

তিনি বলিলেন "দেখ বৎস যদি চাঁদকে চাহিয়া নাপাও ত তোমার দুঃখ হইবে ? এ বৃথা দুঃখ, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই অন্যায়" ।

ভীল বলিল, "মোরে কি বিয়ে করিতে চাহিত না ! রাজাডাই মোর সর্ব্বনাশ করিল ! রাজাডা ওরে গুণ করিছে।" ভীলের মুখ রক্তবর্ণ হইল—পুরোহিত বলিলেন—"কি ?"

সে বলিল "রাজাডা তুমি ! তুমি ভীলের মেয়েরে কেন চাও ? মন্ত্র-ফুল দেও—বনের মধ্যে খুঁজিতে যাও !"

পুরোহিত বলিলেন—"বনের মধ্যে !"

ক্ষেতিয়া বলিল "হ্যাঁ বনের মধ্যে ! কাল দেখি দুজনে বনের মধ্যে ?"

"দুজনে বনের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ দুজনে। রাজা আর পুরাণ পুরুত ঠাকুর ?"

"পুরাণ পুরুত ঠাকুর।"

"ঠাকুর, রাজারে বলিস্ তুইডা, মেয়েরে যদি না ছাড়িয়া দেবে ত ভাল হইবে না, মোদের ধনে রাজার দৃষ্টি—মোরা কুথায় দাঁড়াই গিয়ে।"

পুরুত ঠাকুর তাহার শাসনের কথা কানে শুনিলেন না—যাহা শুনিলেন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া আসিল। ক্ষেতিয়া চলিয়া গেল, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিলেন রাজাকে সেই দিন যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আর কিছু বলিলেও যে ফল হইবে এমনো মনে হইল না। তবে ইহার প্রতিকার কোথা ? তিনি ব্যথিত হইলেন,উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল রাণী যদি রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন ত তাহাই একমাত্র উপায়। তিনি তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিছু পরে গণপতি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, গণপতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া না দাঁড়াইতেই তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"গণপতি !" গণপতি চমকিয়া উঠিলেন, হরিতাচার্য্য বলিলেন "ইতি মধ্যে রাজাকে

হরিতাচার্য্যের সেই ক্রুদ্ধ স্বরে গণপতি এতদূর ভীত হইলেন যে তাঁহার মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইল না, হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আর তুমি তাঁহার সহিত ছিলে, অথচ তাঁহাকে একটি কথা কহ নাই! এই তোমার পৌরহিত্য"?

গণপতি অর্দ্ধোচ্চারিত ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন—"দেব, কিন্তু—আমি—কিন্তু—রাজা—"

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আর কিন্তু না, তুমি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহ—আজ হইতে তোমাকে আমি বিদায় দিলাম"।

বলিয়া পুরোহিত মন্দিরের বাহির হইয়া গেলেন। নিরপরাধ গণপতি স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারকা-বর্ণ ও তারকার নির্ম্মাণ উপাদান।

সকল তারকার যেমন সমান জ্যোতি নহে, তেমনি সমান বর্ণও নহে। নীল, লাল, হরিৎ পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে আকাশে এত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের তারকা আছে আর একের বর্ণ এত মৃদু ভাবে অন্যের বর্ণের সহিত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, যে দর্শকেরা সহজে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারেন না।

যমক ও বহুসঙ্গিক * তারকাদিগের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ বর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। সাদার্ণ ক্রস-রাশির তারকা গুচ্ছের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়া স্যর জন হারসেল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই তারকাগুচ্ছে এক শত তারারও অধিক তারা আছে। ইহার মধ্যে সাতটি মাত্র দশম শ্রেণীরও কিছু অধিক উজ্জ্বল। ইহার দুইটি লাল, দুইটি সবুজ, তিনটি ধানি, এবং একটি সবুজাভ নীল। এই ভিন্ন-বর্ণধারী তারাগুলি একখানি কারু কার্য্য খচিত অলঙ্কারের ন্যায় তাঁহার নয়নে প্রকাশ পাইয়াছিল। তারাদিগের জ্যোতির ন্যায় বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পুরাতন কালের জ্যোতিষীগণ সিরিয়াসকে লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তাহা সবুজাভ, এবং ক্যাপেলা যাহা এখন ফিকেনীল তাহা তখন লাল ছিল।

কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল † তারকার বর্ণের আশ্চর্য্য রূপ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে।

---

* গত বৎসরের একাদশ সংখ্যক ভারতী দেখ।

† সময়ে সময়ে যে সকল তারকার ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন শীল তারকা কহে। গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যক ভারতী দেখ।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দের নূতন তারকা প্রথমে শ্বেত, পরে পীত অবশেষে লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে।

জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে,যখন তারাদিগের উজ্জ্বলতা হ্রাস হইতে থাকে তখনি সাধারণত তাহাদের বর্ণের লোহিতত্ব বাড়িয়া উঠে।

প্রধান কয়েকটি ভিন্ন বর্ণ তারকার বর্ণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সিরিয়াস বেগা আটেয়ার ডেনেব	হরিৎবর্ণ
অ্যালডিবেরণ অ্যানটেয়ার্স বেটেলগুস	লালবর্ণ
রেগুলাস ডেনেবোলা ফোমালহট ধ্রুব তারা	শ্বেতবর্ণ
আর্কটিরাস	পীতবর্ণ

তারকাদিগের আয়তন অথবা ব্যাস নিতান্ত ক্ষমতাশালী দূরবীন দিয়াও জ্যোতির্ব্বিদগণ ধরিতে পারেন না, পৃথিবী হইতে তাহারা এতই দূরে অবস্থিত যে তাহাদের মাপা অসম্ভব। তবে তারকাগণ যে কি উপাদানে নির্ম্মিত ইহা তাঁহারা অনেক পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন। তারকাদিগের অন্তরে যাহাই থাকুক প্রথমতঃ তাহাদের উপরিভাগে যে উজ্জ্বল আবরণ দেখা যায় ‡ তাহা তারাদিগের আলোকাবরণ নামে কথিত। পৃথিবীর উপরে যেমন বাষ্পাবরণ আছে, এই আলোকাবরণের উপরিভাগে আবার সেইরূপ বাষ্পাবরণ আছে।

আলোকাবরণের উপাদান পদার্থ এতই প্রচণ্ড-উত্তপ্ত অবস্থায় অবস্থিত যে যদিও আলোকাবরণে ধাতু প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান তথাপি তাহা তরল বা বাষ্পময়।

ধাতুদ্রব্য গলাইতে যে কিরূপ প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন তাহা মনে করিয়া দেখিলে আলোকাবরণের উত্তপ্ততা কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। নিরেট লৌহ ও নিরেট জল অর্থাৎ বরফ এ উভয়কেই উত্তাপ দ্বারা গলান যায়। সেনটিগ্রেড থারম-মিটরের শূন্য ডিগ্রি পরিমিত উষ্ণতায় বরফ জল হয় আর উক্ত থারম-মিটারের ১০০ ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতায় জল বাষ্প হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু লৌহকে

---

‡ সূর্য্যের যে উজ্জ্বল গোলাকার মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহা সূর্য্যের আলোকাবরণ।

তরলাবস্থায় আনিতে হইলে সেনটিগ্রেড থারমমিটরের প্রায় দেড় হাজার ডিগ্রি উষ্ণতার আবশ্যক। আর কত পরিমাণ উষ্ণতা দিতে পারিলে যে লৌহ বাষ্প হয় তাহা এখনো অজ্ঞাত। সুতরাং তারাদিগের আলোকাবরণে কত পরিমাণ উষ্ণতা আছে অর্থাৎ সেখানে উত্তাপের প্রখরতা কিরূপ মাত্রায় অবস্থিত তাহা এখনো জ্যোতির্ব্বিদগণ পরিমাণ করিতে পারেন নাই।

তবে তারাদিগের আলোক পরীক্ষা দ্বারা আলোকাবরণ কিরূপ উপাদান-পদার্থে গঠিত জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা কতকটা বলিতে পারেন।

যেমন, (হগিংসের কথানুসারে) সিরিয়াস হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়ম, এবং সম্ভবতঃ লৌহ বাষ্পময়, ক-লাইরা বা বেগা হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়ম, সোডিয়ম এবং লৌহ বাষ্পময়,—ইত্যাদি।

তারাদিগের বাষ্পাবরণের বাষ্প সকল যখন জমাট বাঁধে, তখন তাহা আলোকাবরণে পরিণত হয়, আবার আলোকাবরণ যে আলোক নিক্ষেপ করে তাহা বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক শোষিত হয়।

আলোক শোষন ক্রিয়া কিরূপ তাহা রঙ্গিণ্ কাচ দ্বারা সহজে বুঝান যায়। একটা সবুজ গ্লাস সবুজ, কেননা সবুজ বর্ণ ছাড়া অন্য সকল বর্ণের জ্যোতি ইহা নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া লয়। ইহা যেন এক রকম চালুনি, সেই চালুনির ভিতর দিয়া সবুজ রং মাত্র বাহিরে আসে আর সকল রং তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, কাজেই আমরা তাহাকে সবুজ দেখি। কেবল গ্লাস বলিয়া নহে, কঠিন, তরল, বাষ্প সকল রূপ পদার্থই আলোক শোষণ করে। তারকাদিগের আলোকাবরণের উত্তাপ-পরিমাণ ভেদেই যে একমাত্র তাহাদিগের বর্ণের তারতম্য ঘটে তাহা নহে, বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক কোন তারকার আলোক কি পরিমাণে শোষিত হয় তাহার উপরও তাহাদের বর্ণ বৈষম্য নির্ভর করে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় কখনো কখনো রক্ত-লোহিত বর্ণ ধারণ করে—ইহার কারণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক সূর্য্যের আলোক তখন অধিক পরিমাণে শোষিত হয়। বিকালের পরিবর্ত্তে যদি দ্বিপ্রহরে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইত তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইত—সূর্য্যের বাষ্পাবরণে তাহা শোষিত হইয়াছে। কেননা নিম্নদিকে পৃথিবীর বায়ু-স্তরের চাপ ক্রমশঃই অধিক এবং উপরের দিকে ক্রমশই কম, সুতরাং যখন সূর্য্য আমাদের মাথার উপর দিয়া কিরণ দেয় তখন সে কিরণ পৃথিবীর লঘু বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসে, সেই জন্যই আমরা এত উত্তাপ অনুভব করি আর সেই লঘু বাষ্পে অধিক কিরণ শোষিত হয় না। কিন্তু অস্তে যাইবার সময় সূর্য্য দিক্‌মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইলে তখন তাহার কিরণ রাশির পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তর

তবে তারকাদিগের বর্ণ ও জ্যোতির পরিবর্ত্তনের কারণ এখনো জ্যোতির্ব্বিদগণ সবিশেষ আর কিছুই জানেন না।

এইখানে একটি কথা, যে সকল পদার্থ তারকাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান—যেমন হাইড্রোজেন, সোডিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম লৌহ ইত্যাদি—এই সকল পদার্থের সহিত আমরা পৃথিবীর প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাই—সুতরাং কে বলিতে পারে তারকা জগতেও প্রাণী নাই? শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

দারজিলিং পত্র।

ভাই ———,

'সমুদ্রচর আমি মরুচর তৃষিত তোমাকে একবিন্দু জল দানে শীতল কর্‌তে কুণ্ঠিত,' এ কথাটা যদিও নিতান্ত বেঠিক, তবে অগাধ জলে ডুবেও যে একজন তৃষ্ণায় হাবুডুবু খেয়ে মরতে পারে—একথা যদি বল, তা আমি অস্বীকার করতে পারিনে, এ কথার সার্থকতা এবার আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি।

দারজিলিং এলেম—কোথায় এখানকার নির্ঝর ঝর ঝরে, তরুশাখার মর্ম্মরে, পাখীর কলতানে, মেঘমালার স্তরবিন্যস্ত বর্ণ-মিলনে প্রাণ ঢেলে মুক্ত পাখীর মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব—ওমা এসেই শয্যাগত।

এখন ত ভাই বুঝেছ, দৃশ্যের এই সমুদ্রে বিরাজ করে, আমি কেন তোমাকে চিঠিরূপ জল ফোঁটা দান করতে পারিনি? সমুদ্র চরের তৃষ্ণার জ্বালা যে মরুচরের চেয়ে বেশী বই কিছুমাত্র কম হয় নি ভরষা করি সেটাও এই সঙ্গে বুঝতে পারবে। আমরা যে খাঁচার পাখী, খাঁচায় মরতে আমাদের ত দুঃখ নেই, কিন্তু কণ্ঠে শ্রষ্ঠে শিকলি কেটে আকাশে উঠা যদি কেবল সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে ধুলায় লুটিয়ে পড়ার জন্যই হয় ত সে কি সামান্য কষ্ট?

তবে তুমি ভাই কবি মানুষ তোমার মতে সে কষ্ট কষ্টই নয়—যে কষ্টে উপভোগ্য কিছু নেই। তোমার ত এক বুলিই আছে—

"যাতনার এই দুঃখময় সুখ তুই কি বুঝিবি সজনি?
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ কাঁদিয়ে দিবস রজনী"

বুঝতে পারলে ভাল হোত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাগ্যবানের সোণা—এ হতভাগ্যের কাছে ছাই না হয়ে ত কখনো আসে না,—সুতরাং তোমার কবিতার মাহাত্ম্য আমি কখনোই বুঝতে পারিনি কখনো বুঝবার আশাও দেখিনে। আমি যখন এই মস্ত

খুং করতে করতে সময় কাটাতেম তখন হাজার চেষ্টা করেও ত সে কষ্টের মধ্যে সুখ কিছু অনুভব করতে পারতেম না।

আমার চোখের উপর বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে হেসে খেলে কত লোক যাওয়া আসা করত, আমার সঙ্গীরাও সামনে দিয়ে চাতক পাখীর মত মেঘ রাজ্যে বিচরণ করতে যেতেন, সমুখের পাহাড়ে কখনো মেঘের দৃশ্য কখনো রোদের দৃশ্য মানুষের অদৃষ্টের মত বদলাতে থাকত—তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মন কেবলি হুহু করত। এই সুদৃশ্য আনন্দ দৃশ্যের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য বিভীষিকা লুকান আছে—বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য মিলনের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের ভাব লুকান আছে আমি শুধু সেইটুকই উপলব্ধি করতেম, আর এই অসীমতার দিকে চেয়ে সসীমে আশ্রয় পাবার জন্য হৃদয় আকুল হয়ে উঠত, পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে আবদ্ধ হবার জন্য নিতান্তই ব্যগ্র হয়ে পড়তেম। সারাদিনই মনে হোত, কখন বাড়ী যাব, একটু বিরক্ত হলেই বলে বসতেম—কালই বাড়ী যাব, বলার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, অসুখকে শাসান, যেন সে শাসন বাক্যে অসুখটা আর পালাতে পথ পাবে না।

বলব কি ভাই, তখনকার দুঃখ মনে করে এখনো আমার চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যেতে পারে—তবে যে যায় না—সে কেবল আমার একটি ফিলজফার বন্ধুর উপদেশে হঠাৎ আমি ফিলজফার হয়ে উঠেছি বলে। তাঁর ফিলজফি হচ্ছে—"যে কোন কষ্টের ভাবনা হোক না কেন তার সঙ্গে একটা মস্ত 'যদি' কথা বসাতে পারলেই সে কষ্ট হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়"। মনেকর তোমার যদি কোন একটা জিনিষ খুব পসন্দসই হয় আর কিনতে ইচ্ছা করে তখনি তুমি ভাববে এ জিনিষটা যদি নাই দেখতে কিম্বা যদি না ভাল হোত তাহলে ত তোমার কিনতে ইচ্ছা হবার কোন কারণ থাকত না, তাহলে এখনই বা ইচ্ছা করবে কেন ?

এ ফিলজফির মর্ম্ম তুমি যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে আমার এমন মনে হচ্ছে না,—কিন্তু তা না পারলেই যে তুমি আমাকে বোকা ঠাওরে বসবে—দোহাই তোমার—সেটি করো না। এ ফিলজফি বুঝতে গেলে একটু বেশী রকম ফিলজফার হওয়া আবশ্যক এইটে মনে রেখো। তবে কি জান ভাই ঐ ফিলজফির মধ্যে যে কতখানি সান্ত্বনা তা আজ কাল হঠাৎ আমি উদ্ভাবন করে ফেলেছি তখন কিন্তু তা আদপেই মাথার মধ্যে আসেনি। সুতরাং তখন অসুখের সময় সবেধন নীলমণি একমাত্র আরাম আমার যা ছিল—সে ওরূপ সান্ত্বনা না। আমাদের এখানে প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা যে একটা পড়ার মজলিস হয়—সে সময় তার জন্য আমি বড়ই হা প্রত্যাশ করে থাকতেম। দিনের বেলা অন্যেরা মাঝে মাঝে আমাকে দেখতেন আবার যে যার কাজ কর্ম্ম করতেন, বেড়াতেন চেড়াতেন, সন্ধ্যা বেলাটা এলে আমরা যখন সকলে একত্র হতেম তখন যেন আর আমার কোন অসুখই থাকত না।

এ বাড়ীর একটা নাম আছে খুব মস্ত, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাড়ী ছাড়া দারজিলিংএ শুনতে পাই এত বড় বাড়ী আর নেই, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে কাসলটন হাউষ। যখন লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের দারজিলিংএ স্বতন্ত্র বাড়ী তৈয়ার হয়নি—তখন নাকি তিনি এই খানেই থাকতেন। কিন্তু আসল ধরতে গেলে এ বাড়ীটি তত বড় নয় বাড়ীর হলটা যত বড়। এই মস্ত হলে—জিনিষ পত্র নিতান্ত টিমটিমে গোছ, হলের এক টেরে একটা গোল টেবিল—আর অন্য টেরে দু দেয়ালে দুখানা কৌচ আর এদিক ওদিকে খানকতক চৌকি। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে খাবার আসা পর্য্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন, তোমাকে একবার শোনাতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি কি ব্রাউনিং পড়েছ ? আমি এর আগে আর পড়িনি। টেনিসন ও ব্রাউনিংএর লেখা কি তফাৎ ? টেনিসনের লেখা, কোমল মধুর, বসন্তের বাতাসের মত তাতে একটা মৃদু উলসিত ভাব। টেনিসন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যখন কান্না পায় তখন শিশিরের মত দু এক ফোটা জল ধীরে ধীরে চোখে দেখা দেয়। কিন্তু ব্রাউনিংএর লেখা কি জোরাল। শুনতে শুনতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কারখানা হতে থাকে। ব্রাউনিংএর লেখা অনেকটা জর্জ এলিয়টি ধরণের। এক একটা কার্য্যের অনিবার্য্য ফল, মনুষ্য হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের খেলা তিনি জলন্তরূপে চিত্রিত করেছেন। পাপের প্রতি তাঁর কি ঘৃণা! কোন কোন কবি অন্যায় কাজকেও এমন কোমল তুলি দিয়া আঁকেন যে সেই অন্যায়ের প্রতিও—তথনকার মত কেমন একটা মমতা জন্মে। কিন্তু পাপের অনিবার্য্য ভীষণ ফলের প্রতি ব্রাউনিংএর মর্ম্মগত বিশ্বাস দেখা যায়। ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যে কান্নাপায়—সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়, সে কান্না হঠাৎ থামান যায় না। তাঁর Blot on the Scutcheon একবার পড়ে দেখ। এমন সুন্দর কাব্য-নাট্য আর পড়েছি মনে হয় না।

যাহ'ক তখনকার দিন গুলাত এইরূপ সুখে দুঃখে এক রকম করে কেটে গেছে। এখন যে অন্য রকমে কাটছে তা যদিও নয়! সেই আগেকার মত করেই সূর্য্য উঠছে, নিভছে, পাহাড়ের দৃশ্যের অনবরত পরিবর্ত্তন চলেছে—রাস্তাদিয়ে হাসি কান্না নিয়ে লোক-জন যাচ্ছে, আর আমাদের বাড়ীতে দিনের বেলার নিয়মিত কাজ কর্ম্ম সন্ধ্যা বেলার মজ-লিষ সবই ঠিক আছে—তবুও সেই এক দিন আর এই এক দিন, তাতে আর এতে আমার কাছে আকাশ পাতাল তফাৎ। সেলির একটি কবিতা মনে পড়ে গেল—

That garden sweet, that lady fair
And all sweet shapes and odours there

In truth have never passed away
'Tis we 'tis ours have changed not they.

বাস্তবিক দেখতে গেলে বিশ্বের পরিবর্ত্তন নেই, বিশ্ব চিরদিন একই আছে, তার হাসি কান্না জন্ম মৃত্যু ভাঙ্গা গড়া যেখানকার যা ঠিকই আছে, এসব পূর্ণ বিশ্বের এক একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সুতরাং তার যে পরিবর্ত্তন সে সমস্তই অপরিবর্ত্তন। তবে নাকি বিশ্বের সমস্তটা একসঙ্গে আমাদের চোখে পড়ে না—তাই আমরা কেবল তার পরিবর্ত্তনই দেখি, আর এই অনিত্য মায়াময় পরিবর্ত্তনশীল জগতের জন্য সর্ব্বদাই আক্ষেপ করি। কিন্তু এইরূপে বিশ্বকে মমতা করতে গিয়ে আপনারাই তার মমতার পাত্র হয়ে পড়ি।

এ সম্বন্ধে আমাদের ফিলজফার কি বলেন শুনবে? তাঁর মতে আমাদের জীবনটা নদীর স্রোত, আর এই সংসার নদীর কিনারা। নদীর কিনারার কোনজায়গা সুদৃশ্য সুন্দর, কোন জায়গায় মরুময় চড়া, কোথায় বা পর্ব্বতের ছায়ায় ভয়ঙ্কর অন্ধকার; স্রোতটা এই নানারকম পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। তা যাক্ তাতেই বা ক্ষতি কি? শেষে ত সেই সমুদ্র। পৃথিবীতে যা ঘটছে ঘটুক, বদলাবার ইচ্ছা করবার দরকার নেই? এইটে কেবল মনে রাখলেই হোল সুখ দুঃখ আমাদের খুঁজতে হয় না আপনা হতেই আসে।

দুঃখের বিষয় এই, সমস্ত সময়টাই আমাদের এই কথা মনে থাকে, কেবল আসল সময় ছাড়া। যাঁহারা উপদেশক তাঁহারা যে এ সম্বন্ধে বাদ পড়েন তা নয়, নিদেন আমাদের ফিলজফারটিকে ত বেশী সময় তাঁহার নিজের কথাই মনে করিয়ে দিতে হয়, তখন তাঁর উত্তর কিন্তু সম্পূর্ণ আর একতর হয়ে পড়ে। প্রবোধ আর সান্ত্বনা এই দুট যে স্বতন্ত্র জিনিষ এইটে তখন তিনি বিশেষ করে প্রমাণ করতে বসেন, কিন্তু প্রমাণের আড়ম্বরে—তাঁর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও যখন দুই একই হয়ে দাঁড়ায়—তখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে--প্রকৃত বিজ্ঞতার অভাবে যে মানুষ উহাদের একত্ব অনুভব করতে অক্ষম—ইহা অনুভব করে মহা শোকান্বিত হয়ে পড়েন,—আর সে অভাব কখনো দূর হবে কি না—দুর হওয়া টাই বা কতদূর প্রার্থনীয়—ক্রমে—তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ জন্মে। ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত তাঁর মনে হয়,—জীবনে আমাদের ছেলে মানষি কখনোই যায় না—তবে সময়ের গুণে সেই ছেলে মানষির রূপের বদল হয় এই মাত্র। ছেলেবেলা আমরা একটা জিনিষ না পেলে কাঁদতেম—এখন আর একটা জিনিস না পেলে কাঁদি, লোকের সামনে কাঁদতে লজ্জা করে তাই মনে মনে কাঁদি। ছেলেরা কোন জিনিস না পেলে রাগ করে বলে—'বড় বয়েই গেল'। কিন্তু যখন মুখে ও কথা বলে তখনো তাদের চোখে জল। বড় বেলাতেও মুখে সেই "বয়ে গেল", কিন্তু চোখের বদলে এখন হৃদয়ে জল, আর মুখে একটু তীব্র হাসি। ক্রমশ যখন হৃদয়ের জল

টুকুও শুকিয়ে যাবে তখন ঠোঁটে কেবল ব্যঙ্গের হাসিটুক থাকবে। কিন্তু সে অবস্থাকে যদি বিজ্ঞতার অবস্থা বল—তবে এ বিজ্ঞতার চেয়ে ছেলেমানষি থাকাই ভাল।

যাক এখন ফিলজফি থাক, যা বলছিলেম তাই বলি—বলছিলেম সেই এক দিন আর এই এক দিন, তখন আমি সারাদিনই বিছানায় পড়ে থাকতেম এখনো যে থাকিনে তা নয়—তবে সে থাকা আর এ থাকার মধ্যে বিশেষ তফাৎ এই, এখন আমি ইচ্ছা করলেই উঠতে পারি—বেড়াতে যেতে পারি—তখন তা পারতেম না। কিন্তু পারি বলে—যে বেশী বেড়াতে গেছি তা যদি ও নয় তবে বেড়াবার সে হাঁস ফাঁসানিটা অনেকটা নিবৃত্তি হয়েছে বটে। সীমাতে পৌঁছিলে বিপরীত জিনিষের ধরণও প্রায় এক হয়ে দাঁড়ায়.আগুণেও হাত জ্বলে বরফেও জ্বলে। সুখেতেও কান্না পায় দুঃখেতেও কান্না পায়। তখন যেতে পারতেমনা বলে, বাধ্য হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতেম, এখন যেতে পারি জেনে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি। যাই হোক, বেশী বেড়াই না বেড়াই বেড়াবার ইচ্ছার অভাব নেই। বিছানায় বসে বসে কত জায়গায় যাবারি যে পরামর্শ হয় তার ঠিক নেই। কিন্তু হলে কি হয়—আমরা যে ডানাকাটা পাখী, যুক্তির দৌড় যতই হৌক—পায়ের দৌড় যে কিছুই নেই—দুই এক পা গেলেই বেশ অনুভব করা যায়। এতদিন এসেছি পার্ক আর মলরোডই আমাদের আস্তানা। এ দুটি জায়গাই আমাদের বাড়ীর এত কাছাকাছি যে এখানকার লোকের মতে আমাদের বাড়ী থেকে মল আর পার্কে গিয়ে শ্রান্ত হওয়া আর ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া সমান। কিন্তু তাদের ফুল আমাদের কাছে ইটের চেয়েও কঠিন। এ পর্য্যন্ত এমন কোন দিন যায় নি—যেদিন ঐটুক বেড়িয়ে আমরা না শ্রান্ত হয়েছি।

মলরোড আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে। অবজারভেটরি-হিল বলে (Observatory Hill) একটা ছোট ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড় বেড়ে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাড়ীর কমপাউণ্ডের পাশ দিয়ে এই রাস্তাটা চলে গেছে। রাস্তার উপরেই গভর্ণমেণ্ট হাউসের সিপাই শান্তিরির পাহারা। এ রাস্তাটার মত, মুক্ত, সমতল, সুখে বেড়াবার জায়গা সমস্ত দারজিলিংএ আর নেই। এখানে গাছ পালার জঙ্গল আদপে নেই, কলকাতার রাস্তার মত রাস্তার ধারে ধারে এক একটি গাছ, মন্দারের গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা, গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে একটি চাঁপার গাছে দুই একটি ফুল ধরে আছে, তাহার গন্ধেই তার আশ পাশ ভরপূর। এক একটি গাছে সুন্দর পরগাছার ফুল। রাস্তার পশ্চিম ধারে অল্প খাড়াই ঢালু তৃণময় স্থানে কত রকম সুদৃশ্য ঘাস, কত ফার্ণ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন গোলাপের গাছে ছোট ছোট গোলাপফুল। এই ঢালুস্থানের পরপারে পশ্চিমে, রাস্তার কিছু নীচে ইংরাজদের সুসজ্জিত দোকান আর এই মুখে দারজিলিং-সহরের ও জলা পাহাড়ের মুক্ত দৃশ্য। পাহাড়ের সবুজ গায়ের উপর দারজিলিংএর শাদা

মত এ বাড়ীগুলি ঝলমল করতে থাকে, আর রাত্রিকালে বাড়ীর আলো গুলি নক্ষত্রের মত পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকে।

মলরোডের উত্তরে গভর্ণমেণ্ট হাউস ও সুদূরে রজত মেঘ তরঙ্গের ন্যায় তুষারাচল শ্রেণীর অপূর্ব্ব উন্মুক্ত দৃশ্য। সুবিধা ও সৌন্দর্য্য এখানে একত্র বিরাজিত। না হবে কেন এটা ইংরাজ ইন্দ্রের প্রধান আখড়া-স্থান। এখানে তাঁরা মেয়ে পুরুষে, হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ান। রোজ বিকালে এখানে ব্যাণ্ড বাজে। ব্যাণ্ডের কাঠের ঘরটি অনেক সময় তাঁদের আরাম ঘরের কাজ করে। বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হলে এইখানে তাঁরা বিশ্রাম করেন। আজ কাল বাঙ্গালিরাও অনেকে এখানে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান, এমন কি বাঙ্গালী মেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়তে দেখা যায়। একদিন ৫।৬ জন বাঙ্গালী একদিক্‌কার রাস্তা জুড়ে স্ত্রী পুরুষে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, দুই জন ইংরাজের সেটা বড়ই অসহ্য বোধ হয়েছিল—তারা আস্তে আস্তে বলে গেল—Damnation take them; ওদের মত উঁচুতে মাথা রাখতে দেখলে ওদের ভাল না লাগবারি কথা। দু—বাবুর এক মেয়ে বেশ ভাল রকম ঘোড়ায় চড়তে পারেন। সাড়ী-পরা মেয়েদের ঘোড়ার পিঠে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে দেখতে বেশ মজার, কিন্তু কেমন ভয় ভয় করে, মনে হয় বুঝি পড়লো।

আমাদের মেয়েরা সাড়ী পরে যে ঘোড়ায় চড়েন দু—বাবু এতেও সন্তুষ্ট না, তিনি আরো চান, তিনি বলেন—ইংরাজি মেয়েদের অনুকরণে বাঁকা জিনে দুই পা একপাশে রেখে চড়া কেন? তাতে দেখায় এই, যেন আমরা ইংরাজদের মেয়েদের দেখেই ঘোড়ায় চড়তে শিখছি—কিন্তু আসলে মেয়েদের ঘোড়ায় চড়াত আর আমাদের দেশে নূতন নয়, আমাদের মেয়েরাত আগে ঘোড়ায় চড়তেন, সুতরাং ঘোড়ায় চড়তে হলে সর্ব্বতোভাবে দেশী রকমে চড়া উচিত। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহলে বাঙ্গালিনীদের হয় মারহাট্টি মেয়ের মত মালকোচা—কিম্বা পুরুষের মত কাপড় পরতে হয়। তখন কি না পশ্চিমী মেয়েরা পুরুষের বেশেই ঘোড়ায় চড়তেন। মেয়েরা এতে রাজি হবেন কি?

ইংলণ্ডে আজকাল মেয়েদের কাপড় পরা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, কেহ কেহ বলিতেছেন মেয়েরা পুরুষের মত কাপড় পরিবে না কেন, যখন তাহাতেই অধিক সুবিধা,—ইত্যাদি।

যদি সত্যই কোনদিন ইংরেজ মেয়েরা পুরুষের পোষাক ধরেন—তখন ক্রমে আমাদের মধ্যেও সে অনুকরণ চলিবে দু—বাবুর এই এক আশা দেখিতেছি।

পার্ক মল-রোডের ঠিক বিপরীত দিকে, আসলেও বিপরীত। মল যেমন লোকজন পূর্ণ, পার্ক তেমনি নির্জ্জন, মল যেমন মুক্ত স্থান পার্ক তেমনি গাছপালার ঢাকা। সহর হবার আগে দারজিলিং কিরূপ জঙ্গল ছিল, তার চিহ্ন গভর্ণমেণ্ট এইখানে রেখেছেন।

পার্কের যে রাস্তা, তার দুই ধারের পুরাতন অরণ্য বজায় আছে, তবে এই রাস্তা এত বড় বড়, এত যত্ন নির্ম্মিত—যে পাশের বন আর বন বলে মনে হয় না। ইংরাজের মেয়েরা অনেক সময় যত্ন করে এথোথেলো রকমে যে রকম সাজ সজ্জা করেন শুনতে পাওয়া যায়, এই অরণ্যের ভাবও আজকাল সেই রকম। রোদের সময় এই রাস্তায় বেড়াতে কি আরাম। রাস্তার একদিকে অরণ্যময় পাহাড়ের খদ, অন্য দিকে অরণ্যময় উঁচু পাহাড়, দুই দিকের এই বনানীতে পার্কের এক ক্রোশ রাস্তা ছায়াময়। এখানে যে কত রকমের গাছ আছে তার ঠিক নেই। মস্ত মস্ত বকুল গাছের মত এক রকম গাছ আছে তাতে জলপাইএর মত একরকম ফল হয়। ফলগুলা গাছতলায় অনেক পড়ে থাকে, আমরা কুড়িয়ে খেয়ে দেখেছি খেতেও অনেকটা জলপাইএর মত। চালতার মত বড় বড় পাতাওয়ালা, তেজপাতার মত পাতাওয়ালা, জামের গাছের মত এক রকম গাছ—কত রকমের ঝাউ গাছ, সেগুণ, শাল, এ ছাড়া কত রকম অচেনা পাতার গাছ তার ঠিক নেই। বড় বড় গাছ প্রায়ই শৈবালময়, কোনটা বা লতাফুলে ঢাকা, কোনটায় বা পর গাছা জড়ান। এক রকম মাঝারি ঝাঁকড়া গাছ আমের মুকুলের মত মুকুলে মুকুলময়, আমরা যতদিন এসেছি এইরূপ মুকুলিত দেখছি। এই বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে প্রশস্ত-স্থানে কত রকম লতাগুল্ম ঘাস ফার্ণ, কত রকম সুগন্ধ ছোট ছোট গাছড়া, দোনার গাছ ত অসংখ্য, মধ্যে মধ্যে বন ফুলের রাশ। এক রকম শাদা শাদা মখমলের মত বনফুল আছে তার নাম অমর (immortal) ফুল, দেখতে অনেকটা ছোট চন্দ্রমল্লিকার মত, শুকিয়ে গেলেও তার গন্ধ অনেক দিন থাকে—গন্ধ বড় সুন্দর। এক এক জায়গায় এই ফুলের জঙ্গল, এক এক জায়গায় ঝিঙ্গে ফুলের মত হলদে রঙ্গের এক রকম লতাফুল এক একটা ছোট গাছে তারাবাজির তারার মত ফুটে আছে। আরো নানা রকমের বন ফুল আছে—কিন্তু এই দুরকমের ফুলই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। লতা গুল্মগুলির পাতা এত নানা রকমের ও সুদৃশ্য যে যেটি দেখি মনে হয় কি সুন্দর পাতা। পার্কে ইংরাজদের বড় বেশী দেখা যায় না, তারা আমোদপ্রিয় জাত, স্বজনতাই তাহারা বেশী চায়। কখনো কখনো দুটি একটি ঘোড়ায় চ'ড়ে, কখনো কতক জন মিলে বন-ভোজনে এখানে আসে, কিন্তু একলা কাউকে কদাচ দেখা যায়।

একদিন পার্কে আসতে আসতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলেম। আমরা সকলে মিলে পার্কে যাচ্ছি, এখন আমি এত আস্তে চলি যে আমার সঙ্গে চলে ওঠা সকলের পুষিয়ে ওঠে না, তাতে অন্য সকলেরি অসুবিধা, সুতরাং আমি তাঁদের বিধিমত আশ্বাস দিয়ে—একটু আগিয়ে চলতে বল্লেম। পার্কের রাস্তা এত সোজা ও নির্জন, যে সে রাস্তা ধরে গম্য স্থানে পৌছবার আমার কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তাঁরা ইতস্ততঃ করে একটু একটু এগোতে এগোতে অবশেষে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন আমি কচ্ছপ গতিতে চলতে লাগলেম। একজায়গায় দুট রাস্তা, উপরেরটা পার্কের, কিন্তু আমি রাস্তার ধারের

হেলান পাহাড়-গায়ের হেলান উঁচু উঁচু গাছ গুলো দেখতে দেখতে এ মন ভাবতে ভাবতে চলেছি যে ও রাস্তাটা আমার নজরেই পড়েনি—আমি আনমনে সমান পথে নীচের রাস্তা ধরে অবিরত চলে যাচ্ছি, আর ভাবছি যে,—মানুষরা যারা এই-রূপ বেঁকে জন্মায় তাদের সোজা করার উপায় কি? তাদের মূল উৎপাটন কর তারা এই গাছ গুলার মত মরে যাবে, তবু সোজা হবে কি? কিন্তু তারা এই যে বাঁকা হয়ে জন্মেছে, এটা তাদের মন্দ ভাগ্য, তাদের ত দোষ নয়। তবে কেন তাদের মমতা না করে লোকে এই জন্য তাদের অপরাধী করে, সোজা লোকের মনেও এরূপ বাঁকা ভাব কেন? বাঁকা দৃশ্য দেখলে কি মনের ভাব গুলাও এরূপ বাঁকা হয়ে যায়—না পৃথিবীতে এমন সোজা হয়ে কেউ জন্মায় না যার মনের ভাবের আনতি একেবারেই নেই?

হঠাৎ আমার ভাবনাটা ভেঙ্গে গেল, একটা ভূটিয়া কোমরে একখানা কুক্‌ড়ি (একরূপ ছোরা) বাঁধা আমার দিকে দেখি চেয়ে যাচ্ছে। আমি একটু চমকে চারদিকে চেয়ে দেখি—এ ত পার্কের রাস্তা নয়—এ কোথায় এসে পড়েছি! আমি ফিরে দ্রুত-পদে চলতে লাগলেম। আশ পাশে মাঝে মাঝে দু একজন মোট পিঠে করে চেয়ে যাচ্ছে, দু একজন কুক্‌ড়ি পরা লোক চলে যাচ্ছে, স্থানে স্থানে এত নির্জন যে কেউ আমাকে পাশে বনের মধ্যে ঠেলে ফেল্লে চিরকাল কারো জানার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নেই! আমি হাতের গহনা জামার ভিতর দিকে গুঁজে ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে জড়সড় হয়ে চটপট চলতে লাগলেম, খানিক দূর এসে সাহস করে দু একজন ভূটিয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম পার্কের রাস্তা কোথা! তারা আমার কথা বুঝলে না—না কি—একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্লে 'জানিনে', বলে চলে গেল। আমি তখন নিজের উপরই একান্ত নির্ভর করে চলতে লাগলেম—অবশেষে ঘুরে ফিরে—শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পার্কের রাস্তাতেই এসে পড়লেম। যা হউক এখন অবশ্য আর রাস্তা ভুল হয় না।

পার্কের স্থানে স্থানে একটু ঘেরাঘোরা বাগানের মত আছে, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই নয়, পার্কের তরুময় ছায়াময় পথই পার্কের শোভা, পার্কের সর্ব্বস্ব। দুপুর বেলায়ও এখানে রোদের ঝাঁজ নেই, (পাহাড়ে যদিও এতশীত কিন্তু রোদ হলে রোদের খুব ঝাঁঝ) একটা গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে বড় বড় গাছের ছায়া দ্বিপ্রহরে তাদের প্রাণ বিছিয়ে দিয়েছে, অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক সেই স্তব্ধতাকে এক অপূর্ব্ব রহস্যে পরিণত করছে। গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ের কোলে ঘুমন্ত মেঘের দৃশ্য আর পাহাড়ের মাথার উপর নানা রঙ্গের মেঘের তরঙ্গ—চোখে এসে পড়ে! বাস্তবিক পাহাড়ে মেঘের যেমন শোভা, সূর্য্য কিরণের যেরূপ অপরূপ বর্ণ মিলন এমন সমতল ভূমিতে দেখা যায় না। পার্কের স্থানে স্থানে মস্ত স্থানও আছে, ছায়াময় রাস্তাপার হয়ে হঠাৎ সেই

মুক্ত স্থানে এসে পড়লে কাঞ্চন জঙ্ঘার রৌদ্রদীপ্ত জমাট জ্যোৎস্নাময় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হঠাৎ যখন চোখের সামনে এসে পড়ে তখন যেন চমকে উঠতে হয়। কিন্তু দারজিলিং আসার পথে যখন প্রথম এই তুষারাচল শ্রেণী দেখি—তখন আমার কি চমকই লেগেছিল। সকাল বেলা ট্রেন যখন জলপাই গুড়িতে লাগলো তখন আমাদের একজন সঙ্গী হঠাৎ বল্লেন 'দেখ দেখ'। আমরা সকলে জানালায় মুখ বাড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেম, এ কি কারখানা! দূরে আকাশের গায়ে ও কিরূপ মেঘের ঘটা! কে একজন বল্লেন 'মেঘ না—তুষার পর্ব্বত।'

ঐ জমাট জ্যোৎস্নার-তরঙ্গ তুষার-পর্ব্বত—কাঞ্চন জঙ্ঘা! আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলেম। চারিদিক সমতল ক্ষেত্র, নিকটে পাহাড় পর্ব্বতের কোন চিহ্ন নেই, অথচ দূরের এই অপরূপ পর্ব্বত দৃশ্য ঠিক যেন পাতাল গহ্বরে—স্বর্গের দৃশ্যের মত মনে হোতে লাগলো। এই সমতল ক্ষেত্র থেকে আমরা কি করে ঐ পর্ব্বত রাজ্যে উঠব তখন ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। কিন্তু এত শীঘ্র এ আশ্চর্য্যটা ভেঙ্গে যায় যে সেও কম আশ্চর্য্য লাগে না। জলপাই গুড়ির অল্প পরেই সিলিগুড়ি ষ্টেসন, সিলিগুড়ি দারজিলিংএর উপত্যকা। এখান থেকে পাহাড়ে ওঠার রেলগাড়ীতে চড়তে হয়, এ গাড়ীগুলি সাধারণ রেলগাড়ীর মত নয়। ঘোড়ার ট্র্যাম গাড়ী হতেও এগুলি ছোট। এই গাড়ীর বেঞ্চগুলি মাটী হতে আধ হাত উঁচু হবে কি না সন্দেহ। গাড়ী চড়ে রাস্তার ধারের দুই পাশের গাছ পালা অনায়াসে হাত দিয়ে ধরা যায়। সিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গাড়ী যতই উপরে উঠতে থাকে, ততই পাহাড়ের শোভা চোখের উপর ফুটে ওঠে। এক এক জায়গায় রেল এত পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে গেছে যে মনে হয় গাড়ীর শ্রেণী যেন ঠিক নীচের গভীর গহ্বরের চুল পরিমাণ তফাৎ দিয়ে চলে যাচ্চে, এই পড়ে পড়ে। কিন্তু তবু গাড়ী অগ্রসর হয়, দুপাশের বনের মধ্য দিয়ে, কখনো খদের ধার দিয়ে, ষ্টেসনের মধ্য দিয়ে, পাহাড়-দেয়ালের পাশ দিয়ে—পাহাড়ের স্তর, মেঘের স্তর, ঝরণার দৃশ্যের সমুখ দিয়ে, তরল মেঘের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, মনে হয় কোন মায়া রাজ্যে মেঘপুরে অগ্রসর হচ্ছি। বাস্তবিক ছেলেবেলাকার পরীরাজ্যের গল্প যদি সত্য বলে অনুভব করতে চাও ত দারজিলিং রেলে একবার চড়। দারজিলিংএর শোভা দারজিলিং পৌঁছবার অনেক আগে থেকে আরম্ভ।

এইখানে তোমাকে একটি উপদেশ দিই,দারজিলিং যদি আস ত জলপাই গুড়িতে শীত বস্ত্র পরে নেবে, কেননা যদিও সিলিগুড়ি ছাড়িয়ে শীতের হাওয়া আরম্ভ হয় কিন্তু তখন আর কাপড় পরার সুবিধা থাকে না। জলপাইগুড়িতে আমরাও শীতকাপড় পরার উপদেশ পেয়েছিলেম, শুনলেম সিলিগুড়ি ছাড়িয়ে বেশ শীত পাব। কিন্তু রৌদ্রের রাজ্যে থেকে শীতের প্রভাব কে বুঝে বল? বিশেষ আর কখনো দারজিলিং আসিনি—শীত না

বদলাবার সুতরাং কোনই আবশ্যক বোধ হোলনা। সিলিগুলি ছাড়িয়ে যখন প্রথম একটু ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়া গেল ভাবলেম এই বুঝি শীতের দৌড়, আগে কাপড় বদলাইনি বলে নিজের বুদ্ধির মনে মনে অনেকটা প্রশংসা করে নিলেম। জলপাইগুড়ির গরম ভোগের পর সেই ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস বসন্তের বাতাসের মত গায়ে লাগে, তার পর যে কি ভয়ানক শীত আছে তখন তা কিছুই অনুভব করা যায় না। কিন্তু বেলা দুপুরের সময় গয়া-বাড়ী ষ্টেসনে পোঁছে ক্রমে এতটা শীত বোধ হোল যে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, বুকের ভিতর গুড় গুড় করতে লাগলো, অথচ কাপড় সঙ্গে তেমন কিছুই রাখা হয়নি। এই শীতটা ভোগ করেই আর কি দারজিলিং এসেই শয্যাগত।

দেখ কার ধন কে খায়! আমি ঠেকে ভুগে যে অভিজ্ঞতা টুক লাভ করেছি তুমি অমনি তার ফলটুক ভোগ করলে। এই বিধির বিধান, সুতরাং সে জন্য আমার দুঃখ নেই, আমার দুঃখ এই, আপাততঃ আমাকে এইখানেই থামতে হচ্ছে।

পদ্মসুন্দরীর কথা।

একটি পদ্মফুল দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর পদ্মফুল আর কখনও দেখি নাই। ফুলটি হাতে লইয়া যতই তাহার আঘ্রাণ লইতে লাগিলাম ততই আমার বোধ হইতে লাগিল যেন কিসের একটা স্রোত আমার শরীরের মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। লোকের মনে একটা আনন্দ হইলে পর বলিয়া থাকে যে তাহার ভিতরে আনন্দ-স্রোত বহি-তেছে আমি কিন্তু সেই দিন ঠিক বুঝিয়াছিলাম যে অন্তরের বিমল তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিক একটা বৈদ্যুতিক স্রোত শরীরের মধ্যে বহিয়া যায়। পদ্মের আঘ্রাণে আমি যখন বিভোর হইয়া উঠিলাম তখন একটা স্থির ভাব আমার মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, স্থির হইয়া স্থির নেত্রে পদ্মের সেই স্থির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম এইরূপ স্থির ভাবে পদ্মটির প্রতি যে কতক্ষণ চাহিয়াছিলাম তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই; কিন্তু সেই সময়ে আমার নিজের অবস্থা কেমন এক রকম নূতন রকমের হই-য়াছিল; আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমার ইন্দ্রিয় সকল আমার নহে; পদ্মটিকে দেখিতেছি বটে কিন্তু উহার চারিদিকে যেন একটা আলোক দেখিতেছি, ক্রমে চক্ষু চাহিয়া থাকিতে আর পারিলাম না; চক্ষু বুজিয়া আসিল কিন্তু তখনও সেই পদ্ম-টিকে দেখিতে পাইতেছি। পরে কি হইল বলি শুন। ছায়াবাজী দেখাইতে যেমন একটার পর একটা ক্রমাগত কতকগুলা ছবি দেখান হয় সেই রকম ছায়াবাজীর খেলা আমার মনের মধ্যে আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই সব ছবি এত তাড়াতাড়ি

আমার মনের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল যে ঐ সকল ছবির একটাও আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; এইরূপে কিছুক্ষণ গেলে পর যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা এখনও মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, এমন সুন্দরী তোমরা কেহ কখনও দেখ নাই, এমন সরোবরের নির্ম্মল জলও তোমরা কখনও দেখ নাই, এমন আকাশের নীল রংএর মধ্যে এমন দীপ্ত সূর্য্যও বুঝি কখনও দেখ নাই, সুন্দরীর এমন মৃদু হাস্যও কেহ কখনও দেখ নাই। আমি যে পদ্মফুলটি দেখিতেছিলাম সেই পদ্মফুলটি হাতে লইয়া সুন্দরী আমার দিকে অগ্রসর হইলেন; আমার সঙ্গে যেন কথোপকথন আরম্ভ হইল। সেই কথোপকথনের মধ্যে এখন আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা তোমাদের বলি শুন।

পদ্মিনী সুন্দরী বলিলেন যে "দেখ তুমি আমাকে দেখিয়া যে এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ এইটিই আশ্চর্য্য; মনুষ্য মাত্রেই অন্ধ, তাহারা ঐ অন্ধ অবস্থাতেই থাকিতে ভালবাসে, তাহারা নিত্য প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আদর করিতে জানে না তাই নিত্য সৌন্দর্য্য তাহাদের সমক্ষে সতত বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাহা তাহারা দেখিতে পায় না; তুমি আজ আমার স্নিগ্ধ গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তোমার অন্তরের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়াছ তাই আজি আমি তোমার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছি। মানুষের বাহ্যেন্দ্রির সকল তাহাদের অন্তরেন্দ্রিয়ের উপরকার আবরণ, এই আবরণের ভিতর দিয়া দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে অহঙ্কারী মনুষ্যরা তাহাই সত্য বলিয়া স্থির করিয়া লয় আবার ঐ আবরণের ভিতর দিয়া না দেখিলে তাহারা আবার কিছুই দেখিতে পায় না। আমি এখন তোমার মনের কথা সকল বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার সৌন্দর্য্য-প্রীতি নিবন্ধন, (সেই প্রীতি যদিও ক্ষণস্থায়ী) তোমার মনের সহিত আমার মন এক হইয়া গিয়াছে; কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে না—তুমি আমায় যথার্থ ভাল বাসিয়াছ তাই তোমার মন আর আমার মনের মধ্যে যে আড়াল ছিল তাহা সরিয়া পড়িয়াছে, দুটি ঘরের মধ্যের দ্বার বন্ধ ছিল তাহা খুলিয়া গিয়াছে তাই তুমি আমার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইতেছ। আজকাল দেখিতে পাই যে নব্য যুবকেরা অনেকে সখ করিয়া চসমা পরে ক্রমে চসমা ব্যতীত আর দেখিতে পায় না আর প্রাচীন লোকেরা তাহাদের উপহাস করে, কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই দশা আর ঐ নব্য যুবকের দশা আমি একই রকম দেখি; মানুষে সখ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অভ্যাস দোষে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে জগতের কোন পদার্থ সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে ইহা তাহারা বিশ্বাসও করে না।

সুন্দরী এই কথাগুলি বলিয়া একটু থামিলেন সেই সময়ে আমি মনে মনে বলিলাম যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মনুষ্যেরা কেবল মনের সাহায্যে যে অপরের মনের

ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়, অপরের মনের মধ্যের চিত্রিত চিত্র যে তাহারা ঐরূপে দেখিতে সক্ষম হইতে পারে ইহা আজ কাল কোন কোন পণ্ডিতদের গবেষণায় এক রকম প্রমাণীকৃত হইতেছে। সুন্দরী আমার কথা বুঝিলেন একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু পদ্মফুলের সহিত মানুষের মনের ভাব মনে মনে বিনিময় হইতে পারে ইহা তাহারা কখনই স্বীকার করিবে না। অভিমানী পণ্ডিতরা যেটুকু মানিতে প্রস্তুত আছেন সেইটুকুই এখন যথেষ্ট, কেননা আজকালকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জগতের রহস্য অন্বেষণ করিতে গিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমার বোধ হয় যে তাঁহারা সমুদ্রতলে কি আছে তাহা জানিবার জন্য অনেক কষ্টে অনেক দূর হইতে সমুদ্রতীরে আসিয়া সমুদ্রের বীচি গণনা করিতেছেন আর বলিতেছেন যে সমুদ্র তলে কিছুই নাই কেবল ঢেউ মাত্র আছে। সে যাই হউক এখন সে সব কথায় আমাদের কাজ নাই, আমি আজি তোমাকে যাহা বলিব তাহা তুমি মন দিয়া শুন।

"মনোময় জগতে অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুই নাই সমস্তই বর্ত্তমান, এইটি আজি তুমি বুঝিয়া দেখ; তুমি এক্ষণে মনোময় জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়া আমার যে রমণীমূর্ত্তি দেখিতেছ মনোময় জগতে এই রূপেই আমি নিত্য বর্ত্তমান আছি; প্রকৃতি দেবী আমার এই রূপ অবলম্বনে স্থূল পদার্থে এইরূপ রূপ গঠনের চেষ্টা করিতেছেন; মনোময় জগতের আমার এই রমণী রূপ, বীজ স্বরূপ হইয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে নানা রূপে প্রকাশিত হইতেছে; একটী বীজ হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হইবার কালের মধ্যে যেমন অঙ্কুর বৃক্ষ শাখা পত্র ফুল ফল নানারূপ আকার প্রকাশ পায় সেই রকম আমার মনোময় জগতের প্রকৃত রূপ জড় জগতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জড় জগতে নানা রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে; আমার চিত্র অবলম্বনে জড় জগতে এক্ষণে পদ্মরূপ প্রকাশ পাইয়াছে; তোমার প্রকৃত চিত্র অবলম্বনে এক্ষণে জড় জগতে মনুষ্য মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। জড় জগৎ সম্বন্ধে তুমি এককালে আমার ন্যায় একটি ফুল ছিলে, আমিও তোমার ন্যায় একটি মনুষ্য হইব। দেখ জড় জগৎ সম্বন্ধে তুমি যখন একটি ফুল ছিলে সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত তোমার যে কত বার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এক একটি আকার হইতে অন্য আকার ধরিয়াছ, এইরূপ ক্রমাগত জন্মিয়াছ, আবার মরিয়াছ, এক্ষণে এই মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, এইরূপ ক্রমবিকাশ স্থূল জগতের নিয়ম। স্থূল জগতে আকৃতির অভিব্যক্তি এইরূপে ক্রমশঃ হয় বলিয়াই স্থূল দেহধারী সম্বন্ধে অতীত ও ভবিষ্যৎ কথা আছে, কিন্তু মনোময় জগতের যে আকৃতি অবলম্বনে ঐ সকল নানারূপ আকার প্রকাশ পাইতেছে তাহা সর্ব্বদাই সেই একই রূপ রহিয়াছে। জড় জগৎ সম্বন্ধে আমি কিছুক্ষণ মধ্যেই শুকাইয়া মরিয়া যাইব, কিন্তু মনোময় জগতের আমার এই আকার যেমন তেমনিই থাকিবে"।

পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়াই যেন একটু শিহরিয়া উঠিলাম, একবার যেন মুখ ফিরাইলাম, মুখ ফিরাইবা মাত্র দেখি সারি গাঁথা কত শত মৃত দেহ আমার সমক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। পদ্মিনী বলিলেন "তোমার অতীত কাল বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ দেখ"।

এই শ্মশানের মধ্যে, সারি সারি অবস্থিত নিজের শত শত মৃত দেহ সম্মুখে দেখিয়া কি একটা উদাস ভাব মনে আসিল। পদ্মিনী বলিলেন "উদাসীন, জ্ঞান লাভ কর, আমরা সকলে বিশ্বেশ্বরের চিত্র পটে আঁকা এক একটি চিত্র মাত্র, আমরা সকলেই অমর ; বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে নমস্কার কর"।

আমি বলিলাম "আমি অমর"। আমি প্রণত হইয়া নমস্কার করিলাম। আকাশে একটি ধ্বনি উঠিল ওঁ।

নমস্কার করিয়া উঠিয়া দেখি পদ্মফুলটি হাতে করিয়া বসিয়া আছি, ছোট ছেলেটি কাছে আসিয়া বলিতেছে 'বাবা ফু' বলিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফুলটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল আমিও কি ভাবিতেছিলাম তখন সব ভুলিয়া গেলাম। একবার কেবল মনে হইল কে যেন পিছন থেকে বলিতেছে 'উদাসীন।'

আমি যতদিন বাঁচিয়া ছিলাম তত দিন ঐ দিনের ঘটনা আর আমার মনে পড়ে নাই। তবে জগতে যাহা দেখিতাম তাহা যেন এক রকম নূতন ধরণ ধারণ করিয়াছিল। ঐ দিনের ঐ ঘটনার পর থেকে আমার মনটা ইন্দ্রিয়গুলা থেকে একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাই যাহা দেখিতাম তাহারই পিছনে আর একটা ছায়ার মত কি দেখিতাম।

শ্রীকৃ

মোগল দরবারে ইংরাজ দূত।

প্রথম প্রস্তাব।

বাণিজ্য-জীবি ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। এই বাণিজ্য লক্ষ্মীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য তাঁহারা এই বিপুল ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ ও শাসন কার্য্যে সক্ষম হইয়াছেন। মহাত্মা আক্‌বরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্ব্বেই ইংরাজেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ সার টমাস রো সর্ব্ব প্রথমে দূত রূপে নিযুক্ত হইয়া তৎকালীন মোগল বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরিত হন। রোর নিজ লিখিত কাহিনী হইতে আমরা তৎকালীন মোগল দরবারের কএকটি চিত্র পাঠক বর্গের সমক্ষে ধরিব।

সার টমাস রো সাহেব ১৫৫৮ খৃঃঅব্দে এসেক্সের অন্তঃপাতী লোলেটম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ম্যাগডেনেল কলেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। কলেজ হইতে উপাধি লইবার পূর্ব্বেই তিনি পারিসে গিয়া ফরাসী ভাষার আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। পারিস হইতে প্রত্যাগমনের পর ইন্‌সফোর্টে আইন শিক্ষা করিয়া বিশেষ রূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। ইহার পর রাজ্ঞী এলিজেবেথ, তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে রো সাহেবের কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় শরীর রক্ষক নিযুক্ত করেন। রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের প্রথম জেমসের নিকট হইতে রো সাহেব "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হন। রো'র ভ্রমণ লিপ্সা বড় প্রবল ছিল, সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরে নিজ ব্যয়ে কয়েক খানি অর্ণবপোত সুসজ্জিত করিয়া আমেরিকা ভ্রমণার্থে গমন করেন। এবং আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ভারতের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন।

টমাস রোর প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই তাঁহার চতুরতা, সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্বদেশহিতৈষীতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পরম্পরার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে থাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, যথেচ্ছাচারী বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া অশেষ বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া যে ব্যক্তি স্বদেশের কার্য্য-সাধন ও সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া গিয়াছেন, তিনি কখনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি যথার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে রো সাহেব ভারতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন ও তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ।

হকিন্স সাহেব যদিও জাহাঙ্গীরের সময়ে রো'র পূর্ব্বে আসিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিকট রাজা জেম্‌সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মূল কার্য্যের কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। রো সাহেবের ন্যায় তিনিও সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, ও যাহাতে ইংরাজ বাণিজ্য চিরস্থায়ী হয়, তাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টপ্রহর সম্রাট সদনে উপস্থিত থাকিতেন, তথাচ তদ্দ্বারা কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হকিন্সের সেই চির সঞ্চিত আশা বিফল হইয়া গেল, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের সহিত তাহাব বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়াই আমরা এই ঘটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম।

হকিন্স সাহেব যখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুজরাটের শাসন কর্ত্তা মীর মোকারাব খাঁ বাহাদুর তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেই

বাণিজ্যপোত হইতে কতকগুলি দ্রব্যজাত লইয়া আদৌ তাহার মূল্য দেন নাই। ইহা ভিন্ন হকিন্সের প্রতি অন্যান্য কুব্যবহার করাতে ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে দুরপনেয় মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। সময়ক্রমে হকিন্স আগরায় গিয়া সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনি মোকারাব খাঁ বাহাদুরের অত্যাচারগুলি সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। সম্রাট বিদেশীয়দিগের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া মীর মোকারাব্‌কে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। কার সাধ্য মোগল সম্রাটের অনুজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে? সম্রাট যাহা বলিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাই সম্পাদিত হইল। মীর সাহেব পদচ্যুত, অবমানিত ও যথাসর্ব্বস্বহীন, হইয়া মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার উপায় কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল, মীর মোকারাবের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি পুনরায় প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদানেই হৌক বা সম্রাটের দয়া বশেই হৌক, পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হৃত মান ও ধন রাশির উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইলেন। অনেকগুলি প্রধান প্রধান আমীর ও ওমরাও তাঁহার সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইংরাজের প্রতি সমান অনাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেবল হকিন্স যে তাঁহাদের বিষ নয়নে পতিত হইলেন, এমন নহে—সমস্ত ইংরাজ জাতির প্রতিই তাঁহাদের বিদ্বেষ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই ইংরাজ বাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সকলেই জানেন, যে জাহাঙ্গীর অতিশয় অলস ছিলেন। তিনি বড় লোকের মুখে যখন যাহা শুনিতেন, তখনই তাহাতে ধ্রুব বিশ্বাস করিতেন। সত্যাসত্য পর্য্যবেক্ষণের নিজে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না। জাহাঙ্গীরের এই প্রকার অলস প্রকৃতি উপরোক্ত ইংরাজদ্বেষীদিগের বাসনা সিদ্ধির পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন, যে ইংরাজদিগের প্রশ্রয়ে সম্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে—তাঁহারা একটী আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও তজ্জন্য অনেক গোলাগুলি অস্ত্র শস্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ইহাঁরা হয়ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয়-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবেন। অতএব যত শীঘ্র মোগলরাজত্বে ইংরাজ বাণিজ্যের লোপ হয় সম্রাটের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই প্রকার অনুযোগ বস্তুত বিশেষ ফলোপদায়ক হইল। সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না, যখন তাঁহার মঙ্গলকারীগণের মুখ হইতে এই বাক্য উদ্গারিত হইয়াছে তখন যে ইহা

এবং তৎক্ষণাৎ জলদগম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হইল—"ইংরাজ আর মোগল রাজত্বের কোন স্থলে স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।" ইহাতে মোকারবের অভীষ্টও চরিতার্থ হইল, এবং ইংরাজ বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাতও পড়িল, হকিন্সের স্বদেশে মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশা লোপ পাইল—এবং তিনি বিফল মনোরথ হইয়া আগরা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে আবার এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্যে বাদসাহের ফারমান অনুযায়ী সুরাটে ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য কুঠী ও আহম্মদাবাদ, কাম্বে, গোজা, আজমীরে শাখা বাণিজ্যাগার ছিল। পর্টুগিজদের ক্ষমতা সেই সময়ে বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহারা ইংরাজদের এই ক্রমিক উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া সুরাট বন্দরের সোয়াল নামক স্থানের কতকগুলি ইংরাজ বাণিজ্যপোত সহসা আক্রমণ করিল। জয়লক্ষ্মী ইংরাজের উপর প্রসন্না হইলেন। পর্টুগীজেরা বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের এই পরাভব বার্ত্তায় স্থানীয় মোগল কর্ম্মচারীরা বড় সুখী হইলেন। সুরাটের কুঠীর তত্ত্বাবধারকেরা এই সুযোগে এডওয়ার্ড নামক একজন সাহেবকে বহুমূল্য উপঢৌকন সহিত আগরার বাদসাহ দরবারে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সমস্ত ঘটনা যখন বিলাতে ডাইরেক্টর্‌দের কাণে উঠিল তখন তাঁহারা সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অবধি তাঁহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল—এবং এই বাণিজ্য ক্রমে আরও বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইলে—তাঁহাদের অর্থাগম যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এই আশায় তাঁহারা প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহাদের সে মোহ অপনীত হইল—ও কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে আরও নানাধরণের অত্যাচার উপদ্রবের কথা তাঁহাদের কাণে উঠিতে লাগিল—সুতরাং তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আশু প্রতিকারের উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৫৯৯ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম স্থাপিত হয়। ও তাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হন। বাণিজ্যে তাঁহাদের বিশেষ ধনাগম হইতে লাগিল, তাঁহারা ভাবিলেন—যদি স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সহিত অব্যাহত বাণিজ্য চালাইতে পারা যায়—তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য না করিলেও চলে। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা হইতে ভারতের বাণিজ্যাকাশ নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি হইল। কালে এই মেঘ রাশি একত্রিত হইয়া ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত করিবে, ইহাও তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। যাহা হউক এই সমস্ত দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থে তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বর জেমসের বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন দেখিলেন, রাজা রাজড়ার সহিত

বন্দোবস্ত রাজারাজড়ার দ্বারাই হইতে পারে; তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"এখানকার রাজসভা হইতে ইংলণ্ডেশ্বরের নামসম্বলিত পত্র ও নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া একজন রাজদূত মোগল রাজসভায় গমন করিবে এবং কোম্পানী তাহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।" ইংলণ্ডাধীপ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহারা এই কার্য্যের উপযুক্ত লোক খুঁজিতে লাগিলেন। সর টমাস রো ঠিক এই সময়ে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন; রোর স্বাভাবিক ভ্রমণ প্রবৃত্তিটা বড়ই প্রবল ছিল, আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তাহা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এমন কি স্বয়ং ইংলণ্ডাধীপ যখন তাঁহাকে এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন তখন তিনি সানন্দে সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। ভারতীয় মোগল সম্রাটের স্বর্ণময় স্তম্ভ, মণিখচিত ছাদ, বহুমূল্য বস্ত্র মণ্ডিত সভাতল, দুষ্প্রাপ্য মাণিক্য খচিত স্বর্ণমণ্ডিত দ্যুতিময় সিংহাসন, ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভারতীয় ঐশ্বর্য্যাদি তখন আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের মনোরঞ্জক ছিল। রো সাহেব হকিন্স-প্রচারিত লিপিগুলি ও পুস্তকাবলী পাঠে, সাতিশয় কৌতুহল পরবশ হইয়া প্রকৃত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এক্ষণে এই অসম্ভাবিত সুযোগ পাইয়া তিনি যাত্রার নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বর্ণনীয় বিষয় ছাড়িয়া তৎকালে ভারতে ইংরাজদের প্রকৃত অবস্থা কি প্রকার ছিল—তাহা বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব। তখন ভারতে ইংরাজ বণিকেরা কি প্রকার অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিতেন তাহাতে তাহাদের বাণিজ্য কার্য্যের কতদূর ব্যাঘাত হইত নিম্নলিখিত ইতিবৃত্ত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ভারতের সহিত যথেচ্ছা বাণিজ্য পরিচালন, এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় শাসন কর্ত্তা ও মোগল সম্রাটের অনুমতি লইয়া কোম্পানী সমুদ্রের উপকূলে দুই একটী বাণিজ্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সুরাটনগর এই সময়ে ভারতের প্রধান বন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—ইহার সমৃদ্ধি তৎকালীন সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য বন্দর অপেক্ষা যে শতগুণে অধিক ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুরাট সম্রাটের অধিকৃত ও সমুদ্রোপকূলে বলিয়া সকলজাতীয় বণিকেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অবতরণ করাইয়া বিক্রয় করিতেন। এই সুরাট বন্দর হইতে বাদসাহের এতদূর অর্থ লাভ হইত যে প্রতিবৎসর নবাব সাহেব ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের যথেষ্ট উদরপূর্ত্তি হইয়াও লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারে প্রেরিত হইত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের বাণিজ্য দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। আজও যেমন ইংরাজ ছুরী কাঁচি ইত্যাদি চাকচিক্যময় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতের বক্ষঃশোষণ করতঃ ধনরত্নাদি লইয়া যাইতেছেন—প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা ঠিক্ সেইরূপ করিতেন। জাহাজ ভরিয়া বন্দুক, তরবারি, ছুরী কাঁচি ও

অন্যায় চাকচিক্যময় অস্ত্র শস্ত্রাদি দেশীয় মহাজনদিগকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে, ভাল ভাল অপরিষ্কৃত স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, রেশমীবস্ত্র, রেশম ও নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া যাইতেন। ইংলণ্ডে গিয়া, এই সকল দ্রব্য দ্বিগুণ মূল্যে লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ও রাজার নিকট অথবা ইউরোপের অন্যান্য প্রাদেশিক ভূপালগণের নিকট বিক্রয় করিতেন। তৎকালে ইংরাজের তৈয়ারি দ্রব্যাদিরও ভারতে বিশেষ আদর ছিল—আত্মরক্ষার্থে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার তখন সাধারণের মধ্যে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল—সুতরাং দেশীয় মহাজনেরা এই সকল বিলাতি হাতিয়ার কিনিয়া লইয়া সাধারণকে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত, ও বাছা বাছা গুলি স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীরা সম্রাটের ব্যবহারার্থে কিনিয়া লইতেন। যদিও মোগল সম্রাটের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত কারখানা ছিল, তথাপি তাহাতে কেবল সরকারের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিই উৎপন্ন হইত যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া বাহিরে যাইত তাহার মূল্যও অধিক ছিল। কাজেই ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রথমতঃ চাকচিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়তঃ মূল্যের স্বল্পতায় অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত। মীর মোবারকের সহিত হকিন্সের বিবাদের পর আর ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের মঙ্গল রহিল না। যথোপযুক্ত শুল্ক প্রদান করিয়াই যে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন এমত নহে, কখনও কখনও বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অযথা শুল্ক দাবি-করা হইত, এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে নবাবের কর্ম্মচারীরা দ্রব্যাদি নামাইতে দিতেন না। আবার কখনও কখনও কোন নূতন জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নবাব সাহেব দলবল লইয়া জাহাজস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইতেন ও নানা প্রকারে অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। কোন দ্রব্য তাঁহার চক্ষে সুন্দর বলিয়া বোধ হইলে তিনি হয়ত বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতেন—না হয় মূল্য দিব এই কথা বলিয়া লইয়া যাইতেন পরে হয়ত মূল্যদিবার নামও মুখাগ্রে আনিতেন না। যদিই বা নিতান্ত ভদ্রতা ও সদাশয়তা দেখাইয়া মূল্য দিতেন তাহাতে বণিকদিগের লাভ না হইয়া অন্য রূপে লোকসান হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা অনুনয় বিনয় করিলে তিনি তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন। অত্যাচার প্রপীড়িতদিগেরও অভিযোগ করিবার কোন উপায় ছিল না, কাহার কাছে অভিযোগ করিবে ? যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। আবার রাজধানীতে গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করাও বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল—যদিও বা ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইত—তাহা হইলে অভিযোগটা তাঁহার কাণে গিয়া উঠিত বটে কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য শেষ হইত। আবার কখনও বা দ্রব্যাদি নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া যাইবার জন্য শুল্ক (Transit Duty) ধরিয়া লওয়া হইত। তখনকার এই নিয়ম ছিল—বন্দরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যদি কোন বাণিজ্য পোত মগ্ন হয় তাহা হইলে—তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। বাজেয়াপ্ত করার কাজ স্থানীয় শাসন কর্ত্তাদের উপর

নির্ভর করিত। কয়েকখানি বিলাতি জাহাজ ঘটনাক্রমে এই সময় মগ্ন হওয়াতে সমস্ত দ্রব্যজাত স্থানীয় মোগল কর্ম্মচারীরা সরকারের নামে অধিকার করিয়া লইলেন—এই প্রকার নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচারে প্রপীড়িত ও উত্তেজিত হইয়া—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী টমাস্ রোকে ভারতীয় মোগল বাদসাহের নিকট প্রথম জেম্‌সের দূতরূপে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

১৬১৫ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে—"লায়ন" নামক সুবৃহৎ অর্ণব-পোতে স্বদলে আরোহণ করিয়া রো সাহেব ইংলণ্ডের তটভূমি পরিত্যাগ করিলেন। অনন্ত তরঙ্গময়ী সমুদ্র বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে, ২৪ আগষ্ট তারিখে "লায়ন" সক্রোটা দ্বীপে উপনীত হইল। সক্রোটায় নামিয়া ইংলণ্ডীয় দূত সপ্তাহকাল বিশ্রাম করিলেন। সক্রোটা হইতে জাহাজ সুরাট অভিমুখে চলিল। স্যর টমাস রো নিরাপদে, বিপদ সঙ্কুল-সমুদ্র পথ, অতিবাহিত করিয়া যখন বন্দরে উপস্থিত হইলেন—তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য সুরাট উৎসবময়ী ভাব ধারণ করিল।

ক্রমশঃ।

ইয়োরোপের মধ্যযুগ ও জোর্ডানি ব্রুণো।

আমাদিগের দেশে দেখা যায় যে জনসমাজে কি একটী নিরাশার ভাব উপস্থিত হইয়াছে; চারিদিকের দরিদ্রতা, শারীরিক ক্ষীণতা ও অজ্ঞানতার দিকে চাহিলে হৃদয় নিতান্তই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তবে এই নিরাশার মধ্যে একমাত্র ভরসা এই, কোন সমাজই চির কাল একরূপ থাকে না। এই সংসার-রূপ নাগর-দোলায় ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় কত সমাজ উপরে উঠিয়া আবার নিম্নে পড়িয়াছে কত সমাজ তাহার বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি অন্য কোন সমাজের দুর্গতি দূর হইয়া কালক্রমে তাহার উন্নতি হইতে পারে তবে আমাদের মনেই বা আশার সঞ্চার হইবে না কেন? খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অসভ্য গথ জাতি দ্বারা রোমীয় সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে পর ইয়োরোপের সমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহা আমাদিগের বিদ্যমান অবস্থা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে; আমাদিগের সমাজেও যেরূপ অজ্ঞানতা, দরিদ্রতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, অন্ধবিশ্বাস অথবা তাহা হইতে শোচনীয়তর অ-বিশ্বাস ইত্যাদি সামাজিক উন্নতির শত্রু বিরাজমান রহিয়াছে ইয়োরোপেও পঞ্চম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেইরূপ ছিল। অথচ দেখ ইয়োরোপীয় সমাজ অল্পে অল্পে ঐ সকল শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে; ইহার কারণ কি? এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে

চিন্তার স্বাধীনতা। যখন দেখিবে কোন সমাজে সকল ব্যক্তিই নির্জীব ভাবে অন্যে যাহা করিতেছে তাহাই করিয়া সন্তুষ্ট রহিতেছে, নিজে উদ্‌যোগ করিয়া একটা কিছু নূতন সামাজিক উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেছে না তখন সে সমাজে অধোগতির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে বুঝিতে হইবে। যত প্রকার দাসত্ব আছে তাহাদিগের মধ্যে চিন্তা-শক্তির দাসত্ব সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক; চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা না থাকিলে জনগণের উন্নতি হইতে পারে না। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে কোন সমাজে নূতন করিয়া উন্নতি হইবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে দুই চারি জন মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখা দেয়। এই সকল লোক অন্যের কার্য্য অনুকরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না, ইহারা নিজের বহুশ্রম বহুক্ষতি সত্ত্বেও স্বকীয় প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিতে বিরত হয় না। শর্করা-মিশ্রিত জলে বায়ু হইতে একপ্রকার কীটাণু পতিত হইলে যেরূপ উহাতে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উহা সুরাসারে পরিণত হয়, ঐ সকল মহৎ ব্যক্তিদিগের সদ্‌বাক্যে ও সৎকার্য্যেও সেইরূপ সমাজে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা যাহা বলেন যাহা করেন লোকে প্রথমতঃ তাহা অনুসরণ না করিলেও সময়ে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। ইয়োরোপে যখন অন্ধকার-যুগ শেষ হইয়া বর্ত্তমান যুগ উপস্থিত হয়, তখন সেখানে কয়েকজন প্রকৃত উচ্চদরের লোক আবির্ভূত হয়েন—জোর্ডানি ব্রুণো তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। যে ব্যক্তি সম্পত্তির জন্য নহে, মান সম্ভ্রমের জন্য নহে, আত্মীয় স্বজনের জন্য নহে—কেবলমাত্র চিন্তার স্বাধীনতা প্রচারের জন্য অগ্নিদাহনে প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন তাঁহাকে মানব-সমাজ কি বলিয়া মহৎ ব্যক্তি বলিয়া অস্বীকার করিবে। ব্রুণোর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এস্থলে ইয়োরোপীয় সমাজের অন্ধকার যুগ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করিব। ইয়োরোপের ইতিহাসে ষষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়কে মধ্যকাল কহে; এই মধ্যকালের প্রথম ছয় শতাব্দী অন্ধকার যুগ নামে খ্যাত, কারণ এই যুগে জনগণ অজ্ঞানতা অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। কিরূপে ইয়োরোপে বিজ্ঞান সাহিত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, কিরূপে নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুবিশ্বাস সমাজে দেখা দিল, কিরূপে তাহাতে সমাজে দুর্গতির পরিসীমা রহিল না হালাম এই সকল বিষয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন আমরা এখানে তাহার সারভাগ প্রকাশ করিতেছি।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমীয় সাম্রাজ্যে একজনও উচ্চ লেখক ছিল না—এমনকি সাধারণ লেখকের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এই সময় আইন, দর্শন, ইতিহাস, পদ্য ইহাদিগের সকলেরই অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে, এমন কি লাটিন ভাষা পর্য্যন্তও বর্ব্বর ভাষার সংশ্রবে আসিয়া বিশুদ্ধতা হারাইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যার এইরূপ অগৌরব ঘটিবার কতকগুলি কারণ ছিল; লাটিন ভাষার আদিম স্থান নিজ রোম এক্ষণে শ্রীহীন, অসভ্য জাতীয় লোকে এক্ষণে রোম সাম্রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে আসীন—তাহারা

দর্শন সাহিত্যাদির গৌরব জানিত না। ইহা ছাড়া নৃপতিগণও অনেকে নিরক্ষর ছিলেন, ইহার উপর আবার বারম্বার বর্ব্বরদিগের আক্রমণ। লোকের এক্ষণে আর বিদ্যানুশীলনে মতি রহিল না। এই কালের শিক্ষিতদিগের মধ্যে খৃষ্টীয়গণ পুরাতন কালীন সাহিত্যাদির প্রতি একেবারে বিমুখ ছিলেন; তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও বিশ্বাস পূর্ব্বতন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিরোধী সুতরাং তাঁহারা পুরাকালের সাহিত্য অবহেলা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যার যে অবনতি ঘটে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার আর কোন ব্যতিক্রম হইল না! যখন গল (বর্ত্তমান ফ্রান্সদেশ,) স্পেন ও ইটালী এই তিন দেশে অসভ্য গথ জাতি (ইহারা আদিতে জার্ম্মনি দেশে বাস করিত) আসিয়া সিংহাসন স্থাপন করিল, তখন আর ঐ দুরবস্থা দূর হইবার কোন আশা রহিল না। গথ জাতি যুদ্ধ ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, তাহারা কেবল যুদ্ধেরই মর্য্যাদা জানিত—তাহারা বিদ্যাভ্যাস করা সময়ের অপব্যয় মনে করিত। রাজা যাহা করেন প্রজাও অনেকটা তাহাই করে; অসভ্য রাজাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া রোমের অধিবাসীরাও অশিক্ষিত হইয়া পড়িল। আবার ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের কথিত ভাষা পূর্ব্বতন বিশুদ্ধতা হারাইয়া অবশেষে লাটিন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, এইরূপে মূল লাটিন হইতে ফ্রান্স, স্পেন, ও ইটালী এই তিনদেশে তিনটী ভাষা গঠিত হইল। যাহারা এই সকল ভাষা কহিত তাহারা আর এক্ষণে লাটিনে লিখিত গ্রন্থাদির অর্থ বুঝিতে সক্ষম রহিল না। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক কয়েকটী রচনা ফরাসি দেশে লাটিন হইতে কথিত ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়—ইহাতে বুঝা যায় যে লোকে তখন আর লাটিন বুঝিতে পারিত না। সেইরূপ আবার দশম শতাব্দীর শেষে ইটালীতে দেখা যায় যে পঞ্চম গ্রেগরি নামক পোপ তাঁহার লোকদিগকে শুদ্ধ কেবল লাটিন শিক্ষা দেন এরূপ নহে, ইটালীতে তখন যে সাধারণ্যে কথিত ভাষা চলিত ছিল তাহা ও জার্ম্মনভাষা এ দুইটীও শিক্ষা দেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সে সময় ইটালীর চলিত ভাষা লাটিন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। লাটিন ভাষা সাধারণে চলিত না থাকা মূর্খতার একটী প্রধান কারণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা ব্যতীত আবার পুস্তকও সহজে পাওয়া যাইত না। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশর দেশ মহম্মদীয়দিগের হস্তগত হইলে তথাকার প্যাপিরস নামক কাগজ নির্ম্মাণের বস্তু ইয়োরোপে রওয়াণা হওয়া বন্ধ হইল।

(প্যাপিরস একপ্রকার শরের ছাল; পুরাকালের লোকে উহার অংশ আঠা দিয়া যুড়িয়া কাগজ প্রস্তুত করিত।)

এই সময় হইতে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ছিন্নবস্ত্র হইতে কাগজ নির্ম্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত লিখিবার সামগ্রীর মধ্যে ইয়োরোপে এক কেবল পার্চমেণ্ট নামে চর্ম্মনির্ম্মিত বস্তু প্রচলিত ছিল। ইহার দাম অধিক থাকায় পুস্তকের দামও

অধিক ছিল। আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে বিদ্যার অবনতি বর্ণনা করিয়াছি—এই অবনতি কি প্রকার শোচনীয় হইয়াছিল তাহা হালামের একটী কথাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার মতে ষষ্ঠ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যাংশ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে কেবল মাত্র দুইজন প্রকৃত উচ্চ লেখক জন্মেন; এই দুয়ের মধ্যে আয়র্লণ্ডের দার্শনিক যন স্কোট্সের নাম অনেকেই জানেন অপরের নাম গের্ব্বার্ট, ইনি দ্বিতীয় সিল্‌বেষ্টর নামে পোপ হয়েন—১০০৩ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। গের্ব্বার্ট-অঙ্কশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই তমোময় কালে পুরাকালীন সাহিত্যাদি যে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই ইহার কারণ এই যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি লাটিনে লিখিত হইত এবং খৃষ্টান পাদরিরা ঐ ভাষার অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদিগের আশ্রমে পুরাতন গ্রন্থাদি রক্ষিত ও পঠিত হইত। যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি লাটিনে লিখিত না হইয়া প্রচলিত ভাষা সমূহে লিখিত হইত, তাহা হইলে পুরাকালের গ্রন্থ সমূহ লোকে একেবারে ভুলিয়া যাইত। যাহা হউক সাধারণ ব্যক্তিগণ লাটিন ভাষাও অনুশীলন করিত না, কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাসও করিত না; তাহারা অজ্ঞানতা তিমিরে আচ্ছন্ন রহিল। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে তাহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার অন্ধবিশ্বাস দেখা দিল। কাহারও প্রতি দোষারোপ হইলে সে বাস্তবিক অপরাধী কিনা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত নিয়মিত বিচার করা হইত না, দোষারোপ-কারীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কিম্বা গরম জলে হাত ডুবাইয়া কিম্বা তপ্ত লৌহ হাতে ধরিয়া স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিত। কখনও কখনও বা জনগণ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িত—এই উন্মত্ততা নানারূপ মূর্ত্তি ধারণ করিত। কখনও বা লোকে দল বাঁধিয়া ক্রুসেড যাত্রা করিত অর্থাৎ বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে যীশু খৃষ্টের কবর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জেরুজেলম্ অভিমুখে গমন করিত, আবার কখনও কখনও বা তাহারা রাস্তা বাটে বিকট রব করিয়া স্বস্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে চলিত। সাধারণের অজ্ঞানতার ফল স্বরূপ আর একটী বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে—পাদরিগণ দৈব সাহায্যে লোকের পাপ নাশ করিয়া দিবে ও বাঞ্ছিত বিষয়লাভে সাহয্যে করিবে এই ভাণ করিয়া তাহাদিগের নিকট নানাপ্রকার চাতুরী দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিত। লোকেও যখন দেখিল যে কিছু অর্থব্যয় করিতে পারিলে ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে তখন আর তাহারা অধর্ম্মকে তত শঙ্কা করিত না। খৃষ্টীয় পুরোহিত ও সন্ন্যাসীগণ শুদ্ধ চাতুরী দ্বারা অর্থ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না, তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার পাপ বিরাজ করিতে থাকিল।

সমাজে যখন এই প্রকারে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইল, ও জ্ঞানের আলোক অন্তর্হিত হইল তখন যে জনসমূহের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি। কি কৃষিকার্য্য কি অন্তর্বাণিজ্য কিছুরই আর শ্রী রহিল না। কৃষি কার্য্যে অর্থের প্রযো-

জন কিন্তু কৃষকদিগের তখন অর্থ ছিল না; তাহা ব্যতীত আবার উচ্চশ্রেণীর লোকগণ মৃগয়ায় অনুরত থাকায় তাঁহারা দেশের অনেক জমি জঙ্গল করিয়া রাখিতেন, ইহাতেও কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইত। অন্তর্বাণিজ্য করিতে হইলে দেশের মধ্যে বণিকগণকে স্বেচ্ছামত যাতায়াত করিতে দেওয়া আবশ্যক—কিন্তু সে সময়ে গমনাগমনের বিলক্ষণ অসুবিধা ছিল; জমিদারদিগের মধ্যে পথিকদিগের নিকট শুল্ক আদায় করার প্রথা ছিল। তাঁহা-দিগের ভূসম্পত্তির মধ্য দিয়া যাহারা যাইত তাহাদিগের তজ্জন্য শুল্ক দান করিতে হইত। আবার কোন কোন স্থলে ডাকাইতির ভয় ছিল—ডাকাইতরা পথিকদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত আর তাহা ভিন্ন সময় সময় তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিত। সমাজের এই দুরবস্থার কালে যে শিল্প ব্যবসায় নিতান্ত হীনশ্রী হইয়া পড়িবে ইহা ধরা বাঁধা কথা; ইয়োরোপে প্রকৃতি দেবীর সুদৃষ্টি নাই ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, তবে যে অনুর্ব্বর শীত প্রধান দেশে বাস করিয়াও ইয়োরোপীয়গণ ধনমান সম্পদে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে সে কেবল তাহাদিগের বুদ্ধি ও কৌশলের গুণে। অন্য দেশ হইতে অল্প মূল্যে প্রকৃতিজাত বস্তু লইয়া গিয়া স্বদেশে তাহাকে কল দ্বারা ঘষিয়া পিটিয়া মাজিয়া পুনরায় আবার সেই দেশে সেই বস্তু লাভে বিক্রয় করিতে বর্ত্তমান কালে ইয়োরোপীয়গণ যেরূপ পটু সে রূপ অন্য কোন জাতি নহে। যাহা হউক আমাদিগের বর্ণনীয় অন্ধকার-যুগে ইয়োরোপে কলের মহিমা প্রচারিত ছিল না। অতএব সেখানকার অধিবাসীদিগের আসিয়া-মহাদেশ জাত সুখকর সামগ্রী সমূহ ভোগ করি-বার ঐকান্তিক বাসনা থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা ছিল না। ইয়োরোপ তখন কেবল স্বর্ণ রৌপ্য, পশম, আর অস্ত্র শস্ত্র এই কয়েকটী দ্রব্য অন্য দেশে রওনা করিতে পারিত—ইহার বিনিময়ে সে অতি অল্প সামগ্রীই প্রাপ্ত হইত। সুতরাং তাহার এই সময়ে বহির্বাণিজ্যের আয়তন অধিক ছিল না; তাহার যাহা কিছু বহির্বাণিজ্য ছিল তাহা বিনিস ও আমাল্‌ফি এই দুই সহরের অধিবাসীরা চালাইত। ইহারা ইয়োরোপের দ্রব্য লইয়া গ্রীস ও কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যাইত ও তথা হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিত। বহির্বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা যে এই সময় ইয়োরোপের অতি অল্পই ছিল তাহা একটী বিষয় হইতেই বুঝা যায়। যাহা করিতে ধর্ম্মে নিষেধ তাহা যদি লোকে করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য কোন সহজ উপায় নাই। বিধর্ম্মীদিগের নিকট অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করা ইয়োরোপে নিষেধ ছিল, অথচ বাণিজ্যের নিমিত্ত ইয়োরোপীয়েরা সে নিষেধ মানে নাই। ইহা অপেক্ষা আরও একটী গুরুতর ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই; পাপের মধ্যে কাহাকে দাসত্বে বিক্রয় করার অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর পাপ অল্পই আছে। অথচ দেখ আসিয়া-জাত দ্রব্যাদি ভোগ করিবার অভিলাষে বিনিসীয়গণ বহুসংখ্যক দাস আনিয়া আসিয়া মহাদেশে বিক্রয় করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। যাহা অন্ধকার

যুগে ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল, তাহা অদ্যাবধি আফ্রিকায় প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীগণের গলায় চাক্‌চিক্যশালী কৃত্রিম মণি মুক্তাদির মালা ও গাত্রে মাঞ্চেষ্টরের কলপ্রস্থত বিবিধবর্ণের বস্ত্র পরিবার বাঞ্ছা এতই প্রবল যে তাহারা স্বদেশীয়দিগকে দাসত্বে বিক্রয় করা কিছুমাত্র গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণনা করে না। হায়! মানুষ, তুমি কখন দেবতা তুল্য আবার কখন বা তুমি পশু হইতেও অধম।

যাহা হউক, ইয়োরোপের এই দুর্দ্দশা চিরস্থায়ী রহিল না; অজ্ঞানতার সহিত অন্ধ বিশ্বাস ও পাপ এবং পাপের সহিত দারিদ্র্য ইয়োরোপে দেখা দেয়; ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপের দারিদ্র্য ঘুচিল, তাহার ব্যবসায় বাণিজ্যাদি শ্রীশালী হইল, ধনাগমের সহিত অতঃপর তাহার জ্ঞানলাভও হইল। কিরূপে তাহার ভাগ্যে লক্ষীর শুভ দৃষ্টি পড়িল, তাহা এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি। ইয়োরোপে কোন্ সময়ে বাণিজ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে তাহা ঠিক জানা নাই। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটে। ইয়োরোপের উত্তর প্রদেশে বালটিক সমুদ্র ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে বাণিজ্যের একটী ক্ষেত্র ছিল আর ভূমধ্যসাগরের উপকূলে দ্বিতীয় একটী ক্ষেত্র ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে ওলন্দাজদিগের নাম সকলেই জানেন; এই জাতির ফ্লেমিশ নামে একটী শাখা ছিল—ইহারা মধ্যকালে পশম বস্ত্র বপনে সাতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করে। ফ্লেমিশরা শুদ্ধ যে স্বদেশের উন্নতি করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল, এরূপ নহে; কালক্রমে তাহারা ফরাসি, জার্ম্মনি ও ইংলণ্ড এই তিন নিকটবর্ত্তী দেশে শাখা প্রশাখা সংস্থাপন করিল। এইরূপে ইয়োরোপের উত্তর খণ্ডে জনগণের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিবার ইচ্ছা জন্মিল, ভূপতিগণও সেই ইচ্ছার সাহায্য করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ব্যবসায়ে ধনসঞ্চয় করিতে পারিত সে রাজার নিকট হইতে জমিদারদিগের সমান পদ লাভ করিত। যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ হান্‌সিয়াটিক লীগ নামে বণিক-সমিতি সংস্থাপিত হইল, তখন বাণিজ্যের উন্নতির পথ আরও পরিষ্কার হইয়া আসিল। লোকে যতদিন পর্য্যন্ত একতায় আবদ্ধ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকে ও অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হয়। ভূস্বামিগণ নানা প্রকারে বণিকদিগের নিকট অর্থ আদায় করিতেন ও তাহাদিগের উপর উৎপাত করিতেন। কিন্তু যখন এক নয় দুই নয় দশ নয় জার্ম্মনিতে অশীতিটী প্রধান প্রধান স্থলের বণিকগণ একমত হইয়া পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত উল্লিখিত সমিতি সংস্থাপন করিল, তখন তাহাদিগের পক্ষ বলবান্ হইয়া দাঁড়াইল। লুবেক, কলোন্, ব্রন্‌সুইক ও ডান্‌টজিক এই চারিটী স্থলে তাহাদিগের প্রধান কার্য্যালয় খোলা হইল—এতদ্ভিন্ন বিদেশেও তাহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারিত হইল। সর্ব্বস্থলেই নৃপতিগণ তাহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

ইটালী দেশে বিনিস, জেনোয়া, পীসা প্রভৃতি সহর, ফ্রান্স দেশে মার্সেল সহর, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটী স্থল বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করিল। ইটালী দেশের বণিকগণ গ্রীস ও আসিয়ার পশ্চিম কূলে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল; তাহারা স্বর্ণ রৌপ্য, পিত্তল, টিন্, সীসা, পশম ও পশমীয় বস্ত্র ইত্যাদি ইয়োরোপ হইতে রওনা করিত এবং তৎপরিবর্ত্তে আসিয়া হইতে নানাবিধ বিলাসকর সামগ্রী লইয়া যাইত। কালক্রমে আবার ইটালী দেশে রেশমের ব্যবসায় সংস্থাপিত হইল; ১১৪৫ অব্দে এই ব্যবসায় প্রথমতঃ পালের্মো নগরে স্থাপিত হয়, পরে জেনোয়া, লম্বার্ডি ও টস্কানি এই তিন স্থলেও উহা প্রচলিত হয়। এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা ইয়োরোপীয় বাণিজ্য আরও স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। যতদিন পর্য্যন্ত উত্তর খণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ডের মধ্যে গতায়তের সুবিধা না হইয়াছিল, ততদিন অবশ্য ইয়োরোপ মহাদেশে বাণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব হয় নাই। কিন্তু যখন কম্পাস নামক দিঙনির্ণয় যন্ত্র চলিত হইল, তখন জেনোয়া নগরের ও অন্যান্য স্থলের বণিকগণ ইংলণ্ড ও নিকটবর্ত্তী দেশে ঘন ঘন যাইতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল আর তখন হইতেই ইয়োরোপের উত্তর ও দক্ষিণ মিলিত হইল, আর এই মিলনে সমগ্র ইয়োরোপের মঙ্গল পথ উদ্‌ঘাটিত হইল। অতঃপর কিছুকাল জেনেয়াবাসীগণ উত্তরে লণ্ডন ও দক্ষিণে আলেক্‌জান্দ্রিয়া এই দুই বহু দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে বাণিজ্য উদ্দেশে যাতায়াত করিতে লাগিল।

বাণিজ্যের যখন উন্নতি হইল, তখন কৃষিকার্য্য যে নিস্তেজ রহিল তাহা নহে। ফলতঃ ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যে উন্নতিস্রোতে বাণিজ্য শ্রীসম্পন্ন হইল, সেই উন্নতিস্রোতে কৃষিও অগ্রসর হইতে লাগিল। তবে দুঃখের বিষয় আমাদিগের গ্রন্থকার হালাম কৃষির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সবিস্তার কিছু বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন খৃষ্ট ধর্ম্মা-বলম্বী সন্ন্যাসীগণ স্বস্ব আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ কৃষি দ্বারা ফলশালী করেন এবং কালক্রমে ভূস্বামীগণও জমির যাহাতে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হই-লেন। এইরূপে অল্পে অল্পে ইয়োরোপে ধনবৃদ্ধি হইল। কোন জাতির মধ্যে আর্থিক উন্নতি হইলে তাহাদিগের পারমার্থিক উন্নতি হইতে বিলম্ব হয় না। ইয়েরোপেও আমরা দেখিতে পাই যে অতঃপর সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের নৈতিক অবস্থা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিল। একদিকে ধর্ম্মবিষয়ক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া জনগণের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রচলিত হইল আর তাহাতে নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সত্বরেই দূরীভূত হইল। অপর দিকে 'শিভাল্‌রি' নামক অনুষ্ঠান উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইয়া ঐ শ্রেণীর লোক সভ্যতা প্রাপ্ত হইল। শিভাল্‌রি মধ্যকালের একপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান, উহার অন্তর্গত লোকদিগকে নাইট বলিত। বিশেষ রূপে নিজের বলবিক্রম ঔদার্য্য সদাশয়-তাদির পরিচয় দিতে না পারিলে লোকে এই উপাধি প্রাপ্ত হইত না। দুর্ব্বলকে

রক্ষা করা, প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ না করা, দরিদ্রকে সাহায্য করা, যাহা ন্যায্য তাহাই অনুসরণ করা, আর স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এই কয়টী নাইটের অবশ্য- কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। আর ইহা ব্যতীত লোকের নিকট মিষ্টভাষী ও সদাচারী হওয়াই নাইটের অতিকর্ত্তব্য ছিল। সকল নাইটেরই যে এই সকল সদ্‌গুণ ছিল তাহা বোধ হয় নহে; তবে কিনা এই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলীতে উক্ত সকল গুণ লোকের অনুকরণীয় বলা হইত আর তাহাতে যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের স্বভাব উন্নত হইয়াছিল সে বিষয়ে দ্বিবাক্য হইতে পারে না। এক্ষণে আমরা মধ্যকালে সাহিত্যদর্শন বিজ্ঞানাদির কিরূপে উন্নতি হইল তাহা বলিতেছি। বিদ্যার চর্চ্চা আমরা এই সময়ে প্রথমতঃ ইটালী দেশে বলোনা নগরে দেখিতে পাই; এখানে আইন অধ্যাপনার নিমিত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় আর কালক্রমে ইহা দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমে পারিস, মনপেলিয়ে, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ ইত্যাদি স্থলেও কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয় আর তাহাতে বহুসংখ্যক ছাত্র নিয়মিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ে কত ছাত্র থাকিত তাহা অবশ্য ঠিক বলা যাইতে পারে না; একজন লেখক বলেন যে এক সময় অক্সফোর্ডে ত্রিশ হাজার ছাত্র ছিল, আর একজন বলেন বলোনায় এক সময় দশ হাজার ছাত্র ছিল। এই সকল সংখ্যা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে মধ্যকালের শেষ ভাগে ইয়োরোপীয়-দিগের মনে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। আইন ব্যতীত এই সময়ের বিদ্যালয় সমূহে আর একটী বিষয় অধীত হইত; ইহা দর্শন। এই মধ্যকালীয় দর্শন পুরাতন দর্শন হইতে গঠিত হইলেও ইহার কিছু বিশিষ্টতা ছিল। আইন ও দর্শন এই দুই বিষয়ের সহিত চিকিৎসা বিদ্যারও চর্চ্চা হইত; এই শেষোক্ত বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত ফ্রান্সদেশে মন্‌-পেলিয়ে নগরে একটী প্রধান বিদ্যালয় ছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মধ্যকালে ইয়োরোপীয়গণ এই সকল কঠোর বিদ্যার অনুশীলনেই কি ব্যাপৃত ছিল? ঠিক তাহা নহে; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতন সাহিত্য অধ্যয়ন করিত, আবার অনেকে নূতন ভাষা-সমূহে পদ্য গল্প ইত্যাদি রচনা করিত। পদ্য-রচয়িতাদিগের মধ্যে ফরাসি দেশের ট্রুবাডুর-দিগের নাম প্রসিদ্ধ আছে; এই দেশে দক্ষিণ ভাগে যে ভাষা চলিত ছিল তাহা বোধ হয় পদ্য রচনার পক্ষে উপযোগী ছিল। অন্ততঃ আমরা দেখিতে পাই যে মধ্য-কালের শেষ ভাগে এই ভাষায় ভূরি ভূরি প্রেমাত্মক কবিতা রচিত হয় এবং এই সকল কবিদিগের মধ্যে গণ্য হওয়া অনেক রাজা ও সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রী পুরুষগণের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় ছিল। এক্ষণে আমরা মধ্যকালের দর্শন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতেছি; আবেলার্ড ও লম্বার্ড এই দর্শনের একরূপ স্থাপয়িতা আর টমাস আকুইনাস ইহার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষক। মধ্যকালীন দর্শনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে— বাইবেলের কথা অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন না করিয়া কিরূপে মানবীয় বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা

ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এই দর্শনের স্বকীয় কোন অস্তিত্ব নাই, প্রকারান্তরে কেবল খৃষ্টধর্ম্মের বাক্য সমর্থন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। উহা নিজে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না, প্রতিপদে বাইবেলের ভয় রাখিয়া উহার চলিতে হইত। এরূপ দর্শনে অবশ্য সমগ্র মানব জাতির বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে না; মধ্যকালীন দর্শনে তুইটী প্রশ্নের প্রাধান্য ছিল, একটী এই যে, সুন্দরতা, সত্যতা, ন্যায্যতা ইত্যাদি সাধারণ ভাব সমূহের রাম শ্যাম যতু ইত্যাদি বিশেষ বস্তুর ন্যায় কোন স্বকীয় অস্তিত্ব আছে, না উহারা কেবল মানসিক ভাব মাত্র? আর একটী প্রশ্ন এই যে, মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন কিনা অর্থাৎ মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহা কেবল তাহার নিজের উপর নির্ভর করে, না তাহা তাহার মনের অবস্থা ও তাহার বহিঃস্থিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে? তখনকার দর্শনে প্রথমতঃ যখন আরিষ্টোটলের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ গৃহীত হয় তখন খৃষ্টীয়ধর্ম্মের নায়কগণ তাহা অনুগ্রহের ভাবে দেখেন নাই, কিন্তু পরে যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বয়ং টমাস আকুইনাস উহা সাদরে প্রবর্ত্তিত করিলেন তখন আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পাইলেন না; তখন হইতে বাইবেল ও আরিষ্টোট্‌ল এই তুইটী খৃষ্টানদিগের সমান মান্য হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, এই মধ্যকালের দর্শন দ্বারা তৎকালীন লোকদিগের বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা মানব জাতির কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই, কারণ তাহাতে যে সকল বিষয় যেরূপে আলোচিত হইত তাহা দ্বারা মানুষের উপকার দূরে থাকুক অপকারই হওয়ার সম্ভাবনা। উক্ত দর্শনের প্রধান দোষ এই যে উহা অনেক সময় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্নে কূট তর্ক করিত, যেমন স্বর্গীয় জীবগণের প্রকৃতি কি, তাহারা কি প্রকারে কার্য্য করে, কি প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করে; আর একটী দোষ এই যে কোন প্রশ্নের মীমাংসায় কেবল কল্পনা প্রসূত তর্কই করা হইত, ঘটনাবলী বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কোন বিষয় আলোচিত হইত না। সুতরাং এরূপ দর্শনে কোন লাভ নাই, তবে লাভ যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা এইমাত্র যে তদ্দ্বারা ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে চিন্তা করিবার প্রথা পুনরায় প্রচলিত হয়। যাহা হউক এই লাভ আংশিক মাত্র, কারণ অপর পক্ষে দেখা যায় লোকে এই দর্শনের মাহাত্ম্যে এতই আরিষ্টোটলের দোহাই দিতে শিখিল যে কেহ কিছু নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিতে যাইলেই তাহারা তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইত। অন্যের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিয়া ইয়োরোপীয়গণ স্বকীয় পদের উপর ভর দিয়া চলিতে ভুলিয়া গেল। তবে কালক্রমে এই শোচনীয় অবস্থারও মোচন হইল আর তখন (ষোড়শ শতাব্দী) হইতে ইয়োরোপে বর্ত্তমান যুগের সূচনা হইল।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মহিলা-শিল্পমেলা।

সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে যত্নবতী হয়েন এই দুইটী উদ্দেশ্যে প্রায় দুই বৎসর হইল "সখি সমিতি" নামক একটী মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশহিতকর অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা এই সমিতির একটী প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার না হইবার যে সকল কারণ কাছে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব তাহার একটী প্রধান কারণ। উপায় অভাবে এখন ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে স্ত্রীশিক্ষা দিতে পারেন না। কন্যাগণ একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাঁহারা স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা ঘরে রাখিয়া (খৃষ্ট-মিশনারী মহিলাগণের দ্বারা শিখাইতে না চাহিলে) কন্যাগণকে শিক্ষা দিবার তেমন সুবিধা পান না। কিন্তু নানা কারণে মিশনারী মহিলাগণের দ্বারা অনেকে পরিবার-মহিলাদিগকে শিখাইতে অনিচ্ছুক। ধর্ম্মের জন্য অনেক পরিবারে ইহাঁদের প্রবেশই নিষেধ। ইহাঁরা বাঙ্গলা ভাল জানেন না। অন্যান্য বিষয়েও ইহাঁরা যেরূপ শিক্ষা প্রদান করেন তাহা বড় সন্তোষজনক হয় না। আর বিশেষতঃ আমাদের স্ত্রীলোকদিগের যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে সে রূপ ইহাঁদের দ্বারা আদবেই হয় না। ইহাঁদের যথার্থ উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দান করা। কিন্তু যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকদের মনে দেশানুরাগ প্রদীপ্ত করিয়া জ্ঞান ও কর্ত্তব্যের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে সেই শিক্ষাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

কি মেয়ে কি পুরুষ সকল লোকেরই বাল্য শিক্ষা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে। বাল্য শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তিভূমি। মাতা যদি বুঝেন, সন্তানের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি যেমন আবশ্যক নীতির বিকাশ তেমনি আবশ্যক, শরীরের বল যেমন আবশ্যক মনের বল ধর্ম্মের বল তেমনি আবশ্যক, তাহা হইলে সন্তানদিগের যথার্থ শিক্ষা হয়, তাহা হইলেই বঙ্গবাসীকে একদিন উচ্চ জাতি হইতে দেখিবার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষায় হিন্দু রমণী উক্তরূপ জ্ঞান কর্ত্তব্যে দীক্ষিত হইতে পারেন—বিদেশী স্ত্রীলোক দ্বারা সে শিক্ষা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কেবল মাত্র হিন্দু রমণীর দ্বারাই এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক ও সুশিক্ষিতা হিন্দুরমণী এখন আমাদের দেশে নাই, সুতরাং আপাততঃ এ রূপে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা দুরাশামাত্র। ভবিষ্যতে যাহাতে এই আশা ফলবতী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমিতির নিয়মাবলীর মধ্যে একটী এই নিয়মও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে "অনাথা এবং অল্প বয়স্কা বিধবাগণ যদি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইতে চাহেন ত এই সমিতি তাঁহা-

দিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে এবং পরে শিক্ষিত হইয়া যখন তাঁহারা কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন তখন বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিবে। * সুখের বিষয় এই ইহার মধ্যেই সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমিতির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া দুই একজন বালিকা এই উদ্দেশ্যে লেখা পড়া শিখিতেছেন। এবং আরো কয়েকটী বালিকাকে তাঁহাদের পিতা এই কার্য্যে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক রমণীকে ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান করিতে যত অর্থের আবশ্যক সমিতির সে রূপ অর্থবল নাই, অল্পদিন মাত্র এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে কিছু সখি-সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে না যাঁহাদের নিয়মিত চাঁদা হইতে এই কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আর একটী উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সখীগণ আপনাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থ হইতে বৎসর বৎসর একটী মহিলা-শিল্প মেলা খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

দেশীয় মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি ও মহিলাগণ বিরচিত নানাবিধ শিল্পাদি এই মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে। বিক্রয়ের লাভ উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে, আর মূলধন পর বৎসরের মেলার জন্য রক্ষিত হইবে। এখন বঙ্গ মহিলা-গণের সাহায্যের উপরই এ মেলার জীবন নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সকল মহিলাই প্রায় কাঁথাসেলাই ফুলতোলা প্রভৃতি দেশী শিল্প এবং কার্পেট বোনা প্রভৃতি নানা প্রকার বিলাতী শিল্পও কিছু না কিছু জানেন। যিনি যাহা ভাল জানেন তিনি তাহা তাঁহার সাধ্যমত অল্পবিস্তর যেরূপ পারেন প্রস্তুত করিয়া যদি সমিতিকে উপহার প্রদান করেন তবে যথেষ্ট উপকার হয়। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের জন্য এইটুকু না করিলে আর কে করিবে? তাঁহাদের সহৃদয়তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর আছে বলিয়াই সমিতি এ মেলা স্থাপন করিতে সাহস করিয়াছেন। এই মেলা দ্বারা সমিতির অর্থ বৃদ্ধি ভিন্ন আরও অনেক উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে। এ মেলার সহিত পুরুষের কোন সংশ্রব নাই. পুরুষ প্রবেশ এখানে নিষেধ। সুতরাং পুরমহিলাগণ এখানে আসিয়া সহজেই শিল্পাদি দর্শন ও ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং তাহা দ্বারা সখি-সমিতির একটী প্রধান

---

* এইখানে একটী কথা, যে সকল বালিকা এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা পাইতে চাহেন, শিক্ষা পাইবার পর তাঁহারা যে আজীবন সখি সমিতির কার্য্যে বাঁধা থাকিবেন এমন নহে। শিক্ষা শেষ হইবার পর চারি বৎসর মাত্র তাঁহাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতে হইবে। তাহার পর এই কার্য্য করা না করা তাঁহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু চারি বৎসরের আগেই যদি কেহ এই কার্য্য হইতে অবসর লইতে চাহেন তবে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে সমিতির যে ব্যয় হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সেই ব্যয়ে আর একজনের শিক্ষা সম্পন্ন হইবে।

উদ্দেশ্য মহিলাগণের মধ্যে মেলামেশা তাহাও সফল হইবে। দ্বিতীয়তঃ মহিলাগণ যাহাতে শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যত্নবতী হয়েন সেই জন্য এই সমিতি হইতে সেলাই এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক একটী পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। মেলায় প্রেরিত শিল্পের মধ্যে যে বিভাগে যাঁহার রচিত শিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তিনি সেই বিভাগের পুরস্কার পাইবেন। এইরূপ শিল্প মেলায় মহিলাগণের শিল্পেরও উন্নতি হইবে। তাঁহাদের যে কোন প্রকার উন্নতিই সমিতির লক্ষ্য।

সমিতি আগামী মাঘ মাসে এই মেলা খুলিবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাহা হইলে এখন হইতে তাহার আয়োজনের আবশ্যক, সুতরাং মহিলাগণ তাঁহাদের হস্ত রচিত শিল্পাদি এখন হইতে যদি সমিতিতে প্রদান করেন ত ভাল হয়। যদি শিল্পের পরিবর্ত্তে কেহ অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন তাহাও কৃতজ্ঞচিত্তে সমিতি গ্রহণ করিবে। *

অবশেষে সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের প্রতি নিবেদন এই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবটি নিজ নিজ সংবাদপত্রে উদ্ধৃত করিয়া উপকৃত করিবেন।

একটী কুসুমের মর্ম্ম কথা।

প্রবাদ প্রশ্ন। †

আমি একটী বনের ফুল, আমি লতাপাতার মাঝে ফুটিয়া উঠি, লতাপাতার মাঝ হইতে ছোট মুখখানি বাহির করিয়া একটু হাসি, তাহার পর ঝরিয়া পড়ি।

আমি প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে জাগিয়া উঠি, পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্য দেখিয়া আমার মুখে হাসি ধরে না, অলিকুল আমার সেই হাসি দেখিয়া আমার কাছে আসে, গুণ-গুণ স্বরে আমার কত প্রশংসা করে, তাহাদের প্রশংসা শুনিয়া আমার বুক ফুলিয়া

---

* এই সমিতির বিশেষ বিবরণ যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন ত ভারতীর ঠিকানায় পত্রসহ একখানি ৵১০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে "সখিসমিতি" নামক একখানি পুস্তক তাঁহাকে পাঠান যাইবে। যাঁহারা শিল্পাদি পাঠাইবেন আপাততঃ তাহাও ভারতী সম্পাদিকার নামে এইখানে পাঠাইলেই চলিবে।

† ইহার উত্তর 'যতক্ষণ ধন ততক্ষণ আপন' কিম্বা এইরূপ আরো একটি কিছু হইতে পারে। মাঝে মাঝে ভারতীতে এইরূপ এক একটি প্রবাদ প্রশ্ন বাহির হইবে। পাঠকগণ তাহা পড়িয়া প্রবন্ধটির ভাবের সহিত মিলাইয়া একটি প্রবাদ স্থির করিবেন। যাঁহার প্রবাদ অধিকবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে—তিনি এক বৎসরের জন্য বিনামূল্যে ভারতী পাইবেন। কিম্বা ঐ মূল্যের পুস্তক উপহার পাইবেন।

উঠে, আনন্দে অবারিত হস্তে আমার মধু-ঐশ্বর্য্য তাহাদের বিতরণ করি, আমার মধু-ভাণ্ডার শূন্য হইলে স্বার্থপর ভ্রমর উড়িয়া যায়, ডাকিলেও আর ফিরিয়া আসে না।

ভ্রমর উড়িয়া যাইতে না যাইতে প্রভাত সমীর আমার নিকট উপস্থিত হয়, আমার সৌরভটুকু চাহে, আমি হাত পা নাড়িয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করি কিন্তু আমি দুর্ব্বল সে বলবান, সে আমার কথায় নিবৃত্ত হয় না, আমাকে পদদলিত করিয়া সৌরভ-টুকু অপহরণ করে, আমি মধুহীন, সৌরভহীন হইয়া ভারবহ জীবন বহন করি।

ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকে, সূর্য্যের প্রখর কিরণে আমার হাসিমাখা মুখখানি শুকাইয়া যায়, কিন্তু আমাকে দরিদ্র দেখিয়া কেহই আমার নিকটে আসে না, যত বেলা বাড়িতে থাকে প্রভাতের অলিকুলের প্রশংসা গীতি ততই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়; তাহা-দের আর দেখিতে পাই না; সমীরকে দেখিতে পাই বটে কিন্তু তাহার সেই স্নিগ্ধ, মৃদু, শীতল হাসটুকু দেখিতে পাই না; সে তাহার সেই হাসি, সেই রূপ কোথায় লুকা-ইয়া ফেলে, ভয়ানক মূর্ত্তিতে দূরে দাঁড়াইয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস ছড়াইয়া দেয়, আমার দিকে তাকাইয়া তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া উঠে, তাহার সে হাসি দেখিয়া লতামণ্ডপ ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, ঘোর আঁধারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়, আমি তখনও লতাপাতার ভিতর হইতে সেই ভাবেই মুখখানি বাহির করিয়া বসিয়া থাকি, কিন্তু আঁধার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না, আমি অনন্ত আঁধারের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া যাই।

আমি সেই আঁধারের ভিতর সমস্ত রাত্রি নতমুখে বসিয়া থাকি, অবিশ্রান্ত শিশির-পাতে আমার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া যায়, আমি শিশিরপাত মস্তকে ধারণ করিয়া ঊষার আলোকচ্ছটা দেখিবার আশায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকি।

"কিন্তু সমস্ত রাত্রি শিশিরপাত আমার সহ্য হয় না, নৈশ পবনের নিদারুণ কষাঘাত আমি সহ্য করিতে পারি না, ঊষা দেখা দিবার আগেই আমি বৃন্ত হইতে খসিয়া ঘোর আঁধারের বুকে পড়িয়া যাই, লতাপাতার ছায়ার নীচে কুসুমরাশির মহাশ্মশানে অনন্ত কালের জন্য আমার ক্ষুদ্র জীবনের সমাধি হয়।

কেহই তাহা দেখিতে পায় না, সেই নীরব নিশীথে আমার মৃত্যুতে কাহারও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হয় না, নৈশ পবন একবার হো হো করিয়া উঠে, জানি না তা খেদে না হর্ষে, নিশীথ নক্ষত্র এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে—জানি না স্বর্গের নক্ষত্রের মনে সামান্য কুসুমের মৃত্যুতে কি ভাবের উদয় হয়! আমি মরি বটে কিন্তু জানি না আমার জীবনে কাহার কি উপকার—জানি না আমার জন্ম মৃত্যুর কারণ কি?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

আজ কাল ইয়োরপে এক সমস্যা উঠিয়াছে, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতি কি না?

এতদিন এ সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন দ্বিধা ছিল না; বাইবেল কহিয়াছেন "ইব আদমের অংশ হইতে সৃষ্ট" সুতরাং স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতা এতদিন একটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। কিন্তু চিরকালই কালের বিচিত্র গতি। হঠাৎ আজ কাল সেই ধ্রুব বিশ্বাসের উপর কালস্রোতের আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকে এখন পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্রয়াসী, স্কুল কলেজে তাহারা পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান উপাধি লইতেছে, তাহাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিনো, মিশেষ ব্রাউনিং প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে পুরুষের সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আর বজায় থাকে না। এই ভয়ে ভীত হইয়া মহা মহা যোদ্ধ্ পুরুষগণ রাশি রাশি ভারি ভারি যুক্তির পাথর জমা করিতেছেন, আর এক এক খানি তুলিয়া বিপক্ষের মস্তকের প্রতি অব্যর্থ সন্ধান নিক্ষেপ করিতেছেন। বেচারাগণ মাথা লইয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রাখিয়া পলাইবে কি লইয়া পলাইবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবে সুখের বিষয় এই—সেই যুক্তির পাথর গুলি তাহাদের হস্ত নিক্ষিপ্ত হইতে না হইতে (বেশীর ভাগই) এমন অযুক্তির ফেনার আকারে মিলাইয়া পড়িতেছে—যে বিপক্ষদের যেখানকার মাথা সেই খানেই অটুট থাকিয়া যাইতেছে।

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে কয়েক বৎসর হইল ডিলনে নামক একজন ফরাসীস্ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন, (ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ডিলনে নহেন, প্রায় ১৫ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) নলেজে তাহার যে সমালোচনা হয় আমরা তাহা হইতে কয়েকটি অদ্ভুত যুক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ডিলনের মতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ—কেননা—কীট মৎস্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগের স্ত্রীজাতির বুদ্ধি সাধারণতঃ অধিক দেখা যায়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবদিগের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরা অধিক পরিমাণে বুদ্ধিমান। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে জীব যত উন্নতি লাভ করে তাহাদের পুরুষ জাতিদের বুদ্ধিও তত উন্নতি লাভ করে, এবং পুরুষরা যে পরিমাণে উন্নত হয়—স্ত্রীরা সেই পরিমাণে অবনতি লাভ করে—সুতরাং মানুষের পুরুষেরা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া স্ত্রীগণও ত বলিতে পারেন দুই বিপরীত অবস্থার—অর্থাৎ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের অবস্থাগত প্রকৃতির রূপ প্রায় একই। যেমন আদিম

অসভ্যদিগের মধ্যে সত্যের দিকে স্বাভাবিক যেরূপ অনুরাগ, সুসভ্যদিগের মধ্যে সত্যের দিকে বুদ্ধিগত সেইরূপ অনুরাগ দেখা যায়, অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্যের গুণ প্রায় একই রকম—ইত্যাদি, সুতরাং সর্প প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবের স্ত্রী বুদ্ধি যে কালে অধিক দেখা যায়—সে কালে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতির স্ত্রী বুদ্ধিও যে অধিক হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ! সে যাহাই হউক ডিলনের সিদ্ধান্তটি পুরুষের নিকট এতই সন্তোষকর—যে তাঁহার এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা আর তাঁহাদের বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নলেজসম্পাদক ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই—স্ত্রী কন্যা দিগকে নীচ প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চতা লাভ করিতে তিনি সম্মত নহেন।

এখন ডিলনে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে আর কি যুক্তি দিয়াছেন দেখাযাক। তাঁহার প্রথম যুক্তি—

"পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা বেশী খায়—আর মেয়েরা কম খায় কিন্তু বারে বারে খায়, সুতরাং পুরুষেরা শ্রেষ্ঠ।"

চমৎকার যুক্তি সন্দেহ নাই—তবে বেশী খাইতে পারা যে কিসে শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন, আর কম অথচ বারে বারে খাইলেই বা হীনতা কেন প্রকাশ পায়—তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণতঃ ভদ্রলোক অপেক্ষা কুলি মজুরেই ত অধিক খায়, আর কম কম অথচ বারে বারে খাওয়া ইহা ত ধনীদিগের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়। যাহউক নলেজ সম্পাদকের মতে কথাগুলি অর্থ শূন্য।

দ্বিতীয় যুক্তি,

পুরুষদের নিশ্বাস টানিবার ক্ষমতা অধিক, এবং তাহারা অধিক মাত্রায় অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাহাদের নাড়ী যদিও স্ত্রী নাড়ির ন্যায় বেগগামী নহে কিন্তু তাহাদের শরীরের তাপ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক।

নলেজ সম্পাদক বলিতেছেন—এই যুক্তির অনুকরণে স্ত্রীলোকেরা ও ত বলিতে পারেন পুরুষের শরীর রক্ষার্থে অধিক অক্সিজেন আবশ্যক, তাহাদের নাড়ী ক্ষীণ, তাহাদের শরীরের তাপ অধিক—সুতরাং তাহারা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তৃতীয় যুক্তি,

পুরুষের শরীর ও অস্থি স্ত্রীলোক অপেক্ষা আয়তনে অধিক সুতরাং তাহারা শ্রেষ্ঠ।

নলেজ সম্পাদক বলেন—হাতীর অস্থি ও শরীর পুরুষ (মানুষের) অপেক্ষাও আয়তনে অধিক তবে হাতী পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ?

ডিলনের যুক্তি।

পুরুষেরা ডান হাতে কাজ করে, বাঁ হাত ব্যবহার করিতে পারে না—কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বাঁ হাতেও অনেক কাজ করিয়া থাকে।

চার্লস রিড (একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক, তিনি ন্যাটা) বলিবেন ইহা নিকৃষ্টতার চিহ্ন নহে বরঞ্চ ইহাকে উন্নতির চিহ্ন বলা যাইতে পারে। পুরুষদের একহাত কার্য্যক্ষম স্ত্রীলোকের উভয় হাত কার্য্যক্ষম।

ডিলনের যুক্তি।

মেয়েদের পা বেশী মাটীর সঙ্গে মেশান, পুরুষদের খড়ম পা সুতরাং পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ।

নলেজ সম্পাদক।

খড়ম পা যে শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন ইহা নূতন শুনা গেল। পায়ের কার্য্য অনুসারে গঠন বিভিন্ন হয়। ডিলনে যদি ১০০ জন নর্ত্তকী ও ১০০ জন দ্বারবানের পা তুলনা করেন তবে নর্ত্তকীদের মধ্যে খড়ম পায়ের সংখ্যা অধিক হইবে।

ডিলনের যুক্তি।

পুরুষের স্বর মেয়েদের অপেক্ষা গম্ভীর ও তাহাদের শরীরে স্নায়বীয় শক্তি অধিক।

নলেজ সম্পাদক।

বুষের স্বর আরো গম্ভীর ও গরিলার স্নায়বীয় শক্তি অধিক তবে কি তাহারা পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ!

আর কত বলিব, এমন আরো অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু ডিলনের যুক্তির মাহাত্ম্য পাঠক বোধ হয় উল্লিখিত যুক্তিতেই যথেষ্ট পাইয়াছেন। তবে ডিলনে যে যুক্তির মত যুক্তি একেবারেই কিছু দেন নাই তাহাও নহে। পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের যে একটি সাধারণ যুক্তি আছে অর্থাৎ পুরুষের মস্তিষ্ক ভার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক, ইহা এবং এইরূপ দুই একটি যুক্তিযুক্ত কথাও তিনি বলিয়াছেন কিন্তু নলেজ সম্পাদক তাহার যে উত্তর দিয়াছেন আমরা তাহা পরে বলিব। আপাততঃ এই বলিতে পারি, ডিলনে স্ত্রীলোকদিগকে মস্তিষ্ক হীন করিতে গিয়া যে নিজের মস্তিষ্ক হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাঁহার পুস্তকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি নাইন্‌টিন্‌থ্ সেন্‌চুরি পত্রিকাতে সুলেখক জে, রোমানিস 'স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক পার্থক্য' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি এ সম্বন্ধীয় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাঁহার মতে পুরুষগণ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এবং শিক্ষার প্রভেদ এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে—এ শ্রেষ্ঠত্বে পুরুষদের জাতিগত জন্মগত অধিকার। কিন্তু বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতি ইহা তিনি বলেন না। বুদ্ধিই মনুষ্যের একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, দয়া মমতা ধর্ম্ম ভাব প্রভৃতি কতকগুলি গুণে—অর্থাৎ হৃদয়ে স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠ।* আমরা বলি তবে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উচ্চতা নীচতা লইয়া এত

---

* But now, the meritorious qualities wherein the female mind stands

গোলযোগ কেন ? কেহ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ কেহ হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ উভয়ের গুণের আদান প্রদানে মনুষ্য জাতি শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধির হিসাবে কোন কোন অংশে রোমানিস আবার স্ত্রীদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তিনি বলেন কোন একটা বিষয় স্ত্রীলোকে যেমন দ্রুত ধারণা করিতে পারে পুরুষে তেমন পারে না। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রীলোকে সাধারণত যত শীঘ্র পড়িয়া তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করে—পুরুষের তাহা হইতে অধিক সময় লাগে। †

---

pre-eminent are affection, sympathy, devotion, self-denial, modesty; long-suffering, or patience under pain, disappointment, and adversity; reverence, veneration, religious feeling, and general morality. In these virtues—which agree pretty closely with those against which the Apostle says there is no law—it will be noticed that the gentler predominate over the heroic; and it is observable in this connection that when heroism of any kind is displayed by a woman, the prompting emotions are almost certain to be of an unselfish kind.

All the aesthetic emotions are, as a rule, more strongly marked in women than in men—or, perhaps, I should rather say, they are much more generally present in women. This remark applies especially to the aesthetic emotions which depend upon refinement of perception.

* * * * *

Again, purity and religion are, as it were, the natural heritage of woman in all but the lowest grades of culture.

* * * * *

The whole organisation of woman is formed on a plan of greater delicacy, and her mental structure is correspondingly more refined: it is further removed from the struggling instincts of the lower animals, and thus more nearly approaches our conception of the spiritual.

† She has gained even on the intellectual side, certain very conspicuous advantages. First among these we must place refinement of the senses, or higher evolution of sense-organs. Next we must place rapidity of perception, which no doubt in part arises from this higher evolution of the sense-organs—or, rather, both arise from a greater refinement of nervous organisation. * * * *

Again, reading implies enormously intricate processes of perception, both of the sensuous and intellectual order; and I have tried a series of experiments, wherein reading was chosen as a test of the rapidity of perception in different persons. Having seated a number of well educated individuals round a table, I presented to them successively the same

কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তিতে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি। স্ত্রীলোকের এ বুদ্ধির নিতান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মতে শিক্ষার অভাবে স্ত্রীগণ যে উদ্ভাবনী শক্তির অভাব দেখায় তাহা নহে, কিট্‌স্ বার্ণ্‌স্, ফ্যারাডে ইহাদের মত অল্প শিক্ষা কত নারী না পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি একটা কিট্‌স্ বার্ণ্‌স্ কিম্বা ফ্যারাডে জন্মিয়াছে?

এইখানে একটি কথা, কিট্‌স্, বার্ণ্‌স্ সেরূপ উচ্চ-শিক্ষিত নাই হউন্ কিন্তু যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী পুরুষ শিক্ষার ফল গুপ্তভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান, আর স্ত্রীলোক-দিগের সম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত, অল্প স্বল্প স্ত্রীলোক কিট্‌স্ প্রভৃতির মত অর্দ্ধ শিক্ষা পাইলেও কাল পরম্পরার অশিক্ষায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক হীন-স্ফূর্ত্ত। এরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। কিন্তু রোমানিস এ কথা মানেন না; তিনি বলেন অন্ততঃ যতদিন স্ত্রীলোকদিগকে কিট্‌স্ ফ্যারাডে না দেখিতেছি ততদিন এই কথাই বলিব। তিনি বলেন যখন মস্তিষ্কের ভার পুরুষের স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাঁচ আউন্স অধিক, তখন একমাত্র এই শারীরিক গঠন বিভেদই স্ত্রীদিগের অল্প বুদ্ধির কারণ দাঁড়াইতে পারে।

ডিসনেও এইরূপ একটি যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নলেজ সম্পাদক যে

---

paragraph of a book, which they were each to read as rapidly as they could, ten seconds being allowed for twenty lines. As soon as time was up I removed the paragraph, immediately after which the reader wrote down all that he or she could remember of it. Now, in these experiments, where every one read the same paragraph as rapidly as possible, I found that the palm was usually carried off by the ladies. Moreover, besides being able to read quicker, they were better able to remember what they had just read—that is, to give a better account of the paragraph as a whole. One lady, for example, could read exactly four times as fast as her husband, and could then give a better account even of that portion of the paragraph which alone he had had time to get through. For the consolation of such husbands, however, I may add that rapidity of perception as thus tested is no evidence of what may be termed the deeper qualities of mind—some of my slowest readers being highly distinguished men.

Lastly, rapidity of perception leads to rapidity of thought, and this finds expression on the one hand in what is apt to appear as almost intuitive insight, and on the other hand in that nimbleness of mother-wit which is usually so noticeable and often so brilliant an endowment of the feminine intelligence, whether it displays itself in tact, in repartee, or in the general alacrity of a vivacious mind.

উত্তর দিয়াছেন রোমানিসের এই কথার উত্তরেও তাহা বলা যাইতে পারে। হাস্কির (Huschke) কথার নজির দিয়া ডিলনে বলিয়াছেন পুরুষের মস্তিষ্ক-আধার স্ত্রী অপেক্ষা শতাংশের ১৮ অংশ পরিমিত বড়। ইহা হঠাৎ শুনিতে যেমন মস্ত কথা আসলে কিন্তু ততদূর নহে। শরীরের আয়তনের উপরই মস্তকের আয়তন নির্ভর করে। এখন পুরুষরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড়, সুতরাং তাহাদের মাথাও বড় হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে স্ত্রীলোকদের শরীরের আয়তনের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ কম কি না? হাস্কির কথানুসারেই তাহা কম নহে, বরঞ্চ পুরুষের শরীর তুলনায় তাহাদের মাথা যত বড় স্ত্রীলোকের শরীর তুলনায় তাহাদের মাথা তদপেক্ষা অধিক বড়।

সে যাহাই হৌক, পুরুষেরা আপাততঃ যে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন এমন কথা আমরা বলি না যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এসম্বন্ধে নীচের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদিগকে সমান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে—সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহারা যে পুরুষ অপেক্ষা হীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিছু কাল ধরিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান লাভে সমান অধিকার দাও, বিদ্যা বুদ্ধির সমান চর্চ্চা করিতে দাও, তখনো যদি তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির অভাব দেখা যায়—তখন বুঝা যাইবে—তাহারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধি হিসাবে জাতিগত নিকৃষ্ট।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে রোমানিস কি বলিয়াছেন—নোটে তাহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটি শেষ করি।‡

---

‡ In conclusion a few words may be added on the question of female education as this actually stands at the present time. Among all the features of progress which will cause the present century to be regarded by posterity as beyond comparison the most remarkable epoch in the history of our race, I believe that the inauguration of the so-called woman's movement in our own generation will be considered one of the most important. For I am persuaded that this movement is destined to grow; that with its growth the highest attributes of one half of the human race are destined to be widely influenced; that this influence will profoundly react upon the other half, not only in the nursery and the drawing-room, but also in the study, the academy, the forum, and the senate; that this latest yet inevitable wave of mental evolution cannot be stayed until it has changed the whole aspect of civilisation. In an essay already alluded to, Sydney Smith has remarked, though not quite correctly, that up to his time there had been no woman who had produced a single notable work, either of reason or imagination, whether in English, French,

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হারমোনিয়ম শিক্ষা। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ প্রণীত।

"হারমোনিয়ম যন্ত্রে দেশীয় সংগীত বাদনের স্থূল স্থূল সংকেতগুলি, এবং তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই অবসর অতি অল্প, অথচ ইচ্ছা আছে এই অল্প সময়ের মধ্যেই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া প্রয়োজনানুসারে মনকে আমোদ দিবেন। এই পুস্তক যাহাতে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক হয় তৎপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে।" ইহা গ্রন্থকারের কথা। যতদূর দেখিলাম—আমাদের মনে হইল গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হইয়াছে, শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তক হইতে হারমোনিয়মের প্রথম-শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

ক্ষুদিরাম। (গালগল্প) শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

Garman, or Italian literature. A few weeks ago Mrs. Fawcett was able to show us that since then there have been at least forty women who have left a permanant mark in English literature alone. Now, this fact becomes one of great significance when we remember that it is the result of but the earliest phase of the woman's movement. For, as already indicated, this movement is now plainly of the nature of a ferment.

* * * *

But while we may hope that social opinion may ever continue opposed to the woman's movement in its most extravagant forms—or to those forms which endeavour to set up an unnatural, and therefore an impossible, rivalry with men in the struggles of practical life—we may also hope that social opinion will soon become unanimous in its encouragement of the higher education of women. Of the distinctively feminine qualities of mind which are admired as such by all, ignorance is certainly not one. Therefore learning, as learning, can never tend to deteriorate those qualities. On the contrary, it can only tend to refine the already refined, to beautify the already beautiful—'when our daughters shall be as corner-stones, polished after the similitude of a palace.' It can only tend the better to equip a wife as the helpmate of her husband, and, by furthering a community of tastes, to weave another bond in the companionship of life. It can only tend the better to prepare a mother for the greatest of her duties—forming the tastes and guiding the minds of her children at a time of life when these are most pliable, and under circumstances of influence such as can never again be reproduced.

ইন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গের একজন সুলেখক,তাঁহার 'ভারত উদ্ধার' বাঙ্গলার একখানি উৎকৃষ্ট হাস্য কাব্য। বলিতে কি, ভারত উদ্ধারে যে একটি সরস কৌতুকের ভাব দেখা যায় তাহা এইরূপ ধরণের অন্য কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি মনে হয় না। কিন্তু হাসি কৌতুকেরও একটি সীমা আছে, তাহারও যথা ব্যবহার করা চাই। লেখক ব্যক্তি বিশেষ, ধর্ম্ম বিশেষ বা সমাজ বিশেষের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কৌতুক শক্তির কেন যে বিকৃত ব্যবহার করেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। ক্ষুদিরামে অনেক ফিলজফি আছে, অনেক হাস্য কৌতুক আছে—কিন্তু ক্ষুদিরামে সুরুচির কণা মাত্র নাই।

ফুলহার। **শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।** পাঠক নামেই বুঝিয়াছেন—ইহা একখান কবিতা গ্রন্থ। ইহার অনেকগুলি কবিতাই ভাল, ইহার নামটি নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। 'বাঙ্গালী বাবুর কথা' নামক কবিতাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম।

বাঙ্গালিবাবুর কথা।

১

আর কি, গেলই বৃথায় জনম,
বাঙ্গালি হইয়া জনমি ভবে ;
বিজেতার বোঝা বলদের সম,
বতেছি, বহিতে জীবনে হবে।

২

উহু কি বিষাদ বঙ্গের জননী,
অধীনতা-পাশে রয়েছে বাঁধা;
কাঁদিছে কাতরা, কি করুণ ধ্বনি !
কাঁদা না—মুকুতি তরেত্বে সাধা।

৩

এ যাতনা ভুলা বড়ই কঠিন,
ভুলিব এবার মাদক সেবে ;
আর কি ? বাঁচিব বলই ক'দিন,
বোমবোম ভোলা কি হবে ভেবে!

৪

লোহিত বরণ উঠিতেছে রবি,
ছড়ায়ে আকাশে রূপের ছটা;
দেখাবে লেখক আঁকিয়া যে ছবি,
দেখিও পাঠক ! বঙ্গের ঘটা !

৫

ঘোঁট সিদ্ধি ঘোঁট আন নিম সোটা,
বোম ভোলা ভাই বলরে মুখে ;
দেও ধুতুরার রস দুই ফোটা,
দলা বেঁধে ফেলে দেওরে মুখে।

৬

গেল দুই দণ্ড কিছুই হলনা,
গাঁজায় তামাকে মিশায়ে লও ;
ডল, জল যেন অধিক হয় না,
হবে সুখ, শ্রম অলপ সও।

৭

মার দম বোম বলিয়ে কেদার,
স্বদেশের ধার কেই বা ধারে ;
আছয়ে প্রচুর পয়সা আমার,
পুঁছিব বল এ জগতে কারে !

৮

প্রতিবাসিগণ নিত্য অনাহারে,
মরুক তাহাতে ক্ষতি কি মম ?
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য তারা একেবারে,
চকে কুমরের চাকের সম !

৯

ভোঁ ভোঁ ভোঁ মধুর বাজিছে বাজনা,
কেমন কেমন কাণের কাছে ;
বোম শিব,—মনে আনন্দ ধরেনা,
নেশাতে নির্ম্মল আমোদ আছে।

১০

*   *   *
*   *   *   *

১১

দেখিতে দেখিতে আইল যামিনী,
পরিল প্রকৃতি চন্দ্রিকা-বাস ;
ঝমর ঝমর করিয়া অমনি,
আইল, চলিল মদের গ্রাস।

১২

কামিনী-কণ্ঠেতে মধুর সুতান,
উঠিল ভেদিয়া গগণ্-তল ;
নেশায় খুলিয়া গেল মম প্রাণ,
ঠুন্ ঠুন্ নাচে বাজিল মল !

১৩

দে মদ দে মদ আর একটুক্,
বঙ্গ পরাধিনী—উঠিছে মনে ;
দাসত্ব কঠোর—জ্বলে গেল বুক্,
ডোব স্মৃতি এই মদের সনে।

১৪

বাহবা বাহবা ভুলেছি সকল,
কিছুই মনেতে নাহিক মোর ;
ধন্য সুরাদেবি ! জ্বলন্ত তরল,
মানব মনের যাতনা চোর।

১৫

আর কি, এই ত সুখ ধরাতলে,
বাঙ্গালির আর, কি সুখ আছে ?
প্রহারিছে পৃষ্ঠে জেতা মহাবলে,
বেদনা নাশিছে সুরায় পাছে।

১৬

থাক্ স্মৃতি ! আর তুলনা ও কথা,
দাও বাবা মদ আবার দাও ;
ভয়ানক ক্লেশ হৃদয়ের ব্যথা,
বিস্মৃতি ! এ ব্যথা তুলিয়া নাও।

১৭

*   *   *   *
*   *   *   *   *

পাঠকদিগের প্রতি নিবেদন।

গত বৎসরের সূচিপত্রে ভুল ক্রমে 'আশা' নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লেখক, এবং 'অন্ধকার নিশীথে' নামক কবিতাটির লেখকের নাম, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বসু। তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত পত্র হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া সূচিপত্রে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই, সম্প্রতি তাঁহার নিকট হইতে আবার পত্র পাওয়া গিয়াছে।

যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন।

ইতি পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ নামক আমার রচিত যে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া "আত্মা ও অহং বৃত্তি" নামক একটী প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের স্বপক্ষের যাহা বলিবার কথা তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ভারতীতে এতবার এত রকমে বলিয়াছি যে, আবার সেই সকল পুরাতন কথা এখানে নূতন করিয়া বলা এক প্রকার যন্ত্রণা-বিশেষ। সামগ্রী রসালো হইলে কি হয়—একই সামগ্রীকে বারংবার ক্রমাগত কচ্‌লাইলে অমৃতও তিক্ত হইয়া উঠে। এ জন্য এখানে আমরা আবশ্যক মত তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিয়া শুদ্ধ কেবল এইটি দেখাইব যে, বিপিন বাবু আমাদের কথা খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহার আপনার কথাই আপনি খণ্ডন করিয়াছেন ও আমাদের কথাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সার গ্রন্থে বলিয়াছেন "দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহং ইতি ধীবলাৎ।" অর্থাৎ "সামান্যতঃ আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার (অর্থাৎ আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ দেকর্ত্তা বলিয়াছেন "I think therefore I am" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দুইটি প্রসিদ্ধ বচনের পরস্পর তুলনা-প্রসঙ্গে, আমি সাংখ্য-সারের উপরি-উক্ত বচনটির মধ্য হইতে "সামান্যত" এই শব্দটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; এতদুপলক্ষে বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার এই মত অর্থ করেন, যথা, আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলেই (এক কথায় অহংবৃত্তি বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়েন; উপরোক্ত বচনের মধ্যে যে সামান্যতঃ পদ আছে, তাহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন নাই।" বিপিন বাবুর মতে "সামান্য" এ কথাটি সামান্য কথা নহে—তাহা এমনি-একটি অসামান্য গুরুতর কথা যে, তাহার উল্লেখ না করিলেই নয়। বিপিন বাবু হয় তো মনে করিয়াছেন যে "সামান্যত" এই শব্দটি আমার পক্ষের হানিজনক হওয়াতে আমি তাহা চুপে চুপে সরাইয়াছি; তাহা যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন—তবে সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। বচনটি এই—"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতিধীবলাৎ" অর্থাৎ সামান্যত আমি জানি এইরূপ বুদ্ধিবলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়, কি না আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে "সামান্যত" এই শব্দটি উল্লেখ না করিলেও ঐ বচনটির প্রকৃত তাৎপর্য্যের যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না—এক্ষণে তাহা আমরা দেখাইতেছি। ফরাসীস্ দেশীয় দেকর্ত্তার এই যে একটি বচন যে "আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ" ইহার অর্থই এই যে, সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি

ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; অর্থাৎ আমি ইহা চিন্তা করিতেছি বা উহা চিন্তা করিতেছি—আমি ঘট চিন্তা করিতেছি বা পট চিন্তা করিতেছি—এরূপ বিশেষ বিশেষ চিন্তার কথা এখানে হইতেছে না, এখানকার মন্তব্য কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহা দ্বারাই আমার আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। এরূপ স্থলে 'সামান্যত' এ শব্দটি উল্লেখ না করিলেও উহা ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; এই জন্যই আমরা উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। যেখানে এক কথা বলিলেই মূল বচনের ভাবার্থ বুঝা যায় সেখানে আমরা দুই কথা বলিতে নারাজ। দেকর্ত্তা "সামান্যত"এ শব্দটিকে উহ্য রাখিয়াছেন—বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছেন—এই যা প্রভেদ, কিন্তু ফলে দুই কথার তাৎপর্য্য একই প্রকার। মনে কর গঙ্গার পরপারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—এপার হইতে আমি তাহা দেখিতেছি; সামান্যত আমি দেখিতেছি যে, প্রদীপ আলো দিতেছে; কিন্তু বিশেষত তাহা যে-কুটীরের মধ্যস্থিত ঘটী-বাটীতে আলোক দিতেছে তাহার প্রতি আমার লক্ষ নাই; ফলে, তাহা প্রদীপ কি না ইহা জানিতে হইলে তাহা ঘটিতে আলোক দিতেছে বা বাটীতে আলোক দিতেছে এসকল বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন প্রয়োজন করে না; সামান্যত তাহা আলোক দিতেছে ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাহা প্রদীপই বটে। 'আমি ঘটি জানিতেছি' ইহা ঘটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'আমি বাটি জানিতেছি' ইহা বাটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'সামান্যত আমি জানিতেছি' ইহা আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে "সামান্যত" এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ যদি কেবল এইরূপ বলা যায় যে, "আমি জানিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ" তবে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্তু বিপিন-বাবু 'সামান্যত' এই সহজ শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সঙ্গে 'অনুমান' এই আর একটি শব্দ যুড়িয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন 'দ্রষ্টা সামান্য অনুমান বলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন'। তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'অনুমান' কথাটী তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন—মূল বচনটিতে তো তাহার নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। বিপিন বাবু বলিতেছেন "সামান্য অনুমান বলে," আর এক জন বলিতে পারে "সামান্য জনশ্রুতির বলে," তৃতীয় ব্যক্তি বলিতে পারে "সামান্য বিশ্বাসের বলে;" মূলের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলিতে পারে সুতরাং সেরূপ বলা'র কোন মূল্য নাই। যদি এরূপ হইত যে 'সামান্য' এই কথাটির উল্লেখ মাত্রেই অনুমান ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, তবে বিপিন বাবুর স্বপক্ষে সেই যা এক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো আর নহে। মনে কর, প্রথমত আমি প্রদীপ দেখিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি রঙ্‌মশাল দেখিতেছি এবং তাহার সঙ্গে ইহাও দেখিতেছি যে উভয়েরই সামান্য লক্ষণ ঔজ্জ্বল্য—রঙ্‌মশালের বিশেষ লক্ষণ শ্বেতবর্ণের আলোক; এখানে অনুমান কোন্‌খানটায়? আমি ঘটি জানিতেছি—

বাটি জানিতেছি ;—ইত্যাদি ; এবং তাহার সঙ্গে সামান্যত ইহাও জানিতেছি যে 'আমি জানিতেছি ;' অনুমান ইহার কোন্‌খানটায় ? 'আমি জানিতেছি' ইহা কি অনুমান—না সাক্ষাৎ জ্ঞান ?

বিপিন বাবু এখানে বলিতে পারেন যে যেমন ধূমদৃষ্টে বহ্নি অনুমিত হয়, তেমনি 'আমি জানিতেছি' এই জ্ঞান দ্বারা আমার আপনার অস্তিত্ব অনুমিত হয় ; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু এ কথা যুক্তিতে টেঁকিতে পারে না ; কারণ যখন অগ্নি দৃষ্ট হইতেছে না—শুদ্ধ কেবল ধূমই দৃষ্ট হইতেছে, তখনই ধূম দৃষ্টে অগ্নির অনুমান সম্ভবে ; কিন্তু যখন ধূমের সঙ্গে অগ্নিও দৃষ্ট হইতেছে তখন অগ্নিও প্রত্যক্ষে বিরাজমান, ধূমও প্রত্যক্ষ বিরাজমান, এবং দুএর যোগও প্রত্যক্ষে বিরাজমান। যখন আমি একটা ঘট দেখিতেছি, তখন ঘটপদার্থ আমার বাহিরে বর্ত্তমান—ঘটজ্ঞান আমার অন্তরে বর্ত্তমান ; কিন্তু যখন আমি আপনাকে জানিতেছি তখন অহং-পদার্থও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, অহংজ্ঞানও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, এবং দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অভেদ-সম্বন্ধও আমার অন্তরে বর্ত্তমান। বিষয়-জ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান এ দুএর মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের বেলা—জ্ঞানের বিষয় (আমি) এবং জ্ঞান (আমি জানিতেছি) দুএর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানও যা, জ্ঞাতাও তা, জ্ঞেয় বিষয়ও তা, তিনিই এক। এই জন্য আত্ম-জ্ঞানের বেলায় এ কথা শোভা পায় না যে, আমি জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মাকে অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি ; কেননা এখানে জ্ঞানও যা—আত্মাও তা—একই,—সুতরাং একেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে দুইকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা হয়। অতএব 'আমি জানিতেছি' ইহা আত্মার অস্তিত্বের আনুমানিক প্রমাণ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ। এরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণের উপর বিপিন বাবুর কেন যে এত বিরাগ, তাহা বুঝিতে পারি না। বিপিন বাবু বলেন যে "এখনও কি শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু 'আমি জানি' এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন।" বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি আমাদিগকে "আমি জানি না" এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে বলেন ? মনে কর এক-জন আসিয়া বলিলেন "বিন্ধ্যগিরিতে একটা আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে" ও তাহার প্রমাণ তিনি এই দিলেন যে তিনি নিজেও তাহার কিছুই জানেন না এবং আর কেহও তাহার কিছুই জানে না। বিপিন বাবু কি ইহাঁর এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে পারেন ? 'আমি জানি' এভিন্ন—জ্ঞান ভিন্ন—সত্যের প্রমাণ আর যে কি জগতে আছে, আমরা তো তাহা জানি না। বিপিন বাবু নিজে কি বলিতেছেন ? তিনি বলিতেছেন "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন ;" তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই তো অনুভবাত্মক ? না আর কিছু ? যাহা জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না তাহাকে

অবশ্য তিনি অনুভবাত্মক বলিতে পারেন না। ইহা সত্ত্বেও বিপিন বাবু বলিতেছেন যে "অহংবৃত্তি লোপ হউক, এরূপ বাদ দিলে যে অজ্ঞেয় শূন্যাকার অথচ সত্তামাত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা।" 'অজ্ঞেয়' অর্থাৎ কেহই তাহাকে জানে না—জানিবে না—জানিতে পারে না; সুতরাং সেরূপ আত্মাকে বিপিন বাবুও জানেন না এবং অন্য কাহারও তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ না-জানা কথার যিনি উপদেশ দেন তিনিই বা কিরূপ উপদেষ্টা এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন তিনিই বা কিরূপ শিষ্য, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। গুরু মদ্দা-ছাগল দোহন করিতেছেন এবং শিষ্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য চালুনী ধরিয়াছেন;—কৌতুকের চূড়ান্ত! ইহারই নাম "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—এক অন্ধ আর এক অন্ধের পথ-প্রদর্শক। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কখনই আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পারেন না, কেননা জ্ঞাত বিষয় কখনই অজ্ঞেয় শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তবেই হইতেছে যে, অজ্ঞেয়-বাদী আত্মাকে জানেন না; যদি তিনি আত্মাকে না জানেন, তবে তিনি আত্মার সম্বন্ধে যতই বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করুন্ না কেন, সমস্তই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ।

কিন্তু বিপিন বাবু তাঁহার স্বপক্ষের প্রমাণার্থে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাকে—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে—সহায় ডাকিতেছেন; তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।" এবং তিনি ইহার অর্থ করিতেছেন "আত্মার সচ্চিদংশ ও বুদ্ধিবৃত্তি এই দুই পদার্থকে জীব অবিবেক হেতু সংযোগ করিয়া 'আমি জানি' এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়"। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, এখানকার এই যে 'আমি জানি' ইহা স্বতন্ত্র, এবং আমরা যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা স্বতন্ত্র। 'আমি জানি' বলিতে দুই প্রকার 'আমি জানি' বুঝায়,—প্রথম, লৌকিক ব্যবহারের "আমি জানি" এবং, দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞানের "আমি জানি"। লৌকিক ব্যবহারকালে আমি যখন বলি যে আমি গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, তখন আমার শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই "আমি" শব্দ প্রয়োগ করি, সুতরাং তখন আমি আমার শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানি; শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে এইরূপ অবিবেকাত্মক "আমি জানি"ই সচরাচর লোকে প্রচলিত—"সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।" লৌকিক ব্যবহার কালে আমরা এরূপ করি বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা-কালে আমরা আত্মাকেই 'আমি' বলিয়া জানি—শরীরাদিকে নহে। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক "আমি জানি" অবিবেক-জনিত; শেষোক্ত আধ্যাত্মিক "আমি জানি" বিবেক-জনিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে অবিবেক-জনিত লৌকিক "আমি জানি"ই দূষ্য; বিবেক-জনিত আধ্যাত্মিক 'আমি জানি' সাধকের পরম শ্রেয়স্কর। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যের গোড়াতেই আত্মাকে অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর (অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের গোচর) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে

যে আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ নহে; কি তবে তাঁহার মত-বিরুদ্ধ? দেহাদিকে আমি বলিয়া জানাই তাঁহার মত-বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার অবিকল অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

"তুমি (অথবা "ইহা" "উহা") এবং "আমি" এই দুইরূপ প্রত্যয়ের গোচর, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব যে, বিষয় এবং বিষয়ী, এ দুয়ের মধ্যে যখন পরস্পর ঐক্য হইতে পারে না তখন তাহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের মধ্যেও যে ঐক্য হইতে পারে না ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর চিদাত্মক বিষয়ীতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, অথবা বিষয়েতে বিষয়ীর এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত। তথাপি একের সত্তা ও ধর্ম্মেতে অন্যের সত্তা ও ধর্ম্ম আরোপ করত পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে অবধারণ না করাতে—অত্যন্ত পৃথক্ যে উল্লিখিত ধর্ম্মদ্বয় ও ধর্ম্মিদ্বয় তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সত্য এবং মিথ্যা দুয়ে জড়িত এইরূপ লোক-ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায় যে, আমি এই (শরীর বা মস্তিষ্ক ইত্যাদি,) আমার এই (গৃহ বা ভূমি ইত্যাদি)।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শরীরাদিকে আমি বলিয়া জানাই শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ—আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী। শঙ্করাচার্য্যের মতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা, এবং যুষ্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি, এই দুইকে একত্র মিশাইয়া খিচুড়ি পাকানো'র নামই অবিবেকে, এবং উভয়ের পার্থক্য রক্ষা করা'র নামই বিবেক। এ উপলক্ষে স্কটলাণ্ড দেশীয় তত্ত্ববিৎ হামিলটন কি বলিতেছেন পাঠক তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল শৃগালেরই এক রায়; হামিলটন বলেন

"But the something of which we are conscious, and of which we predicate existence, in the primary judgement, is two fold,—the ego and the nonego, we are conscious of both and affirm existence of both. But we do more, we do not merely affirm the existence of each out of relation to the other, but, in affirming their existence we affirm their existence in duality, in difference, in mutual contrast (ইহার নাম বিবেক); that is, we not only affirm this ego to exist, but deny it existing as the nonego; we not only affirm the non-ego to exist, but deny it existing as the ego.

শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মত এই যে, যুষ্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি এবং অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা এই দুইকে জড়াইয়া এক করিয়া ফেলাই অবিদ্যা। আমার প্রতিবাদীরা বলিতেছেন—আত্মাকে অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা

অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন চা'লে ডা'লে খিচুড়ি হয়; ইহাঁরা বলিতেছেন ডা'ল ব্যতিরেকেও শুধু চা'লে খিচুড়ি হয়। এটা ইহাঁরা দেখিতেছেন না যে, আত্মাকে অস্মৎ-প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে উল্টা আরও যুস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি হইতে তাহার পার্থক্য রক্ষা করা হয় এবং ইহারই নাম বিবেক; আত্মাকে দেহাদির সহিত জড়াইয়া ফেলার নামই অবিবেক। আমরা তাই বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে "আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয়" শঙ্করাচার্য্যের এই গোড়ার কথা-টীকে অবিদ্যাজনিত বলিলে তাঁহার অধ্যাস বাদের পাকা ভিত্তিমূল কাঁচিয়া যায়। আমার প্রতিবাদিরা বলিতেছেন "না—তাহা কাঁচিয়া যায় না; আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট খিচুড়ি পাকানো হয়—যুস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় দেহা-দির সহিত তাহাকে জড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই (শুধু চা'লেই খিচুড়ি পাকানো হইতে পারে, ডা'লের কোন প্রয়োজন নাই)," অথচ শঙ্করাচার্য্য চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন যে আত্মা এবং দেহাদি এ দুইকে জড়াইয়া একীভূত করিবার নামই খিচুড়ি পাকানো। এখন, শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিব—না ইঁহাদের কথা শুনিব?

বিপিন বাবু শঙ্করাচার্য্যের নিম্ন-লিখিত প্রসিদ্ধ বচনটিও উদ্ধৃত করিতে ক্রটি করেন নাই;—"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং। ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা। চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।" এই শ্লোকটির অর্থ প্রকৃত-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রভেদই বা কোন্‌খানে এবং অভেদই বা কোন্‌খানে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। বিষয়টি অতি গুরু-তর, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হওয়া সুকঠিন, এ জন্য বারান্তরে তাহার রীতিমত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে আমরা কেবল আমাদের বক্তব্যের স্বল্প মাত্র আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছি।

লোকে কথায় বলে যে "তেলে-জলে কিছুতেই মিশ খায় না"—তেলে জলে এত যে প্রভেদ, তথাপি, একটা কাচের পাত্রে তেল ও জল রাখিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটি চক্রাকৃতি অভেদ-স্থান লক্ষিত হয়; সেই অভেদ-স্থানটিকে তৈলরেখাও বলা যাইতে পারে—জল-রেখাও বলা যাইতে পারে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তথাপি উভয়ের অভেদ-স্থান আছে—যেমন সুষুপ্তি। সুষুপ্তির যদি জ্ঞানের সহিত আদবেই কোন সংস্রব না থাকিত—সুষুপ্তি যদি একেবারেই অজ্ঞেয় হইত—তবে তাহার সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারিতাম না যে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'। সুষুপ্তির সহিত যে-অংশে জ্ঞানের সংস্রব আছে সেই অংশে সুষুপ্তির অভ্যন্তরে অহংবৃত্তিও আছে এবং সেই অংশেই আমরা বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; সুষুপ্তি যে-অংশে অজ্ঞানাবস্থা সে অংশে আমরা তাহা বলি না—বলিতে পারিও না; কেননা একেবারেই যাহা জ্ঞান-বহির্ভূত তাহার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহা

অনর্থক বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রার সময় আমি সত্যসত্যই জ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আমি স্মরণ করিয়া বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; তাহা যদি না হইত, তবে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এ কথার কোন অর্থই থাকিত না। এই জন্য বিপিন বাবুর এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না যে, সুষুপ্তি-কালে আমাদের অহম্বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। উপরি-উক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানেই প্রভেদ সেইখানেই প্রভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটা না একটা অভেদ-স্থান আছেই আছে। তেমনি আবার দেখানো যাইতে পারে যে, যেখানেই অভেদস্থান সেইখানেই তাহা প্রভিন্ন বস্তু-দ্বয়ের অভেদ স্থান। তেল আর জলের মধ্যে যদি প্রভেদ বিলুপ্ত হয়—তেলটুকু যদি কোন মহাপুরুষের মন্ত্রবলে জল হইয়া যায়—তবে উভয়ের সেই অভেদ-রেখাটিও দৃষ্টি হইতে পলায়ন করে। কঠোপনিষদে আছে "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। তথাপি উভয়ের অভেদ স্থান এই যে, উভয়ই আত্মা। ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা এই অভেদ-স্থানটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "শিবোহং শিবোহং।" এই অভেদ-স্থানটিতে পরমাত্মার সংস্পর্শে জীবাত্মার পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইবারই কথা এবং পুণ্যের খদ্যোত-জ্যোতি ব্রহ্মানন্দের সূর্য্যালোকে কবলিত হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু সেই যে অভেদ স্থান—তাহা তো আর অজ্ঞেয় শূন্যাকার নহে; তাহা জ্ঞান-জ্যোতি ও আনন্দ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সেই অভেদ স্থানে যখন আত্মা বিরাজমান তখন কাজে-কাজেই বলিতে হইতেছে যে, সেখানে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কেননা আত্মা-মাত্রেরই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহা জ্ঞানও বটে জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞেয়ও বটে—আত্মা মাত্রই আপনাকে আপনি জানে; যে—আপনাকে আপনি জানে না, তাহাকে আত্মা বলাও যা—দেয়াল বলাও তা'—একই। তবে আর উপরি-উক্ত অভেদ-স্থানীয় পরম পরিশুদ্ধ আত্মাকে অজ্ঞেয় বলি কিরূপে? তিনি কি আপনার নিকটে এবং সাধকের নিকটে জ্ঞেয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তবুও কি বলিতে হইবে যে, তাঁহার নিকটে আত্মা অজ্ঞেয় শূন্যাকার ছিল? শঙ্করার্য্যের নিকটে যদি পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় শূন্যাকার হইতেন, তবে তিনি অন্য ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দিবার অধিকারীই হইতেন না; কেন না, তাঁহার নিজের নিকটে যাহা অজ্ঞেয়—তিনি নিজে যাহা জানেন না—তাহা তিনি অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে যা'ন—ইহা কত না লজ্জার কথা!

অতএব বিপিন বাবু পঞ্চদশীর এই যে, একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা জ্ঞাতৃ জ্ঞানান্তরাভাবাৎ" অর্থাৎ জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয়—ইহার আদবেই কোন অর্থ নাই। প্রদীপান্তরের

অভাব-প্রযুক্ত প্রদীপ কি কখনও অদৃশ্য হয়? তবে জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয় হইবে কেন? প্রদীপ প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি প্রদীপকে অদৃশ্য বলিতে হইবে? জ্ঞান প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি জ্ঞানকে অজ্ঞেয় বলিতে হইবে? প্রদীপ যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞান তেমনি আপনার আলোকে আপনি জ্ঞাত—তবে আর জ্ঞান অজ্ঞেয় কি রূপে? জ্ঞাত বস্তুকে অজ্ঞেয় বলা কি রূপ কথা?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা আত্মাকে স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন কি না? যদি করেন—তবে তিনি বলিতে পারেন না যে, "বিদ্যতে নানুভাব্যতা" আত্মা অনুভব-যোগ্য নহে; যদি না করেন—তবে তাঁহার উপদেশ মূলেই অনুভবাত্মক নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল বিতণ্ডা ও শব্দাড়ম্বর মাত্র। তবে আর বিপিন বাবুর এ কথা কোথায় রহিল যে "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন?" তিনি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছেন—সমস্তই তো তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ—তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও তো অনুভবাত্মক কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনে কর যেন ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ এক পয়সাও নাই—তাহা নিতান্তই অজ্ঞেয় শূন্যাকার, অথচ ব্যাঙ্ক হইতে হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাহির হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; এরূপ ব্যাঙ্ক নোটের কি কোন মূল্য আছে? যিনিই ব্যাঙ্কে নোট ভাঙাইতে যাইবেন তিনিই অজ্ঞেয় শূন্যাকার দেখিবেন—অন্ধকার দেখিবেন, ও শূন্য-হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিবেন। প্রদীপ যদি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করে, নিজেই যদি অপ্রকাশ হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান যদি আপনাকে আপনি না জানে, আপনার নিকট আপনি অজ্ঞেয় হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে জানিবে? এই জন্যই আমরা বলি যে, যিনি 'অনুভবাত্মক' সত্যের প্রয়াসী, অথচ 'আমি জানি' এমন একটি সুনিশ্চিত অপরোক্ষ অনুভূতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অনুভবাতীত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ইচ্ছা করিয়া নিপতিত হন, তাঁহার সেরূপ পতনের কারণ আর কিছু নয়—যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ—অনুভবাত্মক সত্য অনুশীলনের নাম করিয়া অনুভবের মূলোচ্ছেদ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতৃপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গ।

সন্দেহ।

(বিজন কক্ষে একাকী)

স্বনবালা।

যাহারে দেখিতে প্রাণ
উঠে সদা আকুলিয়া,
কেন নেহারিলে তারে
হৃদি উঠে দ্বিগুণ জ্বলিয়া!
কেবল যাহার ধ্যানে
দেহেতে রয়েছে প্রাণ!
দেখিব ভাবিলে যারে
সুখে উঠি উথলিয়া।
হেরিলেই কেন তায়—
তীব্র এক যাতনায়
নিবারণ নাহি মানে
অশ্রু বহে নেত্র দিয়া!
যখন তারে না দেখি
কতই কল্পনা আঁকি
কতই আদর তারে
করে এ পাগল হিয়া,
দেখিলে সে মুখখানি
একটি ফুটে না বাণী,
মনের বাসনা যত
মনে যায় মিশাইয়া।
বড়ই আগ্রহ ভরে
বড় সাধ আশা করে
দেখিবারে যাই তারে
আকুল ব্যাকুলহিয়া!

আগ্রহের প্রতিদান
দেখিতে পায় না প্রাণ,
কাঁদিয়া ফিরিয়া আসি
হাসিবার তরে গিয়া।

(সখির প্রবেশ)

সখি। সখি, সারাদিন ধ'রে
রহিবি অমনি করে
অমনি আঁধারে ঢাকা
অমনি বিষাদে মাখা
রহিবে কি মুখখানি তোর?
অমনি সলিলে ফুটি
রহিবে নয়ন দুটি
কেন সখি, এতই কিসের জ্বালা ঘোর?

বনবালা।
সেই এক কথা মনে জাগে অনিবার,
কেন সখি বোঝে না সে হৃদয় আমার!
মুখানি হেরিলে পরে
জ্বলন্ত ভাবের ভরে
যখন উথলে হৃদি প্রেম পারাবার—
সুখের তরঙ্গ ছুটে
হৃদি যেন টুটে টুটে
শোণিতে বিদ্যুৎ ছোটে শত শতবার!
কেন সখি বোঝে না সে হৃদয় আমার?
সে মোর মনের আলো এমনি উজল ভায়,
আর ত কাহারো কাছে লুকান নাহিক যায়।
সে আলো তাহারি কাছে কেনগো আঁধার
নাহি কি নাহি কি তবে ভালবাসা তার?
বড় ব্যগ্র হয়ে সখি আদর করিয়া,
কতই মনের কথা কহিবারে গিয়া,—
একটি কথা না সরে
আঁখি রাখি আঁখি পরে

মন যেন হুহুকরি উঠেগো কাঁদিয়া,
মর্ম্মের ভিতর হ'তে অশ্রু উঠে উথলিয়া।
কতই করিয়ে বল
ঢাকি সেই অশ্রু জল
হাসিতে লুকাতে যাই হৃদয় বেদনা,
নীরদে দামিনী ছুটে
আরো ত আঁধার ফুটে
কি জানি তবুও অন্ধ কেমন সে জনা?
শূন্যভাবে চেয়ে থাকে
দেখেও যেন না দেখে
কি জানি কেমনতর সদা অন্যমনা!

নিতান্ত অধীর যদি হয়ে উঠে হিয়া,
নিতান্ত দুখেতে যদি আপনা ভুলিয়া,
দারুণ প্রাণের জ্বালা
কহিবারে যাই বালা
বিষাদের গান গাহি হৃদয় খুলিয়া।
তবুও বোঝে না কেন?
শুনিতে না চায় যেন
যতই শুনাতে মন চাহে বারবার,
যদিই বা শুনিবার
অবকাশ হয় তার
বোঝেনা সে, বোঝেনা সে বেদনা আমার।
যেন গো সে যাতনায়
কিছু নাহি আসে যায়,
হেরিলে নয়ন জল বলে সে হাসিয়া,
দুখের অভাবে মোর
দুখেতে বাসনা ঘোর
দুখের স্বপন দেখি সুখেতে ভাসিয়া।
হৃদয় শোণিত দিয়া গঠিত যে ব্যথা,
নিঙরি মরম শিরা বাহিরে যে কথা,

সে দুখ শুনিলে সখি হাসি তার পায়।
নীরবে নয়ন জল নয়নে শুকায়।

দুখেতে পাইয়ে ব্যথা
একটি কহিলে কথা
মুছাইলে অশ্রুজল সমবেদনায়,

যদি এ যাতনা হায়
চকিতে নিভিয়া যায়
এতই বিরাগ ভরা কেন সে তাহায়?

একবার যদি বলে ভালবাসে মোরে,
একটি আদর যদি হাসিয়ে সে করে।

তাহলে তাহলে যদি
সুখেতে উথলে হৃদি
সমস্ত যাতনা জ্বালা ভুলি একবারে,

নীরবে উদাস-ভরে
রহে সে কেমন করে?
নহে তো নিঠুর সখি কোমল সে মন,

একটি কহিলে কথা
ঘোচে যদি মনো ব্যথা
একটি কবে না তবু সান্ত্বনা বচন?

কেন সে বুঝে না সখি হৃদয় বেদন,
আমার মনের মত নহে বুঝি মন।
তাইতে বুঝে না বুঝি হৃদয় আমার,
এখনো হৃদিতে আছে, ভালবাসা তার!

সখি।

জানি না কেমন তবে তাহার প্রণয়।
এমন নাহিক অন্ধ প্রেমের হৃদয়।
এক রতি থাকে হৃদে যদি অভিমান,
সে চরণে আর অশ্রু করিসনে দান।

বনবালা।

কি বলিস সখি হা রে
এমন না হতে পারে ?
প্রণয়ী এমন অন্ধ নাহি কোন জন ?
প্রেমের নহে সে হিয়া
প্রেমের নয়ন দিয়া
দেখিতে যে নাহি পায় প্রেমিকের মন ?
তাই সখি বুঝেনা সে হৃদয় আমার ?
সত্যই ফুরায়ে গেছে ভালবাসা তার ?
সারাদিন অবিরত
প্রেমের কাহিনী যত
না কয়ে একটি কথা কহিত যাহার প্রাণ,
প্রাণভরা প্রেম সেই
দুদিনে কিছুই নেই
দুদিনে কি একেবারে সব অবসান ?
তা নহে তা নহে সখি নারীর মতন,
নহে কোন পুরুষের মনের গঠন।
কেবলি প্রণয় দিয়া
গঠিত নহে সে হিয়া
প্রাণের পরাণ বুঝি নহে ভালবাসা,
শুধু ঐ এক গান
জুড়াতে পারে না প্রাণ
শুধু নাহি এক সাধ এক ঐ আশা !
অথবা সংসার জ্বালা
হৃদে পশিয়াছে বালা—
কে জানে তাই বা কোন অভিনব আশা—
পরিতৃপ্ত করিবার হয়েছে পিয়াসা ?
হৃদয় তাহারি দিকে সদা ধাবমান,
সহসা প্রণয় তাই হইয়াছে ম্লান।
তাইতে বুঝে না সখি হৃদয় আমার।
দুদিনে শুকায় কভু নবীন প্রণয়-তার !
এখনো হয়ত সখি ভালবাসে মোরে,
তবুও কেন গো জ্বলি সন্দেহের ঘোরে !

সখি।

বুঝেছিলো অভাগিনি
ভেঙ্গেছে প্রণয় তার,
দিসনে আপনি সখি
আপনাকে ফাঁকি আর।
কি হইবে আর কাঁদি
পাষাণে হৃদয় বাঁধি
সে প্রণয় আজি হতে ফেল উযাপিয়া।
সব শূন্য, শূন্যময়
কেহ ত কাহারো নয়
মিথ্যা-প্রেম ফাঁকি-জুকি যা সখি ভুলিয়া!
ছিন্ন করে ফেলে দিয়ে মিছে-মায়াডোর,—
নে রে নে যোগিনি ব্রত
শ্মশানেতে পরিণত
হউক—দেখিব সুখে—সে হৃদয় তোর!

বিদ্রোহ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীলের মেয়ের সহিত রাজাকে একত্র দেখা গিয়াছে, সে কথা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না, কথাটা রাজবাটীতেও উঠিল, সখীদিগের মধ্যে তাহা লইয়া মহা একটা কাণাকাণি ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল, রাণীর দুঃখে কেহই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে বাকী রাখিলেন না, কেবল যাঁহার দুঃখ তিনিই একথা জানিলেন না, সকলেই তাঁহার কাছে কথাটা প্রকাশের জন্য অস্থির অথচ কেহই বলিতে সাহস করে না। অবশেষে কোন রকমে তাঁহার কাণেও উঠিল। রুক্মিণী দাসী রাণীর বড়ই প্রিয়, সে তাহার বাপের বাড়ীর দাসী, তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে আবার তাঁহার ছেলেকেও মানুষ করিতেছে। সে এ কথা শুনিয়া কোন মতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একদিন দুপর বেলা শয়ন কক্ষে পালঙ্কে বসিয়া রাণী সেতার বাজাইতেছেন সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। রাণী তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার কিছু একটা বলিবার আছে। সেতারা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে রুক্মা?"

সে বলিল "একি শুনতে পাই, রাজা যে ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ ?"

আবার সেই কথা!

রাণী রাগিয়া বলিলেন—"কে এসব কথা উঠায় বল দেখি"?

দাসী বলিল—"ওঠাবে আর কে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে"!

রাণী আরো রাগিয়া গেলেন, বলিলেন "দেখ যদি অমন করে বলবি, তোকে এখনি ছাড়িয়ে দেব"

দাসী বলিল "তা ছাড়াবে না কেন? আজ তোমার স্বামী পুত্র হয়েছে, আজ আমি দাসী বই আর কি? যখন কোলে করে মানুষ করেছিলুম তখন আমি দাসী ভেবে করি নি"

রাণী অপ্রস্তুত হইলেন—বলিলেন "অন্যেরা যা বলে বলুক ওসব কথা তুই বলিস কেন"?

দাসী বলিল "আরে অবোধ মেয়ে, আমি কি সাধে বলি! তোর ভালর জন্যই বলছি। রাজার মন যাতে ভাল হয় এখন থেকে তার উপায় কর, ওষুধ বিষুধ চেষ্টা কর, নইলে পেকে দাঁড়ালে কি আর সামলাতে পারবি। তুই যদি না কিছু করিসত আমি পুরুত ঠাকুরকে গিয়ে বলব এর একটা তন্ত্র মন্ত্র না করলে চলবে না"

রাণী কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল "পুরুতঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, বারান্দায় আসন দিয়া তাঁহাকে বসাইয়াছি"

দাসী খবর দিয়া চলিয়া গেল, সেমন্তী রুক্মাকে বলিলেন—"দেখ তুই যদি পুরুত ঠাকুরকে কি আর কাউকে এ সব কথা বলে বেড়াবি—ত তক্ষণি আমি তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, খবরদার এ কথা নিয়ে ঘোঁট করে বেড়াস নে।"

দাসী যদিও বুঝিল রাণীর কথাটা নিতান্তই ভয় দেখান কথা নহে—তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিলে সত্যই তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না, তবুও পুরুতঠাকুরের নিকট এ কথা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিতে পারিল না, তবে কথাটা গোপনে বলিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

রাণী পুরোহিতের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলে পুরোহিত বলিলেন "বৎসে মঙ্গল হোক, বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"বিষণ্ণ? না বিষণ্ণ না, রাগ ধরেছিল, দাসীগুলোর বাজে কথায় মানুষ কি রাগ না করে থাকতে পারে?

পুরোহিত একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা আমার বাজে কথা শুনিতে পারেন না, আমি কিন্তু একটু বিশেষ কাজের কথায় আসিয়াছি, শুনিবার এখন অবসর হইবে

রাণী একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন—"আপনার কথা শুনিব তাহার আবার অবসর! দেখুন দেখি আপনি কি বলেন! সকল সময়েই তাহা শিরোধার্য্য;"

রাণী উৎসুক হইয়া চাহিলেন, পুরোহিত গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইতে যেন একটু থামিলেন, আসল কথা, যেরূপ সহজে সে কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন দেখিলেন বলাটা তত সহজ নহে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মা স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিনী, স্বামীকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে রক্ষা করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, সেদিকে যেন তোমার লক্ষ্য থাকে"

রাণী বিস্মিত হইলেন। এই তাঁহার বিশেষ কথা? ইহা কি আর রাণী জানেন না? এই কথাগুলির মধ্য দিয়া পুরোহিতও কি তবে সেই কথাই তাঁহাকে বলিতেছেন? রাণীর প্রাণে বেদনা লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন—"নাগাদিত্যের প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি দেখিতেছি, রাজা যদি সাবধানে না চলেন—ত তাঁহার অমঙ্গল রাজ্যের অমঙ্গল সন্নিকট"—

রাণী চমকিয়া উঠিলেন, আর সব কষ্ট তিনি ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন—"কুগ্রহ! প্রভু কি রূপে তাহার শান্তি হইবে!"

পুরোহিত বলিলেন—"বৎসে ভয় পাইও না, তাঁহাকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত কর, তাঁহার সমস্ত বিপদ দূর হইবে"

রাণী চুপ করিয়া রহিলেন,—কিছু পরে বলিলেন—"দেব, আমি অবলা, সামান্য স্ত্রীলোক, আমার কি সাধ্য আমি তাঁহাকে পরিচালিত করি—আপনি এ কথা তাঁহাকে বলুন, তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিন।"

পু। "না বৎসে, তাঁহাকে এ কথা কিছু বলিও না, যাহার গ্রহ তাহাকে তাহা জানান বৃথা, তাহাতে বিপরীত ফল ঘটে, মনের মধ্যে আশঙ্কা জন্মাইয়া দিলে সেই আশঙ্কায় গ্রহের দৃষ্টি আরো প্রখর হয় ভবিতব্য তাহাতে আরো অগ্রসর হইয়া আসে, তাহা ছাড়া আর কিছু ফল হয় না। মা তুমি আপনাকে সামান্য ভাবিও না, স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তোমার এ শুভ ইচ্ছা সাধনে ভগবান তোমাকে বল দিবেন"

বলিয়া পুরোহিত উঠিবার উদ্যোগ করিলেন--রাণী বলিলেন "দেব আমাকে বলিয়া দিন আমি কি করিব,—আমার সব অন্ধকার মনে হইতেছে?"

পুরোহিত বলিলেন—"তুমি তাঁহাকে সত্যের পথে চালিত করিবে, প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে, বুঝিলে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে। কিন্তু কি করিয়া তাহা করিবে তাহা আমি জানি না, আমা অপেক্ষা তুমি বৎসে তাহা বেশী বুঝিবে।"

পুরোহিত বিদায় লইলেন, রাণী ভাবিতে লাগিলেন। পুরোহিতের শেষ কথায় তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইয়াছিল—রাজার গ্রহ কি, কাহা হইতে পুরোহিত অনর্থ

উৎপত্তির ভয় করিতেছেন তাহা মহিষী বুঝিলেন, রাণী ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, সকলেই এই এক কথা বলিতেছে!

কিন্তু মনের ব্যথা তাঁহার মনেই রহিল। পাছে মনের ব্যথা বাহিরে প্রকাশ পায় পাছে কেহ মনে করে রাজার প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন—প্রাণের অশ্রু প্রাণে রাখিয়া তিনি সখীদের সহিত রীতিমত হাসিয়া কথা বার্ত্তা কহিলেন—নিয়মিত সাজসজ্জা করিয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজাও প্রতিদিনের মত উদ্যানে আগমন করিলেন। বাগানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, গাছে গাছে কাগজের ফানুষে দীপ জ্বলিতেছে, রাণীর সম্মুখে সখীদের নৃত্যগীত চলিতেছে। রাণী প্রস্ফুটিত ফুল বৃক্ষ বেষ্টিত প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায়, আশে পাশের ফুলের মধ্যে ফুল-রাণীর মতই শুইয়া আছেন, এক একটি ফুল দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে। রাজা আসিবার পরও খানিকটা নৃত্যগীত চলিল, তাহার পর তাহারা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে রঙ্গভূমির অভিনেত্রীদিগের মত একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ক্রমে বৃক্ষ নিকুঞ্জের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া সেখানে গান বাদ্য করিতে লাগিল, সেখান হইতে মধুর গীতধ্বনি কোমলতর মধুরতর হইয়া রাজা রাণীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

সখীরা যখন চলিয়া গেল—রাণীর এতক্ষণকার উথলিত আবেগ তখন আর বাঁধ মানিলনা, রাজার কোলে মাথা রাখিয়া রাণী কাঁদিতে লাগিলেন, কি করিয়া রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন রাজা যেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে' বারবার বলিতে লাগিলেন, "আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" তাঁহার উচ্ছসিত-প্রেমাদরে রাণীর অশ্রুজল মুছিয়া যাইতে লাগিল; হৃদয় দিয়া তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা মুছাইতে রাজা প্রয়াসী হইলেন। রাণী যখন দেখিলেন তাঁহার ক্রন্দনে রাজা কতখানি আকুল, সেই আকুলতার মধ্যে কত ভালবাসা, কত মমতা, কত সান্ত্বনা মাখামাখি, তখন রাণীর মনের অন্ধকার ক্রমে একটা আনন্দের আলোকের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

রাণীর বড় বড় চোখের পাতা তখনো অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল,—ছোট ছোট ঠোঁট দুখানি তখনো এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল, মুখের বিষণ্ণতা হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে আরো গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ অশ্রুজলে এ গাম্ভীর্য্যে কতখানি মাধুর্য্য কতখানি আনন্দ প্রকাশ পাইতেছিল। রাত্রের অন্ধকার দূর হইলে প্রথম প্রভাতের যে গাম্ভীর্য্য, গভীর তৃপ্তিতে যে অবসাদ, রাণীর ছোট্ট সেঁউতি ফুলেরই মত মধুর বিষণ্ণ শুভ্রমুখে রাজা সেই আনন্দের বিষাদ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোহাগভরে কহিলেন—"সেঁউতি রাণি বিষণ্ণ হইয়াই কি তুই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাস?"

রাণী রাজার দিকে চাহিয়া একটু অভিমানের স্বরে বলিলেন—"এসব কথা কেন উঠে? আমি শুনিতে পারি না।"

রাজা বুঝিলেন কি কথা,হাসিয়া বলিলেন—"কেন ওঠে আমিও ত তাই জিজ্ঞাসা করি?

রাণী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া—বড় বড় চোখে একটু তিরস্কারের ভাব পূরিয়া বলিলেন—"কিন্তু সমস্তটাই কি লোকের দোষ? সত্য কি কিছুই নাই?"

রাজা আশ্চর্য্য হইলেন, তিনিও তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন—"মহিষি?"

মহিষী একটু থতমত খাইয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না মহারাজ আমি ও কথা বলিতেছিনা, আমি বলিতেছি—সব বিষয়ে লোককে উপেক্ষা করিলে কি চলে? রাজা হইয়া তুমি ভীলের সহিত মেশ, বন্ধুর ব্যবহার কর, লোকেরা কেনই বা না নিন্দা করিবে?"

রাজাও তখন একটু গম্ভীর হইলেন, বলিলেন—"রাজা হইয়াছি বলিয়া আমিত লোকের দাস হই নাই, আমার মান অপমান আমি নিজে বুঝি, তাহাদের কথায় তাহার মীমাংসা নহে। ধনে যাহারা বড় তাহাদের আমি প্রকৃত বড় লোক বিবেচনা করি না—গুণেই মানুষ বড়লোক। জুমিয়া আমার সভাসদ হইতেও আসলে বড়। ছোট লোকের সহিত আমি বন্ধুত্ব করি নাই।"

মহিষী অধোমুখ হইলেন, বুঝিলেন রাজা ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু হরিতাচার্য্যের কথা তাঁহার মনে জাগিতেছিল, তাই তবু বলিলেন—"তবে লোকের কথা আর মিথ্যা হইতেছে কই? ভীল যে সত্যই তোমার এত বন্ধু তাহা ত আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম তাহারা বাড়াইয়া বলে। একটা সত্য হইলে আর একটাও সত্য হইতে পারে"। রাজা বলিলেন—"মহিষি তুমি আমার নিকট আজ প্রহেলিকা, এ তোমার হৃদয়ের কথা না মুখের?"

মহিষী বলিলেন—"কি মনে হয়?

রাজা। "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আগে কখনো তোমাকে এরূপ করিয়া বলিতে শুনি নাই,—তাই সমস্তটাই একটা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতেছে।"

মহিষী বলিলেন—"তবে আর প্রহেলিকায় কাজ নাই। মহারাজ, লোকে তোমার নামে মিথ্যা বলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাহারা বলিতেছে ভীলের মেয়ের সঙ্গে তোমাকে বনে একত্র দেখিয়াছে—এনিন্দা'——

রাণীকে আর কথা কহিতে না দিয়া রাজা একটু অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন—"মহিষি! তোমাকে আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সত্যই একদিন ভীলের মেয়ের সঙ্গে বনে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল—কিন্তু কি ভয়ানক মিথ্যা নিন্দা।"

রাজা সংক্ষেপে সে দিনকার ঘটনা বলিলেন—রাণী প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেন,—হঠাৎ যেন কেমন ব্যথিত হইলেন,—কিন্তু সে ব্যথা ঠিক অবিশ্বাসের ব্যথা নহে একটা

অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার ব্যথা। দাসীদের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—"লোকে যাহাই বলুক, তাহাতে আমার মনে এ পর্য্যন্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ শুনিতে শুনিতে পাছে তোমাকে কখনো সন্দেহ করিয়া ফেলি বড় ভয় হয়। মহারাজ, তুমি তাহার পথ দূর কর, আমাকে অঙ্গীকার দাও ভীলের মেয়ের মুখ আর তুমি দেখিবে না।"

রাণী যাহা বলিলেন—হৃদয়ের কথা বলিলেন, কিন্তু এই কথায় হঠাৎ রাজা কেমন রাগিয়া গেলেন, বলিলেন—"লোকের কথায় যদি তোমার আমার উপর হইতে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায় ত সে বিশ্বাস আমি শপথে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি না, স্বতঃউৎসারিত বিশ্বাস ভিন্ন অন্যরূপ বিশ্বাসের আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

রাজার মনে হইল—এ সমস্তই পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন তাহাও জানিতেন, তাঁহার কথায় রাণী এতদুর নীত হইয়াছেন, রাজার তাহা বড়ই খারাপ লাগিল, রাজা গুম হইয়া রহিলেন। রাজার সেই ক্রুদ্ধ ভাবে ক্রুদ্ধ ব্যবহারে রাণীর বিষম আঘাত লাগিল, তিনি কি এমন অন্যায় কথা বলিয়াছেন যে রাজা তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। রাণী এতদুর মর্ম্মাহত হইলেন, যে তাঁহার অশ্রুজল বাহির হইল না, স্তমিত বিষাদের ন্যায় তিনি বসিয়া রহিলেন। রাণীর রুদ্ধ যন্ত্রণা রাজা অনুভব করিলেন, কিন্তু তথাপি একটি কথা কহিলেন না, আর কখনো যাহা করেন নাই—সেই বিবণ্ণ কাতর মর্ম্ম পীড়িত পত্নীর সমুখে বসিয়া নীরব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাছের ভিতর দিয়া সন্ধ্যাতারা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, গাছের আড়াল হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত আকাশে ভাসিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নালোকে ফুল-গাছের ছায়া চাঁদের বিষাদের ছায়ার মতই যেন বিছানার উপর পড়িল—রাজা একটু পরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, মহিষী সেই ছায়ায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা এই প্রথম, তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম মনোবিচ্ছেদ। কে যেন বলিতে লাগিল "তোমাদের এ চির বিচ্ছেদ, এ বিচ্ছেদ আর কখনো দূর হইবে না।" রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া মনের ভিতর মন দিয়া দেখিলেন তিনি কি রাজাকে সন্দেহ করিতেছেন? দেখিলেন রাজাকে তাঁহার সন্দেহ নাই,—তবে কেন এরূপ সন্দেহ ভাবের কথা কহিয়া রাজাকে কষ্ট দিয়াছেন? এ ঘটনার জন্য তিনিই কি সম্পূর্ণ দোষী নহেন? আবার সেই পুরোহিতের কথা মনে আসিল—রাজার অমঙ্গল—রাজ্যের অমঙ্গল—রাজাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখাই রাণীর কর্ত্তব্য"—রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কি করিতেছেন, কি করিবেন—সমস্তই যেন অন্ধকার সংশয়ের মধ্যে নিহিত, তিনি সেই আঁধার সমুদ্রের আঁধার তরঙ্গের মধ্যে আত্মহারা, ইহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

দেখিলেন কে একজন যেন কাছে আসিতেছে রুক্মা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "রুক্মা একবার মহারাজকে ডাকিয়া আন।" তাঁহার ভাব দেখিয়া রুক্মার চোখে জল আসিল, সে কথাটি না কহিয়া মহারাজকে ডাকিতে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ সন্দেহ! কেবলি সন্দেহ! রাজা বিরক্ত হইয়া অন্তপুরের বাহির হইলেন, রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পাশ দিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন, তোরণ অতিক্রম করিবার সময়ে প্রহরী বলিল "মহারাজ গণপতি ঠাকুর সাক্ষাৎ প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন।" রাজা বিরক্ত ভাবে উত্তর করিয়া গেলেন—"কেহ এখন আমার সাক্ষাৎ পাইবে না, কেহ যেন আমাকে খুঁজিতে না যায়"। নদীর ধারে তিনি একটি গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সুহারমতীর জ্যোৎস্নালোক-দীপ্ত সফেন তরঙ্গ তাঁহার চখের উপর উথলিত হইতে লাগিল, নিস্তব্ধ রাত্রে তীরের অন্ধকার গাছ-পালা—নদীর জ্যোৎস্নাধৌত কালজলে আকাশের নীল মেঘ—সমস্তই যেন একটা স্বপ্ন রাজ্যের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ আলোড়িতভাবের সহিত এই নিস্তব্ধ জগতের কি প্রভেদ ভাব! ধীরে ধীরে রাজার হৃদয় প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সুযুপ্তির মত তাঁহার হৃদয় জ্যোৎস্না দৃশ্যের স্তব্ধতায় লীন হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে রাজার মনে প্রথম দিনের এই নদী তীরের ঘটনাটি জাগিয়া উঠিল। বাস্তবিক কি সুন্দরী! পদ্মও সে হাতে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল! সে দিন রাজা প্রশংসার মত যে কথাটা কথার কথা ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আজ যেন অনুভব করিয়া বলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাজা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, একেবারে জলের ধারে নামিয়া হঠাৎ একটু হঠিয়া দাঁড়াইলেন, অদূরে নদীর উপরে একটি গাছের তলায় কে যেন বসিয়া। রাজাকে দেখিয়া মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল" নিকটে আগমন করিল, রাজা বলিলেন—"আপনি গণপতি ঠাকুর! এখানে একাকী"?

গণপতি ঠাকুর বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—"মহারাজ আমার আর স্থান কোথা?"

মহারাজ গণপতিকে গুরুর মত ভক্তি না করুন, কিন্তু তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহার সেই বিষণ্ণ ভাবে নৈরাশ্যপূর্ণ কথায় ব্যথিত হইলেন বিস্মিতও হইলেন, বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

গণপতি বলিলেন "হরিতাচার্য্য আমাকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, আমি আর এখানকার কেহই নই।"

রাজার অপ্রকৃতিস্থ হৃদয় অতি অল্পে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কেন ?"

গণপতি মৌণ হইয়া রহিলেন। রাজা বলিলেন "শুধু শুধু আপনাকে তাড়াইতে তাঁহার কি অধিকার। আপনি কি দোষ করিয়াছেন ?"

গণপতি বলিলেন—"আর কিছু দোষ নহে দোষ আপনি আমাকে ভাল বাসেন—আমি আপনাকে ভালবাসি" !

রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—"ভাল করিয়া বলুন কি হইয়াছে; আমি আপনাকে ভালবাসি তাঁহার তাহাতে কি ?"

গণপতি বলিলেন—"তিনি চান আমি তাঁহার গুপ্তচর হইয়া আপনার প্রতিদিনকার কথা তাঁহাকে খবর দিই—তিনি চান আপনার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মত সন্দেহ করিয়া আপনার জীবন অসহ্য করিয়া তুলি। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে আপনি ভীলকন্যার প্রেমে মুগ্ধ, আমি তাঁহার কথায় সায় দিই নাই—আমার এই অপরাধ"—

রাজার অসীম ক্রোধ হইল, খানিক পরে তিনি বলিলেন—"তিনি যেমন মন্দির স্বামী তেমনি থাকুন—আমি আর একটি মন্দির স্থাপন করিব, আপনি তাহার পুরোহিত হইবেন,—আমি আপনাকে কুল পুরোহিতরূপে বরণ করিব।"

পুরোহিত আশাতীত আহ্লাদে বাক্যহীন হইলেন।

রাজা বলিলেন—"এখন আসুন আমার সহিত"। রাজা চলিতে লাগিলেন—গণপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুজনেই নিস্তব্ধ, স্তব্ধ নিশীথের দুইখানি মেঘের ছায়ার মত ধীরে ধীরে যেন দুজনে ভাসিয়া চলিয়াছেন। দুজনেই চিন্তা মগ্ন, দুজনেই নিজের ভাবে অন্যমনা, গণপতি আনন্দের চিন্তার মুমূর্ষু, ক্রোধ ও বিরক্তির ভাবে রাজা প্রপীড়িত, তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতেছে—"কেবলি সন্দেহ কেবলি অবিশ্বাস! আমি কি করিয়াছি ?" দূর শৃঙ্গপরে নীলাকাশে মস্ত চাঁদ, শাল গাম্ভারী প্রভৃতি বড়বড় গাছের ফাঁক দিয়া রাস্তার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, জোৎস্নার গায়ের উপর গাছের ছায়া লতাইয়া আছে, ছায়ার গায়ে জ্যোস্নার গায়ে তৃণ গুল্মরাশি বনফুলের রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। সহসা রাজা দেখিলেন—এ সেই তরুপথ, এই খানে বেড়াইতে বেড়াইতে অদূর নিকুঞ্জের সঙ্গীত শুনিয়া ছিলেন, আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই সেই নিকুঞ্জের ভিতর গিয়া পড়িবেন। সেই সুরবা লহরী ধ্বনি রাজার কাণে যেন বাজিয়া উঠিল, সেই জীবন্ত ছবি সেই অমানবী সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল,—সহসা রাজা চমকিয়া উঠিলেন, নিজের প্রতি নিজের যেন সহসা সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন—"এ কোথায় আসিয়াছি !" বলিয়াই তিনি ফিরিলেন, তাঁহার মনে হইল, গাছ পালার মধ্যে কে যেন বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল, সচকিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহই কোথায় নাই,—রাজা দ্রুত পদে বন পার হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই শুনিলেন মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়াছেন।

য়ুরোপীয় "গুপ্ত সমাজ"।

এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায় শাসিত-রাজ্যের সহিত সাধারণ রাজ্য তন্ত্রের যে কিরূপ প্রভেদ তাহা য়ুরোপীয় ইতিহাস পাঠে সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। ইহাও দেখা যায় যে স্বেচ্ছাচার তন্ত্র প্রবর্ত্তিত প্রদেশে প্রায়ই গুপ্ত সমাজ সংস্থাপিত হইয়া থাকে; প্রতিষ্ঠিত রাজ্য তন্ত্রের ধ্বংস করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীর প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে অধুনা প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় সুসভ্য প্রদেশে প্রকাশ্য সভা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যে রাজ্যের রাজা কিম্বা সম্রাট সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী যে রাজ্যের প্রজাদিগের কোন প্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই, যেথানে প্রকাশ্য সভা কিম্বা স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ, যেখানকার মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা বিহীন, সে রাজ্যে প্রায়ই গুপ্ত সমাজের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী; মনুষ্যেরা, বিশেষতঃ ইয়োরপের সভ্যজাতিরা যখন অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হয় এবং তাহাদিগের জীবন কৃতদাসত্বে পরিণত হয়, তখন যে তাহারা গুপ্তভাবে মিলিত হইয়া, অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার উপায় কল্পনা করিবে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। আর এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট যে এই সভার প্রতি সন্দেহ ও দ্বেষ প্রকাশ করিবেন, এবং তাহাদিগকে অহিতকারী বিবেচনায়, তাহাদিগের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? উক্ত কারণে অর্থাৎ সভার কার্য্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য পাছে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রকাশ করে সেইজন্যই গুপ্তসভার মধ্যে শপথ, গুপ্ত চিহ্ন প্রভৃতির এত বাঁধা বাঁধি।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রকাশ্যে সভা করিয়া রাজনৈতিক বিষয় সকলের আন্দোলন করা, এবং সাধারণের ক্লেশ নিবারণ ও কষ্টের প্রতিকার করিবার জন্য সকলে মিলিত হইয়া আবেদন করিবার অধিকার, এই সকল যে গুপ্ত সভা সকলের সৃষ্টি নিবারক তাহার কিছু মাত্র সংশয় নাই। ফরাসি ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিশেষ রূপে বিদিত আছেন গুপ্তসভার প্রভাবে রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি কত মহা মহা পরিবর্ত্তন সেখানে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ একবার উহার পার্শ্বস্থ প্রদেশ ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করুন এবং উহার ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়া ফ্রান্সের ইতিহাসের তুলনা করিয়া দেখুন, কত প্রভেদ তাহা সহজেই দেখিতে পাইবেন। আমি এমন কথা কহিতেছিনা যে ইংলণ্ডে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিপ্লব ঘটে নাই। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উভয় রাজ্যের বিপ্লবের বিশেষ প্রভেদ আছে, এবং ফ্রান্সের বিপ্লবের তুলনায় ইংলণ্ডীয় বিপ্লব অকিঞ্চিৎকর। ইংলণ্ডে কোন প্রকার গুপ্ত সমাজের সৃষ্টি হয় নাই ও ফ্রান্সের ন্যায় ভীষণ বাত্যাঘাত সহ্য করিতে হয় নাই,

ইহা বলিলে কিছু অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয়। ফ্রান্সে বিস্তৃত গুপ্ত সমাজ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই সকল সমাজ সময়ে সময়ে ফ্রান্সের নিয়তি শাসন করিয়াছে। ইংলণ্ডে ডরশেটসায়র-শ্রমজীবিদিগের যে সভার সৃষ্টি হয় তাহাকে যদিও গুপ্ত সমাজের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছিল। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে ফ্রান্স য়ুরোপীয় ক্ষমতাশালী ও উন্নত রাজ্য গুলির অগ্রণী এবং ফ্রান্স অনেক বিষয়ে উহাদের শিক্ষাগুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুইটী নিকটবর্ত্তী রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনে কত প্রভেদ! ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং আপামর সাধারণ প্রকাশ্যে মিলিত হইয়া আপনাদিগের ক্লেশ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। কিন্তু ফ্রান্সে কি নেপোলিয়ান, কি লুই ফিলিপ, কি প্রেসিডেন্ট বোনাপার্ট (কেবল ক্ষণিক রাজ্য বিপ্লবের সময় ব্যতিরেকে) প্রায় সকলেরই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলিত ছিল এবং প্রকাশ্যে সভা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিবার অধিকার কতকগুলি কঠিন নিয়মাধীন ছিল, অধিকন্তু পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের উপস্থিত ব্যতিরেকে সভায় কার্য্য হইতে পারিত না।

য়ুরোপে রোমরাজ্য প্রভৃতি দুই একটী দেশ (যেখানে প্রাচীন কালে কতক পরিমাণে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত ছিল) ব্যতিরেকে প্রায় সকল রাজ্যই স্বাতন্ত্রী রাজা বা সম্রাট দ্বারা শাসিত হইত এবং অদ্যাবধিও অনেক গুলি রাজ্য ঐরূপে শাসিত হইতেছে। কিন্তু স্বাতন্ত্রী রাজ্য-প্রণালীর অন্তরে একটী প্রকাণ্ড নৈতিক শক্তি লুকায়িত ছিল ঐ শক্তি ক্রমে প্রকাশিত ও বিস্তারিত হইয়া য়ুরোপকে নবজীবনে জীবিত করিয়া উৎসাহে মাতাইয়া তুলিল এবং ঐ শক্তির আঘাতে অজ্ঞানরূপ তিমির অপসারিত হইয়া ক্রমে সভ্যতার জ্যোতি প্রকাশিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। ঐ ভীষণ শক্তির আবির্ভাবে য়ুরোপীয় লোকদিগের মন উন্নতি ও সাম্য অভিমুখে প্রবল বেগে চালিত হইল। এস্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে * পরিবর্ত্তনকারী সংস্কার সমূহ এককালিন সকল শ্রেণীর লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই ও করে না। প্রথমেই উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মনে পরিবর্ত্তনকারী সংস্কারের উদয় হয়। † তাঁহারা যখন দেখিলেন যে তাহাদিগের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই নাই, সমস্ত ক্ষমতা একটী

---

* Revolutionary Ideas.

† উন্নতির সংস্কার সকল শিক্ষা হইতে উদ্ভূত। শিক্ষার যত বৃদ্ধি হইবে ততই লোকের মন উন্নতির দিকে চালিত হইবে, কারণ যত দিন লোকের মনে শিক্ষার জ্যোতি প্রবেশ না করে তত দিন উহা জড়তাময় থাকে। উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই প্রথমে শিক্ষার আলোক প্রকাশিত হয়।

অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত তখন তাহারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের স্বত্ব হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলেন, ক্রমে অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, তৎপরে মধ্য শ্রেণীর লোকেরা ক্রমে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এইরূপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। ফরাসি বিপ্লব সম্পূর্ণাবয়ব হইতে কত সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই। উহার কার্য্য প্রথমে কাউণ্ট অব প্রোভেন্স (Count of provence), ডিউক অব অর্লিয়ানস, (Duke of orleans) এবং ডিউক ডিএগিলেন (Duke d' Aiguillon) কর্ত্তৃক আরম্ভ হয়, ইহাঁরা উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন। তাহার পর ইহাঁরা পরিত্যাগ করিলে ঐ কার্য্য লেফেট (Lafayette) বেলি (Bailly) এবং রোল্যাণ্ড (Roland) হস্তে লইলেন। ইহারা মধ্যশ্রেণীর লোকছিলেন। অবশেষে ঐ কার্য্য নিম্ন শ্রেণীর লোক ম্যারাট (Marat) রবেসপিয়ার (Robespierre) সেণ্ট জষ্ট (St just) প্রভৃতি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইংলণ্ডের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও দেখা যায় যে প্রথমে উচ্চ, তৎপরে মধ্য অবশেষে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে ব্যারণদিগের ম্যাগনা চার্টা (magna charta) তৎপরে মধ্য শ্রেণীর রিফর্ম বিল (Reform bill) অবশেষে আধুনিক নিম্নশ্রেণীর চালিত চার্টারের (charter) অন্দোলন। গুপ্তসমাজ সকলের ইতিহাস পরীক্ষা করিলেও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। ইলিউমিনেটি (Illuminati) কার্ব্বনেরী (Carbonari) টগেণ্ডবণ্ড (Tugendbund) প্রভৃতি যে সকল গুপ্ত সমাজ অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা উচ্চশ্রেণীর লোক দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যত্রে যে সকল গুপ্ত সমাজ অধুনা সৃষ্ট হইয়াছে সে সকল প্রায় নিম্নশ্রেণী সম্ভূত। এক এক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, তাহার অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীর অন্তঃকরণে উক্ত ক্ষমতা পাইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ বলবৎ হইয়া উঠে। এই প্রকারে উহা সর্ব্বনিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত অবরোহণ করে। সাধারণ লোক মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যতই বিস্তার হইতে থাকিবে ততই গুপ্ত সমাজের সৃষ্টির এবং উহার আশঙ্কা পূর্ণ ভাব ক্রমশই হ্রাস হইতে থাকিবে।

শ্রী অঘোরনাথ দত্ত।

বসন্তের কবিতা।

কবিতার সৌন্দর্য্য সকলে অনুভব করিতে পারে না—সকলে চাহেও না। আত্মম্ভরিতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বাস করিয়া যাহাদের হৃদয়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে তাহারা কবিতাকে প্রলাপের হিসাবে দেখে—ভাব আয়ত্ত করিতে না পারিয়া গালি দেয়। কিন্তু তাহাদের কথায় কবি গান বন্ধ করিতে পারেন না—যেমন গাহিয়া যান সেইরূপই গাহিবেন। বসন্তের কবিতার মৃদু স্পর্শন অনুভব করা তার্কিকের সাধ্যাতীত। মলয়ানিলের মত তাহা আমাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া যায়—আমাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে। প্রশান্ত সাগর বক্ষের উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া যেমন বাতাস বহিয়া যায়, বসন্তের কবিতাও সেইরূপ আমাদের স্থির হৃদয়ের উপর দিয়া নীরবে বহিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ের উথলিতভাব ঈষৎশিহরণে প্রকাশ পায়। বসন্তের কবিতায় ঝঞ্ঝা ঝটিকা নাই। মেঘ মুক্ত নির্ম্মল আকাশ, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জ্যোৎস্না, মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল তাহার প্রাণ। মেঘ, অন্ধকার বসন্তের কবিতায় থাকিবে কিরূপে? বসন্তে তেমন মাতামাতি দেখা যায় না—কিন্তু তাহার মৃদু স্পর্শনগুলি অতি সুন্দর।

বর্ষার কবিতার মধ্যে মধ্যে একটা একঘেয়ে ভাব আছে। এই একঘেয়েত্ব সময় সময় এমনি বিরক্তিকর বোধ হয় যে ঐখানেই পুঁথি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে। সাত আট পৃষ্ঠা ধরিয়া হয়ত টিপি টিপি বৃষ্টিই পড়িতেছে—আকাশের মুখভার—পৃথিবী বিষণ্ণা—এক গৃহের দুই কোণে যেন দুই জনে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। পাঠকের মন এরূপ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়ে—সকল উদ্যম, উৎসাহ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ষার কবিতায় যে মহান্ সৌন্দর্য্য আছে তাহা তখন উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু আষাঢ়ারম্ভে যখন নূতন ছন্দে, নূতন সুরে বর্ষা গানারম্ভ করে তখন হৃদয় কিছুতেই নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। বর্ষার তালে তালে হৃদয়ও নাচিয়া উঠে।

বসন্তের কবিতায় পদবিন্যাস অতি চমৎকার। কথাগুলি ছোট ছোট কিন্তু মর্ম্মস্পৃক্। জয়দেবের সহিত বসন্তের কবিতার কোমলতা তুলনা হইতে পারে। 'কোকিল কূজিতকুঞ্জকুটীর' বসন্তেরই সৃষ্টি। জয়দেব বসন্তের কবিতার হেলিয়া দুলিয়া বাতাসের সঙ্গে টলমল করিয়া যাওয়ার ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিতাও হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বসন্তের কবিতা ফুল সৌরভে, জ্যোৎস্নালোকে, ভাসিয়া বেড়ায়। তাহা ক্রমে ক্রমে আকাশে উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধগামী পক্ষীর গতির সহিত বসন্তের কবিতার গতির অনেক সাদৃশ্য আছে। বর্ষার কবিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে—বৃষ্টির ভারে পৃথিবী হইতে অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। বসন্তের গান অনেক উচ্চে উঠে।

কিন্তু বর্ষার কবিতায় তত্ত্ব কথা অধিক আছে বলিয়া মনে হয়। বর্ষার দার্শনিক কবিতা। রূপকের প্রাদুর্ভাবও বর্ষায়। বসন্তের কবিতায় মৃদুস্পর্শনের ভাব অনেকটা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে ভাব অন্তঃসলিলা নদীর মত হৃদয়ে বহিতে থাকে। বর্ষার ভাব অন্তঃসলিলা নহে বটে—বসন্তের মত স্থায়ীও নহে। বৃষ্টিতে খাল বিল ভরিয়া উঠে—বৃষ্টি ধরিয়া যায় খালবিলও শুকাইয়া আসে। বর্ষার কবিতার এই ভাব। গাম্ভীর্য্য কিন্তু বর্ষার কবিতায় অধিক। ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গা যেমন কূলে কূলে পরিপূর্ণ—গম্ভীর, বর্ষার কবিতাও সেইরূপ গম্ভীর। বর্ষার ছন্দ মহাকাব্য রচনায় উপযোগী। বসন্তের ছন্দ গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত। বসন্তে বীর রসের সংস্রব নাই—বর্ষায় বীর-রসই অনেক স্থলে আসর জমকাইয়াছে। বসন্তকে দেখিলে আমাদের সহসা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ষাকে সহজেই শৈব মনে করিয়া লই।

বসন্তের কবিতায় বিবাহের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায়। সে বাঁশীর সুর উদাস বটে, কিন্তু তাহাতে মিলনের গানই বাজে। বর্ষার বাঁশীর স্বরও কেমন ভিজা ভিজা ঠেকে। কেমন ষোলকলার মিলন উপলব্ধি করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বীররসের অবতারণায় মিলনের ভাব অনেকটা মারা গিয়াছে। বর্ষার নায়কের একটা প্রধান দোষ—দাপাদাপি। বসন্তের নায়কের মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস বর্ষায় কোথায়? বর্ষার নায়ক কাঁদিয়াই আকুল, ক্রোধেই অজ্ঞান। সে অনেকটা খামখেয়ালী বলিতে হইবে।

বর্ষার কবিতায় কেহ না মনে করেন যে কোমল রস নাই। বর্ষার কবিতায় কোমল রসের অভাব নাই কিন্তু বসন্তে বীররসের অভাব আছে। বর্ষার সহিত বসন্তের মজ্জাগত প্রভেদ এই যে, বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে—বসন্ত আমাদিগকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্ষায় আমরা জানালা খুলিয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া থাকি—বসন্তে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়া গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি। বসন্ত ও বর্ষার কবিতা তুলনা করিয়া আমরা আরও বলিতে পারি—বসন্ত অদ্বৈতবাদী, বর্ষা দ্বৈতবাদী।

বসন্তের কবিতায় উদাসভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। বসন্তের বিরহ গান গুলিও কেমন উদাস ভাবে ঢালা। বর্ষার কবিতায় উদাসভাবের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বোধ হয় বর্ষার বিরহে অভিশাপ লুকান থাকে। বসন্তে উদাস ভাবেরই প্রাধান্য। বর্ষার গানে একটা জমাট্ ভাব আছে। বসন্তের গানে ততটা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বসন্তের গান খুব হৃদয়স্পর্শী। সুর হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, বসন্ত বর্ষাপেক্ষা চড়ায় উঠিতে সমর্থ।

বর্ষার কবিতায় অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনেক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। বসন্তে স্মৃতির আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করা যায়। স্মৃতির সহিত বসন্তে সহস্র বিস্মৃতি জড়াইয়া থাকে। বর্ষায় স্মৃতি বিস্মৃতিতে এতটা মেশামেশি থাকে না। এই জন্যই বোধ করি অনেকে বসন্তকে মিলনের কাল বলিয়া থাকেন।

বর্ষা ও বসন্তের কবিতার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রভেদ বুঝা যাইবে। কিন্তু প্রবন্ধ বাড়াইবার আর আবশ্যকতা নাই। উপসংহারে আমরা বর্ষার কবিতাকে গোলাপের সহিত এবং বসন্তের কবিতাকে চম্পকের সহিত তুলনা করিতে পারি। বসন্তের কবিতা—যৌবনের প্রথম বিকাশ। বর্ষার কবিতা—যৌবন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবন নহে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেলি গার্ড।

১৮৫৭ সালে ভারতে যে মহা বিপ্লব ঘটিয়াছিল—যাহার ভয়ানক আলোড়নে ইংরাজ রাজত্বের গভীরতম ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল, যাহার জ্বলন্ত অগ্নিতে শত শত ইংরাজ নরনারী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাহা সমস্ত ইংরেজাধিকৃত ভারতেতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা, লক্ষ্ণৌএর "বেলি গার্ড" ভারতের একাংশে তাহারই একমাত্র ক্ষুদ্রতম কীর্ত্তি। দিল্লী, মিরাট, কানপুর, এলাহাবাদে যে ভীষণ অনল প্রদীপ্ত ভাবে পূর্ণতেজে কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া গর্জ্জিয়াছিল তাহারই একটী স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্ণৌয়ের বক্ষে পড়িয়াছিল সেই স্ফুলিঙ্গ কণা হইতে ক্রমশ যে ভীষণ কাণ্ড বাধিয়া উঠে লক্ষ্ণৌএর বেলীগার্ড আজও অতীতের সেই বিভীষিকাময় স্মৃতির একমাত্র সাক্ষ্য স্বরূপ ভগ্নাবশিষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান। কানপুর প্রভৃতিস্থলে ইংরাজ নিজ হস্তে এই ভয়ানক বিপ্লবের স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু অযোধ্যায় তাঁহাদের সে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সিপাহীরা আগ্নেয় অক্ষরে বেলীগার্ডের উপর যে সমস্ত ভয়ানক ঘটনার মুদ্রাঙ্কন করিয়াছে—তাহার উপর ইংরাজের কোন কিছু বাড়াইবার বা কমাইবার আবশ্যকতা হয় নাই।

ইংরাজের রাজনৈতিক ইতিহাসে "বেলীগার্ড" রেসিডেন্সি ভবন বলিয়া কথিত, সাধারণ লোকে ইহাকে "বেলীগার্ড" বা বেলী গারদ বলিয়া জানে, নবাব আমলে এইস্থানে রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাস স্থান ছিল। নবাবী আমলের রেসিডেন্সী একটী বা দুইটী বড় বাড়ী নহে, তাহাকে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা-ময়ী নগরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোমতীতীরে এক অত্যুচ্চ ভূমি খণ্ডের উপর "বেলিগার্ড" সংস্থাপিত। পূর্ব্বে এই স্থানে নবাব আসফ উদ্দৌলার বিলাস কানন ছিল, রেসিডেণ্ট সাহেবের ও তাঁহার দল বলের উপযুক্ত বাসস্থান নাই দেখিয়া তিনি এই স্থানে তাঁহাদের বাস করিতে আদেশ

করেন। সেই সময় হইতে যিনি অযোধ্যার নবাব-সরকারে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া আসিতেন—তিনিই এই রাজভোগ্য-প্রাসাদে বাস করিতেন। অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে এইস্থান চিফকমিশনার সাহেবের হেডকোয়াটার হয়। ইহার ভিতর দস্তুর মত দোকানপাট, বাজারহাট, সাধারণ কার্য্যালয়, খাজনাখানা, দপ্তরখানা, রেসি-ডেন্সি বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপিত ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সমস্ত লোপ হইয়াছে—সেই বৈজয়ন্তী শোভার পরিবর্ত্তে আজ রেসিডেন্সী ভবন শ্মশানময়ী ভাব ধারণ করিয়াছে।

রেসিডেন্সীর আর একটা নাম "বেলীগার্ড" ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলী-গার্ড নাম হইবার কারণ এই, বাদসাহ গাজী উদ্দিনের সময়ে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলী একদল অতিরিক্ত সৈন্য নিযুক্ত করিয়া এখানকার খাজনাখানা সুরক্ষিত করেন, তাহার পর হইতেই বেলিসাহেবের নামানুসারে রেসিডেন্সি বেলীগার্ড নাম পাইয়াছে। সাধারণ লোকে বেলীগার্ড বলিলেই রেসিডেন্সি ভবন বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়। আজকাল বেলীগার্ডের আর সে অনুপম শোভা নাই—যেখানে পূর্ব্বে অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী প্রাসাদ ছিল—এক্ষণে তথায় কেবল মাত্র তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানে বলদর্পিত ইংরাজসৈন্যেরা সঙ্গীনহস্তে দৃঢ়পদবিক্ষেপে প্রহরীর কার্য্য করিত, আজ কাল সেইস্থল শৃগাল কুক্কুরের বিলাস স্থল হইয়াছে। যেখানে সর্ব্বদাই সমুদ্র তরঙ্গোচ্ছাসের ন্যায় আনন্দ কোলাহল বহিত, সেখানে নিস্তব্ধতা আসিয়া একাধি-পত্য করিয়াছে। যেস্থানে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এক সময়ে ক্রীড়া কৌতুকে, আমোদে উল্লম্ফনে হাস্য রহস্যে কালক্ষেপণ করিয়াছিলেন আজ সেইস্থানে তাঁহাদের দেহ স্থিরভাবে সমাধি গর্ত্তে বিশ্রাম করিতেছে। যেস্থানে ইংরাজ সৈনিকের সামরিক তীব্র তুর্য্য নিনাদ, অদুর প্রবাহিতা কলনাদিনী গোমতীর অস্ফুট মর্ম্মবেদনার সহিত মিশিয়া গিয়া সুদূরে লয় প্রাপ্ত হইত, আজকাল সেইস্থানে বৃক্ষ পত্র সঞ্চালনের ও পদস্পৃষ্ট ভূপতিত পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। যদিও ইংরাজ ইহার মধ্যে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ ও সুদৃশ্য লতা বল্লরী-সংগঠিত মনোহর পুষ্পোদ্যান স্থাপন করিয়া ইহাকে মনুষ্য সমাগমের উপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন তথাপি ইহা দেখিলেই মনে এক বিসদৃশ ভাবোদয় হয়—বোধ হয় যেন শ্মশানের মধ্যে ফুল ফুটিয়াছে, প্রতপ্ত বালুকামরুতে যেন শীতল জলোচ্ছাস বহিয়াছে।

আমরা যে সময়ে বেলিগার্ড দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে সূর্য্যদেব পশ্চিমাচল গামী হইতেছিলেন। সেই সদাপ্রসন্ন-সুনীল শরদাকাশ-উচ্ছ্বাসিত অস্তমান তপনের ক্ষীণতেজ কিরণ রেখা বেলিগার্ডের ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা রাজি ও স্বচ্ছ বেগবতী তরঙ্গময়ী প্রাচীনা গোমতীর বক্ষের উপর ছাইয়া পড়িতেছিল। আবার কখনও বা মর্ম্মর-প্রস্তরময় কবর চূড়ায় উঠিয়া তাহাকে হেমকান্তি বিশিষ্ট করিতেছিল।

আমরা ধীরে ধীরে মহাত্মা স্যরহেন্‌রি লরেন্সের কবরের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। এতবড় একটা লোকের কবরে জাঁক জমক, বা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। সামান্য সৈনিকের বা সেনাধ্যক্ষের কবরের উপর তাহাদের গুণগরিমা বর্ণনা করিয়া কত কি লেখা রহিয়াছে। কিন্তু সার হেন্‌রির কবরে কেবল "Here lies sir Henry Lawrence who died to do his duty" এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে। স্যর হেনরী বড় উন্নতমনা, সরলপ্রকৃতি, তীক্ষ্ণদর্শী শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার ন্যায় উচ্চমনা ইংরাজ অল্পই ভারতে আসিয়াছে। তিনি মরিবার পূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন "আমার সমাধির উপর এই কয়েকটী কথা ছাড়া যেন অন্য কিছু লেখা না হয়।" আমরা লরেন্সের সমাধির পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে সেইস্থানে, একজন "পথ প্রদর্শক" Guide আসিয়া দেখা দিল। একতাড়া কাগজ পত্র—সার্টিফিকেট বলিয়াই বোধ হইল; তাহার হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কপালে চন্দন ত্রিপুণ্ডক, জাতিতে ছত্রী বলিয়াই বোধ হইল। সে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে করিয়া বেলীগার্ডের সকলস্থান দেখাইয়া আনিবার প্রস্তাব করিল। সে বলিল— তাহার পিতা কোম্পানীর অধীনে সিপাহী ছিল, ছয়মাস ধরিয়া এই রেসিডেন্সির মধ্যে অবরুদ্ধ ভাবে শত্রুদের সহিত যুঝিয়াছিল, কর্ণেল সাহেব তাহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন ইত্যাদি। সে দিন সন্ধ্যা হইয়াছিল, সুতরাং পর দিবস প্রাতে তাহাকে লইয়া আমরা বেলিগার্ড দেখিবার সমস্ত ঠিক্ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে যখন দিক্‌মণ্ডল নবোদিত বালার্ক কিরণ ছটায় রক্তিমাভ হইয়াছে, মৃদুল প্রভাত বায়ু সেই উদ্যানস্থ পুষ্পিতাগ্র লতিকাগুলি, সমুন্নত বিটপীশির, ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা চূড়া লঙ্ঘন করিয়া বেড়াইতেছে তখন আমরা বেলীগার্ডের সীমামধ্যস্থ হইলাম। রামশরণ (আমাদের গাইড) সেই অবরুদ্ধ স্থানের ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা ও অন্যান্য স্মরণীয় স্থলগুলির যেরূপ পরিচয় দিয়াছিল আমরা তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার পর লক্ষ্ণৌএর অবরোধ "ও সিপাহি বিদ্রোহ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ দিব।

বেলীগার্ড গেট—এইস্থান রেসিডেন্সির প্রকাশ্য প্রবেশতোরণ ছিল, গেটটী অতিশয় উন্নত ও গোলাকৃতি সুবিস্তৃত খিলানে নির্ম্মিত, কিন্তু সিপাহীর কামানে ও বন্দুকের গোলাগুলিতে তাহা অতিশয় বিকৃত ভাব ধরিয়াছে। সুগঠিত মুখমণ্ডল, সংক্রামক বসন্ত চিহ্নে চিহ্নিত হইলে দেখিতে যেরূপ কদর্য্য ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায় বেলী গার্ডের নয়নরঞ্জক অত্যুন্নত কারুকার্য্যময় তোরণ সিপাহীর অস্ত্রে সেইরূপ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গেটটীর কার্ণিসের কোন অংশ হয়ত গোলার আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে—আবার সেই ভগ্ন অংশের উপর দিয়া বন্য উদ্ভিদ শিকড় গাড়িয়াছে—কোন স্থানে বা বৃহৎ জ্বলন্ত গোলা পড়িয়া দেয়ালের চূর্ণ সুরকীর জমাট গাত্র খসাইয়া

দিয়াছে আবার কোনও স্থল ভেদ করিয়া গোলাকার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বড় বড় গোলার আঘাত ছাড়া গেটটীর আদ্যোপান্ত গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। তোরণটীর আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার এমন কোন স্থান নাই—যে স্থানে সিপাহিদিগের আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষ্য পড়ে নাই—ফলতঃ এই গেট দেখিয়াই লক্ষ্ণৌ অবরোধ সময়ে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষ উপলব্ধি হয়।

গেট পার হইয়াই ডানদিকে খাজনাখানা, বামদিকে ডাক্তর ফেরার সাহেবের বাটী। নবাবের নিকট হইতে কোম্পানীর যে সমস্ত টাকা আদায় হইত বা কোম্পানীর নির্জের রাজ্যাংশ হইতে যাহা আদায় হইত তাহাই এই স্থানে খাজনাখানায় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া রক্ষিত হইত। ইহা একটী সুবিস্তৃত ও বিশেষ মজবুত লম্বা-দালান, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ৫।৭ হাত গভীর এবং পাকা করিয়া গাঁথা। রামচরণ বলিল—যুদ্ধের সময় এইখানে সৈনিকদিগের রসদ ঘর হইয়াছিল—এইস্থান টাকার পরিবর্ত্তে, গম, আঠা, ও চাল ডালে পরিপূর্ণ ছিল।

ডাক্তার ফেরার সাহেবের বাটীটী একটী সাহেবী ধরণের বৃহৎবাড়ী। তোরণ দ্বারের নিকটস্থ বলিয়া ইহার উপরও অগ্নিবর্ষণ হইয়াছিল। বাড়ীগুলি কেবল মাত্র খাড়া রহিয়াছে—ছাদের ইট কড়ি বরগা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে অখণ্ড বিস্তৃত নীলাকাশ ইহার মস্তকশোভা করিয়া রহিয়াছে। বাড়ীটী একতালা হইলেও ইহার নীচে একটী "তয়-খানা" বা "ভূমধ্যস্থ গৃহ" আছে। লক্ষ্ণৌএ তয়খানাওয়ালা বাড়ীর প্রচলনটা উত্তর-পশ্চিমস্থ অন্যান্য নগর অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়। "তয়খানা" নির্ম্মাণ প্রথমে নবাবদিগেরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু কালক্রমে এই রোগটী সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার ফেরার সাহেব রেসিডেন্সির বড় ডাক্তার ছিলেন বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে বড়ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। ফেরার সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও এই বাড়ীতে তাঁহার সহিত বাস করিতেন তিনি একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারি কর্ম্মচারী ছিলেন। ফেরার সাহেবের দালানেই কমিসনার স্যর হেন্‌রি লরেন্সের মৃত্যু হয়। যেখানে তিনি মরিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই একটী প্রস্তরে Here died Sir Henry Lawrence! বলিয়া লেখা আছে। স্যর হেনরির মৃত্যুর বিবরণ অতিশয় হৃদয়দ্রবকারী। তিনি কতদূর সরকারী নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, কর্ত্তব্যের অপেক্ষা স্বীয় জীবনকে কতদূর হেয়জ্ঞান করিতেন, বিপদে, রোগে, শোকে যন্ত্রণায় কি প্রকার অটল থাকিতেন, তাহা তাঁহার মৃত্যু ঘটনা হইতে বিশেষ প্রমাণিত হয়। উপযুক্ত স্থলে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে কিন্তু এই স্থলে কথা প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের শেষ কাহিনীটি বলিব।

লক্ষ্ণৌএ সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বসূচনা দেখিয়া স্যর হেনরি রেসিডেন্সের চারিদিক

উচ্চপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া আবশ্যকীয় স্থলে ব্যাটারি স্থাপন করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রতিদিনই, কি দিবসে কি রাত্রে, নিজে পদব্রজে চারিদিকে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। গভীর রাত্রে সকলেই হয়ত পালাক্রমে বিশ্রাম করিতেছে কিন্তু তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই—তিনি হয়ত ছাদের উপর উঠিয়া শত্রুর গতিবিধি নির্ণয় করিতেছেন—অথবা গোপনে ব্যাটারির নিকটে যাইয়া কে কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা দেখিতেছেন। যে সময়ে তিনি অযোধ্যার কমিসনারী পান তখন তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল—সেরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থায় লোকে অবসর ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর অনুরোধে স্যর হেন্‌রি নিজ শরীরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীরা রেসিডেন্সির চারিদিক অবরোধ করিয়াছে কাহারও আর বাহির হইবার উপায় নাই—২সরা জুলাই রাত্রে তিনি তাঁহার প্রাইবেট্ সেক্রেটারি মেজর বুপার্ট ও ডিপুটী এডজুটাণ্ট কাপ্তেন উইলসন, তিনজনে, রেসিডেন্সির একটী নির্জন দ্বিতল কক্ষে বসিয়া কলিকাতার ও এলাহাবাদের চিঠিপত্রগুলি পড়িতেছেন ও তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মন্ত্রণা করিতেছেন এমন সময়ে সহসা একটী গোলা আসিয়া সেই দ্বিতল গৃহের কার্ণিশের নিম্নস্থান ভেদ করিয়া মহাশব্দে অগ্নুদ্গার করিয়া সেই গৃহমধ্যে পতিত হইল, উইলসন সাহেবের উপর দিয়াই সেই আঘাতটা কাটিয়া গেল। সকলে স্যর হেন্‌রীকে একবাক্যে বলিলেন "আপনি এস্থান ত্যাগ করুন, শত্রু আপনার এই গৃহে অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দেখুন। আপনি অন্য গৃহে স্থান পরিবর্ত্তন করুন" কিন্তু স্যর হেনরি বলিলেন "কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ জীবন যায় যাক্ তাহাতে ক্ষতি নাই—আমি কোন মতেই এই স্থান ত্যাগ করিব না, এই স্থানে হইতে শত্রুর গতিবিধি আমি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। অন্য গৃহে গেলে আমার এ সুবিধাটুকু লোপ হইবে।" কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করে—তাহার পরদিন মধ্যাহ্নে স্যর হেন্‌রি শয্যার উপর শুইয়া কতকগুলি সরকারী কাগজ পত্র পড়িতেছেন—এমন সময়ে পূর্ব্বদিনের বিভিন্ন স্থানের পার্শ্ব দিয়া আর একটী জ্বলন্ত গোলা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ভূমে পড়িয়া ফাটিয়া গেল—এবং সেই ভগ্নাংশের একখণ্ড তাঁহার পায়ে বিঁধিয়া গেল। নিকটে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র জর্জ লরেন্স বসিয়া ছিলেন, তিনি এই ভয়ানক ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্যর হেনরির জীবনের উপর লক্ষ্ণৌবাসী-অবরুদ্ধ ইংরাজগণের জীবন নির্ভর করিতেছে—তাঁহার মৃত্যুতে, সকলেরই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। গোলার শব্দে অন্যান্য সকলে ছুটিয়া আসিল—তাহারা আসিয়া যে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিল তাহাতেই তাহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—স্যর হেনরি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন—তাঁহার যাতনাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদে সেই গৃহপূর্ণ হইয়া যাইতেছে—অজস্রধারে

তাঁহাকে সেই ঘর হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, অন্য ঘরে লইয়া গিয়া ফেরার সাহেবের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল, সেই ভীষণ জ্বলন্ত গোলার আঘাতে তাঁহার বামপদের জানুদেশের নিম্ন ভাগ সমস্তই বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—ইহার পর রেসিডেন্সি ভবন হইতে ডাক্তার ফেয়ারের পূর্ব্ব কথিত গৃহে তাঁহাকে আনা হয়। তখনও স্যর হেন্‌রী বিলক্ষণ সজ্ঞান, সেই ভীষণ যাতনা-পীড়িত হইয়াও তিনি পাদরীর নিকটে ধর্ম্ম-কথা শুনিতে লাগিলেন—ইহার পর এক ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র ভ্রাতা ভগিনীদিগকে এই শোচনীয় সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভ্রাতষ্পুত্র লরেন্স সেই খানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে আমি পুত্র-নির্ব্বিশেষে ভালবাসি পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—তাহারা সকলে সেই কক্ষে আসিয়া জুটিল—স্যর হেন্‌রি তাহাদের সমক্ষে বলিলেন "ভাই সকল! লক্ষ্ণৌএ তোমরা যে বিপদে পড়িয়াছ, পরমেশ্বরের হস্ত ভিন্ন আর তাহা হইতে রক্ষার কোন উপায় নাই, সকলেই প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিবে, দেখিও যেন ব্রিটিশ রক্ত কলঙ্কিত না হয়। আমি আমার অবর্ত্তমানে মেজর ব্যাঙ্ক্‌স্‌কে তোমাদের কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলাম আর আমি তোমাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনোদ্দেশে কত কি মন্দ কথা বলিয়াছি তোমরা সকলে আমাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মার্জ্জনা না করিলে আমি সুখে মরিতে পারিব না।" তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া যাহারা নিকটে ছিল সকলেই বালকের ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অনেকে আহত পা খানি কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ফেরার বলিলেন তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবে, চাই কি তাহাতে সহসা প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

দুই দিন অনবরত কষ্ট ভোগ করিয়া ৪ঠা জুলাই ফেয়ার সাহেবের দালানে স্যর হেন্‌রীর প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ সাধারণে জানিলে হীনোৎসাহ হইবে বলিয়া এই সংবাদ গোপন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ অজানিত ভাবে সমাধিস্থ করা হইল। এত কৌশলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইল যে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পরেও সকলে জানিত যে স্যর হেন্‌রির আদেশে সমস্ত কার্য্য চলিতেছে।

ক্রমশঃ।

দারজিলিং।

একমাস মাত্র তোমাকে চিঠি লিখি নাই—কিন্তু মনে হইতেছে সে যেন আজ কতদিন!

আমরা দেখিতেছি সময় দিয়াই সময় গণিনা, দিন কাটিলেই আমাদের কাল কাটে না, পরিবর্ত্তনরূপ যে সকল ঘটনাস্রোত আমাদের জীবনে বহিয়া যায় সেই স্রোত গণিয়াই আমরা কালের দূরত্ব অনুভব করি।

মানুষের জীবনে পরিবর্ত্তনের বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, দিন রাত সে আপনার কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, তবে কিনা মৃদুবাহী নদীর মত এত ধীরে ধীরে এত মৃদু ভাবে মানুষের জীবন-পাড়কে আঘাত করিয়া তাহা হইতে এক একটি অণু পরমাণু সে খসাইয়া লইতেছে—যে সে ক্ষয় সে পরিবর্ত্তন সহসা অনুভব করা যায় না, তাহা বুঝিতেও সময়ের আবশ্যক। কিন্তু এমন পরিবর্ত্তনও আছে নিমেষের মধ্যে যাহাতে মনুষ্যের জীবনের গাঁথনি পর্য্যন্ত সহসা আলোড়িত হইয়া উঠে—তাহার নিকট আর কালের মান্য নাই। মেরিয়া এন্টয়নেটের ৩৬ বৎসর বয়সেও যাহা হয় নাই এক রাত্রির মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার করুণাময় রাজ্যে কেন এত অমঙ্গল, কেন এত দুঃখ তাপ? একটি পুণ্য হৃদয়ের নির্ম্মল প্রেমানন্দ হরণ করিয়া, একটি স্নেহময়ী মাতার কোল শূন্য করিয়া এই অনন্ত বিশ্বের কি ক্ষতিপূরণ হয় কে জানে? হউক তাহাই হউক, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হউক। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মঙ্গল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত, কিন্তু প্রীতির নয়নে, ভক্তির নয়নে, বিশ্বাসের নয়নে দেখিলে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অনন্ত মঙ্গল রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই, অমঙ্গল মঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা মাত্র, দুঃখ তাপ মনুষ্যের মনুষত্ব বিকাশক, শান্তির পথ প্রদর্শক মাত্র। তাঁহার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দ ত তিনি আমাদের জন্য সর্ব্বদাই রাখিয়া দিয়াছেন কিন্তু বিপদের অন্ধকারে তাঁহার প্রেমজ্যোতি যেমন ফুটিয়া উঠে, দুঃখতাপের মধ্যে তাঁহার শান্তি যেমন অনুভব করি—এমন অন্য কোন সময়ে? হউক, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হউক।

সেই ফুলকলিকার বিষাদ-কোমল-মুখখানির ধৈর্য্যভাবে তাহার সেই কচি প্রাণের আত্মবিসর্জ্জনে কোন সৌন্দর্য্য কোন স্বর্গীয় ভাব না ফুটিয়া উঠিয়াছে? মর্ম্মের অশ্রুজল মর্ম্মে চাপিয়া, অন্যের কাজে অন্যের সুখ স্বচ্ছন্দতায় ছায়াখানির মত আপনাকে সে যে মিশাইয়া রাখিতেছে, পিতামাতা স্বামী ভাই বোনের জন্য সে যে নিজের অসুস্থ শরীর মনকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাহাদের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে—তাহার সেই

মধুর বিষণ্ণ স্নেহময়ী মুখখানি দেখিলে পাথরও গলিয়া যায়, সে ছবিতে মূর্ত্তিমতী শান্তি মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা বিরাজ করিতেছে। এমন সর্ব্বজনে স্নেহময়ী, সুবুদ্ধি সুবিবেচক সহিষ্ণু বিনম্র নিঃশব্দে-গৃহকার্য্য-পরায়ণা—একালের যেন উপকথা।

* * * * *

থাক্; ও কথা এইখানেই থাক, আমার এ পূর্ণ হৃদয়ে ও কথার ও ভাবের অন্ত নাই, কিন্তু বেশী যখন বলিবার থাকে, তখন অল্পেতেই শেষ করা ভাল।

* * * *

তোমাকে যখন চিঠি লিখি তারপর থেকে আমাদের এখানকার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন আমরা এখানে যে কয়জন ছিলাম তার মধ্যে কেহ কেহ বাড়ী গিয়াছেন, আবার বাড়ী হইতেও কেহ কেহ এখানে আসিয়াছেন। আমাদের সে পড়া শুনার মজলিস অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে। আগেকার চেয়ে এখন আমরা ঢের বেশী বেড়াইয়া বেড়াই, লোকে বলে আমাদের পা হইয়াছে। তবু কিন্তু বেড়াইয়া সাধ মেটেনা, মনে হয় সারাদিনই বাহিরে থাকি, পর্ব্বতের মুক্তদৃশ্যের মধ্যে এমন একটা উদার মহান ভাব আছে, যে শোক তাপের গুরু ভারও সেখানে লঘু হইয়া আসে, প্রাণের ক্ষুদ্রতা—সেই অনন্তের মধ্যে যেন আর দাঁড়াইতে পারে না, সেই অনন্তের মধ্যে অনন্ত প্রসারণ লাভ করিয়া হৃদয় যেন অনন্ত হারা-হৃদয়ের সঙ্গে একত্ব লাভ করে। এই অনুভবে যে পবিত্র পুলক, যে একটি কোমল ধীর আনন্দ পাওয়া যায় তাহা কিন্তু যেমন সহসা পাওয়া যায়—তেমনি সহসা হারাইয়া ফেলিতে হয়,—এই আনন্দ ধরিয়া রাখিবার কৌশলই বুঝি ঋষিরা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার নামই বুঝি যোগানন্দ! কিন্তু আমার মনে হয়—সংসারী লোকের হৃদয়ে দুঃখ তাপের মধ্য দিয়াই এই আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠে, দুঃখ তাপই মনুষ্যের মনুষত্ব বিকাশ করে—জীবনের জীবনত্ব গঠিত করে।

* * * * *

এখানে আসিয়া যাহা দেখিবার আমরা প্রায় সকলি দেখিয়াছি।

আমাদের বাড়ী হইতে অনেকটা দূরে—একটা নীচের পাহাড়ে গিয়া এখানকার প্রধান ঝরণা—ভিক্টোরিয়া ওয়াটর ফল্‌স্ দেখা যায়। এখানকার লোকেরা এই ঝরণাকে কাক-ঝোরা বলে। আমরা দুই তিন দিন সেখানে গিয়াছিলাম, সে স্থানটির কি একটা রুদ্র গম্ভীর সৌন্দর্য্য—এমন দৃশ্য দারজিলিংএর আর কোথায় দেখি নাই। আমরা পাশের রেলিং দেওয়া একটি রাস্তায় দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, আমাদের পদতলে পাহাড়—বামে পাহাড়, ডাহিনে পাহাড়—আর সম্মুখের সুদূর উচ্চ পাহাড়-গাত্র দিয়া একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তুষার শ্বেত জল-স্ফুলিঙ্গ-রাশি বিকীর্ণ করিয়া সহস্রধারায় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নীচের শত সহস্র বড় বড় পাথর চাঙ্গড়ার উপর আসিয়া পড়িতেছে। তাহার অবিশ্রান্ত ঝম ঝম শব্দে চারিদিকের সেই গম্ভীর ভাব কি এক মহানতর ভাবে

পরিণত হইতেছে। জলের তোড়ে তোড়ে এই জল প্রণালীর গাত্র, নীচের পাহাড় গাত্র দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এই বিদীর্ণ পাহাড়ের উপরে ঝরণার প্রণালীর পাশে ভেকাকৃতি একখানি প্রকাণ্ড ভগ্নপাথর বসিয়া আছে—কত দিন হইতে এই প্রস্তর ভেক এইরূপ একাসনে জলধারার দিকে উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া কে জানে? জল প্রণালীর দুই দিকের পাহাড় ঘন বনাচ্ছন্ন—বন ফুলে ফুলে ফুলময়। শুনিলাম, কখনো কখনো ঐ বনের মধ্যদিয়া ভাল্লুক বাহির হইয়া থাকে!

এখানকার একটি পাহাড়ে খেজুর গাছের মত বড় বড় ফার্ণ তরু দেখিলাম, দারজিলিং রেল পথে এরূপ গাছ অনেক দেখা যায়।

আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝরণা দেখিতে লাগিলাম, তাহার জলকণা উড়িয়া উড়িয়া আমাদের অল্প অল্প আর্দ্র করিতে লাগিল। এই ঝরণা দেখিয়া বম্বের অযোণ্টা পাহাড়ের গুহা দেখিতে গিয়া যে একটি ঝরণা দেখিয়াছিলাম আমার মনে পড়িতে লাগিল। অযোণ্টার গুহা একটি বৌদ্ধ কীর্ত্তি। পাহাড় কাটিয়া তাহার মধ্যে উক্ত বিশাল গুহা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই গুহার ভিতর দিকের বাহির দিকের পাহাড় দেয়াল বুদ্ধমূর্ত্তিতে পূর্ণ। মূর্ত্তি গুলি পাহাড়ের গায়ে খোদা। আমরা গুহা প্রদর্শন করিয়া নিকটে পাহাড়ের উপর একটি প্রবহমান সঙ্কীর্ণ জলধারার কাছে বসিয়াছি, দূরের জল প্রপাতের শব্দ আমাদের কাণে আসিতে লাগিল। আমরা দুই জন স্ত্রীলোক দুই জন পুরুষ। তাঁহাদের এক জন প্রথমে সেই শব্দ অনুসরণে জল প্রপাতটি দেখিয়া আসিয়া আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, প্রস্তরস্তূপবিশিষ্ট, কষ্টগম্য সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমরা অবশেষে একটি জলাশয়ের নিকটে আসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ নিভৃত প্রদেশ, প্রায় চারি দিকেই সোজা সোজা উঁচু উঁচু পাহাড়—মধ্যে যা একটু সঙ্কীর্ণ পথ। পাহাড়ের গায়ে একটি গাছ নাই কেবল মৌমাছির চাকে চাকে ভরা—আর একদিকের পাহাড় গাত্র হইতে ঝমঝম করিয়া জল পড়িতেছে—জল পড়িয়া নীচে জলাশয় উৎপত্তি হইয়াছে, জলাশয় হইতে একটি সঙ্কীর্ণ জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রস্তর চাঙ্গড়ার মধ্যদিয়া কে জানে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

আমরা দুই জনে জলাশয়ের তীরে বসিলাম, তাঁহারা দুই জনে স্নান করিতে নামিলেন। বরফের মত ঠাণ্ডা জল, পার হইয়া ওপারে যাইতে তাঁহাদের শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। ওপারে গিয়া নির্ঝরতলেও তাঁহারা একবার মাথা পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র, অতদূর হইতে যে জোরে জল পড়িতেছে তাহাতে মাথা যেন ফাটিয়া যায়। ওপারে নির্ঝর-পাহাড়ের গাত্রে নিম্ন দেশে প্রকাণ্ড গুহা, তাঁহারা স্নানের পর গুহায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন গুহার মধ্যে দু একখানি কম্বল ও দগ্ধ কাষ্ঠ পড়িয়া আছে। কেহ যে এখানে বাস করে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা চীৎ-

কেবল সেই জিজ্ঞাসা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া ভীমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সেই স্থানটির মত রুদ্র ভয়ঙ্কর স্থান আর আমি দেখি নাই। দারজিলিংএর এ দৃশ্য অবশ্য তাহার কাছে কিছুই নয়।

গত বারের পত্রে আমি যে অবজারভেটরি হিলের কথা বলিয়াছি একদিন আমরা ইতি মধ্যে তার উপর উঠিয়াছিলাম।

পাহাড়টা ৫০০ ফুট আন্দাজ উঁচু, ঘূর্ণমান পথে ক্রমাগত অতটা পথ উঁচুতে উঠা আমাদের পক্ষে বড় সহজ কথা নয়, তবুও উঠিয়াছিলাম। এই পাহাড় হইতে চারিদিকের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাছাড়া এখানে দুটি দেখিবারো জিনিস আছে। প্রথম— এখানে দুর্জ্জয় লিং দেবতার অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়—এই পাহাড়ে একটি দর্শনীয় গুহা আছে। কেহ কেহ বলেন, দারজিলিং শব্দ দুর্জ্জয় লিঙ্গের অপভ্রংশ, দুর্জ্জয় লিং দেবের নিকেতন হইতে এই পাহাড়টির নাম দারজিলিং। কিন্তু বাবু শরৎচন্দ্র দাস যিনি তিব্বতে গিয়া ছিলেন তাঁর ভিন্ন মত। তিনি বলেন, তিব্বতী ভাষার দরজিলিং কথা হইতে দারজিলিং হইয়াছে। দরজি অর্থে বজ্র—কিন্তু উক্ত ভাষায় বজ্র শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, লিং অর্থে স্থান, দারজিলিং অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থান। সিকিমে দারজিলিং বলিয়া একটি মঠ এখনো আছে। এখানেও নাকি তাহার একটি শাখা মঠ ছিল। তাই ইহার নাম দারজিলিং। তিনি বলেন বর্দ্ধমানের রাজা এখানে যখন আসেন তখন তিনি দুর্জ্জয়লিং প্রতিষ্ঠা করেন তাহার আগে দুর্জ্জয়লিং বলিয়া এখানে কোন দেবতাই ছিল না।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল। শুনা গেল বর্দ্ধমানের রাজা এখানে আসিবার অনেক আগে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা এখানে আসিয়াছিলেন, তখন সবে ইংরাজ দারজিলিং পাইয়াছে তখন পথ ঘাট এরূপ কিছুই নাই, কিন্তু তিনি নাকি তখনও দুর্জ্জয় লিং দেখিয়া গিয়াছিলেন। আমরাও দেখিলাম, কিন্তু কি দেখিলাম শুনিবে? পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ তলায় সিঁদুর মাখান ক খানা ইট, তাহাই দুর্জ্জয় লিং। সেই দেব নিকেতন রক্তস্রোতে ভাসিতেছে, দেখিয়া শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। শুনিলাম এইমাত্র ছাগ বলি দিয়া লইয়া গিয়াছে।

কতদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—দুর্জ্জয়লিং দারজিলিংএর অধিষ্ঠাতা দেব, মস্ত জাগ্রত দেবতা, আমরা মনে মনে তাহার মস্ত একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যেখানেই কল্পনা সেইখানেই আশাভঙ্গ—এ ধরা কথা। তবে আমাদের সম্মুখে তখনো আর একটা বৃহৎ আশা সুতরাং এ আশাভঙ্গের দুঃখটা আর তখন অনুভব করিতে পারিলাম না। দুর্জ্জয়লিং যেমনই হোক, তখনো গুহা দেখিতে বাকী, গুহাটা যে নিতান্ত একটা দেখিবার জিনিস তাহাতে তখনো কাহারো মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বিশেষ গুহার নাম শুনিয়া অবধি আমার অযোণ্টার গুহাই মনে উদয় হইতেছিল।

তুর্জ্জয়লিং দেখিয়া আমরা গুহা দেখিতে চলিলাম। পথ প্রদর্শক সঙ্গীমহাশয় অগ্রসর হইলেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করিলাম। তুর্জ্জয় লিঙ্গের স্থান হইতে নামিয়া একটা রাস্তায় ঘুরিয়া তিনি পাহাড়ের একটি কিনারায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—এইখান হতে নেমে গুহা পাওয়া যাবে'। দেখিলাম একটি অতি সঙ্কীর্ণ উবড়ো খাবড়ো পাহাড়ের পদ-পথ, দেখিয়া ভারী ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু অতদুর আসিয়া আর পিছান যায় না—প্রথমে আমরা দু একজন সেই অরাস্তা দিয়া আস্তে আস্তে নামিতে লাগিলাম—তখন গুঁড় গুঁড় বৃষ্টি পড়িতেছে, যে রাস্তায় পা দিয়া নামিতেছি ভিজিয়া পিছোল পিছোল হইয়াছে, রাস্তার দুদিকের ঘাসগুলা তাও ভিজিয়া জবজব করিতেছে, আমাদের মাথায় ছাতাও নেই, কেননা ঘাস ধরিয়া পথে কখনো বসিয়া কখনো দাঁড়াইয়া কষ্টে শ্রষ্টে আমরা নামিতেছি, যদি একবার পা পিছলায় ত কর্ম্ম নিকাশ, একেবারে সেই ৫০০ ফুট নীচে গিয়া পড়িব। ঘাস গুলো যে ধরিতেছি তাও ভয়—পাছে জোঁক ধরে! এখানে বড় জোঁক, বিশেষ ভিজে জায়গায়। নানাদিকেই এইরূপ বিপদ—কিন্তু শেষ সুখ পরম সুখ, একমাত্র তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া নায়িকার মত আমরা যখন গহ্বরে নামিলাম তখন? তখন চক্ষু স্থির, দেখিলাম একটা বৃহৎ পতনোন্মুখ প্রস্তর খণ্ডের নিম্নদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—এই গুহা! যাহউক এতখানি হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না ইহা প্রথম গুহা মাত্র, ইহার মধ্যে আর একটি সুদীর্ঘ গহ্বর। গহ্বর অত্যন্ত অন্ধকার, আমরা আলো আনি নাই—সুতরাং তাহাতে নামিয়া আর দেখা হইল না। শুনিলাম প্রবাদ এই, সুড়ঙ্গ বরাবর তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। তুর্জ্জয় লিং যখন দেখিলেন তিনি আর যবন হস্ত হইতে দারজিলিং রক্ষা করিতে পারেন না তখন এই পথে একেবারে তিব্বতে পলায়ন করিলেন। দেবতার অদৃষ্টও অখণ্ডনীয়!

প্রথম-গুহার এক দিক মাথায় ঠেকে এক দিকে বেশ দাঁড়াইতে পারা যায়। মাথার দিকের এক এক স্থান হইতে মাঝে মাঝে এক এক ফোঁটা জল চুঁয়াইয়া আমাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, একটা দুটা চামচিকা হঠাৎ উড়িয়া বাহির হইয়া গেল, আর একটা ঘন অন্ধকার সেই নিম্নের গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের মনে একটা গাম্ভীর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল।

উপরে উঠিবার সময় আরো কষ্টে উঠিতে হইল, ইহার পর তিন চার দিন আমাদের পায় ব্যথা ছিল।

তুর্জ্জয় লিং ছাড়া এখানে আরো দেবতা দেখিয়াছি! ভূটিয়ারা দারজিলিংএর প্রধান নিবাসী। দারজিলিং সহরের কিছু নীচে তাহাদের যেখানে প্রধান আড্ডা তাহার নাম ভূটিয়া-বসতি। আমরা ডাণ্ডি করিয়া সেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ডাণ্ডি বলিতে পালকি বুঝিও না, ইহা কাঠের এক রকম খোলা চৌকি বিশেষ, চৌকির দুই সীমায়

বরাবর লম্বা ডাণ্ডা চলিয়া গিয়াছে তাহাই ডাণ্ডিওয়ালার কাঁধে থাকে। ভূটিয়া বসতির আরম্ভে—বসতির কিছু উপরে—একটা গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির—ইহা একজন লামার স্মরণচিহ্ন, এইখানে তাঁহার দন্তনখ পোঁতা আছে। লামারা কখনো কখনো কাহারো মঙ্গল প্রার্থনায় এই গম্বুজ প্রদক্ষিণ করিয়া উৎসব করেন। কিন্তু ভূটিয়াদিগের আসল দেবস্থান ইহার পরে। এই মন্দির (ভূটিয়ারা মন্দিরকে গুম্‌পা বলে) একটি দ্বিতল গৃহ, নীচে দেবতারা থাকেন উপরে দেব পুরোহিত (লামা) থাকেন। নীচের দেব মন্দিরের সম্মুখে একটি বারান্দা গৃহ, মন্দিরে যাইতে হইলে প্রথমে সেই বারান্দায় প্রবেশ করিতে হয়। বড় বড় পিচকারির মত মন্ত্রচক্র বারান্দায় দেয়ালের গায় সারি সারি দণ্ডায়মান, একটা চক্র ঘুরাইয়া দিলে এক সঙ্গে সমস্ত গুলা ঘুরিয়া যায়। দেব গৃহের দ্বারের মন্ত্রচক্র দুইটা বড় বড় দুইটা ঢোলের মত। এই চক্রের মধ্যে মন্ত্র লেখা আছে—চক্র যত ঘোরে মন্ত্র তত ঘোরে, এইরূপে যত মন্ত্র ঘুরিয়া যায়—তত পাপ ক্ষয় হয়। যখন প্রথমে মন্ত্রচক্রের সৃষ্টি হয়—তখন আমাদের মালা জপার ন্যায় ঈশ্বরে তদ্গত হওয়া ইহার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আমাদের হরিনামের মালা জপিয়া পাপক্ষয় করিতে যেমন মুখের পরিশ্রম ইহাতেও তেমনি হাতের পরিশ্রম মাত্র।

দেব গৃহে মাটীতে ছোট দুইটি অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি দেখিলাম, একের নাম মহাকাল, অন্যের নাম মহাকালী। তাহাদের দেখিতে অনেকটা কালীরই মত, কালীর মত দুই জনেই পুরুষের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, কিন্তু কালী হইতেও তাহাদের চেহারা অদ্ভুত।

মন্দিরের আসল দেবতারা সম্মুখের দেয়ালে একটা কাচের দরজার মধ্যে রক্ষিত। তাহার একটি বুদ্ধ একটি মহাদেব—আর একের কি তাহারা নাম বলিল আমরা কোন মতেই ধরিতে পারিলাম না। ঠাকুর-গৃহে দেয়ালে নানারূপ দেব চিত্র, মেজেতে শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি সজ্জিত। পূজার সময় বাজান হয়। এখানকার বৌদ্ধধর্ম্ম আর কি হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত, তিব্বতেও তাই। ইন্দ্র চন্দ্র মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের ন্যায় বুদ্ধও তাহাদের পূজ্য এই মাত্র। অহিংসা পরমোধর্ম্ম তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের এ সার কথা নহে, লামারা বিবাহ করেন না, কিন্তু মদমাংস তাঁহাদের নিষিদ্ধ নহে। বাঙ্গলা দেশের পণ্ডিত গণ সেদেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তিব্বতী ইতিহাস গ্রন্থে তাহা দেখা যায়, তাহার মধ্যে একজনের নাম তারানাথ।

ভূটিয়ারা নিজে দেবপূজা করে না, ভূতছাড়াইবার জন্য হউক, পাপক্ষয় করিবার জন্য হউক কিম্বা অন্য কোন মানসে হউক তাহাদের পূজার আবশ্যক হইলে তাহারা লামাকে টাকা দেয়—লামা তাহাদের হইয়া পূজা করেন। সুবিধা মন্দনয়!

প্রথম দিন ভূটিয়াবসতিতে আমরা মন্দির লামার দেখা পাই নাই, তাহাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালাদের প্রবোধ বাক্যে আমাদের দুঃখ অনেকটা নিবারণ হইল, লামাকে দেখিবার জন্য আমাদের অতটা উতলা দেখিয়া তাহারা বলিল "সে

লামা তাহাদেরি মত, তাহাকে দেখিয়া আমাদের কি হইবে —যিনি আসল লামা তিনি তিব্বতে।

আর একদিন আমরা লামার দেখা পাইয়া দেখিলাম তাহাদের কথাই ঠিক, বাস্তবিকই লামাকে দেখিয়া ভক্তি হইবার কিছু নাই, সাধারণ ভুটিয়ার মতই চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদও সেইরূপ ময়লা, বিদ্যা বুদ্ধিও তথৈবচ, পূজা করিতে নিজের ভড়ং রক্ষা করিতে যতদূর বিদ্যা আবশ্যক ততটুকুই সার। সে দিন তাঁহার বাস গৃহে পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, তিব্বতী ভাষার গ্রন্থে তাঁহার গৃহ পূর্ণ, কোলঙ্গায় ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি, আর এই সাজের সহিত বুঝি সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য—ঘরের মাচার উপর, কাঁচা মাংসের একখানি মস্ত পা! পরদিন তাহা হাঁড়িতে চড়িবে। এই গৃহের পাশেই লামার পাকশালা।

দারজিলিংএর আশ পাশে অনেক চায়ের বাগান। আমি এই লিখিতেছি আমার জানালা দিয়া নীচের একটি চা-ক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ঝাঁকড় ঝাঁকড়া বেলফুলের গাছের মত সবপ্রায় এক সমান ছোট ছোট গাছ পাহাড়ের একদিকের ঢালু গায়ে এমন পরিষ্কার সাজিয়া আছে। চায়ের বড় বড় পাতায় ভাল চা হয় না, ছোট কচি পাতারই বেশী আদর। চায়ের ফুল বড় সুন্দর অনেকটা ছোট রকমের পেয়ারা ফুলের মত।

আমরা যেদিন এখানকার বোটানিকাল গার্ডন দেখিতে যাই—সেইদিন অমনি চায়ের ক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। এখানকার বোটানিকালে তিনটি যে কাচের ঘর আছে, তার প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টির ফুল-পত্রশোভা অধিক।

তৃতীয় গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র পরগাছার ফুলের বড় একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। এই ঘরে একটি ফোয়ারা আছে, আমরা বলায় ফোয়ারাটি ছাড়িয়া দিল।

কলিকাতায় আজকাল সাড়ি ধুতীর যেমন নূতন নূতন নাম হইয়াছে ট্রাম পাড়, বাগান বাবু সাড়ি—ইত্যাদি, এখানকার টবের ফুলের ও সেইরূপ মজার মজার নাম দেখিলাম। একই রকম ফুল কেবল রংএর একটু ইতর বিশেষ—কোনটার নাম Delight কোনটার Fairest of the fair কোনটার May Queen ইত্যাদি। বোটানিক্যালে দু একটি অতি নূতন রকম গাছ দেখিলাম—এই গাছের পাতাগুলি সমস্তই একেবারে আকাশের মত নীল, এই নীলের ভিতর দিয়া একটি লাল আভা বাহির হইতেছে, এমন সুন্দর দেখিতে কি বলিব।

দারজিলিংএ একটাও কাক দেখি নাই, কিন্তু শুনিলাম বোটানিকেলে কখনো কখনো দু একটা নাকি দেখা যায়। প্রবাদ এই, বর্দ্ধমানের রাজা—দারজিলিংএ দুই চারিটি কাক আর শেয়াল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য দেশের লোকেরা এখনো তাঁকে অভিশম্পাৎ দেয়। দারজিলিংএর যত প্রবাদ বেচারা বর্দ্ধমানের রাজাকে লইয়া।

বর্দ্ধমানের রাজার এখানকার বাসবাটী নাকি একটি দেখিবার জিনিস, আমরা অবশ্য ভিতরে গিয়া দেখি নাই তবে এখানে বসিয়া তাঁর বাড়ীর বাহিরের চেহারাখানা দেখিতে পাই বটে। তাঁর বাড়ী এখান হইতে অনেকটা নীচে, সেই কাকঝোরার কাছাকাছি।

আজি মধু-যামিনী।

বেহাগ, খেম্‌টা।

আজি মধু-যামিনী।
জোছনা আকুল,
ঝরিছে বকুল,
তটিনী দোদুল-
গামিনী।

দূরে ডাকে পিক,
ফুলে ছায় দিক,
আঁখি অনিমিক
কামিনী।

বহে বায়ু ঢুলে,
কুসুমে, মুকুলে;
কোথা বাঁশী ভুলে
কাঁদিছে!

স্বপনের ঘোরে,
কুসুমের ডোরে,
কে যেন গো মোরে
বাঁধিছে!

দেহে নাহি বল,
নয়ন সজল;
টল টল টল
পরাণে!

নিশাসে নিশাসে
হাসি ম'রে আসে;
কে হাসে, কে ভাসে
কে জানে!

তরুর ছায়ায়
কায়ায় কায়ায়
হিয়ায় হিয়ায়
সুদূরে!

ফুল-রেণু মত,
আশা, সাধ যত,
মেঘে খোঁজে পথ,
বধু রে!

ধরা ভেঙে-চুরে,
কোন্ সুর-পুরে,
ছায়া মত ঘুরে
কাহারা!

তুমি আমি, হায়,
চেনা নাহি যায়!
ছিল কি হেথায়
ইহারা?

ছিল কি কথন'
দেহের বাঁধন ?
এরা যে স্বপন-
ফোয়ারা ?

তুমি আমি, বধু,
যাপি নিশি-মধু,
দিতে জেগে স্নধু
পাহারা !

যেন ডুবে, ভেসে,
কোন্ সিন্ধু-দেশে,
কাঁপি নিশি-শেষে
দুজনা !

ঢেউয়ে ঢেউয়ে, হায়,
কূল ভেঙে যায় !
কে বলে কাহায়
আপনা !

কাহার উপর
কে করে নির্ভর !
কে আপন, পর,
কে জানে !

কোথা কার্ গেহ,
কোথা কার্ দেহ,
কোথা কার্ স্নেহ
এ টানে !

জাগা রে চেতনে
প্রিয় সম্বোধনে !
দেহে বাঁধ মনে,
দামিনি !

যাই ভেসে যাই,
বুঝি বা তলাই,
কি চোখেতে চাহি
যামিনী !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

গতি ও শক্তি।

যখন কোন বস্তু এক স্থান হইতে অপর স্থানে অবস্থিত হয়, তখন এই স্থান পরিবর্ত্তনকে আমরা উহার গতি বলি। যেমন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে শারীরিক শক্তি ব্যয় করিতে হয় সেইরূপ পদার্থে গতি উৎপাদন করিবার নিমিত্তও শক্তি ব্যয় আবশ্যক। রেলগাড়ি চালাইতে বাষ্পের শক্তি ব্যয় করা হইয়া থাকে; অগ্নির তেজে জলের বাষ্প বিস্তৃতি লাভ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, রেল গাড়ির কলে বাষ্পকে বিস্তৃত হইতে না দিয়া তদ্দ্বারা গাড়ির গতি উৎপাদিত করে।

এই প্রবন্ধে আমরা গতি ও শক্তি এই দুইটী বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের কি মত তাহা স্থূলতঃ বর্ণনা করিব। মনে কর বৃক্ষ হইতে একটী ফল পড়িতেছে, ফল পৃথিবীর আকর্ষণ বলে প্রথম সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পড়িবে এবং এই প্রথম সেকেণ্ডের শেষে ইহার যে বেগ হয় তাহা যদি বরাবর একই থাকে তবে ইহা দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করিয়া পড়িবে; এক কথায় বলিতে হইলে, ফলের বেগ তখন একসেকেণ্ডে ৩২ ফুট। যাহা হউক প্রথম সেকেণ্ডের পরেও পৃথিবীর আকর্ষণ ফলের উপর কার্য্য করিতে থাকিল, অতএব দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেষে উহার বেগ ৬৪ ফুট হইল—সেইরূপ আবার তিন সেকেণ্ড গত হইলে উহার বেগ ৩ × ৩২ অর্থাৎ ৯৬ ফুট হইবে। এইরূপে যত সেকেণ্ড ধরিয়া পৃথিবীর আকর্ষণ ফলের উপর কার্য্য করিবে, উহার বেগ এক সেকেণ্ডে ততগুণ ৩২ ফুট হইবে। এস্থলে দেখা যাইতেছে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক সেকেণ্ডে নিয়মিত রূপে ৩২ ফুট করিয়া বেগ বৃদ্ধি করিতেছে, কোন সেকেণ্ডে উহার বেশী বা কম করিতেছে না। যে সকল শক্তি দ্বারা সমান সময়ে সমান পরিমাণে বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহাদিগকে সমদ্রুতিসাধক বলা যাইতে পারে। অন্যান্য কতকগুলি শক্তি আছে তাহারা বিভিন্ন প্রকৃতির। মনে কর একখানি চাকার উপর ঠেলা মারিতে মারিতে একজন দৌড়াইয়াছে, ঐ ব্যক্তির শক্তিতে চাকার বেগ ক্রমাগত অধিক দ্রুত হইতেছে—কিন্তু ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক সেকেণ্ডে সমান পরিমাণে এই বেগ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না; অতএব উহার শক্তি সমদ্রুতিসাধক নহে।

উপরে আমরা দেখিয়াছি ফলটী প্রথম সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পড়ে; দ্বিতীয় সেকেণ্ডে কত ফুট পড়িবে? যদি উহার বেগ ৩২ ফুট থাকিত তবে মোটে ৩২ ফুট পড়িত, কিন্তু উহার বেগ দ্বিতীয় সেকেণ্ডের আদিতে ৩২ ফুট আর অন্তে ৬৪ ফুট, অতএব আমরা এই কল্পনা করিতে পারি যে এই দ্বিতীয় সেকেণ্ডে উহার বেগ ৩২ ফুট ও নহে ৬৪ ফুটও নহে তবে উহার মাঝামাঝি $\frac{৩২+৬৪}{২}=৪৮$ ফুট। বস্তুতঃ দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ফলটী আন্দাজ ৪৮ ফুট পড়ে, অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় সেকেণ্ডে উহা ১৬ + ৪৮ = ৬৪ ফুট পড়ে। তৃতীয় সেকেণ্ডের আদিতে ফলের বেগ ৬৪ ফুট আর অন্তে ৯৬ ফুট, অতএব তৃতীয় সেকেণ্ডে উহার বেগ মোটামুটি $\frac{৬৪+৯৬}{২}=৩২+৪৮=৮০$ ফুট। তৃতীয় সেকেণ্ডে ফলটী ৮০ ফুট পড়ে, অতএব প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন সেকেণ্ডে উহা ১৬ + ৪৮ + ৮০ = ১৪৪ ফুট পড়ে। এইরূপে আমরা ক্রমাগত গণনা করিয়া যাইতে পারি; কিন্তু পণ্ডিতেরা একটী সঙ্কেত স্থির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যত সেকেণ্ডই হউক না কেন ঐ ফলটী কতদূর পড়িবে ইহা সহজেই গণনা করা যাইতে পারে। $\text{স্থান} = \frac{\text{দ্রুত} \times (\text{সময়})^২}{২}$

ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক সেকেণ্ডে যে পরিমাণে বেগ বৃদ্ধি হয় তাহাকে দ্রুতি বলিলে আর যত সেকেণ্ড ধরিয়া শক্তিটী কার্য্য করিয়াছে তাহাকে সময় বলিলে দ্রুতির পরি-

মাণকে সময়ের পরিমাণের বর্গ দ্বারা পূরণ করিয়া দুই দ্বারা ভাগ করিলে কত দূর পদার্থটী পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় হইবে। ঐ সঙ্কেতে আমরা দেখিতে পাই যে তিন সেকেণ্ডে ফলটী $\frac{৩২ \times ৩^২}{২} = \frac{৩২ \times ৯}{২} = ১৪৪$ ফুট পড়িবে আর উপরেও আমরা এই রাশি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন মনে কর কোন একটী কূপের নিম্নে পড়িতে একখানি প্রস্তর খণ্ডের পাঁচ সেকেণ্ড লাগিল তাহা হইলে কূপের গভীরতা কত? পাঁচ সেকেণ্ডে প্রস্তর খণ্ড $\frac{৩২ \times ৫^২}{২} = ১৬ \times ২৫ = ৪০০০$ ফুট পড়িবে। কূপের গভীরতাও তাহা হইলে চারিশত ফুট।

বস্তুর বেগ যদি পরিবর্ত্তন না হইয়া বরাবর একই থাকে তাহা হইলে উহা কোন সময়ে কত স্থান অতিক্রম করিবে ইহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। যেমন একটী ভাঁটা একখানি মসৃণ টেবিলের উপর চালাইয়া দেওয়া হইল; উহার বেগ একসেকেণ্ডে মনে কর দশ ফুট, তাহা হইলে উহা এক সেকেণ্ডে দশ, দু সেকেণ্ডে কুড়ি, ইত্যাদি ক্রমে যত সেকেণ্ড হইবে তত দশ ফুট স্থান অতিক্রম করিবে।

এক্ষণে শক্তি, গতি ও বেগ এই তিনটী কথার অর্থ বোধ হইবে। শক্তি দ্বারা গতি সাধিত হয়, গতিশীল পদার্থ এক সেকেণ্ডে যত স্থান অতিক্রম করে তাহাকে উহার বেগ কহে, আর কোন শক্তি দ্বারা বেগ যদি সমান সময়ে সমান পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে উহাকে সমদ্রুতিসাধক বলা যাইতে পারে আর তাহা না হইলে অসম দ্রুতিসাধক। কোন শক্তি দ্বারা এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণে বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে উহার দ্রুতি বলা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আমরা বস্তুর গুরুত্বের কথা কিছু বলি নাই, এক্ষণে তাহার উল্লেখ হইতেছে। বস্তু সকল পদার্থ গঠিত; ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পদার্থ আছে—যেমন একসের জলে যত খানি পদার্থ আছে, দশ সের জলে তাহার দশগুণ। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আয়তন হইতেও দেখা যায় যে তাহাদিগের গুরুত্ব সমান নহে, যেমন এক ঘটী জল যত ভারি হইবে এক ঘটী বালুকা তাহার অপেক্ষা অধিক ভারি হইবে। ইহার অর্থ এই যে, বালুকার অনুগুলি পরস্পরের যত নিকটে অবস্থিত, জলের অনুগুলি তত নহে; অর্থাৎ বালুকা জল অপেক্ষা অধিক ঘন। আর ইহা ব্যতীত বালুকার প্রত্যেক অনুতে যে পরিমাণে পদার্থ আছে, জলের অনুতে তত নাই। অনুশব্দে বস্তুর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মনে করিতে হইবে, এই সকল অংশ চক্ষুর অগোচর—তবে আমরা এই কল্পনা করিয়া লই যে যাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশ হইলে কোন বস্তু সে বস্তু থাকে না, বিভক্ত হইয়া পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়—সেই রূপ অংশ অনু। যেমন জলের অনুকে বিভক্ত করিতে গেলে উহা আর জল থাকে না, হাইড্রোজেন ও অক্‌জিজেনের পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। যাহা হউক আমরা কল্পনা করিতেছি যে, সকল বস্তুর অণু সমানপরিমাণে পদার্থ ধারণ করে না, কোন

বস্তুর অনুতে বা অধিক পরিমাণে পদার্থ আছে কোনটার অনুতে বা অল্প পরিমাণে আছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আর একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অনুগুলি সমান পরিমাণে নিকটবর্ত্তী নহে। কঠিন বস্তুর অনুগুলি তরলের অপেক্ষা আর তরলের বায়বীয়ের অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী। এই দুই কারণে বস্তুদিগের ঘনত্ববিভেদ ঘটে অর্থাৎ আয়তন সমান হইলেও পদার্থের পরিমাণ সমান হয় না। পদার্থের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে, অতএব যে বস্তু যত ঘন অর্থাৎ যে বস্তুতে যত পদার্থ তাহার উপর তত অধিক মাত্রার আকর্ষণ হইবে। এক বস্তুতে যদি আর এক বস্তু অপেক্ষা দ্বিগুণ পদার্থ থাকে, তবে প্রথমের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বিতীয়ের অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্রা ভেদে বস্তুদিগের গুরুত্ব-ভেদ জন্মে, যে বস্তু যত ঘন সে বস্তু তত ভারি। ঘনত্ব অনুসারে গুরুত্ব ভেদ হয় বলিয়া লোকে সাধারণত ঐ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্মরণ রাখে না; কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা কখনই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে ঘনত্ব শব্দে পদার্থের মাত্রা আর গুরুত্বে পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্রা বুঝায়।

এক্ষণে দেখা যাউক বস্তুর গুরুত্ব ভেদে শক্তির কার্য্য ভেদ ঘটে কি না। একটী একসের ভারি গোলক লইয়া তুমি উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিলে, বস্তুটী তোমার জোরে পৃথিবীর আকর্ষণের বিপরীতে দশ হাত উর্দ্ধে উঠিল; তাহার পর আবার ঐ আকর্ষণে নিম্নে পড়িল। যদি একসের ভারি গোলক না লইয়া দুইসের লইতে, তাহা হইলে উহা সেই জোরে দশ হাতের স্থলে পাঁচ হাত উঠিত; আর আধসের হইলে কুড়ি হাত উঠিত। এইরূপে দেখা যায় যে পদার্থের মাত্রাভেদে শক্তির কার্য্য ভেদ ঘটে; ফলতঃ একই মাত্রার শক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পদার্থের প্রতি কার্য্য করিয়া তাহাদিগের গতি সাধন করে, তবে দেখা যায় যে পদার্থের মাত্রা আর যত পরিমাণ স্থানে গতি ঘটে এই দুয়ের পুরণ ফল বরাবর সমান থাকে। যেমন উপরে ১×৫=১০, আবার ½×২০=১০। পদার্থের মাত্রা × গতির স্থানের পরিমাণ এই রাশিকে বিজ্ঞানে কার্য্য কহে। অর্থাৎ কোন শক্তিতে যখন কার্য্য হয়, তখন কার্য্য আর কিছুই নহে—কতক পরিমাণ পদার্থ কতক পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে এই মাত্র। অতএব কত পদার্থ কত স্থান অতিক্রম করিল ইহা জানিতে পারিলেই কার্য্যের পরিমাণ স্থির হয়। যেমন একটী দশসের বস্তু মাটীতে পড়িয়া আছে, আমি তাহা হাতে করিয়া দশ হাত উচ্চে লইয়া গেলে যে কার্য্য করি তাহা একসের বস্তু এক হাত উচ্চে উঠাইলে যে কার্য্য হয় তাহার অপেক্ষা ১০০ গুণ অধিক, অতএব শেষের কার্য্যটীকে এক বলিলে প্রথম কার্য্যটীকে একশ বলিতে পারি। সেইরূপ আবার কুড়িসের বস্তু দশ হাত উর্দ্ধে উঠাইলে যে কার্য্য হইবে তাহার পরিমাণ ২০×১০=২০০। ইংরেজী ভাষায় গুরুত্বের একক রাশি এক পাউণ্ড (আন্দাজ আধসের) আর স্থানের একক রাশি

এক ফুট—অতএব ইংরেজীতে এক "ফুট—পাউণ্ড এই রাশিকে অর্থাৎ এক পাউণ্ড ভারি বস্তু এক ফুট উর্দ্ধে উঠাইতে যে কার্য্য করা হয় তাহাকে কার্য্যের একক রাশি ধরিয়া অন্যান্য কার্য্যের পরিমাণ ঐ রাশিতে প্রকাশ করা হয়। ফরাসিতে আবার সেইরূপ "গ্রাম - সেণ্টি মিটর" এই রাশিকে কার্য্যের একক ধরা হয়। "গ্রাম" গুরুত্বের পরিমাণ, হাজার গ্রামে আন্দাজ একসের হয়; সেণ্টিমিটর স্থানের পরিমাণ—উহা এক মিটরের শতাংশ, এক মিটরে ৩৯.০৩৭ ইঞ্চ হয়। এক গ্রাম ভারি বস্তু এক সেণ্টিমিটর স্থানের উপর দিয়া চালাইতে (কিম্বা অত পরিমাণ স্থান উর্দ্ধে উঠাইতে) যে কার্য্য করা হয় তাহাকে এক "গ্রাম—সেণ্টিমিটর" বা "সেণ্টিমিটর—গ্রাম" বলা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাবায় এক্ষণে গ্রাম, সেণ্টিমিটর, ও সেকেণ্ড এই তিন রাশিকে পদার্থ (গুরুত্ব) স্থান, ও সময় এই তিনের একক ধরা হয়। এক্ষণে দেখা যাউক এই তিন রাশি দ্বারা আমাদিগের উপরি লিখিত গতি শক্তি প্রভৃতির কিরূপে সংজ্ঞা-প্রকটন হইতে পারে।

যেরূপ বেগে এক সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটর স্থান অতিক্রম করা হয় তাহাতে বেগের একক ধরিতে হইবে।

যেরূপ দ্রুতি দ্বারা এক গ্রাম ওজন বস্তুর এক সেকেণ্ডে একক মাত্রার বেগ প্রদত্ত হয় তাহাতে দ্রুতির একক ধরিতে হইবে।

যেরূপ শক্তিতে এক সেকেণ্ডে এক গ্রাম ওজন বস্তুর প্রতি একক মাত্রার দ্রুতি প্রদত্ত হয় তাহাকে শক্তির একক ধরিতে হইবে। একক মাত্রার শক্তির নাম গ্রীক ভাষা হইতে "ডাইন" রাখা হইয়াছে। যতখানি শক্তি এক সেকেণ্ড ধরিয়া এক গ্রাম ভারি বস্তুর উপর কার্য্য করিলে উহার এত বেগ হয় যে উহা সেকেণ্ডে এক সে... স্থান অতিক্রম করিতে পারে ততখানি শক্তির নাম এক ডাইন।

এক সেণ্টিমিটর স্থানের উপর দিয়া এক ডাইন শক্তির বিপরীতে কার্য্য করিলে যত খানি কার্য্য হয় তাহাকে কার্য্যের একক ধরা যাইতে পারে। কতখানি স্থান ধরিয়া কত খানি শক্তি ব্যয় হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই কার্য্যের মাত্রা স্থির হয়; এক ডাইন শক্তির বিপরীতে কার্য্য করিতে হইলে এক ডাইন শক্তির ব্যয়।]

এক্ষণে শক্তি ও কার্য্য সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে। পৃথিবীতে উত্তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ রাসায়নিক আকর্ষণ শারীরিক বল ইত্যাদি যত প্রকার শক্তি আছে সে সমুদয়ই এক মহান্ তেজের আবির্ভাব মাত্র। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে যেমন অনুমান করেন যে পদার্থের পরিমাণ জগতে বরাবর সমান থাকে, সেইরূপ ইদানীন্তনকালেও জার্ম্মানির মাইয়াব, ইংলণ্ডের জাউল, টম্‌সন, টিণ্ডাল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জগতে তেজের পরিমাণ বরাবর

ও সেইরূপ; তেজ কখনও বা উত্তাপ, কখনও তড়িৎ, কখনও বা গতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। মনে কর আমি শারীরিক তেজবলে একটী ভারি বস্তু একশ হাত উচ্চে লইয়া গেলাম দেখিতে মনে হইবে যে আমার অতখানি তেজ নষ্ট হইল। কিন্তু সেই বস্তুটী কোনরূপে সেই উচ্চ স্থান হইতে নড়াইয়া দেও—দেখিবে পুনরায় যখন উহা নিম্নে আসিল তখন উহাতে এত তেজ প্রকাশ পাইয়াছে যে উহার সম্মুখে যাহা কিছু পড়িবে তাহা পেশিত হইয়া যাইবে। আমি যদি শক্তি ব্যয় না করিতাম তাহা হইলে আর উহার এরূপ শক্তি বিকাশ ঘটিত না; অতএব আমার তেজটী নষ্ট হইয়া যায় নাই উহা ঐ বস্তুতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। সুযোগ পাইলেই আবার প্রকাশ পায়, এইরূপ তেজকে প্রচ্ছন্ন তেজ, ইংরেজীতে "পোটেন্‌শ্যাল" তেজ কহে; আর যে তেজ বাস্তবিক প্রকাশ পাইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছে তাহাকে "কাইনেটিক" তেজ কহে। কার্য্যের মাত্রা দ্বারাই পণ্ডিতগণ তেজের মাত্রা স্থির করেন; কার্য্য তেজের বিকাশ মাত্র, অতএব কার্য্যের পরিমাণও যাহা তেজের পরিমাণও তাহা। কিরূপে তেজ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় আর সেই সেই অবস্থায় উহার কি কি গুণ তাহা পদার্থ বিজ্ঞানে বর্ণিত হয়। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন হইবে। তবে যদি কোন কোন পাঠক আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এইরূপ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভের অভিলাষী হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভবিষ্যতে আমরা আরও কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করিতে পারি।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

জোর্ডানি ব্রুণো।

গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছি মধ্যযুগে ইয়োরোপের কি দুর্দ্দশা ঘটে; আর সেই সময় দর্শন শাস্ত্রের কিরূপ অবনতি হয় তাহাও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দর্শন প্রতিপদে রোমীয় খৃষ্ট ধর্ম্ম ও আরিষ্টোট্‌ল এই দুয়ের দোহাই দিয়া চলিত; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। চিন্তাবৃত্তি এইরূপ দাসত্ব অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে ইয়োরোপীয়গণ আরিষ্টোট্‌ল ভিন্ন অন্যান্য পুরাতন পণ্ডিত ও লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ প্লেটোর দর্শন পুনরালোচনা করিল, কেহ কেহ পূর্ব্বতন গ্রীক প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিকদিগের মতগুলি অধ্যয়ন করিল, কেহ কেহ জিনো প্রবর্ত্তিত ষ্টোই-

সিজ্‌ম্ (এক প্রকার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য) অবলম্বন করিল, কেহ কেহ এপিকিউরসের সুখ-ভোগ বাদ প্রচলিত করিল, আবার মণ্টেন্‌প্রমুখ কতকগুলি লোক পূর্ব্বতন অবিশ্বাস-বাদ পুনঃ প্রচার করিল। ইহার সহিত পুরাতন গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পাদিরও গৌরব পুনরায় ঘোষিত হইল। এইরূপে রুদ্ধস্রোত ইয়োরোপীয় চিন্তা-সরিতে পুনরায় চারি-দিক হইতে সবেগে স্রোত বহিতে লাগিল; আর ইহাতে কালক্রমে এই সুফল জন্মিল যে লোকে কেবল পরের চিন্তা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল না; তাহারা আপনারাও চিন্তা করিতে লাগিল। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই সময় যাঁহারা আরিষ্টোটলের অনুগামী ছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে উক্ত পণ্ডিতের দর্শন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা আরব লেখক-দিগের কৃত অনুবাদে ঐ দর্শন শিক্ষা করিতেন, এক্ষণকার পণ্ডিতেরা মূল গ্রীক ভাষায় উহা পাঠ করিলেন আর তাহা ভিন্ন তাঁহারা কেবল আরবদিগের রচিত টীকার উপর নির্ভর না করিয়া গ্রীকদিগের রচিত টীকার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক ইয়োরোপে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার প্রাক্কালে এক পক্ষে আরিষ্টোটলের দর্শন বিষয়ক একাধিপত্যের ধ্বংস হইল, অপর পক্ষে লুথার কর্ত্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়া রোমীয় কাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিষয়ক একাধিপত্যেরও অবশেষ হইল। এই প্রকারে ইয়োরোপীয় জগৎ বহুকাল নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পুনরায় উন্নতি পথে ধাবমান্ হইল আর সেই সময় যে কয়জন মহাপুরুষ চিন্তার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহার জয়পতাকা দেশে দেশে উড্ডীয়মান করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জোর্ডানিব্রুণো একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। নেপ্‌ল্‌স্ হইতে কিয়দ্দূরে নোলা নামক স্থানে আন্দাজ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রুণোর জন্ম হয়। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে কোপার্নিকস নামক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের মৃত্যু ঘটে আর ইহার দশ বৎসর পরে বিখ্যাত দার্শনিক বেকনের জন্ম হয়। লিউয়েস বলেন ব্রুণোর প্রকৃতি তাঁহার জন্ম স্থানের অনুরূপ ছিল; নেপ্‌ল্‌সের সূর্য্য যেরূপ প্রখর তেজোময় এবং ঋতুর অবস্থা যেরূপ খাম্‌খেয়ালি, ব্রুণোর প্রকৃতিও সেইরূপ একপক্ষে প্রচণ্ড তেজঃশালী আর অপর পক্ষে অস্থির ছিল। এই অধৈর্য্যময় তেজোরাশির সহিত তাঁহার উচ্চদরের কল্পনা শক্তি ও রসবোধ ক্ষমতাও বিদ্যমান ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় কি যে, এরূপ প্রকৃতির লোক কখনও "তথাস্তু" বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না, পরন্তু জগতে একটী নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশে দেশে বিদেশে প্রচারক বেশে পরিভ্রমণ করিবে। ব্রুণো প্রচারক ছিলেন বটে, কিন্তু প্রচার করিতে যাইয়া কখনও কর্ত্তব্য জ্ঞান হারান নাই। শিক্ষিত লোকের যেরূপ শিষ্টাচারী হওয়া উচিত সকল সময়েই তিনি সেইরূপ ছিলেন।

ব্রুণো জীবনের প্রথম ভাগে ডমিনিকান নামক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন;

সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন করিয়া তুলিল। একদিকে তিনি কাথলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিলেন, অপর দিকে আরিষ্টোটলের দর্শনে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। ইহার একটীতেই তিনি তখনকার লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারিতেন, দুইটীতে ত আর কোন কথাই নাই। অতঃপর তিনি ডমিনিকান সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বিদেশে পলায়ন করিলেন, কারণ দেশে থাকিলে হয়ত তদ্দণ্ডেই ঐ সম্প্রদায় তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া প্রাণদণ্ড করিত।

এক্ষণে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর; ডমিনিকান সম্প্রদায়ে থাকিলে তিনি এক প্রকার সুখে কালযাপন করিতেন, কিন্তু যাহাতে বিশ্বাস নাই তাহা মুখে স্বীকার করা কপটতা ও ভণ্ডামি আর ব্রুণো এতদুভয়ই অন্তরের গভীরতম স্তর হইতে ঘৃণা করিতেন। অতএব তিনি জীবনের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই দেশান্তরী হইলেন, এই সময় হইতে তাঁহার এই পৃথিবীতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন একটী অবিশ্রান্ত সংগ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি এক দেশ হইতে যেমন অন্য দেশে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার বিপক্ষগণও তেমনই তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইতে থাকিল। প্রকাণ্ড ইয়োরোপের এক স্থলেও তিনি অধিক দিন ধরিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইলেন না; যেথানে যান, সেখানেই তাড়না, বিড়ম্বনা, উৎপাত। কিন্তু ইহাতেও তিনি টলিলেন না, তিনি ভাঙ্গিবেন তবু দমিবেন না; এতই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এতই তাঁহার ভণ্ডামির প্রতি আন্তরিক ঘৃণা। হে ভারতবাসি, তুমি এই মহাত্মার জীবন চরিত আলোচনা করিয়া ধন্য হও! তোমার সমাজে কত শত সহস্র অন্যায় ও অত্যাচার বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়াও তুমি চক্ষু বুজিয়া আছ। তুমি কেবল সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে কপটতার পক্ষ সমর্থন করিতেছ।

ডমিনিকান সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া ব্রুণো প্রথমতঃ জেনিভায় গমন করিলেন, কিন্তু তথায় অধিককাল থাকিতে না পারিয়া তিনি ফ্রান্সে প্রথমে টুলুস পরে পারিস যাইলেন। পারিসে তিনি কোন উপায়ে নৃপতির সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং যদি তিনি বাহিরে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে সহজেই রাজসরকার হইতে বেতনভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু পুনরায় বলা যাইতেছে যে কপটতাচরণ ব্রুণোর কুষ্ঠিতে লিখিত হয় নাই; যাহা হউক, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে পারিসে কিছু পূর্ব্বে লোকে খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অনেক দুর্ভাগার প্রাণনাশ করিয়াছিল, সেই পারিসে এক্ষণে অবিশ্বাসী ব্রুণো উপদেশ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না, অপিচ আবেলার্ডের পর অপর কোন শিক্ষক উক্ত সহরের ছাত্রদিগের নিকট অতদূর প্রিয়পাত্র হয়েন নাই। কথিত আছে যে ছাত্রদিগের সম্মুখে তিনি অধ্যাপকের ন্যায় একটানা গম্ভীর ভাবে বক্তৃতা দিতেন না।

সেইরূপই করিতেন। কখনও ধীর, গম্ভীর, পাণ্ডিত্যময় ভাব; কখনও বা প্রচণ্ড তর্কময় ভাব; কখনও কল্পনাময় রসাত্মক ভাব; আবার কখনও বা বিদূষকের ন্যায় বিদ্রূপ গর্ভ ভাব—এ সকলই সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বক্তৃতায় দেখা দিত। সুতরাং তিনি যে শীঘ্রই ছাত্রদিগের বিশেষ কৃপার পাত্র হইবেন ইহা ধরা বাঁধা কথা।

পারিস হইতে ব্রুণো ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সভায় গমন করিলেন; তথায় তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। তিনি তাঁহার ঘটনাময় জীবনে যাহা কিছু সুখ সম্ভোগ করেন তাহা বোধ হয় এই ইংলণ্ডে; একদিকে রাণীর তাঁহার প্রতি শুভ দৃষ্টি ছিল, অপরদিকে আবার সার ফিলিপ সিডনি প্রভৃতি গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের সহিত তিনি বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালেই তিনি তাঁহার মাতৃ ভাষায় রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ গুলি প্রণয়ন করেন। ইংলণ্ডে পৌছিবার অনতিবিলম্বে (১৫৮৩ অব্দে) তিনি অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মহা বাগযুদ্ধে আহূত হইলেন। আলবার্ট ডে লাস্কো নামে পোলণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংলণ্ডে আইসেন, তাঁহাকে সম্মাননা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যাপারের উদ্‌যোগ হয়। অক্স্‌ফোর্ডের পণ্ডিতগণ আরিষ্টোটলের দর্শন ও টোলেমি প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষ শাস্ত্র (যাহাতে পৃথিবীকে গতিহীন ও জগতের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করা হয়) এই দুই বিষয় সমর্থন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন আর ব্রুণো বিপক্ষ মতের পোষকতা করিলেন। তিনি আত্মগরিমা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই তর্কে তিনি পনর বার ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মুখ বন্ধ করেন আর তাঁহারা কেবল উত্তর স্বরূপ তাঁহার প্রতি গালি বর্ষণ করেন। এই বাক্যে কতটা অত্যুক্তি আছে না আছে বলা যায় না; তবে তিনি যে এই সময়ে একজন "মাথা উঁচু" লোক হইয়া উঠেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর তিনি অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশ-বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এক্ষণে জগৎ তত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বিষয়ে তাঁহার মত গোঁড়া খৃষ্টানদিগের মত হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন ছিল; তিনি এক প্রকার অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ব্রুণোর মতে এ জীবন একরূপ ক্ষণকালের মৃত্যু যন্ত্রণা মাত্র; আত্মা ইহার মধ্য দিয়া যাইয়া অনন্ত আত্মায় মিলিত হয়। যদিচ তিনি এলিজাবেথের অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন, তথাপি যখন লোকে তাঁহার নূতন রকমের ধর্ম্মবিষয়ক মত দেখিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল তখন ব্রুণো অগত্যা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া পুনরায় পারিস যাইলেন। এখানে আসিয়াই তিনি প্রকাশ্য ভাবে আরিষ্টোটলের প্রাকৃতিক দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণ সমক্ষে স্বকীয় মত প্রচার করিলেন; তিন দিন ধরিয়া তিনি প্রকৃতি, জগৎ, ও পৃথিবীর গতি এই সকল বিষয়ে তর্ক করিলেন। সাধারণ্যে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন বটে—কিন্তু তাহার দণ্ডস্বরূপ তাঁহাকে ফ্রান্স হইতে

অতঃপর তিনি জার্ম্মাণি যাত্রা করিলেন ; ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মার্বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক উপাধি লইলেন, কিন্তু তথায় দর্শন শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন না। এবং তাহাতে তথাকার অধ্যক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত কলহ করেন ও তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন। মার্বুর্গ হইতে ব্রুণো বুর্টেম্বুর্গ গমন করিলেন এবং সেখানকার লুথরের প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় তাঁহাকে উপদেশ-বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন। এখনকার লোক তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে আরিষ্টোটল প্রণীত দর্শনের পক্ষ ছিলেন, অথচ তাঁহারা ব্রুণোকে উহার বিপক্ষে বক্তৃতা দিতে যে অনুমতি দিলেন ইহা তাঁহাদিগের উদারতার লক্ষণ বলিতে হইবে ; আর ব্রুণোও তাহা যথেষ্টরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি কিছুকাল ধরিয়া একপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দে রহিলেন, কিন্তু তিনি কোন স্থলেই স্থির হইয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি নামে পরিব্রাজক ও প্রচারক না হইয়া কার্য্যে তাহাই ছিলেন ; দেশে দেশে স্বমত প্রচার করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে বড়ই প্রবল ছিল। অতএব দেখা যায় যে তিনি সুখের বুর্টেম্বুর্গ ছাড়িয়া একেবারে তাঁহার শত্রু পক্ষের (কাথলিক সম্প্রদায়ের) ব্যূহ প্রাগ নগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কেহ তাঁহাকে ডাকিল না, কেহ তাঁহাকে খুঁজিল না ; তিনি হেলম্ষ্টাটে উপনীত হইলেন, তথায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এ নগরেও অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া তিনি কিয়দ্দিবস ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থিতি করিয়া লাটিন ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখান হইতে কিছু কাল পরে তাঁহাকে পাডুয়া নগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাডুয়া তাঁহার মাতৃদেশ ইটালীর একটী স্থল ; অতএব এক্ষণে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন—ক্রমাগত দশ বৎসর ধরিয়া তিনি সুইট্জারলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ও ইংলণ্ড এই সকল দেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। যেখানে গিয়াছেন সেখানেই শত্রু দল উত্থিত করিয়াছেন, এক দিকে কাথলিক পাদরি শত্রু আবার অপর দিকে আরিষ্টোট্ল্ ভক্তেরা শত্রু। তিনি কেবল একমাত্র সত্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বকীয়মত নির্ভীক চিত্তে প্রচার করিয়া এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু হায়! কেন আসিলেন? গোঁড়া পাদরিরা তাঁহার নিমিত্ত শৃঙ্খলাদি দ্বারা কারাগার সজ্জিত করিতেছিল, শীঘ্রই উহাতে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। তিনি পাডুয়া নগরীতে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া যেমন বিনিসে পদার্পণ করিলেন আর অমনি কারারুদ্ধ হইলেন। এখানে তিনি ছয় বৎসর কাল রুদ্ধ রহিলেন ; যে ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও কোন স্থলে স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে ভীষণ কারাগারে ঐ দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা কি মহা কষ্ট কর! কিন্তু পৃথিবীতে সুখ দুঃখ সব জিনিষেরই শেষ আছে, ব্রুণোরও দুঃখরজনী অবসান হইল। তাঁহাকে রোমে লইয়া যাওয়া হইল, নানা

প্রকারে তাঁহাকে বুঝান ও ভয় দেখান হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিবার পাত্র নহেন। অবশেষে ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) কাথলিক পাদরিরা তাঁহাকে খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বহিভূর্ত করিল এবং অগ্নিদাহনে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিবার অনুজ্ঞা দিল। ব্রুণো এই পরীক্ষার সময় স্থির ও গম্ভীর ছিলেন, কেবল ঐ অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া একবার সগর্ব্বে বলিলেন 'আমার মনে হইতেছে যে এই দণ্ডের কথা শুনিয়া আমার যত ভয় না হইতেছে উহার আজ্ঞা দিতে তোমাদিগের তাহা অপেক্ষা অধিক ভয় হইতেছে।' ইহার পর পাদরিরা তাঁহাকে আর এক সপ্তাহ সময় দিল, কিন্তু তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না; অতএব ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অনুজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হইল।

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পাদরি সম্প্রদায় কি অপরাধে ব্রুণোর প্রতি এই কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করেন। অপরাধ গুলি এইঃ তিনি কাথলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসকারী নৃপতিদিগকে (বিশেষতঃ রাণী এলিজাবেথকে) প্রশংসা করেন, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন, তিনি চিন্তা করিবার ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহ পরীক্ষা দ্বারা অনুসন্ধান করিবার স্বাধীনতা প্রচার করেন, কাথলিক সম্প্রদায়ের মতের বিরুদ্ধে তিনি পৃথিবী গতিশীল ও জগৎ অসীম ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিরোধী অদ্বৈতবাদে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন ও উহা প্রচার করেন, আর তাহা ভিন্ন কাথলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষে (Mass) যোগদান করিতে অসম্মত হয়েন। এই সকল ব্যবহার তখনকার লোকের চক্ষে ভয়ঙ্কর ছিল, আজি কালি ও অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিপক্ষ কোন মতই সহ্য করিতে পারেন না। তবে আজি কালি কেহ ধর্ম্ম বিষয়ে মতের অনৈক্য নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড দিতে সাহস পান না, তখন ঐরূপ দণ্ড দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। হতভাগ্য ব্রুণো এবং তৎসাময়িক আরও অনেকে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেন।

অতঃপর আমরা ব্রুণোর দার্শনিক মত সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। একজন লেখক বলেন যে ইহা ব্রুণোর পক্ষে অতি গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে যে তিনি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তিনি স্বকীয় কল্পনা সাহায্যে যে দর্শন সৃজন করেন তাহা ইদানীন্তন কালের দর্শনের সহিত অনেকটা একরূপ। অর্থাৎ ইদানীন্তন কালে বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোকের সাহায্যে লোকে যে দর্শন প্রকটন করিয়াছে ব্রুণো উহার কেবল মিট্‌মিটে আলোকেও প্রায় সেইরূপ দর্শন রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রুণোর পরবর্ত্তী খ্যাত নামা দার্শনিকদিগের মধ্যে ডেঃকার্ট ও স্পিনোট্‌জা এই দুয়ের তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে এক মত দেখা যায়, আর ইহা ভিন্ন

ব্রুণোর দার্শনিক মতগুলি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ তাঁহার দর্শন কল্পনাময়; সকল দর্শনেই বিজ্ঞানেও কিছু না কিছু কল্পনার ভাগ থাকে। তবে বিজ্ঞানে ও বিজ্ঞানের উপরি-স্থাপিত বর্ত্তমানের অনেক দার্শনিক রচনায় দেখা যায় যে প্রথমতঃ পরীক্ষা দ্বারা বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পর কল্পনার সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের নিয়ম স্থিরীকৃত হয়, এবং অবশেষে আবার পরীক্ষা করা হয় যে এই সকল নিয়ম হইতে যাহা গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে তাহা ঠিক কিনা; এইরূপে চারিদিক হইতে পরীক্ষা দ্বারা কল্পনাকে ঘিরিয়া রাখা হয়। কবির কল্পনা সেরূপ নহে; তিনি যাহা ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, কল্পনা করিতে পারেন; তাঁহার কল্পনা অবারিত। ব্রুণোর দর্শনেও কল্পনার রাজত্ব অবারিত, তিনি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—"দার্শনি করা একরূপ কবি ও চিত্রকর। যে ব্যক্তি কবির ন্যায় সৃজন করিতে এবং চিত্রকরের আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারে না সে দার্শনিকই নহে।" প্লেটো এই প্রকারের দার্শনিক ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে আর এ প্রকার দার্শনিকের তত আদর নাই। ব্রুণোর দর্শন সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে তাঁহার পরে বেকন যাহা বলিয়া জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করেন, তিনি অগ্রে থাকিতেই তাহা বলেন। ব্রুণোর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরা অনেকেই কেবল মনোরাজ্যের ঘটনাগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন, তাঁহারা কখনো ভুলক্রমেও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করিতেন না। ব্রুণো বলিলেন প্রকৃতির দিকে চাহ প্রকৃতি দেখ। তবে ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে ব্রুণো ঠিক বেকনের কিম্বা ইদানীন্তন কালের বৈজ্ঞানিকের চক্ষে প্রকৃতি দেখিতেন; তিনি বরং কবিদিগের ও ধ্যানরত ঋষিদিগের চক্ষে প্রকৃতি দেখিতেন—তিনি প্রকৃতিকে ঈশ্বরের বাহ্যিক বিকাশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই দুই প্রকার দৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে উহার ভিতরে কি কি নিয়ম বিরাজ করিতেছে তাহা "তন্ন তন্ন" করিয়া দেখা—আর কবি ও দার্শনিক প্রকৃতি দেখেন উহাকে দেখিয়া আপনাহারা হইবার নিমিত্ত, উহা দ্বারা উহার স্রষ্টাকে চিন্তা করিবার নিমিত্ত।

ব্রুণোর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান একটী এই যে তিনি কোপর্নিকস্ প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষিক মত অবলম্বন করেন; ক্যাথলিক সম্প্রদায় টোলেমির মতের পক্ষ ছিলেন—টোলেমি বলেন পৃথিবী জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত ও গতিহীন আর কোপর্নিকসের মত তাহার বিপরীত। ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই সকল বিষয়ে বাইবেলে যে কথা আছে তাহা অভ্রান্ত মনে করেন, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে বাইবেল কেবল ধর্ম্ম বিষয়ের জন্য, জ্যোতিষ বিজ্ঞানের কোন কথা মীমাংসা হইতে পারে না। বাইবেলের উক্তি

ঈশ্বরের উক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও এরূপ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই যে উহাতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাই সত্য। এরূপ মনে করা অসঙ্গত হয় না যে যাহারা ঈশ্বর কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছে তাহারা তাহাদিগের সময়ে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতগুলি কেবল অলঙ্কার-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছে মাত্র, তাহারা ঐ সকল মত উল্লেখ করিয়াছে বলিয়াই যে অখণ্ডনীয় এরূপ না হইতে পারে। যাহা হউক, জগৎবিষয়ে ব্রুণো আরও কয়েকটী মত প্রচার করেন, তাহাতে ও তিনি গোঁড়া খৃষ্টানদিগের বিরাগভাজন হয়েন, তিনি বলেন জগৎ অসীম ও অনাদি, আমাদিগের এই সৌর জগৎ অন্যান্য অসংখ্য জগতের পার্শ্বে একটী মাত্র,—আর জগদীশ্বর এসমুদয়ের মধ্যে থাকিয়া ইহাদিগের গতি ও জীবন দান করিরাছেন। কেহ কেহ কল্পনা করেন ঈশ্বর "বাহিরে" থাকিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রুণো অন্যরূপ কল্পনা করেন—তাঁহার মতে জগৎ আর ঈশ্বর দুইটী আলাহিদা বস্তু নহে—ঈশ্বরই জগতের "মধ্যে" থাকিথা জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সমুদয় বস্তু কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু হইতে গঠিত, ইহারা কেবল পদার্থ নহে, ইহাদিগের মধ্যে পদার্থ ও আত্মা উভয়ই আছে। ইহাদিগের নাম মনাড; বলা বাহুল্য যে পরে লাইবনিটজ্ এই মনাডবাদ ব্রুণোর দর্শন হইতে গ্রহণ করেন। ঈশ্বর এই মনাডদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ. আমাদিগের ও অন্যান্য সকল বস্তুর আত্মা এক একটী মনাড মাত্র। প্রকৃতির দুই মুর্ত্তি—এক সৃষ্ট আর এক স্রষ্টা; পরমেশ্বর দ্বিতীয় মুর্ত্তি আর দৃশ্যমান জগৎ সমূহ প্রথম মূর্ত্তি। যেমন সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য অবস্থিতি করে, যেমন সমুদয় বিদ্যমান বস্তুতে তাহাদিগের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে—সেইরূপ সকল বস্তুতেই ঈশ্বর অবস্থিতি করেন। সংসারে মন্দ বলিয়া একটী বাস্তবিক কোন জিনিষ নাই—জগৎগুলি যেরূপ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আর ভাল হইতে পারেনা। সংসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় বটে কিন্তু সমুদয় বিশ্ব সংসার বরাবর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় বিরাজ করিতেছে; তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। পরমেশ্বর আপনার মধ্য হইতে সমুদয় জগৎ বাহির করিয়াছেন আর তাহা এক নিয়মের অনুসারীরূপে করিয়াছেন, খামখেয়ালি ভাবে নহে। তবে তিনি যে নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহাতেই ছিল; অতএব তিনি স্বগত নিয়মের অধীন তিনি স্বাধীন। [যিনিই দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন যে পরে স্পিনোট্জাও এই সকল মত প্রচার করেন।] ব্রুণোর জীবনে যাঁহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন যে স্বাধীন ইটালী ঐ মহাপুরুষের সম্মানার্থে ইদানীন্তন কালে এক প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে।

অবশেষে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধ রচনায় আমরা লিউইস ও উবারবেগ এই দুই লেখককে অনুসরণ করিয়াছি।

ফুলজানি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সইয়ের ঠেলাঠেলিতে ফুলকুমারী চমকিয়া উঠিয়া বসিল। কালীর হাতে পাঁচটা পদ্ম ফুল, তার একটা এই সবে ফুটিতেছিল, কালীর টানাটানিতে সে ইহারই ভিতর একটু একটু ম্লান হইয়া গিয়াছে। ফুলকুমারী যখন উঠিয়া বসিল, তখন তারও অবস্থা সেই মলিন অস্ফুট শতদলের মত—স্বেদসিক্ত, দুঃস্বপ্নের ক্লান্তিতে আলুথালু মূর্ত্তি। কালী ফুল তুলিয়া ফিরিতে ফিরিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিল, তখন সূর্য্য উঠিয়াছে, মুখের মধ্যে জল লইয়া সূর্য্যের পানে ছিটাইতেছিল আর রামধনুর বিচিত্র বর্ণখানি দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া দেখিতেছিল সই কি করিতেছে। কিন্তু সই হাসি মুখখানি লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া নাই! বাঁধা ঘাটের কাছা-কাছি আসিয়া কালী দেখিল ফুলকুমারী শয়নাবস্থায়—তাহারও বড় ভয় হইল! সে তিনলাফে সেই দীর্ঘ সোপান শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া সইয়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। দেখিল সই নিদ্রিত, ঘামে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেছে—কুঞ্চিত কপোল এবং শুষ্ক ওষ্ঠাধরে দুর্ভাবনার রেখা পড়িয়াছে। তাহার প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল—প্রথমে ডাকিল "সই"—দুই তিন ডাক উত্তর নাই। শেষে কালী কাঁদ কাঁদ হইয়া ফুলকুমারীকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার শীতল হস্ত স্পর্শে ফুল চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

কালী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—"ছি ভাই তোকে একলা কোথাও নিয়ে যেতে নেই! এর মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলি! আমার এমনি ভয় হয়েছিল, তার আর কি বলব!—এই দেখ পাঁচ পদ্ম তুলেচি!"

তখনও ফুল মানস নেত্রে পিতার অন্তিম শয্যা দেখিতেছিল—শুনিতেছিল, গম্ভীর কণ্ঠে পিতা বলিতেছেন—"এ বিয়ে সুখের হবে না!" সে সইয়ের হাতের পদ্ম ফুল দেখিয়াও দেখিল না—কাঁদ কাঁদ হইয়া কালীকে বলিল—"চল সই এখান থেকে যাই। আমার বড্ড ভয় কচ্চে।" বলিয়াই সে দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং কালীর কাপড় পরা শেষ হইতে না হইতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। ফুলভরা ডালা পড়িয়া রহিল।

কালী গম্ভীর হইয়া মনস্থির করিয়া বলিল—"এত ভয় কি সই? মালীরে সব চারি দিকে, সুশীলারাও হয়ত আস্‌চে, দাঁড়া ফুলের ডালা নিই!" এই বলিয়া সে সইয়ের নিস্পন্দ হস্তে ফুলের ডালা দিল, নিজে বাঁহাতে পদ্ম ফুল ও ডালা লইয়া ডানিহাতে সইকে ধরিয়া লইয়া চলিল। তারা ফটক পার হইতে না হইতে সুশীলারা সব আসিয়া জুটিল

বাহিরে আসিয়া ছুজনেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কালী বলিল "এত ভয় পেলি কেন সই ?"

ফুল। ডান বাগদী বুড়ীকে দেখে, সে মন্ত্র পড়ে শাঁপ দিয়ে গেল। অমনি যেন আমার ঘুম এল—তার পর একটা বড় ভয়ের স্বপন দেখ্‌লাম!

কালী রোমাঞ্চ হইল—সে ভয়ার্ত্ত স্বরে আবার শুধাইল—"কি স্বপন সই ?"

তখনও ফুল মানস নেত্রে বাপের অন্তিম মূর্ত্তি দেখিতেছিল—এই মাত্র শ্রুত তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের রব তাঁহার কানে বাজিতেছিল, সে ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া সব কথা কালীকে বলিল। তাহার ফলে আমবাগান দিয়া তাহারা যাইতে সাহস করিল না—ভিন্ন দূর পথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। থাকিয়া থাকিয়া কালী একবার বলিল, "বাগ্‌দী বুড়ী বাগানে আস্‌বে কেন ভাই—আর কাউকে হয়ত তুই দেখেছিস্!"

ফুল। তা হবে—কিন্তু ঠিক্ বাগ্‌দী বুড়ীর মতন সই! তেমনি পাকা চুল, হাতে লাঠি—চোক যেন ঘুরচে! ঝগড়া করে ফুল তুলে ভাল হয়নি ভাই—হয়ত ঠাকুরের শাঁপে এমন হল!

কালী চুপ করিয়া রহিল। ফুলকুমারীকে যে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তার বিয়ে সুখের হবে না মনে করিতে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হয়ত তাহার জেদেই ঠাকুর রাগিয়া শাঁপ দিলেন ভাবিয়া তাহার আত্মানুশোচনা হইল—চোক ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। কিন্তু এই কোমল বয়সেই তাহার একটু পাকা বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। সইকে শুধাইল—সইমাকে কথাটা বলে একটা পূজো দেওয়া ভাল কি না ? ফুল তাতে রাজি নহে। মাকে কোন মতে একথা বলা হবে না—মা বক্‌বে! আর বিয়ের কথা কি বলা যায়! কালী অনেক বুঝাইয়াও সইয়ের মন ফিরাইতে পারিল না। শেষে নিরুপায় হইয়া বলিল, "তা কি করতে হবে—তুইই বল!"

ফুল নতমুখে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"বিয়েতে কাজনেই সই—যাতে বিয়ে না হয় তাই কর।"

বড় দুঃখেও কালী হাসিল। বলিল—"নে ক্ষেপামি রাখ—তুই আমি বিয়ের কর্ত্তা আর কি। ৮ দিন পরে বিয়ে আজ বলে বিয়েতে কাজ নেই! ভাল, আমার কি সাধ্যি ?"

ফুল সইয়ের হাত ধরিল। চোক হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া দুখানি হাত ভিজিয়া যাইতেছিল। কালী কাতর হইয়া বলিল—"তা কি করতে হবে বল—তাই করি!" ফুল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুট স্বরে এদিক ও দিক চাহিয়া বলিল—"তুই কেন তাকে বুঝিয়ে বল্‌না ? সে যদি বিয়ে কর্ত্তে না চায় ত বিয়ে হবেনা।"

কালী বুঝিয়া বলিল—"ওঃ তুই পুঁরো দাদার কথা বল্‌চিস্—তা ভাই কেমন করে

এমন সময় পাঠশালার ছুটী পাইয়া পুরন্দর ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার বাড়ী যাবার সেই পথ। দূর হইতে দেখিয়া দুই সইয়ে ভারি ব্যতিব্যস্ত হইল,—ফুল চোকের জল মুছিতে বেহাত হইয়া ফুলের ডালা ফেলিয়া দিল, এবং তাড়াতাড়ি ফুল কুড়াইতে লাগিল। কালীর কালো কালো মুখখানিতে হাসি ধরে না! পুরন্দর কাছে আসিয়া একটু অপ্রতিভ হইল—কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মর্ ছুঁড়িরে এখানে তোরা কেন?"

কালী হাসিয়া কুটি কুটি হইল—সে অবস্থাতেও তামাসার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। বলিল—"তুমি এলে কেন দাদা—সইকে দেখ্‌তে বুজি?" পুরন্দর কালীকে মারিতে আসিয়া হাতে আর কিছু না পাইয়া তাহার ডালার দুটো ফুল লইয়া তাহার মাথায় গুজিয়া দিল। কালী বলিল—"ও কি দাদা—কি দিলে মাথায়?"

পুর। কেন ফুল!

কালী। ওহো সবাইকে বলে দেব—কনের নাম করলে পুরো দাদা!

পুর। তা বেশ করেচি ছুঁড়ি—ফুল ফুল ফুল—হলো?

হঠাৎ কালী গম্ভীর হইয়া পুরন্দরকে ধীরে ধীরে বলিল—পুরো দাদা, তোমায় একটা কথা বলব! ভারি একটা কথা। সই বল্‌তে বলেচে, তোমার শুন্‌তেই হবে!"

ফুলকুমারী তখন পুষ্পচয়ন ছাড়িয়া হাত দুখানিতে চোক ঢাকিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন! পুরন্দর তাহার দিকে একবার চাহিয়া আবার ছুটিয়া চলিলেন। কালীকে বলিয়া গেলেন—"আচ্ছা বোন্‌টী তোরা দুপুর বেলায় তাল পুকুরে যাস্ কাপড় কাচতে, সেইখেনে কথা শুনব!

সেই পরামর্শই ঠিক্ হইল। ফুলের তাতে ভারি লজ্জা—কিন্তু কি করে নহিলে নয়। তখন দুই সইয়ে বাড়ী ফিরিল।

স্থূলদেহ কমাইবার একটি উপায়।

অতি অল্প পরিমাণে জলীয় পান করা স্থূল দেহ কমাইবার একটি অতি সহজ উপায়। বিলাতের ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্রের জনৈক লেখক ইহার স্বপক্ষে আপনার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া বলেন—খাদ্য কিছুই না কমাইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে আন্দাজ দেড় গ্লাসের অধিক জল পান না করায় সপ্তাহে তাঁহার আধসের করিয়া শরীর কমিয়া যায়। অতএব আহারের পরিমাণ সমান রাখিয়া কেবল পানীয় কমাইলেই চলিতে পারে। কিছু দিন পরে এই অল্প জল পান তাঁহার বেশ সহিয়া গেল।

ইহার উপকারিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রকটারের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বলেন বাত বা অম্লরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ স্বল্প জলপান নিরাপদ নহে, অন্ততঃ ডাক্তারের অনুমতি ব্যতিরেকে এ নিয়ম পালন করা তাহাদের অনুচিত, নিজের উপর পরীক্ষা করিয়া তিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন "১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি কৃশ হইবার জন্য অল্প জলপান করিতে লাগিলাম। তখন আমি যে বিশেষ স্থূলকায় ছিলাম তাহা যদিও নহে, ২ মন ২১ সের তখন আমার ওজন, কিন্তু আমার মত স্বল্প-প্রশস্ত মধ্যাকৃতিদিগকে ইহাতেই স্থূলকায় বলা যাইতে পারে। উক্ত নিয়ম পালন করিয়া দুই মাসের মধ্যেই আমার ভার কমিয়া ১ মন ৩৯ সের হইল। কিন্তু আমার বাতশ্লেষ্ম-ধাতুবশতঃ বাতের যন্ত্রণা বিশেষ বাড়িয়া উঠিল। স্বল্প জল পান করার সহিত আমার এই যন্ত্রণার যে কিছু সম্পর্ক আছে আমি প্রথমে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু যখন তাহা বুঝিয়া অধিক জল পান করিতে লাগিলাম—সে যন্ত্রণা তখন দূর হইল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জে ডবলিউ ড্রেপারের সহিত প্রকটারের সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রকটারের এই কথা লিখিয়া লয়েন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তাঁহার সহিত যখন প্রকটারের দেখা হয় তিনি তখন প্রকটারকে বলেন যে—শরীর-বৃদ্ধিবশত তাঁহাকে সেই পর্য্যন্ত আর কষ্ট পাইতে হয় নাই।

তিনি বলেন, বাতরোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির যদি উক্ত নিয়ম পালন আবশ্যক হয়—তবে নিয়মিত দেড় গ্লাস পানীয়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণে বাইকারবনেট-সোডা অথবা বাইকারবনেট-পটাস ব্যবহার করিলে স্বল্প জল পানে আর ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার দ্বারা স্থূলদেহ কমাইবার এই সহজ উপায়টি অর্থাৎ স্বল্প জলপান—সকলেরি পক্ষে নিরাপদ হইতে পারে।"

তবে স্থূলকায় ব্যক্তিগণ সাবধান যেন হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় এ নিয়মটি পালন করিতে গিয়া উপস্থিত অসুখ হইতে অন্য অসুখের হাতে গিয়া না পড়েন।

স্নেহময়ী।

সর্ব্ব-সহা ধরণীর মত, ছিলে দেবী এই নিলয়ের।
স্নেহময়ি, করুণ নয়নে হেরিতে গো মুখ সকলের।
করুণার ছবি যেন এঁকে
আননেতে গিয়েছিল রেখে!
শত কোটী জননীর হৃদি,
দিয়ে গড়া বিপুল হৃদয়,
দাস, দাসী, প্রতিবাসী আদি,
মা, বলে জানিত সমুদয়।
হৃদয়ের নীড়ে মা, তোমার, মোরা সবে বেঁধে ছিনু বাসা,
জননী গো কার ডাক্ শুনে ফেলে গেলে আকুল নিরাশা।

যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে ভেবেছিলে যাহাদের কথা,
সেথা থেকে কর আশীর্ব্বাদ, তারা কেহ নাহি পায় ব্যথা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে, দেখেছিলে যাহাদের মুখ,
তারা যেন তব আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করে মিছা সুখ দুঃখ।
ধৈর্য্যে ধরা হৃদি-খানি লয়ে,
শোক দুঃখ অবিরাম সয়ে,
পেয়েছ যে অমৃত আলয়, যেন তাহা চিরদিন রয়,
সংসারের শোক দুঃখ ভার, পরশে না যেন সেই দ্বার।
সাজাইতে আসন তোমার,
আগে চলে গিয়াছেন যাঁরা,
ঘেরিয়া তোমার চারিধার
প্রেম অশ্রু ফেলিছেন তাঁরা।
তবে, আজিকার দিনে গো জননী—
ভুলে যাও ম্লান মুখ গুণি!
ভুলে যাও মিলন-আনন্দে হেথাকার দুঃখ অশ্রুধারা!

মস্তিষ্ক-ভার।

মিস ফ্রান্সেস কবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের একজন বিদ্যাবতী রমণী। অধ্যাপক রোমানিশ যে বলিয়াছেন—মস্তিষ্কের ভারাধিক্য পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, মিস্ কব একথা অস্বীকার করিয়া বলেন,—মিসেস সমারভিলের মাথা ত নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল এমন কি তদপেক্ষা ছোট মাথা তিনি কখন দেখেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া মিসেস সমারভিল যে অসামান্য বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।* আর অধ্যাপক রোমানিস স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাহাদের মাথা দেখিয়া এরূপ স্থির করিয়াছেন তাহা জানা আবশ্যক? কারণ রমণীগণের অত্যুকৃষ্ট মস্তক তিনি কখনই পান নাই। অথচ তিনি প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক থ্যাকারির মস্তিষ্কের অসাধারণ ভার উদ্ধৃত করিয়াছেন আর বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন পুরুষগণের মস্তিষ্কের গুরুভারের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ অন্যায় করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। মিসেস সমারভিলের মস্তকের ক্ষুদ্রত্ব বরং কতক পরিমাণে ইহাই প্রতিপন্ন করে যে মস্তিষ্কের গুরুত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টত্বই অধিক ফলপ্রদ, এবং ইহাও অনেক দেখা গিয়াছে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মধ্যে বৃহদ্-মস্তক-লোকও নিতান্ত নির্ব্বোধ। ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানে ইহা ত চলিত কথাই যে "বৃহদ্ মস্তক" অর্থাৎ বোকা গর্দ্দভ।

---

* মিশেষ সমারভিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিজ্ঞানবিদ্-রমণী। সূর্য্য কিরণের উপর কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া তিনি বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লাপ্লাসের মেকেনিক্ সেলেস্ত নামক গ্রন্থের ইনি অনুবাদ করেন—এবং অনেকগুলি বিজ্ঞান পুস্তক ইঁহার কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

এই সকল কার্য্যের সম্মান স্বরূপ ইঁহাকে রাজকীয় জ্যোতিবিক সভার সভ্যপদ প্রদান করা হয়।

বিদ্রোহ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুক্মা বাহিরবাটীতে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ কোথায়?" প্রহরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল? "বেড়াইতে গিয়াছেন?"

রুক্মা বলিল—"এত রাত্রে—বেড়াইতে গিয়াছেন! যাও সংবাদ দাও—মহারাণী ডাকিতেছেন।"

প্রহরী বলিল—"মহারাণী ডাকিতেছেন—কিন্তু—

রুক্মা রাগিয়া গেল, বলিল—"কিন্তু কি রে হনুমান? তোর দেখছি বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে?"

প্রহরী মুস্কিলে পড়িল, বলিল—"কিন্তু—কিন্তু মহারাজ যে যেতে বারণ করেছেন?"

রুক্মা। "মহারাজ যেতে বারণ করেছেন?"

প্রহরী বলিল—"হ্যাঁ আমি ঠিক বলছি রুক্মা—মহারাজ নদীর ধারের দিকে বেড়াতে গেলেন, আর আমাকে হুকুম দিয়ে গেলেন—কেহ যেন তাঁকে খুঁজতে না যায়—রাণীজিকে বলিও—এ খোদাবন্দের কোন কসুর নেই।"

রুক্মা বলিল—"বটে, তবে তুই থাক" বলিয়া দ্রুত বেগে সে দ্বার নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রহরীর কথায় তাহার মনে মহা সন্দেহ জন্মিল! রাজা বাহিরে,গিয়াছেন—এত রাতে,—তা আবার অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! মনে মনে ভাবিল 'হারে বোকা মেয়ে কিছুতেই তুই বুঝিবি নে? কেবল আমাদের উপর রাগ করিবি—আর ঘরে বসিয়া কাঁদিবি? তবু একটা উপায় করিবিনে? পোড়ারমুখীকে দেশ ছাড়া না করিলে কোন দিন সে যে পাটরাণী হইয়া বসিবে?"

রুক্মা নদী তীরে আসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল, কোন পথ অবলম্বন করিলে সে রাজার খোঁজ পাইবে—ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, তীরাভিমুখেই নামিতে লাগিল। হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দূরের বৃক্ষতলে যেন দুইটী মনুষ্য ছায়া!

রুক্মা একটু ঘুরিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল, গাছের ভিতর দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্নালোক আসিয়া রাজার মুখে পড়িয়াছিল—রুক্মা রাজাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু আর একজনকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না, একটি গাছের ডালের আড়ালে তাহাকে অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, একেবারে তাঁহাদের সম্মুখে না গেলে তাহাকে আর ভাল করিয়া দেখিবার যো নাই, কিন্তু রুক্মা তাহার আবশ্যকই বিবেচনা করিল না; যখন দেখিল এ দুইজনের একজন রাজা তখন আর এক জন যে কে তাহাকে তাহার

সন্দেহ মাত্র রহিল না। ইহার পর সে শপথ করিয়া বলিতে পারিত—যে নিজে স্বচক্ষে মহারাজের সহিত একত্রে নির্জ্জনে নদীতীরে গাছেরতলায় ভীলকন্যাকে দেখিয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে রাগে কষ্টে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে কিছু মাত্র আহ্লাদও যে ছিল না তাহা নহে, আহ্লাদটা অহঙ্কারের আহ্লাদ, তারের উপর চুরী করিয়াছে, এই আহ্লাদ।

ইহার পর মুহূর্ত্ত মাত্র না দাঁড়াইয়া সে ধীরে ধীরে আবার অলক্ষ্যে উপরে উঠিল, উঠিয়া দ্রুতপদে রাণীর নিকট উপস্থিত হইল।

রাণী আর তখন প্রমোদ উদ্যানে নাই, তাঁহার শয়ন কক্ষে। বাপ্পার ক্রন্দনে কিছু পূর্ব্বেই তিনি প্রাসাদে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। উপরে আসিয়া তিনি যখন বাপ্পাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাঁহার চুম্বনে শিশু যখন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া বার বার মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুই হাতে মায়ের মুখ খানি ধরিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল তখন রাণীর কষ্টের হৃদয়ে একটি পবিত্র সান্ত্বনা স্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। বালক তাঁহাকে আদর করিতে করিতে তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল, রাণী ঘুমন্ত শিশুকে কোলের কাছে লইয়া বিছানায় শয়ন করিলেন, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সে হাসিয়া উঠিতে লাগিল. দু একবার মা মা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মায়ের চুম্বন স্পর্শ পাইয়া আবার নিশ্চিন্ত নীরব হইয়া গেল। রাণী তাহার ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার এই ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন, এই অনুভবে সন্ধ্যাবেলার দুঃখ বহুদিনের বিস্মৃত কষ্টের মত প্রশান্ত হইয়া আসিল, তাঁহার হৃদয়ে রাজার প্রতি অভিমানের আর তখন স্থান রহিল না, যতই তিনি সন্তানের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, যতই তিনি তাহার ভালবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যতই সে মুখে রাজার আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সেই স্নেহ হইতে রাজার স্নেহে লীন হইতে লাগিল, রাজা যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি তখন একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় অভিমান-শূন্য হইল, তাঁহার প্রেম তাঁহার ভালবাসাই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন "ছি ছি আমি কি করিয়াছি—মিছামিছি তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি—তিনি হয়ত ভাবিয়াছেন—আমি তাঁহাকে সন্দেহ করি, কেন আমি এমন কাজ করিলাম।" রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রেম প্রকাশের উৎসাহে এতক্ষণকার দুঃখ তাপ মগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় রুক্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন—"মহারাজ কোথা?" রুক্মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে মনে মনে যাহা ভাবিতেছিল মুখেও তাহাই বলিল, বলিল—"আরে অবোধ মেয়ে—এখনো

বুঝিবি নে ? পোড়ারমুখীটা যে পাটরাণী হইয়া বসিবে ? রাজা তাহার কাছে – এই আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।”

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না, জগৎ সংসার কেবল তাঁহার চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল, তিনি শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া একটা ঘূর্ণঝটিকার সহিত যুঝাযুঝি করিতে লাগিলেন। রুক্মা তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ নানারূপ উপদেশ দিতে দিতে খানিকটা কান্না কাটি করিল, অবশেষে মহারাজকে আসিতে দেখিয়া চলিয়া গেল।

রাজা যখন ধীরে ধীরে পালঙ্কে আসিয়া বসিলেন, তখনো রাণী জাগিয়া, কিন্তু নিদ্রিতের মতই নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া রহিলেন। রাজা দেখিলেন, রাণী ঘুমাইয়া, গৃহ এমন উজ্জ্বল দীপালোকিত নহে, যে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু সেই অস্পষ্ট মলিন আলোকে তাঁহার ঘুমন্ত মুখে একটি অতি ম্লান সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইয়াছে, প্রশান্ত ললাট কি যেন একটি কষ্টের ছায়ায় রেখাযুক্ত, মুদিত কোরক সদৃশ নয়ন-পুট যেন অশ্রুভারে অবসন্ন হইয়াই মুদ্রিত, মুদিত ওষ্ঠাধর—কি যেন করুণ ভাবে ঈষৎ বিকম্পিত। রাজা বুঝিলেন, তিনি কি অন্যায় করিয়াছেন, এই কুসুম কোমল হৃদয়ের প্রতি কি করিয়া তখন অত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন তাঁহার নিজেকে দোষী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, গুরুতর দোষী মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন প্রতারক কি প্রতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি জানেন না, জানিতে সাহসও নাই, তবু যেন প্রতারক। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার মনে হইল সেই পবিত্র মুখ স্পর্শ করিতে যেন তাঁহার অধিকার নাই, তিনি শুধু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি এত স্থির হইয়া পড়িল যে রাণী যে নয়ন খুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছেন—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি শুধু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার স্থির দৃষ্টিতে ক্রমে সে মুখ আর একরূপ হইয়া পড়িল, ক্রমে যেন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, এ কাহার মুখ ? আকাশের মত নীলের মধ্যে কাল চ'খের তারা এ কার ? স্বচ্ছ বিষণ্ণ মুখের মধ্যে কাহার এ মুখের ছায়া ? সেমন্তী সেমন্তী তুমি কে ? তুমি কি ?—রাজা ধীরে ধীরে সেই চক্ষে চুম্বন করিলেন,—রাণীর স্তম্ভিত অশ্রু-রাশি সহসা উথলিয়া উঠিল, রাজা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আমাকে ডাকিয়াছিলে ?”

রাণী কথা কহিলেন না, তখন যে ভাবে ডাকিয়াছিলেন, এখন আর সে ভাব নাই। অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া মার্জ্জনা চাহিবার জন্য তখন ডাকিয়াছিলেন—কিন্তু এখন কে অপরাধী ? রাজাকে যখন ভীলকন্যার মুখ দেখিতে বারণ করিয়াছিলেন—তখন সন্দেহ করিয়া সে প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু এখন ? এখন অভিমান সোহাগের অভি-

মান নহে, এখন সন্দেহের অভিমানে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাকিয়াছিলে ?"

রাণী গর্ব্বিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তখন জানিতাম না কোথায় ছিলে ?"

রাজা বলিলেন—"কোথায় ছিলাম ?"

রাণী। "যেখানে ভাল লাগে"

রাজা। "নিজেইত জানি না কোথায় ভাল লাগে ?"

রাণী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"কেন ভীল কন্যা"—এতক্ষণ রাজার হৃদয়ে একটা দোষের ভাব—অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল—রাণীর এই কথায় তাহা দূর হইল। এই সন্দেহে, এই মিথ্যা অপবাদে তাঁহার হৃদয় বিষাক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তিনি নির্দ্দোষী, কিন্তু নিজের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিতে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের অপমান মনে হইল, তিনি কেবল ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"মহিষি, এসব কথা শুনিতে আমার অবসর নাই, আমার কাজ আছে, চলিলাম, আজ রাত্রে হয়ত আসিতে পারিব না।"

রাজা চলিয়া গেলেন—মহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। রাণীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহার এই উত্তর—এই ব্যবহার ? একটা সান্তনার কথা কহিয়া একবার আদর করিয়া রাজা যদি কহিতেন সব মিথ্যা—তাহা হইলে কি তাঁহার এই সন্দেহ এই যন্ত্রনা নিমেষে অন্তর্হিত হইত না ? তবে কি সত্য—সবই কি সত্য ? তাঁহার প্রতি আর রাজার ভালবাসা নাই ? সমস্ত হৃদয় প্রাণ যাহার চরণে ঢালিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে কি একটা মমতার কথাও আর পাইবার আশা নাই ?

রাণী অসহ্য মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়া অতিবাহিত করিলেন, পরদিন তাঁহার সেই গভীর বিষাদে একটি উদাস-ভাবের ছায়া পড়িল। তিনি আর রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; ভাবিলেন হউক যাহা হইবে হউক। রাণীর মাঝে মাঝে কেবল হরিতাচার্য্যের কথা মনে পড়িতে লাগিল—"রাজার অমঙ্গল", কি অমঙ্গল ? ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে এই কি অমঙ্গল ? ইহা রাজারও অমঙ্গল নহে রাজ্যেরও অমঙ্গল নহে—একমাত্র তাঁহারই অমঙ্গল, রাজার স্নেহ প্রেম হারাইলে একমাত্র তাঁহারই ক্ষতি, ইহাতে অন্যের কি ? তিনি বুঝিলেন হরিদাচার্য্য তাঁহার কষ্ট নিবারণ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে আর কাহারো অমঙ্গল হইতে পারে না।

গভীর ভালবাসায় আঘাত পাইলে—মর্ম্ম যন্ত্রণায় অকুল হইলে—যে শূন্যময় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া হৃদয় কোন দিকে, আর আলোককণাও দেখিতে পায় না সেই নিরালোক-শূন্য সমুদ্রে আত্মহারা হইয়া রাণী ভাবিলেন "আমি কে ? আমার আবার

মঙ্গল অমঙ্গল কি? হউক যাহা হইবার হউক, ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে হউক"।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রুক্মার কাছে হরিদাচার্য্য সকল কথাই শুনিলেন, রাজার আচরণ, রাণীর মনের কষ্ট, অথচ ইহার প্রতিকারের প্রতি অনাস্থা সকলি শুনিলেন। হরিদাচার্য্য দেখিলেন ভবিতব্য অক্ষত-পদক্ষেপে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বুঝি আর বাধা দেওয়া যায় না। তিনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিলেন—

"মা ইচ্ছা করিয়া কেন এ কষ্টভোগ করিতেছ?

রাণী বলিলেন—সাধ করিয়া কে কষ্ট ভোগ করে?

পুরো। "তবে কেন তুমি ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছ না। তুমি এইরূপ ঔদাস্যভরে থাকিলে যে সব যায়!

রাণী। থাকিতে পারিলে ত আমারি ভাল। কেন নিষ্কাম হইতে ত আপনারাই উপদেশ দেন?

পুরোহিত। মা, দুঃখ ভোগ করা কি নিষ্কাম হওয়া? দুঃখ দূর করাই নিষ্কাম হইবার উপায়।"

রাণী। "লোকের দুঃখ দূর করা, কিন্তু নিজে ভোগ করা।"

পুরো। "না মঙ্গল নিজের পরের নাই, যাহাতে নিজের পরের বিশ্বসংসারের মঙ্গল হয়—তাহাই আমাদের করণীয়। নিষ্কাম হইলে পরের মঙ্গলের সহিত নিজের চূড়ান্ত মঙ্গল সাধিত হয়—তাই নিষ্কাম ধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং মঙ্গল অভিপ্রায়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই নিষ্কাম ইহার উপায়,—কর্ম্মে উদাসীনতা জড়তা মাত্র তাহা কর্ম্মহীনতা নহে।

রাণী। "কিন্তু আমার কি সাধ্য আমি জগতের মঙ্গল করি? কি আমার কর্ত্তব্য আমি কি করিয়া বুঝিব? আমি সমুখে যে গরীবকে দেখিতেছি—তাহাকেই আগে দান করিতে ইচ্ছা হয়; সত্য সংসারে সেই দানের আরো যোগ্য পাত্র আছে কিন্তু তাই ভাবিয়া সেই দান তুলিয়া রাখাই কি আমার কর্ত্তব্য? আমার নিজের মঙ্গলে আর একজনের অমঙ্গল, রাজার মঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল, আমি রাজ্যের মঙ্গল করিতে গেলে রাজা কষ্ট পান। আমি স্ত্রী, রাজার কষ্টমোচন করাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।"

পুরোহিত স্তব্ধ হইলেন, কিছু পরে বলিলেন—"মহিষি, স্বামীর মঙ্গল সাধনই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যাহা করিতেছ তাহাতে কি তাঁহার মঙ্গল হইতেছে? তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিনী, তাঁহাকে মোহ হইতে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। মোহই অমঙ্গলের মূল, তুমি তাঁহাকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে?"

মহিষী চুপ করিয়া রহিলেন—খানিকপরে বলিলেন—"দেব, কি বলিতেছেন বুঝিলাম না? ভালবাসা যদি মোহ হয় আমাকে ভালবাসাও ত মোহ? যতদিন সংসারে থাকিবেন সে মোহ হইতে ত পার পাইবেন না, তবে কেন আমি তাঁহার পথের কণ্টক হইব? আমি রাণী ছিলাম, আর একজন না হয় আমার স্থানে বসিবে।"

পুরো। "না দেবি, সংসার-ধর্ম্ম সংসারী ব্যক্তির পক্ষে মোহ নামের বাচ্য নহে। অধিকারী ভেদে ধর্ম্ম। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ মোহ সুতরাং অধর্ম্ম, কিন্তু সংসারীর পক্ষে বিবাহ মোহ নহে অধর্ম্মও নহে। তুমি তাঁহার বিবাহিত পত্নী তোমাকে ভালবাসা তাঁহার মোহ নহে, কেননা তাহা হইতে অন্যায় অমঙ্গল উৎপন্ন হইবে না।"

রাণী। "আর একজনও বিবাহিত হইবে। রাজা যে এতদিন অন্য বিবাহ করেন নাই ইহাই ত আশ্চর্য্য!

পুরো। "তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এস্থলে বিবাহ হইবার নহে, রাজা ভীলকন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে পারেন না। রাজা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কাজ করিতেছেন তুমি তাঁহাকে উদ্ধার কর। কেবল তাহাই নহে, একজন পবিত্র বালিকা কলঙ্কিত হইতেছে—তুমি তাহাকে রক্ষা কর—সে স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোককে না রাখিলে কে রাখিবে?"

রাণী। "কিন্তু নিজে যদি সে নিজেকে না রাখে ত কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে!"

পুরো। "সে বালিকা, নিজেকে রক্ষা করা তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি চেষ্টা করিলে তাহা পারিবে। রাজার কর্ত্তব্য এখন তোমার পালনীয়।"

মহিষী তাহা বুঝিলেন, কিছু পরে বলিলেন—"করিব—যাহা অদৃষ্টে থাকে করিব—কিন্তু কি করিব?

পুরো। তাহাকে রাজার দৃষ্টি পথ হইতে দূরে রাখ—আর কিছু করিতে হইবে না।

রাণী বলিলেন—"কিন্তু—সত্য যদি—" বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। পুরোহিত বলিলেন—"না মা আর ইতস্তত করিও না—সময় বহিয়া যাইতেছে।"

পুরোহিত চলিয়া গেলেন, রাণী ভাবিতে লাগিলেন, "সব কি সত্য? কি করিয়া জানিব এ সমস্ত মিথ্যা নহে? কি করিয়া জানিব রাজার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিতেছি না? রাজার নিকট হৃদয় খুলিয়া তাঁহার হৃদয়ের কথা শুনিবার জন্য তিনি আকুল হইলেন—সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া তাঁহাকে আজ সব জিজ্ঞাসা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এরূপ সঙ্কল্প ত প্রতিদিনই করেন—তবে তাহা পারেন কই? তাঁহাকে দেখিলে কি যে কষ্টে অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায় সে সঙ্কল্প রাখিতে আর কই পারেন! রাণী দেবতার নিকট বল ভিক্ষা করিলেন, আকুল হইয়া কাঁদিয়া মনে মনে কহিলেন "দেব দেব মহাদেব, আমার স্বামীর নিকট আমি ঘোর অপরাধী, এ অপ-

রাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমার বল দাও, তিনি স্বামী, তিনি দেবতা, তিনি যাহা করেন তাহা দোষের হইতে পারে না—ভগবান, তাঁহার অপরাধ যেন আমার মনে না আসে, আমাকে বল দাও আমার অপরাধ যেন খুলিয়া বলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা পাই।”

তারকা-গুচ্ছ।

তারকাদিগের মধ্যে যে একটি দলবদ্ধ হইবার ভাব আছে “যমক ও বহুসঙ্গিক তারকাতে” তাহা আমরা দেখিয়াছি। নক্ষত্র জগতের কোন কোন স্থলে এই ভাবের আশ্চর্য্য রূপ বিকাশ দেখা যায়। প্লায়ডিস বা সপ্ত তারকা-রাশি ইহার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। স্বাভাবিক চক্ষে এই সপ্ত নক্ষত্রের ৬টি সুস্পষ্ট দেখা যায়। প্রবাদ এই, সাতটির মধ্যে একটি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার এবং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে, ৭টির ত কথাই নাই এই গুচ্ছে ১১টি তারা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর দূরবীনের দৃষ্টিতে—তাহাদের ক্ষমতার তারতম্যানুসারে—এই কয়েকটি ৫০ হইতে ১০০ টিতে পর্য্যন্ত পরিণত হয়।

বৃষ রাশির হায়েডিস-গুচ্ছ আর কর্কটরাশির মধুমক্ষিকা-গুচ্ছ ও এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আকাশে যত গুলি গুচ্ছ দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে পারসিউস রাশির গুচ্ছই সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে জমকালো। ইহার মত বিশাল গুচ্ছ যে আকাশে আর নাই তাহা নহে—তবে তাহারা অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ।

এইরূপ তারকা-দল দুই ভাগে ভাগ হইয়া থাকে।

প্রথম, অসম তারকা-দল, ইহা স্বাভাবিক চক্ষে স্পষ্টরূপে হউক অস্পষ্টরূপে হউক দেখা যায়।

দ্বিতীয় তারকা গুচ্ছ। স্বাভাবিক চক্ষে ইহা দেখা যায় না, কিন্তু ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহা তারকারাশির সমষ্টি বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা

নিম্নে হারকিউলিস রাশির তারকাগুচ্ছের একটি ছবি প্রদত্ত হইল।



"হারকিউলিস রাশির তারকা গুচ্ছ"

মাঝারি গোছ দূরবীণ দিয়া হারকিউলিস রাশির উক্ত প্রকাণ্ডগুচ্ছটি এবং তুলা ও কুম্ভ রাশির বিশাল গুচ্ছ দুইটি দেখা যায়। কিন্তু কতকগুলি গুচ্ছ—যাহা আমাদের দৃষ্টিগম্য নক্ষত্র জগতের বাহিরে—সেই জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ যাহাদের ভিন্ন জগতের বলিয়া থাকেন, তাহারা এতই দূরে অবস্থিত এবং সেইহেতু এত হীন প্রভ যে নিতান্ত ক্ষমতাশালী দূরবীন দিয়াও তাহাদের প্রকৃত আকৃতি এবং সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় না। তাহাদের কিনার দেশের জ্যোতি ক্রমশ হ্রাস হইতে হইতে উজ্জল ধূমাকার বা মেঘাকারে পরিণত হইয়া অবশেষে কোথায় বিলীন হইয়া পড়িতেছে কিছুই বুঝা যায় না। ভালপেকিউলা রাশির ডামবেল গুচ্ছ এবং বৃষ রাশির কাঁকড়া গুচ্ছ ইহার দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি তারকাগুচ্ছের জ্যোতি কিনার দেশ অপেক্ষা মধ্য ভাগে এত অধিক যে মধ্যের দিকেই তাহারা অধিকতর সংশ্লিষ্ট ভাবে বিরাজিত মনে হয়।

আকাশে কতগুলি তারকা গুচ্ছ ও নীহারিকা আছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষী কর্ত্তৃক তাহা পর্য্যবেক্ষিত হইয়া তালিকাবদ্ধ হইয়াছে। স্যার উইলিয়ম ও জন হারসেলের তালিকাই এ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রধান। স্যার জন হারসেলের শেষ তালিকায় ৫০৭০টি তারকাগুচ্ছ আছে। নীহারিকা ও তারকা গুচ্ছে কি প্রভেদ তাহা আমরা আগামী বারে বলিব।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

দারজিলিং।

দারজিলিংএর মত মজার জায়গা আর দেখি নাই—যেন কামরূপ, যে দিকে চাই নূতন নূতন রূপের খেলা।

দিকমণ্ডলীর এক দিকে চাহিতে আর একদিক ভুলিয়া যাইতে হয়—এক শোভা দেখিতে আর এক শোভা নয়নে ফুটিয়া উঠে। কোন দিকে তুষার পর্ব্বত স্নিগ্ধ বিদ্যুতের মত ঝলমল করিতেছে—কোন দিকে শ্যামল পাহাড়স্তর দিগন্তের কোলে দণ্ডায়মান, কোন পাহাড়ের পশ্চাৎ হইতে আগুণের মত মেঘ উঠিয়া আকাশের গায়ে ঠিক আগুণ লাগিয়াছে। কোন দিকের পাহাড় মেঘে মেঘে একেবারে আচ্ছন্ন। কখনো একদিকে নীলাকাশে চাঁদের মূর্ত্তি—অন্য দিক প্রখর সূর্য্য কিরণে ঝলসিত। কোন-টির সহিত যেন কোনটির সাদৃশ্য নাই—অথচ এই বৈষম্যের মধ্যে একটি মহান সাম্য বিরাজমান; সেই মেঘ, সেই পাহাড়—সেই বন জঙ্গল, সেই উন্মুক্ত অবারিত দিগন্ত দৃশ্য।

মেঘ-রৌদ্রের লুকাচুরী খেলা ত এখানে অনবরত চলিতেছে। এই দেখ প্রখর রৌদ্র—, হঠাৎ একটি পাহাড় হইতে তরল মেঘ ধূম উঠিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে দেখিতে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—দেখিতে দেখিতে সেখানকার পাহাড় দৃশ্য—গাছপালা বাড়ী ঘর সেই মেঘ ধূমে একাকার হইয়া যায়, অনন্ত বিস্তৃত শূন্য সমুদ্র ছাড়া তখন আর সে দিকে কিছুই দেখা যায় না, অথচ অন্য দিকে হয়ত তখনো রৌদ্র আছে। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই আবার ধীরে ধীরে সে মেঘ পরিষ্কার হইয়া যায়। আস্তে আস্তে সেই মেঘের মধ্য হইতে প্রথমে পাহাড়ের চূড়া গুলি ক্রমে ক্রমে নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সে বড়ই চমৎকার, দৃশ্য! তরল মেঘের মধ্যে হঠাৎ গাছ পালার সেই অস্ফুট চিত্র—যেন আকাশের পটে মায়া ছবি ভাসিয়া বেড়ায়। সে গাছ পালার মূল কোথায় কে জানে? নীচের দিক তখনো মেঘাচ্ছন্ন; গাছের শ্রেণীতে তাহা মিলিত নাই—আশ পাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন; ছিন্ন মূল—ছিন্ন শ্রেণী—কতকগুলি শাখা প্রশাখা মেঘের বর্ণে আকাশের বর্ণে—অপূর্ব্ব একটি বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশে বিরাজিত!

এরূপ উড়ন্ত মেঘে কিন্তু বৃষ্টি হয় না, কুয়াসার মত অল্প ভিজাইয়া যায়। ইহা পাহাড়ে-কুয়াসা। এইরূপ কুয়াসাতে যেমন পাহাড় ঢাকিয়া যায় তেমনি উজ্জ্বল মেঘেতেও এখানে পাহাড় ঢাকিয়া যায়—তবে উভয়ের মধ্যে তফাৎ এই—কুয়াসাতে দিকবিদিক পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে—ইহাতে তাহা হয় না। যতই বেলা বাড়িতে থাকে—উজ্জ্বল মেঘের স্তর—পাহাড়ের আকৃতিতে পাহাড়ের গায়ের উপর জমাট বাঁধিতে থাকে।

এখন বেলা দ্বিপ্রহর। পাহাড়ের স্তরের উপর উজ্জ্বল মেঘের স্তর, তাহার মাথার উপর

নীল শ্লেটের মত জমাট নীলাকাশ, নীলাকাশে কোথাও বা লাল কোথাও বা বেগনি কোথায় বা উজ্জ্বল আগুণের মত সুবিস্তৃত মেঘ খণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এখান হইতে তুষার পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায় না, কিন্তু আমি অনুমান করিতেছি তাহার অধিকাংশই এখন এই উজ্জ্বল মেঘস্তরে লুকাইয়া গিয়াছে। বিকালে এই শুভ্র মেঘের স্তর নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, তুষারাচলের মুক্ত স্থলগুলি তাহার আভায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে। প্রাতঃকালে এখানে কেবল সাধারণত এরূপ মেঘের ঘটা দেখা যায় না—ভোরবেলাই এখানে আকাশ মেঘ মুক্ত নির্ম্মল থাকে, সুতরাং তুষারাচলের মেঘমুক্ত দৃশ্য—ভোর বেলা যেমন দেখিতে পাওয়া যায়—এমন অন্য সময়ে না। সিঞ্চল গিয়া যাঁহারা ধবলাগিরির শৃঙ্গ দেখিতে চান তাঁহারা প্রায়ই সেখানে এই অভিপ্রায়ে রাত্র অতিবাহিত করেন। সেখানে রাত্রবাস না করিলে—দারজিলিং হইতে ভোরের সময় সেখানে পৌছান সহজ নয়।

আমরাও সিঞ্চলে গিয়াছিলাম তবে রাত্রবাস করি নাই। সিঞ্চল দারজিলিং হইতে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ। আগে এইখানে গভর্ণমেণ্ট সেনানিবাস ছিল। কিন্তু এখানকার শীত সেনাদের সহ্য না হওয়ায় জলাপাহাড়ে এখন বারিক হইয়াছে। জলাপাহাড় দারজিলিং হইতে ৫০০ ফুট উঁচু সুতরাং সেখানে শীতও অপেক্ষাকৃত কম। সিঞ্চলে এত শীত যে বাহিরে পাহারা দিতে দিতে দু একজন প্রহরী নাকি মরিয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট জলাপাহাড়ে সেনানিবাস উঠাইয়া আনেন।

সিঞ্চলের চেহারা এখন ভগ্নাবশিষ্ট সহরের চেহারা, দেখিলে দুঃখ হয়। শত শত চিম্নি-স্তম্ভ ও ভগ্ন-প্রাচীর বক্ষে ধারণ করিয়া দীন হীন ভাবে সে পড়িয়া আছে। গভর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সিঞ্চলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

দারজিলিং হইতে সিঞ্চল ৭।৮ মাইল। জলাপাহাড় দিয়া ঘুরিয়া ঘুম ষ্টেসন হইয়া সিঞ্চল যাইতে হয়। একদিন প্রাতঃকালে আমাদের দুই জন অশ্বারোহী ও চারিটি ডাণ্ডির রেজিমেণ্ট যখন জলাপাহাড়ের ব্যারাকের নিকট দিয়া চলিয়া গেল তখন সৈনিক রেজিমেণ্টগণেরও কৌতূহল উপস্থিত হইল, একজন স্ত্রীলোক নিতান্তই কৌতূহল সম্বরণে অক্ষম হইয়া আমাদের একজন সওয়ার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, আপনারা কি জাতি? যখন শুনিলেন 'বাঙ্গালী' তখন নিতান্তই দমিয়া বলিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন—বুঝি আমরা নেপাল রাজ পরিবার। কিন্তু আমরা যে তাঁহার এই কথায় কিছুমাত্র কম দমিলাম তাহা নহে, নেপালী চেহারার সঙ্গে আমাদের চেহারার কেহ ভুল করিতে পারে—এরূপ আমাদের কথনো মনে হয় নাই, সে ভুল ভাঙ্গা বড় কম কথা নয়!

•

দারজিলিং আসার সময় রেলের গাড়ীতে আর একবার পরিচয় লইয়া বড় একটা

একজন লোক আমাদের দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ গা ওঁরা কোথা হইতে আসিতেছেন—কোথাকার রাজা বুঝি ?" এইখানে বলা আবশ্যক, আমাদের অভিভাবকটিকে সাজ গোজে অনেকটা রাজার মতই দেখাইতেছিল। একে সুশ্রী সুন্দর মুখ, তাতে চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা—তার উপর হিন্দুস্থানী পাগড়ি—রাজা মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু দাসীটি যেরূপ উত্তর দিয়াছিল সেইটিই কিছু মজার—সে বলিল "ও গো ওঁরা ব্রাহ্মণ গো ব্রাহ্মণ !"

ঘুম ষ্টেসনের নিকট আসিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি গুলা একবার নামাইয়া সেখানকার দোকান হইতে রুটি কিনিয়া লইল, কেহ কেহ কিছু কিছু খাইয়াও লইল। আমাদের কাছে দুই এক জন মেয়ে কমলালেবু বিক্রি করিতে আনিল আমরাও কিছু কিনিয়া লইলাম। ঘুমষ্টেসন দারজিলিংএর ঠিক আগের ষ্টেসন, এখান হইতে ট্রেন নামী পথে কিছু ঘুরিয়া দারজিলিং পৌঁছায়। ঘুম হইতে দারজিলিং খানিকটা নীচে। দারজিলিং আসিবার সময় আর একটু হইলে আর কি এই ঘুমেই আমাদের ঘুমাইতে হইত।

সে গল্পটি এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা যদিও এই নূতন দারজিলিং আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের অভিভাবকটি যিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন (তিনি এখন কলিকাতায় গিয়াছেন) আগে আর একবার আসিয়াছিলেন। ঘুম ষ্টেসনে পৌঁছিবার কিছু আগে হইতে তিনি ভাবিয়া লইয়াছেন এইবার ট্রেন দারজিলিং ষ্টেসনে আসিবে। তিনি যত বাড়ী ঘর দেখিতেছেন ততই প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি ততই নূতন হইয়া উঠিতেছে, গতবারে যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার কাছে যে ঝরণাটি ছিল সেটি পর্য্যন্ত তিনি আমাদের দেখাইলেন, সবই মিলিয়া গেল, এখন কেবল গাড়ী থামিলে হয়—দারজিলিংএ নামা মাত্র বাকী। গাড়ীও থামিল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন আমাদের কেহ লইতে আসিয়াছে কি না, দেখিলেন কোথায় কেহ নাই। কাজেই আমরা গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম, লোকজন ডাকিয়া আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া তিনি নামিলেন। এদিকে কুলিরা জিনিস লইতে উপস্থিত, ভূটিয়া কুলির চেহারা সেই প্রথম একেবারে আমাদের চোখের কাছে,—কি রকম যণ্ডা চেহারা, গাল দিয়া যেন রক্ত পড়িতেছে, মুখের হাড় গুলা সব বাহির হইয়া রহিয়াছে, এক এক জন স্ত্রীলোক পরণে একটা ঘাগরা, তার উপর কোর্ত্তা, কোর্ত্তার উপর এক রাজ্যের মালা, চেহারা ঠিক ডাইনির মত, দেখিলে ভয় হয়। তাহারা অবুঝ-ভাষায় কেহ ভিক্ষা মাগিতেছে, কেহ কুলি—জিনিস লইবে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছে।—আমরা কি বলিব—কিছু ভাবিয়া পাইতেছি না,—আমাদের ভাব দেখিয়া একজন কুলি একটা বাক্সে হাত দিয়া চোখ মুখ নাড়িয়া বলিল—ঘুম—ঘুম—

অভিভাবকটিও ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঘুম শুনিয়া তাঁহার ঘুম ছুটিয়া গেল। নহিলে সেইখানে সেই শীতে রাত কাটাইতে হইলেই হইয়াছিল আর কি, সে রাতে ত আর ট্রেন ছিল না। ঘুম ষ্টেসনে বসিয়া সেই কথা মনে পড়িতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘুম ছাড়িয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, সিঞ্চলের এই-দিককার রাস্তা বড়ই খারাপ। মেরামত অভাবে এবং বর্ষার প্রভাবে এক সময়ের সুনির্ম্মিত রাস্তা এখন নিতান্তই ভগ্নপ্রায়। আমাদের ঘোঁড়সওয়ার দুইজন পিছাইয়া রহিলেন, এই ভগ্নরাস্তার উপর দিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা হুহু করিয়া ছুটিতে লাগিল, আর আমাদের অতিক্রান্ত নিম্ন পথগুলি দুই ধারের জঙ্গলের মধ্যে সহসা এমন লুকাইয়া পড়িতে লাগিল যে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যাইতে লাগিল। সিঞ্চলের এই তরুলতা ফুল পত্রময়—নিবিড় জঙ্গলের স্থানে স্থানে এক একটি পত্র শূন্য নিতান্ত অদ্ভুতাকৃতির বৃক্ষ আগাগোড়া শৈবালাবৃত হইয়া গুড়ির মতই মোটা মোটা তিন চারিটি সুদীর্ঘ ডাল বাহির করিয়া উচ্চ অরণ্যের মাথার উপর আরো দুইচার হাত উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে তাহার দিকেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই শৈবালাকৃত শুষ্ক প্রায় প্রকাণ্ড দৈত্য তরু দেখিলে মনে হয় যেন সে তাহার শৈবাল লোমশালী শাখাহস্ত বাহির করিয়া অরণ্যের প্রহরীতায় নিযুক্ত। সমগ্র দারজিলিং আর কি আগে এইরূপ বন ছিল! ইংরাজ নরককেও স্বর্গ করিয়া তোলে, কি কার-খানা! সিঞ্চলের রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভোর বেলা ছাড়িয়া বেলা নয়টার সময় সিঞ্চলের ডাক বাঙ্গলার কাছে ডাণ্ডি নামিল, আমরা উঠিয়া ভগ্ন ব্যারাকের ময়দান ঘুরিয়া টাইগারহিলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। টাইগারহিল সিঞ্চলের ময়দান হইতে আবার ৫০০ ফুট উচ্চ, এইখান হইতেই ধবলগিরির একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধবলগিরি দেখিতে পাইবার যদিও আমাদের আশা বেশী ছিল না কেন না—তখন উজ্জ্বল মেঘে চারিদিকের পাহাড়ের অধিকাংশস্থলই ঢাকিয়া পড়িয়াছিল, বিস্তৃত তুষারাচল শ্রেণীর কতক দেখা যাইতেছিল—কতক মেঘের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কথাই আছে নিরাশার মধ্যে আশার আলো অধিক জ্বলিয়া উঠে

Hope like the glimmering taper's light
Adorns and cheers the way
And still the darker grows the night
Emits a brighter ray.

আমরাও দুরাশার আশা হৃদয়ে ধরিয়া টাইগার হিলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। টাইগার হিলের পথ বড়ই খারাপ, এখানে ডাণ্ডি উঠে না, ছোট্ট সঙ্কীর্ণ বন্ধুর

স্বর্গদর্শনের জন্য কি না করা যায়। একে ত শীত প্রচণ্ড, কিন্তু রৌদ্র তাহা হইতেও প্রচণ্ড, পথ আবার অতি অতি প্রচণ্ড! খানিক দূর যাই আর বিশ্রাম করি—আর আমাদের সঙ্গী পথ প্রদর্শক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—আর কতটা বাকী। সঙ্গী মহাশয়ের উত্তরে প্রাণ ত আরো ঠাণ্ডা হইয়া আসে। তিনি বলেন 'কতদূর তাহা শুনিয়া আর আবশ্যক কি, যদি বলি অল্পদূর তাহা হইলে মিথ্যা বলিতে হয়।' ইতি মধ্যে পথে আর এক মহা ব্যাপার উপস্থিত।

আমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াটি—এখানে আসিয়া তিনি একটি মহা নাম লাভ করিয়াছেন, সবাই বলে আমাদের অপেক্ষা চলিতে তিনি মজবুত। এ নামটি পাছে হারাইয়া ফেলেন সর্ব্বদাই এই তাঁর এক আশঙ্কা; এই ভয়ে আমরা দুই পা না চলিতে চলিতে তিনি দশ পা অগ্রসর হইয়া চলেন—আর কথায় কথায় আমাদিগকে পদ যুদ্ধে আহ্বান করেন। সে দিন সেই নামের জোরে দম্ভভরে শ্রান্তি ক্লান্তি চাপা দিয়া কোন রূপে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন—হঠাৎ পথের মধ্যে তাঁর মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। ভাগ্যবশত নিকটেই পথের পার্শ্বে একটি জলাশয় ছিল—সঙ্গী মহাশয় তাহা জানিতেন, সেই জল তাঁহার মাথায় মুখে দেওয়ায় ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং আমাদের বারণ সত্ত্বেও আবার টাইগারহিলের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আর কোন গোল হইল না, আমরা সকলে নির্ব্বিঘ্নে পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠিলাম। চূড়ার সমতল ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবা মাত্র আমাদের সমস্ত কষ্ট নিমিষে যেন দূর হইয়া গেল, চারিদিকে সুন্দর মেঘ দৃশ্য, সুন্দর রৌদ্র কান্তি, দিব্য শীত বাতাস, আমাদের শরীর মন জুড়াইয়া গেল,—কিন্তু ধবলগিরির চূড়া দেখা আর হইল না, সেদিক মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। তবে আমরা ত তুষারাচল দেখিয়াছি, কল্পনা করিতে লাগিলাম—তাহারি মত ছোট একটি টুকরা মেঘের ভিতর লুকাইয়া আছে। কাঞ্চন জঙ্ঘার শ্রেণী কিন্তু বেশ দেখা যাইতে লাগিল। তাহার মাথার উপর নীলাকাশ,নীচে নীল পর্ব্বত, সেই নীল পাহাড়ের খানিক উচ্চ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত বরফে বরফে আচ্ছন্ন, এই বরফ রৌদ্র কিরণে ঝলমল করিতেছে, চন্দ্রের মধ্যে যেমন কলঙ্ক এই বরফের গাত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে সেইরূপ কলঙ্ক, মাঝে মাঝে কাল কাল রেখা, এই কলঙ্ক ধারণ করিয়া তুষারমণ্ডলীর জ্যোতি, তাহার শোভা যেন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তুষারাচল শ্রেণীর প্রভা ঠিক হীরক প্রভা নহে—ইহার জ্যোৎস্নার ন্যায় একটি মৃদু শান্ত নয়ন রঞ্জক ভাব আছে। এইরূপ বরফের পর্ব্বত উত্তরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তরঙ্গের মত উচ্চ নীচ হইয়া চলিয়া গিয়াছে—মধ্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়াই কাঞ্চনজঙ্ঘা। ধবলগিরি আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতেও উচ্চ, কিন্তু দারজিলিং হইতে তাহা দেখা যায় না।

[illegible] নামিবার সময় আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই। যদিও নামিবার

সময় আমাদের সকলকেই প্রায় এক একবার আছাড় খাইতে হইয়াছিল—তবে কোনটাই মারাত্মক নহে। নামিতে নামিতে আমরা অমর ফুলের রাশি অনেক তুলিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া কতকগুলি সুন্দর ফার্ণ ও দু এক রকমের রাঙ্গা রাঙ্গা ফল আনিয়াছিলাম। এখানে ঘাসের মধ্যে মাটিতে এক রকম লাল ফল পড়িয়া দেখা যায় ঠিক মক্কাফলের মত আকৃতি, তবে তাহা হইতে ছোট, এবং মক্কার বিচিগুলি হলদে, এ ঘনঘোর লাল। এফলগুলি তৃণশস্পের মধ্যে মাটিতে এমন পড়িয়া থাকে—মনে হয় কে যেন একটা ফল ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে—কিন্তু তুলিতে গেলে তখন বুঝা যায় তাহার একটি ডাঁটা আছে আর ডাঁটাটি মাটির ভিতর হইতে উঠিতেছে। ঘাসের মাঝে মাঝে এই ফলগুলি বড় সুন্দর দেখায়।

আমরা ইতিমধ্যে একদিন রঙ্গিতে গিয়াছিলাম।

রঞ্জিত বা রঙ্গিতে যত ভাল ভাল ও নানা রকমের ফার্ণ পাওয়া যায় দারজিলিংয়ের আর কোথায় তেমন দেখি নাই। দারজিলিংয়ে যে সকল শুকনো ফার্ণ বিক্রি হয়—তাহা রঞ্জিত হইতেই বিক্রিওয়ালারা আনে। রঞ্জিৎ সিকিমের একটি নদীর নাম, এই নদীর নামে তাহার চারিপাশের জায়গারও এই নাম হইয়াছে। রঙ্গিৎ দারজিলিং হইতে ১১র মাইল নীচে। তাহার ওপারে স্বাধীন সিকিং রাজ্য। রঞ্জিতের রাস্তা যদিও বেশ প্রশস্ত কিন্তু যেমন উবড়ো খাবড়ো তেমনি প্রায় সমস্ত পথটাই খুব চড়াই। এক একবার ডাণ্ডি এত ঝোঁকে যে মনে হয় এই বুঝি পড়িলাম। তবে আমাদের মন যতই টলুক ডাণ্ডিওয়ালাদের পা কিছুতেই টলেনা এইরক্ষা! বরঞ্চ যাঁহারা ঘোড়ার পিঠে ছিলেন তাঁহাদের বেশী সাবধানে যাইতে হইতেছিল।

পরিষ্কার প্রভাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা মলরোড দিয়া ভুটিয়া বসতিতে পৌঁছিলাম। বসতির ভিতর দিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা চীৎকার করিতে করিতে হুহুশব্দে নামিতে লাগিল, বসতিতে লোক জমিয়া গেল, ৫খান ডাণ্ডি এক সঙ্গে এ পথে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের সঙ্গী দুইজন ঘোড়াতে চড়িয়া কিছু পূর্ব্বে ছাড়িয়াছিলেন সুতরাং অনেকটা দূর পর্য্যন্ত আর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল না।

নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া চাক্ষেত্রের পাশ দিয়া পাহাড় দেয়ালের পাশ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষ পরগাছায় জড়িত ফুলময় বন পথ দিয়া ডাণ্ডি নামিতে লাগিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার রৌদ্রদীপ্ত মূর্ত্তি এক একবার পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পড়িতে লাগিল, আবার সমুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল খানিকদূর নামিয়া একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন ৯ মাইল নামিয়াছি বেলা প্রায় ৮টা—তখন গাছপালার ফাঁক দিয়া পাহাড়ের নীচে সবুজ একটা জল দেখিতে পাইলাম; শুনিলাম ঐ রঞ্জিতের পাণী। সে জল তখনো এত নীচে যে তাহার দুই ধারের বৃক্ষশ্রেণী নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, মনে

বালীর চড়া। এই শ্বেত-বালীবাঁধান নীল জলের রেখা গাছ পালার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে আমাদের চোখের উপর চমকিয়া যাইতে লাগিল। আরো খানিকটা নামিয়া একটা গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ডাণ্ডিওয়ালারা বলিল—আমরা নদীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহা নদীর গর্জ্জন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা নদীর তীরে আমাদের নামাইয়া দিল। আমরা বালির চড়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম—কি চমৎকার দৃশ্য!

নদীর দুই তীরে, নদীর জলে, বালির চড়ার উপর বর্ষায়-ভাঙ্গা বড় বড় পাথর স্তূপাকৃত। জলের তোড়ে তোড়ে অধিকাংশ পাথরই ঘসিয়া গোলাকার মসৃণ হইয়াছে। এই পাথরে পাথরে আহত প্রতিহত হইয়া একটা সুবিস্তৃত কাল জলের রাশি সফেণ তরঙ্গ তুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অবিরল গর্জ্জন করিয়া দুর্দ্দান্ত বেগে চলিয়াছে। পাশের পাহাড়ের গাছপালার মধ্যে হইতে একটি বাঁশীর স্বর উত্থিত হইয়া সেই গর্জ্জনের সহিত মিশিতেছে। বাঁশীর মত এই শব্দ রঙ্গিতে পৌঁছিবার খানিকটা আগে হইতেই শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আমরা মনে করিয়াছিলাম বাতাসে বাঁশ গাছ হইতে এরূপ শব্দ হইতেছে, কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালারা বলিল উহা একরকম পোকার ডাক।

নদীর পর পারে সিকিং পাহাড়, এই শ্যামল পাহাড়ের পদতলে সুনীল তটিনী, মাথার উপর যতদূর দেখা যায় পরিষ্কার নীলাকাশ—সেই সুবিস্তৃত বিশাল নীলাকাশের এক স্থানে একখানি মাত্র উজ্জ্বল মেঘ খণ্ড।

নদীর এক স্থানে জল গভীর, সেখানে তরঙ্গের আর উচ্ছাস নাই, ঘোর নীলজল প্রশান্ত ভাবে খানিক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এইখানে উপকূলে একখানি ডোঙ্গা বাঁধা—এই ডোঙ্গা এই প্রশান্ত জল রাশি বাহিয়া গরু ঘোড়া প্রভৃতি পার করে—কখনো কখনো মানুষও ইহাতে পার হয়। কিন্তু নদীর উপর একটি যে বেতের দোলনা-সেতু আছে মানুষেরা সচরাচর তাহাতেই পার হয়। এই সেতু পুরাতন কাল হইতে বর্ত্তমান; তবে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ইহাকে নূতন বেতে একেবারে নূতন করিয়া নির্ম্মিত করেন। সেতুটি একটি দেখিবার জিনিস। নদীর দুই তীরে জমীর উপর বড় বড় বাঁশ গাড়িয়া তাহার উপর এই সুদীর্ঘ বেতের বুনানির দোলনা রক্ষিত,—এই বাঁশ এই দোলনা আবার বড় বড় বেতের মোটা দড়িতে তীরের বড় বড় গাছের সঙ্গে মজবুত করিয়া বাঁধা,—ইহা হইতে পড়িবার কোন ভয় নাই, তবে দেখিলে ভয় হয়, যদি কেহ নীচে পড়ে ত তাহার কিনা আর আশা ভরষা নাই—নদীর জলে বড় বড় পাথরের উপর পড়িয়া একেবারে শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। আমরা সেতুতে চড়িলাম—সেতু এত অল্প প্রশস্ত যে পাশাপাশি দুই জন যাইতে পারে না। পাশের বাঁশ ধরিয়া ধরিয়া আমরা দুই তিন জন প্রথমে পরে পরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—খানিক দূর গিয়াছি এমন সময় ওপারে কয়েক জন দুষ্ট লোক দোলনার উপর চড়িয়া অবিশ্রান্ত ঝাঁকা দিতে লাগিল, আমরা কাজেই আর চলিতে না পারিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম—খানিক পরে তাহারা

চলিয়া গেল আমরা আবার চলিতে লাগিলাম, কিন্তু আমরা যেরূপ আস্তে আস্তে চলিতেছিলাম দেখিলাম বড় কম সময়ে ওপারে পঁহুছিব না, অথচ দোলনাটা ব্যাপারখানা কি তাহাও বুঝিলাম, সুতরাং আমরা আর বেশীদূর না গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমরা ফিরিবার পর তখন আর দুই একজন উঠিলেন, তাঁহারা কিন্তু একেবারে শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কেবল তাহাই নয়—তাঁহারা ওপারে নামিয়া কমলানেবু কিনিয়া লইয়া, ডোঙ্গায় চড়িয়া আবার এ পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওপারে নদীর তীর দেশে কতকগুলি খড়োঘর দোকান প্রভৃতি আছে। তাঁহারা বলিলেন, দোকানের কাছে একটি ফুলের মন্দির করিয়া সেইখানে কয়েক জন পশ্চিমী ব্রাহ্মণ হোম করিতেছে। দারজিলিংএ পশ্চিমী লোকের অভাব নাই—বিশেষ ধোপা মেথর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক ত অনেক।

রঙ্গিতের ধারে একটি দোকান গৃহের সামনে একটি অশ্বথ গাছের তলায় আমরা আহারাদি করিলাম। সে স্থানটি একটি উঁচু পাড়, পাড়ের নীচে হইতে বড় বড় গাছ উঠিয়া নদী এমন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে নদীর ধারে বসিয়া সেখান হইতে নদী মোটেই চোখে পড়ে না, নদীর একটা তরঙ্গ ভঙ্গ, একটা উচ্ছাস কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—কেবল নদীর সেই আবশ্রান্ত গর্জ্জন শব্দ পাহাড়ের উপর সমুদ্রের গর্জ্জন বলিয়া মনে হয়, নিশ্চল স্থির দৃশ্যের মধ্যে ঝটিকার বিপ্লব বলিয়া মনে হয়——বাতাস নাই ধূলা নাই, গাছপালা স্থির—কেবল অবিশ্রান্ত তোলপাল গর্জ্জন ধ্বনি!

আমরা যে দোকান ঘরের সামনে বসিলাম—সেখানি একজন হিন্দুস্থানীর। অশ্বথ গাছের ধারে একটি ছোট দেব কুটীর, তাহাও হিন্দুস্থানীর, কোন হিন্দু আসিলে এইখানে দু এক পয়সা দর্শনী দিয়া যায়। কিন্তু দেখিলাম গৃহ তালারুদ্ধ, খুলিতে বলায় হিন্দুস্থানী সম্মত হইল না, আর কিছু নহে সে আমাদের হিন্দু মনে করে নাই।

একটা কথা বলা হয় নাই, আমাদের এখানে আনিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা বক্সিস বক্সিস করিয়া এক গোল বাধাইল—তাঁহাদের ইচ্ছা তাহারা বক্সিস লইয়া ওপারে মদ্যপান করিয়া আসেন। কিন্তু তাহাতে কিরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝিতেই পার। তাহারা মদ খাইয়া নেশা করিয়া বসিলে এমনকি আমাদের ফিরিবার পক্ষেও গোল। সুতরাং আমাদের অভিভাবক যিনি তিনিত তাহাতে রাজি হইলেন না, বলিলেন বাড়ী ফিরিয়া বক্সিস দিবেন। কিন্তু তাহারা তখন আমাদের কায়দায় পাইয়াছে মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিল, বলিয়া বসিল—তবে তাহারা ডাণ্ডি লইয়া চলিয়া যাইবে। আমাদের সঙ্গী বন্ধুটি মহা ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু আর একজন ভয় পাইবার পাত্র নহেন তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র যষ্টিটি আস্ফালন করিয়া যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে ওরূপ গোলমাল করিলে তিনি তাহাদের সকলকে আগা গোড়া মারিবেন আর এক

পয়সা ভাড়াদিবেন না তখন ক্রমে ক্রমে তাহারা এমন চুপ করিয়া গেল যে যেন কতই শিষ্টশান্ত। ভুটিয়ারা যতই বলবান হোক না—তাহাদের সাহস যে কিরূপ তাহা এই ঘটনাটি হইতে বুঝিতে পারিবে। যদি আমরা নরম হইতাম তাহা হইলেই আর কি পাইয়া বসিত।

রঞ্জিতে ত দারজিলিংএর মত শীত নাইই—শুনিলাম গরমীকালে বেশ গরম হয়। আমরা নয়টায় পৌঁছিয়া আবার দুইটার পর ছাড়িলাম। এবার উপরে ওঠা—বড় সহজ ব্যাপার নয়,ডাণ্ডিওয়ালাদের জন্য আমাদের মায়া করিতে লাগিল। তাহারা বলিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দারজিলিং পৌঁছিবে, কিন্তু কি করিয়া যে এতশীঘ্র তাহারা উপরে উঠিবে আমরা ভাবিয়া পাইলাম না। এ কর্ম্মে তাহারা এত অভ্যস্ত আর অত বড় বড় জোয়ান তবু তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রমের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাহারা পাল্লা দিতে লাগিল ছুটাছুটি করিতে লাগিল,—তিন খানি ডাণ্ডি একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, আমাদের দুইখানি পিছাইয়া রহিল—আমরা নিতান্তই জেদ করিয়া তাহাদের দৌড়িতে দিই নাই। যদিও তখন রৌদ্র প্রখর—কিন্তু পশ্চিমের পাহাড় আমাদের আড়ালে পড়িয়াছিল তাই সমস্ত পথটাই আমরা ছায়ায় ছায়ায় উঠিতে পারিয়াছিলাম সকালটা বরঞ্চ এমন সুখে নামিতে পারি নাই, পূর্ব্ব দিকের রৌদ্রে ৭ টার পর হইতেই আমাদের তাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত পথটাই মাথার উপর ছাতা ধরিতে হইয়াছিল—তাই ভাল করিয়া চারি দিক দেখা পর্য্যন্ত হয় নাই। আসিবার সময় আমরা খুব দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

বনের মধ্যদিয়া, সুন্দর বাঁশ ঝাড়ের নিকট দিয়া, চাক্ষেত্র দিয়া, ফার্ণের রাজ্য দিয়া ডাণ্ডি অগ্রসর হইতে লাগিল। বনের এক এক স্থানে এমন নূতন দৃশ্য, এক রকম লাল পাতার গাছে শ্যামল বন এমন সুন্দর দেখাইতেছে—দূর হইতে সে পাতাকে ফুল বলিয়া মনে হয়—কিন্তু নিকটে আসিলে দেখা যায় তাহা পাতা। এক এক জায়গায় অবিশ্রান্ত ফুটন্ত ফুলময় পরগাছা জড়িত বড় বড় গাছের সার। দারজিলিংএ এমন দেখি নাই। এক একটা পাহাড়ে একটি বড় গাছ নাই—কেবল ছোট ছোট বন ফুলে ফুলে ফুলময়। এক একটা পাহাড় আগাগোড়া চায়ের গাছে ঢাকা,—ক্ষেতে স্ত্রীপুরুষে বেতের ঝুড়ি পিঠে চা তুলিতেছে। এক এক স্থানে কেবল রকম বিরকম ফার্ণ। স্থানে স্থানে এত সুন্দর ফার্ণ যে লোভ সামলান যায় না—ডাণ্ডিওয়ালারাদের বলায় মাঝে মাঝে তাহা তুলিয়া দিতে লাগিল। এক এক জায়গায় পাহাড়ের গাত্র হইতে সুগন্ধি সুদীর্ঘ ফুটন্ত দোনার গাছ ঝুলিয়া ঝুলিয়া আছে, আমাদের মাথায় গায়ে ঠেকিতে লাগিল, আমরা হাত দিয়া ছিঁড়িয়া লইতে লাগিলাম। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিলাম তাহার গুঁড়ি টিপায়ের পায়ার মত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই বন ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে এক একটা পাহাড়ের গা দিয়া এক একটু জল পড়িতেছিল—

ডাণ্ডিওয়ালারা এক একজন গিয়া জল পান করিয়া আসিতে লাগিল। রাস্তার মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বসতি— দু একজন সেখানে গিয়া মাড়ুয়া খাইয়া আসিল। একজন এত মাতাল হইল যে সে আর ডাণ্ডি বহিতেই পারিল না। যেখানেই বসতি সেখানেই কুড়ে ঘরের সামনে আমাদের দেখিয়া লোক জমিতে লাগিল. কাণে ফুল গোঁজা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। ফুলপরা ভুটিয়াদের একটি রোগ। মুটে মজুররা মোট বহিতেছে তাহাদের মাথার টুপীতে এক গোছা ফুল, মেয়েদের কাণে ফুলের দুল। সোণা রূপার গহনার ত কথাই নাই। পুরুষেরাও এখানে সোণা রূপার গহনা পরে। মেয়ে পুরুষে বোঝা বহিতেছে গলায় টাকার মালা—কাহারো গলায় খাঁটি সোনার ছোট ছোট ঢাক—কাণে সোনার দুল ইত্যাদি।

রঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে যে মুটে গিয়াছিল তার ভারী ইচ্ছা সে টাকার মালা পরিবে। আর ৫। ৬ টাকা হইলেই তাহার সাধটি পূর্ণ হইবে শুনিলাম।

ভুটিয়া বসতির নীচে একটি ক্ষুদ্র বসতিতে আসিয়া আমাদের একজন ডাণ্ডিওয়ালা একটি কুঁড়ে ঘরের কাছে গিয়া জল চাহিল। কুটীরস্বামী একজন মুসলমান, সে বলিল—কাছে ঝোরা আছে সেইখানে গিয়া খা—এখানে জল নেই, আমি কি তোর চাকর? তখন ভুটিয়াও বকিতে বকিতে উপরে উঠিতে লাগিল—জল না দিবি নেই দিবি, বকিস কেন ইত্যাদি। মুসলমানটা রুক্ষ মেজাজের লোক, চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিবার পাত্র নহে, দুইজনে বকাবকি আরম্ভ হইল—আমাদের অন্য ডাণ্ডি-ওয়ালারা ডাণ্ডি কাঁধে করিয়াই তাহাতে যোগ দিল, কিন্তু আমাদের ফেলিয়া তখন কিছু আর সেখানে উপস্থিত হইতে পারে না কাজেই মুখের চেঁচানি মাত্র সার করিয়া মুসলমানের রাজ্য ছাড়িয়া তাহাদের প্রস্থান করিতে হইল। একজন তৃষ্ণাতুর পথিককে একটু জল দিতে পরাঙ্মুখ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, হিন্দু হইলে এরূপ হইত না।

সে দিন বিকালে আমরা আর কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না, তাহার দৃশ্য তখন উজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন দৃশ্য। তুষার পর্ব্বত তখন মেঘ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। তখন পূর্ব্বদিকে নীল মেঘের কোলে কেবল একখানা মস্ত চাঁদ ভাসিতে-ছিল—যতই বেলা পড়িতে লাগিল সেই চাঁদ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, মেঘের রেখার মধ্য দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উপরে উঠিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার আগেই আমরা মলরোডে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষে মলরোড পূর্ণ—ব্যাণ্ড বাজিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, আমাদের কয়খানা ডাণ্ডি আর আরোহী-পৃষ্ঠ দুইটি অশ্ব তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিল। সবাই আমাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আমাদের লজ্জা করিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া সে কথা ভুলিয়া গেলাম—কেবল নদীর ধারে গিয়া স্নান করিতে পারিলাম না এই বড় দুঃখ হইতে লাগিল।

মোগল রাজত্বে বৈদেশিক দূত।

অতি সমারোহের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ দূত সুরাটে অবতরণ করিলেন। বন্দরে যে সমস্ত জাহাজ ছিল তাহারা রঙ্গিন পতাকা, ও মনোহর পুষ্প পল্লব মালায় শোভিত হইল। তাঁহার সম্মানার্থে ঘন ঘন তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল, এবং সাধারণ সওদাগর, কাপ্তেন, ও শতাধিক অস্ত্রধারী পুরুষ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কি শুভক্ষণেই ইংলণ্ডীয় রাজদূত সুরাটে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না—কেননা—ইহার পরই নারিকেলে জল সঞ্চারের ন্যায় ইংরাজ কোম্পানীর ভারতে সৌভাগ্যসঞ্চার হইল।

স্যর টমাসের স্বদেশীয় লোকেরা ত তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেনই—কিন্তু এই সময়ে স্থানীয় উচ্চ পদস্থ মোগল কর্ম্মচারীরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। কিন্তু একটী বিষয়ে রো সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন—সেই সময়ে এরূপ নিয়ম ছিল—ভারতীয় বন্দরে বৈদেশিক লোকে যে কোন দ্রব্য আনিয়া নামাইবেন—ভার-প্রাপ্ত মোগল কর্ম্মচারীরা তাহা খুলিয়া দেখিবেন। এবং তাঁহাদের সম্মতি হইলে দ্রব্যাধিকারীগণ, তাহা ভারতের অন্যান্য স্থানে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এই নিয়মানুসারে মোগল কর্ম্মচারীরা, রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের দ্রব্যাদি, এমন কি ইংলণ্ডাধীপ প্রেরিত সম্রাটের উপঢৌকন দ্রব্যাদিও খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন—রো সাহেব এ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলেও তাহা কেহ গ্রাহ্য করিল না। রো'র থাকিবার জন্য সুরাটে যথেষ্ট আয়োজন করা হইল, তিনি এক মাস ধরিয়া সুরাটে অবস্থান করিলেন।

বাদসাহ এই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং রাজধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। এ সংবাদ রো'র কর্ণগোচর হইবা মাত্র তিনি আনন্দ-নীরে মগ্ন হইলেন। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আগরায় গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা যে অতিশয় দুরুহ ব্যাপার ইহা তিনি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মোগল কর্ম্মচারীরা তাঁহার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকাতে রো একয়েকদিন তাঁহাদের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু একয়েক মাস কাল বৃথা কাজে কাটিয়া যাওয়াতে ও মোগল কর্ম্মচারীরা প্রতিশ্রুত সাহায্য দানে শিথিল প্রযত্ন হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগকে এই বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল—রো শুভ লগ্নে সুরাট পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট্‌-সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে বুরহানপুরে সম্রাটের সেনানিবেশ ছিল। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার পারবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ খাঁ খানানও এই সময়ে কুমারের সহিত একত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। মালিক আম্বর বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বড়ই জ্বালাইতেছিল, কুমার ও খাঁ খানেনের এই স্থানে শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্য ইহার কার্য্যে বাধা দেওয়া। কুমার পারবেজের সহিত রো'র সাক্ষাৎ-বাসনা নানা কারণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন মোগল সৈন্য মধ্যে বিলাতি তরবারি বিশেষ আদরের সহিত প্রচলিত হইতেছে—সুতরাং বুরহানপুরে একটী কুটী স্থাপন করিলে কোম্পানীর বিশেষ লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যে রাজকুমারের সম্মতি পাইলেই সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল—সুতরাং তিনি বুরহানপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ইংলণ্ডীয় রাজদূতের উপস্থিত সংবাদ কুমার বাহাদুরের সরকারে পৌঁছিবা মাত্র, একজন কোতয়াল আসিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত এক সরাইয়ে লইয়া গিয়া বাসা দিল—ইহার পরদিন তিনি কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শতাধিক অশ্বারোহী ও কোতোয়াল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাজ সকাশে লইয়া গেল সভাগৃহে কুমার পারবেজ এক অত্যুচ্চ সিংহাসনের উপর বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহার চারিদিকে পদমর্য্যাদা ক্রমে অমাত্য ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ বসিয়া রহিয়াছেন—উপরে মণি খচিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে অসংখ্য মণি মুক্তা খচিত রাজকুমার ও অন্যান্য প্রধানবর্গ, অদূরে এবং রাজকুমারের আশে পাশে, সশস্ত্র প্রহরীগণ, এবং এই বিস্তীর্ণ সভাগৃহ এই জনসমাগমেও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রো সাহেব দরবারে উপস্থিত হইলে কোতোয়াল তাঁহাকে প্রাচ্য প্রথানুসারে ভূমিস্পর্শ করিয়া আদব বাজাইতে ইঙ্গিত করিলেন—কিন্তু রো সাহেব তাহা না করিয়া ইয়োরোপীয় প্রথানুসারে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল কুমার এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইবেন—কিন্তু রো সাহেব "আপনার পিতার নিকট, ভারতের বাদসাহের নিকট ইংলণ্ডেশ্বরের দূত" বলিয়া নম্রতার সহিত পরিচয় দেওয়াকে কুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পারবেজ রো সাহেবকে ইংলণ্ডীয় রাজা জেম্‌সের সম্বন্ধে, তথাকার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্যর টমাস রো এ পর্য্যন্ত বসিবার আসন পান নাই, দাঁড়াইয়া থাকিতে ক্লান্তি বোধ করিয়া তিনি কুমারের কাছে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—রাজপুত্র উত্তর করিলেন—"যদি তুরস্কের সুলতান বা স্বয়ং পারস্যাধীপ এই দরবারে উপস্থিত থাকিলেন তাহা হইলে তাঁহারাও এস্থলে আসিয়া বসিবার সাহস করিতে পারিতেন না।" রো সাহেব নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ এক রৌপ্যময় স্তম্ভের উপর

জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহাকে একে একে দেখাইলেন। কুমার পারবেজ উপহার দ্রব্যাদি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বুরহানপুরে কোম্পানীর ফ্যাক্টরী স্থাপনের কথাটা রো সাহের, এই অবসরে পাকা করিয়া লইলেন। পারবেজ বলিয়া দিলেন আমি ইংলণ্ডীয় রাজদূতের সহিত অদ্য সভা ভঙ্গের পর নির্জ্জনে ভাল করিয়া আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।" রো সাহেব কুমারের ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যার পর—রাজভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোথায় বা কুমার পারবেজ্ আর কোথায় বা তাঁহার আলাপ, একজন চোপদার আসিয়া সাহেবকে খবর দিল—"আপনি যে কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট মদিরা অদ্য উপহার দিয়াছেন তাহাই পান করিয়া জাঁহাপনা অতিশয় বদ্‌মেজাজ্ হইয়া উঠিয়াছেন—এক্ষণে অন্তঃপুরিকাগণের সহিত আমোদে মত্ত আছেন"। রোসাহেব অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রোসাহেবের দলে—একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক, একজন সেক্রেটারি, একজন চিত্রকর ও পঞ্চদশ জন ইংরাজ চাকর ছিল—তিনি ইহাদের লইয়া সুরাট পরিত্যাগ করিয়া আজমীরের দিকে ধাবমান হইলেন। ৫ই ডিসেম্বর নর্ম্মদা পার হইয়া মণ্ডলেশ্বরে আড্ডা করা হইল—এই মণ্ডলেশ্বরের নিকটেই তৎকালীন সুবিখ্যাত "মাণ্ডব দুর্গ।" মণ্ডলেশ্বর হইতে ভারতের অনন্তগৌরবভূমি-চিতোরে আসিতে তাঁহার দুই সপ্তাহ লাগিল। চিতোরের আর তখন সে বৈজয়ন্তী শোভা নাই, বিমলযশঃশালী বীরপ্রবর-প্রতাপের প্রতাপ চিরকালের জন্য লোপ হইয়াছে, অনন্ত শোভাময়ী চিতোর প্রতাপকে হারাইয়া পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল পরিয়াছে। রাজপথ জনশূন্য, প্রাসাদ অধিবাসী শূন্য—বীরপ্রসূ চিতোরের প্রত্যেক গৃহ বীরশূন্য, চিতোরদুর্গ সূর্য্যচিহ্নিত-আর্য্য-পতাকা শূন্য! রো চিতোরে গিয়া সেই ভগ্নাবস্থা দেখিলেন। চিতোরদুর্গ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মন্তব্য পত্রে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে সব এখানে নিষ্প্রয়োজন।

চিতোর হইতে আজমীরে যাইতে পাঁচ দিন সময় লাগিল। বাদসাহ এই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আজমীরে বাস করিতেছিলেন, বাদসাহের আজমীরে অবস্থান, রো'র পক্ষে অতিশয় সুবিধা কর বলিয়া বোধ হইল!

মহাত্মা আকবর স্বীয়, উদারনীতিতে, মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তিমূল যে প্রকার সুদৃঢ় ও তাহার সীমা যে প্রকার সুবিস্তৃত করিয়া গিয়াছিলেন—জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর তাহারই অবিসম্বাদিত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের সমস্ত অংশ, পঞ্জাব, কাশ্মীর, কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু গুজরাট, বেহার, বঙ্গদেশ, প্রভৃতি, ভূভাগ সম্পূর্ণ রূপে মোগল-সরকারভুক্ত ছিল—কেবল দাক্ষিণাত্যের কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য তখনও স্বাধীনতা লইয়া মোগল সম্রাটের সহিত যুঝিতেছিল।

রাজ্যের বাহিরের অবস্থাত এইরূপ—কিন্তু ভিতরে এই সময়ে বড় গোলযোগ

পুরের মধ্যে পরমারূপশালিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাজ্ঞী নুরজাহানই সর্ব্ব-বিজয়ী ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন। সামান্য উজীর উমরাহ দূরে থাক্ স্বয়ং মোগল-সম্রাট সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনীর বুদ্ধি চক্রে ঘূর্ণিত হইতেছিলেন। চক্রান্তটা অবশ্য ভবিষ্যৎ সিংহাসনের জন্য। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ভারতের সিংহাসন লইয়া যে একটা বিপ্লব হইবে—ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ বোধ হইতেছিল—জাহাঙ্গীর নূর জাহানের হস্তে কলের পুতলী সুতরাং এখানে অন্য কাহারও জয়লাভ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

ক্রমশ।

আষাঢ়ে গল্প।

দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আষাঢ়ের প্রথমদিবসে যখন আকাশের একপ্রান্তে একখানি শুভ্র মেঘ কোন্ পুরাতন দিনের স্মৃতির মত আসিয়া দেখা দেয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তখন কেমন এক নূতন ভাবের উদয় হয়! সুপ্তোথিত যেমন উষার প্রশান্ত মুখ-চ্ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয় গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর আষাঢ়ের নূতন জলদ জাল দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আষাঢ়ের গল্পের আশায় আমরা তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া থাকি। সে আশাপূর্ণ উৎসাহ মনে করিতে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

আষাঢ়ের গল্প আমাদের স্মৃতির তীর্থক্ষেত্র। সহস্র স্মৃতি তাহার সহিত সুখে দুঃখে জড়িত। বাহির হইতে উঠাইয়া আনিয়া আমরা মনকে গৃহের অন্ধকারে যে বদ্ধ করিতে পারি সে কেবল আষাঢ়ে গল্পের আকর্ষণে। আষাঢ়ের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে যখন আপিসের তাড়া পড়ে—গৌরাঙ্গ প্রভুর গুম্ফশোভিত দন্ত কিড়মিড়ি মনে পড়ে, তখন প্রাণে কি গভীর নৈরাশ্য উপস্থিত হয়! জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, সংসারকে নিষ্ঠুর মনে হইতে থাকে, খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটে মাত্র। আষাঢ়ে বন্ধু বান্ধব লইয়া—আত্মীয় স্বজন লইয়া গৃহের অন্ধকারে বসিয়া থাকিতেই লাগে ভাল। এ সময়ে আপিস কেন? আষাঢ়ে গল্প—হিসাবনিকাশ কিসের?

আষাঢ়ে গল্পের কৈফিয়ৎ নাই। বসন্তের উপন্যাসে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে একটা ছেদ আছে। আষাঢ়ে গল্পে সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে—একীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রতি মুহূর্ত্তেই ষোড়শী রূপসী মরা-বরের সহিত মালাবদল করিতেছে, সাতটি

পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ নাই—ঔপন্যাসিক কমা সেমিকোমলনেরও সম্পর্ক শূন্য। সহসা সপ্তম পরিচ্ছেদে দু'জনের বিরহ নিশ্বাসে আসিয়া তাহার অবসান হয় না। অন্তিমে মৃত্যুর চিত্র থাকিলেও আষাঢ়ে গল্পে ট্র্যাজেডি হইতে পারে না। যদি বা তর্ক তাহাকে ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রমাণ করে তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে ট্র্যাজেডির মত তাহার প্রভাব লক্ষিত হয় না।

আষাঢ়ে গল্পের নায়ক প্রায়ই সৃষ্টিছাড়া কোন জীব, কিম্বা নায়কের স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এক ব্যক্তি। অনেক সময় রাক্ষস, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, ব্যাঘ্র, শৃগাল এবং বন্দুর বংশধরেরাই গল্পের নায়ক। গল্পও অনেক সময় বেগুনক্ষেতের কাঁটায় কোন প্রকারে বিধিয়া থাকে মাত্র। দৃশ্য বর্ণনা ইহাতে প্রায় নাই—ষোল আনার মধ্যে এক আনা থাকে ত যথেষ্ট। রাজপুত্রেরা দেশভ্রমণে বাহির হইলেই স্ত্রী এবং শ্বশুরের অর্দ্ধেক রাজ্য লাভ করেন। আষাঢ়ে গল্পের এই স্ত্রীলাভ ঘটনাটীতে রামায়ণ মহাভারতের খানিকটা প্রভাব আছে বোধ হয়। থাকেত আমাদের জিৎ। না থাকিলে আষাঢ়ে লেখার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না।

আষাঢ়ে নায়িকা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র। নায়িকার চরিত্রে মহৎ ভাব অতি সামান্যই—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়িকার কুল শীল সময় সময় উচ্চ হয় বটে, কিন্তু সে কেবল রাজপুত্রের বিবাহের সুবিধার জন্য। অসম্ভব ঘটনা কোন কোন নায়িকাকে বড় করিয়াও দেয়। সময়বিশেষে নায়কের জ্যেষ্ঠতাত হইবার মত নায়িকাও দু'একটী মিলে। কিন্তু উপন্যাসের যোগ্যা নায়িকা আষাঢ়ে গল্পে বড় একটা মিলে না।

আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসে মধ্যে মধ্যে দু'একটী আষাঢ়ে নায়িকাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ মন্দ না লাগিলেও উপন্যাসে এইরূপ নায়িকা ভাল সাজে না। নায়িকাকে পুরুষ করিলেই তাহার চরম উন্নতি হইল না। স্ত্রীলোকের স্ত্রীভাব থাকা বিশেষ আবশ্যক। পুরুষবেশ স্ত্রীজাতিকে কিন্তুতকিমাকার করিয়া তুলে মাত্র। আষাঢ়ে গল্পে তাহা যদি বা শোভা পায়—তাহাও সকল সময়ে পায় না—উপন্যাসে কিছুতেই শোভা পায় না।

বসন্তের সহিত বর্ষার যে তফাৎ উপন্যাসের সহিত আষাঢ়ে গল্পেরও সেই তফাৎ। একটী রীতিমত উপন্যাসে আমাদিগকে জগতের অভ্যন্তরে খানিক দূর টানিয়া লইয়া যায়; আষাঢ়ে গল্প আমাদিগকে চারিদিক হইতে আনিয়া গৃহে বন্ধ করে। আষাঢ়ের সহিত শীতের গল্পের প্রভেদ এই যে, আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধার গল্প—শীতের গল্প বৃদ্ধের গল্প। শীতের গল্পে খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা এ-ও-তা' গুঁজিয়া দিলে বেশ চলিয়া যায়। আষাঢ়ের গল্পে বিজ্ঞানের গন্ধ সহ্য হয় না। ভিজা ভিজা ভাব আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ

উপসংহার আষাঢ়ে গল্পে সকল গুলিতেই এক। গল্পের সঙ্গে উপসংহারের বড় একটা সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ গল্প-বক্তার সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিতে পারে। আষাঢ়ে গল্পের সাধারণ উপসংহার "আমার কথাটী ফুরোলো—নটে শাকটী মুড়োলো" ইত্যাদি। রাজার কথাই হৌক্, রাখালের কথাই হৌক্, শৃগাল ব্যাঘ্রের কথাই হৌক্, এ উপসংহারটী সর্ব্বত্রই বসিয়া থাকে।

আষাঢ়ে গল্পে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয় অন্য কিছুতে সেরূপ হয় না। আষাঢ়ে গল্প শুনিলে বাঙ্গলার শারীরিক মানসিক অবস্থার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য দেশে আষাঢ়ের কিরূপ আদর জানি না। কিন্তু যেখানে আষাঢ় আছে—রীতিমত আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের মত জমাট্ আষাঢ় আছে সেখানে নিশ্চয়ই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। আমাদের এখানে জমাট্ বর্ষা—জমাট্ গল্প। যেখানে বর্ষা জমাট্ নয় সেখানে গল্পও জমিতে পায় না। হায়! সে দেশের কি দুর্ভাগ্য!

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতৃপ্তি।

তৃতীয় সর্গ।

আকুলতা।

ললিত। (একাকী)
অনন্ত এ আকুলতা লয়ে
কি করি কি করি কোথা যাই?
চারি দিক শূন্য শূন্য ময়
দাঁড়াবার কোথা আছে ঠাঁই?
কোথা দেবী জ্যোতির লহরী!
কোথা সেই মাধুরীর ছটা?
মিলিতে না আঁখিতে আঁখিতে
চারিদিক ঘন ঘোর ঘটা!
ও আঁখি কোরো না নিমীলন
চাহ পুনঃ চাহ মুখ তুলে?
অভাগা এ আশ্রয় বিহীনে
আশ্রয় যাইবে কি গো ভুলে?
একি কথা! দেবী কে সে? কোথা?
বনবালা দেবি মোর আয়,
মধুর প্রেমের বুকে তোর
হৃদয় আশ্রয় মোর চায়।

আকুলতা।

বন বালা। (একাকী)
কেন গো এমন করে বুকের ভিতর?
এ কি এ আশঙ্কা হৃদে করিয়াছে ভর!

হু হু করি জ্বলে উঠে
বেগে উচ্ছ্বলিয়া ছুটে
লণ্ড ভণ্ড করি দিয়ে হৃদয়ের স্তর!
কেমন সন্দেহ বায়ু থেকে থেকে ছোটে,
হৃদয় সে ঘূর্ণি-পাকে আলোড়িয়া ওঠে!
মরমের তার গুলি
ছিঁড়ে খুঁড়ে টেনে তুলি
চলি যায় রাখি শুধু শূন্য ভয়ঙ্কর!
মরুময় হৃদয়ের যেদিকেতে চাই,
আঁধার আঁধার শুধু দেখিবারে পাই!
নাহি হেথা অশ্রু জল
নাহি হাসি নাহি বল
আঁধারে ছাইয়ে শুধু রয়েছে অন্তর!
নাহি আর প্রেম আশা নাহি সুখ স্নেহ,
বিশ্বাস ফুরায়ে গেছে নাহি আর কেহ!
কিছু নাই কিছু নাই
আঁধার সমস্ত ঠাঁই
আঁধার সন্দেহ বুকে বাঁধিয়াছে ঘর।
আঁধার হৃদয় মাঝে বাহিরে আঁধার!
আঁধারে চৌদিক শুধু করে হাহাকার!
আঁধার আঁধার আঁখে
আঁধার তাকায়ে থাকে
আঁধারে কাঁদিতে থাকে বিশ্বচরাচর!

ললিতের প্রবেশ।

ললিত।

সুখের ছবিটি মোর নয়ন-উল্লাস,
পরানের সঞ্জীবনী হৃদয় বিকাশ,
বিকশিত কুসুমের মধুরিমা খানি,
কেন গো বিষণ্ণ হেরি ঐ মুখখানি?
উলসিত বসন্তের তুই বনবালা,
যৌবন স্বপন সুখে করিবি যে খেলা,
ললিত লাবণ্য কোথা? কোথা সুধাহাসি?
সুবাসিত মালাখানি কেন ম্লান বাসি?

বনবালা।

সখাগো কোরনা উপহাস!
এ যে সখা বাসি মালা নাহিত সুবাস!
কি দিয়ে করিবে তবে, বসন্তের হৃদয় বিকাশ?
সখাগো কোরোনা উপহাস।
ও আদরে বাড়ে ব্যথা,
কয়োনা প্রেমের কথা,
নাই যদি প্রেম,—মিছে কেনগো প্রকাশ!

ললিত।

সারাদিন ঐ এক কথা
সারাদিন ঐ অভিমান?
না জানি সে প্রেম ক'স কারে
না পেয়ে যা ব্যথিত পরাণ।
সারাদিন অশান্তি অতৃপ্তি
সারাদিন আকুলি ব্যাকুলি?
সারাদিন সন্দেহ দারুণ
দিনরাত প্রাণ জ্বলাজ্বলি!
ইহাকেই বলিস কি প্রেম!
এই যদি ভালবাসা হয়?
তার চেয়ে শান্ত স্নেহময়
বন্ধুতা কি ঢের ভাল নয়?

বনবালা।

একটু একটু যদি থাকে গো দয়ার রেখা,
রাখ এই কথা সখা আর নাহি দিয়ো দেখা।
জ্বলন্ত বাসনা হৃদে যদি উঠে দেখিবার,
আকুল পরাণ যদি চাহে তোমা বারবার,
তবু সখা তবু সখা, দিওনা দিওনা দেখা,
যাতনায় এহৃদয় হয় যদি ছারখার।
সহিতে না পারি সেই তীব্রময় জ্বালা,
যদি গো মরিয়া যায় অভাগিনী বালা,

সে সময় একবার দিওমাত্র দেখা,
নহে তার আগে তবু নহে আগে সখা।
প্রেমাগুণ যতদিন এহৃদে রহিবে জাগি,
দিওনা দিওনা দেখা এই এক ভিক্ষা মাগি।
বিষণ্ণ কাতর আঁখি, অগ্নিময়-অশ্রুমাখি
ডাকিবে যখন তোমা কায়মনচিতে,
তবুও তখন নাহি এস দেখা দিতে।
যখন দেবতা হৃদে সঁপিবেন বল,
যখন নিভিয়া এই প্রেমের অনল,
বন্ধুতায় পরিণত, হইবে তোমার মত,
যে দিন শুকায়ে যাবে নয়নের জল,—
সেই দিন হতে সখা আসিও আবার,
নহে তার আগে তবু নহে আগে তার।
সে দিন কহিব কথা, নীরবে দিব না ব্যথা,
হাসিব, কাঁদিয়ে সখা কাঁদাব না আর।
সেই দিন হতে হব তোমারি মনের মত,
উল্লাসে প্রমোদরঙ্গে করিব আমোদ কত!
সে দিন পরাণ খুলি বিষাদযন্ত্রণা ভুলি
হাসিব উচ্ছ্বাসভরে তুমিও হাসিবে যত।
তবে দুখিনীর শুধু এই মাত্র ভিক্ষা সখা,
সে দিনের আগে আর দিওনা দিওনা দেখা।

প্রস্থান।

ললিত।

গেল চলে; বলে গেল আমাকে চাহেনা আর!
কে কাঁদে কাহার তরে সংসারে কেই বা কার?
পশ্চিমে পড়েছে ঢলে কনক তপনকায়!
এখনো পূরব নভ যদিও লোহিত ভায়!
প্রেমের স্মৃতির রাগ এখনো রয়েছে মাখি,
এখনো কাঁদিয়ে রাঙ্গা বিশাল গগণ আঁখি!
তবুও এ কতক্ষণ বিরহের অশ্রুজল!
নিমেষের তরে শুধু অভিনয় এ সকল!
উদিবে চাঁদিনী নিশা ফুরাইবে এ বিষাদ,
এখনি হাসিবে নভ হৃদে নব নব সাধ!
তবে যাই যাই চলে আমাকে চাহেনা আর,
কে কাঁদে কাহার তরে সংসারে কেই বা কার!

অনন্তের স্বপ্ন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ডিকুইন্সির "অনন্তের স্বপ্ন" ভারতীতে বাহির হয়। এক্ষণে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান লেখক রিক্তরের স্বপ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি। ডিকুইন্সির পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নটি হইতে ইহার কিরূপ প্রভেদ তাহা প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিবেন। আমরা এস্থলে স্বপ্নটি যেরূপ প্রকাশ করিতেছি তাহা ডিকুইন্সির অনুবাদ হইতে গৃহীত। কিন্তু ডিকুইন্সির সকল অনুবাদের ন্যায় ইহাও মূল হইতে যথেষ্ট বিভিন্ন ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

"আমি এক সময়ে বৈজ্ঞানিক ক্রুগরের একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম। তাহার একস্থানে—গ্রহ হইতে গ্রহের সৌর জগৎ হইতে সৌর জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থান শূন্যময়—এই পুরাতন অজ্ঞ ভ্রান্ত মতের বিশেষ বর্ণনা সন্নিবিষ্ট আছে।

আমাদের সূর্য্য মণ্ডল অপর কোন সূর্য্য মণ্ডল হইতে যে দূরে অবস্থিত আমাদের সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি সর্ব্ব সহিত তাহার ৩১৪১৯৪৬০০,০০,০০,০০০ অংশের একাংশমাত্র স্থান অধিকার করে। উক্ত বর্ণনা পড়িয়া ভাবিলাম উঃ! ইহা যদি প্রকৃত হইত— এই ধূলিময় উজ্জ্বল সৌরজগদ্‌বিন্দুগুলি ব্যতীত আর সমস্তই যদি শূন্যময় আঁধার হইত— তাহা হইলে এই বিস্তৃত বিশ্ব কি ভয়ানক দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিত! তাহা অপেক্ষা আমরা কেন মনে করি না—যে পৃথিবী, সাগর কেবল মাত্র মৃতের আবাস ভূমি জীবিতের নহে; পৃথিবীর জনাকীর্ণ সুন্দর সুবিস্তৃত দ্বীপগুলি শম্বুক খোলস অপেক্ষা বৃহত্তর নহে। বিমানমার্গ শূন্যময় স্থির করা অপেক্ষা এইরূপ সিদ্ধান্ত লঘু-ভ্রম সন্দেহ নাই। সাগরগর্ভবাসী জন্তু সকলের পক্ষে সমুদ্রের উর্দ্ধবর্ত্তীস্থান বায়ুবাষ্প-হীন শূন্য বলিয়া ভ্রম করা ইহাপেক্ষা অনেক গুণে যুক্তিসঙ্গত।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা হার্শালের মতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নক্ষত্র আমাদের হইতে এত দূরে অবস্থিত যে অদ্য তাহার যে জ্যোতি আমাদের পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে তাহা অন্যূন ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সেই তারকা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, এবং এইরূপ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে যে কোন কোন বহুদূরস্থিত তারকাদি বহুযুগ হইতে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেও তাহাদের পূর্ব্বপ্রদত্ত আলোক আমরা অদ্যাবধি উপভোগ করিতেছি। ইহা যদি সত্য হয় তবে সৌর জগৎ বহির্ভূত যে শূন্য প্রদেশ সমস্ত-জগৎমণ্ডলীকে বেষ্টন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহার তুলনায় জগৎ মণ্ডল কিছুই না। এই শূন্যময় কাল্পনিক মরুভূমি ব্যাপ্ত শক্তি-সকল এক মুহূর্ত্তের জন্য ও বিস্মৃত হইতে পারে এমন কে আছে! ইহা জগৎ ভেদ করিয়া শূন্য, শূন্য ভেদ করিয়া আবার অপর এক জগৎকে আমাদের নয়নগোচর করাইতেছে। আকর্ষণী শক্তি কি বিশ্বগত নহে? তাঁহা কি কেহ কোনও সূর্য্য ও তাহার গ্রহের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে? মধ্যবর্ত্তী সমস্ত শূন্যরাজ্য ভেদ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী তারকাটির আলোক কি আমাদের পৃথিবীকে স্পর্শ করে না? মনুষ্যের নিজ মস্তকের সার-মধ্যে যেরূপ মানবাত্মার অবস্থান সেইরূপ এই আলোক প্রবাহের মধ্যে গ্রহময়-বিশ্ব আধ্যাত্মিক জগতের মাতৃভূমি স্বরূপে বিরাজমান।

এই সকল চিন্তার অবসান হইলে নিম্নোক্ত স্বপ্নটি তাহাদের স্থান অধিকার করিল।

আমার মনে হইল যেন আমার বাহিক দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার আভ্যন্তরিক দেহটি যেন তথা হইতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উত্থিত হইল, এবং পার্শ্বে আমার আকার সদৃশ অপর এক আকার দণ্ডায়মান দেখিলাম। কিন্তু আমা হইতে তাহার এইমাত্র প্রভেদ যে উহা আমার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকময় নহে কিন্তু তথাপি আপনাকে অবাধে আলোকিত করিতেছিল। উক্ত আকারটি আমাকে বলিল "ইহলোক এবং পর-লোক এই দুইটি চিন্তাই আমার পক্ষযুগল-স্বরূপ যাহা দ্বারা আমি যথা ইচ্ছা অবাধে ভ্রমণ

করি।” অতঃপর দূর এক জগতের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল “আর দেখ! আমি ঐখানে রহিয়াছি। চিন্তা ও দ্রুতগতি তোমার সঙ্গে লইয়া আমার সহিত আইস, তোমাকে আবরণের মধ্য দিয়া বিশ্বরাজ্য পূর্ণরূপে দেখাইব।” এই কথা শুনিয়া আমিও সেই আকারের সহিত চলিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবী আমাদের দুই দেহের উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাদ্গত হইয়া অতি গভীর দূর প্রদেশে অবস্থান করিতেছে দেখিলাম। একটি মৃদু শিখা মাত্র এই পর্ব্বত-শ্রেণীর চূড়াদেশ হইতে চিকচিক্ করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পর আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে সূর্য্যকে এক অতিক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল মাত্র। ক্রমে আমাদের সৌর জগত একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল, কেবল তাহার স্থলে ধূমকেতুর ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের রেখামাত্র সিরিয়স নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত দেখিলাম। অতঃপর আমরা অসংখ্য সৌরমণ্ডলের মধ্যে এত দ্রুত পদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম যে তাহারা চন্দ্রের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের পশ্চাৎভাগে নৈহারিক বিন্দুর ন্যায় মিটি মিটি করিতে লাগিল আর সেই সকল মণ্ডলস্থিত গ্রহগণ একেবারেই আমাদের চক্ষু সন্নিধানে পড়িল না। অবশেষ সিরিয়স ও অপরাপর তারকাদল গুলি আমাদের পদদেশের অতি নিম্ন-প্রদেশে অপরাপর নৈহারিক আলোক বিন্দুর মত মনে হইতে লাগিল। এইরূপ নক্ষত্রারণ্য ভেদ করিয়া আমরা ছুটিলাম, একটির পর অপরটি এইরূপে অসংখ্য মণ্ডল-পতাকাগুলি আমাদের সমক্ষে বিকশিত হইয়া পরে আমাদের পশ্চাতে লুকাইতে লাগিল। উজ্জ্বল তারকার পর তারকাশ্রেণী অত্যুচ্চ প্রাসাদের ন্যায় অতিতুঙ্গ ও গম্ভীর ভাবে আমাদের নয়নাধীন হইয়া আমাদের অন্তরাত্মা স্তম্ভিত করিয়া আমার ডুবিয়া গেল। তাহারা যেন অনন্ত-বিধাতার গম্যপথের উভয়পার্শ্বে অতি বৃহদ্বিস্তারে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কখন কখন আমার পার্শ্বস্থ আকারটি আমার শ্রান্ত চিন্তারও অগ্রগামী হইতেছিল। তখন আমার এমন মনে হইল যেন সে আমাকে ছাড়াইয়া অসীম দূরে বিদ্যুতের ন্যায় চিকচিক করিতেছে। তবে যখনই মনে ভাবিলাম যে আমি তথায় উপস্থিত হইয়াছি মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখি যে আমিও সেই খানে পৌঁছিয়াছি। এইরূপে আমরা এক মণ্ডলের ভীষণ গভীর কবল হইতে অপর এক মণ্ডলের গ্রাসে পতিত হইতে লাগিলাম। আমরা যতই উচ্চে আসিতে লাগিলাম আমাদের উর্দ্ধস্থিত আকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র অপরিপূর্ণ মনে হইল না অথবা আমাদের নিম্নস্থ বিমানপ্রদেশ মণ্ডলাদির দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপূর্ণ এমনো মনে হইল না। যখন দেখিলাম বাত্যাপ্রধাবিত জলবিম্বের বারিধিতে নিমজ্জনের ন্যায় সূর্য্যগণ সূর্য্য-মহাসমুদ্রে বিলুপ্ত হইল, তখন আমার আভ্যন্তরিক মানব হৃদয় অতি-ভয়াক্রান্ত হেতু শ্রান্ত হইয়া ক্ষুদ্র গুহা অথবা নিভৃত ব্রহ্ম মন্দিরের জন্য ব্যাকুল হইয়া

এই বিশালবিস্তৃত বিশ্বের কোনও সীমান্ত নাই ? উত্তরে তিনি বলিলেন "আর দেখ ইহার কোন আদিও নাই।"

এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের উপরিস্থ আকাশ যেন শূন্য হইয়া গেল,—একটি তারকাকেও আর তাহার ক্ষীণপ্রভা বিতরণ করিতে দেখিলাম না—অনন্ত অন্ধকারের একত্ববিনাশের নিমিত্ত একটি আলোকশিখাও দেখা গেল না। আমাদের পশ্চাদ্স্থিত অগণ্য তারকারাশি একত্র মিশিয়া যেন অস্পষ্ট নীহারিকার আকার ধারণ করিল। ক্রমশ তাহাও আমাদের নয়নপথ হইতে নিরুদ্দেশ হইল। তখন আমি ভাবিলাম "আঃ এতক্ষণে আমরা বিশ্বের অন্তসীমায় পৌঁছিলাম।" আর চতুস্পার্শস্থ ঘন গভীর সীমান্ত প্রদেশ কি ভয়ানক রাজ্য ভাবিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। এই শূন্যময় বহুবিস্তৃত অন্ধকার মরু সাগরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকময় বিশ্বকে অনন্তকালের জন্য অস্তমিত ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এই ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার পার্শ্বস্থ আকারটি পূর্ব্ববৎ আপনাকে আলোকিত করিতে লাগিল কিন্তু পার্শ্বস্থ সকলই অব্যক্ত রহিল। এই বিষম দুঃখের সময় আকারটি আমাকে বলিল "রে বিশ্বাসহীন মানব! উর্দ্ধে চাহিয়া দেখ্ অতি পুরাতন অনন্ত জ্যোতি আসিতেছে।" আমি চাহিলাম এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্যোৎস্না আসিয়া উদিত হইল। নিমেষ মধ্যে অত্যুজ্জ্বল তারকাজ্যোতি দেখিলাম অবশেষে অসংখ্য অগণ্য জ্বলন্ত তারকারাশি একত্রে মিশিয়া সমস্ত লোক জ্যোতির্ম্ময় করিল। যুগযুগান্তর হইতে এই অসংখ্য তারকাজ্যোতি আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিয়া চিন্তারাজ্যের অতীত উচ্চ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আমাদের ধরিল। আমরাও নূতন যুগের এই নূতন মণ্ডল সকল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। অবশেষে পুনরায় নক্ষত্র বিহীন অন্ধকার প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইবার অন্ধকার অধিক দূর বিস্তৃত দেখিলাম এবং অন্ধকার রাজ্য হইতে পুনরায় আলোক রাজ্যে পৌঁছিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত অন্ধকার হইতে আলোক রাজ্যে আলোকরাজ্য হইতে অন্ধকার রাজ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিলাম, এবং প্রতিবারই অন্ধকাররাজ্য ক্রমশ অধিক দূর বিস্তৃতি লাভ করিতেছে দেখিলাম। অবশেষে পরিত্যক্ত পৃথিবী যখন বিন্দু আকারে দেখিতে লাগিলাম আর উত্তরালোক (Aurora borealis) আমাদের নয়নপথে পড়িয়া আমাদের পৃথিবীর নিরুদ্দেশ হইবার প্রথম সূচনাস্বরূপ হইল, তখন এ সকল দেখিয়া শেষ বিচারদিন উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বৃহৎ সমুদ্রাভ্যন্তরিক জল প্রবাহ উত্থিত হইতে লাগিল এবং দশগ্রহ প্রমাণ বিদ্যুতালোক আমাদের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বহইতে পশ্চিমাভিমুখে দৌড়িতেছে দেখিলাম। আর যেখানে কোন সূর্য্য অধিষ্ঠান সেখানে তৎপরিবর্ত্তে কুহেলিকাময় বাস্পাভ্যন্তর হইতে এক গভীরান্ধকারময় পাংশুবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল বিরাজিত দেখি-

করিতেছে কিন্তু সেই আলোক এবং উত্তাপের কোন অংশই প্রত্যার্পণ করিতেছে না। আর দেখিলাম সীমান্ত বিহীন দৃশ্য পথের মধ্য দিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে—এবং তাহাদের শিখরস্থ তুষাররাশি তখন গ্রহাদির সংস্পর্শে ঝিক ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই অসীম বিস্তার দেখিবা মাত্র ভারাক্রান্ত শ্রান্তাবনত হৃদয়ে আমার সহযাত্রী আকারটিকে কহিলাম "ক্ষান্ত হও, আমাকে লইয়া আর চলিও না—আমি পৃথিবীর মধ্যেই সঙ্গীহীন, এই মরুরাজ্যের মধ্যে আরো একাকী বলিয়া অনুভব করিতেছি। সমস্ত পৃথিবীই যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ কিন্তু এই শূন্যময় মরু প্রদেশ তাহা হইতে আরও সুবৃহৎ এবং বিশ্বের বৃদ্ধি সহকারে ইহার মরুময় সাহারা যেন আরও বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অতএব আর অগ্রসর হইও না—এইখানেই ক্ষান্ত হও।"

তখন আকারটি নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় মৃদুভাবে আমাকে স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিকতর কোমল স্বরে বলিলেন "পরমেশ্বরের সমক্ষে শূন্যের অস্তিত্ব নাই। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, মধ্যে, তারকাগণের চতুস্পার্শ্বে, আঁধারে আলোকে সকল স্থলেই বিশ্বের প্রকৃত আবাসভূমি। এই বিশ্বই সমস্ত সত্যের আধার কিন্তু মানবাত্মা অপার্থিবের পার্থিব চিত্র অঙ্কনেই কেবল মাত্র সমর্থ। পবিত্র অঞ্জন দ্বারা তোমার চক্ষুকে দিব্য-দর্শন প্রদান করিতেছি, নয়ন উন্মীলন করিয়া দিব্য দৃশ্য অবলোকন কর।" তৎক্ষণাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম সম্মুখে অসীম আলোক-সমুদ্র বিস্তৃত তাহা অকুল, অগাধ, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ। এক মণ্ডলী হইতে অপর মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থান জ্যোতির্ম্ময় দেখিলাম এবং মধ্যে মধ্যে তথা হইতে ভীষণ জলপ্লাবনের বজ্রঘোষণা আসিয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে নিম্নে যে মার্গশূন্য অসীম বিস্তার আমরা পূর্ব্বে পার হইয়া আসিয়াছিলাম তাহা আমার নয়ন পথে সুস্পষ্ট পতিত হইল এবং অতি দূর ও অতি নিকট উভয়ই আমার দৃষ্টির পক্ষে তখন সমভাবে অবস্থিত দেখিলাম। অন্ধকার জ্যোতিতে পরিণত হইল, আলোক অন্ধকারে লয় পাইল, সৃষ্টির মরুময় ও জীবহীন প্রদেশ অনন্ত আলোক সাগরে আপ্লুত হইল এবং এই আলোক সাগরে সূর্য্যগণ ধূষর পাংশুবর্ণ মুকুলের ন্যায়, আর গ্রহগণ কৃষ্ণবর্ণ বীজকণার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। তখন আমি সুস্পষ্ট বুঝিলাম যে মৃত্যু কেবল মাত্র পৃথিবীতেই বিচরণ করে কিন্তু আমরা যেন জগতের অতীত রাজ্যে অমর ভাবে বিরাজমান। আমি দেখিলাম ধূলিজাত গ্রহগণ আলোক রাজ্যের বালাত্মার দোলানাস্বরূপ। সৃষ্টির সাহারা মরুগুলিতেও জীবন ও বিধাতৃ শক্তির চেতন-প্রতিধ্বনি ও নিশ্বাস শুনিলাম এবং প্রতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করিলাম—[যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান্ সকলই আমি—যাহা কিছু অতীতকালে ছিল অথবা ভবিষ্যতে আসিবে সকলই আমি।] বুঝিলাম আমার চক্ষুর সম্মুখে যে মায়াবরণ রহিয়াছে কোন মানব হস্ত তাহা উন্মোচনে সমর্থ নহে।

সমস্ত সৃষ্টির রহস্যাবরণ যে কেহ উন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট হয় কেহই কৃতকার্য্য হয় না। জীবনের অপরিসীমত্বের সম্মুখে দুঃখ স্থান পায় না কেবল মাত্র অসীম পরমানন্দ ও পুণ্য-প্রার্থনা-সঙ্গীত তথায় অবাধে বিচরণ করে।

বিশ্বের এই মহান দৃশ্যের মধ্যে পূর্ব্বাবধি অনন্তকালপ্রদীপ্ত আকারটি অন্তর্দ্ধান হইল কিন্তু একেবারে এখন বিলীন হইল অথবা অপরিদৃশ্যমান্ তাহার মাতৃভূমি দেবজগতে গমন করিল কি করিয়া বলিব! কেবল মাত্র আমি একক এই জীবন্ত বিশ্বের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান হইয়া মানব সহানুভূতির জন্য লালায়িত হইলাম। তখন দূর গভীর অন্তরীক্ষের আলোক সাগর হইতে ভাসিয়া হঠাৎ একটি গ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রহের উপরে মাদোনার আকৃতির একটি দেবী দণ্ডায়মানা। তাঁহার পার্শ্বে একটি সন্তান। বালকের মুখমণ্ডল প্রশান্ত নিশ্চল এবং নৈকট্যপ্রযুক্ত তাঁহার মুখ কিছু বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিল না। শিশুটি রাজচক্রবর্ত্তী যেহেতু দেখিলাম তাহার মস্তকে মুকুট অবস্থিত কিন্তু সেটি সুবর্ণ নির্ম্মিত না হইয়া কণ্টক নির্ম্মিত। তখন বুঝিলাম যে গ্রহটি আমাদের দুঃখময় পৃথিবী এবং যেমন পৃথিবী নিকটবর্ত্তী হইল অমনি এই শিশুটি যেন দূর নক্ষত্র রাজ্য হইতে আমাকে সান্তনা প্রদানের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এইরূপ কোমল করুণার এবং অনন্ত স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আমার অন্তঃকরণ আনন্দ লহরীতে ভাসিতে লাগিল—সে আনন্দ আমাদের ধারণাতীত। পরে তুমুল আনন্দ কোলাহলের মধ্যে জাগিয়া উঠিলাম।

আমি জাগিলাম বটে—কিন্ত স্বপ্নাবসানেও আমার সুখ জীবন্ত রহিল। পরে বিস্ময় মনে বলিয়া উঠিলাম "আহা! মৃত্যু কি সুন্দর! এখন দেখিতেছি আমরা বিনষ্ট না হইয়া মরণাবসানে জীবন্ত অসীমানন্ত রাজ্যে গমন করি। তখন এই পৃথিবীতে আমাকে প্রেরণ করার জন্য পরমেশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। কিন্তু মৃত্যুর পর বিশ্বের অদৃশ্য স্বর্গ রাজ্যে আমাদের স্থান দানের নিমিত্ত অধিকতর ধন্যবাদ প্রদান করিলাম—সেখানে চরম পুণ্য অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নাই সেখানে পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীবন ও তুচ্ছ আশা প্রবেশ করিতে পারে না—পরমেশ্বরের সেই পুণ্য স্বর্গ রাজ্যের জন্য পুণ্যান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

জোছনা রজনী।

আকাশ প্লাবিত জোছনা—
প্রেমে যথা মানুষের হিয়া।
তারাগুলি নিবু নিবু চায়—
নবপ্রেমে সলাজ নয়না।
ধীরে ধীরে অতিধীরে
বায়ু বহে যায়—
প্রেমভরে শ্লথকলেবর।
জোছনা মাখিয়া শিরে
আঁধার বুকেতে করে
তরুগুলি সন্তপ্ত অন্তর!
সর্ব্বাঙ্গে চাঁদিমা মাখি
মাথা উঠাইয়া তরু
অবাক চাহিয়া নভপানে!
কদাচিৎ কোন পাখী
জোছনা প্লাবন দেখি
মাতিয়াছে সুমধুর তানে।
সম্মুখে বিস্তারি সিন্ধু
বিশাল হৃদয়,
পিইছে চাঁদের মধু
পরাণ পূরিয়া;
মত্ত মধুপানে সিন্ধু,
অনন্ত হৃদয়,
সুখভরে থাকি থাকি
উঠিছে ফুলিয়া।
ঊর্ম্মিরূপে ভাঙ্গি ভাঙ্গি
অনন্ত হীরক,
ছড়াইছে, হাসিতেছে
চাঁদ মুখে চাহি।
প্রেমেতে বিভোর চাঁদ
কোটি চাঁদ হয়ে
সিন্ধু বক্ষে যাইতেছে ভাসি!

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বেলি-গার্ড।

(২)

সিপাহীরা আসিয়া রেসিডেন্সির চারিধার অবরোধ করিলে কমিশনার সাহেবের আদেশানুসারে এক এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এক একটী স্থান রক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। বেলিগার্ড গেট রক্ষা করিবার ভার লেফ্‌টেনাণ্ট এট্‌কেন সাহেবের হাতে পড়ে—তিনি প্রথমতঃ একদল দেশীয় পদাতিকের সহায়তায় এইস্থান রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। শত্রুর আগমনের পূর্ব্বেই বেলিগার্ড তোরণের বৃহৎ কবাট দুটি একেবারে বন্ধ করিয়া তাহার পার্শ্বে মৃত্তিকাময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়। এই প্রকার উপায়ে শত্রুদিগের প্রবেশ পথ বন্ধ করা হইল বটে কিন্তু তাহাদের বজ্রনাদী কামান সকল এই রুদ্ধ তোরণের উপর অজস্র অগ্নি বর্ষণ করিয়া অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের মনে যথেষ্ট ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। শত্রুপক্ষ যাহাতে আর একতিল মাত্র অগ্রসর না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই তোরণের মুখের উপর লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব দুইটী বড় বড় কামান স্থাপন করিয়াছিলেন।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় দিনে প্রতিহিংসা-পরায়ণ উন্মত্ত সিপাহীগণ মহোল্লাসে ভীষণ দৃঢ়তার সহিত এই তোরণ দ্বারের উপর সাংঘাতিক আক্রমণ করে। সেই দিন তোরণ দ্বার ভাঙ্গিতে পারিলে ক্ষিপ্ত সিপাহীগণ লক্ষ্ণৌএ কাণপুর ব্যাপারের দ্বিতীয় অভিনয় করিত—কিন্তু ইংরাজের বড় সৌভাগ্য যে তোরণ দ্বারের অতি সন্নিকটস্থ হইয়াও তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। এই দিনে লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহাম নামক একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক শত্রুর সঙ্গীন বিদ্ধ হইয়া অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

ইহার পর ২০ এ আগষ্ট তারিখে সিপাহীগণ অগ্নিসংযোগে এই তোরণ দ্বার ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতেও বিফল-মনোরথ হয়। পরিশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া তাহারা ভূপ্রোথিত বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া ইহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার সংকল্প করে, কিন্তু তাহাদের গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ সেই দিবস প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত বারুদ ভিজিয়া যায়। ইহার পর বেলিগার্ড তোরণের উপর আর অধিক আক্রমণ হয় নাই। স্যার জেমস্ আউটরাম যে সময়ে লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে সসৈন্যে রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হন, সেই সময়ে তিনি এই বেলিগার্ড গেটের নিকট একদল হাইল্যাণ্ডার সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ফেরার সাহেবের বাড়ীর গায়েও আর একটী আড্ডা করা হইয়াছিল। কাপ্তেন ওয়েষ্টন সাহেব পেন্সন প্রাপ্ত সিপাহীদের সহায়ে এই স্থান রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন। লক্ষ্ণৌএর ঘণ্টাঘর হইতে ডাক্তার ফেরার সাহেবের বাটীর সকল অংশই

প্রায় দেখা যাইত। ঘণ্টাঘর সিপাহীদিগের হাতে ছিল সুতরাং এই স্থান হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহারা ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর উপর ভয়ানক গোলাবর্ষণ করে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর "তয়খানায়" প্রথমতঃ অনেক বালক, বালিকা, অসহায়া রমণী ও বৃদ্ধাদিগের আশ্রয় স্থান হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুদিগের ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টিতে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। কলিন ক্যাম্বেল ও আউটরাম লক্ষ্ণৌএর উদ্ধার কার্য্য সমাধা করিয়া অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে লইয়া আলমবাদাভিমুখে ধাবিত হইলে রোষপরায়ণ সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া কামানের চোটে ইহার ছাদ উড়াইয়া দেয়।

রেসিডেন্সী ভবন—অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই স্থান ইংরাজ রেসিডেণ্টদিগের আবাসস্থান ছিল। অযোধ্যা ইংরাজের খাসে আসিলে চিফ কমিশনার এই চির প্রিয় আবাস স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া এই স্থানেই স্বীয় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। রেসিডেন্সি ভবনের আজকাল যে ভগ্নাবশেষ অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, তাহা হইতেই বোধ হয় ইহা এই সীমার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাড়ী ছিল। অত্যুচ্চতা নিবন্ধন বাড়ীটির উপর শত্রুর লক্ষ্য কিছু বেশী পড়িয়াছিল। অবরোধের সময়ে ইহার সর্ব্বোচ্চভাগে একটী টেলিগ্রাফ সিগন্যাল-আফিস স্থাপন করা হয়। এইস্থান হইতে তারের দ্বারা "মচ্ছিভবনের" সঙ্গে খবরাখবর চলিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে রেসিডেন্সি প্রাসাদের অতিশয় মনোরম অবস্থা ছিল—চারিদিকে মনোহর পুষ্পোদ্যান সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জবন ও অন্যান্য নানাবিধ দর্শনীয় বস্তু ইহার কমনীয়তা বৃদ্ধি করিত কিন্তু অবরোধের কয়েক সপ্তাহ পরেই এই বৈজয়ন্তী শোভা পদদলিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রাক্ষসী ভাব ধারণ করে। সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষাদির স্থল দুর্গন্ধময় বারুদস্তূপ অধিকার করে। নানাবিধ সুদৃশ্য প্রস্তর মূর্ত্তির স্থলে রাশক্বিত গোলা গুলি ও কামান প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা রেসিডেন্সির সম্মুখে প্রোথিত করা হয়।

রেসিডেন্সির দক্ষিণভাগে একটী বিস্তৃত তয়খানা ছিল। এই তয়খানার মধ্যে অনেক বড় বড় সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট, জজ্ ও উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা সামান্যভাবে কাল যাপন করিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে অগণ্য দাস দাসী ফিরিত, যাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইলে ব্রুহাম ফেটিনে রাজপথ পরিপূর্ণ হইত, যাঁহাদের অন্য সময়ে দেখিলে লোকে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইত, যাঁহারা সর্ব্বদা দেবভোগ্য রসাল অমৃতোপম খাদ্য দ্রব্যে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন, লক্ষ্ণৌএ অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সামান্য বেশে সামান্য পরিচারিকার ন্যায় এই তয়খানায় বসিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছিল। নিজ হস্তে রন্ধন, কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ, স্বহস্তে বস্ত্রধৌতকরণ ও কূপ হইতে জলোত্তোলন প্রভৃতি সমস্ত পরিশ্রমের কার্য্য তাঁহারা কলের পুত্তলির ন্যায় সমাধা করিতেন। ভিতরের রসদ শেষ হইয়া আসিলে পরিশেষে সামান্য আটার রুটি, জল,

ও অপরিষ্কৃত সিদ্ধ ডালই তাঁহাদের জীবন রক্ষার উপায় মাত্র হইয়া পড়ে। * এই ভয় খানার ঠিক উপরের ঘরের বারান্দায় কর্ণেল পামার সাহেবের কন্যা মিস্ পামার গোলা বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এইখানে তাঁহার স্মরণার্থ একখানি প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত আছে। যেখানে মিস্ পামার মরিয়াছিলেন, তাহার ঠিক উপরেই উত্তর পূর্ব্বের ঘরে স্যার হেনরী আহত হন।

রেসিডেন্সির পরেই "ভোজখানা"। ইংরাজেরা ইহাকে Banqueting Hall বলিতেন। কমিশনার দল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীরা এই সুসজ্জিত, সুপ্রশস্ত প্রাসাদে আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, নৃত্যাদি আমোদ প্রমোদের কোন পার্টি হইলে এই স্থানে তাহার আয়োজন হইত। চারিদিকে বড় বড় জানালা—বড় বড় ঘর ও দালান থাকাতে বিদ্রোহের সময়ে ইহার উপর শত্রুর দৃঢ় লক্ষ্য পড়িয়াছিল। অনেকগুলি জানালা ও দ্বার আলমারি, তাঁবু প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহার সাধ্য কি জ্বলন্ত বেগবান গোলার গতি প্রতিহত করে? অবরোধের প্রারম্ভেই স্যার হেন্রি এই সুপ্রশস্ত প্রাসাদকে "রুগ্ননিবাসে" পরিণত করেন। আহত, পীড়িত, ইংরাজ সৈনিকগণের শুশ্রূষার ও সুচিকিৎসার জন্য অনেক বড় বড় উচ্চপদস্থ রমণী পালা ক্রমে এই "ভোজখানায়" আসিয়া দিবারাত্রি রোগীর যাতনা উপশমে নিযুক্ত থাকিতেন। দুইমাস পূর্ব্বে যে স্থান উজ্জ্বল আলোক মালায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যপরায়ণ ইংরাজ নরনারীর পদস্পর্শে কৃতার্থ এবং পিয়ানোর মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইত, ঘটনাবশে তাহা হইতে এই ভয়ানক সময়ে কেবল মুমূর্ষুর হৃদয় ভেদী অস্ফুট আর্ত্তনাদ, আহত সৈনিকের উন্মত্ত প্রলাপ ও পীড়িতা ইংরাজ রমণীগণের যাতনা ব্যঞ্জক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

"ববনেলর" নামক একজন কাফ্রি খোজা বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় বড়ই প্রভাব দেখাইয়াছিল। তাহার দৃঢ় লক্ষ্যে ও প্রতিহিংসার মুখে পড়িয়া অনেক ইংরাজ নরনারী জ্বলন্ত গোলার আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই রুগ্ন নিবাসের বারান্দায় তাহার

---

* লক্ষ্ণৌএ অবরুদ্ধ অবস্থায় স্যার হেনরির ভূয়োদর্শন ও সতর্কতা সত্ত্বেও আহার্য্য দ্রব্যাদি কি প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, নিম্ন লিখিত তালিকা হইতে তাহা বেশ প্রমাণ হইবে।

আটা	একটাকা সের।
ঘৃত (অপকৃষ্ট)	দশটাকা সের।
চিনি	ষোলটাকা সের।
দোক্তাতামাক	দুইটাকা প্রত্যেক পত্র।
ব্রাণ্ড	ডজন ১৫০ হইতে ১৮০ টাকা।
বিয়ার	ডজন ৭০ টাকা।

Ree's seize of Lucknow.

হস্তেই পাদ্‌রি পোলহামটন সাহেব আহত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। শত্রুর গোলাবর্ষণ ব্যর্থ করিবার জন্য এই "রুগ্ন নিবাস" ও ওয়াটার গেটের মধ্যে কয়েকটী বড় বড় কামান রক্ষা করা হয়; এবং ইহার দক্ষিণভাগে কারট্রিজ এবং বারুদ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল।

মার্টিনিয়ার পোষ্টের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ ও বিধ্বস্ত ভিত্তিমূল দেখিয়া কিছু কৌতুহল উপস্থিত হইল—অনুসন্ধানে জানিলাম মার্টিনিয়ার পোষ্ট নাম হইবার কারণ এই—

বিদ্রোহের প্রারম্ভেই সিপাহীদের উপদ্রবে সমস্ত লক্ষ্ণৌ নগর অশান্তির আকর হইয়া উঠে, ইহা দেখিয়া মার্টিনিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ স্কিলিং সাহেব স্বীয় ছাত্রবৃন্দ লইয়া এই অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রেরা যুদ্ধের সময়ে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর হ্যাভ্‌লক্‌ আউটরাম ও প্রধান সেনাপতি কলিন ক্যাম্বেল আসিয়া অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে উদ্ধার করিয়া দিলখুসাতে পাঠাইয়া দেন। রাস্তার চারিদিকে তখনও শত্রুর কামান গর্জ্জিতেছে, হঠাৎ অদৃশ্য স্থল হইতে শন্‌ শন্‌ করিয়া গুলি আসিয়া পড়িতেছে, এ প্রকার ভয়ানক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা ইংরাজদিগকে উদ্ধার করিয়া রেসিডেন্সির বেলিগার্ড গেট পরিত্যাগ করিলেন। এই আনন্দোচ্ছাসে কে কাহাকে ফেলিয়া গেল—তাহার ঠিক নাই—সকলেই নিজে পলাইতে পারিলেই বাঁচে। এই সময়ে একজন আহত ইংরাজ মার্টিনিয়ার পোষ্টের অদূরে একটী নির্জ্জন কক্ষে শায়িত হইয়া নিজের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। যখন তাহার জনৈক আত্মীয় আসিয়া তাহাকে বলিল—"আমাদের ত উদ্ধার হইয়াছে—তোমাকেও ত আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না—তুমি যদি আমার স্কন্ধে ভর দিয়া বেলিগার্ড গেট পর্য্যন্ত যাও, তবে জোগাড় করিয়া একখানা ডুলীর ভিতর তুলিয়া দিই।" সে ব্যক্তি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইল—বলিল "আমার আর বেশী দেরি নাই, তোমরা চলিয়া যাও—কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে জনকতক সিপাহী মারিয়া মরিব।" সে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আহত ব্যক্তি যে গৃহে ছিল, সেই গৃহের তয়খানায় রাশিকৃত বারুদ প্রোথিত ছিল। সিপাহীরা ইহা জানিত; সকলকে রেসিডেন্সি ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া একদল বিদ্রোহি যেমন সেই ভবন সন্নিকটস্থ হইল, অমনি সেই আহত ইংরাজ সৈনিক বারুদে অগ্নিদান করিল। সিপাহীরা অনেকে তখন গৃহের মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছে, জীবিত ইংরাজ দেখিয়া যেমন তাহারা বধ করিতে উদ্যত হইল, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অগ্নি-যুক্ত বারুদ মহাশব্দে ভিত্তিমূল বিদীর্ণ করিয়া সিপাহী দল ও আহত ইংরাজ সৈনিকের জীবনলীলা সাঙ্গ করিল।

একজন সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ অযোধ্যার বিদ্রোহ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা "প্রজাবিদ্রোহ" না "সিপাহী বিদ্রোহ?" অন্যান্য স্থলের এ

বিদ্রোহের যে প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হউক না কেন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই—কিন্তু অযোধ্যা বিদ্রোহ প্রসঙ্গে, সৈনিক বিদ্রোহ বা "Mutiny" কথাটা ব্যবহৃত না হইলেই ভাল হয়। কারণ কি আমরা পরে দেখাইতেছি।

যে সকল সিপাহী লইয়া ইংরাজ দেশীয়সৈন্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধাংশের উপরও তখন অযোধ্যা হইতে সংগৃহীত হইত। তখনকার কথা দূরে থাক্ আজও এ প্রকার প্রথা প্রচলিত। লক্ষ্মৌয়ে যে সকল সিপাহীরা বিদ্রোহে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ ইংরাজ সরকারের নিমকভোজী ও অপরাংশ ভূতপূর্ব্ব নবাব সরকারের বিদায় প্রাপ্ত সৈন্য দল। যে সরকারের ও যে পক্ষ ভুক্ত লোক হউক না কেন—অযোধ্যা প্রদেশ তাহাদের সকলেরই জন্মভূমি। অন্যান্য স্থানের লোক ছিল না—একথা বলিতেছি না কিন্তু যাহা ছিল তাহার সংখ্যা শতকরা দুই জনের বেশী নহে। এ প্রকার স্থলে প্রজাবিদ্রোহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

যে দলের লোক ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া বলিতেছেন—বেশ হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করা ভাল বলিয়া চীৎকার করিরাছিলেন। অযোধ্যা সম্বন্ধে যে তাঁহাদেব সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক, একথা তাঁহারা পরে স্বীকার করিয়াছেন। এমন কোন ঐতিহাসিক নাই, এমন কোন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ নাই—যিনি অযোধ্যা ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হওয়াকে বিদ্রোহের একটী মুখ্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখ না করিয়াছেন!

কিন্তু অযোধ্যার ন্যায় পঞ্জাবও ত ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল—সেখানেও "অসন্তোষ" "অভক্তির" কারণ প্রচুররূপে বর্ত্তমান ছিল—তবে সেখানে দ্বিতীয় লক্ষ্মৌএর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে পঞ্জাবজয়ের পর তাহার সুশৃঙ্খলা সাধনার্থে হেন্‌রী লরেন্সের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছিলেন। লরেন্স পঞ্জাবে না গিয়া যদি সর্ব্বপ্রথমেই অযোধ্যায় আসিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই মহা বিদ্রোহ ভ্রূণাবস্থাতেই লয় পাইত।

দৃঢ়চেতা লর্ড ডেলহাউসী এ কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু যে মহাপুরুষ "ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতাকাশে বিতস্তি প্রমাণ মেঘ খণ্ড দেখিয়াছিলেন"—তিনিই ইহার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—সুতরাং তিনি শাসন কার্য্যে ব্রতী হইয়াই ভগ্ন স্বাস্থ্য, অবসর ভোগেচ্ছু স্যর হেনরীকে বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহের সহিত অযোধ্যার কর্ত্তৃত্বভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে অগ্নি ঈষৎ ধূমায়িত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু সে ধূমরেখা অস্পষ্ট ও সাধারণ চক্ষুর দৃষ্টি বহির্ভূত! স্যর হেনরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অযোধ্যার সকল বিভাগেরই সকল স্থানেরই অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভেদ

তিনি দেখিলেন অযোধ্যাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তাহাকে আরো অরাজকতায় ডুবাইতেছেন। লক্ষ্ণৌএর সকল স্থানেই সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের ও প্রতিহিংসার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। ধনী হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই নূতন শাসন পরিবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট। নবাবী আমলে তাহাদের উপর অত অত্যাচার হইত, তথাপি এখনও তাহারা সেই প্রাচীন শাসন প্রথার প্রতি অনুরক্ত। স্যর হেন্‌রি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন তালুকদারেরা ইংরাজ শাসনের উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট; নবাবী আমলে তাহাদের বড় একটা জবাবদিহি ছিল না। অনেকে গায়ের জোরে দুর্ব্বলের ভোগ্য জমি স্বদখলে আনিয়া প্রভূত ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়াছিল, অনেকের নবাব সরকারের নিকট অনেক বাকী বকেয়াও পড়িয়াছিল, কিন্তু ইংরাজি শাসনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সকল রহস্য বাহির হইয়া পড়িল, তখন কমিশনার সাহেব জবরদস্তিতে তাহাদের পূর্ব্ব গ্রাস উদ্গীরিত করাইলেন। এইরূপে অনেক তালুকদার অর্দ্ধেকের উপরও জমি হারাইয়া ইংরাজ শাসনের উপর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ গ্রস্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ তিনি দেখিলেন ইংরাজ শাসনের বিশেষ শত্রু ভূতপূর্ব্ব নবাবের বিদায়প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ। নবাবী আমলে মোটা মোটা পেন্সন ভোগ করিয়া, চির-বিলাসিতায় কালক্ষেপণ করিয়া, সুখসেব্য দ্রব্যাদি সম্ভোগে সর্ব্বদা রত থাকিয়া তাহারা নিতান্ত পর মুখাপেক্ষী ও পরিশ্রমজনক কর্ম্মে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং নবাবের অবর্ত্তমানে তাহাদের পেট চলা ভার হইয়া পড়িল। অনেকে পেটের দায়ে গভীর নিশীথে সংগোপনে মূল্যবান দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদর সংস্থান করিতে লাগিল। এ প্রকার শ্রেণীর লোক যে ইংরাজ শাসনের উপর অভক্তিপরায়ণ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? তৃতীয় অসন্তোষের মূল কারণ, বিদায় প্রাপ্ত নবাব-সৈন্যগণ ও সাধারণ প্রজাবর্গ ও কয়েক দল দোকানদার। নবাবী আমলে সিপাহীরা নিয়মিত বেতন না পাইলেও নানা উপায়ে তাহাদের উপরি পাওনা ছিল—এবং বেতন না পাইতই বা কেন? নবাব সাহেবদের এ বিষয়েত কোন কৃপণতা ছিল না। অলসভাবে বসিয়া বসিয়া ডাল রুটি জীর্ণ করিয়া সিপাহীরা বিলাসিতার রসাস্বাদন করিয়াছিল। সুতরাং নবাব নির্ব্বাসিত হইলে ইংরাজ এই সমস্ত অকর্ম্মণ্য সৈন্য দলের অধিকাংশকেই পেন্সন দিয়া বিদায় করিয়া কিয়দংশকে স্বদলভুক্ত করিলেন। আবার অনেক সিপাহী স্বেচ্ছায় চাকরী ছাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহারা ইংরাজের এই ব্যবহারে তাহাদের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া উঠিল। তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রতিহিংসার তুষানলের তীব্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় তাহারা নীরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বিলাসিতার ভিত্তিমূলে লক্ষ্ণৌএর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; নবাবের দরবার বিলাসিতার কেন্দ্র স্থান সুতরাং লক্ষ্ণৌএ বিলাস দ্রব্যের দোকানেরও কোন অভাব ছিল না। লক্ষ্ণৌএর সুবিস্তৃত চক আজও তাহার সাক্ষ্যের

স্থল। দোকানদারেরাও অনেকে নবাব সরকারে দ্রব্যজাত যোগাইয়া বিপুল বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু নবাবের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারাও অবলম্বন ও উপজীবিকা শূন্য হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর বীতশ্রদ্ধ হইল। *

সাধারণ শ্রেণীর লোকেও নানা কারণে মনোমধ্যে অসন্তোষ পোষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যে শুল্ক বসাতে তাহার দাম চড়িয়া উঠিল। মাদক দ্রব্য, লবণ প্রভৃতির দাম অনেক চড়িল; অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যও বড় ফাঁক গেল না সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। †

তীক্ষ্ণদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, স্যর হেনরি লরেন্স ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ তারিখে লক্ষ্ণৌএর শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত অসন্তোষের কারণ দিব্য চক্ষে উপলব্ধি করিলেন। তাহাদের অসন্তোষের কারণও যে সমূলক ইহা বুঝিয়া যে প্রকার প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাদের সুবিধাকর ও সন্তোষপ্রদ হইবে, তাহাও অবলম্বন করিলেন। বড় বড় তালুকদার ও আমীর ওমরাহদিগকে প্রকাশ্য দরবারে ও অপ্রকাশ্যে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও মনোযোগ দেখাইতে লাগিলেন এবং পদচ্যুত কর্ম্মচারীদিগকে ইংরাজসরকারে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। তাহারা সকল সময়ে যাহাতে তাঁহার সহিত অনায়াসে সাক্ষাৎ করিতে পারে, তাহারও উপায় করিয়া দিলেন। শাসন সংক্রান্ত কতক বন্দোবস্তও নূতন করিয়া করা হইল। স্যর হেন্‌রির এই প্রকার সহানুভূতিতে, সৌজন্যতায় ও অমায়িকতায় সকলে তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল বটে—কিন্তু দৃঢ়নিবদ্ধ অসন্তোষ বীজ একেবারে মনোক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে পারিল না।

---

* এই শ্রেণীর ব্যবসাদারেরা কি প্রকার অসম্ভব লাভ করিত, এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা একজন শিল্পী একটী সুগঠিত কারুকার্য্যময় গালার (Lac) পুতুল তৈয়ার করিয়া নবাবকে উপঢৌকন দিতে যায়; নবাব ওয়াজিদ্ আলিসার মেজাজ তখন বড় প্রফুল্ল। বিশেষতঃ তিনি ঐ লাক্ষা নির্ম্মিত পুত্তলিকার সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরদ কিসিকা হ্যায়?" শিল্পী নম্রভাবে উত্তর করিল "জাঁহাপনা! "লাক্ কা হ্যায়"। নবাব সাহেব হুকুম দিলেন ইহাকে লাখ্ টাকা পুরস্কার দাও। বস্তুত সে লাখ্ টাকা না পাইলেও যে অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

† নবাবী আমলের একজন পক্ককেশ স্বর্ণকার লেখকের নিকট কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল "বাবু সাহেব! নবাবী আমলে আমরা চার পয়সায় দুইবেলা ডাল রুটি ও দুধ পাইতাম; কিন্তু এক্ষণে আট পয়সা দিলেও একজন লোকের একবেলায় পরিতৃপ্ত আহার হয় না।

এইপ্রকার অবস্থায় বহরমপুরের বিদ্রোহ ব্যাপার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এ সংবাদে তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চেতা, দূরদর্শী বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল—তিনি এই বিদ্রোহ স্ফুলিঙ্গকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না—মনে মনে ভাবিলেন—"এই স্ফুলিঙ্গ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সমস্ত ভারত বিদগ্ধ করিতে পারে—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কি আমি লক্ষ্ণৌএ সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া অযোধ্যা প্রদেশকে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিব না ?" ওয়াজিদ্ আলির নির্ব্বাসনের পরই যদি লরেন্স সাহেবকে অযোধ্যায় পাঠান হইত, তাহা হইলে বোধ হয় অযোধ্যার সিপাহী বিদ্রোহ আদৌ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিত না।

বহরমপুরের পদচ্যুত সিপাহীগণের মধ্যে অনেকেরই নিবাস অযোধ্যা প্রদেশ। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা সমস্ত ঘটনা আমূল বিবৃত করিল। জাতি-নাশাশঙ্কা পূর্ব্বে অযোধ্যার সিপাহীগণের বক্ষে প্রবিষ্ট না হইলেও ইহার পর হইতে তাহারা এ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। ইহার অব্যবহিত পরেই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া উঠিল—যে তাহা হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় জাতি-নাশাশঙ্কাই বিদ্রোহের একটী প্রত্যক্ষ কারণ।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের একদিনে ক্যাণ্টনমেণ্টের হাঁসপাতালে তথাকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সাহেব প্রাত্যহিক কার্য্য পরিদর্শন উদ্দেশে আগমন করেন। পদবীতে তিনি একজন সর্জ্জন মেজর—পায়াটা কিছু বড় বলিয়া বুদ্ধিটাও তদনুরূপ স্থূল ছিল। সেই "রুগ্ননিবাস" কেবল দেশীয় পীড়িত সিপাহীদিগের জন্য। সমগ্র ছাউনীর মধ্যে সেই টাই দেশীয় সিপাহীদের আশ্রয় স্থান। চারিদিকে রুগ্ন, অর্দ্ধারোগ্য সিপাহীগণ শুইয়া বা বসিয়া রহিয়াছে—এমন সময়ে ডাক্তার সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহের পার্শ্বেই এপথিকারীর (ঔষধ প্রস্তুতকারীর) গৃহ। সে ব্যক্তি একজন দেশীয়। সেই গৃহে ৪।৫ জন রুগ্ন সিপাহী ঔষধ লইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—সাহেব তাহাদের সম্মুখে এক বোতল আরকের তীব্রতা পরীক্ষা জন্য তাহার অগ্রভাগ স্বীয় ওষ্ঠাগ্র স্পৃষ্ট করিলেন। রুগ্ন সিপাহীরা যাহারা ঔষধের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া আর ঔষধ লইল না, তাহাদের প্রতিজ্ঞা—মরিয়া যাইবে তাহাও স্বীকার—তথাপি উচ্ছিষ্ট ঔষধ খাইয়া জাতিঃপাত করিবেনা। একথা বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে সঞ্চারিত হইল—সকলেই বিলাতী ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিল।

কথাটা স্যর হেনরির কাণে গেল—তিনি বুঝিলেন ডাক্তার সাহেব বস্তুতঃ বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন—বিশেষতঃ এই ভয়ানক সময়ে। তিনি এক দিন প্রাতে স্বয়ং গিয়া রুগ্ন নিবাসে উপস্থিত হইলেন—সকলের সমক্ষে সেই উচ্ছিষ্ট বোতল চূর্ণীকৃত করিলেন, ডাক্তার সাহেবকে সেই প্রকাশ্য স্থলে হিন্দীতে ভর্ৎসনা করিলেন। স্যর হেনরির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও ন্যায় পরায়ণতায় ক্ষুব্ধ সিপাহীগণ আপাততঃ সন্তুষ্ট হইয়া ঔষধ ব্যব-

হার করিতে আরম্ভ করিল বটে কিন্তু সেই অত্যাচারী ডাক্তারকে অল্পে ছাড়িল না। একদিন নৈশান্ধকার বিদূরিত করিয়া—গভীর নিশীথে জগতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা এক ভয়ানক অগ্নিশিখা উঠিল। অগ্নিশিখাটা ক্রমশঃ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া একখানি সুদৃশ্য সুসজ্জিত বাঙ্গলা উদরসাৎ করিল—স্বয়ং হেনরি রেসিডেন্সির উন্নত প্রাসাদ হইতে সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া সর্ব্বধ্বংসী অনলশিখা দেখিলেন—প্রকৃত ঘটনা কি তাহাও বুঝিলেন। একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল ছাউনীর হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেবের বাঙ্গলা জ্বলিয়া গেল। স্যর হেনরি বুঝিলেন প্রতিহিংসা এই অগ্নিদান করিয়াছে।

ডাক্তার সাহেব পলাইয়া গিয়া অপঘাত মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে এক বিষময় ফল ফলিল। জাতি-নাশাশঙ্কা লক্ষ্ণৌএর সিপাহীদের মনে কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইল। স্যর হেনরি অপরাধীদিগকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষদিগকে দেশীয় সৈন্যের উপর বিশেষ নজর রাখিতে উপদেশ দিলেন এবং মিষ্ট কথায়, সদুপদেশে, যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদে তাহাদের যতদূর সম্ভব বুঝান যাইতে পারে তাহাও করিলেন।

কিন্তু ধূমায়িত অগ্নিশিখার বর্দ্ধিত তেজ কতিপয় জলবিন্দু দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা সহজ নহে—বিবর নির্গত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গকে বেণুনিনাদে বশীভূত করা বড় অনায়াসসাধ্য নহে—উচ্ছলিত তরঙ্গায়িত নদী স্রোতের মুখে বালুকা স্তূপ স্থাপন করিয়া তাহার গতিরোধ করা সম্ভবায়ত্ত কার্য্য নহে, সুতরাং স্যর হেনরির এত উপদেশ, এত অনুযোগ, এত যুক্তি, এত সতর্কতা, এত শিষ্টাচার রোষ গর্জ্জিত প্রতিহিংসা পরায়ণ, সন্দিগ্ধ, অশান্তিগ্রস্ত সিপাহীদের শান্ত করিতে পারিল না।

ভবিতব্য অযোধ্যায় কি ফল প্রসব করিবে তাহা তিনি পূর্ব্বদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। যাহাই ঘটুক না কেন, বীরের কার্য্য—তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। সুতরাং তিনি সর্ব্ব প্রথমে "রেসিডেন্সি" ভবন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

রেসিডেন্সির সম্মুখে ও আশে পাশে, এবং বেলিগার্ড গেটের সান্নিধ্যে অনেকগুলি তৃণ কুটীর ছিল ; এই সকল কুটীরে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বাস করিত। কমিশনার সাহেব তাহাদের স্থানান্তরিত করিয়া—সম্মুখের স্থান সুপ্রশস্ত ও উন্মুক্ত করিলেন। রেসিডেন্সির নানা স্থানে প্রয়োজন মত পরীখা ও উচ্চ প্রাচীর ও মৃত্তিকা স্তূপ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল। বাহির হইতে যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তদনুযায়ী রসদ সংগৃহীত হইয়া রেসিডেন্সি জাত হইল। গোলাগুলি, কামান, বারুদ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রেসিডেন্সির মধ্যে নিরাপদ স্থলে প্রোথিত করা হইল।

এবং বাহিরের সমস্ত টাকাকড়ি একত্রিত করিয়া ঠিক্ রেসিডেন্সি ভবনের সম্মুখে স্যর হেন্‌রির নিজের চক্ষের উপর নিরাপদ স্থলে পুতিয়া রাখা হইল।

এই প্রকার নানাবিধ আয়োজনে স্যর হেনরি মনোনিবেশ করিলেন বটে—কিন্তু ইতিমধ্যেই ধূমায়িত অগ্নি রাশি সহসা একদিন জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ-মণ্ডল এতক্ষণ কেবল মেঘাচ্ছন্ন ও স্তব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল—ভয়ানক ঝটিকারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রকৃতির ন্যায় চারিদিকে এতক্ষণ যে স্তব্ধভাব লক্ষিত হইতেছিল, সহসা মহা-ঝটিকার প্রথম বাত্যা উঠিয়া তাহাকে সচঞ্চল করিয়া তুলিল।

২৮ এপ্রেল প্রাতে কতকগুলি "নব-সংগৃহীত" সিপাহী সৈন্য, কাওয়াজ শিক্ষার পর ছাউনীতে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময়ে অন্য পদাতি-দলের কয়েকজন সিপাহী বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটার জন্য তাহাদের বিদ্রূপ করিল। বিদ্রূপটা তাহাদের প্রাণে লাগিল এবং তাহারা ভবিষ্যতে টোটা কাটিতে অস্বীকার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। দলের কর্ত্তা সাহেব এই কথা শুনিয়া তাহাদের অনেক বুঝাইলেন এবং তাঁহার আশ্বাসপ্রদ বাক্যে তাহারা তখনকার মত কতকটা প্রবুদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রবাদ প্রশ্ন।

এতদিন জানিতাম কবিদেরই লোকে পাগল বলে, এখন দেখিতেছি শুধু তা নয়, নিজের বিষয় ছাড়িয়া অন্যের বিষয় যে যত ভাবে সেই তত পাগল—নিঃস্বার্থপরতাই সংসারে পাগলামী!

কিন্তু লোকে যাহাই বলুক, বাস্তবিক আমি "ক্ষ্যাপা" নহি—আমি শুধু নিঃস্বার্থপর। নিজের কথা আমি ভাবি না—নিজে বড় হইতে, বিখ্যাত হইতে ইচ্ছা নাই, আমি শুধু ভাবি অন্যকে কি করিয়া বড় করিব—কি করিয়া বিখ্যাত করিব। অন্যকে? কাহাকে? বিশ্ব সংসার ত অনন্ত অসীম? ক্ষুদ্র হইয়া এই অসীমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ত বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ান! বিশ্বজনীন-ভালবাসার বিশ্বজনীন উপকারিতা সম্বন্ধে আমার যে কিছুমাত্র অবিশ্বাস আছে তাহা নহে আমার কেবল বিশ্বাস ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং অন্যকে? কাহাকে? আমি যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তেমনি ক্ষুদ্রকে। যে যত দীনহীন সেই যেমন দানের তত উপযুক্ত পাত্র, তেমনি আমার ধারণা—বিখ্যাত হইবার যাহার যত সম্ভাবনা কম—সেই তত বিখ্যাত হইবার অধিকতর যোগ্য পাত্র।

এই যুক্তিসিদ্ধ কথাটি বুঝাইতে বুঝাইতে আমি পাঁচজন বন্ধুবর্গের সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি—দেখিলাম সিঁড়ির কোণে একগাছি খড় পড়িয়া আছে, দেখিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, নিঃস্বার্থপরতার উৎসাহস্রোতে আমার মনশ্চক্ষুর একটি আঁধার-পরদা সহসা খুলিয়া গেল—বুঝিলাম সার্থক আমার জন্ম, এত দিন পরে আমি বিখ্যাত করিবার ঠিক উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছি, ইহা হইতে দীন হীন সামান্য আর কি পাইব ?

খড়গাছটি উঠাইয়া লইয়া বন্ধুদিগকে বলিলাম "আমি এই খড়টিকে Famous করিব।" (আহ্লাদের আতিশয্যে আমার মুখ হইতে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে ইংরাজি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল তাই এখানেও সেই কথাটি রাখিলাম—ভরসা করি পাঠকগণ কিছু মনে করিবেন না)।

বন্ধুবর্গ হাসিয়া, অস্থির হইয়া, আমাকে ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি ভাবিতেছি আমি ক্ষ্যাপা কি তাঁহারা ? মানুষে যদি প্রসিদ্ধ হইতে পারে তবে খড়ই বা কেন প্রসিদ্ধ না হইবে ? অন্ততঃ আমার খড়গাছটি মানুষ হইতেও এসম্বন্ধে ভাগ্যবান কি না—পাঠকই তাহার বিচার করুন।

প্রথমতঃ যে কয়জন বন্ধুর সঙ্গে খড়গাছটিকে লইয়া উক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইল, তাহাদের কাছে ত খড়টি বিখ্যাত হইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহারা প্রত্যেকে কত জনের কাছে এই গল্প করিবেন—তাঁরা আবার কত জায়গায় এই কথা বলিয়া বেড়াইবেন, এই রকম করিয়া পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক ত এই খড়গাছটির কথা জানিয়া ফেলিবে। খড়গাছটির ভবিষ্যৎ বিখ্যাতির এই ত প্রথম সোপান। এখন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, কোন কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন একবার আরম্ভ করিলে তাহার শেষ সহজ কি না ? প্রকৃত পক্ষে কোন কার্য্যই কঠিন নহে যদি তাহার আরম্ভ না কঠিন হয়। আমার খড়ের কীর্ত্তিস্তম্ভের প্রথম সোপান যখন এত সহজে নির্ম্মিত হইয়া গেল তখন তাহার ভবিষ্যৎ গগণভেদী পরিণামের সম্বন্ধে আর কি সংশয় থাকিতে পারে ?

এই অসম্ভব সম্ভব করিতে কৃতকার্য্য হইয়া প্রাণটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল,—কিন্তু আমি নিস্বার্থপর, অন্যকে এই সুখের ভাগ উপহার দিবার জন্য প্রাণটা তদোধিক ফাটিয়া উঠিতে লাগিল, (দুঃখের বিষয় তখন পাঠকদিগের কথা মনে আসে নাই) আমি খড়গাছটির বিখ্যাতির সেই অত্যাঙ্গ-মূর্ত্তি চোখের উপর ধরিয়া, আর স্বয়ং খড় মহাশয়কে চাদরের কোণে বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি আমার প্রাণের বন্ধু ——বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার এই আহ্লাদ ভরা প্রাণ বন্ধুতার তরঙ্গে এতখানি উথলিত, তুফাণিত, উচ্ছ্বলিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল যে কীর্ত্তির নিদান এই সমগ্র খড়গাছটি ব্যতীত অন্য উপহার যে তাঁহার যোগ্য নহে ইহা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম, এবং তদনুসারে বিনা বাক্য ব্যয়ে 'যোগ্যং যোগ্যেন

যোজয়েৎ’ এই মহা বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া বন্ধুবরের প্রতি ইহা নিবেদন করিলাম। নব-বিবাহিত শ্রীমান——মোহন তখন এই খলুসংসারের সার কুটুম্ব দলে বেষ্টিত হইয়া জীবন সফল করিতেছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত শ্যালকমহোদয়গণ এখানে উপস্থিত থাকিতে তিনি এই মহামান্য উপহার গ্রহণের অনুপযুক্ত—সানুনয়ে ইহা নিবেদন করিয়া খড়গাছটি লইয়া সসম্ভ্রমে তিনি তাঁহাদের প্রতি পুনর্নিবেদন করিলেন। শ্যালক ঠাকুরগণের ইহাতে নিরানন্দের কোনই কারণ দেখিলাম না, কেননা খড়গাছটি তাঁহাদের দিকে যেমন ফেলা,অমনি হো হো হাস্য করিয়া ১০।১২ জনে মিলিয়া সেটিকে ধরিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল, মাঝে হইতে এই টানা হ্যাঁচড়ায় বেচারা খড়গাছটি দুই টুকরা হইয়া এক টুকরা একজনের হস্তগত অন্যটুকরা দরজার বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপে এই খড়টি লইয়া আমাদের মধ্যে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ গল্পগুজব চলিতে লাগিল, কেবল তাহাই নহে যে ভাগ্যবান শ্যালক মহাশয় কি জানি কোন জন্মের কোন পুণ্য-ফলে অর্দ্ধ টুকরা খড় লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অনুপস্থিত প্রিয়জনদিগকে আবার এই আনন্দরস উপভোগ করাইবার অভিপ্রায়ে সেটুক পকেটগত করিলেন।

সেই পকেটস্থিত খড় গাছটি অসংখ্য লোকের হাসি ঠাট্টায় বিখ্যাতি লাভ করিতে করিতে ভবিষ্যতে কিরূপ গতি লাভ করিবে তাহা আমি যেমন বুঝিয়াছি পাঠক মহাশয়ও তেমনি বুঝিয়াছেন—সুতরাং তাহার কথা রাখিয়া সেই বাহিরে নিক্ষিপ্ত খড়গাছটির ভবিষ্যতে যে কত অদ্ভুত ঘটনা হইবে তাহাই একবার ভাবিয়া দেখা যাক।

কাল যখন সম্মার্জ্জনী হস্তে হাই তুলিতে তুলিতে,গা মোড়া দিতে দিতে কোন একজন চাকর গৃহস্থিত ধূলি মহোদয়গণকে জঞ্জাল গাড়ীতে উঠাইবার বন্দবস্ত করিতে করিতে সেই খড় গাছটিকে দেখিবে, তখন তার মনে কতখানি আশ্চর্য্য বা নিরাশ্চর্য্যের ভাব বহিয়া যাইবে তা আমি এখন যদিও ভাবিয়াই পাইতেছিনা কিন্তু যে ভাবই হোক তাহার অবশিষ্ট ঘুমটুকু যে তাহাতে পলায়ন করিবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তারপর সেই খড়গাছটি সে সযত্নে তুলিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্ক্যাভেনজারের গাড়িতে তার অধিষ্ঠান না হয়—ততক্ষণ রাস্তার লোকদিগের (তাহারা দেখুক আর না দেখুক) চোখে পড়িবে। এইখানেই তাহার পরিণামের শেষ নহে, স্ক্যাভেনজারের গাড়ী হইতে নানা খরচপত্র সহকারে সে বেচারী খড় ধাপাস্থ হইয়া সারমাটীতে পরিণত হইলে সেই মাটী আবার কলিকাতা আসিবে—এবং কত লোকের বাগানে ফুলফলের গাছে লাগিবে। এইবার ইহার প্রধান কাজ আরম্ভ হইল। মহাশয়েরা তখন নিজেদের ঘরে সেই ফুল সাজাইবেন এবং সেই ফল খাইবেন, বিক্রয় করিবেন, পয়সা পাবেন, এবং সেই পয়সায় কত জিনিষ কিনিবেন। আবার ভাবিয়া দেখুন সেই গাছ বড় হইলে আপনারা স্বচ্ছন্দে সে গাছের কাঠ বিক্রী করিতে পারেন, এবং সেই কাঠে কত জীবনের দরকারী জিনিষ পত্র তৈয়ার হবে। রামায়ণ সাত কাণ্ড

মাত্র—কিন্তু এত কাণ্ডের যা হইতে উৎপত্তি, তাহার কতদূর প্রসিদ্ধি হওয়া উচিত তাহা পাঠক ভাবিয়া দেখুন! এর সব প্রকাণ্ড কাণ্ড মনে পড়িলে আমার কান্না পায় এবং আমার বর্ণনার অতীত বলিয়া মনে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিসমশের সেই কেকের কথাটা মনে পড়ে। সেটা কি তা জানেন? সে ব্যাপার খানা হচ্চে যে একদিন একজন লোক তার বন্ধুবান্ধবকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করে "কাল আমার বাড়ি আসিও এমন এক কেক খাওয়াব যা তৈরি কর্ত্তে হাজার লোক লেগেছে।"

সকলেই ত অবাক, কেকের গির্জ্জাই হয় বা পর্ব্বতই হয়। তার পর দিন নিমন্ত্রিত লোকেরা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া তার বাড়ী গিয়া দেখে টেবিলে অন্য নানারূপ খাবার আছে কিন্তু সে কেক এখনো আসে নাই। বেচারারা অন্যান্য খাবার অল্প অল্প স্পর্শ মাত্র করিয়া সেই কেকের জন্য লালায়িত হইয়া রহিল—আর অত বড় কেকটা যে কিরূপে দরজার ভিতর দিয়া গৃহে আসিবে তাহাই ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল। যাই হউক, এই রূপ ভাবনা চিন্তার মধ্যে অবশেষে যখন একটা সামান্য সাধারণ কেক তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত তখন তাহারা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গৃহকর্ত্তা তখন তাহাদের হিসাব দিতে বসিলেন এই কেক প্রস্তুত করিতে কতজন লোক লাগিয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ময়দা প্রস্তুত করিতে কত লোক খাটিয়াছে—তার পরে ময়দার কল করিতে কত লোক লাগিয়াছে—এই কলে যে লোহা আছে তাহা খণি হইতে উঠাইতে কত লোক লাগিয়াছে—এইরূপে ১০০০ হাজারের বেশী লোকের পরিশ্রম যে এই ক্ষুদ্র কেক খানির মধ্যে বিদ্যমান তাহা তিনি দেখাইয়া দিলেন। লোকেরা তখন নিরুপায়—তাহাই একটু একটু খাইয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহে গমন করিল।

আমার খড়ের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম; তবে তফাতের মধ্যে এই যে, সে কেকের বৃত্তান্তটা এমনি চমৎকার রূপে বর্ণনা করা ছিল যে যখনই গল্পটি পড়িতাম, তখনই কেকটি আমার খাইতে ইচ্ছা করিত কিন্তু আশা করি যে আমার খড়গাছটী খাইবার জন্য কাহারও লোভ পড়ে নাই।

সে কালের ইংরাজ-স্ত্রী।

পুরুষ যতই বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও আইন জারি করিয়া স্ত্রীলোককে আপনার অধীনে রাখিবার চেষ্টা করুক না, স্ত্রীলোক স্বীয় স্বাভাবিক মোহিনী শক্তির প্রভাবে এক-এক সময়ে সেই সকল নিয়ম বাধা অতিক্রম করিয়া উল্টা পুরুষকে আপনার দাস করিয়া তুলে। সহস্র মনুর কঠোর নিয়ম ও ব্যবস্থা অপেক্ষা মানব-প্রকৃতি দুর্দমনীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেকালে ইংরাজি-আইন বলিত যে সর্ব্বাংশে ও সকল অবস্থাতে স্ত্রী স্বামীর অধীন—দাসী—গোলাম; কিন্তু কাজে কখন কখন দেখা যাইত, স্বামী স্ত্রীর খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায়—তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সহায় মাত্র। স্ত্রীকে শাসনে রাখিবার জন্য ইংরাজি আইন পুরুষের হস্তে শাসন-দণ্ড ন্যস্ত করিয়াছিল কিন্তু হরিণ-নয়নের বিজুলি-ছটা ও বিম্বাধরের মুচকি হাসির এমনি মোহিনী শক্তি, যে তাহার বলে কখন কখন সেই দণ্ড পুরুষের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত—এবং পুরুষ স্ত্রীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু সকল স্থলে যে এইরূপ হইত তাহা বলা যায় না—অনেক স্থলে স্বামীরা স্ত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিত—পাশব বলের নিকট মোহিনী শক্তি পরাভূত হইত। সেকালের অর্থাৎ জাইগিরদারি (Feudal) আমলের ইংরাজি আইন-কানুন স্ত্রীজাতির উন্নতি-পক্ষে প্রতিকূল। তাই সেকালের ইংরাজ-স্ত্রী একালের ইংরাজ-স্ত্রীর অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট ছিল। সেকালে স্ত্রী-প্রহার কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর ইংরাজদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও ইতর ইংরাজদিগের মধ্যে যদিও স্ত্রী-প্রহার কতকাংশে প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু ভদ্র ইংরাজদিগের মধ্যে উহা অতি বিরল। পূর্ব্বে কষাঘাতে যে কাজ নির্ব্বাহ হইত এখন তীক্ষ্ণ মর্ম্মাঘাতী বাক্যবাণে সে কাজ সম্পন্ন হয়। এই উভয় প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট তাহাতে রুচিভেদ ও মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশব বলের তেজ ও গরিমা ক্রমশই যে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সেকালের ইংরাজি লৌকিক প্রবাদ ও প্রবচনে স্ত্রীজাতির কতকগুলি নিন্দা প্রকীর্ত্তিত দেখা যায়। স্ত্রীজাতি স্বভাবত মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, একগুঁয়ে এবং ক্রোধান্ধ এইরূপ সেকালের লোকদিগের বিশ্বাস ছিল। সেকালের স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি সত্যই যদি এইরূপ হীন হয়, তাহা হইলে সেও কাহার দোষে? পুরুষদিগের অত্যাচারই এই হীনতার কারণ সন্দেহ নাই। যে সকল দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা দাসত্বের সহচর ও অত্যাচারের অব্যবহিত ফল। দুর্ব্বলেরা প্রপীড়িত হইলে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই ধূর্ত্ততা প্রবঞ্চনা প্রতারণার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ইহা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। শুদ্ধ যে ইংরাজি প্রবচনে স্ত্রীজাতির এই সকল হীন-গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে—সেকালের প্রসিদ্ধ লেখকেরাও উহা কীর্ত্তন করেন। সেকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চিকিৎসক Lævinus Lemnius স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ক্রোধান্ধতা সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:—"প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনায় সচরাচর দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরা প্রচণ্ড রিপুর দাস—কোন কারণ না থাকিলেও তাহারা নিষ্ঠুর ও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে; বিদ্যুৎবজ্র যেরূপ মেঘ ও আকাশের মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায় তাহাদের ক্রোধের প্রকৃতিও কতকটা সেইরূপ ... ... যেহেতু

স্ত্রীলোকের মন পুরুষের ন্যায় ততটা সবল নহে এবং তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাও ততটা নাই, এইজন্য তাহারা সামান্য কারণেই বুদ্ধির লাগাম ছাড়িয়া দেয় এবং পাগ্‌লা কুকুরের ন্যায় অনির্ব্বিশেষে যাকে তাকে আক্রমণ করে। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর ইহার স্বাভাবিক কারণ কি, তাহা হইলে আমি বলি, স্ত্রীলোকের মাংস শিথিল কোমল ও সুকুমার এবং তাহাদের হৃদয়-দেশটা সহসা জ্বলিয়া উঠে। লঘু শুষ্ক তৃণে যেরূপ সহজে শীঘ্র আগুণ ধরে ও দপদপ করিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠে কিন্তু শীঘ্রই পুড়িয়া শেষ হইয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীলোক শীঘ্রই রাগিয়া আগুণ হইয়া উঠে ও জ্বলিতে থাকে, কিন্তু এই ক্রোধাগ্নি আবার শীঘ্রই অশ্রুবারিতে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। নীচ কুলের স্ত্রীলোকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে কিন্তু ভদ্র স্ত্রীলোকেরা ক্রোধান্ধ হইলেও বাহিরের আব্রু রক্ষা করে—তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ নীচু করিয়া থাকে, স্বামীর কথায় উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া যোগ্য মনে করে না"।

এইরূপ মেজাজ বিগড়াইবার কারণও বোধ হয় কতকটা পুরুষের অত্যাচার। আমরা দেখিতে পাই ছেলেদিগকে পিতা মাতারা যখন এক-এক সময়ে অনিয়মিত আস্কারা দেন ও অকারণ প্রহার করেন তখন সেই সকল ছেলে বিগড়াইয়া যায়—মানব প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। অর্থাৎ আপনার খেয়াল অনুসারে প্রভু যদি দাসের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করেন (অকারণে রুষ্ট ও অকারণে তুষ্ট হন) তাহা হইলে সেই দাসবৎ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে কখনই তাহার চরিত্র প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। স্ত্রী যত দিন স্বামীর কশাঘাতের শাসনে থাকে ততদিন কখনই সে স্বামীর সখী ও সঙ্গিনীর পদবাচ্য হইতে পারে না। স্ত্রী স্বীয় মানসিক সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া—জ্ঞান ধর্ম্ম ও বিবিধ চিত্ত-রঞ্জনী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া স্বামীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা একালের নব্য ভাব। এখনকার সুশিক্ষিতা ইংরাজ-স্ত্রী বাস্তবিকই স্বামীর সখী ও সঙ্গিনী, সেকালের স্ত্রী স্বামীর কিঙ্করী ও দাসী ছিল।

একালের স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী বটে কিন্তু তাহার মাত্রা আছে—স্বামী কোন প্রকার অন্যায় আদেশ করিলে স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু সেকালের ইংরাজ-স্ত্রীর প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না—অন্যায় হউক, অধর্ম্ম হউক, স্বামীর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আমাদিগের দেশের এইরূপ আদর্শ-স্ত্রী সীতা। শকুন্তলা কিম্বা দ্রৌপদী পতিপ্রাণা হইলেও তাহাদের নিজত্ব ছিল—তাহাদের একটু তেজস্বিতা ছিল। কিন্তু সীতা অপেক্ষাও নিজত্ব-বিস্মৃতা, সহিষ্ণু, পতি-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী স্ত্রীর একটি দৃষ্টান্ত সেকালের য়ুরোপীয় উপন্যাস ও উপকথায় দেখিতে পাওয়া যায়—ঐরূপ পত্নী সেকালের য়ুরোপ ও ইংলণ্ডে আদর্শ-পত্নী বলিয়া পরিগণিত হইত।

বোকাচিওর একটি প্রধান প্রচলিত উপন্যাস যাহা হইতে Chaucer সংগ্রহ করিয়া

তাঁহার "Canterbury tales"-মধ্যে "Oxford clerk's story" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং যাহা সেকালের পাশ্চাত্য য়ুরোপে নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছিল সেই গল্পের স্থূল ঘটনাগুলি নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

সালুজ্জোর (saluzzo) যুবা মার্কুইস্ গ্রিসেল্ডা নাম্নী একটি সুন্দরী দরিদ্র কন্যার উপর আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার নির্ব্বাচন অসঙ্গত বা অযোগ্য হয় নাই—সুপত্নীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাঁহাতে আছে। তিনি সুপ্রসন্না, বুদ্ধিমতী, রসিকা, লোকরঞ্জনে আগ্রহান্বিতা, দানরতা, ধর্ম্মিষ্ঠা এবং স্বামীর নিতান্তই আজ্ঞাবহা। কালক্রমে তাঁহাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। মার্কুইস সালুজ্জো স্বীয় পত্নী গ্রিসেলডার পতি-ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কোলের শিশু তাঁহার নিকট হইতে ছিনিয়া লইয়া গ্রিসেলডার অজ্ঞাতে শিক্ষার জন্য বলগনা নগরে পাঠাইয়া ছিলেন। গ্রিসেলডা মনে করিলেন তাঁহার স্বামী কন্যাটিকে বধ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। রাজার আদেশ পালন করিবার জন্য যখন রাজ-অনুচর রাণী-গ্রেসিলডার সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তিনি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া বিনীত ভাবে ও সজল নয়নে এই কথা শুদ্ধ বলিলেন "ইহাকে লইয়া যাও, তোমার ও আমার প্রভু যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা পালন কর; আর তোমার নিকট আমার এই মাত্র মিনতি যে পশু পক্ষী যেন ইহাকে কবলিত না করে—তবে যদি রাজার আজ্ঞা তাহাই হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। আর দেখিও, যদি মারা পড়ে তবে যেন ভাল করিয়া গোর দেওয়া হয়।" তাঁহার স্বামী তাহার নিকট যখন আসিলেন তখন তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, যদিও তখন তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার স্বামীই তাঁহার কন্যার হত্যাকারী। পরে আবার তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল—তাহাকেও রাজা বোলগ্না নগরে পাঠাইয়া দিলেন—আর তাঁহার পত্নীর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন যে তিনি তাহাকেও বধ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। রাজার নিকট যখন শুনিলেন যে কন্যাটির ন্যায় পুত্রটিকেও বধ করা হইবে তখন সেই আদর্শ-পত্নী উত্তর করিলেন "নাথ, প্রভু, তোমার যাহাতে সুখ হয় তাহারই চিন্তা কর, আমার জন্য তিলার্দ্ধ ভাবিও না; কারণ তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাতেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন আমার অন্য সুখ নাই"। ইহাতেও যখন গ্রিসেলডার পতিভক্তির হ্রাস হইল না, তখন রাজা বলিলেন, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ উচ্চবংশের উপযুক্ত আর একটি মহিলাকে আমি বিবাহ করিব এবং এই অভিপ্রায়ে পোপের নিকট হইতে ব্যবস্থা-পত্রও আনাইয়াছি। তুমি পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া যাও। এবং বিদ্রূপ করিয়া আরও এই কথা বলিলেন "তুমি তোমার পিতৃ-গৃহ হইতে যে ধন-রত্ন আনিয়াছিলে তাহাও তোমার সঙ্গে লইয়া যাও"।

চির বিশ্বাস যে আমার ন্যায় দরিদ্র দাসী তোমার উচ্চ কুল ও পদের যোগ্য নহে। কারণ আমি যাহা হইয়াছি তাহার জন্য বিধাতার নিকট এবং তোমার নিকটই আমি ঋণী; তুমি কৃপা করিয়া আমাকে যাহা ধার দিয়াছিলে তুমি এখন ফিরিয়া লইতে চাহিতেছ—আমি স্বচ্ছন্দ মনে উহা ফিরাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার অঙ্গুলী হইতে বৈবাহিক অঙ্গুরীয়ক এবং তাঁহার পরিহিত সমস্ত পরিচ্ছদাদি খুলিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। কেবল লজ্জারক্ষা করিবার বসনটি মাত্র রহিল—ঐ বসনটি তিনি রাজার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইলেন। এই অবস্থায় রাজা তাঁহাকে নিজ বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রত্যাখ্যাত ও দূরীভূত হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর প্রতি গ্রিসেলডার প্রীতি ও ভক্তি অটল রহিল। রাজার দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল কিন্তু এই সকল আয়োজন কে করে? রাজা গ্রিসেলডাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; সামান্য দাসীর ন্যায় গ্রিসেলডাকে তাঁহার আগন্তুক সপত্নীর জন্য ঘরকন্না গুছাইতে হইবে, তাহার পরিচর্য্যা করিতে হইবে—এইরূপ রাজাজ্ঞা তাহার নিকট প্রেরিত হইল! রাজা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার নব বিবাহিতা ভার্য্যাকে গৃহে আনিবার জন্য আমি যাইতেছি এবং গৃহ-প্রবেশের সময় তাহাকে যথোচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহি; তুমি তো জান আমার এখানে এমন কোন স্ত্রীলোক নাই যে ঘরকন্না গুছাইতে পারে, কিম্বা তাহার অভ্যর্থনার জন্য আবশ্যকীয় আয়োজন করিতে পারে। আমার গৃহাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুমি যত জানো এমন আর কেহই জানে না—অতএব কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না হইবে তাহা তোমার উপর ভার। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে তোমার পিতৃগৃহে আবার ফিরিয়া যাইও!" গ্রিসেলডা উত্তর করিলেন "নাথ তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমি প্রস্তুত আছি!" এইরূপে তিনি দাসীপদ গ্রহণ করিয়া সমস্ত আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং দাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কর্ত্তব্যপরতা ও সহৃদয়তার সহিত নববধূকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা রূঢ়ভাবে নিজ পরিত্যক্তা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নব বধূকে কেমন লাগিল?" গ্রিসেলডা উত্তর করিলেন—"নাথ আমার খুব ভাল লাগিল; যেমন দেখিতে সুন্দরী তেমনি যদি বুদ্ধি বিবেচনা থাকে তাহা হইলে উহাকে লইয়া তুমি যার পর নাই সুখী হইতে পারিবে; কিন্তু আমার এই মাত্র মিনতি, তোমার পূর্ব্ব পত্নীর প্রতি যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলে ইহাঁর প্রতি যেন সেরূপ ব্যবহার না করা হয়। কারণ ইনি অল্প বয়স্কা ও যত্নে লালিত পালিত ইনি কখনই উহা সহ্য করিতে পারিবেন না—আমি শিশুকাল হইতে কষ্টে অভ্যস্ত, আমার সকলই সয়।" তখন রাজা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "যে কুমারীকে দেখিতেছ ইনি আমারই কন্যা—আমি উহাকে শিক্ষার জন্য বলগনার পাঠাইয়াছিলাম—তুমি মনে করিয়াছিলে আমি উহাকে বধ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে যেরূপ আমার

প্রিয় পত্নী ছিলে এখনও সেইরূপ আছ—তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও তোমার শিক্ষার জন্যই আমি তোমাকে এই কষ্ট দিয়াছি।"

এলিজেবেথের আমলে ইংলণ্ড-সমাজে সতী স্ত্রীর আদর্শ কিরূপ ছিল তাহা ইমজেন ডেসডেমনা প্রভৃতি নারী-চরিত্র বর্ণনায় জানিতে পারা যায়। Shakespear এর "Taming of the Shrew"র এক স্থলে আছে।

পতি তব প্রাণনাথ, জীবন, রক্ষক,
হর্ত্তা-কর্ত্তা, অধিপতি, করেন তোমাকে
যতন পালন; জলে স্থলে তোমা লাগি
করিছেন দেহক্ষয় কত কষ্ট করি—
ঝঞ্ঝাবাতে জাগি রাত্রি, শীতে দিন যাপি।
তুমি শুয়ে আছ ঘরে সুখে নিরাপদে!
তোমা কাছে আর কিছু নাহিক প্রার্থনা—
চাহে শুধু প্রেম, রূপ, কথার বাধ্যতা,
—অল্প মাত্র প্রতিদান সে মহা ঋণের।
প্রজার কর্ত্তব্য যথা রাজার নিকটে,
পত্নীর কর্ত্তব্য তথা পতির সমীপে;
খুঁৎখুঁতে, ঝগড়াটে, তোলো-পারা মুখ,
কথার অবাধ্য পত্নী সেইতো বিদ্রোহী—
আপন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী।
স্ত্রীলোক নির্ব্বোধ হেন (কি লজ্জার কথা)
কোথায় পাতিবে জানু শান্তি-ভিক্ষা তরে
না সে আরও যায় তেড়ে যুদ্ধের লাগিয়া!
কোথায় করিবে সেবা শুশ্রূষা মমতা—
না সে চাহে করিবারে প্রভুত্ব শাসন!
আমাদের দেহ কেন দুর্ব্বল কোমল?
—কঠোর খাটুনী তরে নহে উপযোগী?
নাহি অন্য হেতু তার—কোমল হৃদয়
চাহে নিজ উপযোগী সুকুমার দেহ।

সপ্ত দশ শতাব্দিতে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকের যে আদর্শ জনসমাজে প্রচলিত ছিল, মিল্টন তাঁহার ইবের মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

জনিতা বিধাতা মোর, তোমার আদেশ
পালি অবিচারে ইহা ঈশ্বরের বিধি,

ভগবান বিধি তব, তুমি বিধি মোর ;
নারীর ইহাই সুখ, পরম গৌরব।

কিন্তু মিল্টন স্ত্রীলোকের জড়বৎ অধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না—স্ত্রী পুরুষের সঙ্গিনী ও সখী এই আধুনিক ভাবের আভাষ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আদমকে ইব বলিতেছেন ঃ—

তুমি কি করনি মোরে তব প্রতিনিধি ?
—এই সব নীচ প্রাণী আমার অধীন ?
অসমানে অসমানে হয় কভু মিল ?
—সমাজ বন্ধন ?—কিম্বা বাস্তবিক সুখ ?
পরস্পরে সমতুল আদান প্রদান
নহিলে হয় না সুখ। একজন অতিমাত্র
অপরের অল্প দান—নাহি হয় মিল ;
—নীরস হইয়া উঠে অল্প কাল মাঝে।
সেই সঙ্গ চাহি আমি, তারি কথা কহি
যাহাতে জ্ঞানের সুখ হয় ভাগাভাগি।

John Stewart Mill ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক বলিতে পারেন ?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাষ্টের আবিষ্কৃত চিকিৎসা।

(নাইন্‌টিন্‌থ্ সেনচুরি হইতে গৃহীত)

পাষ্টে ফরাসীদেশীয় একজন রাসায়নিক-পণ্ডিত, ইহাঁর নাম ভারতীর পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহে। গতবৎসর ভারতীতে ইহাঁর হাইড্রোফোবিয়া চিকিৎসার বিষয় তাঁহারা পড়িয়াছেন। ইহাঁর চিকিৎসার মূল মন্ত্র বিষে বিষক্ষয়। কেবল হাইড্রোফোবিয়া নহে এই উপায়ে তিনি নানাপ্রকার রোগ আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কিন্তু ঘটনাবশতঃ সত্য মিথ্যা হয় মিথ্যা সত্যের রূপ ধারণ করে। পাষ্টের চিকিৎসার উপকারিতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইলেও, শত শত লোকে তাহা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেও এখন পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসার উপকারিতায় ইউরোপের সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে নাই। ইহার প্রধান কারণ লর্ড ডনেরিলের গত

বৎসর হাইড্রোফোবিয়ার মৃত্যু *। এই কারণে পাষ্টের প্রাণপণ পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি সাধারণের নিকট হইতে ভক্তির পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা এবং ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে গালাগালি লাভ করিতেছেন। কেহ বলেন পাষ্টে হৃদয় শূন্য হন্তারক, কেহ বলেন ধন পিপাসু প্রতারক। কেহ বলেন প্রতারক না হইলেও তাঁহার যথার্থ চিকিৎসার উপায় তিনি অর্থ লাভ জন্য গোপন রাখিয়াছেন। এ কথার উত্তর এই যে পাষ্টে যদি যথার্থ উপায় গোপন রাখিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দোকানদারী করিতেন তবে এতদিনে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি জীবনের প্রথম ভাগে যে অবস্থায় ছিলেন এখন শেষভাগেও তাহাই আছেন। এখনও তিনি স্কুলে রসায়নের একজন প্রফেসর মাত্র, সামান্য প্রফেসরের বেতনই তাঁহার সম্পত্তি। তাঁহার আবিষ্কৃত উপায়ে যখন লোকদিগকে চিকিৎসা করা হয় সে সময় তিনি সেস্থানে উপস্থিতও থাকেন না তাহার জন্য অর্থ গ্রহণও করেন না। বিশেষ ডাক্তার উপাধি না থাকায় ইহাতে তিনি আইন মতে অধিকারীও নহেন। পাষ্টে বলেন বিজ্ঞানের জন্য আমি যথেষ্ট কাজ করিতে পারি কিন্তু টাকার জন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারি না। ইকোল নর্ম্মাল নামক স্কুলে তাঁহার নিজ গৃহে থাকিয়া তিনি ক্রমাগত রাসায়নিক চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রথম এই কলেজের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তখন এই কলেজে কোন ল্যাবরেটরি ছিল না নিজের উৎসাহে নিজ ব্যয়ে তিনি কলেজের একটী ক্ষুদ্র গৃহে একটী ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। এই সামান্য ল্যাবরেটরিতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের পথ মুক্ত হয়, এই খানেই তাঁহার প্রথম দুই একটি পরীক্ষা সুসিদ্ধ হয়। এখন তিনি যে কেবল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটেরির কর্ত্তা তাহাই নহে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর একটী

---

* এ সম্বন্ধে পাষ্টে ব্রিটিস মেডিকেল জর্ণেলে এইরূপ পত্র লেখেন; লর্ড ডনেরিলের চিকিৎসার সময় আমি পারিসে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু এ চিকিৎসায় তাঁহার উপকার হয় নাই বলিয়া চিকিৎসার প্রণালীটাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে না। * * লর্ড ডনেরিল দংশনের ১১ দিন পরে চিকিৎসা আরম্ভ করেন এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীর বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। এরূপ চিকিৎসায় বাস্তবিক উপকার আছে কি না এই ভাবিতেই তাঁহার প্রথম ১২ দিন কাটিয়া যায়। তাহা ভিন্ন যখন চিকিৎসা আরম্ভ হইল তখনও বিশেষ প্রণালী অনুসারে তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে দেওয়া হয় নাই। এতদ্ সত্ত্বেও ৪। ৫ মাস যে তিনি জীবিত ছিলেন ৪। ৫ মাস পর্য্যন্ত সে বিষের শক্তি বাড়িতে পারে নাই ইহাই যথেষ্ট।”

(এখানে বলিয়া রাখি সাধারণ ও বিশেষ দুই উপায়ে পাষ্টে হাইড্রোফোবিয়ার চিকিৎসা করেন। যাহাদের হাইড্রোফোবিয়া হইবার অধিক সম্ভাবনা তাহাদের বিশেষ প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু লেডী ডনেরিল কোন মতেই লর্ড ডনেরিলকে সে উপায়ে চিকিৎসা করিতে দেন নাই।

যে ল্যাবরেটরি নির্ম্মাণ হইতেছে তাহারও তিনি ভাবী কর্ত্তা। তিনি সাধারণের যে মহা উপকার করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সাধারণের ও ফ্রান্সের রাজকোষের সাহায্যে প্যারিশে এই ল্যাবরেটরি প্রস্তুত হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য টাকা জমী বাড়ী প্রভৃতি যাহা আবশ্যক রাজকোষ হইতে সে সকলই তিনি পাইয়াছেন। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং রুসিয়া অষ্ট্রিয়া স্পেন ইটালী রিও-জেনেরিও ইত্যাদি স্থানেও এই ল্যাবরেটরির অনেকগুলি শাখা ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের মর্ম্মগত সংস্কার যে রোগ একটা দুর্ভাগ্য বিশেষ মৃত্যু একটী সমস্যা। আয়ু ফুরাইলে মরণ হইবে যমের হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। কিন্তু পাষ্টের ল্যাবরেটরি দেখিলে দেখা যায় যমও বিজ্ঞানের হস্তগত। এখানে সমুদয় রোগের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করা হইতেছে। এক একটী ক্ষুদ্র স্থানে মৃত্যু উৎপাদনকারী শত শত আকারের জীবন্ত বিষাক্ত কীটাণু-যম রহিয়াছে, একজন মানুষ তাহার পরিচালক, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের মারিতে পারেন বাঁচাইতে পারেন, তাহাদের বিষশক্তি হ্রাস করিতে পারেন, বৃদ্ধি করিতে পারেন, একবারে বিষক্ষয় করিতে পারেন আবার তাহা উৎপাদন করিতে পারেন।

স্বাভাবিক মৃত্যু অপেক্ষা রোগ দ্বারা অকাল মৃত্যুর সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু রোগের মূল কি? অনেক কাল ধরিয়া অনেক পরিশ্রমের পর পাষ্টে চক্ষুর অগোচর বায়বীয় জগতে রোগের মূল পাইয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের যত রোগ হয় তাহা বাহির হইতে আইসে। বায়ু মধ্যস্থ বিষাক্ত কীটাণু তাহাদের বিষসঞ্চারক শক্তি দ্বারা আমাদের শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া আমাদের পীড়িত ও বিনষ্ট করে। পাষ্টে চক্ষুর অগোচর জগতের এই ভয়ানক শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তাহার দ্বারা তিনি মানুষের প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন আবার রোগের প্রবেশ দুঃসাধ্য করিতেও পারেন। যখন কোন জিনিস যেমন চিনি মিশ্রিত জল পচিয়া যায় তাহাতে কীটাণু দেখা যায় লোকের আগে বিশ্বাস ছিল এই কীটাণু (কোন বীজ ব্যতিরেকে) আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পাষ্টের অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে বাস্তবিক তাহা নহে। কোন স্থানে কীটাণু জন্মাইতে হইলে তাহার বীজ থাকার আবশ্যক। বীজ না থাকিলে কীটাণু জন্মে না। বিজ্ঞানের এমন অনেক ব্যাপার যে সকল আগে বোঝা যাইত না এই আবিষ্কার দ্বারা এখন তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বটি বিজ্ঞানের এত উন্নতিকারী এবং মানবের এত উপকারী যে জীবতত্ত্ব দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও ছাত্রগণ পাষ্টের নিকট আসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁরা পরস্পরের আবিষ্কৃত বিষয়ের সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া পরস্পরের সহায়তা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশলাভ করিতেছেন।

প্যাষ্টের ল্যাবরেটরিতে কোনস্থানে অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গ নীরবে এক মনে তীক্ষ্ণ-শক্তি-অনুবীক্ষণের দ্বারা নানা প্রকার বিষাক্ত কীটাণু নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং তাহাদের কার্য্য প্রণালীর জ্ঞানলাভ করিতেছেন। কেহ বা মৃত মানুষ পরীক্ষা করিয়া তাহার রোগের মূল সিদ্ধান্ত করিতেছেন কেহ বা মৃত জন্তুর শরীর হইতে রোগের বিষাক্ত বীজ লইয়া বীজপুষ্টকারী উপযুক্ত তরল পদার্থপূর্ণ কাচের নলে তাহা আবদ্ধ করিতেছেন। ঘরের চারিদিকে আলমারি সেল্‌ফ ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহাতে মানুষের এবং জন্তুর উভয়ের যক্ষ্মা গ্ল্যানডার বিসূচিকা ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের বীজ রহিয়াছে। তাহাদের উপযুক্ত পোষণকারী দ্রব্যে এবং উত্তাপে তাহারা পুষ্টিলাভ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বীজ ভিন্ন ভিন্ন কাচের নলে আবদ্ধ। নলের মুখ তুলা দ্বারা আবদ্ধ। তাহাতে বাহিরের পরিষ্কার বাতাস ভিন্ন অন্য কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ভিতরের কীটাণুও বাহির হইতে পারে না।

এখন আমরা পাষ্টের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আরম্ভ করিব। বসন্তের বীজ দ্বারা বসন্ত উৎপন্ন করিয়া বসন্ত হইতে মৃত্যু ভয় যায় তাহা সকলেই জানেন। বসন্তের ন্যায় অন্যান্য রোগেও টীকা দিয়া তাহার অপকারিতা দূর করাই পাষ্টের চিকিৎসা পদ্ধতি! কি উপায়ে তিনি এই টীকা প্রস্তুত করেন ও তাহার কি ফল হয় এখন তাহাই দেখা যাউক।

এক সময়ে ফ্রান্সের মুর্গী হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীদের মধ্যে এক-প্রকার ভয়ানক মারক উপস্থিত হয়। মুর্গী হাঁস ভিন্ন অন্য জন্তুকে এ রোগে ধরিতে আগে দেখা যায় নাই, কিন্তু এই রোগে মৃত কতকগুলি মুর্গীর শূন্য খাঁচায় খরগোস রাখায় তাহারাও মরিয়া যায়, তাহা হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল খরগোসেরও এই রোগ হয় বরং মুর্গী অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিক সংক্রামক। ঘোড়া কুকুর ভেড়ার মানুষের এ রোগ হয় না। প্রথমে মুর্গী বা খরগোসের শরীর ভিন্ন এই রোগের বীজ পোষণ উপযোগী অন্য পদার্থ ঠিক করিতে না পারায় পরীক্ষার বড় অসুবিধা ছিল। পরে দেখা গেল মুর্গী বা খরগোসের মাংস সিদ্ধ করিলে যে কষ প্রস্তুত হয় তাহাতেও তাহারা পুষ্টিলাভ করিতে পারে। তখন পরীক্ষা করা সহজ হইল। এই রোগে মৃত একটী খরগোসের এক কণা রক্ত লইয়া যদি রোগশূন্য মুর্গীদেহের পরিষ্কার কষপূর্ণ একটী কাচের নলে রাখ তবে দেখিবে কয়েক ঘন্টা পরেই শত শত কীটাণুতে নলটী পূর্ণ হইতে থাকিবে এবং সেই জন্য পরিষ্কারের পরিবর্ত্তে কষের রং ঘোলা দেখাইবে। সেই মৃত খরগোসের একবিন্দু রক্ত অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে দেখা যায় রক্তকণার মধ্যে মধ্যে কাল কাল ক্ষুদ্র কীটাণু রহিয়াছে। ইহাই এ রোগের মূল। এ রোগের নাম মোরগ বিসূচিকা। এক নলে ইহারা বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারে না। মুর্গীর কষে তাহাদের পোষণ উপযুক্ত যে পদার্থটুকু আছে তাহা ফুরাইয়া গেলে মরিয়া তলায়

পড়িয়া থাকে। যদি ২৪শ ঘণ্টার মধ্যে এ নল হইতে আবার আর একটী নলে বীজ লইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাদের বিষের শক্তি ইহাদের সমান সতেজ থাকিবে। এইরূপে ২৪শ ঘণ্টার অধিক এক নলে না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে অগণ্য নলে লইয়া গেলেও তাহাদের বিষ শক্তি হ্রাস হয় না। কিন্তু তাহার বেশী যত সময় তাহারা বাতাসে শুখাইবে তাহাদের বিষের শক্তির হ্রাস হইয়া আসিবে! মৃত জন্তুর শরীরে ইহারা অনেক বৎসর বাঁচে ও বিষের ক্ষমতা পূর্ণ পরিমাণে থাকে কিন্তু ৫১০ডিগ্রী উপরের উত্তাপে ইহারা বাঁচিতে পারে না। পরীক্ষার দ্বারা এই ফল লাভ হইলে পাষ্টের মনে আশা হইল যে অবশিষ্ট মুর্গী যা আছে তাহা বাঁচাইতে পারিবেন। তখন তিনি ক্রমাগত নল পরিবর্ত্তন করিয়া এবং প্রত্যেক বারে ২৪ শ ঘণ্টার অধিক সময় ধরিয়া তাহাদিগকে বাতাসে শুষ্ক করিয়া ক্রমে তাহাদের বিষ হ্রাস করিয়া সেই স্বল্প বিষাক্ত বীজ ফ্রান্সের সমুদয় মুর্গীখানায় প্রেরণ করাইলেন। ইহার টীকায় মুর্গীগণ অল্প অসুস্থ হইয়া তাহার পর রোগমুক্ত হইল।

এতক্ষণ মুর্গীদের রোগের কথা বলিলাম এবার মুর্গীর যে রোগ হয় না তাহার কথায় আসিব।

বাসিলস নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বা আকারের কীট আছে ইহাদের শরীর স্বচ্ছ উজ্জ্বল এবং ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। অবস্থা বিশেষে এই লম্বা সুতার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বীজ জন্মায়, তাহাকে ইংরাজীতে স্পোর বলে এই স্পোরের কার্য্যশক্তি ও বিষ আশ্চর্য্য রকম অধিক। ইহারা ঘাসে থাকে এবং সাধারণতঃ ঘাসের মধ্যে ইহাদের যে বিষ থাকে তাহার দ্বারা জন্তুদের একরকম রোগ হয়, এ রোগ বড় ভয়ানক, ইহাতে বাঁচিবার আশা নাই। ইহা ছোঁয়াচে, জন্তু হইতে মানুষেরও এ রোগ হয়। ইহার ইংরাজী নাম Malignant Pustule। এ রোগে প্রথম কোন জায়গায় একটু পোকার কামড়ের ন্যায় লাল হয় ক্রমে একদিন দেড়দিনের মধ্যেই ইহা ফুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও পরে ইহা হইতে তাহার মৃত্যু হয়। এই রোগে মৃত্যুর লক্ষণ বিষ পানের মৃত্যুর ন্যায়।

অন্যান্য পোকার ন্যায় ইহারা উত্তাপে মরে না কিন্তু টিণ্ডেল ইহাদের বিনষ্ট করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, ক্রমাগত এক লাগাড় উত্তাপ না দিয়া খানিকক্ষণ বাদ বাদ উত্তাপ দিলে ক্রমে ইহাদের কার্য্যশক্তি হ্রাস হইয়া ইহারা বিনষ্ট হয়। এ পোকারা বাতাসে থাকিতে পারে এবং পরে বাতাস হইতে যাহা ধরে তাহাতেই পুষ্টতা লাভ করিতে পারে। যদি কোন জন্তুর শবের সঙ্গে ইহাকে মাটীতে পোঁতা যায় তবে মাটীস্থ পোকার শরীরে বিষ প্রকাশ করাইয়া পুনরায় উপরে আসে এবং ঘাস বিষাক্ত করিয়া জন্তুদের প্রাণ নাশ করে। পাষ্টে তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায়

এমন কয়েকটী বাসিলস তিনি উপযুক্ত দ্রব্যে পোষণ করিয়া দেখেন ৪২০।৪৩০ ডিগ্রী উষ্ণতায় ইহারা বাঁচিতে পারে কিন্তু তাহার কম উষ্ণতায় স্পোর হয় না। এই স্পোরেরই বিষশক্তি অধিক, কীটের বিষশক্তি কম। তিনি এই স্পোর হীন কীটের বীজে টীকা দিয়া জন্তু ও মানুষকে এ রোগ হইতে মুক্তি দান করেন। তাঁহার এই আবিষ্কারটী প্রকাশ হইলে ফ্রান্সের চারিদিকের লোকেরা টীকা দেওয়াইবার জন্য স্ব স্ব জন্তু আনিয়া পাষ্টের নিকট উপস্থিত করিল। প্রথম বৎসর ৩৩৫৫০, ২য় বৎসর ৩৯৯১০২ ও তৃয় বৎসর ৫০০০০০ জন্তুকে পাষ্টে টীকা দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুর্গীর এ রোগ হয় না। পাষ্টে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহার কারণ মুর্গীর শরীরের উত্তাপ এত অধিক যে এই কীটাণু তাহাতে বাঁচিতে পারে না। পরীক্ষার জন্য তিনি একটা মুর্গীর পা জলে রাখিয়া উত্তাপ কমাইয়া তখন তাহাতে কীটানু দিয়া দেখিলেন মুর্গীটা রোগাক্রান্ত হইয়া মর মর হইল, কীটাণু বাঁচিয়া রহিল। তখন তিনি সেই মুর্গীকে লইয়া কম্বল প্রভৃতি দিয়া গরম করাতে মুর্গী পুনরায় বাঁচিয়া উঠিল কিন্তু পোকা মরিয়া গেল। ইহার বীজ অত্যন্ত সাবধানে ও মনোযোগের সহিত প্রস্তুত করিতে হয়। এক মিনিটের অমনোযোগে সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। বাহির হইতে অন্য দ্রব্য না মিলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। আমাদের শরীরে শত শত ভিন্ন ভিন্ন কীটানু রহিয়াছে তাহারা দেখিতে এত কাছাকাছি যে কোনটা বিষাক্ত কোনটা নয়, ইহা বোঝা সহজ নহে সেই জন্য টীকার বীজ প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন।

এইরূপে অনেক রোগের টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু হাইড্রোফোবিয়ার টীকাই পাষ্টের নামের সহিত অধিক জড়িত। ইহার বিষয় গত কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকৃত সুযোগ্য লেখক কর্তৃক যথাযোগ্য রূপে বর্ণীত হইয়াছে সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

তবে এ সম্বন্ধে এই টুকু বলিতে পারি গত বৎসর (১৮৮৭) ফ্রান্সের পুলিস রিপোর্টে দেখা যায়, যত লোক কুকুর দ্বারা দংশিত হয় তাহার মধ্যে ৩০৬ জন পাষ্টের টীকা গ্রহণ করে। এই টীকাধারীদের দুই জন মাত্র মরে। কিন্তু এ দুই জন এমন মাতাল যে, যে সকল নিয়ম পালন করা দরকার তাহারা তাহা করে নাই, করিলে মরিত কি না বলা যায় না। বাকী ৪২জন কুকুর দংশিত লোক যাহারা টীকা গ্রহণ করে নাই তাহাদের মধ্যে ৭ জন মরে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে টীকা দেওয়া লোক অপেক্ষা বিনা-টীকা দেওয়া লোকের মৃত্যু সংখ্যা অনুপাতে ৩০ গুণ অধিক।

নানা রোগের উক্ত রূপ টীকা ঔষধি বাহির করা ভিন্ন পাষ্টের এই নূতন আবিষ্কারের দ্বারা আরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইউরোপে বিয়ার মদ অত্যন্ত চলিত কিন্তু পূর্ব্বে যে বিয়ার প্রস্তুত হইত তাহা অত্যন্ত খারাব এবং রোগের আকর ছিল। বিয়ার

প্রস্তুত করিতে হইলে ইয়াষ্ট (yeast) নামক এক প্রকার জীবন্ত পদার্থ বা কীটাণু আবশ্যক। বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন মদ প্রস্তুত হইতে পারে না কিন্তু পূর্ব্বে ইয়াষ্টের সহিত অন্যান্য নানা প্রকার বিষাক্ত কীটানু থাকিত তাহা দ্বারা মদ খারাব হইত এবং তাহা পান করিয়া লোকে অসুস্থ হইত। পাষ্টে ইহা দেখাইয়া এবং এই বিষ-কীটাণু জন্মাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীদের অনেক উপকার করিয়াছেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের আর একটী উন্নতিও পাষ্টের নিকট বাধিত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আগে হাঁসপাতালে যে সকল রোগীদের শরীরে অস্ত্র করা হইত, তাহাদের রক্ত প্রায় বিষাক্ত হইয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিত, অনেক চেষ্টাতেও তাহা নিবারণের উপায় পাওয়া যায় নাই। পাষ্টের এই আবিষ্কার হইতে ডাক্তার লিষ্টারের মনে হইল হয়ত অস্ত্র করার সময় বাহির হইতে ভিতরে কোন প্রকারে বিষ প্রবেশ করে। তখন পরীক্ষা দ্বারা এই অনুমান সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইল। প্রাণ রক্ষার পরিবর্ত্তে অস্ত্র দ্বারা যে প্রাণনাশই হয় তাহা তিনি বুঝিলেন। ইহা বুঝার এই ফল হইয়াছে, এখন অস্ত্র করিবার সময় প্রথমে সে অস্ত্র কারবল্কিকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, এবং সে সময় যাহাতে বাহিরের মুক্ত বাতাস গৃহে প্রবেশ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত রাখা হয়। এইরূপে এখন আগেকার অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম। সূতিকাগারে নানা প্রকার যে রোগ হয়, দেখা গিয়াছে তাহার কারণও বাহিরের বিষ। সেই জন্য এখন হাঁসপাতালে সূতিকাগারে পরিষ্কারের এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁটীনাটী বন্দোবস্ত যে তাহা বলিতে গেলে পাঠকেরা বিরক্ত হইবেন মাঝে মাঝে হাসিও রাখিতে পারিবেন না।

পাষ্টের বিষয় যিনি কিছু জানেন তিনিই স্বীকার করিবেন পাষ্টে মানুষের অমূল্য উপকার করিয়াছেন। পাষ্টে তাঁহার এই আবিষ্কার জন্য ইটালী স্পেন তুরস্ক ব্রাজিল পর্টুগাল স্থইডেন সার্বি অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী রোমেনিয়া নিকান টুনিস ফ্রান্স ইংলণ্ড প্রভৃতি সমুদয় দেশ হইতে যে কত মাননীয় উপাধি ও রাজাদের নিকট মহামূল্য উপহার ও মেডেল পাইয়াছেন তাহার তালিকা দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্পেন হইতে দত্ত একটী সামান্য রৌপ্য মেডেল তিনি সমুদয় মূল্যবান দ্রব্য অপেক্ষা ভালবাসেন। এই মেডেলে একটী উন্মাদ কুকুরের ভয়ানক মূর্ত্তি রহিয়াছে—তাহার সম্মুখে ফুলের মালা হাতে একটী শিশু নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতে যখন তাঁহাকে মেডেল দেওয়া হয় তাঁহার পূর্ব্বতন শিক্ষক ডুমা তাঁহাকে যে অভিবাদন পত্র দেন তাহাতে বলেন 'তুমি আমাদের জগত হইতে আর একটী সূক্ষ্মতম জগত বাহির করিয়াছ, বিষকে ঔষধে পরিনত করিয়াছ, তুমি ফ্রান্সের একটী গৌরব'।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

ছোট নহিলে বড় হয় না, ছোট আগে বড় পিছে। তিল হইতে তাল হয়, কিন্তু একেবারেই তালটা হইয়া উঠিবার খুব কমই সম্ভাবনা।

তবে ছোট কাজের, অল্প কাজের এত অনাদর কেন? যাহারা এতটুক কাজ করিতেছে তাহারাও কাজ করিতেছে, আর যিনি প্রকাণ্ড একটা কাজ কবিবার আশায় চুপ করিয়া বসিয়া ঐ ছোট কাজ গুলির দিকে চাহিয়া ভ্রু কুঁকড়িয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন 'ভারী ত কাজ,' তাঁহার কাজ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

পাখীরা যখন বাসা করে এক একটি ক্ষুদ্র কুটা বহন করিয়া আনে, কুটা কুড়াইতে যাহার লজ্জা সে কি কোন জন্মে বাসা বানাইতে পারে! তাই বলিতেছি ছোট কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিও না, মহৎ উদ্দেশ্য চোখের সামনে ধরিয়া ছোট হইতে আরম্ভ কর, বড় আপনা হইতে হইবে—না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

"সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞার অধীন,
বিফল হতেই পারে হৃদয় যতন,
তা বলে মানুষ কি গো হবে লক্ষ্যহীন?
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন!
উদ্দেশ্যে দোষিব কি গো সিদ্ধির শিখরে
উঠিবারে আমি আজ বিফল বলিয়া?
পর্ব্বতের পদতলে থাকি যদি মরে,
অন্যেত উঠিতে পারে উপরে চড়িয়া!

জীবনের বাকী কখনো পুরে না। বাকীতেই জীবন। মুহূর্ত্তের বাকী পুরাইতে দিবস, দিবসের বাকী পুরাইতে মাস, মাসের বাকী পুরাইতে বৎসর চলিয়া যায়, এইরূপে ক্ষুদ্র বাকীর স্থলে কেবল অসংখ্য বাকী জমা হইতে থাকে, জীবনের বাকী পুরাইতে শেষে জীবনটাই বাকী পড়িয়া যায়। সেই ভাগ্যবান যাহার জীবনের মুহূর্ত্তও বাকী পড়ে নাই।

ভাব কোথা? অভাবে।

মিলনের অভাব বিরহ,—বিরহে যতখানি প্রেমের ভাব এমন কি মিলনে? যে মিলন বিরহ-ছাড়া নয় অর্থাৎ মিলনকালেও যেখানে বিরহের অনুভাব, সেইখানেই মিলনের যথার্থ তৃপ্তি, বাস্তবিক পক্ষে এ তৃপ্তি মিলনের নহে, যত বিরহের। তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা;

সঙ্গে নৈব যদেকা
ত্রিভুবন মপি তন্ময়ং বিরহে।

তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।

একত্র থাকিব অথচ তাহাকে স্পর্শ করিব না! কি মধুর! কি সুন্দর! কি পবিত্র! বাহিরের মিলনের অভাবে অন্তরের মিলন কবিই ইহা বুঝেন।

যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে সেই কবিতাই তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতা পড়িয়া যাহা পড়ি নাই এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া উঠে, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতাটুক মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না,—তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বের অভাব দেখা যায়।

তাই বলিতেছি বৈষম্যের মধ্যে যেমন সাম্যের, স্বপ্নের মধ্যে যেমন সত্যের অধিষ্ঠান তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব বিরাজমান।

স্বপ্নের মধ্যেই সত্য এ বড় বিষম কথা! হইলে কি হয় কথাটি সত্য। সত্য স্বপ্ন-জগতের ধন, যাহাকে আমরা সত্য জগৎ বলি তাহার সহিত সত্যের বড় কমই সম্পর্ক। আমরা সত্য-জগৎ বলি কাহাকে? ইন্দ্রিয় জগৎকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি তাহাই আমাদের নিকট সত্য জগৎ। সংসারই আমাদের নিকট সত্য। কিন্তু সংসারে সত্য কোথায়? সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলেরই আধিপত্য, সংসার মিথ্যাতেই জর জর। সংসারে সত্য কেবল স্বপ্নরাজ্যে, কল্পনায়। যদি সত্য দেখিতে চাও তোমাদের সত্য রাজ্য ছাড়িয়া সংসারাতীত ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্ন রাজ্যে সত্য অনুসন্ধান কর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অমৃত পুলিন ।/০ (ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস) একজন পরিব্রাজক প্রণীত।

উপন্যাস খানিতে ঘটনার পারিপাট্য, বর্ণনার মাধুর্য্য বেশ আছে। 'পশু যুদ্ধ,' 'কার গলায় দিলে' প্রভৃতি কয়েকটি পরিচ্ছেদ বড় ভাল হইয়াছে। নায়ক নায়িকার চরিত্রাংশ আকবরের উদারতা গিরি রাণীর প্রেম তাহাও বেশ অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা সত্ত্বেও উপন্যাসখানিকে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

উপন্যাসের মিবার-রাণা প্রতাপ সিংহে ইতিহাসের মিবার-রাণা প্রতাপ সিংহের [illegible] দেখিতে পাই।

এখানে প্রতাপ সিংহ আকবরের সহিত বালকের ন্যায় কথায় কথায় অযথা রাগ করেন, অথবা বীরত্বের আস্ফালন করেন।

তবে প্রতাপসিংহের চরিত্রের এই বালকত্ব স্থানে স্থানে একটু হাস্যকর হইলেও নিতান্ত অসহনীয় নয়, কিন্তু উন্মাদিনার চিত্রের জন্য লেখককে মার্জ্জনা করা যায় না।

উন্মাদিনী কে? আহমদ নগরের চাঁদ সুলতানা। যাঁহার প্রশংসা, বীরত্ব, উদারতা আজও ইতিহাসে কীর্ত্তিত।

এই ভারত ধন্যা রমণীকে লেখক সামান্য রমণী হইতেও অধম করিয়া গড়িয়াছেন। রমণী জাতির স্বভাব সুলভ লজ্জা, সতীত্বানুরাগ, পবিত্রতা হইতে ইনি বঞ্চিত। কেবল তাহাই নহে ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া ইনি পিশাচীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, নির্দ্দোষ অসহায় বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া ইহাঁর হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হইতেছে। এইরূপ চিত্র আঁকিয়া লেখক কেবল যে ইতিহাস ভঙ্গ দোষে দোষী হইয়াছেন তাহা নহে, চিত্রটি আগা গোড়া অস্বাভাবিক। রাণী হইয়া রাণীর মত ব্যবহার তাঁহার আদপে নাই। এমন কি আকবরকে তিনি আপনার জঘন্য ইতিহাস যেরূপ অসঙ্কোচে বলিতেছেন—এক জন সামান্য স্ত্রীলোকও তাহা পারে কি না সন্দেহ। অতটা বলিবার আবশ্যকও কিছুই ছিল না।

উপন্যাসের উন্মাদিনীই এই উপন্যাস খানিকে সর্ব্বতোভাবে কলঙ্কিত করিয়াছে।

ললনা সুহৃদ। ১ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

ললনাগণের কি কর্ত্তব্য, আর কি অকর্ত্তব্য, কিসে তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধি হয় আর অসুখ দূর হইতে পারে, কিরূপ আচার ব্যবহার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়, কিরূপ শিক্ষা তাঁহাদের উপযোগী এই পুস্তক খানিতে তাহাই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানির ভাষা সরল উপদেশ গুলিও বেশ সঙ্গত। ললনাগণের নিকট বইখানি আদৃত হউক এই বাসনা।

শঙ্করাচার্য্য। * অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

২৪ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে শঙ্করাচার্য্যের জীবনের সারভাগ সংক্ষেপে বেশ বিবৃত হইয়াছে। তবে শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত এত সংক্ষেপে পড়িয়া আশ মেটে না।

সাহিত্য প্রসূন। * শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীযুক্ত কাশীরাম দাস প্রভৃতি খ্যাত নামা লেখকদিগের রচনায় এই পুস্তকখানি গ্রথিত। সুতরাং পুস্তক খানির বিশেষ প্রশংসা বাহুল্য মাত্র। উপরের ক্লাশের বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক হইবার এখানি সম্পূর্ণ উপযোগী।

———

বিদ্রোহ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা রাণী দুজনেরি হৃদয়ে অসীম বেদনা, প্রাণে ঘোরতর অশান্তি। রাজা ভাবেন "আমি সন্দেহের কাজ কিছুই করি নাই—কেন এ সন্দেহ? যাহাকে অসীম ভালবাসি তাহার নিকট হইতে এই প্রতিদান"?

এই চিন্তার মধ্যে এই কষ্টের মধ্যে মাঝে মাঝে সুহাসের কথা যদি মনে পড়ে, তাহার সেই ফুলের মত সুন্দর মুখখানি যদি নয়নে জাগিয়া উঠে রাজা যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়েন—কি যেন একটা লজ্জার ভাবে কি যেন একটা দোষ করিয়াছেন—এই ভাবে নিজের কাছেই নিজে জড়সড় হইয়া পড়েন।

কিন্তু এ অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে অধিকক্ষণ মনে সে ভাব স্থায়ী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ ভাবের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস জন্মে, যাহাকে দোষ বলিয়া মনে আসিতেছে তাহাকে অদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বাসনা প্রবল হয়—সেই বাসনায় অনুযায়ী এমন সকল যুক্তিরাশি আবির্ভূত হইতে থাকে যে তাহার মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব্বের সঙ্কোচ ভাব চাপা পড়িয়া যায়। তখন রাজা ভাবেন "সৌন্দর্য্য দেখিতে কাহার না ভাল লাগে? ফুল দেখিয়া জ্যোৎস্না দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না প্রীতির সঞ্চার হয়—কিন্তু তাহাকে কি প্রণয় বলা যায়? না তাহাতে দোষনীয় ভাব কিছু আছে?"

রাজা বুঝেন না দোষ সৌন্দর্য্যে নহে দোষ মনে—দোষ বাহিরে নহে দোষ ভিতরে। সূর্য্যের আলোক সকল সময়েই বিমল উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে তাহা যেমন বিকৃতবর্ণ হইয়া যায়—বিকার যুক্ত হৃদয় দিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধতাও তেমনি মলিন হইয়া পড়ে। রাজা যদি ইহা বুঝিতেন তবে কিরূপ হৃদয় দিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে ভাল বাসিতেছেন তাহাই দেখিতেন, সৌন্দর্য্যকে ভালবাসা দোষের কি না ইহা বিচার করিতেন না; আত্ম পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি আত্মপরীক্ষা করিতে চাহেন না, তিনি যে নির্দ্দোষ এইটুক মাত্র তিনি শুধু বুঝিতে চাহেন।

বুঝিতে চাহিলে কি না বুঝা যায়? বুঝিতে চাহিলে প্রকাণ্ড দোষও এমন লঘুতর ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে—যে সে দোষের আর দোষত্বই থাকে না—রাজা ত-সে হিসাবে যথার্থই নিরপরাধ। তাঁহার দোষ এত সামান্য—যে আত্ম পরীক্ষারূপ অনুবীক্ষণ দিয়া না দেখিলে তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ হইবরিই নহে। সুতরাং হঠাৎ কখনো কখনো রাজার হৃদয়ে উক্তরূপ যে মেঘভার জন্মে, বাসনা-প্রসূত যুক্তির বাতাসে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা পরি-

স্কার হইয়া যায়, তখন তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মলতা তিনি অধিক করিয়া উপভোগ করেন আর রাণীর সন্দেহ শতগুণ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, একটা গর্ব্বিত ক্রোধের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, কখনো কখনো বা ক্রোধের পরিবর্ত্তে রাণীর প্রতি একটা করুণ মমতার ভাব আসিয়া পড়ে—মনে করেন—"রাণীকে তাঁহার বুঝাইয়া বলা উচিত—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই,—লোকের কথায় কেন তাঁহাকে এরূপ সন্দেহ করিতেছেন।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিয়া যখন রাণীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ নয়নে পড়ে, তাঁহার বিষণ্ণ কাতর ভাবে তিনি যেন তীব্র তিরস্কার শুনিতে পান, তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয় একটি বিষম সঙ্কোচের ভাবে প্রপীড়িত হইয়া উঠে, যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন কিছুই আর বলা হয় না—দুএকটি বাজে কথার পর তাঁহার অনেক কাজের কথা মনে পড়িয়া যায়—তিনি বাহিরে চলিয়া যান। যে অশান্তি লইয়া রাণীর নিকট গিয়াছিলেন—তাহা হইতে অধিক-তর অশান্তি লইয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসেন—জীবনটা সুখশান্তিহীন শুধু একটা হাহাকার বলিয়া মনে হয়। এই অশান্তি অন্ধকারের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ বাপী-তীরের সুন্দর মুখচ্ছবি বড় অধিক করিয়া মনে পড়ে, সেখানকার প্রশান্ততা—সেখানকার সুমধুর নীরবতা অতি গভীর রূপে অনুভব করেন—কিন্তু সেদিকে যাইতে আর তাঁহার সাহস হয় না।

রাজা যখন এইরূপে একটি আদরের কথা না কহিয়া একটা ভালবাসার কথা না কহিয়া চলিয়া যান—রাণীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। রাণী জগৎ সংসার অন্ধ-কার দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া মনে মনে ভাবেন "এ দুঃখে একটা সান্ত্বনা নাই, একটা মমতার কথা পর্য্যন্ত নাই—ওগো সে এত নিষ্ঠুর—এখন এত নিষ্ঠুর? আমার সেই প্রেমময় করুণাময় স্বামী একফোটা অশ্রুজল যাহার প্রাণে বিদ্ধ হইত, একটু ম্লান দেখিলে যে সহিতে পারিত না—সে আজ এত নিষ্ঠুর? আমার অসীম দুঃখে অসহ্য যাতনার আজ সে উদাসিন! সারাদিন কাছে থাকিয়া যাহার তৃপ্তি হইত না—এক মুহূর্ত্ত নয়নের আড়াল করিলে যাহার প্রাণে বিরহ বেদনা বাজিত আজ একবার সে ফিরিয়া চাহে না, এত নিষ্ঠুর সে এত নিষ্ঠুর!

"প্রভু আমার, স্বামি আমার ও চরণে আমি কি দোষ করিয়াছি—কেন এ অবহেলা? সত্যই কি তবে তোমার সে ভালবাসা নাই, সত্যই কি তবে তোমার হৃদয় অন্যের জন্য ব্যাকুল? যদি তাহাই হয়—আমার কি সে কথা শুনিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই, আমি কি তোমার বন্ধুত্বেও অধিকারী নহি, সর্ব্বস্বধন আমি যে তোমার সুখের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহা কি তুমি জান না প্রভু? কিম্বা সব দোষই বুঝি আমার। বুঝি সব মিথ্যা—বুঝি সব মিথ্যা। আমি নিজের মনের গুণে নিজের দোষে নরক অনল ভোগ করিতেছি এবং তাঁহার বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতেছি।"

রাণী উৎসুক হইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করেন, আসিলে মনের সমস্ত কথা

তাঁহাকে খুলিয়া বলিবেন। কিন্তু রাজাকে দেখিলে তাঁহার আর সে ভাব থাকে না, কি এক মর্ম্মভেদী অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায় মনের সহস্র আবেগ জমাট বাঁধিয়া আসে—যদিই বা মুখ হইতে কোন কথা বাহির হয় সে অভিমানের কথা। রাজা তাহা সন্দেহ বলিয়া বুঝেন, রাজা যদি এক মুহূর্ত্ত থাকিতেন সে কথার পর আর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তও থাকেন না—বাণাহতের মত সরিয়া পড়েন।

এইরূপে দিন যাইতেছে। দিন দিন উভয়েরি যন্ত্রণা বাড়িতেছে, জীবন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে—অথচ কেহ কাহাকেও কিছু খুলিয়া বলেন না—ইচ্ছা করিলেও পারেন না। দৈব যেন অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে পদক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে তফাৎ করিয়া দিতেছে।

যে দিন পুরোহিতের সহিত রাণীর কথা হইল সে দিন রাণী হৃদয়ে বজ্রবল বাঁধিলেন, ভাবিলেন যেমন করিয়াই হউক রাজাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া শুনিলেন রাণী বাগানে। একটু আশ্চর্য্য হইলেন। যে দিন হইতে তাঁহাদের মনান্তর হইয়াছে সেই দিন হইতে রাণী আর বাগানে যান নাই।

রাজা উদ্যানে পদার্পণ করিবা মাত্র সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বহু-দিনের স্মৃতির মত তাহাতে সহসা তাঁহার হৃদয় রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কত দিন কত দিন পরে এই মধুর জ্যোৎস্নালোকে এই মধুর উপবনে সঙ্গীতের সেই মধুর হিল্লোল! সেই গীতধ্বনি শুনিয়া তাঁহার আগেকার কত প্রেমের কাহিনী জীবনের কত সুখের চিত্র মনে জাগিয়া উঠিল, রাজা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন—গানটি সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

কেন সখি আসিতে না চায়?
যদি বা আসে গো হেথা
কেন সখি থাকিতে না চায়?
　　যাই যাই করি করি
কেন বুকে ছুরি বিঁধে নিঠুর কথায়?
সখি—কেমন করিয়া প্রাণ ধরি
　　তার যদি এতই অসাধ
থাকিতেই বলি বা কি করি?

মুখ সখি ফুটে না যে তায়।
মনের তরঙ্গ যত মনেতে মিশায়।
সখি—হাসিয়া যাইতে তারে বলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয়মনে——সে যাতনা জানিতে বা পায়,
পাছে আঁখি উথলায়।
সখি—বড় অভিমান করে
যাইতে যে বলি তারে
বোঝে না সে পলাইয়ে যায়—
সে যে কেবলি কাঁদায়!
সখি—আমার ত দেখিলে তাহায়
শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে
হৃদি উঠে উথলিয়ে,
শতবার বুক মাঝে
বিদ্যুতের লহরী খেলায়।
সদা ভয়ে ভয়ে সারা
বুঝি পড়িলাম ধরা
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়।
কই সখি—বুঝিতে না পারে
শুধু যাই যাই করে
মন মন না বুঝিলে কে বুঝাবে তায়।
সখি বড় ভাল বাসি
সে মুখের হাসি
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়।
তবু—কেন সাধ প্রাণে
দেখি সে নয়ানে
ফুটেছে বিরহ ব্যথা না দেখে আমায়।
এই—ব্যথা টুক তার
হৃদি চাহে বার বার,
না দেখিলে জ্বলি যাতনায়।
সখি এ কেমন ধারা,
এ হেঁয়ালি বল কে বুঝায়?

গান শুনিয়া রাজার প্রাণে একটা অনুতাপ উথলিয়া উঠিল—রাজার হৃদয় একটা কোমল ভাবে আর্দ্র হইতে লাগিল, কি যেন একটা অজানা দুঃখে তাঁহার নেত্র ছল ছল করিয়া আসিল, রাজা ধীরে ধীরে রাণীর নিকট গমন করিলেন, রাণী তখন প্রস্তর-বেদীতে শুইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। রাণী যখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন সেই আকুল নয়নের দৃষ্টিতে রাজার হৃদয় কি একটা আকুলতার পূর্ণ হইয়া উঠিল—রাজা ধীরে ধীরে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। কিন্তু করিলেন কি? তাহাতে রাণীর হৃদয়ের যত্নরুদ্ধ-অশ্রুজল সহসা যে অন্তরতল ভেদ করিয়া উঠিল, অনন্ত সুখের আবেগে মগ্ন হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার আর কিছুই বলা হইল না। খানিক পরে রাজা বলিলেন "সেমন্তী"?

সেমন্তী কেবল অশ্রু পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা তাঁহার অলক গুচ্ছ গুলি আগেকার সময়ের ন্যায় হাতে করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—

"সেমন্তী আমি কি দোষ করিয়াছি"?

কাঁদিয়া সেমন্তীর হৃদয় ভার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, রাজার আদরে বহু দিনের পর তাহার হৃদয় প্রশস্ত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল—সেমন্তী উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে ববিলেন—"নাথ তুমি কি দোষ করিবে? আমিই দোষী, আমাকে ক্ষমা কর"

রাজা একটু হাসিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা সে কথা থাক, দোষ যাহারই হউক, তোমার আর ত সে ভাব ফিরিয়া আসিবে না, সেইটে বল দেখি"?

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—

"তোমার এ রকম মুখ দেখিলে আমার কি কিছু মনে হয়? তুমি কেন আগেকার মত আদর করনা'?

রাজা বলিলেন "তুমি কেন কথা কহ না?"

রাণী না কথা কহিলে তবে রাজার এখনো কষ্ট হয়! রাণীর মনে বড় আহ্লাদ হইল, তাঁহার ঐ কথা আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল, তিনি অভিমানের ভাবে ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

"নাথ আমার কথা কি তোমার আর ভাল লাগে"?

এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল এই কথায় হঠাৎ রাজার ভাবান্তর হইল—কথাটা রাজার ভাল লাগিল না—রাজা ইহা অবিশ্বাস বলিয়া বুঝিলেন।

কিন্তু রাণী বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হইতে একথা বলেন নাই, তিনি বুঝিয়াছেন রাজা তাঁহাকে ভালবাসেন। কিন্তু রাজার মুখ হইতে বার বার তিনি সেই কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে চান, তাঁহার প্রেমাদরে সমস্তক্ষণ লীন হইয়া থাকিতে চান। সেই বাসনা হইতেই তাঁহার উক্ত অভিমানের কথা। কিন্তু সংসারে কেহ কাহারো মন বুঝে না। রাণীর সেই অভিমান রাজা অবিশ্বাসের অভিমান বলিয়া বুঝিলেন। রাজা দেখিলেন আবার সেই

সন্দেহ! তাঁহার মন একটা নিরাশার ভাবে পূরিয়া গেল, মনে হইল রাণীর ঐ বদ্ধমূল অবিশ্বাস ভাঙ্গান তাঁহার সাধ্য নহে। বলিলেন "মহিষি যদি তাহাই তোমার মনে হয় ত আমার বলিবার কিছুই নাই"।

রাজার কঠোর উত্তরে রাণীর মর্ম্মবিদ্ধ করিল—রাণী বলিলেন "মহারাজ সত্য সত্যই কি বলিবার কিছুই নাই"।

রাজা বলিলেন 'না'।

বহুদিন পরে দুজনে যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন বহুদিন পরে দুজনের হৃদয়ের মেঘ যদি বা অপসারিত হইয়াছিল—আবার সহসা তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল, আবার তাহা বজ্র কম্পনে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রাজা যখন কিছু পরে উঠিয়া গেলেন রাণীর সহসা চমক ভাঙ্গিল। করিলেন কি? সমস্ত সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলেন? রাজাকে কিছুই বলিলেন না—বলিবার অবসর দিলেন না! কেবল তীব্র কথার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে তাড়াইলেন! রাণীর মনে হইল তাঁহারই সমস্ত দোষ। তীব্র অনুতাপের দংশনে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নের শতধারা শুকাইয়া গেল। অভিমানের কষ্ট, রাজার অনাদর ভুলিয়া গেলেন। একটিবার রাজার সহিত দেখা করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন—কিন্তু কি করিয়া এখন আবার তাঁহাকে ডাকেন, ডাকিলেও কি তাঁহার এ দোষ ক্ষমা করিয়া রাজা এখনি আর আসিবেন? তাহাতেও ভরসা নাই, তিনি উঠিলেন।

অতৃপ্তি।

চতুর্থ সর্গ।

সখি ও বনবালা।

বনবালা।

বুঝাসনে আর সখি
বুঝাসনে মোরে আর,
দেলো সখি ছেড়ে দেলো অভাগীর আশা।
কেন এ অবোধ দুখে
ঢালিবি অশ্রুর ধার
ঢালিসনে এ অযোগ্যে তোর ভালবাসা।

এখনো সে ছবি যদি
মিলালো না হৃদি হতে
এখনো ছিঁড়িতে স্মৃতি নারিলাম যদি,
এখনো এ আঁখি যদি
বরষিবে অশ্রুজল
এখনো কাঁদিবে যদি দুরবল হৃদি, —
হোক সখি যাহবার
রাখিসনে আশা আর
কাঁদিসনে দুখে মোর হাসিবি ত হাস!
এ দুখে মমতাধার,
নহে মোর অধিকার
সখিরে তাহাই ভাল তীব্র উপহাস।
দেলো সখি ছেড়ে দেলো অভাগীর আশ।
এখনো বুঝাবি তবু
দিবিনে দিবিনে ছেড়ে
একাকী ভাসিতে স্রোতে নিয়ে অশ্রুজল।
এখনো আশ্বাস ভরে
শুধাবি আমায় তবু
কতদূর যত্ন মোর হয়েছে সফল?
তবে এই শোন সখি—
শোন বালা শোন তবে
পারিনি ভুলিতে তারে পারিব না আর।
প্রত্যেক কথাটি তার
জ্বলন্ত আখরে লেখা
রয়েছে হৃদয়ে যেন আঁকা আজিকার।
সেই যবে একদিঠে
মুখপানে চাহি চাহি
চুলগুলি করিত সে হাতে মাথামাথি।
কত কি ভাবের ছায়া
বহিয়ে যেত সে মুখে
গণিতে গণিতে মুগ্ধ প্রেম ভরে আঁখি।

সে সৌন্দর্য্য মোহময়
করিয়ে করিয়ে পান
আজিও যে উথলিত অবশ হৃদয়!
সে মোহ কভু কি সখি
ছুটিতে পারে কি আর
সখি এ বিষম স্মৃতি ছুটিবার নয়।
সেই যে লতিকা দিয়ে
হাতটি বাঁধিয়া মোর
একদিন সুধাস্বরে বলেছিল মোরে;
নহে এ লতিকা বালা
আমার হৃদয় ডোরে
আজীবন তরে আমি বাঁধিলাম তোরে।
কি মোহিনী মায়াবলে,
বাঁধিল সে যাদুকর
ছিঁড়িতে নারিনু তাহা এখনো এখনো।
সে বিষ অমৃত জ্ঞানে
এখনো তৃষিত হৃদি
চাহিছে করিতে পান আশা নাই কোন।
একটি অলক গুচ্ছ
কেমনে গুছায়ে দেছে
হাতের উপর হাত কেমনে রেখেছে;
কেমনে একটি হাসি
শোভেছে বদনে তার
একটি চাহনি কিবা কেমনে চেয়েছে।
প্রত্যেক চাহনি হাসি প্রত্যেকটি কথা,
সকলি তেমনি তো লো হৃদয়েতে গাঁথা।
হা সখি তবে কি আর আছে আশা তবু?
ভুলিতে এ হৃদি তারে পারিবে কি কভু?
নাগো না ভুলিতে চাই
যেন গো মরিতে পাই
বিষমাখা মধু স্মৃতি হৃদয়েতে ধরে।

ফুলের সুবাস ঘোরে
ফুলটি যেমন মরে
মরুক তেমনি হৃদি এ সুধার ঘোরে।

সখি।
কাঁদ তবে কাঁদ সই,
নিতান্তই
কাঁদিবি যদি,
অলি সে গেছে চলে,
ফুলে ফুলে
সঁপিছে হৃদি।
যেজনা যেতে চায়,
রাখা যায়
তারে কি জলে?
তুমি যত কাঁদ
শিকলি যত বাঁধ,
সে যে—
আপনি খোলে।

বনবালা। স্বগতঃ
বুঝি আর এলনা সে
বারণ করেছি তাকে।
কেহ কারে বুঝেনারে
মনের ব্যথা মনেই থাকে!
কেন তবে অভিমান
কেন চাহা প্রতিদান
কেনরে পিপাসা তার
ফেলে গেছে প্রাণ যাকে?
চাহিবনা প্রেম আর
ফেলিব না অশ্রুধার
এস শুধু কাছে এস
অভাগী কাতরে ডাকে।
শুধু সখা কাছে থাকো—
শুধু তুমি চেয়ে দেখো
দাও গো চরণে শুধু
মরিতে এ অবলাকে।

নীহারিকা।

নীহারিকা অর্থাৎ আলোকধূম। আকাশে যাহা জ্বলন্ত ধূম খণ্ডের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় তাহাই নীহারিকা। সাধারণতঃ নীহারিকাগণের আকার অনির্দ্দিষ্ট গঠনের, কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-গঠনেরও আছে।

বহুদূরে অবস্থিত তারকাগুচ্ছও যে নীহারিকার ন্যায় ধূমবৎ প্রত্যক্ষ হয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যেমন পারসিউস রাশির তারকা গুচ্ছ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে ঠিক নীহারিকা, সামান্য দূরবীন দিয়া দেখ—তারকা রাশির সমষ্টি। এমন অনেক আলোক-ধূম যাহা প্রথম প্রথম দূরবীন পর্য্যবেক্ষণে নীহারিকা বিবেচিত হইয়াছিল. হারসেল পরে ক্ষমতাশালী দূরবীন দিয়া দেখিলেন তাহারা তারকা গুচ্ছ।

ইহার ফলে নীহারিকাগণ 'ভেদ্য' ও 'অভেদ্য' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অনুমিত হইল, যে সকল নীহারিকা দূরবীণ দ্বারা ভেদ হইয়া তারকাগুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়—তাহাই ভেদ্যনীহারিকা—আর যাহারা এতই দূরে অবস্থিত যে দূরবীণে যাহাদের কূল পায় না তাহারা অভেদ্য-নীহারিকা। ইহা সত্য হইলে ইতিপূর্ব্বের নীহারিকার সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে দাঁড়ায় এই নীহারিকাগুলি প্রকৃত পক্ষে তারকাগুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে যে যতদূরে সেই তত ধূমাকারে প্রতিভাত।

কিন্তু আজকালকার একটি প্রধান আবিষ্কার ইহার বিপরীত প্রতিপন্ন করিতেছে—পূর্ব্বের নীহারিকা সিদ্ধান্তেরই ইহাতে জয় হইয়াছে। কতকগুলি নীহারিকা তারকাগুচ্ছ হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাদের মেঘবৎ দৃশ্য যে কেবল দূরত্ব-প্রসূত নহে, বর্ণ বিশ্লেষণী যন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে আলোক ধরিয়া দেখা গিয়াছে—প্রকৃত নীহারিকাগণের আলোক জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থের আলোক; তাহা তারকাদিগের ন্যায় জমাট জ্যোতিষ্কের আলোক নহে। এই বাষ্পালোকের মধ্যে একটি হাইড্রোজেন বাষ্পালোক। কিন্তু এত অল্প দিন এ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে যে প্রকৃত নীহারিকা হইতে দৃশ্যত নীহারিকার পৃথক-কার্য্য এখনো শেষ হইয়া যায় নাই।

সুতরাং প্রকৃতই হউক আর দৃশ্যতই হউক সমগ্র নীহারিকা মণ্ডলীকে এখন এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১। বিষম-গঠন নীহারিকা।

যেমন ওরায়ণ রাশি ও অ্যানড্রমিডা রাশির নীহারিকা।

২। চক্র নীহারিকা এবং ডিম্বাকৃতি নীহারিকা।

এই দুই শ্রেণীর নীহারিকাকে জ্যোতির্ব্বিদগণ একই তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন,—কেননা তাঁহাদের মতে পার্শ্ব দিয়া দেখিলে ডিম্বাকৃতি নীহারিকাই সম্ভবতঃ, অন্ততঃ অনেক স্থলে, চক্রাকার দেখায়।

৩। ঘূর্ণ্যমান বা আবর্ত্ত নীহারিকা।

ইহার একটি ছবি আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

৪। গ্রহ-নীহারিকা।

ইহারা গোলাকার কিম্বা ঈষৎ ডিম্বাকৃতি—এবং ইহাদের আলোক প্রায়ই নীলাভ, অনেকটা গ্রহের মতন। এই নিমিত্ত স্যর জন হারসেল ইহাদের উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৫। তারকা-বেষ্টনকারী নীহারিকা। এই তারকা অন্যান্য অংশে অন্য তারকা-দিগেরই মত; কেবল নীহারিকা সংযোগই ইহার অসাধারণ। আধুনিক সময়ের তীক্ষ্ণ-দর্শী দূরবীণও এই নীহারিকায় তারকার চিহ্ন ভেদ করিতে পারে নাই।

তারকাদিগের ন্যায় নীহারিকাদিগেরও সকলের জ্যোতি সমান নহে—এবং পরিবর্ত্তনশীল তারাদের ন্যায় ইহাদের জ্যোতিও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দের আবিষ্কৃত বৃষ রাশির একটি ক্ষুদ্র নীহারিকা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। পর বৎসর আবার ইহার জ্যোতি বাড়িতে থাকে।

তারকা-জ্যোতি নামক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি ছায়াপথের নিকটেই তারকাগণ ঘন সন্নিবিষ্ট। কিন্তু নীহারিকার সংস্থিতি ঠিক বিপরীত। ছায়াপথে যে নীহারিকা কেবল বিরল এমন নহে—ছায়াপথ হইতে যতই দূরে যাও ততই নীহারিকার সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি নীহারিকা জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থ। জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পূর্ব্বে জগৎ নীহারময় ধূমে পরিব্যাপ্ত ছিল ক্রমে সেই নীহার-ধূম জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ রূপ ধারণ করিয়াছে। তারকা যেখানে অধিক—সেখানে নীহারিকা অল্প—এবং নীহারিকাময় প্রদেশ স্বল্প-তারকা-বিশিষ্ট ইহা উপরোক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি যুক্তি স্বরূপ দাঁড়ায়।



ক্যানিস ভিনাটিসি রাশির আবর্ত্ত-নীহারিকা　　—স্বর্ণকুমারী দেবী

আষাঢ় ও শ্রাবণ।

সহসা বাহির হইতে দেখিলে অনেক জিনিষের মধ্যে কেমন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দিন দিন যত নিকটে আসা যায়—বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকি সাদৃশ্যের মধ্যে ততই বৈসাদৃশ্য মাথা উঁচু করিয়া উঠে। প্রতিদিন সহস্র প্রভেদ চক্ষে পড়ে—সাদৃশ্য কমিয়া যায়, বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ উভয়েই বর্ষার পরিবার মধ্যে গণ্য। কিন্তু এক পরিবারের হইলেও মুখশ্রী উভয়ের এক নহে। মানবহৃদয়ে উভয়ের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। আষাঢ়, শ্রাবণ আমাদের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে না। দুই জনের ভাবগত প্রভেদ আলোচনা করিলে সময় সময় এমন সন্দেহও হয় যে, উভয়ে বুঝি এক পরিবারের লোক নহে। ভাদ্রের দুর্ভাগ্য—ভাদ্র শরতের পরিবারভুক্ত। কিন্তু শ্রাবণের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে নাকি ভাদ্রকে আশ্বিনের আত্মীয় না জানিয়া শ্রাবণের আত্মীয় ঠাহরাইয়া থাকেন। যাক্, সে কথার আলোচনায় আমাদের আবশ্যক নাই। আষাঢ় ও শ্রাবণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লইয়াই আমাদের কথা।

আষাঢ়ে গল্প পৃথিবী বিখ্যাত। শ্রাবণের এ বিষয়ে বড় খ্যাতি নাই। খ্যাতি নাই থাক্, তাই বলিয়া শ্রাবণের যে গল্প নাই তাহা নহে। শ্রাবণের কাব্য রচনায় ক্ষমতা অধিক। আষাঢ়ে গল্পে চোখের জলের তেমন ঘটা নাই—নেহাৎ যদি কান্না পায় দুই মুহূর্ত্তের অধিক তাহা থাকে না। শ্রাবণে অশ্রুজলে হৃদয় ঝরিয়া পড়ে—নয়নে যে জল বহে তাহার প্রতি বিন্দুতে হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। বাসন্তীউপন্যাস শ্রাবণের বারিধারায় অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রাবণের কাব্যে উচ্চদরের চরিত্রও পাওয়া যায়। আষাঢ়ে চিল, ব্যাঘ্র, ব্রহ্মদৈত্য নায়ক শ্রাবণের গল্পে বড় দেখা যায় না। আষাঢ়ে গল্পে গাম্ভীর্য্য নাই—শ্রাবণের গম্ভীর ভাষা, গম্ভীর ভাব। আষাঢ়ে গল্পে অসম্ভবের যেমন প্রাচুর্ভাব শ্রাবণের গল্পে তেমন নাই। তবে শ্রাবণের গল্পেও বর্ষার প্রভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আষাঢ়ের সহিত তুলনায় শ্রাবণের গল্প গম্ভীর বটে, তাই বলিয়া তাহা উপন্যাস মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

বিরহিণীর হৃদয়ে আষাঢ় শ্রাবণ উভয়েরই প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু আষাঢ়ের ভাবের সহিত শ্রাবণের ভাবের কেমন একটু তফাৎ আছে। আষাঢ়ে বিরহিণীর হৃদয়ে একটা নূতন ভাব আসিয়াছে—সে ভাবে একটু আশাপূর্ণ ঔৎসুক্য। শ্রাবণে বিভীষিকাটা কিছু পাকিয়া দাঁড়ায়। আষাঢ়ে বিরহিণী মেঘের নিকট প্রণয়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রাবণে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না—নির্জ্জনে নীরবে আপনার বিভীষিকা মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। মোটের উপর, বর্ষায় সহচরী

সঙ্গ বড় ভাল লাগে না—একেলা থাকিতেই ইচ্ছা করে। সহচরীদের সান্ত্বনাবাক্য এ সময়ে হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতে থাকে। সুখের সময় সান্ত্বনা সহিতে পারা যায়—দুঃখের সময় যায় না। বসন্তে সহচরীসঙ্গ ভাল লাগে—বর্ষায় বিজনে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

উদ্ধবদাসের একটী কবিতার অংশ-বিশেষ উঠাইয়া বসন্ত ও বর্ষার বিরহের প্রভেদ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আষাঢ় শ্রাবণের তুলনার মধ্যে বসন্ত ও বর্ষার কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বোধ হয় না। কবি বসন্তে বলিতেছেন,

"সো বরনারী, তোহারি লাগি ঝুরত,
রোয়ত সহচরী সঙ্গে।"

বর্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনী ভাসে।"

বসন্তে ক্রন্দন আছে—কিন্তু 'রোয়ত সহচরী সঙ্গে,' বিজনে একেলা বসিয়া নয়, সহচরীরা সঙ্গে আছেন। আর বর্ষায় নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে, দুঃখও গুরুতর। তাই সহচরীর নামগন্ধ নাই।

বসন্ত ও বর্ষায় যেমন, আষাঢ়ে শ্রাবণেও কতকটা সেইরূপ। আষাঢ়ে দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে—কোথায় আশা! কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মত সেও যদি আসে। শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।

রসিকভাব আষাঢ়ে শ্রাবণের চেয়ে বেশী। শ্রাবণে রসিকতা সব সময়ে জমে না—অনেক রসিকতা এমনি দীন হীন বেশে ম্লান মুখে বাহির হয় যে, তাহাদিগকে দেখিলে মায়া করে। বর্ষাকালীন দেশলায়ের মত অনেক কথা হাওয়া লাগিলেই ভিজিয়া যায়। চকমকির আগুনে সময় সময় তাহাদিগকে না তাতাইয়া লইলে চলে না। আষাঢ়েও এমন ঘটিতে পারে। কিন্তু শ্রাবণেই যেন চকমকির অধিক আবশ্যক। এ বিষয়ে রসিক রসিকারাই বুঝেন ভাল, আমরা সাদাসিধা যাহা মনে আসিল বলিলাম মাত্র। কৈফিয়ৎ তলব হইলে আমরা এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিব বোধ হয় না। কিন্তু আষাঢ়ে লেখার সহিত কৈফিয়তের নাকি বড় একটা মুখদেখাদেখি নাই, তাই সাহস করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। কৈফিয়ৎ তলপ হইলে রসিক রসিকারা আমাদের হইয়া ঝগড়াঝাঁটি করিতে বোধ হয় সম্মত আছেন। সে তাঁহাদের অভিরুচি।

শ্রাবণের মুখশ্রীর অনেকে খুব সুখ্যাতি করেন—তাঁহারা বলেন, শ্রাবণের মুখে কি একটী মিষ্ট ভাব আছে। আষাঢ়েরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা

বলেন, যে কেহ একবার রথের ভেঁপু শুনিয়াছে সে আর এমন কথা বলে না। গাল দুটী ফুলাইয়া রথের দিনে ছেলেরা কেমন ভেঁপু বাজায়—আষাঢ় না হইলে সে ভেঁপু বাজে না। আষাঢ়ের মিষ্ট ভাবে ভেঁপুও মধুর শুনায়। তাঁহারা আষাঢ়ের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রমাণটি নাকি সকলের সেরা। দিদিমারাও আষাঢ়ের তরফে—কেন না আষাঢ়ে গল্প তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। বিরহিণীরা কিন্তু আষাঢ়কে কি শ্রাবণকে ভাল বাসেনসন্দেহ। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহাদের টান অধিক কি "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা" তাঁহাদের অধিক প্রিয় বুঝিবার যো নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাহা না বলিলেও চলে—কারণ সকলেই তাহা জানেন। গুটীকতক সামান্য তফাৎ দেখাইয়াই আমরা বিদায় লইতেছি—আরও অনেক তফাৎ আছে; কিন্তু সে সকল বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অতএব এইখানেই শেষ করা যাক্।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দারজিলিং।

উঃ আজকাল এখানে কি ভয়ানক বাদলা! দিন নাই রাত নাই অবিশ্রান্ত জল জল জল! এরূপ মেঘলা বাদল যে কতদিন চলিবে তার ঠিক নাই। পাহাড়ে একবার বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলে সহজে ছাড়ে না। তবে এসময়টা ঠিক বরষাকাল নয় এই যা আশা ভরষা। আমি দেখিতেছি দিন কতক এইরূপ বৃষ্টি চলিলেই আমাদের পলাইতে হইবে। বাহিরে বেড়াইতে না পারিলে এরূপ বদ্ধভাবে আঁধার ঘরে বসিয়া থাকা এখানে অসহ্য। দিন গুলা যে কি বিশ্রী লাগিতেছে কি বলিব, বসিয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই, বাদলায় এত শীত বাড়িয়াছে যে না বেড়াইলে গরম হওয়া যায় না, একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই শীতে সব কণকণ করিতে থাকে! এত শীত আমরা কিন্তু তবু ঘরে আগুণ জালিনা। তোমরা জান অগ্নি পরীক্ষাতেই লোকে Myrter—কিন্তু আমরা এখানে অগ্নিস্পর্শ না করিয়াই Myrter হইয়াছি। কলিকাতায় বসিয়া তোমরা যদিও একথাটার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিবেনা, তা নাই বুঝিলে, যাঁহারা বুঝদার তাঁহারা বুঝেন! ইংরাজদের কাছে এটা বড়ই আশ্চর্য্য। তাঁদের ঘরে এখন সারাদিনই আগুণ। একটু সারসি খুলিলেই দেখা যায়—আকাশ হইতে নীচে ঝুপ ঝুপ করিয়া জল পড়িতেছে; আর দারজিলিংএর বাড়ীগুলির চিমনি হইতে হুস হুস করিয়া উপরে

ধোঁয়া উঠিতেছে। দূরের পাহাড় পর্ব্বতের দৃশ্য একেবারেই অদৃশ্য, সমস্তই মেঘাচ্ছন্ন, নিকটের পাহাড়স্তর, গাছপালাও মেঘবৃষ্টিতে একাকার হইয়া কেমন আবছায়া, অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অস্পষ্ট আঁধার দৃশ্যের মধ্যে যে গাম্ভীর্য্যের ভাব তাহা বড়ই উপভোগ্য। ইহার দিকে চাহিয়া বেশ ভুলিয়া থাকা যায়, দারজিলিংএর রৌদ্রময় মূর্ত্তির জন্য আর প্রাণ ছটফট করে না। তবে সারসি খুলিতে না খুলিতে এত জলের ছাট আসে যে বেশীক্ষণ সারসি খুলিয়া এই দৃশ্যটা ভোগ করা যায় না এই দুঃখ!

একটা ভারী আশ্চর্য্য এখানে এতটা বাদল চলিতেছে কিন্তু মেঘ বজ্রের গর্জ্জন নাই। আগে শুনিয়াছিলাম পাহাড় প্রদেশে নীচের পাহাড়ে বজ্রবৃষ্টি বিদ্যুৎ হয়—উঁচু পাহাড়ে বসিয়া তাহা দেখা যায়। কিন্তু তাহা দূরে থাক্ এখানে বৃষ্টি বাদলের মধ্যে বসিয়া মেঘের ডাক শুনিতে পাই না, কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং!

আমাদের দেশে বৃষ্টিতে ভিজিলে যেমন অসুখ করে এখানে কিন্তু তা হয় না। এদেশের লোকের ত কথাই নেই—ইংরাজেরাও 'ওয়াটার প্রুফ' কাপড় পরিয়া রাস্তায় দিব্য যাওয়া আসা করেন। আমরা একদিন বিকালে আকাশ একটু পরিষ্কার দেখিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম—খানিকদূর যাইতে না যাইতে ভিজিয়া ফিরিতে হইল!

বর্ষাকালে ভিজিতে আরাম আছে কিন্তু সে এ রকম লোকের মধ্যে না। বাড়ীর সকলে বকিবেন, রাগ করিবেন—আমরা ছুটিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পলাইয়া ছাতে ছাতে বাগানে বাগানে খালি পায় খালি মাথায় ভিজিয়া বেড়াইব—তবেই সিন ভিজিয়া আমোদ! নহিলে রাস্তার মধ্যে মাথায় ছাতি, গায়ে ওয়াটার প্রুফ, বৃষ্টিতে চলিয়াছি—লোকগুলা সব অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া যাইতেছে, আমরা পলাইবার পথ পাইতেছিনা, সেরূপ ভিজিয়া বেড়াইবার চেয়ে ঘরে বসিয়া থাকাই ভাল। তাই আছি আর কি। মাঝে মাঝে যখন ভিজিতে বড় ইচ্ছা করে তখন কল্পনায় ভেজা যায়।

আচ্ছা ভাই কল্পনাটা কি সুবিধার জিনিস? এমন বেওয়ারিস জিনিস আর কোথায় দেখিয়াছ? যেমন ইচ্ছা কল্পনা কর না কেন তার জন্য কেউ তোমাকে কৈফিয়ৎ তলব করিবার নাই। কেন না তুমি কল্পনা করিতেছ বলিয়া তা কখনো সত্য হইবে না।

লোকে ভাবে কল্পনাটা সত্য হইলে কি ভালই হইত, কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনের কথা কেহ জানিতে পারে না এটা যেমন আমাদের সৌভাগ্য, কল্পনাটা সত্য হয় না—এটাও সেইরূপ সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বাস্তবিক আমরা যা কল্পনা করিতাম তাই সত্য হইয়া দাঁড়াইবার ভয় থাকিত তাহাহইলে কল্পনাতেও আমাদের স্বাধীনতা থাকিত না। তাহা হইলে কি মুস্কিল হইত বল দেখি? তাহাহইলে কি আমি এই শীতের সময় এমন সহজে জলে ভিজিবার কল্পনাটা করিতে পারিতাম? তবে নাকি বেশ জানিতেছি—আমি যতই কল্পনা করি না কেন কল্পনাটা কল্পনাই থাকিবে তাই প্রাণ

পুরিয়া কল্পনা করিতেছি—আর সকল লোকের মত ভাবিতেছি—কল্পনাগুলা সত্য হইলে কি ভালই হইত।

আচ্ছা এ কি রকম মজার বল দেখি? যে কল্পনা সহজে সত্য হইতে পারে—কল্পনা করিতে গেলে সে রকম কল্পনা প্রায়ই মনে আসে না, কল্পনা করিব—ত চাঁদে উঠিব, পরীর মত উড়িয়া বেড়াইব ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে লেপচারা হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রাখিয়া স্বর্গে যাইবার কল্পনা করিত, তা আমরাও ত পৃথিবীতে থাকিয়া চাঁদে বেড়াইবার কম ভাবনা ভাবিনা, বেচারা লেপচাদেরই কি এত দোষ! কিন্তু তাদের বেলায় মুর্খমি—আর আমাদের বেলায় কল্পনার দৌড়! হায় হায় এমনি পৃথিবীর গতিক! কথাটা হইতেছে আমরা সকলেই পাগল, তবে যে যাহাকে বলিয়া লইতে পার। আমাদের এমন অনেক কথা আছে যা শুনিলে লেপচারাও সম্ভবতঃ আমাদের পাগল ঠাওরায়। যেমন,—তাহারা যদি শুনে আমরা ভূতে বিশ্বাস করি না ত বোধ করি আমাদের মূর্খতায় তাহারা আর হাসিয়া বাঁচে না।

তুমি হয়ত জানিতে চাও লেপচা ব্যাপারখানা কি, তারা কে? দারজিলিংএ যে কয় জাতি প্রধান নিবাসী আছে ইহারা তাহাদের মধ্যে এক জাতি। লেপচা, ভুটিয়া, পাহাড়িয়া এই তিন জাতিই এখানকার প্রধান বাসেন্দা। চেহারা ধরণ ধারণ তিন জাতিরই কাছাকাছি। লেপচারা এ দেশের আদিম নিবাসী, সম্ভবতঃ তিব্বত সীমানার লেপচিকাং স্থান হইতে ইহারা আগত বলিয়া ইহারা লেপচা নামে অভিহিত। ভুটিয়াদের অপেক্ষা ইহারা সুশ্রী—ইহাদের নাসিকা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা প্রায়ই সত্যবাদী বিশ্বাসী। তবে আজ কাল সভ্যতার সংস্পর্শে—মিথ্যাও যে ইহারা শিখে নাই এমন নহে। ইহাদের বিশ্বাস ইহাদের পিতামাতার আত্মা ভূত রূপে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে—এই ভূতগণই তাহাদের পূজ্য দেবতা। লেপচারা ক্রমেই ভুটিয়ার সহিত এক জাতি হইয়া আসিতেছে—খাঁটি লেপচা এখন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, দিন কতক পরে লেপচা জাতি সম্ভবতঃ একেবারেই লোপ পাইবে।

ভুটিয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্যজাত। সংখ্যাতেও এখানে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভুটিয়া কথাটায় যদিও ভূটানের অধিবাসী বুঝাইবার কথা কিন্তু এখন এখানে বৌদ্ধ মাত্রেই ভুটিয়া নামে অভিহিত। নেপাল হইতে যাহারা আসে—তাহারা নেপালি ভুটিয়া—তিব্বত হইতে যাহারা আসে তাহারা তিব্বতী ভুটিয়া ইত্যাদি, আর নেপালি হিন্দু যাহারা দারজিলিংএ থাকে তাহারা পাহাড়িয়া নামে অভিহিত।

এখানকার প্রায় সকলেরই মূর্ত্তি বেশ বলিষ্ঠ, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী খাঁদা খাঁদা চেপটা চেপটা, ঠোঁটগুলি বেশ পাতলা, সবশুদ্ধ দেখিতে একরকম নন্দ নয়।

আমরা উন্নত নাসিকা না হইলে অসুন্দর বিবেচনা করি, কিন্তু ভুটিয়াদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অন্য রকম। নাক চেপটা গালের হাড় উঁচু ইহা তাহাদের সৌন্দর্য্যেরই লক্ষণ।

শরৎদাস তাঁহার তিব্বতের একজন আলাপী বন্ধুর নিকট তাহাদের রুচির এইরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। স্ত্রীলোকের উন্নত নাসিকা তাহাদের চক্ষে অসহ্য।

এদেশের অনেক পুরুষের মুখ স্ত্রীলোকের মত একেবারে গোঁপদাড়ী হীন, কাহারো কাহারো চীনেম্যানদের মত সামান্য গোঁপদাড়ী। একে ভূটিয়াদের মেয়েপুরুষের একই রকম প্রায় জোরাল চেহারা, পরিধানেও একই রকম ঢিলে ঢালা কাপড়, আবার মেয়েদেরও লম্বা চুল, পুরুষদেরও লম্বা চুল,—ইহার উপর যে পুরুষের মেয়েলি মুখ—অর্থাৎ গোঁপ দাড়ি নাই তাহাকে অনেক সময় হঠাৎ পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, অন্ততঃ চিনিতে গোল বাধে। এরূপ স্থলে মেয়ে পুরুষ বাছিবার সহজ উপায় পিঠে কটা বিনুনি ঝুলিতেছে দেখা। ভূটিয়াদের চুল প্রায় কখনো খোলা থাকে না পুরুষেরা একটা বিনুনি স্ত্রীলোকের দুইটা বিনুনি করে। ভূটিয়াদের মধ্যে যাঁহারা লামা তাঁহাদের চুল কেবল আমাদের পুরুষদের মত ছোট। রাস্তা ঘাটে এমন ছোটলোক লামা অনেক দেখা যায়। তাহারা যে বাস্তবিক লামা অর্থাৎ পুরোহিত তাহা নহে। তবে যাহাদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহারাও ঐরূপ লামার বেশ করে, এবং নিজেকে লামা বলে।

ভূটিয়ারা ছোটবেলায় বিবাহ করে না, মেয়ে পুরুষের বিবাহ বয়স প্রায় একই। মেয়েরাও ১৬ হইতে ২৫।৩০ বয়সে বিবাহ করে—পুরুষেরা ২০র আগে বিবাহই করে না। বিবাহ বাপ মায়েই ঠিক করে, বরকন্যা সম্মত হইলে বিবাহ হয়। হিন্দুদের মত ভূটিয়াদের বর্ণবিভেদ নাই। কাহারো ছোঁয়া খাইতে ইহাদের বাধা কি কোন মাংস ইহাদের নিষিদ্ধ নহে। এমন কি পাহাড়িয়ারা অর্থাৎ যে সকল নেপালি হিন্দুরা এইখানে বাস করে ভূটিয়াদের সংসর্গে তাহাদেরও আচার ব্যবহারপ্রথা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মুর্গী প্রভৃতি অনেক রকম মাংসই ইহারা খায়। শুনিয়াছি ভূটিয়ারা নাকি কাঁচা মাংসও সময় সময় খায়। ভূটিয়ারা সাধারণত বড় অপরিষ্কার, বিশেষ তিব্বতী ভূটিয়ারা। শীতই তাহাদের এইরূপ অপরিষ্কারের একটি প্রধান কারণ। শরৎদাস গল্প করেন, তিনি তিব্বত যাইবার সময় পথে একজন স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিতে আসে, তাহার বয়স ৭০ কি ৭৫ এই রকম। সে বলিল এতটা বয়স হইয়াছে তাহার জ্ঞান হইয়া অবধি সে কখনো স্নান করে নাই। তাহার গায়ের ময়লা তাহাকে শীতে বেশ আরামে রাখে।

সাজ গোজের প্রতি কিন্তু এদেশের লোকের বেশ দৃষ্টি আছে। মেয়েদের এ দিকে ময়লা কাপড় কিন্তু চুলগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া বিনুনি করা। এখানে ইংরাজদের যখন ঘোড়দৌড় কিম্বা কোন রকম খেলা হয়—তখন মেয়েরা কত রকম রংএর কাপড় পরিয়া, পুরুষেরাও বেশ ভাল রকম সাজগোজ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিতে আসে। ফুল পরা ইহাদের সাজ গোজের একটি প্রধান অঙ্গ।

সিকিমে লিম্বু বলিয়া এক আদিম জাতি আছে শরৎদাস তাঁহার 'তিব্বত ভ্রমণে' ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

অরুণ এবং টামবর নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগকে নেপালীরা লিমবুয়ান বলে—এবং এই নাম হইতে ইহার আদিম অধিবাসীরা লিম্বু নামে খ্যাত। কিন্তু তাহারা আপনাদের ইয়াক্থন্গ বলে।

তিব্বতীরা ইহাদের সাং বলে—কেন না প্রবাদ এই, কতক লিম্বু তিব্বতের সাং নামক দেশ হইতে, কতক মধ্য দেশের কাশী হইতে আসিয়াছে এবং কতক সাংপুরের নিকটবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড পাহাড় গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে তীর্থযাত্রীরা এই গহ্বর সন্নিকটে আসিয়া নিজের ভাষায় কথা কহে না। এখানে আসিয়া কেহ মৌণী হইয়া থাকে, কেহ বা অন্য ভাষায় কথা কহে। কিন্তু কেন যে তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তকের এরূপ আজ্ঞা তাহা তাহারা জানে না।

ইহাদের বিবাহ পদ্ধতি বড় মজার। যে পুরুষ যে মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়—গান গাহিয়া তাহার সেই মেয়েকে ভুলাইতে হয়। এই অভিপ্রায়ে বিবাহ প্রার্থী পুরুষ তাহার মনোনীত কন্যাকে কন্যার পিতা মাতার অজানিত ভাবে হয় কোন বাজারে—কিম্বা যেখানে বাজার নাই—ঐরূপ কোন সজন স্থানে লইয়া যায়। সেখানে গিয়া পরস্পর গান গাহিতে থাকে। গান বেশ মজাড়ে রকম হওয়া চাই। যাহার গান অধিক সরস হইবে তাহারি জয়। যদি গানে পুরুষ হারিয়া যায় ত লজ্জিত হইয়া সে বিবাহের আশা ছাড়িয়া পলায়ন করে। আর যদি জয়ী হয় ত বিনা ওজরে কন্যার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া যায়। কন্যার সহিত বরাবর একজন সঙ্গিনী থাকে।

অনেক সময় আগে হইতেই স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা থাকে। আমাদের কৃষ্ণ একাকীই যমুনাতীরে রাধার মনোহরণ করেন নাই, জলাশয় নির্ঝর প্রভৃতি যেখানে স্ত্রীলোকেরা জল আনিতে যায়—সেই থানেই অনেক সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত কোর্টসিপ করিয়া আগে হইতে তাহাদের হৃদয় অধিকার করে। এরূপ স্থলে কন্যার গানের ক্ষমতা অধিক হইলে তাহার সঙ্গিনীকে দুই টাকা কিম্বা সেই মূল্যের কিছু জিনিস দিতে হয়—সে বলে যে পুরুষ জিতিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ পূর্ব্বানুরাগ স্থলে সাধারণতঃ একেবারেই গান গাওয়াগাওয়ি হয় না, পিতা মাতার অজানিত ভাবে বিনাড়ম্বরে নিজ গৃহে লইয়া কন্যাকে বর বিবাহ করে, বিবাহের পর কন্যার মা বাপ টের পায়।

অনেক সময় কন্যার পিতৃ গৃহে গিয়া পুরুষ কন্যার সহিত কোর্টসিপ করে।

কন্যার পিতৃগৃহে কোন পুরুষের প্রবেশ যে কঠিন তাহাও নয়। কন্যার নিকট-সম্পর্কীয় কাহাকে একটি মৃত শূকর উপহার দিলেই কন্যার পিতার গৃহ দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হয়।

যখন বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়—তখন বর ধনী হইলে সে একটি গরু কিম্বা শূকর মারিয়া তাহার মাথায় একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া সর্ব্বশুদ্ধ কন্যার পিতামাতাকে উপহার প্রদান করে। কিন্তু সাধারণত নির্ধন শ্রেণীর মধ্যে কন্যা বিবাহের পর স্বামীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া বাপের বাড়ী আসিলে তবে বাপ মা বিবাহের খবর জানিতে পায়।

বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধবেরা প্রত্যেকে কেহ এক ঝুড়ি চাল—কেহ এক বোতল মাড়ুয়া এইরূপ উপহার লইয়া আসে। সেই সকল বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত হইয়া বর ঢোলক বাজা-ইতে থাকে, কন্যা নৃত্য করে—অন্যেরাও নৃত্যে যোগদান করে। ইহার পর পুরোহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিবাহের প্রথম মন্ত্র—"পুরাতন কাল হইতে যে প্রথা প্রচলিত, রাজা রাজড়ারা যে প্রথার আজ্ঞা বহন করিয়া আসিতেছেন—সেই প্রথানুসারে আমরা আমাদের এই পুত্র ও কন্যাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিতেছি।"

পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন, বর তাহার এক হাতে কন্যার এক হস্ত ধরিয়া থাকেন এবং বরকন্যা দুজনেই তাহাদের অন্য দুই হাতে এক একটা মুর্গী ধরিয়া থাকে—মন্ত্র পাঠের পর পুরোহিত ঐ মুর্গীর গলা কাটিয়া তাহার রক্ত কলাপাতের উপর ধরেন। সেই রক্তপাত দেখিয়া বিবাহের পরিণাম সুফলপ্রদ হইবে কি না বিচার করা হয়। আর একটা কলাপাতায় সিন্দূর থাকে। বর তাহার মধ্যাঙ্গুলি এই সিন্দূরসিক্ত করিয়া পুরোহিতের কপালের নিকট দিয়া কন্যার নাসিকাগ্রে প্রদান করিয়া বলে 'কুমারি আজ হইতে তুমি আমার স্ত্রী'।

বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে বর সিন্দূরবিন্দু লইয়া পরে কন্যার ভ্রূতে এক চিহ্ন করিয়া দেয়। ইহার পর সেই হত মুর্গীকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়—যাহার ইচ্ছা কুড়াইয়া লয়। তাহার পর পুরোহিত কতকগুলি শুভাকাঙ্ক্ষী ভূতপ্রেতকে জাগ্রত করেন, ও তাহাদের কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বর কন্যাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন—

"তোমরা ইহার পর যতদিন জীবিত থাকিবে—স্বামী স্ত্রী রূপে জীবন যাপন করিবে"।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই ইহার উত্তর প্রদান করে—তোমাদের আজ্ঞা পালিত হইবে।

ইহার পর আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান যত বাড়ে পুরোহিতের লভ্যও তত বাড়ে। অবশেষে বন্ধুবান্ধবদিগের ভোজের পর কন্যার ধৃতহস্ত বর ছাড়িয়া দেয় তখন কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া যায়।

কন্যা ফিরিবার দুই তিন দিন পরে বরপক্ষীয় একজন লোক কন্যার গৃহে আগমন করিয়া তাহার পিতামাতার সহিত বিবাদ মিটায়। এই প্রথম কন্যার পিতামাতা বিবাহের কথা যেন জানিলেন এইরূপ ভাণ করেন। বরপক্ষীয় লোক প্রধানতঃ তিনটি জিনিস

আনে—এক বোতল মদ—একটা মরা শূকর এবং একটি রৌপ্য মুদ্রা। এই উপহার আনিয়া যেমন সমর্পণ করে—অমনি কন্যার পিতা মাতা ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে গালাগালি দেয় মারিতে উদ্যত হয়। বরপক্ষীয় তখন অনুনয় পূর্ব্বক তাহার রাগ শান্তির নিমিত্ত একটি মুদ্রা বাহির করে। পিতা মাতা তখন বলে—কেন আমার মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলে ? ইত্যাদি।

যখন পিতামাতার রাগ কমিয়া যায়—তখন বরপক্ষীয়-দূত কন্যার মূল্য স্বরূপ অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ বরের ক্ষমতা অনুসারে ১২০ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। টাকা না দিতে পারিলে এই অর্থের উপযুক্ত দ্রব্যা দি প্রদান করে। কিন্তু একটি শূকর সকল মূল্যেরই সহিত দেওয়া চাই।

পিতামাতারা উপহারে সন্তুষ্ট হইলে তখন গ্রামের মান্যগণ্যগণকে উপহার দিতে হয়—সাধারণত ১২ টাকা কিম্বা এই মূল্যের দ্রব্যাদি তাহাদের প্রদত্ত হয়।

তাহার পর কন্যাকে বরপক্ষীয়ের নিকট আনিবার সময় আসে, তখন পিতামাতা বলিয়া বসে "হায় আমাদের মেয়ে হারাইয়াছে। তা হাকে পাওয়া যাইতেছে না। কেহ যাউক গিয়া খুঁজিয়া আনুক।"

তখন আবার দুই টাকা কন্যার পিতাকে দিলে একজন কন্যাকে লইয়া আসে। কন্যা প্রায়ই এই সময় ভাঁড়ার ঘরে লুকাইয়া থাকে।

কেমন মজার বিবাহ বল দেখি ?

বর্ষা বাদল।

বর্ষা।

আষাঢ়ে নবীন মেঘ ছেয়েছে গগণ !
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন গরজন !
কুঁড়ে চালা গাছ পালা ফোট ফোট ছবি,
আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি।
সুনীল অম্বরে ক্ষীণ তড়িতের রেখা,
কষ্টি পাথরের গায় কষা স্বর্ণ লেখা।

বাঁকা টেরা বৃষ্টিধারা এগিয়ে আসে ধেয়ে।
আকুল পথিক এদিক ওদিক একেবারে নেয়ে,
আসে ছাট্ ভেজে খাট্ বন্ধ জানালা দ্বোর,
দিন দুপুরে সন্ধ্যা ঘরে বর্ষা আঁধার ঘোর।

বাদল।

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগণ,
সই—ছেয়েছে মরম তল।
দুরাশার মত বিজলী চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
কে মোরে ডাকিছে হায়!
প্রাসাদ, কুটীর, ফুটিয়া উঠেছে
গাছপালা উপবন।
বিস্মৃতির কোলে উঠেছে ফুটিয়া
তাহার মধুরানন।
জলদ সাগরে ভাসে বকাবলী
অমনি ভাসিয়া যাই,
চাতকীর মত আছিত চাহিয়া
কেন না উড়িতে পাই?
একা এ আঁধারে বিরহ পাথারে,
ভাসিতে পারিনে আর।
নিয়ে যা, আমারে নিয়ে যা সজনী
সে ডাকিছে বার বার॥

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

নানা কথা।

চীনে বাঘ পূজা।

যে চীন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সেই চীনে বাঘপূজা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, কারণ চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ঢুকিবার পর তাহার উপর এত কুসংস্কারের চাপ পড়িয়াছে যে তথায় প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে স্ফূর্ত্তিহীন। সেই সকল কুসংস্কার গুলি অতিশয় অদ্ভূত রকমের। তাহাদের মধ্যে বাঘের পূজা একটা।

এই বাঘপূজা চীনদেশে পুরুষেরা একরূপে ও এক উদ্দেশ্যে এবং স্ত্রীলোকেরা অন্য রূপে ও অন্য উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

যে সকল পুরুষেরা সতত জুয়া খেলিয়া থাকে তাহারাই বাঘের পূজা করে। তাহারা বাঘকে জুয়াখেলার দেবতা বলে। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পীড়িত সন্তান সন্ততির জন্য বাঘের পূজা দেয়।

পুরুষেরা যখন পূজা করে তখন, একটা ডানাওয়ালা বাঘ তাহার পশ্চাতের দুইটা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া এবং মুখে কি সম্মুখের দুই থাবা উঠাইয়া কোন মুণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে—এইরূপ ভাবের কর্দ্দম কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি অথবা প্রতিমূর্ত্তির বদলে শুধু একটা এইরূপ ছবি জুয়াখেলার ঘরে ঝুলাইয়া রাখে আর তাহার দুই পার্শ্বে দুইটা কৃত্রিম মুদ্রার তোড়া ঝুলাইয়া দেয়। ঐ বাঘের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সদত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। প্রত্যেক মাসের দোসরা বা যোলই তারিখে জুয়াখেলকেরা বাঘের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য মাছ মাংস ইত্যাদি নানা প্রকার খাদ্য বাঘের প্রতিমূর্ত্তির নিকট উৎসর্গ দান করে।

এইবার স্ত্রীলোকেরা কিরূপে বাঘের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, তাহা বলি। তাহারা অনেকটা আমাদের দেশের জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের ধাঁচে, একটা বাঘের উপর, তাহাদের এক দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বসাইয়া পরে বাঘের পূজা করে। তাহাদের এই বিশ্বাস যে বাঘের পূজা করিলে ছেলে পিলেদের যে সব কারণে ব্যামো হয় বাঘ সেই সমুদয় নষ্ট করিয়া দিতে পারে। যখন কোন ছেলে হাম কিম্বা বসন্ত রোগে মরমর হয় তখন তাহার আরোগ্যের জন্য ছেলের মা বাঘের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া কত ঘণ্টা করিয়া পূজা দিয়া থাকে,—কৃত্রিম মুদ্রা পোড়াইতে থাকে, ফল মূল শাক শবজি আনিয়া উৎসর্গ দেয় এবং শূকরের লেজ প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রদান করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে বাঘ শূকরের লেজ খুব ভাল বাসে।

ইয়া সিয়্যাট্ বা বীর ধর্ম্ম।

জন্তিয়া এবং খাসিয়া পর্ব্বতে এক প্রকার লোক বাস করে। তাহারা হিঙ্গ টেঙ্গি এবং খাসিয়া নামে প্রসিদ্ধ। যদিও অর্দ্ধ শতাব্দি অতীত হইতে চলিল খাসিসিমগণ (রাজা) ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, বৃটিষ সিংহ যদিও সামান্য জুতা ধরিয়া জন্তিয়া-রাজ রাজেন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন এবং লেফটেনাণ্ট বেডিং ফিলডের হত্যার ছুতায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নংখলাও অধিপতি খাসিরাজ তিরুৎ সিংহের রাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করতঃ হস্তগত করিয়াছেন, তথাপি খাসিয়া জাতি আজও বীরধর্ম্ম একবারে ভুলে নাই। তীর ধনুক লইয়া ক্রীড়া করা, ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা আজিও তাহাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই পুঞ্জির (অর্থাৎ গ্রামের) লোক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইয়াসিয়্যাট (তীর-খেলা) আরম্ভ করে। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক দলের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'কাছিয়ার কা-জিং-কিং-ইয়া' (মোরগ বলি) প্রদান করে, এবং ডিম ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ যুদ্ধের শুভাশুভ নির্ণয় করে। তৎপর প্রত্যেক দলের শত শত লোক তীর ধনুক হস্তে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কোন সুপ্রশস্ত উপত্যকা ভূমিতে উপনীত হইয়া "ক্যাও" "আও" "কো" প্রভৃতি বিকট চীৎকার করতঃ নৃত্য করিতে থাকে। ইতি মধ্যে দুই দলেরই সর্দ্দারগণ দুই স্থানে প্রায় দেড় হাত লম্বা দুইটী খুঁটী পুতিয়া দেয়। এই খুঁটীর অগ্রভাগে আধহাত কি কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা ঘাস একটী বোতলের ন্যায় মোটা করিয়া জড়ান থাকে। ইহাকে "কাসকুম" অর্থাৎ বাসা বলে। বলা বাহুল্য যে কাজিং কিংইয়ার সময় এই ঘাস খুঁটীর মাথায় জড়ান হয়। চেরাপুঞ্জির খাসিয়াগণ ইহাকে "ছঃ পুডুং" (তীর বিদ্ধ করিবার লক্ষ্য) বলে। তৎপর সর্দ্দারগণ স্ব স্ব দলের লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করতঃ খেলা আরম্ভ করে। "ড্যাং ছি ড্যাং; ত্বঃ ত্বঃ হলিঃ উ-জঙ্গ। ত্বঃ ত্বঃ পিন্ কলয় হলিঃ বিরিয়া বিরিয়া। ত্বঃ পিনডেই, ত্বঃ পিনডেই"। "ক্যাও" "অ্যাও" ইত্যাদি। "আমাদের প্রিয় বন্ধুগণ ঠিক হয়ে বসো'। আহ্লাদে নেচে নেচে ত্বরায় খেলা আরম্ভ কর। ঠিক করে লক্ষ্য বিদ্ধ কর; ঠিক করে লক্ষ্য বিদ্ধ কর। ("ক্যাও" "অ্যাও" বিকট চীৎকার শব্দ)।

ইহার পর খুঁটী হইতে প্রায় ৫০।৬০ হাত দূরে ধনুর্দ্ধরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসে ও খুঁটীর অগ্রভাগ স্থিত ছঃ পুডুং লক্ষ্য করিয়া এক দিক হইতে ক্রমে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। যাহাদের তীর ছাড়া হয় তাহারা অমনি ধনুক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এক পাশে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিগে অগ্রসর হয়। যদি কাহারও তীর লক্ষ্য বিদ্ধ করিল তবে তো আর আনন্দের সীমা নাই। অমনি গগন ভেদী "ক্যাও" "অ্যাও" "তূ—উ—উ" ধ্বনি মেদিনী কম্পিত করে। আর

খাসিগণ ধনুক উর্দ্ধদিকে তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং একতান রাগিণী ধরিয়া "জ্জং-উয়ং ডিং ডিং ডিং। সিটেং রিন্তি জ্জং উবং ডিং ডিং ডিং" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতঃ লম্ফে ঝম্পে নৃত্য করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়ে।" আবার বলিতে থাকে ফো পরটন্—সরকারীয়াপুরা। ঙ্গিন্ পিন-রূপ ডা সিটেং রিন্তি। রুং-ইয়ান—ড্যাকিউ—রেং ছাউ রেং" ইত্যাদি। হে সৈন্যগণ ধনুকার্দ্ধ দ্বারা আমরা তোমাদিগকে পরাজয় করিব—ইত্যাদি। এইরূপে এক পক্ষের তীর ছাড়া হইলে অপর পক্ষ তাহাদের লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। যে দলের লোক অধিক পরিমাণে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিয়াছে তাহাদেরই জয়। যে দল পরাস্ত হইল তাহাদের অবমাননার এক শেষ। তাহাদের প্রত্যককেই চারি পয়সা করিয়া দিতে হয়। জেতাগণ সেই পয়সা সংগ্রহ করিয়া পুঞ্জির কোন ব্যক্তিকেপ্রদান করে অথবা কাকিয়াড্ নামক খাসিয়া গৃহ-জাত সুরা ক্রয় করিয়া পান করে। এবং এইরূপে বিদ্রূপ করিয়া আনন্দে নাচিতে থাকে "দেখ উহারা নতশির হইয়া কাঁদিতেছে। ধনুকার্দ্ধ দ্বারা আমরা ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছি। কাল আবার এখানে এসো, এক তীরেই তোমাদের পরাস্ত করিব। পরাস্ত হইয়াছিস্ পুঞ্জিতে যাইয়া স্ত্রী পুত্রকে কি রূপে মুখ দেখাইবি।" ইত্যাদি।

যে সকল তীর লক্ষ্য বিদ্ধ করে নাই সেই সমুদায় একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। এবং যাহার যে তীর সে তাহা বাছিয়া লইয়া যায়। তারপর জেতাগণের এক জন লক্ষ্য বিদ্ধ-তীরগুলি হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে "স্বিম্—স্বিম্—স্বিম্" (লও লও লও) বলিতে থাকে। তাহার হস্ত হইতে যাহার যে তীর সে লইয়া যায়। অমনি দলস্থ অন্যান্য লোক আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠে এবং তাহার প্রশংসা করিতে থাকে। সর্ব্বশেষে একজন ঐ ছঃ পুড়ুং উঠাইয়া লয় এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে নৃত্য করে ও অপর পক্ষকে নিন্দা করে। সময় সময় গালি দিতেও ক্রুটী করে না। মধ্যস্থিত ছঃ-পুড়ুং-ধারী অতি সরু গলায় কেএ—এ—এ—এ—এ করিয়া তান ধরে। আর একজন কিছু মোটা গলায় বলিতে থাকে "ওয়ান হাংতা নম্বাই—ই—ই—ই'—কাল আবার এখানে আসিও—ও—ও।" এরূপে অপমানিত হইয়া অপর পক্ষ লজ্জায় ঘৃণায়, রাগ ও দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া অধোমুখে নিজ পুঞ্জি অভিমুখে প্রস্থান করে। ইহাতে সময় সময় রক্তপাতও হইয়া থাকে।

আবিসিনিয়ার ভূত।

আবিসীনীয়া প্রদেশের এবং আমাদের দেশের ভূতের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় দেশেরই ভূত উপদেবতা, উভয় দেশেরি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অনেকটা একই প্রণালী অনুসারে আরোগ্য করা হয়। কেবল ভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে উভয় দেশের অনুমান বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের দেশে মানুষ মরিয়া ভূত হয় তাহাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষই ভূত। ইহাদের দেশের কামারেরাই ভূত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। একজন সাধারণ লোকে যে লৌহের ন্যায় কঠিন দ্রব্যকেও গলাইতে তাহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা প্রস্তুত করিতে পারিবে তাহা ইহাদিগের মতে একেবারে অসম্ভব। ইহারা ভূতকে 'বুদ' বলে এবং বুদরা ইচ্ছা করিলে নানা প্রকার শরীর ধারণ করিতে পারে এইরূপ বিশ্বাস করে।

পার্কিন্স নামক একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী এই সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প লিখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহা হইতে দুই একটী এখানে উঠাইয়া দিতেছি। তিনি যখন আবিসীনীয়ায় ছিলেন তখনই ইহার কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়। অধিকাংশই শোনা কথা, তবে দুএকটি তাঁহার চক্ষের দেখা। পার্কিন্স সাহেবের পরিচিত দুইটী বালিকা একদিন জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল, সেখানে একজন কামারকে দেখিতে পাইয়া তাহারা তাহাকে বুদ বলিয়া উপহাস করে ও তাহার ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ তাহাকে ব্যাঘ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে বলে। কামার তাহা শুনিয়া তাহার কাপড়ের মধ্য হইতে কতকগুলি ছাই লইয়া নিজ গাত্রে ছড়াইয়া দিবা মাত্র তাহার শরীর ব্যাঘ্রাকারে পরিণত হইল। বালিকা দুটী ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাঘ তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া উচ্চহাস্য করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল, তখন বালিকারা ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

দুই জন বুদভ্রাতা এইরূপে পশু শরীর ধারণ করিয়া আপনাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিত। একজন একটী সুন্দর অশ্ব বা বৃষ বা গর্দ্দভ বা কোন প্রকার মূল্যবান পশুর আকার ধারণ করিলে তাহার ভ্রাতা তাহাকে বিক্রয় করিয়া আসিত। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে পশু পুনরায় মানবাকার ধারণ করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আপনার ভ্রাতার নিকট আসিত। তাহার পরদিন আবার বিক্রীত হইত ও প্রত্যাগমন করিত। কিছুদিন পরে লোকে তাহাদের চাতুরী বুঝিয়া ফেলিল এবং সেই পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে আর কেহ পশু ক্রয় করিত না। অবশেষে এক ব্যক্তি এই রহস্য ভেদ করিবার উদ্দেশে বুদ ভ্রাতাদ্বয়ের একজনের নিকট একটী সুন্দর অশ্ব ক্রয় করে এবং বিক্রেতা চলিয়া যাইবা মাত্র এককোপে তরবারি দ্বারা অশ্বটীকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

জানিতে ক্রেতার বাড়ীতে আসিয়া এই সংবাদ শুনিল। সেখানে সে কাঁদিল না, কিন্তু বাড়ী আসিয়াই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে সে বলিল তাহার ভ্রাতা গানাস নামক অসভ্যদের নিকট ঘোড়া ক্রয় করিতে গিয়া নিহত হইয়াছে।

আবিসীনিয়দিগের বিশ্বাস বুদেরা মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ইচ্ছামত আকার দিতে পারে। একবার একজন বৃদ্ধার মৃত্যুর পর একজন কামার কবররক্ষাকারীকে উৎকোচ দ্বারা বশ করিয়া তাহার নিকট হইতে বৃদ্ধার মৃত শরীর ক্রয় করিয়া লইল। ইহার কিছুদিন পরে লোকেরা দেখিল কামার কোথা হইতে চড়িবার জন্য একটী সুন্দর গর্দ্দভ আনিয়াছে কিন্তু এই গর্দ্দভের একটী বিশেষত্ব এই, মৃত বৃদ্ধার বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেই সে তথায় যাইতে চাহিত এবং তাহার পরিবারস্থ কাহাকেও দেখিলে নানা প্রকারে আহ্লাদ প্রকাশ করিত। বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনে ইহাতে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং একদিন জোর করিয়া কামার ও গর্দ্দভকে তাহাদের কুটীরে লইয়া আসিল। গর্দ্দভ এখানে আসিয়া পরিচিত ও আপনার ন্যায় ভাব প্রকাশ করায় জ্যেষ্ঠপুত্রের নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে এই গর্দ্দভ তাহার মাতা। তখন সে কামারকে বলিল এই গর্দ্দভকে পুনরায় মনুষ্য করিয়া দাও। কামার প্রথমে অসম্মত হইল কিন্তু ভয়ে ও লোভে অবশেষে সম্মত হইয়া নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। গর্দ্দভ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধার আকার ধারণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধার কনিষ্ঠ পুত্র ইহা দেখিয়া নিতান্ত কুপিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষা বিদ্ধ করিয়া কামারের প্রাণবধ করিল। তখনও বৃদ্ধার একটা পদের পরিবর্ত্তন হইতে অবশিষ্ট ছিল। তাহা আর হইল না। তাহার পর হইতে তাহার একটী মনুষ্য পদ ও একটী গর্দ্দভ পদ ছিল। পার্কিন্স সাহেব নিজে অবশ্য তাহাকে দেখেন নাই কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে বলিয়াছিল— তাহারা বৃদ্ধা ও তাহার পদ স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

আমাদের দেশে যেমন রাত্রিকালে নিশিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বনে জঙ্গলে লোকের প্রাণ বধ করে ইহাদের দেশেও বুদেরা ব্যাঘ্রাকার ধারণ করিয়া মনুষ্যকে ডাকে এবং জঙ্গলে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ বধ করে!

পার্কিন্স সাহেবের একজন দাসীকে একবার এইরূপে ভূতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

প্রথমতঃ দাসীর শরীর খারাব হইয়া মাথা ধরিল তাহার পর হিষ্টিরিয়া আরম্ভ হইল। সকলে বলিল দাসীকে ভূতে পাইয়াছে। সাহেব বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে হিষ্টিরিয়া ছাড়িয়া গেল, দাসী নিতান্ত অবসন্ন ভাবে পড়িয়া রহিল। এই অবস্থায় ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার রোগ সত্য কি না দেখিবার জন্য পার্কিন্স সাহেব তাহাকে সজোরে চিমটী কাটিতে লাগিলেন কিন্তু সে

যে কিছু অনুভব করিতেছে তাহা বোধ হইল না। তাহার মুখের একটী শিরাও কাঁপিল না। পার্কিন্স সাহেব তাহার নাকের নিকট এক শিশি তীব্রগন্ধ ঔষধ ধরিলেন, তাহাতেও তাহার কোন সাড় হইল না। তখন তিনি কতকগুলি টুকরা কাপড় সেই ঔষধে ডুবাইয়া তাহার নাকের রন্ধ্রে গুঁজিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

এই সময় পার্কিন্স সাহেব দেখিলেন দাসী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি সজোরে মুষ্টির মধ্যে এরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে কেহ না দেখিতে পায়। লোকেরা তাঁহাকে বলিল 'যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বুদেদের বিশেষ প্রিয় বস্তু সেই জন্য তাহারা তাহা কাহাকেও দেখিতে দেয় না।' পার্কিন্স লোকদিগকে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিতে বলিলেন। অনেকে খুলিতে চেষ্টা করিল, কেহই পারিল না। যাহারা খুলিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে দাসী দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। পার্কিন্স সাহেব নিজে খুলিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন তিনিও পারেন নাই। পার্কিন্স সাহেবের নানা প্রকার যাদুগ্রথিত একছড়া মালা ছিল। তাহার মধ্যে বুদ তাড়াইবার যাদু ছিল না। কিন্তু ভূত তাড়ান যাদু বলিয়া পার্কিন্স সাহেব মালাগাছটি দাসীর মুখের উপর রাখিয়া দিলেন কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে আরও অনেকে মন্ত্রৌষধ অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু একজন মাত্র একটী ঔষধ জানিতে পারিয়াছিল। সেই মন্ত্রৌষধি দাসীর মুখে দিবা মাত্র দাসী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল "এ যাদুর ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ইহা দ্বারা আমি তাড়িত হইব না।"

এখানে দাসীর মুখ দিয়া ভূতে কথা কহিতেছে বুঝিতে হইবে।

পার্কিন্স সাহেব গামলা গামলা জল আনিয়া তাহার শরীরে ঢালিলেন তাহাতেও কোন প্রকার ফল হইল না। রাত্রিতে দাসী ঘুমাইল না আরও অধীর হইয়া পড়িল এবং ক্রমাগত কথা কহিতে লাগিল। একবার সে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বলিল যে "আমার অসুখ করে নাই বা আমাকে ভূতেও পায় নাই আমি কেবল একবার বাহিরে বেড়াইতে যাইব।"

পার্কিন্স সাহেব তখন তাহার অসুখ ভুলিয়া গিয়া বলিলেন "তা বেশ ত আগে সকাল হউক তখন যাইও"। লোকেরা হাসিয়া বলিল 'বুদ তাহাকে জঙ্গলে লইয়া যাইয়া বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার মুখ দিয়া ঐ কথা বলিতেছে।'

এই সময় কুটীরের নিকট বাঘের ডাক শোনা গেল। লোকেরা বুঝিল বুদ বাঘের বেশে দাসীকে ডাকিতেছে। দাসী পাছে চলিয়া যায় ভয়ে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত পদ সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল এবং কুটীরের ভিতর ও বাহিরে প্রহরী নিযুক্ত করিল। সে দিন সমস্ত রাত্রি বাঘ নিকটেই ছিল ও মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছিল। পার্কিন্স সাহেব অনেক দিন আবিসীনীয়ায় ছিলেন কিন্তু আর কখনও রাত্রে অমন বাঘ ডাকিতে শুনেন

নাই। এদিকে বাঘ যখনি ডাকে দাসী বাহিরে যাইবার নিমিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে কিন্তু প্রহরীদের হাত এড়াইয়া ও হস্ত পদ বদ্ধ থাকায় যাইতে পারে না। একবার প্রায় এক ঘণ্টা কাল আর তাহার ব্যস্ততার কোন ভাব দেখা গেল না—প্রহরীরা ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় বাঘ কুটীরের একেবারে নিকটে আসিল, দাসী আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ প্রহরীর ঘুম ভাঙ্গায় দাসী পুনরায় বন্দী হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দরজা খোলার সময় দাসীর হাতের পায়ের বাঁধন ছিল না। সেই দৃঢ় বন্ধন কিরূপে খুলিয়া গেল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না!

সে দিন সমস্ত রাত ও তাহার পর দুই দিন পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিল। এই সময়ের মধ্যে দাসী জলস্পর্শ করে নাই।

পার্কিন্স সাহেব বলেন ইহা যে প্রতারণা নহে তাহা নিশ্চয়। উপবাস অত্যাচার কি কেহ ইচ্ছা করিয়া শুধু শুধু সহ্য করে? ইচ্ছা করিয়া কি কেহ বাঘের মুখে প্রাণ সমর্পণ করিতে যায়?

আমাদেরও ইহা প্রতারণা মনে হয় না। গুপ্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অনেক রূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করে—এই ঘটনাটি তাহারি দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে রোজারা যেমন নানা প্রকার কঠিন কর্ম্ম করাইয়া ভূত ছাড়ায় আবিসীনীয়াতেও ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সেই প্রকার নানা কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত করান হয়। পার্কিন্স সাহেবের আর একজন দাসীকে একবার বুদে পায়।

দাসী প্রথমতঃ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিল। পরে হঠাৎ উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটী করিতে লাগিল। এমন সময় একজন লোক বুদ ছাড়ান যাদু লইয়া আসিল। সেই জন্যই দাসী পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া ছুটাছুটী করিতেছিল। এই যাদু দ্বারা বুদকে নানা প্রকার ভয় দেখান হইলে পর বুদ বলিল 'আমাকে কিছু খাবার দাও তাহা হইলে আমি যাইব'। পার্কিন্স সাহেব কুকুর বিড়াল শৃগাল মুরগী প্রভৃতির বিষ্ঠাপূর্ণ একটা পাত্র দাসীর অজ্ঞাত স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। দাসী কুকুরের মত আঘ্রাণ করিয়া সেই স্থল বাহির করিল ও নিতান্ত ব্যস্ততা ও পরিতৃপ্তির সহিত এই অখাদ্য ভক্ষণ করিল। তার পর বুদ ছাড়িয়া গেল।

এক এক সময় বুদেরা নিতান্ত দরিদ্র লোকের নিকট রাজবেশ রাজঅলঙ্কার ইত্যাদি চাহিয়া বসে। ভূতাবিষ্টের আত্মীয়েরা তখন অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যের নিকট তাহা ভিক্ষা করিয়া আনে। কিছুক্ষণ এই কাপড় পরিধান করিবার পর ভূতের তৃপ্তি হয় তখন সে ছাড়িয়া যায়। ভূতের ইচ্ছা পরিতৃপ্তির এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও অনেক দেখা যায়।

দেবলরাজা।

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অনুমান ৩২ ক্রোশ পূর্ব্বস্থিত "নবগঙ্গা" নদীর ক্রোশৈক দক্ষিণে "ঘোড়ানাচ" নামক স্থানে দেবলরাজার বাসভূমি। অদ্যাপি এই স্থানে দেবলরাজার বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃশ্য গুলি দেদীপ্যমান, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড গড়খাই। অতি কষ্টে বেতস কণ্টক ভেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এখনো জঙ্গল মধ্যে স্তূপাকার ইষ্টকরাশি। প্রায় একক্রোশ লইয়া এই বাটীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই মহাপুরুষ জাতিতে কুম্ভকার। কথিত আছে এই বর্ণশঙ্করজাত মহাত্মা একদিন আপন জাতীয় ব্যবসার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে ছিলেন এমন সময় একজন সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "দেবল আমি তোমার খোদিত মৃত্তিকা রাশির মধ্যে এই রত্নটি পাইয়াছি, গ্রহণ কর, যাহাতে এই রত্ন ছোঁয়াইবে তাহাই স্বর্ণ হইবে"—

এই বলিয়া সন্ন্যাসী একটি পরশ পাথর তাহার হস্তে দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই হইতে দেবল নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া পরশমণির সাহায্যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া লইলেন। আর তাঁহাকে মৃত্তিকা খনন মৃত্তিকা মর্দ্দন করিতে হইল না। তৎকালিক যশোহরে তিনি একজন বিখ্যাত ধনীর মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া উঠিলেন।

এই পৃথিবী অর্থের দাস—অর্থে না হয় এমন কার্য্য নাই—দেবল প্রভূত অর্থ দ্বারা নিজে নিজে রাজউপাধি ক্রয় করিয়া লইলেন। তবে এ রাজউপাধি বর্ত্তমান কালের ইংরেজ রাজ্যের উপাধির ন্যায় নহে। দীন দুঃখীকে অকাতরে দান, দেবসেবায় দান, অতিথিসেবা স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলার্থে দান করিয়া জনসাধারণের নিকট রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তখন তাঁহার রাজোচিত আসবাব সংগ্রহ হইতে লাগিল—দেশের পর দেশ তাঁহার আয়ত্ত হইল। কত কত লাঠি শড়কীওয়ালা তাঁহার দেউড়িতে প্রহরী নিযুক্ত হইল—তিনি প্রকৃত একজন রাজার ন্যায় আধিপত্য করিতে লাগিলেন। দেশে তখন এক প্রকার একটানা-ভাব ছিল কোন ব্যক্তি একটুকু প্রাধান্য লাভ করিতে পারিলেই দিল্লীর বাদশাহকে মানিত না, নিজেই স্বাধীন হইয়া বসিত। দেবলও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি আর নবাব বা বাদসাহকে কর দিতেন না, আপনি স্বাধীন ভাবে এই মহকুমার "বিলবুরনি" "বিলকানেজী" "বিলসাতরা" প্রভৃতি কয়েকটী বিলের নিকটস্থ ভূভাগ এবং পরগণে ননদীর কথকাংশ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে যে দেবল রাজার ধনাদি বিলকানেজীর মধ্যে থাকিত। এই স্থানে অদ্যাপিও একটী জলাশয় আছে, আজ কাল উহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "মাগুরা" "ধলহরা" প্রভৃতি গ্রামের লোকে কহিয়া থাকে যে ক্রিয়াকর্ম্মের সময় ঐ

দেবল রাজের স্থাপিত কোন দেবালয় এ প্রদেশে নাই। তবে শুনিয়াছি "জগদল" গ্রামের কালীবাড়ি নাকি ইঁহারি স্থাপিত। শুনা যায় এই স্থান হইতে প্রাচীন "ভূষণা" পর্য্যন্ত বিস্তৃত গভীর জঙ্গল ছিল। আধুনিক "নবগঙ্গা"নদী তখন একটী সামান্য খালমাত্র ছিল। এই বিস্তৃত বন প্রদেশের মধ্যভাগে একদিন এক দল বীর পুরুষ সহসা "ঘোড়ানাচ" আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইল কিন্তু সাহসী তেজস্বী দেবল রাজের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। যে স্থানে এই সৈন্যদল পরাজিত হয় উহারি নাম বর্ত্তমান "শক্রজিৎপুর"। এই প্রবাদ বাক্যটীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আর কিছুই স্থির করিতে পারি না। যে সময় বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যকে শাস্তি দিতে মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গলায় আইসেন—তখন তাহার সহিত কৃষ্ণনগরের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার আসিয়াছিলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমন সময় নৌকাপথে এই স্থান দিয়া গিয়াছিলেন কেন না যশোহর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার তৎকালে আর অন্য পথ ছিল না এবং সৈন্য যাতায়াতের এই পথই যে তৎকালে একটী প্রশস্ত পথ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই; যেহেতু নলডাঙ্গা রাজবংশের ইতিবৃত্তে পড়িয়াছি বিষ্ণুদাস হাজরার অভ্যুদয়ের সময় মুরশীদাবাদ হইতে ঢাকায় সৈন্য যায়। সুতরাং ভবানন্দের সৈন্য যে এই পথে যাইবে তাহার বিচিত্র কি? এবং তাহারই মধ্য হইতে কতিপয় উদ্ধত সৈনিক যে দেবল রাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহাই সম্ভব। বস্তুতঃ মাগুরা মহকুমার এই অংশে যে কয়েকটী প্রাচীন গ্রাম আছে তাহা যে কোন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তির স্থাপিত তাহা সহজেই বুঝা যায়, অনুমান হয় দেবল রাজ ইহার স্থাপয়িতা। বিনোদপুর, নারায়ণপুর, বিষ্ণুপুর, রাজাপুর, রাজগঞ্জ, রাজপাট, প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের নামের সঙ্গে কেমন একটু ঐতিহাসিক গন্ধ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই স্থানগুলি "সীতারামের" স্থাপিত। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সীতারামের জন্ম হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কারণ প্রবাদ আছে দেবল রাজা বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক লোক ছিলেন। যাহা হউক দেবলরাজ শক্রজিৎপুর নগর সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গৌরব লাভ করিলেন।

প্রকৃতিসুন্দরী বড় স্বার্থপরা, আপনার শ্রী ভিন্ন অপরের শ্রী তাহার প্রাণে সহে না; জগতে যদি মনুষ্য শ্রীলাভ করিল অমনি মহামারী প্রলয় রাজবিপ্লব প্রভৃতি অনুচরকে ডাকিয়া তাহাদের শ্রীহীন করিতে পাঠান। যে দিন হইতে শক্রজিৎপুর নগর সংস্থাপিত হইল সেই দিন হইতেই দেবল বাঙ্গালার নবাবের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন। একদিন প্রত্যূষে ২৫ জন সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া দেবলকে প্রাতঃস্নানের সময় ধরিয়া নবাব দরবারে লইয়া চলিল। শান্তিপ্রিয় দেবল তাহাতে কোন বাধা না দিয়া সৈন্যদিগের সহিত যাইবার সময় পরিবারদিগকে কহিয়া গিয়াছিলেন যে আমি এক জোড়া কবুতর

লইয়া চলিলাম আমার আসিবার অগ্রে যদি এই দম্পতিকে দেখিতে পাও ভাবিও আমার জীবন শেষ হইয়াছে, তখন আপন আপন সম্মান ও স্ত্রীদিগের সতীত্ব রক্ষা করিও।” এই বলিয়া দেবল নবাব দরবারে রওয়ানা হইলেন। যাইতে যাইতে একদিন দৈবাৎ কবুতর যুগল উড়িয়া ঘোড়ানাচে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল! রাজার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া দেবলপত্নী একটী বৃহদায়তন কাষ্ঠ-সিন্দুকে স্বপরিবারে বদ্ধ হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন। পতিপরায়ণা দেবলপত্নী যে জলাশয়ে এই লোমহর্ষণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন তাহাকে লোকে “সাতপুকুর” কহে। অদ্যাপি ঐ সপ্ত দীর্ঘিকা বর্ত্তমান।

এদিকে দেবল নবাব দরবারে কর দিবার অঙ্গীকার করিয়া বাটি আসিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজলক্ষ্মী সাতপুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছে, পরিবারবর্গ কেহই নাই, পুরি নির্জ্জন নীরব! তখন তিনি সেই সন্যাসীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, তাঁহার রাজপুরি শ্মশানে পরিণত হইল।

এ মহাপুরুষের বংশাবলি নাই। কেবল মাত্র কয়েকটী জনপ্রবাদ এবং লুপ্তপ্রায় বাটীর ভগ্নাবশেষ তাহার নাম মাত্র ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিবাহ ও স্ত্রী-সম্বন্ধে ইংরাজি পুরাতন প্রবচন।

সে কালে ইংলণ্ডের লোকে মনে করিত যে “অন্ধের স্ত্রীর মুখে রং-চং দিবার আবশ্যক নাই।” প্রণয়ী প্রণয়-পাত্রের ত্রুটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ—যত দিন কেহ কাহাকে ভাল বাসে ততদিন সে তাহার দোষ দেখিতে পায় না—কাজেই সে সুন্দর হৌক বা কুৎসিৎ হউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তাঁহার প্রণয়-পাত্র তাঁহার কল্পনা-পটে এরূপ সুন্দর করিয়া চিত্রিত যে আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য কোন কৃত্রিম আয়োজনের আবশ্যক করে না। তাই আর একটা প্রবচন এইরূপ আছে—

“সুন্দর সুন্দর নয়
যদি নাহি মনে লয়।
“Fair is not fair,
But that which pleaseth”—যেমন আমাদের একটা কথা আছে—“যার প্রতি মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।”

সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের দুষ্টবুদ্ধির ইঙ্গিত করিয়া একটা প্রবচনে এইরূপ বলে—“যে

ব্যক্তির স্ত্রী সুন্দরী, তাহার দুইটা অপেক্ষা অধিক চক্ষু থাকা আবশ্যক"—ঐ মর্ম্মের একটা প্রবচন ইটালি ভাষায় আছে—তাহা হইতে এই ইংরাজ চলিত কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে—

"Whose horse is white, whose wife is fair,
His head is never void of care."

সাদা ঘোড়া, স্ত্রী-রূপসী, আছে ঘরে যার
এক দণ্ড চিন্তা-ছাড়া নহে মন তার।

সে কালে সুন্দরী স্ত্রীদিগকে কর্ম্মিষ্ঠা বলিয়া মনে করিত না—একটা প্রবচন আছেঃ—

"A fair woman and a slashed gown
'Will find some nail in the way."

ছেঁড়া-খোঁড়া সাড়ি আর সুন্দরী স্ত্রীলোক,
ঘটাবেই পথমাঝে পেরেক-আটক।"

যে সুন্দরী যে পরিমাণে নিজ রূপের গৌরব করে সেই পরিমাণে সে ঘরকন্নার কাজে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, এই মর্ম্মের একটা প্রবচন এইরূপ আছে—

"The more women look in their glasses,
The less they look to their houses."

যে রমণী আয়নায় মুখ দেখে যত
ঘর-কন্না দিকে দৃষ্টি কম তার তত।

সুন্দরী, কুৎসিৎ, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা, বেঁটে এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ স্বভাব এই বিষয় উল্লেখ করিয়া একটা প্রবচন আছে যথাঃ—

"Fair and foolish black and proud
Long and lazy, little and loud."

রূপসী নির্ব্বুদ্ধি অতি, কালো অহংকারী
লম্বা মেয়ে আল্‌সে বড়, বেঁটে চিৎকারী।

ছেলে পিলেকে মানুষ করা, রুটি তৈরি করা, কাট্‌না কাটা, বাঁটনা বাটা ইত্যাদি ঘর কন্নার কাজে মন্ দেওয়া সুগৃহিনীর লক্ষণ—এই মর্ম্মের একটি প্রবচন আছে—

"The foot on the cradle and hand on the distaff.
Is the sign of a good house wife"

ছেলের দোলায় পা, আর চরকাতে হাত,
এই হচ্চে জেনো তুমি, ভাল গিন্নির ধাত।

আর একটা—"The woman that's honest her chiefest delight.
Is still to be doing from morning till night."

স্ত্রীলোক যে ভাল তার মুখ্য এই সুখ
দিবারাত কাজ করা না হয়ে বিমুখ।

সেকালে ইংরাজেরা স্ত্রীলোকদের বাহিরে যাওয়াটা ভাল বোধ করিত না—একটা প্রবচন আছে—

"A woman oft seen, a gown oft worn
Are disesteem'd and held in scorn."
আটপৌরে সাড়ি আর সদা-দৃষ্টা নারী
হৃতশ্রদ্ধা ঘৃণা তারে লোকে করে ভারি।

আর একটা "He that lets his wife go to every feast, and his horse drink at every water, will neither have a good wife nor a good horse." অর্থাৎ—যে আপনার স্ত্রীকে সকল মোচ্ছবে যেতে দেয় আর আপনার ঘোড়াকে সকল জলাশয়ে জলপান করিতে দেয়, না তার ঘোড়া ভাল থাকে, না তার স্ত্রী ভাল থাকে। আর একটা প্রবচন এইরূপ আছে—

"The wife that expects to have a good name
Is always at home, as if she were tame."

অর্থাৎ— যে বনিতা করে ভাল নামের প্রয়াশ
পঙ্গু মত সরবদা ঘরে তার বাস।

স্ত্রীলোকের শঠতা বিষয়ে প্রবচন আছে—

"There's no mischief in the world done
But a woman is always one"

অর্থাৎ— নষ্টামি যেখানে যত পৃথিবীতে হয়
স্ত্রীলোক তাহার মধ্যে আছেন নিশ্চয়।

আর একটাঃ— "Women's jars
Breed men's wars"

অর্থাৎ নারীর বিবাদে
পুরুষের যুদ্ধ বাধে।

স্ত্রীলোক এমনি শঠ যে যতটুকু স্ত্রী ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে জানিতে দেয় তা ছাড়া ঘরে কি ঘটিতেছে স্বামী কিছুই জানিতে পারেনা এই মর্ম্মানুযায়ী গুটিকতক প্রবচন আছে যথা—

"The good man is the last to know
what is amiss at home."

অর্থাৎ কোন ত্রুটি হলে মিন্‌সে
জান্‌তে পায় সর্ব্ব শেষে।

আর একটাঃ—"When the good man's from home
The good wife's table is soon spread !"

অর্থাৎ মিন্‌সে হলে ঘরের বার
গিন্নি পাড়ে পাতের সার।

আর একটাঃ— "Women laugh when they can
And weep when they will"

অর্থাৎ হাসে নারী পারে যত
কাঁদে নারী ইচ্ছে-মত।

আর একটাঃ— "He that tells his wife news
is but newly narried"

অর্থাৎ স্ত্রীকে যে খবর বলে
নিশ্চয় সে সদ্য-বিবাহিত।

আর একটাঃ— "Women commend a modest man
but like him not."

অর্থাৎ—স্ত্রীলোকেরা সলজ্জ ব্যক্তিকে প্রশংসা করে বটে কিন্তু তাহাকে তাহাদের ভাল লাগে না।

স্ত্রীজাতির চপলতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবচন আছে যথাঃ—

"The love of a woman and a bottle of wine
Are sweet for a season and last for a time"

মদিরা-বোতল আর প্রমদা-প্রণয়
কিছুকাল মিষ্টি লাগে—ক্ষণকাল রয়।

"A woman's mind and winter-wind often change" ?
স্ত্রীলোকের মন আর শীতের বাতাস বদলায় সদা।

"Women wind and fortune are ever changing"
অর্থাৎ স্ত্রীলোক, বায়ু আর ভাগ্য ইহাদের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে।

"Maids say nay and take—a kiss,
a ring or an offer of marrage."

"কুমারীরা বলে 'না' অথচ লইতে ছাড়ে না কি কি ?—না, চুম্বন, আংটি আর বিবাহের প্রস্তাব।"

"The maid that taketh yieldeth."
—যে কুমারী দান গ্রহণ করে সে বশে আইসে।"

"The maid that laughs, is half taken."

—যে কুমারী একবার হাসিল, সে জানিবে অর্দ্ধেক অধিকৃত হইয়াছে।

"The woman who wavers is lost"

—যে স্ত্রীলোক একটু ইতস্তত করে, তার সর্ব্বনাশ।

"Husbands are in heaven whose wives chide not."

—সেই সকল স্বামী স্বর্গে, স্ত্রীরা যাহাদিগকে ধম্‌কায় না।

"Swine, women, and bees cannot be turned"

অর্থাৎ—শূয়োর, স্ত্রীলোক আর মৌমাছি (গোঁ ধরিলে) ইহাদিগকে কিছুতেই ফিরানো যায় না।

"Every man can tame a shrew but he that hath her"

অর্থাৎ—প্রত্যেক পুরুষ আপনার ছাড়া অন্যের মুখরা প্রচণ্ডা স্ত্রীকে বশে আনিতে পারে।

"One tongue is enough for a woman"

অর্থাৎ—স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা জিহ্বাই যথেষ্ট।

"Silence is tho best ornament of a woman."

অর্থাৎ—নীরবতাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার।

"Maidens must he seen and not heard"

অর্থাৎ—কুমারীরা দেখিবার জিনিস, শুনিবার জিনিস নহে।

In the husband wisdom, in the wife gentleness.

অর্থাৎ—স্বামীতে বিজ্ঞতা, স্ত্রীতে নম্রতা।

স্ত্রীলোকেরা হৃদয় হইতে যে পরামর্শ দেয় তাহাই অনেক সময়ে উপাদেয় এবং বুদ্ধি করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পরামর্শ দেয় তাহার উপর তত নির্ভর করা যায় না—এই মর্ম্মে একটা স্পেন দেশের প্রবচন আছে—যথা—

তোমার স্ত্রীর প্রথম পরামর্শই গ্রহণ করিবে, দ্বিতীয়টা গ্রহণ করিবে না।

মার্টিন লুথর এই গানটি গাইয়াছিলেনঃ—

"He who loves not woman, wine and song
He is a fool his whole life long"

সুরা সুর্ সুন্দরীতে নাহি যার মন
আহাম্মক সেই লোক চিরটা জীবন।

বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবচন—

"Honest men marry soon
wise men not at all"

ভাল মানুষে শীঘ্র বিবাহ করে
বিজ্ঞ লোকেরা আদপে না।

Sir John More, বিবাহকে একটা থলিয়ার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন উহাতে ১০০টা সর্প ও একটা বাণ মৎস্য আছে—যাহাদের ভাগ্য ভাল তাহারা এই থলিয়ার মধ্যে হাত দিয়া বাণ মৎস্য প্রাপ্ত হয়—কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই সর্প হস্তগত হয়। একটা প্রবচন আছে—

"বিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিও
কিন্তু তুমি নিজে অবিবাহিত থাকিও।"

আর একটাঃ— "He hath tied a knot with his tongue that he can't untie with his teeth.

অর্থাৎ—জীহ্বার দ্বারা (বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিয়া) এমন একটা গাঁট বাঁধিয়াছেন, যে দন্তের দ্বারাও এখন তাহা খুলিতে পারেন না।

"When a couple are newly married the first month is honey-moon and smick smack ; the second is, hither and thither ; the fourth is the devil take him that brought me and thee together.

অর্থাৎ—নবদম্পতীর প্রথম মাসটা হচ্চে মধুর বিজন-বাস ও চুমাচুমি ; দ্বিতীয় মাস—এখানে সেখানে; চতুর্থ মাস—যে আমাদের মিলন ঘটিয়েছে সে যাক্ জাহান্নমে।

এলিজেবেথ্-যুগের একজন ইংরেজ লেখক Sir John Davis বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন —

"Wedlock hath oft compared been
To public feasts, where meet a public rout
Where they that are without would fain go in
And they that are within would fain go out."

উৎসব ভোজের সহ বিয়ার তুলনা
অনাহূত রবাহূত ভীড় যথা জমে।
যাহারা বাহিরে থাকে, ঢুকিবারে চাহে,
যাহারা ভিতরে থাকে চাহে বাহিরিতে।

আমাদের যেমন একটা চলিত কথা আছে "দিল্লিকা লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া যো নখায়া ওবি পস্তায়া।"

"Maids want nothing but husbands, and when they have them, they want every thing."

অর্থাৎ কুমারীরা স্বামী ছাড়া আর কিছুই চাহে না; স্বামী যখন প্রাপ্ত হইল, তখন আবার সকলই চাহিতে থাকে।

"Women, priests and poultry never have enough."

অর্থাৎ—স্ত্রী পুরুত আর মোরগ এদের যত দেও কিছুতেই আশ মেটে না।

প্রেমের অতিমাত্র উচ্ছাস অধিককাল স্থায়ী হয় না বরং পরে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়—এই মর্ম্মের উপদেশ কোন কোন প্রবচনে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"Love me little, love me long."
ভালবাস আমারে অল্প অল্প করিয়া
ভাল বাস আমারে বহুকাল ধরিয়া।
"Hot love is soon cold"—

তপ্ত ভালবাসা শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়।

বেশি সাধিলে উল্টা উৎপত্তি হয়—এই মর্ম্মের একটা প্রবচন আছে যথা—

"Follow love, and it will flee
Flee love and it will follow thee"—
প্রেমের দিকে তুমি ধাও প্রেম যাবে ভেগে
ভাগো তুমি প্রেম হতে, ফিরিবে সে বেগে।

ছেলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে গেলে এই প্রবচনটি তাহাদের প্রতি প্রযুষ্য—যথা;—

"Marry in haste
and repent at leisure".

অর্থাৎ　তাড়াতাড়ি কর বিয়ে
পস্তাও রয়ে-বসে।

"In wooing and thriving men
should take counsel of all the world."

অর্থাৎ স্ত্রীর ও শ্রীর অনুসরণে সকলের নিকট হইতেই পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিবাহের সাধ্য সাধনায় অধিক কাল হরণ না করিয়া শীঘ্র বিবাহ করা উচিত (শুভস্য শীঘ্রং) এই মর্ম্মে—

"Happy is the wooing
That is not long in doing"
সেই সাধাসাধি বড়ই বেশ
যেটা নাকি হয় শীঘ্রই শেষ।

যে নিম্ন লিখিত প্রবচনটি প্রণয়ন করিয়াছিল তাহা'র মানব-প্রকৃতি জ্ঞানটা খুব টনটনে ছিল বলিতে হইবে।

"He that would the daughter win
Must with her mother first begin."
পাইতে চাহে যে রূপসী ঝীকে
সুরু করুক সে মায়ের দিকে।

অদূরদর্শী প্রণয়ীদিগের বিষয় এইরূপ আছে—

"He who marries for love
without money hath good
nights and sorry days."—

যে সঙ্গতি হীন ব্যক্তি শুদ্ধ প্রেমের খাতিরে বিবাহ করে তার রাত ভাল যায় কিন্তু দিন ভাল যায় না। আর একটাঃ—

"Before you marry
Be sure of a house
Wherein to tarry."

অর্থাৎঃ— হতে চাও যদি কনে বর
ঠিক্ কর আগে বাসের ঘর।

বিবাহের গুরুতর পরিণাম।—

"A man's best fortune or his
worst is his wife".

স্ত্রীই পুরুষের হয় পরম সৌভাগ্য নয় চরম দুর্ভাগ্য।—আর একটাঃ—

"Wedlock is a padlock"—
বিয়ের কথা যতই ভাবি
শুধু মনে হয় তালা চাবি।
"Wedding and ill-wintering tame
Both man and beast."

অর্থাৎঃ— বিয়ের হাওয়া, কঠোর পৌষ
পুরুষ পশুরে মানায় পোষ।

একটা প্রবচন সন্তানাদি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"Children are certain cares, and very uncertain comforts."

ছেলে পিলেতে নিশ্চিত ভাবনা ও অত্যন্ত অনিশ্চিত সুখ।

Solomon বলেন—"House and riches are the inheritance of fathers: but a prudent wife is from the Lord"

অর্থাৎ—গৃহ ও ধন সম্পত্তি পিতৃ-পিতামহের দান কিন্তু সুপত্নী ভগবান-দত্তা।

"Marriages are made in heaven."

অর্থাৎ—বিবাহ স্বর্গেই অনুষ্ঠিত হয়।

"In time she comes whom God sends."

অর্থাৎ ঠিক্ সময়ে স্ত্রী ঘরে আসে, বিধাতাই তাহাকে পাঠাইয়া দেন। আমাদের এইরূপ একটা চলিত কথা আছে "বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ!"

A little house well filled
A little land well tilled
And a little wife well willed.

অর্থাৎ—সেই পুরুষই সুখী যার আছে—

বাড়ি টুকু ঠাসা
জমি টুকু চষা
স্ত্রীটির মন খাসা।

যাই বল যাই কও স্ত্রীভিন্ন পুরুষের চলে নাঃ—

"Wives must be had
Be they good or bad."

স্ত্রী ঘরে চাইই চাই
ভাল মন্দ হোক্ যাই।

সমানে সমানে বিবাহ ভাল এই মর্ম্মে একটা প্রবচন আছে—

"Like blood, like good, like age
Make the happiest marriage."

সমরক্ত সমধন সমবঃয়ক্রম
দেখি বিয়া করে যেই সুখী সেই জন।

পুত্র কন্যার বিবাহ করার সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"Marry your sons when you will
Your daughters when you can."

অর্থাৎ তোমার ছেলেদের বিবাহ দেও, যখন তোমার ইচ্ছা—মেয়েদের বিবাহ দেও যখনই পার।

"Marry your daughters betimes
Lest they marry themselves."

অর্থাৎ—তোমার মেয়েদের সকাল সকাল বিবাহ দেও—পাছে শেষে তারা আপনার বিবাহ আপনারাই দেয়।

একজন অষ্টাদশ শতাব্দির লেখক এইরূপ লিখিয়া ছিলেনঃ—

Cries celia to a reverend dean
"What reason can be given
Since marriage is a holy thing
That there is none in heaven ?"
"There are no women" he replied.
She quick returns the jest:
"Women there are, but I'm afraid
They cannot find a priest."

সুধায় সুশীলা "ভাল পাদ্রি মহাশয়
জিজ্ঞাসি একটি কথা তোমার নিকটে
বিবাহ যেহেতু অতি পবিত্র আশ্রয়
স্বর্গেতে বিবাহ তবে নাহি কেন ঘটে ?"
উত্তরিল পাদ্রি "নাহি স্ত্রীজাতি সেথায় ;"
সুশীলা তখনি দিল জবাব তুরিত
"স্ত্রী জাতি আছয়ে সেথা কিন্তু বড় দায়
নাহি মিলে তথা কোন পাদ্রি পুরোহিত।"

জর্মন দেশীয় কবি বেসের (Besser) আদমের নিদ্রা বিষয়ে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন—

"He laid him down and slept and from his side
A woman in her magic beauty rose,
Dazzled and charmed he called that woman "bride"
And his first sleep became his last repose."

শয়ন করিয়া পরে হইলা নিদ্রিত;
মোহিনী উঠিল-এক হ'তে পার্শ্ব দেশ,
"বধূ" বলি ডাকে তারে হয়ে বিমোহিত।
সুপ্তি সে প্রথম আর শান্তি সেই শেষ।

আর একজন জর্মন কবি, মুখরা স্ত্রীর উপর এইরূপ গোরস্তম্ভ-লিপি লিখিয়াছিলেন—

"Here lies, thank God, a woman who
Quarrelled and stormed her whole life through ;

Tread gently o'er her mouldering form,
Or else you'll raise another storm."

বাঁচা গেছে, হেথা শুয়ে নারী একজন
ঝগ্‌ড়ায় কেটেছে যার সারাটা জীবন।
পদক্ষেপ কর ধীরে ওর ভষ্ম পরে
নতুবা উঠাবে ঝড় আবার সজোরে।

একজন ইংরাজ দোকানদার তার মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি গোরস্তম্ভ-লিপি লিখিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পর সেই কবিতা-লিপিটি তার গোরস্তম্ভে লিখিত হয়। তাহা এই—

"Youthful reader passing by,
As you are now, so once was I;
As I am now, so you must be
Therefore prepare to follow me."
যুবক পাঠক পান্থ কর অবধান
এখন যেমন তুমি আমিও ছিলাম;
যে দশা আমার এবে হবে তব তাই
ঠিক হয়ে থাক, পিছে আস্‌তে হবে ভাই।

পরে সেই গোরস্তম্ভের উপর উপরোক্ত কবিতাটির নিম্নে তাহার বিধবা স্ত্রী এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"To follow you I am not content
Unless I know which way you went.
অনুগামী হতে তোমা নাহি মোর মতি
যদি না জানি গো তব কোন্ দিকে গতি।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেলিগার্ড।

বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্রোহীদের পরিণাম।

এত দিন যে অনল ধীরে ধীরে অলক্ষ্য ভাবে ধূমায়িত হইতেছিল, ২৮এপ্রেল প্রাতঃকালে তাহার প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল; কিন্তু ইহা দেখিয়াও উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বড় একটা চেতনা জন্মিল না। এই ক্ষুদ্র বীর্য্য অগ্নিকণা যে মহা প্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা—ভূকম্পের পূর্ব্বলক্ষণ ও মহাঝটিকার প্রথম বাতাস—একথা সকলে বুঝিতে পারিলেন না।

এই ঘটনার পর তিন দিন নিরাপদে কাটিয়া গেল। ২রা মে উপরোক্ত অনির্দ্দিষ্ট পুরাতন দলকে প্যারেডের জন্য ময়দানে একত্রিত করা হইল—কি সর্ব্বনাশ! তাহারা দলপতির সকল আজ্ঞাই যেন বিরক্তি ও ক্রুটির সহিত পালন করিতে লাগিল এবং টোটা কাটিতে নূতনের ন্যায় পুরাতনের মনেও যথেষ্ট অসন্তোষ বীজ জন্মিয়াছে দেখা গেল।

লেফ্‌টেনান্ট ওয়াটসন এই দলের কর্ত্তা ছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি এই ব্যাপার উপরিতন কর্ম্মচারী ব্রিগেডিয়ার সাহেবের গোচর করিবার মনস্থ করিলেন। সিপাহীরা একথা শুনিতে পাইল, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য, জাতিনাশাশঙ্কা, অবাধ্যতা-সংকল্প প্রভৃতি মন হইতে বিদূরিত হইল। "সিপাহী নিমকের অবাধ্য হইয়াছে" ভবিষ্যতের এ অপবাদ যেন তাহাদের পক্ষে অসহনীয় বলিয়া বোধ হইল। এতকাল যে দলে তাহারা সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছে—বরাবর নিমকের মর্য্যাদা রাখিয়া আসিয়াছে—নতশিরে বিনাবাক্য ব্যয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে—সচ্চরিত্রতার ও কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার পাইয়া আসিয়াছে—এই রিপোর্ট দ্বারা তাহাদের সকল সুযশ এক মুহূর্ত্তে লয় পাইবে—ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। সকলে দল বাঁধিয়া ওয়াটসনের কাছে গেল। কাহারাও মুখে বিষাদ ভাব, কাহার ও মুখে অনুশোচনা-চিহ্ন, কাহারও চক্ষে অনুতাপঅশ্রুজল—তাহারা সকলে গিয়া সাহেবকে বলিল—"এবারের মত তাহাদের এ দুর্ণাম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক, আর তাহারা কখনও এরূপ অবাধ্য হইবে না। সন্ধ্যার সময় পুনরায় তাহাদের ময়দানে একত্রিত করা হউক, যদি তাহারা টোটা না কাটে তখন যাহা কর্ত্তব্য করিলেই হইবে"।

ওয়াটসন সাহেব অনুতাপ বিদগ্ধ সিপাহীদের এবার মার্জ্জনা করিলেন ও ব্রিগেডিয়ারকে এ বিষয় জানাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

তিনি বুঝিলেন না অনুতাপে, অনুশোচনায়, মর্ম্মজ্বালায় সিপাহীগণ এখন যে কথা স্বীকার করিল, দুই মুহূর্ত্ত পরে—জাতিনাশাশঙ্কা মনে প্রবল হইলে ইহা সাগর স্রোতে তৃণ খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। বাস্তবিক সিপাহীরা নিজেও একথা বুঝিতে পারে নাই—তাহারা বালির বাঁধে গঙ্গার স্রোত বেগ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সামান্য বিতংসে মত্ত হস্তীকে শৃঙ্খলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দুই ঘণ্টা পরে তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা তাহারা তখন বুঝিতে পারে নাই।

সেই দিন বেলা চারিটার সময় পূর্ব্বকথামত ওয়াটসন সাহেব তাহাদের পুনরায় ময়দানে একত্রিত করিলেন। সিপাহীরা সৈনিক নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়া[illegible] সাহেবের ইঙ্গিতক্রমে সুবাদার রামদয়াল চোবে একটী টোটা লইয়া সকলের [illegible] আসিয়া বলিল—"এই দেখ আমি তোমাদের সকলের আগে টোটা কাটিতেছি। টোটার ভিতর অস্পৃশ্য কিছুই নাই" কিন্তু সে কথা শুনিয়া সেই দলস্থ কতকগুলি সিপাহী গোলমাল করিয়া বলিয়া উঠিল "সুবাদার! টোটা কাটিতে হয় তুমিই কাট আমরা ইহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিব না"।

রামদয়াল চোবে এই দর্পময় উত্তরে পূর্ব্ব সাহস হারাইল—হস্তস্থিত টোটা মুখে দিতে সাহস করিল না। সাহেবকে বলিল "আমার আশা করিবেন না, আমার দ্বারা একার্য্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।"

ওয়াটসন সাহেব অগত্যা নিরুপায় হইয়া এই সমস্ত ঘটনা উপরিতন কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর করিলেন। সিপাহীগণ দর্পিত ভাবে সে দিনকার মত ছাউনীতে ফিরিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার সাহেব আসিয়া তাহাদের সন্দেহের অমূলকতা সম্বন্ধে অনেক বুঝাইলেন—বিদ্রোহের পরিণাম "প্রাণদণ্ড" ইহা বলিয়াও ভয় দেখাইলেন—সিপাহীরা কেবল চুপ করিয়া রহিল, কোন কথার উত্তর দিল না। তাঁহার কথাটা তাহারা এইবার বুঝিয়াছে ভাবিয়া ব্রিগেডিয়ার মনকে প্রবুদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্ত গণিত অনির্দ্দিষ্ট দল, লক্ষ্ণৌ হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে মুসাবাগ নামক স্থানে অবস্থিতি করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল তাহারা ততই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌএর পার্শ্ববাহিনী গোমতীর অপর পারে লক্ষ্ণৌ ক্যাণ্টনমেণ্ট। এইস্থানে কয়েক দল দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থান করিত। ৩রা মে তারিখে উপরোক্ত অনির্দ্দিষ্ট দলের গুপ্ত মন্ত্রণায় স্থির হইল—ক্যাণ্টনমেণ্টের অষ্ট চত্বারিংশ গণিত সিপাহী দলকে এই বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা একখানি পত্র লিখিয়া অতি সংগোপনে সেই দিন মধ্যাহ্নে লক্ষ্ণৌএ উক্ত সিপাহীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই অষ্টচত্বারিংশ গণিত দলের মধ্যে অনেকেই সপ্তগণিত দলের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে প্রস্তত ছিল। কিন্তু মুসাবাগের দলের বুদ্ধির দোষে সমস্ত ব্যাপারই পণ্ড হইয়া গিয়া সকল কথা জানাজানি হইয়া পড়িল।

ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহী দল ইংরাজদিগের উপর যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ছিল বটে—টোটা কাটিতে এ পর্য্যন্ত কোন প্রকাশ্য আপত্তি করে নাই বটে—কিন্তু তাহারা সামান্য উত্তেজনায় যে মহা বিদ্রোহে লিপ্ত হইতে পারে এবিষয়ে সপ্তগণিত দলের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ইহা জানিত না সেই দলে এখন অনেক সিপাহী আছে যাহারা তাহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবে। একথাটা না জানার জন্য যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তাহাতে সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল। সপ্তগণিত দলের দূত ক্যাণ্টনমেণ্টের যে সিপাহীর হাতে পত্র দিল সে সেই পত্র লইয়া তাহার হাবিলদারকে দেখাইল। হাবিলদার আবার সুবাদারকে দেখাইলেন! পত্রের মধ্যে লেখা ছিল—"তোমরা যে কোন তামাশায় আমাদিগকে লিপ্ত হইতে বলিবে, তাহাতে আমরা রাজি আছি। ভাই সকল! যদি আমাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বল আমারা তাহাতেও প্রস্তুত, যুদ্ধ করিতে বল তাহাতেও পিছপাও নই।" সুবাদারের দল মন্ত্রণা স্থির করিলেন, বেশী গোল যোগে কাজ কি? উহাকে বাঁচাইতে গেলে, এবং এ কথা চাপিয়া রাখিলে পরে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে খোসনাম ও পুরস্কারের খুব সম্ভাবনা। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সিপাহীকে আটক করিয়া, প্রধান সেনাপতির নিকট এই সকল মন্ত্রণা জ্ঞাপন করিল।

স্যর হেন্‌রি এ সকল ঘটনা অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন মহা ঝটিকার প্রথম বাত্যা উঠিয়াছে, কাল মেঘের প্রথম ছায়া পড়িয়াছে, ভূকম্পের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এ ঘটনা স্রোত ফিরায় কার সাধ্য? তবে চেষ্টার ত্রুটি কোন মতেই হইতে পারে না। তিনি যে সকল কার্য্যে হাত দিতেন, কখনও তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং জলদ গম্ভীর স্বরে আজ্ঞা দিলেন—"একদল ইংরাজ পদাতী, একদল গোলন্দাজ ও কয়েকদল দেশীয় সৈন্য মুসাবাগে পাঠাইয়া দিয়া, বিদ্রোহী সপ্ত সংখ্যার দলকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া বিদায় দেওয়া হউক। যদি তাহারা কোন প্রকার অসম্মতি বা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে—তাহাদের যেন কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।"

এই সমস্ত গোলন্দাজ অশ্বারোহী ও পদাতি সেনারা যখন মুসাবাগে পৌঁছিল, বিদ্রোহীরা তখন জানিতে পারিল তাহাদের সর্ব্বনাশের জন্য এই আয়োজন হইয়াছে। ছাউনীর সম্মুখে কামানগুলি পাটের গোলা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া (ভয় প্রদর্শনের জন্য *

---

* উক্ত সৈনিক দল যে দিন লক্ষ্ণৌ ক্যাণ্টনমেণ্টে গুপ্তচর পাঠায়, সেইদিন মধ্যাহ্নে একটা জনরব উঠে যে তাহারা মুসাবাগের সমস্ত ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবে। এ সংবাদ শুনিয়া সকলেই সাবধান হইলেন। ক্যাপ্টেন মেগেন নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ সেনানী স্বগৃহে বসিয়া পোষাক পরিতেছিল এমন সময়ে চারি জন সশস্ত্র সিপাহী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। চুপ করিয়া থাকিলে বা কোন প্রকার

কি ?) সজ্জিত করিয়া রাখা হইল, গোলন্দাজেরা বারুদের পলিতা হাতে করিয়া উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইল। বোধ হইল যেন তাহারা কেবল মাত্র আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী ও পদাতিক। এইরূপে ব্যূহ রচনা করিয়া ইংরাজ উন্মত্ত-সিপাহীদিগকে আটক করিলেন। অনির্দ্দিষ্ট দলের সিপাহীগণই এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়া ভীত হইয়াছিল বটে—কিন্তু তাহাদের সংকল্প পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প সুতরাং এই সকল বিপুল সৈন্যের সহিত যুঝিতে যে তাহারা নিতান্ত অশক্ত ইহা তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল। তাহারা ভাবিল একটাতোপে যে কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে তাহার জন্য দলশুদ্ধ গোলন্দাজ কেন।

উচ্চপদস্থ একজন সৈনিক কর্ম্মচারী তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, তাহারা প্রথমতঃ অস্বীকার করিল। এমন সময়ে সহসা ব্যূহ সন্নিহিত জনেক গোলন্দাজ অসতর্কতা বশে একটী কামানের বাতি (Port fire †) প্রজ্জলিত করায় সহসা চারিদিকে আলোকমালা বিকীর্ণ হওয়াতে—ছাউনীর বৃক্ষান্তরালস্থ সিপাহীগণ ভাবিল তাহাদের জন্য বুঝি তোপ দাগিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে অনেকের মনে যথেষ্ট ভয় সঞ্চার হওয়াতে তাহারা সশস্ত্রে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের পলাইতে দেখিয়া দল শুদ্ধ সিপাহী দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ধাবমান সিপাহীগণকে ধরিবার জন্য স্যার হেনরি লরেন্স ইংরাজ অশ্বারোহী পাঠাইলেন। অশ্বারোহী দেখিয়া যাহারা পলাইতে ছিল তাহারা ফিরিল, যাহারা দূরে গিয়াছিল—ইংরাজ অশ্বারোহী গিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিল। যাহারা ছাউনীতে ছিল তাহাদের পাহারার ভিতর রাখা হইল। স্যার হেনরী তাহাদের সকলকেই অস্ত্রশস্ত্র সৈনিক চিহ্ন প্রভৃতি সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া ছাউনীতে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা তাহাই করিল। সে রাত্রের মত সেই অস্ত্র-হীন সেনাদিগকে পাহারা দিতে কতকগুলি সৈন্য ও ইংরাজ কর্ম্মচারী তথায় রহিলেন। এবং জয়োৎফুল্ল সৈন্যবৃন্দ মহানন্দে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া চলিল। সকলেই আনন্দোৎফুল্ল—কেবল স্যার হেনরীর মুখে যেন একটা দুশ্চিন্তার কাল-ছায়া পড়িয়াছে। তিনিই এ জয়োল্লাসে তত উৎফুল্ল নহেন। তিনি ভাবিতেছিলেন একদিকের আগুণ নিভিল—অপর দিকের উপায় কি ?

বাধা দিবার চেষ্টা করিলে সাহেব সেই থানেই গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইতেন। কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব তাঁহার জীবন রক্ষা করিল। তিনি সিপাহীদিগকে ধীরভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ একা আমায় মারিয়া ফেলিলে তোমাদের কি ফল হইবে ? আমি মরিলে আর একজন আমার স্থানে আসিবে এবং তোমাদেরও পরিণাম বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। তবে কেন আমায় বধ করিয়া অস্ত্র কলঙ্কিত কর" সিপাহীরা এ কথায় বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

† কামানে আগুন দিবার জন্য সোরা গন্ধক প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত এক প্রকার পলিতা।

লক্ষ্ণৌএ মহাদরবার। পরদিন অপরাধীদিগের বিচার আরম্ভ হইল। সিপাহীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছে। পত্র লিখিয়া ৪৮ নং দলের সমস্ত সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। স্যর হেন্‌রী লরেন্স সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া ইহার প্রতিবিধানার্থে দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করিলেন—যাহারা নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিতে বাসনা করিলেন। এই উপলক্ষে লক্ষ্ণৌএ একটী মহাদরবার সূচনা হইল। এই দরবারে বড় বড় সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীগণ, দেশীয় সম্ভ্রান্তগণ, দেশীয় উচ্চ পদস্থ সৈনিকবৃন্দ, নিম্ন শ্রেণীর সিপাহীগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। কেহ বা পুরস্কার লইতে আসিল, কেহ বা তামাসা দেখিতে ছুটিল—কেহ বা দরবারের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিল। রেসিডেন্সির সম্মুখস্থ ময়দানে কার্পেট বিছান হইয়াছে, তাহার উপর সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও বিলাতি পুরুষগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সর্ব্ব মধ্যে কমিশনার সাহেবের উন্নত আসন—সম্মুখে বস্ত্রাবৃত মেজের উপর পুরস্কারের দ্রব্য সাজান—উপরে নীলাকাশের নিম্নে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ, সেই চন্দ্রাতপের নিম্নে অসংখ্য জনস্রোত এবং ঐ জনস্রোত মধ্যে অধিকাংশই সিপাহী শ্রেণীভুক্ত।

সহসা এই জন-স্রোত সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল—আবার কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ রূপে স্থির ভাব ধারণ করিল। কমিশনার স্যর হেনরি লরেন্স দেশীয় প্রধান ও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরস্কার বিতরণের পূর্ব্বে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দীতে জলন্ত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায়, তীক্ষ্ণ যুক্তির সহায়ে দেশীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন—"সৈনিকগণ! কতকগুলা দুষ্ট লোকে চারিদিকে রটাইতেছে যে কোম্পানী তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু এ কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা বোধ হয় তোমাদিগকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাঁহারা বংশানুক্রমে কোম্পানী সরকারে চাকরী করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বলিতে পারেন—আমাদের এই শত বর্ষ ব্যাপী শাসন কালের মধ্যে আমরা কখন কোন প্রকারে দেশীয়দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করিয়াছি কি না? তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পড়িয়াছে—তাহারই এই বিষয়ের যথার্থতা আরও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবে। দেখ মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে—আরঞ্জিব বাদসার ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে হায়দর আলি কি প্রকারে পাশব বলের সহায়ে শত সহস্র হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তোমাদের পবিত্র দেবমন্দির সকল—সেই অত্যাচারী রাজারা চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিকৃত করিয়াছিলেন—পবিত্র দেব দেবীমূর্ত্তি সকল জবরদস্তিতে স্পর্শ করিয়া তাহাদের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছিলেন—দেবালয় সকল চূর্ণীকৃত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই স্থানের উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া

গিয়াছিলেন। বাদসাহী আমলের কথা ছাড়িয়া দাও—আমাদের নিজের আমলের ঘটনা দেখ—তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ রণজিৎ সিংহ কোন মুসলমানকে মস্‌জিদ হইতে উচ্চৈঃস্বরে নমাজ পড়িতে দিতেন না। কিন্তু আমাদের এই শত বৎসরের মধ্যে এমন কোন উদাহরণ দেখাইতে পার যাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? অত কথায় কাজ কি এই লক্ষ্ণৌএ নবাবী আমলে শত বৎসরেও হিন্দুগণ সহরের মধ্যে একটী দেব মন্দির স্থাপনে সাহসী হইত না।"

"ক্ষমতায়, ধনে, বুদ্ধিকৌশলে, ও রাজ্যের বিস্তৃতিতে কোন রাজা এই বিশাল জগতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমকক্ষ? পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন মহাসমুদ্র নাই—যাহার উপর না ইংরাজ রণতরী নৃত্য করিতেছে—এমন কোন রাজ্য নাই যেখানে কিছু না কিছু ব্রিটিশ সেনা আছে। একবার তোমরা গত ক্রিমিয়া যুদ্ধ মনে করিয়া ইংরাজের বল বিক্রমটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। * * * যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের যে কোন স্থানে দশ সহস্র বিলাতি সৈন্য সমাবেশ করান যাইতে পারে।"

"কোম্পানী স্বীয় সৈন্য বৃন্দের উপর কতদূর অনুরক্ত, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দে কত দূর মনোনিবেশ করেন ও তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি কতদূর নিরপেক্ষ—যদি দেখিতে চাও তবে একবার পেন্সনভোগী সিপাহীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ! প্রশংসার সহিত, সম্মানের সহিত, অক্ষত যশের সহিত কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া এখন তাহারা কেমন সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে।" * * * *

"নানা জাতিপূর্ণ বীরপ্রসবিনী ভারতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য কোন চিন্তা নাই। এক দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়—এক মাসের মধ্যে আবার নুতন দল সংগঠিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট একজন সিপাহী চাহিলে পঞ্চাশ জন আবেদন করে। গত সপ্তাহে লক্ষ্ণৌএ আমরা ৩০০ শত সিপাহী সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু তিন হাজার দরখাস্ত আসিয়াছিল। সকল দেশে সকল রাজাই বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত সৈন্যের পালনার্থে বিশেষ যত্নবান। বঙ্গদেশীয় সৈন্য দল যে প্রকার কোম্পানীর সেনা দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—এরূপ আর কোন দলই নহে। কত সঙ্কটাপন্ন স্থলে—কত দুর্গম সমরক্ষেত্রে কতশত বিপাদের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা যশের মুকুট পরিয়াছে। তোমরা সেই সৈন্য দল ভুক্ত। বহু সংখ্যক দলপতি তোমাদের সমরক্ষেত্রে পরিচালন করিয়া আমার ন্যায় পক্ককেশ হইয়াছেন—তোমাদের অধিনায়কত্ব করিয়া, তোমাদের স্বোপার্জ্জিত যশের অংশভাগী হইয়া, তোমাদের জয়োল্লাসের সহিত বালকের ন্যায় আনন্দে মাতিয়া কি শিবিরে, কি প্রান্তরে, কি উপত্যকায় কি সংকটময় গিরিপথে কি মরুক্ষেত্রে, কি সমর প্রাঙ্গণে সকল অবস্থায় তোমাদের সহিত সম সুখ দুঃখ ভাগী হইয়াছেন। এই সভাক্ষেত্রে এমন দুই চারিজন পক্ককেশ সেনানায়ক উপস্থিত আছেন

যাঁহারা তোমাদের কার্য্যদক্ষতা, সমর পটুতা ও কোম্পানীর প্রতি আনুরক্তির স্বাক্ষ্য স্বরূপ। নিশ্চয় জানিও আমরা তোমাদের মিত্র বই শত্রু নই। আমাদের পরস্পরের স্বার্থ অতিশয় দুশ্ছেদ্য। তোমাদের সুখে আমাদের সুখ, তোমাদের পরাজয়ে আমাদের পরাজয়—তোমাদের কলঙ্কে আমাদের কলঙ্ক—তোমাদের যশে আমাদের যশ। তাই বলিতেছি দুষ্ট লোকের প্রলোভনে আপাত মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া স্বস্ব যশ কলঙ্কিত করিও না। যে সৈন্য দল আমাদের রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহিত সমক্ষেত্রে এই শত বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, শত শত বিপদময়, অনিশ্চিত জয়লাভেও যাহারা জয়লাভ করিয়া আমাদের মুখ রক্ষা করিয়াছে, নর্ম্মদা হইতে ইরাবতী, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের অনেক সমরক্ষেত্রে যাহারা দুর্দ্ধর্ষ অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—কাবুলের গিরিপথে, ব্রহ্মদেশের প্রান্তরে, চীনের প্রশস্তক্ষেত্রে, হিমালয়ের উপত্যকায়, পঞ্চনদের সমতল ভূমে যে সৈন্য দল জয়শ্রীর কোলে বসিয়া আমাদের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছে, আজ আমরা কেমন করিয়া তাহাদিগকে অনুপযুক্ত ও অবিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করিব। তাই বলিতেছিলাম তোমাদের অমূলক সন্দেহ দূর করিয়া প্রকৃতিস্থ, স্থির বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হও” * * *

ইহার পর বিশ্বাসী ও সেই দিনের পুরস্কারার্হ সৈন্য দলকে সম্বোধন করিয়া লরেন্স সাহেব আরও অনেক কথা বলিলেন, পরে তাহাদের পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হইল। তাহারা সকলের সম্মুখে প্রফুল্ল মুখে গর্ব্বিত ভাবে স্বস্ব যোগ্যতা অনুসারে বিচিত্র অসি, উষ্ণীষ নগদ মুদ্রা ও অন্য প্রকার দ্রব্যাদি পুরস্কার পাইল। পুরস্কার ব্যতীত ইহাদের সকলের পদোন্নতিও হইল।

দরবার নিয়মিত সময়ে ভাঙ্গিয়া গেল। স্যর হেন্‌রি লরেন্স রেসিডেন্সি প্রাসাদে, শিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীগণ স্বস্ব কুঠীতে, সৈন্যগণ ছাউনীতে ও নগরবাসীরা স্বস্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সকলেরই মনে লরেন্স সাহেবের সেই জ্বলন্ত ভাষার ভাব একটু না একটু রহিয়া গেল। সিপাহীরাও ক্ষণ কালের জন্য আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িল।

মিরাট বিদ্রোহ ও স্যর হেনরির সতর্কতা। দরবার ভাঙ্গিয়া গেল যাহারা পুরস্কার পাইয়াছিল তাহারা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে চলিয়া গেল—অনেক সিপাহী তাহাদের ন্যায় রাজভক্তি দেখাইয়া পুরস্কার লইবার বাসনা করিল। যাহারা মনে মনে বিরুদ্ধ ভাব কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল, স্যর হেন্‌রির উদারতায়, যুক্তিপূর্ণ উপদেশে, তাহারাও সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল। যাহাদের মনে সন্দেহ ধূমায়িত হইতেছিল—তাহারা সে সন্দেহ কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিল। যাহারা এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিমকের বাধ্য ছিল তাহারা

আরও বাধ্য থাকিতে সংকল্প করিল। ফলতঃ স্যর হেন্‌রির যুক্তিময় উপদেশের ক্ষণস্থায়ী ফল ফলিল—দরবারের উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধিলাভ করিল। * সিপাহীরা সভাভঙ্গে স্বস্ব ছাউনীতে উপস্থিত হইয়া এই সকল বিষয়ে নানাবিধ আন্দোলন করিতে লাগিল।

১২ই মে লক্ষ্ণৌএ দরবার হয় কিন্তু ১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহ ব্যাপার সম্পূর্ণ ফূর্ত্তি লাভ করে। ১৩ই মে—তাহার পরদিনে স্যর হেন্‌রি মিরাটের বিদ্রোহ ও দিল্লীর অবরোধ বার্ত্তা অবগত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকল বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, লক্ষ্ণৌএ যে কোন মুহূর্ত্তে যে মীরাট ব্যাপার অভিনীত হইতে পারে ইহা তাঁহার ধারণা ছিল—সুতরাং একদল সৈন্য আনিয়া রেসিডেন্সির সম্মুখস্থ স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। গোমতীর উপরে যে লৌহ সেতু ছিল তাহা এই সৈন্য দলের আয়ত্তাধীনে রহিল। একদল সিপাহী "মচ্ছীভবনে" পাঠান হইল। মচ্ছী ভবন অনেক কালের পুরাতন সুদৃঢ় অথচ ভগ্ন প্রায় দুর্গ। গোমতীর উপর যে নৌসেতু ছিল তাহাও সরাইয়া রেসিডেন্সির সম্মুখে রাখা হইল।

(ক্রমশঃ)

বাঁশরী।

আর কেন দাও গলে মালতীর মালা—
　　বেজেছে বাঁশরী ওই!
কি হবে অলকা গুচ্ছ ললাটে সাজায়ে,
　　বাঁশরী বেজেছে সই!
সখি, কেন মিছে বাঁধিতেছ শিথিল কাঁচলি,
　　চরণে নূপুর ভার,

বাঁশার ফুকার ডাকে রাধা রাধা করি
　　রহিতে পারিনে আর!
যতন করিয়া দিলে নয়নে কজ্জল,
　　কপোলে চন্দন রেখা,
নয়ন সলিলে হের ভেসে যায় আঁখি,
　　কলঙ্ক রহিল লেখা।

---

* এই উপদেশের ফল বাস্তবিক ক্ষণস্থায়ী। দুই এক সিপাহী রাস্তায় গিয়া বলিয়াছিল—"ইংরাজ আমাদের ভাবগতিক দেখিয়া ভয় পাইয়া এইরূপ করিতেছে—পুরস্কারের প্রলোভনে সিপাহী ভুলাইতেছে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই—এই মহাদরবারে যে সকল সিপাহী পুরস্কৃত ও উন্নত পদ লাভ করিয়াছিল—কয়েক দিন পরে তাঁহাদেরও আবার বিদ্রোহি অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

কাহারে সাজাবি তুই নেহার আপনা—
শিহরিছে অঙ্গ তোর,
খসিছে হাতের ফুল, অলসিছে আঁখি,
আরতির নাহি ওর।
আর কেন অঙ্গরাগ চিকন ভূষণ—
সজনি চললো চলি,
বাঁশরী ডাকে সে যেথা চললো সেথায়
চরণে কুসুম দলি।
কাজ কি রতনে মোর কাজ কি ভূষণে,
বাঁশীতে বেজেছে নাম,
চল সখি চল চল ডাকিছে যেথায়
নব জলধর শ্যাম!

কোথা সে বিরিন্দাবন কোথায় যমুনা,
কোথা রে কদম্ব মূল,
একি জ্বালা দেখ সখি খুঁজিয়া না পাই,
সকলি হতেছে ভুল!
সারা বৃন্দাবন মাঝে বাঁশরী বাজিছে
ভাসিছে আকাশময়
ছুলিয়া ছুলিয়া ডাকে বাঁশরীর স্বান,
প্রাণের মাঝারে বয়;
কুহরিছে পিককুল মুরলীর তানে,
গুঞ্জরিছে মধুকর;
শ্যামময় প্রাণ আজি হল বাঁশীময়—
অপরূপ বাঁশীস্বর!
অথির পরাণ মন পুলক অলসে,
অলস কোমল কায়,
নাহি জানি তৃণাঙ্কুর বিঁধিছে চরণে—
কুসুম পরশে পায়!

লয়ে চল হাতে ধরে বাঁশরীর পানে,
চরণ চলেনা মোর,
আকুল মুরলী রবে অবশ শরীর,
হৃদয়ে বেঁধেছে ডোর;
শ্রবণ সে বেণু রন্ধ্র রাধা সে মুরলী,
পরাণে পূরেছে তান,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলা করে শ্যামের অঙ্গুলি
পরশে জাগিছে প্রাণ।
নারী জন্মে মিটিবে না পরাণের সাধ,
কেন না হইনু বাঁশী!
মরমেতে বংশীধারী ঢালিত নিশ্বাস,
হৃদয়ে ছুঁইত আসি,
নিশিদিশি অধরেতে মিশিত অধর,
অঙ্গুলি বাজিত গায়,
এছার জনম যদি লিখিত না বিধি,
বাঁশরী হতেম হায়!

ওই শোন কিবা বলে শ্যামের মুরলী—
ভাসিতেছে সমীরণে—
'তেয়াগিয়া গৃহকাজ গুরু পরিজন,
আয় ওলো কুঞ্জবনে!'
সখি, সর্ব্বস্ব তেয়াগ এ যে নহে অনুরাগ,
তেয়াগের মন্ত্র বাজে;
তেয়াগি যন্ত্রণা জ্বালা আয় সহচরি,
তেয়াগিয়ে লোকলাজে।
অপমান অভিমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা
সকলি যাইব ত্যাগি,
মুরলীর লাগি যদি ত্যজিব না কিছু
ত্যজিব কাহার লাগি!
কেন অঙ্গে আভরণ কটিতে কিঙ্কিণী,
কেন এ চিকন বেশ,
কেন অধরেতে দিলে তাম্বুলের রাগ,
কেন বা বাঁধিলে কেশ!

সাজায়েছ বুঝি এই যৌবনের ডালা
সঁপিয়ে দিবার তরে,
তেয়াগের তরে শুধু এত অনুরাগ,
দিতে শ্যাম নটবরে।
তেয়াগিনু লাজ ভয় কুলশীল মান
বাঁশীর মধুর বোলে,
তেয়াগিব ফুল মালা অঙ্গের ভূষণ
মোহন কালার কোলে;

অমূল্য যৌবন ধন বিকাইব পায়,
তেয়াগের কিবা বাকি,
হেরিলে সে কালো মুখ মরিতে পারিনে,
তাইতে পরাণ রাখি।

এই কিরে বৃন্দাবন এই কি যমুনা,
বুঝিতে পারিনে সই!
অবশ তনুয়া মোর অকুল পরাণ
বাঁশরী বেজেছে ওই!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কিরণময়ী। শ্রীনীলমাধব শেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপন্যাসখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। পুস্তকখানির প্রধান গুণ ইহাতে নানারূপ ঘটনা, নানারূপ লোক ও নানা স্থলের নানারূপ দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার প্রধান দোষ—ইহার অনেক ঘটনা সময়-বিসম্বাদী। যে সময় বর্দ্ধমানের ওরডাঙ্গার মাঠে ডাকাতি হইত—এই গল্পটি সেই সময়ের কথা। অথচ তখনকার সময়ে ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর স্ত্রী বসন্তকুমারী ইংরাজি ফ্যাসানে স্বামার বন্ধুবান্ধবের সহিত মেশেন,—

"ব্রজদুর্ল্লভ বাবু একজন উচ্চমনা লোক; তিনি যদিও রীতিমত কোন সমাজভুক্ত ছিলেন না, তথাপি স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত—তিনি ঐ সকল বিষয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের যদিও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তথাপি আপনার দ্বিতীয়-পক্ষের ষোড়শবর্ষীয়া রূপবতী ও গুণবতী সহধর্ম্মিণী বসন্তকুমারীকে জন-সমাজে বাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্ম-বল একটী স্বতন্ত্র বস্তু; ইহা যাহার আছে, সে সহস্র প্রলোভন, সহস্র বিপদ্ নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাহার ইহা নাই—যে ধর্ম্মকে, সতীত্বকে তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া ভাবে, তাহাকে যতই কেন অবরোধে রাখ না, সে তাহারই ভিতর হইতে আপনার পাপ-অভিলাষ পূর্ণ করিবে।"—সেই জন্য তিনি অবরোধ-প্রথার বড়ই বিরোধী ছিলেন; এবং সেই জন্যই আপনার স্ত্রীকে যথেচ্ছা স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে নিষেধ করিতেন না; কিন্তু তাই বলিয়াই কি, তাঁহার হৃদয় একেবারে ঈর্ষা বা সন্দেহ শূন্য ছিল!—তাহা নহে।

একটী সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা—তাহার চারিধারে নানা দেশের নানারূপ ফল

ফুলের গাছে পরিপূর্ণ সুন্দর উদ্যান;—তাহাই ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বসত বাটী। পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, জানি না; কিন্তু এক্ষণে আপনার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া এখানে বাস করিতেছেন। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি সর্ব্বগুণে ভূষিতা রমণী-রত্ন পাইয়াছেন; যেমন হীরকের মধ্যে কহিনুর, তেমনই রমণীকুলের মধ্যে বসন্তকুমারীও একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার স্বামী যদিও তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় এবং দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত, তথাপি তিনি কখন তাঁহাকে একদিনের জন্যও অনাদর করেন নাই। মানব জাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বল হৃদয় যে তাঁহার ছিল না, এমন কথা আমি বলি না; কিন্তু যখনই তাঁহার মন কোন কুপথের দিকে যাইত, প্রভূত অমানুষিক ক্ষমতা বলে তিনি তাহার বেগ ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, এবং বিধাতাও তাঁহার সেই প্রার্থনাটী পূরণ করিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দরী রমণী এবং ওরূপ অতুল সম্পত্তি থাকিলে পৃথিবীতে কেনা আপনাকে সুখী বিবেচনা করে—তাই ব্রজদুর্ল্লভ বাবুও আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন।

আজ ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহ; প্রায় প্রতি মাসেই বসন্তকুমারী একবার না একবার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্রিত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেন। আজও তাহারই একদিন; মুঙ্গেরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা একে একে সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। বসন্তকুমারী সকলেরই সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছেন; কেহই বলিতে পারেন না যে, আমাকে উপেক্ষা করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে দেওয়ান শিউশরণ লাল—একজন করদ রাজার প্রধান কর্ম্মচারী, বড় বাঙ্গালী ঘেঁষা লোক; তিনি এবং ভবশঙ্কর বাবু (যিনি বহু দিবস হইল, স্বাস্থ্যের অনুরোধে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে বাস করিতেছেন,) ইঁহারাই প্রধান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ব্রজদুর্ল্লভ বাবু ইহাতে যোগ দেন নাই; একে তাঁহার শরীর অসুস্থ, তাহাতে আবার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে ঈর্ষার উদয় হয়—কাজেই এ সকল তিনি চক্ষে দেখিতে অসহ্য বোধ করিতেন"।

ইহা নিতান্তই একটি ইংরাজ ঘরের চিত্র। এখন ত বাঙ্গালীদিগের ভিতর এত ইংরাজি ভাবের ইংরাজি ধরণ ধারণের প্রচলন হইয়াছে—কিন্তু এখনকার সময়ের যদি এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করা যায়—তাহা হইলেও ঠিক স্বাভাবিক হয় না, কেন না—রমণীদিগকে বাহিরে আনা না আনা কিম্বা অন্য পুরুষের সহিত মিশিতে দেওয়া না দেওয়া এখনো সম্পূর্ণই স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সুতরাং যে স্থলে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহিত মিশিতে দেখিয়া স্বামীর ঈর্ষা উদয় হয়—সে স্থলে স্ত্রীর এরূপ স্বাধীনতা

হিন্দুস্থানী মুন্সী যুগলকিশোরের ইংরাজ অনুকরণপ্রিয়তাও আমাদের কথার আর একটি দৃষ্টান্ত।

"মুন্সী যুগলকিশোর, ওরফে John Cuthbert; যুগলকিশোরের ভাগলপুরে বাড়ী—একজন ইংরাজ-অনুকরণ-প্রিয় লোক; যদিও বয়সে প্রাচীন (প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর হইবে,) তত্রাচ তখনকার নব্য বাবুদিগের চালচলন্ গুলির বিলক্ষণ নকল করিয়াছিলেন—এমন কি, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক পারদর্শীও হইয়াছিলেন; কারণ এই যে, তিনি যৌবনের চরম সীমায় একবার কোন কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় গিয়া, সেখানে সাহেব বিবীদের সুন্দর পোষাক আর এক সঙ্গে সাধারণ স্থলে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, তিনি বড় খুসী হইয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রৌঢ়া স্ত্রীর ঈশ্বরেচ্ছায় ৺ গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলেই আপনার মনের মত এক সুশিক্ষিতা, সুরসিকা, নির্লজ্জা, পূর্ণযৌবনা রমণীকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া, উভয়ে সাহেব বিবী সাজিয়া, পথে পথে কাঁধ ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া, দুর্লভ মানব জনম সার্থক করিবেন।

লোকে যেটী আন্তরিক কামনা করে, সেটী প্রায়ই সফল হইতে দেখা যায়। পাঁচ বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইল—প্রথম পক্ষের স্ত্রী স্বর্গধামে গমন করিলেন, আর অমনি মুন্সীজী মনের মত একটী রমণী-রত্ন বাছিয়া লইলেন। জানকী, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাঁহার রূপ বর্ণনা আর কি করিব! যাঁহারা ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপের কথা পড়িয়াছেন, তাঁহারই আমাদের এ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—সেই 'বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর বিনায়' আদি সমস্ত সৌন্দর্য্যই জানকী বাইয়ের শরীরে আছে। আর যদি গুণের কথা, স্বভাব চরিত্রের কথা বলেন, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, 'রূপের কি দিব সীমা গুণ ততোধিক'—অর্থাৎ রূপের চেয়ে গুণের ভাগটা কিছু অধিক—আরও এ বিষয়ের এক প্রমাণ এই যে, যখন একবার তাঁহার স্বামীকে কোন কারণে কিছু দিনের জন্য মালদহে যাইতে হইয়াছিল, তখন তিনি জানকীকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গুণের জানকী, 'শুনিয়াছি, সে দেশের কেঁই মেই কথা; হায় বিধি, সে কি দেশ, গঙ্গা নাই যথা।'—গোচ দুই চারিটী কথা বলিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে বাঙ্গালায়, হিন্দীতে এবং ইংরাজীতেও জানকীর কিছু কিছু দখল ছিল—গীতবাদ্যেরও বিলক্ষণ আলোচনা ছিল।

যখন যুগলকিশোর মনের মত স্ত্রী পাইলেন, তখন তিনি মনে করিলেন, নামটাও ইংরাজী চাই—কিন্তু পোড়া লোকে তাঁহাকে যুগলকিশোর বলিয়াই ডাকিত; তাই ক্রোধে ও ঘৃণায় তিনি আপনার নামটী সম্পূর্ণরূপে বদলাইতে না পারিয়া, তাহার

পূর্ব্বে John Cuthbert যোগ করিয়া আর গুণনিধি ভার্য্যার নামের পূর্ব্বে Lucia Margaret বসাইয়া মন্দ লোকের উপর ভালরূপে প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; শুনিয়াছি, যখন তিনি মালদহে ছিলেন, লোকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেই ঐ সুদীর্ঘ নামের পরে 'de ভাগলপুর' বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীরও পরিচয় দিতেন। কিন্তু এ সকলের জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না; এদেশে এমন অনেক গুণবান্ পুরুষ আছেন, যাঁহারা লোকের কাছে ইংরাজ বলিয়া পরিচিত হইবার অভিলাষে যোগেন্দ্র মিত্রের স্থানে J. Motter, দ্বারিকানাথ সেনের স্থলে Dwarkinson বলিয়া লিখেন—আর দুই চারি পাত ইংরাজী পড়িয়াই ধুতি চাদর পরিত্যাগ করেন"।

এইখানে বলা আবশ্যক যুগলকিশোর খৃষ্টান নহেন।

এইরূপ অস্বাভাবিক দৃশ্য না থাকিলে এইখানিকে আমরা ভাল বলিতে পারিতাম। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে ইচ্ছা করে।

ডাকাতদিগের ব্যাপার ও নবদ্বীপের বাবাজির বিলাসাভিনয় অতি সুন্দর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

নায়িকাদিগের মধ্যে বসন্তকুমারীর ছবি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক হইয়াছে। তাহার প্রেম, অনুতাপ, হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ ও জয় বেশ হইয়াছে। মাতঙ্গিনী একটি সুন্দর চরিত্র, পড়িয়া যথার্থ হৃদয় তৃপ্ত হয়।

শৌরীন্দ্রমোহনের চরিত্র লেখক বজায় রাখিতে পারেন নাই। যে শৌরীন্দ্রমোহন সরলাকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার স্মৃতিতেই জীবন কাটাইতে চান, হেমলতা যাঁহার জন্য পাগল কিন্তু যিনি সরলা ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না—সুতরাং বিবাহ করিতে পারেন না,—সেই শৌরীন্দ্রমোহন যেই সরলাকে লাভ করিলেন অমনি সেই সঙ্গে হেমলতাকেও বিবাহ করিয়া বসিলেন।

সন্ন্যাসীদের উপদেশ একটু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়াছে।

কবিতা পাঠ। ৵১২। ১৩টি ছোট ছোট কবিতায় এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। 'জননী' শিশু, নদী পর্ব্বত উষা, সন্ধ্যা এই সকল বিষয় লইয়াই কবিতাগুলি রচিত। বইখানির স্থলে স্থলে যদিও ভাষার এবং মিলের একটু আদটু দোষ দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন—

ঊষা।

ডাকিল কোকিল পাখী নিশি এই পোহাল,
হীরকাভা তারাচয় এক এক করি হায়
নীল গগনের কোলে ধীরে ধীরে লুকাল,
নীরব অবনী মাঝে পাখী কল রবিল—

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পুস্তকখানি প্রশংসনীয়, বিশেষ যখন শুনিতেছি কবিতাগুলি ১৫। ১৬ বৎসরের এক্কজন বালিকার লেখা। কবিতাগুলির মধ্যে বেশ একটি সরল মাধুর্য্য আছে।

কবিতা পাঠের একটি কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ঘুঘু।

ওরে ক্ষুদ্র পাখী　কোন ঝোপে থাকি
　ঘুর ঘুর রবে ধরেছ তান,
নির্জনে থাকিয়া　বিপিনে বসিয়া
　গাইতেছ কার প্রেমের গান ?
অরুণ উদয়ে　সন্ধ্যার সময়ে
　কিবা দ্বিপ্রহরে সদাই গাও ;
ক্ষণেক নীরব　পুনঃ ধর রব
　সুমৃদু কাতরে কি যেন চাও।
মৃদু রব করে　সতত সুস্বরে ;
　কিম্বা দূর কর প্রাণের জ্বালা।

ওই ক্ষুদ্র প্রাণে　কেবা ব্যথা দানে
　ধরাল তোমার এমন আলা।
বুঝি বনে থাকি　পরমেশে ডাকি
　শান্তি চাও তুমি ও ক্ষুদ্র প্রাণে।
ঔদাস্য পূরিত　তোমার সঙ্গীত
　লাগিছে সতত আমার মনে।
ঘুর ঘুর রবে,　গাও হেরি ভবে
　রোগ শোক আর ভাবনা জ্বালা।
ঘুর ঘোর পাখী,　দেখ বনে থাকি
　ঘুর ঘোর বটে ভবের খেলা।

অবসর বিকাশ। কবিতাবলী। জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। কবিতাগুলিতে যদিও কাঁচা হাত প্রকাশ পাইতেছে—কিন্তু ইহাতে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা পুস্তক না হউক, ইহার কতক গুলি কবিতা বেশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত কবিতাটিই শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতি।

কোন প্রেত আত্মার উক্তি।

পার্থিব কার্য্য কলাপ, পার্থিব জীবন,
সকলি গিয়েছে, কেন গেল না স্মরণ !
সেই দিন, সেই ক্ষণ, সেই নির্ম্মম ঘটন,
অনিবার্য্য অগ্নি সম আছে অনুক্ষণ
স্মৃতির কন্দর মাঝে, পোড়াইতে মন।
　কেন গেল না স্মরণ !

ভুলিতে এ ঘোর জ্বালা, প্রথমে যখন ;
করিনু উপায় কত,—অসাধ্য সাধন ;
আমোদ প্রমোদে মাতি, রহিলাম দিবারাতি,
করিলাম কত তীব্র মাদক সেবন ;
আশা ছিল হই যদি ভ্রান্তিতে মগন।
　কেন গেল না স্মরণ !

মনুষ্যের সহবাস,—কথোপকথন ;
মনুষ্যের কণ্ঠরব করিলে শ্রবণ
হ'ত মনে জাগরিত, সেই কথা অবিরত,
কাল অগ্নি সম তেজে হয়ে উদ্দীপন ;
সহিতে নারিনু তার ঘোর জ্বালাতন।
কেন গেল না স্মরণ।

বিভব, সম্পদ, সবে দিয়া বিসর্জ্জন ;
সুখের সংসার ছাড়ি করিনু গমন
নিবিড় অরণ্য মাঝে ;—তরুলতা যথা সাজে,
প্রকৃতির শোভা সদা করিতে বর্দ্ধন।
নিভৃত নির্জ্জন স্থান শান্তির সদন।
কেন গেল না স্মরণ !

এত করে নাহি হ'ল পূর্ণ আকিঞ্চন !—
পরম পিতার তবে লইয়া স্মরণ,
অহরহ তাঁর ধ্যানে, মগ্ন করিলাম মনে,
কিন্তু,—যদি তিল আধ হ'ত অন্যমন,
করিত দ্বিগুণ বেগে তাপ আক্রমণ।
কেন গেল না স্মরণ।

নিরুপায় হয়ে করি আশ্রয় মরণ,
আত্মারূপে প্রেত-দেশে ভ্রমিছে এখন,
রক্ত মাংস দেহ ভার, আমার নাহিক আর,
পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন ;
তবে কেন সেই তাপ হ'ল না বারণ ?
কেন গেল না স্মরণ !

নর হতে কত শক্তি ধরি হে এখন ;—
মানসে করিতে পারি সকলি সাধন ;—
জীব যাহা নিত্য সয় সকলি হয়েছে লয়,
দ্বেষ, হিংসা, ভালবাসা, লোভ, প্রলোভন,
মোহের বিকার আর মায়ার ছলন।
কেন গেল না স্মরণ !

বুঝিয়াছি,—জীব-আত্মা বিধির সৃজন
অন্য উপাদানে নহে, কেবল স্মরণ,—
পার্থিব করম মত, ভাসে তায় অবিরত ;
ফলভোগে জীবগণ যাহার যেমন ;
স্মৃতি ভিন্ন কিবা আছে পাপের শাসন ?
তাই গেল না স্মরণ !

কারাস্থ বালরাজ।* ফ্রান্সের রাজবিদ্রোহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। শ্রীমাধবচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত প্রণীত।

ফ্রান্সের মহাবিদ্রোহ সময়ে ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে কারারুদ্ধ হইয়া কিরূপে নিহত হয়েন এবং তাঁহার বালক পুত্র লুই (ইনিই কারাস্থ বালরাজ) কিরূপ ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করেন—তাহাই এই পুস্তকখানিতে বিবরিত। এই অত্যাচার কাহিনী বড়ই হৃদয় বিদারক। এই প্রসঙ্গে পুস্তকের প্রথমেই ফ্রান্সের রাজ-বিদ্রোহের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানি পড়িলে অল্পের মধ্যে ফ্রান্সের সে সময়ের অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

এইখানে একটি কথা, লেখক একস্থলে নোটে বলিয়াছেন—

"ফ্রান্সের এই মহা ভীষণ রাজবিপ্লবের সময় প্রত্যহ এত লোকের প্রাণবধ হইত যে, দুই চারিজন অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিলেও সমুদায় মস্তক ছেদন করিয়া উঠিতে

পারিত না। এই সময় ডাক্তার গিলোটিন নামক একজন বুদ্ধিমান একটি যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, তাহা দ্বারা অনেক মুণ্ড এককালে ছিন্ন হইতে পারিত। সেই যন্ত্রটির নাম গিলোটিন। স্রষ্টার মস্তকও অবশেষে সেই যন্ত্রের হাত এড়াইতে পারে নাই।”

আমাদের যতদূর মনে হইতেছে,—অধিক লোক এক সঙ্গে নিহত করিবার জন্য বিদ্রোহের সময় গিলোটিন সৃষ্ট হয় নাই এবং ডাক্তার গিলোটিনও ইহার আবিষ্কর্ত্তা নহেন। তবে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তাব করেন যে, এইরূপ একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হউক যাহা দ্বারা ফাঁশি অপেক্ষা আরো সহজে অর্থাৎ অল্প সময় ও অল্প কষ্টে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু সমাধা হইতে পারে। গিলোটিন এই প্রস্তাব করিবার তিন বৎসর পরে বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার লুই উক্ত উদ্দেশ্যে গিলোটিন যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। গিলোটিনে এক জনের অধিক লোক এক সময়ে বিনষ্ট হয় না।

সুরাপান বা বিষপান।* কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সুরাপান কিরূপ অহিতজনক অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক খ্যাত নামা ডাক্তারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা লেখক সপ্রমাণ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন পরিমিত সুরাপানে কোন মন্দ ফল হয় না, কিন্তু লেখক দেখাইয়াছেন এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক।

মদ্যপানের ফল যে ভীষণ তাহা যদিও নূতন কথা নহে, তথাপি বারবার এ কথা সকলকে স্মরণ করান উচিত। লেখকের এই যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ভারতের গোধন রক্ষা।* তাহিরপুর কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

বাঙ্গলার কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তাহিরপুর-জমিদার যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে যত্ন করেন তাহাতে অবিরতই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে! এই পুস্তকখানি তাহার আর একটি প্রমাণ। গোজাতির দ্বারা আমরা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, তাহা দর্শাইয়া তাহার ধ্বংস সাধন কার্য্যে বাধা দিতে যাহাতে দেশীয় মাত্রেই বদ্ধ পরিকর হয়েন এই পুস্তকখানি তাহাই অনুরোধ করিতেছে। ভরষা করি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সকলেই সচেষ্ট হইবেন।

বিটকেলের দপ্তর।* (ভারতবাসী হইতে উদ্ধৃত) শ্রীবিপিনবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহা একখানি সামাজিক রহস্য পুস্তক। রহস্যগুলি টানাবোনা রহস্য নহে, পড়িতে বেশ আমোদ হয়, লেখকের যথার্থই এবিষয়ে ক্ষমতা আছে। স্থানাভাব না হইলে “ভোটযুদ্ধটি” আমরা এইখানে উঠাইয়া দিতাম।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প

অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত চারি বৎসরের পত্রিকা অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিম ১২৲ টাকা; পশ্চাদ্দেয় ১৬৲ টাকা।

১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সুপ্রসিদ্ধ সভ্যগণ ৪ বৎসর ধরিয়া যে সকল তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন সেই সকল, এবং তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে দেশ দেশান্তরবাসী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে যে সকল তত্ত্বের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে বিবৃত হইয়াছে। এদেশের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রথম সময়ের সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পে আছে।

এই কল্প এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক ব্যক্তি এতদন্তর্গত কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ পৃথক্ মুদ্রিত করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অভীষ্টমত ফল হইবে না ভাবিয়া আমরা সমুদায় কল্পটী পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কল্পের কয়েক কাপি ৫০ টাকা করিয়া মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতন মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উপরোক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ইহাতে অনেক চিত্র, মানচিত্র এবং পারসী প্রভৃতি অক্ষরের আবশ্যক হওয়াতে ইহার মূল্য এতদপেক্ষা আর কমাইতে পারা গেল না। কলিকাতার গ্রাহকেরা মাসিক এক টাকা কিম্বা ত্রৈমাসিক তিন টাকা করিয়া দিলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতদতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এইরূপে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া গ্রাহকেরা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। যাঁহারা ১২ টাকা একবারে দিবেন, তাহাদিগকে সাহায্যকারী স্বরূপ গণ্য করা যাইবে। তাঁহাদিগকে সমস্ত পুস্তক একত্রে বাঁধাইয়া দেওয়া যাইবে।

আমার নামে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবার।

আজমীরে পৌঁছিয়াই রো'সাহেবের বাদসাহ সাক্ষাৎকার ঘটিল না। ভ্রমণ-ক্লান্তি ও অন্যান্য কারণে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল এবং আজমীরে গিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হইয়া ১০ই জানুয়ারী (১৬১৬ খৃঃ) সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

রো'র অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন বলিয়াই তিনি প্রথম সন্দর্শনেই সম্রাটের করুণা নয়নে পতিত হন। তিনি সাহসে বুক বাঁধিয়া, দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া, উপঢৌকন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—সুপ্রশস্ত বহুমূল্য দীপ্তিময় প্রস্তর-খচিত সভা ভবনের উচ্চতম স্থলে ভারতবর্ষের সম্রাট উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, মুক্তাবিনির্ম্মিত সিংহাসন বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত হইয়া সেই জনপূর্ণ সভামণ্ডপে স্বীয় জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত চারিটি স্বর্ণ দণ্ডের উপর মণিখচিত চন্দ্রাতপ ঝকমক্ করিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। সম্রাটের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে উন্নত স্থানের উপরে রাজপুত্র ও উচ্চ পদস্থ নৃপতিগণের বিচিত্র আসন সংন্যস্ত রহিয়াছে। সম্রাট সেই উন্নত কারুকার্য্যময় মঞ্চোপরিস্থ মণিখচিত দ্যুতিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার দুই হস্ত নিম্নে পূর্ব্বোক্ত আসনে পদমর্য্যাদা অনুসারে উজীর, ওমরাহ ও প্রাদেশিক ভূপালবর্গ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইঁহাদের মণিখচিত, বহুমূল্য, শিরস্ত্রাণোদ্ভূত জ্যোতির সহিত সভাতল বেষ্টিত অত্যুজ্জ্বল স্ফটিক স্তম্ভের দীপ্তি সম্মিলিত হইয়াছে। সম্রাটের ও সভা ভবনের চারি পার্শ্বে উন্মুক্ত কৃপাণ ও শানিত বর্শা হস্তে রক্ষীগণ নিঃশব্দে পদসঞ্চরণ করিতেছে। উজীর ওমরাহগণের নীচে রাজ্যের বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ উপবিষ্ট। তন্নিম্নে সাধারণ জনস্রোত; এত জন সমাগম, এত ধুমধাম, তত্রাচ সেই সুদূর বিস্তৃত সভা ভবন এতদূর নিস্তব্ধ যে সূচী পতন শব্দও শ্রুতিগোচর হইত।

দুইজন সম্ভ্রান্ত নপুংসক আসিয়া রো সাহেবকে দরবারের মধ্যে লইয়া গেল। আকবর সাহ নিয়ম করিয়াছিলেন—যে কেহ হউক না কেন, মোগল দরবারে বাদসাহের নিকট আসিতে হইলেই ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া তসলীম বাজাইতে হইবে। কিন্তু রো'সাহেব এই রীতি-রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্রাটকে জানাইলেন "বিদেশী অভিবাদন প্রথা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; যদি জাঁহাপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে তিনি স্বদেশীয় প্রথানুসারে অভিবাদনাদি করিতে ইচ্ছা করেন।" তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাব সম্রাটের সহানুভূতি লাভ করিল। রো'সাহেব প্রত্যেক রেলিংএর নিকটে গিয়া ইউরোপীয় প্রথানুসারে সম্রাটকে অভিবাদন করিতে করিতে

তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। পূর্ব্ব কথিত উচ্চ ও নিম্ন স্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিরোহণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তকাবনত করিলেন— অদূরে তাঁহার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বুরহানপুরে কুমার পারবেজের সভায় তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, মোগল সম্রাট বসিবার আসন দিয়া তাঁহার যথেষ্ট পদোচিত সম্মান রক্ষা করিলেন। দ্বিভাষীর দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল—ইতিমধ্যে রো উপঢৌকন দ্রব্যগুলি সযত্নে সম্রাট সমক্ষে রক্ষা করিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বর বাদসাহকে যে সমস্ত উপহার দ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পনর শত টাকা মূল্যের একখানি সুবৃহৎ বিলাতি গাড়ী, কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট বিলাতি ও ফরাসী মদিরা ও কতকগুলি বহুমূল্য তৈলচিত্র এবং একটি বাদ্যযন্ত্রই প্রধান। ছবিগুলির মধ্যে দুইখানি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর জেমস্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতিকৃতি, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গুলি ইংলণ্ডীয় রাজসভার সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত রূপবতী মহিলাদের চিত্রিত মূর্ত্তি। আর একখানি ছবি একটু নূতন ধরণের এবং এ সম্বন্ধে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে রো সাহেবকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল। এ বিষয় আমরা পরে বলিব।

সম্রাট বিশেষ প্রীতির সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের পত্র ও উপহারগুলি গ্রহণ করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে বাদ্য যন্ত্র ছিল, তাহা সম্রাটের আদেশ ক্রমে রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকট খানি বিলাস প্রিয় সম্রাট নিজে উঠিয়া দেখিতে অসম্মত হইয়া একজন পার্শ্বচরকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন। সে আসিয়া তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিল। বাদসাহের আদেশ অনুসারে এই বিলাতি গাড়ী খানিকে আদর্শ করিয়া কয়েক মাসের মধ্যে আরও ৪।৫ খানি নূতন শকট প্রস্তুত হইল। ইহাদের সকল বিষয়ে এতদূর সৌসাদৃশ্য দাঁড়াইল যে কোনখানি প্রকৃত বিলাতি, ও কোনখানি বাদসাহের নিজের কারিকরের কৃত, তাহা স্থির করা দুরূহ হইয়া উঠিল *। বস্তুত ইহা সে সময়ে ভারতে আশ্চর্য্য কার্য্য নহে—মোগল শাসনাধীনে ভারতে দেশীয় সূক্ষ্ম শিল্পের যে কতদূর মাধুর্য্য বিকাশ ছিল, তাহা দিল্লী ও আগরার প্রাসাদাবলী, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি হইতেই বিশদরূপে প্রমাণিত হয়।

উপহার দ্রব্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হইলে, বাদসাহের সহিত রো সাহেবের দ্বিভাষীর সাহায্যে নানা প্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল। বাদসাহ ইংলণ্ডীয় রাজদূতের বাক্‌চতুরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সামাজিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া

---

* রো সাহেব একথা নিজে যথেষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। যদিও উপহার দ্রব্যগুলি পাইয়া সম্রাট ইংলণ্ডাধিপের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যদিও রো সাহেবকে যতদূর সন্তোষ দেখাইতে পারা যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডাধিপ মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন না ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশ এতদূর রত্ন প্রসবিনী হইতে পারে না, মণি মুক্তাদি ভারত হইতে রপ্তানির জিনিস—আমদানির নহে।

রো সাহেব প্রথম দিবসেই সম্রাট্‌কে রাজা জেম্‌সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র ও রাজকীয় লিপি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজি লিপির পারস্য অনুবাদ এক-খানিও তাহার সহিত সংযুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীর উপঢৌকন দ্রব্যাদি পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডাধিপের এই সৌজন্যপূর্ণ পত্র পাঠেও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিলেন। বিদেশীয় দূতগণের মধ্যে ইংলণ্ডীয় দূত মোগলদরবারে যতদূর সম্মান লাভ করিতে হয়, তাহা করিয়াছিলেন। ভারত সম্রাট রো'কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনার ন্যায় কোন বৈদেশিক-রাজ দূতই এতদূর আদৃত ও সম্মানিত হন নাই।" বস্তুতঃ একথা সম্পূর্ণ প্রকৃত। মোগল রাজসভায় গিয়া সম্রাটের অনুকম্পা ভাজন হওয়া ত দূরের কথা—অনেকে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই দিন রো সাহেবের শরীর সহসা অসুস্থ হইয়া উঠাতে তিনি সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার অসুস্থতা শুনিয়া আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রো বিশেষ নম্রতার সহিত সে অনুরোধ কাটাইয়া দেন।

এক্ষণে টমাস রো'র কাহিনী অনুসরণ করিয়া আমরা রাজপ্রাসাদের কয়েকটি চিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে ধরিব। যে স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রবাদ ইউরোপের নানা স্থানে বিশেষ কৌতূহলের সহিত শ্রুত হইত—এবং যাহা শুনিয়া অনেক ইংরাজ তৎকালে ভারতের আদ্যোপান্ত স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া ভাবিতেন—স্যার টমাস সেই দেশের লোক হইয়া ভারতে আসিয়া এই সমস্ত প্রবাদের যথার্থতা প্রত্যক্ষীভূত দেখিয়া যে অধিকতর বিস্মিত হইবেন, ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

বাদসাহের জন্মতিথি, নওরোজ ও খোসরোজ। রো'র মোগল রাজ-সভায় অবস্থান কালীন একদিন বাদসাহের জন্মতিথি-মহোৎসব হয়। তিনি তাহার যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"অদ্য সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন—রাজধানীতে আজ মহাসমারোহ। রাজপ্রাসাদে সমারোহের স্রোত বেগ পূর্ণোচ্ছাসে বহিতেছে। আজ বাদসাহ তুলাদণ্ডে উত্তোলিত হইবেন, স্বর্ণ প্রসবিনী রত্নগর্ভা ভারতে আজ মোগলবাদসাহের মহানন্দের দিন—ঐশ্বর্য্যের

কেন্দ্রস্থান, পরম রমণীয় দিল্লী আজ উৎসবময়ী ভূষণে বিভূষিত। দীন দরিদ্র সকলেরই আজ আনন্দোৎফুল্ল মুখ—দরিদ্র অর্থলাভ করিবে, বাদসাহ স্বহস্তে ধন বিতরণ করিয়া আজ তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন।

আমীর ওমরাহ মহলে বড় ধূম—যাঁর যেখানে যা কিছু বহুমূল্য রত্নভূষিত বেশভূষা ছিল, তাহা সকলেই বাহির করিয়া পরিয়াছেন—মস্তকে মণি খচিত শিরস্ত্রাণ, কোষে দ্যুতিময় তরবারি, আপাদ মস্তক বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত, সকলেরই মুখ উৎসব-প্রফুল্ল, রাজ্যেশ্বরের আনন্দের দিনে তাঁহারাও আনন্দে মাতিয়াছেন। প্রাসাদের তোরণ রাজি নানা বিধ মনমুগ্ধকর পুষ্প ও পতাকা সজ্জায় বিভূষিত হইয়াছে, রক্তচিহ্নিত মোগল পতাকা সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদোপরি বসিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাতাসের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। স্থানে স্থানে নহবৎ বাজিতেছে, রাজপুরী সহস্র সহস্র গবাক্ষরূপ নেত্রোন্মীলন করিয়া এই অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে।

তুলাদণ্ডের স্থান হইয়াছে—প্রাসাদ মধ্যেই এক সুবৃহৎ শ্যামল উদ্যানে। বাগানের চারিদিকে সুগভীর পরিখা, পরিখার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেই স্বচ্ছজলে তটস্থ বৃক্ষ লতাদির মনোহর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, পরিখার ধারে ধারে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রসবিনী বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ। পরিখা বেষ্টিত উদ্যানের মধ্য স্থলে মর্ম্মর প্রস্তর রচিত এক অত্যুন্নত মঞ্চ, তাহার উপর তুলা-দণ্ড ঝুলিতেছে। তুলাদণ্ডের উপরে মণিখচিত দ্যুতিময় চন্দ্রাতপ, তাহার উপরে সুনীল অনন্ত বিস্তৃত আকাশ। তিনটী বিশুদ্ধ স্বর্ণময় স্তম্ভের শিখর দেশ বক্রভাবে সম্মিলিত করিয়া সেই সন্ধিস্থল হইতে সুবৃহৎ তুলাদণ্ড ঝুলান হইয়াছে। তুলাদণ্ডে বাদসাহের বসিবার স্থানটী চতুষ্কোণ এবং সুবর্ণপাতে মণ্ডিত ও নানাবিধ মণিমুক্তা খচিত। উপবেশন-স্থান শিখর দেশের সহিত সমান্তরালে স্বর্ণময় শৃঙ্খলে ঝুলিতেছে। পাছে সেই স্বর্ণ-শৃঙ্খল অতিরিক্ত ভার পাইয়া ছিন্ন হয়, এই জন্য তাহার ছিদ্র মধ্য দিয়া রেশমের রজ্জু দ্বারা তুলাদণ্ডের মস্তক সংলগ্ন করা হইয়াছে।

তুলাদণ্ডের সম্মুখে সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে বসোরার সুবিখ্যাত গালিচা বিছান রহিয়াছে—আমীর ওমরাহ ও সম্ভ্রান্তগণ সেই গালিচার উপরে বাদসাহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সহসা বাদসাহ অন্তঃপুর মধ্য হইতে সেই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আপাদ মস্তক রত্নালঙ্কারে ও রত্ন ভূষায় বিভূষিত। উষ্ণীষের উপর সুবৃহৎ কপোত ডিম্বাকার বহুমূল্য উজ্জ্বল মণি জ্বলিতেছে। কণ্ঠে মণিহার দোদুল্যমান। হস্তে দ্যুতিমান হীরকবলয়, কোষে মণিখচিত উজ্জ্বল তরবারি কটিদেশে স্বর্ণময় হীরক খচিত শৃঙ্খলে ঝুলিতেছে। বস্তুতঃ রত্ন প্রসবিনী ভারতের অধীশ্বরের অদ্যকার বেশ ভূষা দেখিলে ভারতের অতুল প্রবাদময়ী ঐশ্বর্য্যের কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়—জন্মদিনের উৎসবকে "রত্নোৎসব" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাদসাহ উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরে তুলার কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি তুলাদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া প্রথম ছয় বার রৌপ্য মুদ্রার ভারে তৌলিত হইলেন। টাকার তোড়া বাঁধিয়া তুলাদণ্ডে রাখিয়া প্রত্যেক বারে তাঁহার ভারের সমকক্ষ করা হইল। এই প্রকারে উত্তোলিত মুদ্রা সংখ্যা নয় হাজার। দ্বিতীয় বারে নানাবিধ মণিমুক্তা ও স্বর্ণ ভারে তাঁহার ভার পরিমিত হইল। স্তূপীকৃত রৌপ্য মুদ্রার পার্শ্বে এই গুলিও রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কারকার্য্যময় জরির সূক্ষ্ম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট ঢাকাই মস্‌লিন ও নানাবিধ কার্পাসনির্ম্মিত ও কৌশেয় দেশীয় বস্ত্রে তাঁহার পরিমাণ স্থির হইল। তৃতীয় বারে চন্দন, মৃগনাভি, আতর প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ও গোধূম যব প্রভৃতি শস্যে উত্তোলিত হইলেন। তৌলিত অর্থ ও মণিমুক্তাদি সমস্তই বিতরণের জন্য। উল্লিখিত নয় সহস্র রৌপ্য মুদ্রা বাদসাহের স্বহস্তে বিতরণের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। রাত্রিকালে নির্জ্জনে বসিয়া যে কোন দরিদ্রকে ইচ্ছামত ডাকিয়া তিনি স্বহস্তে এই মুদ্রারাশি বিতরণ করিতেন। কেবল মুদ্রা পাইয়া যে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত এমত নহে—তিনি নানাবিধ মধুর আলাপে তাহাদিগকে নানা প্রকারে আপ্যায়িত করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।

তুলা হইতে নামিয়া বাদসাহ সিংহাসনের উপর বসিলেন। চারিদিকে আমীর ওমরাহগণ পূর্ব্ব হইতেই বিরাজ করিতেছিলেন। সিংহাসনের সম্মুখে কতকগুলি পাত্রে রৌপ্য নির্ম্মিত নানাবিধ ফল ও মেওয়া (বাদাম প্রভৃতির অনুকরণে) পূর্ব্ব হইতেই সাজান ছিল; বাদসাহ তাহা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লইয়া সভাসদদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। সকলেই বাদসাহের প্রসাদ কুড়াইবার জন্য ব্যস্ত। গম্ভীর প্রকৃতি, পদস্থ, বিত্তসম্পন্ন আমীর ওমরাহগণ স্ব স্ব গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া বাদসাহের প্রসাদ কুড়াইবার জন্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন। ইহার পর দরবার ভাঙ্গিয়া গেল।

এই দিনে সন্ধ্যার পর "মদিরোৎসব" হইয়া থাকে। বাদসাহ সন্ধ্যার পর আমীর ওমরাহগণের সহিত —উৎফুল্লচিত্তে মদিরা সেবনে উন্মত্ত থাকেন। নৃত্যগীতও প্রচুর পরিমাণে চলিতে থাকে।"

অতৃপ্তি।

পঞ্চম সর্গ।

প্রাতঃকাল।

(পথশ্রান্ত ললিত অপরিচিত কানন তলে
ঘুম ভাঙ্গিয়া)

ললিত।

একি এ কোথা এনু
ফুলে ভরা এ কোন কানন ?
কোন স্বপনেতে ভেসে
এ কোন উষার দেশে
সহসা করিনু আগমন ?
কে তুমি গোলাপ কলি
হেসে হেসে ঢলাঢলি
এতই কি বলাবলি মধুর বচন ?
মধুকর গুণগুণে
তার কথা কেবা শুনে
হেসে কুটি উঠে ফুটি বেল জুঁইগণ।
এ হেন প্রমোদ ভুলি
বকুল কামিনী গুলি
কেনরে করেছে হেথা ভূমেতে শয়ন !
মরিগো কুসুম বালা
কি এত পেয়েছ জ্বালা
প্রাণেতে জাগিছে হায় কার অযতন ?
কঠিন মলিন ভূঁয়ে
কোমল সুতনু থুয়ে
ত্যজিছ জীবন কার যাচি দরশন ?
কোমল পরাণ দলি
যে নিঠুর গেছে চলি
আকুল তারি কি পেতে পদ পরশন !

* * *

তুমি তারে যত মাগো
কই সেত আসে নাগো
সে বুঝি করে গো তত দূরে পলায়ন !
যতই সে দূরে যায়
প্রাণ বুঝি তারে চায়
আরো বুঝি বাঁধে যত করে সে বারণ !
কোথা দেবি ! কোন পুরে
আর কত যাব দূরে
এ যে গো তোমারি মরি স্বপন কানন !
তোমারি সৌন্দর্য্য ছটা,
কাননে প্রকাশে ঘটা,
তোমারি নেহারি হেথা আঁখির কিরণ।

কে তুমি নলিনী রাণি,
আধো ফোটা মুখখানি
পেয়েছে বিশ্বের শোভা ও চরণে স্থান !
তব বাসে তব হাসে,
কার কথা মনে ভাসে
কে তুমি তুলেছ প্রাণে সে ললিত তান ?
তুমি দেবি তুমি মোর,
তুমি সেই মনোচোর,
হৃদি পরে এসে মোর হও অধিষ্ঠান ;
এ কানন তলে থাকি,
ঐ আঁখে আখি রাখি
এ জীবন যেন মম হয় অবসান।

(নলিনী চয়ন।)

(সন্ধ্যাকাল)

ললিত।

হৃদয় ত পূরিল না ফুলটি যে গেল ঝরে ?
সৌন্দর্য্যের হাসিটুক না চাহিতে গেল মরে।
অনন্ত সৌন্দর্য্য তার
সে নহে ত শুখাবার
কাহারে এ ধরিয়াছি কারে ধরিবার তরে !
এ নহে ত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী সেই বালা,
কেমনে মিটিবে তবে অনন্ত পিপাসা জ্বালা।
এস দেবি দেহ শান্তি,
ঘুচাও মনের ভ্রান্তি
অনাথা কাতর জনে কেন আর এত ছলা।

(সন্ধ্যা তারাকে দেখিয়া)

ঐ বুঝি তার আঁখি তারা
ঢালিতেছে অমৃতের ধারা
স্বর্গ হতে এ দীনের পানে।
ও আঁখি কি গান গাহে,
হৃদয় কিছু না চাহে
শুধু প্রাণ ডুবে থাক ওরি মাঝখানে।

তাও যে রে ডোবে ডোবে নিভে নিভে যায়,
একে একে যায় সবি শুধু হায় হায় !
দেবি গো অমর আলো,
কোথা তুমি জ্যোতি ঢালো
হৃদয়ের অবসাদ কে আর মুছায় !

(চন্দ্রোদয়—জ্যোৎস্নায় তরুতলে
এক যুবতীকে দেখিয়া)

ঐ বুঝি দেবী সে আমার ?
বুঝি তারে পেয়েছি, আমি যারে চেয়েছি

আমি কি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে,
মিছেই ডেকেছি, শুধুই গেয়েছি,
বুঝি তারেই পেয়েছি আমি যারে চেয়েছি।
ফুলের গন্ধ, তারার হাসি
ওগো যাদের ভালবেসেছি,
যাদের সুধার মাঝে
ভোর হয়েরে থাকতে এসেছি,
তারা গো প্রেমে আমার
মরে আবার জেগে উঠেছে
এক চেতন রূপ মোহন রূপে
আবার ফুটেছে।
দেবি গো তোমার তরে
হাহা করে, কেবল ফিরেছি—
তোমার আসন ধরে
হৃদয় পরে চেয়ে রয়েছি
আজি তোমায় পেয়েছি।

রমণী। কে পাগল উপবনে আজি !
বুঝি না কি কথা কয়
মনে বড় জাগে ভয় !
থাকুক কুসুম তোলা থাক পড়ে সাজি।
(প্রস্থান।)

ললিত।

গেল চলে গেল চলে কেহ না আমারে চায়,
সবে আসি কাছাকাছি দেখিদেখি সরে যায় !
ভালবাসা যারে ঢালি
সেই যেন দেয় গালি
আমার হাতের ছোঁয়া অমৃত গরল ভায় !
একি রে হৃদয় তাপ
এ কেমন অভিশাপ
জানি না কি ঘৃণা দিয়ে গঠিত্ অভাগা হায় !

দারজিলিং।

এদেশের একজন ভদ্র লামার সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষা করিয়া, ইংরাজি ভাবে দীক্ষিত হইয়া ইনি লামার আচর্য্য নিয়মাদি পালন করিয়া চলেন না। ইনি বিবাহ করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেছেন, ধর্ম্মপুস্তক ও পৌরহিত্যের সহিত ইহাঁর কিছুই যোগ নাই, তথাপি ইনি লামা, কেননা লামারাই এখানকার প্রধান ভদ্রলোক, সুতরাং তাহা হইতে এখন দাঁড়াইয়াছে এই, ভদ্র লোক মাত্রেই লামা। আমরাও ভুটিয়াদিগের নিকট লামা। এই লামা "শরৎ দাসের লামা" নামে এখানে বিখ্যাত। বাবু শরৎচন্দ্র দাস যখন ভুটিয়া স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন—ইনি তখন সেই স্কুলে তিব্বত ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাহার পর শরৎ বাবুর সঙ্গী হইয়া ইনি দুইবার তিব্বতে যান। এখন গভর্ণমেণ্ট শরৎ বাবুকে তিব্বতী ভাষার অভিধানাদি প্রস্তুত করিবার ভার দিয়াছেন, এই কার্য্যেও ইনি শরৎ বাবুর সহকারীরূপে নিযুক্ত। শরৎ বাবুর সহিত যেন ইহাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন,—সুতরাং 'শরৎ দাসের লামা' এই নামটি তাঁহার পক্ষে বেশ সঙ্গতই হইয়াছে। শরৎ বাবুর সঙ্গেই ইনি প্রথমে একদিন আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন আমাদের সহিত ইহাঁর কিছুই আলাপ পরিচয় হয় নাই, আমরা যে ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলাম, সেই ঘরের বারান্দা হইতে তিনি আমাদিগকে সেলাম করিলেন, আমরাও তাঁহাকে প্রতি সেলাম করিলাম। সেই খানেই সে দিনের আলাপ শেষ। তাহার পর তাঁহার সহিত আসল আলাপ হইল কবে শোন।

আমরা দ্বিতীয় দিন যে দিন ভুটিয়া বসতিতে যাই সেই দিন গুম্পা দর্শনের পর আমাদের ইচ্ছা হইল ভুটিয়াদের কাপড় বোনা দেখিব। আমাদের সঙ্গী মহাশয় প্রথমে বসতির মধ্যে ঢুকিয়া সন্ধান লইয়া আসিয়া আমাদের বলিলেন, "এই বসতির মধ্যে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী আছে, সেখানে গেলে তাঁর স্ত্রীর তাঁত বোনা তিনি দেখাইবেন।"

আমরা সঙ্গী মহাশয়ের সহিত তাঁহার গৃহ দ্বারে আসিবা মাত্র দেখি—শরৎদাসের লামা আমাদের আহ্বান করিয়া লইতে আসিয়াছেন। সহসা অপরিচিত স্থানে এইরূপ সামান্য পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও বড় আহ্লাদ হইল। আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার সময় লামা বলিলেন—"কাল লাট সাহেবের স্ত্রী আমাদের মত ভুটিয়া ভদ্র পরিবার দেখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের এখানে আসিয়াছিলেন।

আমরা গিয়া দেখিলাম লামার স্ত্রী তখন রাঁধিতেছেন, আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। রান্নাঘরই লামার অন্তঃপুর। সে ঘরে রান্নাও হইতেছে, ভাঁড়ারও রহিয়াছে,

তাঁতও রহিয়াছে, সেই ঘরটি আর কি লামার স্ত্রীর 'নাড়ার মার ভাঁড়া'। লামার স্ত্রী দেখিতে মন্দ নহেন। শুনিলাম, ভুটিয়াদের মধ্যে তিনি একজন আদর্শ সুন্দরী। অবশ্য আমাদের অমার্জ্জিত রুচি দিয়া সে সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাই হৌক তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল এদেশের ভদ্র স্ত্রী দেখিব, সে সাধ মিটিল; তাঁত বোনাও দেখিলাম।

তবে এক সঙ্গে এই দু দুইটি ইচ্ছা পূর্ণ হইতে শুনিয়া তুমি সেখান হইতে আমাদের যতটা সুখী ভাবিয়া ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়াছ—ততটা জ্বলিবার কোনই কারণ নাই। তোমার জানা উচিত সংসারে এমন সুখ নাই যার সঙ্গে কোন না কোন অসুখ মিশ্রিত না আছে, আর আমরাও এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে গণ্য নই।

দু দুইটা সাধ আমাদের পূর্ণ হইল বটে—কিন্তু দুটার কোনটাতেই আমরা নূতন কিছুই দেখিলাম না, এ একটা আমাদের বড়ই আক্ষেপ রহিল। তাঁত বোনা সেই আমাদের দেশের তাঁত বোনারই মত, আর লামা পত্নীর শ্রী সৌন্দর্য্য বেশ ভূষা সাধারণ সুন্দরী ভুটিয়া স্ত্রীদের অপেক্ষা কিছুই অসাধারণ নহে, (তবে আর একবার বলিতেছি আমাদের অমার্জ্জিত রুচি)!

আমার ভ্রাতৃজায়াটি তখনি আমাকে আস্তে আস্তে বাঙ্গলায় বলিলেন "আমাদের গোয়ালিনী ইহার চেয়ে ঢের ভাল দেখিতে"। তবে এ সম্বন্ধে তাঁর কথাটা ঠিক ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কি শুভক্ষণে যে তিনি গোয়ালিনীকে দেখিয়াছেন জানিনা—তার রূপে তিনি নিতান্তই মুগ্ধ। সে আসিলে তাহাকে দেখিতেই তাঁহার সময় কাটে, সে না আসিলে তাহার রূপের প্রশংসায় তাঁহার অন্য কাজ করিবার অবসর থাকে না। অন্য গোয়ালার দুধের দর আর গোয়ালিনীর জলের দর সমান, কিন্তু বৌঠাকুরাণীর হাসি দেখিবার আশায় সেই জলই অমৃত বলিয়া আমাদের হাসি মুখে পান করিতে হয়,—নহিলে—সে কথা থাক।

রান্নাঘর হইতে লামা তাঁহার ড্রইংরুমে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। সেই গৃহ বুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি দেব মূর্ত্তিতে সজ্জিত, এই মূর্ত্তির মধ্যে একটি কাঞ্চনজঙ্ঘার অধিষ্ঠাতা দেবতার মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি বড়ই অপরূপ, জগন্নাথ কোথায় লাগেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা বুদ্ধদেবকেও পূজা করেন, আবার এই সকল দেবতাকেও পূজা করেন কেন?"

তিনি উত্তর করিলেন—"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহাঁরাও ত বুদ্ধ। যিনি বুদ্ধ হন নাই—এ সকলই তাঁহার পূজ্য, আর যিনি বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার কাছে কোন দেবতাই উপাস্য নহে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পূজার অর্থ কি? পূজা করেন কেন?

তিনি বলিলেন—"যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার উদ্দেশেই পূজা করা। পূজা করিলে তিনি যে আপ্যায়িত হন তাহা নহে, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই পূজা, পূজা আমাদের নিজের জন্য, তাঁহার জন্য নহে।"

কথাটা নেহাত মন্দ বলেন নাই। সে কথা গেল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিতে পাই তিব্বতে অলৌকিক ক্ষমতাশালী অনেক মহাত্মা আছেন, আপনি সে বিষয়ে কিছু জানেন?" তিনি বলিলেন—"শুনিয়াছি বটে, পূর্ব্বে এইরূপ অনেক মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু আজ কাল যদি থাকেন ত গুপ্তভাবে আছেন, আমরা সে বিষয় কিছু জানিনা। তবে ধার্ম্মিক লামাগণ বলেন, সকল বিষয়ের কাল আছে, পূর্ব্বে ক্ষমতা লাভ করিবার কাল ছিল সেই জন্য সে সময় উক্তরূপ মহাত্মাদিগের কথা শোনা যায়, এখন চরিত্র শুদ্ধির কাল, আত্মসংযম করিবার কাল আসিয়াছে, এখন সেইদিকেই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এখন তাহাতেই ধর্ম্ম লাভ হইবে, অন্যরূপ ক্ষমতার এখন আবশ্যক নাই। তবে যে এখন একেবারেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী কোন মহাত্মা নাই তাহা বলিতে পারি না, যাঁহারা যথার্থ মহাত্মা তাঁহারা লোকেদের নিকট সহজে আত্ম প্রকাশ করেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের মধ্যে এত ভূতের ভয়, ভূত পূজা এ সব কেন?"

তিনি বলিলেন—"লেপ্‌চাদের নিকট হইতে ভূটিয়ারাও ঐ বিশ্বাস পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্বান, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ভূত মানেন না। ভূত আছে সত্য, কিন্তু ভূত বাহিরে নাই, ভূত মনের মধ্যে, ভূতের বিশ্বাসই ভূত। এইখানে পাহাড়ে একটি বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে প্রত্যহ বাঁশীর শব্দ হইত, ভূটিয়ারা ভাবিত ভূতের গান। রাত্রে সেই রাস্তায় যাইতে যাইতে কত লোক ভয়ে মরিয়াছিল ঠিক নাই, এক দিন একজন সাহসী লোক সেই গাছটা কাটিয়া ফেলিতেই সব চুকিয়া গেল।"

এইরূপ তাঁহার সহিত অনেক রকম গল্প স্বল্প চলিতে লাগিল। লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, অথচ শাদাসিধে ধরণের, কথায় কথায় হাসিয়াই অস্থির। সেই খোলা হাসি খোলা গল্প শুনিতে লাগে ভাল। লামাকে দেখিতেও মন্দ নহে, সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বর্ণ গৌর, আমাদের পুরুষদের মত মাথায় ছোট ছোট চুল, মুখশ্রী সাধারণ ভূটিয়াদের অপেক্ষা ভাল অর্থাৎ নাসিকাহীন মুখ নহে। গোঁপ দাড়ী নাই বটে, কিন্তু তাহাতে মন্দ দেখায় না। লামার ভাবের সঙ্গে আর পাকা আমটির মত গৌর বর্ণ মসৃণ মুখের সঙ্গে বেশ একটা কেমন বনিবনাও মানানসই ভাব আছে।

সে দিন বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে একদিন আমাদের বাড়ী আসিতে বলিয়া আসিলাম। ইহার মধ্যে একদিন তিনি আসিয়াছিলেন। সেদিন আমরা তাঁহাকে মাংস, লুচি, মিষ্টান্ন, চা প্রভৃতি খাইতে দিয়াছিলাম। খাইতে প্রথমটা তিনি সঙ্কোচ প্রকাশ করিলেন—কিন্তু যখন শুনিলেন অভ্যাগত আসিলে আমরা এইরূপে সমাদর প্রকাশ

করি, তখন তিনি মহা সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করিলেন, এবং বলিলেন—তাঁহারাও এইরূপে অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করেন। সেদিন তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা হয় নাই, অন্য নানারূপ কথা, ভুটিয়াদের লেপচাদের আচার ব্যবহার, সিকিমের বিবরণ, ইংরাজের দারাজিলিং আসা এই সব গল্পই হইয়াছিল, আমি তাঁহার গল্পের সারটুক বরং সংক্ষেপে তোমাকে বলিয়া যাই।

ইংরাজেরা প্রথমে কি করিয়া দারজিলিং পান জান? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বসতি প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কর দিয়া এই অঞ্চলের খানিকটা জায়গা তাঁহারা সিকিং-রাজের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন।

তখন দারজিলিং নিতান্ত জঙ্গল ছিল, বাঙ্গালা হইতে এখানে আসিবার পথ ঘাট আদবে ছিল না বলিলেই হয়, বন পথে আসিতে হইলে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে নিস্তার পাইবার বড় আশা থাকিত না। সিকিংরাজ ভাবিলেন—খানিকটা জঙ্গলের পরিবর্ত্তে কর পাইব—সেত সুবিধার কথা। তিনি ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন সিকিং, ভুটানে দাস ব্যবসায় চলিত, মাঝে মাঝে তাহারা নীচে হইতে বাঙ্গালী-দিগকে ধরিয়া আনিয়া দাস করিত। দারজিলিংএ স্থান পাইবার পর ইহা লইয়া সিকিং-রাজের সহিত ইংরাজের গোল বাধিল, ইংরাজ চাহেন দাস ব্যবসায় নিবারণ করিতে সিকিং তাহাতে ক্রুদ্ধ, তাহার মতে তাহার ন্যায্য অধিকারে অপরের এ অন্যায় হস্তক্ষেপ। এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার জন্য দারজিলিংএর ডেপুটি কমিসনার একশত পুলিশ সৈন্য লইয়া সিকিং যাত্রা করেন।

সিকিং বুঝিল ইংরাজ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইংরাজের ন্যায় সিকিমে শিক্ষিত সৈন্য নাই—রাজার হুকুম হইলে অধিবাসী সকলেরই অস্ত্র ধরিতে হয়। সিকিমের লোকেরা তীর ছুড়িয়া পাথর ছুড়িয়া একশকে একশ প্রায় ঠিক করিয়া দিল। কয়েক জন ইংরাজ একজন বাঙ্গালী এবং দারজিলিং এর কুলি মজুর প্রভৃতি কয়েকজন চালের বস্তা দেয়ালের মত আড়াল করিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। তাহারা যে ফিরিয়া পলাইবে তাহারো উপায় নাই, পথে বহু-সংখ্যক সিকিমবাসী তীর ধনুক ও পাথর লইয়া বসিয়া, যে ফিরিবে তাহাকে মরিতে হইবে। এই সময় একজন দারজিলিংএর ভুটিয়া উকীল ইংরাজদের সঙ্গে ছিল। এইরূপ বিপদ দেখিয়া সে পথের ভুটিয়া সৈন্যদিগকে ঘুস দিয়া হস্তগত করিল, বলিল "ইংরাজকে তোমরা পারিবে না—আজ যেন কয়টা মারিলে, কিন্তু অসংখ্য সৈন্য দারজিলিং হইতে আসিতেছে—এরূপ স্থলে লাভ ছাড়িয়া কেন লোকসানে যাও।"

তাহারা ঘুস পাইয়া ইংরাজদিগকে মারিল না, ইংরাজেরা সেই রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেল। তাহারা পরদিন কুলি মজুর যাহাকে পাইল, কতক মারকাট

করিল—কতক বন্দী করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। বন্দীদিগের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ছিলেন—ইনি বর্দ্ধমানের কর্ম্মচারী তারিণী বাবু।

এই দাঙ্গায় সিকিমের ২০।৩০ জনের অধিক মরে নাই।

কমিসনার সাহেব এইরূপে পলাইয়া আসিয়া আবার অধিক সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে সিকিং গমন করিলেন। যাইবার আগে রাজাকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়া দিলেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য যাইতেছেন না,—কেবল কথাবার্ত্তা কহিতে যাইতেছেন। সেবার সিকিং গিয়া ইংরাজ কৃতকার্য্য হইলেন, সিকিং ইংরাজের ক্ষমতা পূর্ব্বে বুঝে নাই, এবার বুঝিল, বুঝিয়া সন্ধি স্থাপন করিল—ইংরাজ ছয় হাজার টাকা করে সমস্ত দারজিলিং পাইলেন—কেবল তাহাই নহে, দাস ব্যবসায় সিকিং হইতে একেবারে উঠাইয়া দিতে রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর ক্রমে রাজার দায়ীত্ব আরো বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার করও ৯ হাজার হইতে ক্রমে ১২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হয় কিন্তু সম্প্রতি মেকলের তিব্বত মিসনে গমনের পর হইতে এ কর একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

সিকিমের রাজা কতক দিন সিকিম কতক দিন তিব্বতে বাস করেন, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তিন মাসের অধিক সেকিংরাজকে তিব্বতে বাস করিতে দিতে ইচ্ছা নয়—কিন্তু তিন মাসের পরিবর্ত্তে দুই বৎসর ধরিয়া তিনি তিব্বতে বাস করিতেছেন—সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই দুই বৎসরের খাজনা দিতে চাহেন না, আরো বলেন যে সিকিং ত্যাগ করিয়া রাজা যদি এইরূপ অধিক দিন তিব্বতে বাস করেন ত তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার দাওয়ানকে রাজা করিবেন। মহা গোল চলিতেছে, মেকলে, পল প্রভৃতি ইংরাজগভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ এখন সিকিমে, এখন ফলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক।*

সিকিমের রাজবংশ শুনিলাম বেশী দিনের নহে। মোট ৫।৬ শত বৎসর মাত্র সিকিমে রাজা হইয়াছে। প্রবাদ এই—বাঙ্গলার দক্ষিণ হইতে একজন মহাত্মা সন্ন্যাসী পুরুষ সিকিমে আসিয়া বাস করেন। কিছু দিন পরে অন্য দিক হইতে অন্য দুই জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা সিকিমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সিকিমে একজন রাজা প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। এই সুযোগে পশ্চাদাগত দুই জন সন্ন্যাসী নিজে নিজে রাজা হইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী লামা তাহা বুঝিয়া বলিলেন "আমরা সন্ন্যাসী মানুষ আমাদের রাজা হওয়া উচিত হয় না। দেশের একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা করিতে হইবে।"

এই বলিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন, ধ্যানভঙ্গের পর ভূটিয়াদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"অমুক স্থানে গিয়া যাহাকে দেখিতে পাইবে লইয়া আইস, সেই তোমাদের রাজা।"

---

* দারজিলিং পত্র প্রায় এক বৎসর আগেকার লেখা। তাহার পর এখন ত তিব্বত সিকিং লইয়া বিলক্ষণ গোল চলিয়াছে।

তাহারা সন্ন্যাসীর কথিত স্থানে গিয়া দেখিল একজন লোক দুধ দুহিতেছে। দুধ দোহন দর্শন ভূটিয়াদের একটি শুভ লক্ষণ। এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া তাহারা বুঝিল এই ব্যক্তিই রাজা হইবার ঠিক উপযুক্ত। তাহারা তখন তাহাকে রাজা করিল। সেই রাজার বংশই কালানুক্রমে রাজা হইয়া আসিতেছে। সিকিমের এখনকার রাজা সেই আদি রাজের চতুর্দ্দশ বংশধর। ইনি শুনিয়াছি—শিষ্ট শান্ত ধার্ম্মিক পুরুষ। এই রাজ বংশ ছাড়া সিকিমে অন্য কেহ রাজা হইবার নিয়ম নাই। কিন্তু এসম্বন্ধে ভূটানের নিয়ম ঠিক স্বতন্ত্র। ভূটানে জোর যার মুলুক তার। রাজার সামান্য চাকর যদি রাজাকে মারিতে পারিল ত সেই রাজা হইয়া গেল। তাছাড়া ভূটানের রাজা একজন লামা, লামাগণ বিবাহ করিতে পারেন না—সুতরাং রাজবংশ বলিয়া কিছু সেখানে নাই। ভূটানের বর্ত্তমান রাজা একজন বালক লামা। তাহার স্থানে মন্ত্রীরাই রাজত্ব করিতেছে—মারামারি কাটাকাটির আর সেখানে অন্ত নাই। ছাগল ভেড়া মারিতে যেমন সভ্য দেশের লোকের সঙ্কোচ নাই—মানুষ মারাটাও সেখানে তেমনি পশুমারার মধ্যে, যে যাহাকে মারিতে পার। ইংরাজেরা তাহাদের কাছে বড় একটা অগ্রসর হইতে চাহেন না, সিকিমের সহিত ইংরাজের যেরূপ সন্ধি হইয়াছে, ভূটানের সহিতও ঠিক সেই মর্ম্মে সন্ধি হইয়াছে—কিন্তু তাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিলেও ইহাঁরা চোখ বন্ধ করিয়া থাকেন। আর সিকিংরাজের দায়ীত্ব দিন দিনই বাড়িতেছে, তাঁহার রাজ্য কবে যায়, সর্ব্বদাই তিনি সশঙ্কিত। সিকিমের লোকেরা নিতান্ত সরল—শান্তিপ্রিয় সদাচারী। এমন কি পথিক যদি হাজার টাকা লইয়া রাস্তায় রাখে—কেহ তাহার জিনিস লইবে না, তবুত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে তাহাদের সরলতা হ্রাস হইয়াছে। সিকিমের অবস্থা দেখিয়া তিব্বতীরা ইংরাজের উপর বিশেষ বীতরাগ। তাহারা ভাবে একবার ইংরাজদের যদি তাহারা দেশে ঢুকিতে দেয় তবে আর তাহাদের দেশ তাহাদের থাকিবে না। এ সম্বন্ধে তাহারা এত সাবধান যে ইংরাজ দূরে থাক—ভারত বর্ষীয় কাহারো তিব্বত যাইতে হইলেও বহু হাঙ্গাম করিয়া যাইতে হইত। সম্প্রতি শরৎ বাবু তিব্বত হইতে ফিরিবার পর হইতে তিব্বত যাইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এমন কি তাহারা এত সাবধান হইয়াছে যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—তিব্বতের যে সকল লোক দারজিলিং অঞ্চল কিম্বা নীচে আছে তাহারা যদি কয়মাসের মধ্যে দেশে না ফেরে ত তাহারাও পরে তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শরৎ বাবু যখন তিব্বত যান তখন নেপালী লামা বলিয়া আপনাকে পথে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তিব্বতে গিয়া তাসি-লাম্পোর প্রধান মন্ত্রীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষার্থী পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাসি-লামা তাঁহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন—এবং তাঁহারি কৃপায় তিনি নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিতে সক্ষম হইয়াছেন। শরৎ বাবুকে তিনি নিতান্ত কৃপা দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—

তাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন, তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিখিতেন ইত্যাদি। অন্যেরা কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদের ছদ্মদূত বলিয়াছিল কিন্তু সে কথা তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বা স করিয়াছিলেন। এইরূপ দুইবার তিব্বত ভ্রমণের পর শরৎ বাবু দেশে ফিরিলে মেকলে যথন তিব্বত মিশনে গমন করেন—তথন তিব্বতীদের স্থির বিশ্বাস হয়—শরৎ বাবু ছদ্মরূপে তিব্বতে আসিয়া তিব্বতের সব জানিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাসের ফল শরৎ বাবুর সিকিম ও তিব্বতের বন্ধুদিগের উপর অতি ভয়ানক হইয়াছে। সিকিমে শরৎ বাবুকে যাহারা আশ্রয় দিয়াছিল—তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে—তাহারা দেশতাড়িত হইয়াছে, এমন কি মাননীয় তাসি লামা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী—তিনিও পদচ্যুত হইয়াছেন। আর শুনিতেছি শরৎ বাবুর মাথার উপর তাহারা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহাকে একটু সশঙ্কিত থাকিতে হয়—কবে কোন গুপ্তচর তাঁহাকে গুপ্ত করিয়া ফেলে।

শরৎ বাবু গল্প করেন—তিব্বতের লামা বেশ বুদ্ধিমান, তাঁহার শিক্ষার দিকে বিশেষ অনুরাগ আছে, তিনি নূতন যা শিখিতেন অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া লইতেন। শরৎ বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—ইংরাজি জ্যোতিষ বলে—পৃথিবী সূর্য্য ভ্রমণ করে ইত্যাদি। তিনি ইংরাজদের এই অনুমান শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলেন।

লামাদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের কথা শুনা যায়—তাহাতে মনে হয়—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে অল্পদিনের মধ্যে তিব্বতের যেমন উন্নতি হয় আমাদিগের এতদিনেও তাহা হয় নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অন্নের চিন্তাতেই ব্যস্ত, কিন্তু লামাদিগের মধ্যে যথার্থ ব্রাহ্মণ রীতি বিদ্যমান, তাঁহারা জ্ঞান চর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চাতেই সমস্ত জীবন দান করিতে পারেন।

তিব্বতে ফলিত জ্যোতিষের শুনিলাম বেশ চর্চ্চা আছে। লামা বলিলেন—এখানে ঘুম ষ্টেশনের কাছে একজন জ্যোতিষী লামা আছেন, জন্মদিন জানিলে ইনি নাকি জীবনের সমস্ত ঘটনা বলিয়া দিতে পারেন। ইনি অঙ্ক শাস্ত্র খুব ভাল জানেন। জাতিতে ইনি মঙ্গলিয়া—কিন্তু তিব্বতে ইনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তিব্বতের মধ্যেও ইনি একজন পণ্ডিত লোক বলিয়া বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ মাসে মাসে ৪০ কি ৫০ এইরূপ একটি মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতেছেন—এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে তিব্বতীয় গ্রন্থ আছে, ইঁহা দ্বারা তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইবেন।

তিব্বতের একটি আচার আমাদের নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শুনিয়াছ তিব্বতে পাণ্ডবদিগের ন্যায় সমস্ত ভ্রাতা এক পত্নী গ্রহণ করে। এইরূপ বিবাহই তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিবাহ। তিব্বতীরা বলে—যদি সমস্ত ভাই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করে—তাহা হইলে পরিবারের বল হানি অর্থ হানি হইয়া সমস্ত সংসার ছারখার হইয়া যায়। তিব্বতে এইরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত বলিয়া কাহারো পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা অপমান

জনক। সন্তানগণ মাতার স্বামীদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহাকেই পিতা বলে, অন্যকে খুল্লতাত বলে। শুনিলাম আজকাল এইরূপ বিবাহের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে।

আমরা এইরূপ বিবাহের নিন্দা করায় লামা বলিলেন—"আপনারা এইরূপ বিবাহ দূষ্য বলেন—কিন্তু আপনাদের মধ্যে পুরুষেরা যে কতকগুলি করিয়া বিবাহ করেন তাহাত সমান দূষ্য। কেবল তাহাই নহে—স্ত্রী মরিতে না মরিতে বাঙ্গালীরা যে আবার একটা বিবাহ করিয়া বসেন—ইহা আমাদের নিকট বড়ই ঘৃণাজনক, এরূপ কথা শুনিলেও আমরা থুথু ফেলি। স্ত্রী মরিলে বিবাহ না করাই আমাদের পক্ষে প্রশংসার কার্য্য; ছেলে পিলে থাকিলে প্রায়ই লোকে বিবাহ করে না, আর যদিও করে, ১০ বৎসরের কমে করে না। তবে যদি ছেলেপিলে না থাকে ত ৩ বৎসর পরে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তিন বৎসরও এরূপ বিবাহের পক্ষে নিতান্ত অল্প সময়, সাধারণতঃ এইরূপ স্থলে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত লোকে বিবাহ করে না। কেবল ইহাই নহে, দ্বিতীয়বার স্ত্রীগ্রহণ প্রকৃত বিবাহ নহে, বিবাহের মত উৎসব প্রভৃতি ইহাতে কিছুই নাই।"

বিবাহের এই নিয়ম স্ত্রী পুরুষের পক্ষে একই রকম। কেবল বিবাহ কেন—তিব্বতে—এ অঞ্চলেও স্ত্রী পুরুষের অধিকার অনেক বিষয়ে প্রায় সমান। মেয়েরাত অন্তঃপুর বদ্ধা নহেই, তাহারা স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া অভিনয় করে, নৃত্যগীত করে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিলে স্ত্রীলোকে তাহাদিগকে পরিবেশন করে—তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয় ইত্যাদি।

আমার ভারী ইচ্ছা একবার ইহাদের ভদ্র স্ত্রী পুরুষের নৃত্য গীত অভিনয় দেখি। লামা এইরূপ একটি অভিনয়ের যোগাড় করিতে প্রতিশ্রুতও হইয়াছেন, তবে আমরা যদি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরি তাহা হইলে দেখিতেছি সে অভিনয় দেখার সুখ অদৃষ্টে ঘটিবে না। তবে রাস্তায় ভুটিয়ারা মাঝে মাঝে যেরূপ গান গাহিয়া যায়—তাহাই যদি তাহাদের গানের নমুনা হয়, আর সে নাচটাও ঐ গানের সামঞ্জস্য মাফিক কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে কিন্তু এ সুখে বঞ্চিত হইলেও আপশোষ করার কিছুই থাকে না। সে গান ঠিক ধাঙ্গড়ের চীৎকার, আর নাচটাও অবশ্য কোনরূপ বিকট লম্ফঝম্প হইবে।

শরৎ বাবুর তিব্বত ভ্রমণে ভুটিয়া গানের একটি ইংরাজি তর্জ্জমা আছে, ভুটিয়াদের সুর যেরূপ শুনিয়াছি—সে হিসাবে গানের কথা গুলি কিন্তু অনেক ভাল।

আমি সেই অনুবাদের আবার একটা বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছি—দুইটাই এইখানে তুলিয়া দিই।

All here assembled prey attend.
The eagle is the king of birds when he rises all rise,

The lion is the king of the beasts when he leaps all leap
He that drinks is prince of speech, when he speaks all hear.

Though birds are many the king eagles are few,
Though flowers are many the udumwara (fabulous lotus,) are rare,
Though marsh lions are many white lions are few
Though devotees are many saints are but few,
Though wines are many nectar is rare.

মহাশয়গণ, করুন শ্রবণ।
বাজপক্ষী পাখীদের রাজা
সে উড়িলে সবে উড়ে যায়।
কেশরী সে পশুদের রাজা
সে লাফালে সকলে লাফায়।
মাতাল সে বচন-বাগীশ
সেইজন কথা কয় যবে
মন দিয়া শোনে আর সবে।

পাখী বটে অনেক সংসারে
বাজপাখী কটি আছে বল্?
ফুল বটে ফেলাছড়া যায়
কমলিনী নিতান্ত বিরল।

সিংহের ত নাহি কিছু কমি
ঝোপে ঝাপে মেলে শত শত,
বলদেখি তার মাঝ থানে
শ্বেতসিংহ দেখিয়াছ কত?

সাধুলোক মেলে কয়জন!
সন্ন্যাসী ত পথে ঘাটে সব,
সুরাত অনেক রহিয়াছে
সুধা কিন্তু বড়ই দুর্ল্লভ।

কবিতা ও কবি।

জীবের যেমন প্রাণ কবিতার তেমনি ভাব, ভাবময় কবিতাই কবিতা—একথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই যে সর্ব্ববাদী সম্মত কবিতার প্রাণ স্বরূপ ভাব, ইহা জিনিসটা কি? সংসারে এমন কি বস্তু আছে বা কথা আছে যাহা দেখিলে বা শুনিলে আমাদের মনে কোন না কোনরূপ ভাবের উদয় না হয়? যখন একটা কুকুর আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে, তাহাতেও কি একটা ভাব নাই? কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ত আর কবিতা বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁটা' পড়িয়া কেহ তাহার ভোটকাগন্ধে মুগ্ধ হইবেন—কেহ বা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু তাহা কি কবিতা? না এই ভোটকা গন্ধই কবিতার ভাব?

না তাহা নহে। যে ভাব মধুর, সুন্দর, আদর্শ স্বরূপ, যে ভাব দ্বারা প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন লাভ ঘটে, অন্ততঃ সেই মিলন পথে আমাদের লইয়া যাইতে যে ভাবের চেষ্টা—তাহাই কবিতার ভাব। যে কবিতায় এই রূপ ভাবের যত আধিক্য সেই কবিতাই তত শ্রেষ্ঠ।

বায়রণ অসামান্য প্রতিভাশালী ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার অন্তরদৃষ্টির তীক্ষ্ণতার অভাব নাই, তথাপি তিনি সেলি হইতে নিম্নদরের কবি—কেন না তাঁহার কবিতা প্রাণময়—সেলির আত্মাময়।

বায়রণ সুনিপুণ চিত্রকর, সংসারে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই জ্বলন্ত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন; বায়রণ সংসারের কঠোর সমালোচক। সমালোচনার দৃষ্টিতে তিনি সংসার খুঁটিনাটি করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সংসারের প্রাণ ভেদ হইয়াছে, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেখানে তিনি রত্ন দেখিবার আশা করিয়াছিলেন সেইস্থান জঞ্জালপূর্ণ দেখিয়াছেন, সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, প্রেমের নামে লালসা, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলের ছড়াছড়ি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তিনি সংসারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু সত্য—যাহা কিছু মঙ্গল, তাহার প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়াছেন—সংসারকে কেবল ঘৃণার ভ্রূকুটিতে দেখিয়াছেন।

এমন কি সংসারের চপলতার মধ্যে তিনি যখন প্রেমের অপার্থিব ভাব কল্পনাও করিয়াছেন,—কল্পনা করিতে করিতেই তিনি চমকিয়া উঠিয়াছেন—সে কল্পনা যে তাঁহার কল্পনা মাত্র তাহা বুঝিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন—"তাহা এখানে কোথা।"

Yes, love indeed is light from heaven
A spark of that immortal fire,
With angels shared by Allah given
To lift from earth our low desire.

Devotion wafts the mind above
But heaven itself descends in love.
A feeling from the Godhead cought,
To wean from self each sordid thought,
A ray of Him who formed the whole,
A glory circling round the soul!
I grant my love imperfect, all
That mortals by the name miscall.

প্রেম কত উচ্চ বস্তু তাহা তিনি জানেন—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এ পৃথিবীতে তাহা পাওয়া যায় না।

কিন্তু সেলির দৃষ্টি আর একরূপ। তিনি সংসারের অতীত হইয়া সংসার দেখিয়াছেন, অসীমতার মধ্য দিয়া সীমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তিনি সংসারের অত্যাচারে, পাপে তাপে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রপীড়িত, অথচ তাহাতে নিরাশ হইয়া পড়েন নাই তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস কিছু মাত্র টলে নাই, কেননা তিনি তাঁহার দিব্য চক্ষে, মিথ্যার মধ্যে সত্য, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, প্রাণের মধ্যে আত্মা সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেতেই পূর্ণ আত্মার প্রসাদ ব্যাপ্ত, কালে ইহা হইতে মনুষ্য পূর্ণতা লাভ করিবে—এই দৃঢ় পবিত্র বিশ্বাসে তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ হইয়াছে।

বায়রণের দৃষ্টি জগতের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেলির দৃষ্টি জগদতীত সত্য রাজ্যে পৌঁছিয়াছে—এবং এই জগদতীত রাজ্যের সহিত জগতের যে সূক্ষ্ম বন্ধন তাহা তিনি দেখিয়াছেন। সুতরাং বায়রণের কবিতা এই স্থূল জগতের, সেলির সূক্ষ্ম জগতের; বায়রণ ভাবকেও শরীর দিয়া মর করিয়াছেন—সেলি শরীরকেও ভাব দিয়া অমর করিয়াছেন। দুজনেরি ক্ষমতা অসীম, অথচ দুজনের কবিতায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

বায়রণ কোথাও এরূপ ভাবের কথা বলিতে পারেন নাই—

Spirit of Nature! thou
Life of interminable multitudes:
Soul of those mighty spheres;
Whose changeless paths through heaven's deep silence lie;
Soul of that smallest being
The dwelling of whose life
Is one faint April sun-gleam;—
Man, like these passive things,

Thy will unconsciously fulfilleth:
Like theirs, his age of endless peace;
Which time is fast maturing,
Will swiftly, surely, come;
And the unbounded frame which thou pervadest
Will be without a flaw
Marring its perfect symmetry.

কবির হৃদয় নিহিত এই যে ভাব ইহা আলোকের ন্যায় নিজেও উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করে—এবং নিজের সংসর্গে যাহাদের পায় তাহাদেও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আলোক যেমন ইথরের আন্দোলন, জগতের সহিত অন্তরের মিলন-জনিত কবি হৃদয়ের যে আন্দোলন তাহাই তাঁহার কবিতার ভাব। ইথরের আন্দোলন যে স্থলে যতই ঘন ঘন, আলোকও যেমন সেই স্থলে ততই বহুদূরব্যাপী এবং উজ্জল—সেইরূপ বিশ্বসংসারের সহিত নিজের যেখানে যতই ঘনিষ্ঠ মিলন সেইখানেই এই ভাবের তত গভীরতা। সুতরাং ছন্দোবন্ধে কথা সাজাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, কবিত্ব একটি অতীন্দ্রিয় শক্তি,—যাঁহার এই শক্তি যত অধিক তিনিই তত উচ্চ কবি, তিনিই তত অধিক পরিমাণে জগতের অন্তর নিহিত ভাব চয়ন করিয়া—জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম। এই জন্যই মহাকাব্য কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই হোমর হইতে বাল্মীকি বহু উচ্চে দণ্ডায়মান, এই জন্যই বায়রণ সেলির নিকট দাঁড়াইতে অক্ষম,—আর এই জন্যই আজকাল বাঙ্গলায় কবিতার ছড়াছড়িতেও কবি এবং কবিতা উভয়ই বিরল।

সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে পদার্পণ।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র সেন তাঁহার রচিত আত্মা ও অহম্বৃত্তি নামক প্রবন্ধে কিরূপে আপনার কথা আপনিই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছি; আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিপিন বাবু "আর কি কোন শাখা নাই" এই নামের একটি প্রবন্ধে আপনাকে পতন হইতে বাঁচাইবার জন্য পাকচক্রময় নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নহে। তাঁহার এবারকার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাঁকা পথে যাইতে পারিলে তিনি

পারৎপক্ষে সোজা পথে পদার্পণ করেন না। জটিল ঘোরালো পাকচক্রময় বাঁকা পথের গুণ ঢের—তাহা আমরা জানি; কাটবিড়ালীকে যেমন এ-শাখা হইতে তাড়া করিলে ও-শাখা আরোহণ করে, ও-শাখা হইতে তাড়া করিলে অন্য এক শাখা আরোহণ করে, সেইরূপ জটিল পথের অনুপন্থীকে এ দিক্ দিয়া তাড়া করিলে তিনি স্বচ্ছন্দে ও দিক্ দিয়া পলায়ন করিতে পারেন, ও দিক্ দিয়া তাড়া করিলে অন্য আর-এক দিক্ দিয়া পলায়ন করিতে পারেন—এটি তাঁহার সামান্য সুবিধা নহে। কিন্তু পাকচক্রময় জটিল পথের দোষও আবার তেমনি; সেখানে সকলই "অজ্ঞেয়", কিছুই দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় না, যা'ব উত্তরে—যাই দক্ষিণে, উঠিব পর্ব্বতে—পড়ি অন্ধ কূপে, বিপত্তির সীমা পরিসীমা নাই! সে গোলোক ধাঁদার ভিতর একবার প্রবেশ করিলে ক্রমাগতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতে হয়—তথা হইতে উদ্ধার পাওয়াই দুষ্কর। তাই আমরা বিপিন বাবুকে বলি যে, তাঁহার সম্মুখে দিব্য পরিষ্কার সোজা পথ পড়িয়া আছে—তাহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি জটিল পাকচক্র-ময় বাঁকা পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মিছামিছি কষ্ট পা'ন কেন? অনর্থক কথার ঘোর ফের করিয়া লাভ কি? লাভের মধ্যে কেবল—শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় এবং লোকের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়, এ ভিন্ন আর তো কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাংখ্যসার-প্রণেতা যেখানে বলিতেছেন "আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলে দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধ হয়" বিপিন বাবু সেখানে বলিতেছেন "সামান্যতো দৃষ্ট নামক যে এক প্রকার অনুমান আছে সেই অনুমানের বলে দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়।" ইহার বিরুদ্ধে আমরা বিপিন বাবুকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, "সামান্যতঃ সিদ্ধ" এই তিল-প্রমাণ কথাটির ভিতর হইতে "সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানতঃ সিদ্ধ" এরূপ একটা তাল প্রমাণ অর্থ টানিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রভূত টীকা ও ভাষ্যে প্রবন্ধের পংক্তি-পূরণ করা অপেক্ষা—"সামান্যতঃ সিদ্ধ কি না সাধারণতঃ সিদ্ধ" উহার এইরূপ সোজা অর্থ গ্রহণ করিলেই তো চলিতে পারে—তবে তাহা না করা হয় কেন? বর্ত্তমান স্থলে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ এ দুয়ের প্রভেদ সোজাসুজি এইরূপ বুঝিলেই হয়, যথা;—আমি যখন লিখিতেছি তখন বিশেষতঃ আমি আপনাকে লেখক বলিয়া জানিতেছি; আমি যখন পড়িতেছি তখন বিশেষতঃ আমি আপনাকে পাঠক বলিয়া জানিতেছি; কিন্তু আমি যখন লিখিতেছি তখনও আমি জানি যে, আমি লিখিতেছি, আর, আমি যখন পড়িতেছি তখনও আমি জানি যে, আমি পড়িতেছি; অতএব, সাধারণতঃ সকল সময়েই আমি আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি। তবেই হইতেছে যে, 'আমি জানিতেছি' এইরূপ বুদ্ধি-বলে জ্ঞাতা সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণতঃ সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ, এক ব্যক্তি লিখিতেছেন, আর-এক ব্যক্তি পড়িতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি ছবি আঁকিতেছেন;—লেখক মনে জানেন যে, আমি লিখিতেছি; পাঠক মনে জানেন যে, আমি পড়িতেছি; চিত্র-

কর মনে জানেন যে, আমি ছবি আঁকিতেছি, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই মনে জানেন যে, আমি জানিতেছি ; এখানেও দেখা যাইতেছে যে, "আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধি-বলে সামান্যতঃ (অর্থাৎ সাধারণতঃ) দ্রষ্টার (অর্থাৎ জ্ঞাতার) অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আমাদের এ কথা শুনিয়া বিপিন বাবু হয় তো বলিবেন যে, "তোমরা বলিবে বৈ কি—সামান্যত শব্দের অর্থ সাধারণতঃ; তোমোদের মতো লোকের বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্তই বটে ! সামান্যতঃ শব্দের অর্থ যে, কি, তাহা আমার কাছে শেখো—এটি পরম গুহ্য—সামান্যতঃ শব্দের অর্থ "সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান-প্রসাদাৎ।" সোজা পথে আমরা দিব্য সূর্য্যালোকে বিচরণ করিতেছিলাম; বিপিন বাবু আমাদিগকে বিষম এক বাঁকা পথে আনিয়া অকূল পাথারে ফেলিয়া দিলেন! "আমি জানি" এই সাক্ষাৎ-জ্ঞানটি বিপিন বাবুর মতে অনুমান মাত্র। বিপিন বাবু এক তো সাক্ষাৎজ্ঞানকে অনুমান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আবার মূল শ্লোকটির সোজা অর্থটিকে লইয়া এরূপ প্যাঁচাও জিলিপি পাকাইয়াছেন যে, তাহার অন্ধি-সন্ধি পাওয়া ভার। ইহাতেও ক্ষান্ত না থাকিয়া বিপিন বাবু সাংখ্যদর্শনকে তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষী মান্য করিয়াছেন ; কিন্তু কোন দর্শনই যাহা আজিও বলে নাই—সাংখ্য দর্শন তাহা কিরূপে বলিবেন ? সুতরাং সাংখ্য-দর্শন বিপিন বাবুর বিপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বিপিন বাবু সাংখ্য দর্শন হইতে নিম্ন লিখিত ভাষ্য-বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা;—"পুরুষে তু যদ্যপ্যনুমানাপেক্ষা নাস্তি সর্ব্ব সম্মতত্বাৎ" ইহার অবিকল অর্থ আমরা তো এই বুঝি যে, পুরুষ (অর্থাৎ আত্মা) যদিও অনুমান-সাপেক্ষ নহে, যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদিসম্মত।" অতএব ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে যে, বিপিন বাবু আপনিই সাংখ্য ভাষ্যের উপরি-উক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, আবার আপনিই অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-দর্শনের মতে আত্মা অনুমান-বলে সিদ্ধ হয়। সাংখ্য-দর্শন তো আত্মাকে অনুমান-সিদ্ধ বলিতেছেন না, প্রকৃত্যাদি বিবেককেই অনুমান-সিদ্ধ বলিতেছেন, যথা ;

"পুরুষে তু যদ্যপ্যনুমানাপেক্ষা নাস্তি সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তথাপি প্রকৃত্যাদি বিবেকে সামান্যতো দৃষ্ট মেবাপেক্ষ্যতে। তদ্যথা—প্রধানং পরার্থং সংহত্য কারিত্বাদ্ গৃহাদিবদিতি। অত্র হি প্রত্যক্ষসিদ্ধং দেহাদ্যর্থকত্বং গৃহাদিষু গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়ঃ পুরুষঃ প্রধানাদিপরত্বেনা নুমীয়তে।"

ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা যদিও অনুমান-সাপেক্ষ নহে যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদি-সম্মত, তথাপি প্রকৃত্যাদি বিবেক (সামান্য তো দৃষ্ট নামক) অনুমানকে অপেক্ষা করে,—সে কেমন ? না দেহাদির উপকার সাধনই গৃহাদির একমাত্র উদ্দেশ্য এটা যখন সকলেরই প্রত্যক্ষ দেখা আছে, তখন তাহা হইতেই এটা অনুমান করা যাইতে পারে যে, আত্মার ভোগ-মোক্ষ সাধনই প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য, অতএব, দেহাদি যেমন গৃহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা সেইরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।" ইহাতে এইটিই কেবল প্রমাণ হইতেছে

যে, সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি-বিবেক (অর্থাৎ আত্মার ভোগ মোক্ষ সাধনই প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য অতএব আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই বৃত্তান্তটি) সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান-সাপেক্ষ; তা ভিন্ন এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, আত্মা স্বয়ং অনুমান-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে—সাংখ্য-দর্শনের মত এই যে; প্রকৃতি হইতে আত্মার ভিন্নতাই—প্রকৃতি-বিবেকই—অনুমান-সাপেক্ষ, কিন্তু আত্মা স্বয়ং অনুমান-সাপেক্ষ নহে— যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব, বিপিন বাবু সাংখ্য ভাষ্য-হইতে যতগুলা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সমস্তই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সাংখ্য-দর্শনের মতে অনুমান তিন প্রকার, আর তাহার মধ্যে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারাই প্রকৃতি-বিবেক সিদ্ধ হয়, এইটি দেখাইবার জন্য বিপিন বাবু রাশি রাশি ভাষ্য-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন!. মানিলাম সাংখ্য-দর্শনের মতে অনুমান তিন প্রকার—মানিলাম সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান-বলে প্রকৃতি-বিবেক সিদ্ধ হয়—সমস্তই মানিলাম, কিন্তু তাহাতে কাহার কি আসিতেছে যাইতেছে? তাহাতেই কি প্রমাণ হইতেছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে আত্মাও অনুমান বলে সিদ্ধ হয়? সাংখ্য-দর্শন হইতে এই যে একটি কথা বিপিন বাবু স্বহস্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আত্মা অনুমান-সাপেক্ষ নহে যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদি-সম্মত, এ কথাটি কি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া গেল? সাংখ্য-দর্শনের এ কথাটি নাকি সোজা কথা—তাই ইহা তাঁহার পছন্দ হয় নাই। আত্মা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ হয়—একথাটা শুনিতে কেমন জম্‌কালো! কেমন ঘোরালো জটিল ও প্যাঁকচক্রময়! ইহার তুলনায় "আত্মা স্বতঃসিদ্ধ অথবা সর্ব্ববাদি-সম্মত" এ তো একটা অতীব যৎসামান্য কথা, এরূপ কথা তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে—ইহা নগণ্যেরই মধ্যে! যাহা হউক্—বিজ্ঞান-ভিক্ষু যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "আত্মা অনুমান-সাপেক্ষ নহে যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদি সম্মত" তখন অন্ততঃ লোক-রক্ষার্থেও তাহার প্রতি অধিক নয়—যৎকিঞ্চিৎ—কৃপা-কটাক্ষ করিলে দেখিতে ভাল দেখাইত; বিশেষতঃ যখন বিপিন বাবু নিজেই উহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া আপনার প্রবন্ধ-মধ্যে স্থান-দান করিয়াছেন।

বিপিন বাবু আরো বলেন এই যে, "এই তো গেল মূল সূত্রের উপর বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য। তাহার পর স্বপ্রণীত সাংখ্যসার গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ঠিক্ ঐ সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান-বলেই প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন," প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন—কিন্তু হে সুপণ্ডিত বিচারক! এখানে প্রকৃতির অস্তিত্বের কথা হইতেছে না—আত্মার অস্তিত্বের কথা হইতেছে! তাহা বলিলে কি হয়—বিপিন বাবু পুঁথি খুলিয়া সাংখ্য-সারের প্রসিদ্ধ বচনটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন "প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান বলে সিদ্ধ করিয়া ঠিক্ তাহার পর-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিতেছেন—

"তত্র সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেঽমিতি ধীবলাৎ
দ্রষ্টা তো নিত্য বিভ্বাদি ধর্ম্মৈরেব স সাধ্যতে।"

এখন আমরা এই শ্লোকের অর্থ কি করিব ?" কি করিবেন তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন! সম্মুখে দিব্য সোজা পথ পড়িয়া আছে—তাহাই অবলম্বন করুন! তাহা ছাড়া করিবার আছেই বা কি—করিতে চাহেনই বা কি? প্রকৃতির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির অস্তিত্ব সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ হয়, অতএব বিপিন বাবু বলুন যে, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান-সিদ্ধ; এই গেল প্রকৃতির অস্তিত্ব। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান-ভিক্ষু এ কথা বলেন নাই যে, আত্মা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান-বলে সিদ্ধ হয়—তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি বলে দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধ হয়;—আমি জানি এরূপ বুদ্ধি কিছু আর অনুমান নহে;—আমি যদি বলি যে, আমার অনুমান হইতেছে যে, আমি আপনাকে এই প্রবন্ধের লেখক বলিয়া জানি—তবে তাহা শুনিয়া বিপিন বাবু কত না হাস্য করিবেন! অতএব বিপিন বাবু বলুন যে, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে আত্মা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ হয় না কিন্তু আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি বলেই আত্মা সামান্যতঃ সিদ্ধ হয়। মোট কথা এই যে, সাংখ্য-দর্শনের মতে—আমি আছি এই সামান্য বৃত্তান্তটি (আত্মার অস্তিত্ব) 'আমি জানি' এই-রূপ বুদ্ধি-বলে সিদ্ধ হয়; আর 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এই বিশেষ বৃত্তান্তটি (প্রকৃতি-বিবেক) অনুমান-বলে সিদ্ধ হয়। এই তো সোজা পথ পড়িয়া আছে, এমন পরিষ্কার সোজা পথ থাকিতে বাঁকা পথে না গেলেই কি নয়? বিপিন বাবুর অভিপ্রায় মতে "সামান্যতঃ সিদ্ধ" এই ক্ষুদ্র কথাটির যদি এইরূপ অর্থ করা যায় যে, সামান্যতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ-কিনা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমাণ-বলে সিদ্ধ, তবে তাহাতে দুইটি দোষ হয়, যথা,—প্রথম দোষ আর কিছু না—যাহাকে ইতর ভাষায় বলে "বারো হাত শঁসা'র তেরো হাত বিচি।" শঁসাটি বারো হাত বই নয়, কিন্তু তাহার অগণ্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজই তেরো হাত! সামান্যতঃ সিদ্ধ ইহার অর্থ যদি "সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ" এতখানি লম্বা হইতে পারিল, তবে "বিশেষতঃ সিদ্ধ" এ শব্দের অর্থও ঐরূপ না হয় কেন? যথা; বিশেষতঃ সিদ্ধঃ কিনা বিশিষ্টরূপে শেষতঃ সিদ্ধঃ কিনা—বিশিষ্টরূপে শেষবৎ অনুমান বলে সিদ্ধঃ! কিন্তু এরূপ পাকচক্র ময় জটিল পথে না গিয়া যদি "সামান্যতঃ সিদ্ধ" এই সহজ কথাটির এইরূপ সহজ অর্থ করা যায় যে, সামান্যতঃ সিদ্ধ কিনা সাধারণতঃ সিদ্ধ, তবে উদ্ধৃত শ্লোকটির অর্থ কেমন সুন্দর—কেমন বিশদ—কেমন সহজ—মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই দেখাইয়াছি। সামান্যতঃ সিদ্ধ কি না সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ—এরূপ পেঁচা-ইয়া অর্থ করিবার দ্বিতীয় দোষ এই যে, বিজ্ঞান ভিক্ষু যখন একস্থানে অতীব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, আত্মা অনুমান সাপেক্ষ নহে—যেহেতু আত্মা সর্ব্ববাদি সম্মত, তখন তিনি আর একস্থানে কখনই এরূপ কথা বলিতে পারেন না যে, আত্মা সামান্যতো

দৃষ্ট অনুমান বলে সিদ্ধ হয়—যদি বলেন তবে তিনি অতীব একটি গুরুতর দোষে লিপ্ত হইয়া পড়েন, সে দোষটির নাম সাধু ভাষায় বদতো-ব্যাঘাত, ইতর ভাষায়—এক মুখে দুই কথা।

বিপিন বাবুর হস্তে পড়িয়া বিজ্ঞানভিক্ষুর এই তো দুর্দ্দশা! বিজ্ঞান-ভিক্ষুরই যখন এইরূপ তখন আমাদের তো কথাই নাই। আমরা অপরাধের মধ্যে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, ঘটজ্ঞানের বেলায় ঘটপদার্থ আমাদের বাহিরে, ঘটজ্ঞান আমাদের অন্তরে, সুতরাং ঘটজ্ঞান এবং ঘটপদার্থ এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে; কিন্তু অহং জ্ঞানের বেলায়—অহংপদার্থও আমাদের অন্তরে অহংজ্ঞানও আমাদের অন্তরে; আরো আমরা বলি এই যে, উভয়েই আমাদের অন্তঃকরণের সকল অবস্থারই মূলবর্ত্তী সাক্ষীস্বরূপ; সুতরাং অহং পদার্থ এবং অহংজ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে আদবেই কোন ব্যবধান নাই; অহং পদার্থও যা—অহং জ্ঞানও তা—একই। আমরা কি কথা বলিলাম—কেন বলিলাম—আমাদের কথার তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—তাহার প্রতি বিপিন বাবু কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, "আবার সেই পুরাতন কথা! আমরা যে আত্মা ও অহম্বৃত্তি প্রবন্ধে এত করিয়া দেখাইয়া মরিলাম যে, বেদান্ত শাস্ত্রাদি-মতে আত্মা বলিতে এক বুঝায়—অহম্বৃত্তি বলিতে আর-এক বুঝায়, আত্মা অর্থে নির্বিশেষ কূটস্থ ব্রহ্ম, ও অহম্বৃত্তি অর্থে সবিশেষ দেহস্থ জীব; অতএব এতদুভয় কদাপি এক হইতে পারে না; দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদের সে-সকল কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিলেন না।" বিপিন বাবুর এই কথায় আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমরা কাহাকে অহম্পদার্থ বলিতেছি বিপিন বাবু তাহাও বুঝেন নাই—কাহাকে অহংজ্ঞান বলিতেছি তাহাও বুঝেন নাই, আর, আমরা অহংপদার্থের প্রমাণই বা কাহাকে বলি তাহাও বুঝেন নাই। তাঁহার ধী-শক্তির অল্পতা-হেতু তিনি যে, আমাদের কথা বুঝেন নাই, তাহা নহে; আমাদের কথা নাকি অতীব সোজা কথা, এই জন্য তিনি তাহা বুঝেন নাই। সোজা কথার প্রতি এমনি তিনি জাতক্রোধ—সোজা কথা এমনি তাঁহার দুচক্ষের বিষ—যে, তাহার প্রতি তিনি যে, একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিবেন—সেটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেও তাঁহার বিষম যন্ত্রণা মনে হয়,—কাজেই তিনি আমাদের কথার ক অক্ষরও বুঝিতে পারেন না। নিম্নে আমাদের তিনটি সোজা কথা আমরা যথাসাধ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতেছি—বিপিন বাবু তাহা বোঝেন বুঝিবেন—না বোঝেন না বুঝিবেন—বারান্তরে আর আমরা তাঁহার সহিত সে সকল কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিব না, কেন না তাহা করিয়া কোন ফল নাই।

প্রথমতঃ, আমরা অহম্পদার্থ বলি কাহাকে? বিজ্ঞান-ভিক্ষু যে, বলিয়াছেন "দ্রষ্টা"—দ্রষ্টা-শব্দের অর্থ কি? যে দেখিতেছে—সে দ্রষ্টা; কে দেখিতেছে? দ্রষ্টাকে জিজ্ঞাসা কর—তিনি বলিবেন "আমি দেখিতেছি।" অতএব আমিই দ্রষ্টা—অহম্পদার্থই দ্রষ্টা;

অহম্পদার্থই সাক্ষী চৈতন্য; কেননা দ্রষ্টা এবং সাক্ষী এ দুই শব্দের অর্থ একই। আমরা যখনই "অহম্পদার্থ" এই শব্দ উল্লেখ করি, বিপিন বাবু তখনই মনে করেন যে, আমরা বেদান্তের আভাস চৈতন্যকে অথবা সাংখ্যের অহঙ্কারকে লক্ষ করিয়াই "অহম্পদার্থ" এই শব্দ ব্যবহার করিতেছি,—কিন্তু সেটি তাঁহার বড়ই ভুল! অহঙ্কার বা অহংকৃতি বলিলে বুঝায়—কৃত অহং—কৃত্রিম অহং—গড়িয়া তোলা অহং; কিন্তু অহম্পদার্থ বলিলে বুঝায়—অহংবস্তু; বস্তুতই যাহা অহং, বাস্তবিকই যাহা অহং—অহম্পদার্থ বলিতে সেই বাস্তবিক অহংই বুঝায়। আমার এই নশ্বর শরীর পৃথিবীর ধূলি বই নহে অথচ তাহা রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছে বলিয়া সেই সূত্রে আমি আপনাকে পৃথিবীর রাজাধিরাজ মনে করিতেছি—অহংকার-মাত্রই এইরূপ একটা কৃত্রিম কাণ্ড। বেদান্ত, অহংকারকেই—অভিমানকেই—পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন; কিন্তু অহংপদার্থকে ছাড়িয়া এক পদও চলেন না। শিবোঽহং" এখানেও অহং, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এখানেও অহং, "সোঽহং" এখানেও অহং; "তত্ত্বমসি" এখানে যদিচ অহং শব্দটা নাই কিন্তু অহম্ভাব-টি বিলক্ষণই আছে; কেন না, যে তুমি আমার নিকটে ত্বং, সেই তুমি তোমার আপনার নিকটে অহং। অতএব, অহম্পদার্থ, দ্রষ্টা, সাক্ষী-চৈতন্য, আত্মা, এ শব্দ-গুলি সর্ব্বত্রই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—মুখ্য আত্মা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহারি সাক্ষী—

অত্র সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ
দ্রষ্টাতো নিত্য বিভ্বাদি ধর্ম্মৈরেব স সাধ্যতে॥

এখানে দ্রষ্টার নিত্যত্ব এবং বিভুত্ব (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব) এই দুই ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে—কাজেই এখানে দ্রষ্টা-শব্দে বেদান্তের আভাস-চৈতন্য অথবা সাংখ্যের অহঙ্কার বুঝিলে নিতান্তই ভুল বোঝা হয়; যেহেতু, আভাস-চৈতন্য নিত্যও নহে, বিভুও নহে। কাজেই, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে, দ্রষ্টা-রূপী মুখ্য-চৈতন্যই আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলে (এক কথায়—অহংবুদ্ধি-বলে বা অহংবৃত্তি বলে) সিদ্ধ হ'ন। ইহার বিরুদ্ধে বিপিন বাবু বলেন যে, মুখ্য চৈতন্য অহংবৃত্তির বা অহম্প্রত্যয়ের গম্য নহেন। বিপিন বাবু কি বলেন না-বলেন এখন সে কথা থা'ক্—বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমরা দেখাইলাম।

দ্বিতীয়তঃ আমরা অহংবৃত্তি বলি কাহাকে? সামান্যতঃ আমি জানি এইরূপ জ্ঞানকেই আমরা অহংবৃত্তি বলি—অহংপ্রত্যয় বলি—অহংজ্ঞান বলি—অহংবুদ্ধি বলি। এই নিরীহ অহংবৃত্তিটির উপরে বিপিন বাবুর যেরূপ মর্ম্মান্তিক রোষ—বোধ করি বিপিন বাবু অহংবৃত্তিকে কি একটা হেয় পদার্থ ঠাহরিয়াছেন—তিনি হয়তো মনে করেন যে, অহংবৃত্তি অহঙ্কারেরই সামিল। "আমি বড় বুদ্ধিমান পণ্ডিত" এরূপ জ্ঞান অহঙ্কার সূচক বটে; কিন্তু সামান্যত আমি জানি এই যে, একটি জ্ঞান, যাহা চাসারও আছে পণ্ডিতেরও আছে—আপামার-সাধারণ সকলেরই আছে—তাহার জন্য কাহারো গর্ব্বিত

হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না; তাহা আত্মার গভীর অভ্যন্তরে অন্তঃশিলা সরস্বতীর ন্যায় নিঃশব্দে এবং প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে—তাহা রব-দব ও বাহ্যাড়ম্বরে একেবারেই পরাঙ্মুখ। আমরা বলি যে, সামান্যতঃ আমি জানি এইরূপ যে একটি জ্ঞান, যাহা মনুষ্য-মাত্রেরই আছে, তাহাই অহংজ্ঞান বা অহংপ্রত্যয় বা অহংবৃত্তি; আরো এই বলি যে, এরূপ অহংজ্ঞানের সহিত অহম্পদার্থের লেশমাত্রও ব্যবধান নাই; অহংপদার্থও যা—অহংজ্ঞানও তা—একই বস্তু।

তৃতীয়তঃ, আমরা আত্মার অস্তিত্বের (বা অহংপদার্থের অস্তিত্বের) প্রমাণ বলি কাহাকে? আমরা বলি যে, অহংজ্ঞানই—অহম্বৃত্তিই—অহম্প্রত্যয়ই—অহম্পদার্থের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, অহংপদার্থ এবং অহংজ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে কিছু-মাত্র প্রভেদ নাই; অতএব 'অহংজ্ঞান অহং পদার্থের প্রমাণ' এ কথাও যা, আর, 'অহং পদার্থই অহম্পদার্থের প্রমাণ (অর্থাৎ অহং পদার্থ আপনিই আপনার প্রমাণ)' এ কথাও তা—একই। অহং পদার্থ আপনি আপনার প্রমাণ—এই কথাটিরই সংক্ষিপ্ত আকার এই যে, অহংপদার্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ আপনাদ্বারা আপনি সিদ্ধ। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, "আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধি বলে (এক কথায় অহংজ্ঞানের বলে) দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়, ইহার ফল কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। সাংখ্য দর্শনের মতে মূল প্রকৃতি শুদ্ধ-কেবল অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি-জাত বস্তু-সকল কখনও বা প্রত্যক্ষ কখনও বা অনুমান কখনও বা আগম দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য আত্মা অথবা অহংজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির অতিরিক্ত চতুর্থ একটি প্রমাণ—স্বপ্রমাণ—বলিয়া গণ্য করিলে তাহাতে সাংখ্য-দর্শনের মত-বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না। বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাই অহংজ্ঞানকে চতুর্থ প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কিন্তু ঐ চতুর্থ প্রমাণটির স্বতন্ত্র উল্লেখ করা বাহুল্য বিবেচনায় আমাদের দেশের কোন দর্শনকারই তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাঁহাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিবার কারণ শুধু এই যে, অহংজ্ঞান শুদ্ধ কেবল একটি বস্তুরই প্রমাণ—আত্মারই প্রমাণ, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন-কিছুরই প্রমাণ নহে; আর, সেই যে, একটি বস্তু—আত্মা, তাহা আপনিই আপনার প্রমাণ—ইহা সকলেরই জানা কথা, সুতরাং ইহা কাহারও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন করে না। গণিত শাস্ত্রে যেমন ১ বলিলেই বুঝায় যে, তাহা ১×১; তেমনি দর্শন-শাস্ত্রে আত্মা বলিলেই বুঝায় যে তাহা আপনি আপনার প্রমাণ; ১×১=১ এ কথাটি উল্লেখ করা যেমন বাহুল্য—আত্মা আপনি আপনার প্রমাণ এ কথাটি উল্লেখ করাও তেমনি বাহুল্য, এই জন্য দর্শনকারেরা আত্মাকে বা অহংজ্ঞানকে চতুর্থ প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু আবশ্যক মতে সকলেই উহাকে প্রমাণ-মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন; তাহার

সাক্ষী—পঞ্চদশী স্থানে স্থানে স্বানুভূতিকে আত্মার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; বিজ্ঞানভিক্ষু অহংজ্ঞানকে আত্মার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আবশ্যক মতে সকলেই এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সচরাচর দর্শন-কারেরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা প্রমাণকে অপেক্ষা করে না—ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ—তদ্ব্যতীত আত্মা দ্বিতীয় কোন প্রমাণকে অপেক্ষা করে না; তা ভিন্ন—উহার-অর্থ এরূপ নহে যে, আত্মা আপনিও আপনার প্রমাণ নহে—অহংজ্ঞানও আত্মার প্রমাণ নহে। কেননা, আত্মা প্রমাণ-নিরপেক্ষ ইহার অর্থই এই যে, আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ—আত্মা স্বতঃসিদ্ধ।

বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "এই তো আমি বসিয়া বসিয়া আপনাকে আপনি জানিতেছি—তবে ইহাই কি আমার আত্মজ্ঞান হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ?" ইহার উত্তরে আমরা বলি এই যে, বসিয়া বসিয়াই হউক, আর, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই হউক, যেমন করিয়াই আমি আপনাকে আপনি জানি না কেন—'আমি আপনাকে আপনি জানিতেছি' ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। সামান্যতঃ সকল মনুষ্যই আপনাকে আপনি জানে—সকল মনুষ্যেরই আত্মজ্ঞান আছে; সামান্যতঃ সকল মনুষ্যই "আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধি-বলে আপনার অস্তিত্ব আপনি উপলব্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি একজন চাসার আত্মজ্ঞান এবং একজন পরমহংসের আত্মজ্ঞান সমান? সকল মনুষ্যেরই আত্মজ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে যিনি বিবেক বৈরাগ্যের এবং ব্রহ্মানুরাগের অনুশীলন দ্বারা আত্ম-জ্ঞানের সমুচিত স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়াছেন তিনি আত্মার অস্তিত্ব সমধিক পরিষ্কার-রূপে উপলব্ধি করিবেন না তো আর কে তাহা করিবে? ঘোলা জলেও আমরা জলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, আর, স্বচ্ছ জলেও আমরা জলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি,—প্রভেদ কেবল এই যে, স্বচ্ছ জলে আমরা জলের অস্তিত্ব সমধিক পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করি। শঙ্করাচার্য্য এবং প্রাচীন ঋষিরা আপনাদের আত্ম-জ্ঞানকে বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা মাজিয়া ঘসিয়া এরূপ ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আত্মার অবিনাশী অস্তিত্ব তাঁহাদের নিকট করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ ধ্রুব রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। অযত্ন-পালিত বন্যতরুর সহিত প্রযত্ন-পালিত উদ্যান তরুর প্রভেদ কে অস্বীকার করে? অযত্ন-লব্ধ অপক্ক আত্মজ্ঞানের সহিত বিবেক-লব্ধ পরিপক্ক আত্মজ্ঞানের প্রভেদ কে অস্বীকার করে? আমরা তাহা কোথাও অস্বীকার করি নাই—এখানেও অস্বীকার করিতেছি না।

অতঃপর বিপিন বাবু এই বলিয়া তাঁহার একটি পরিচ্ছেদের গোড়া পত্তন করিয়াছেন যে, বেদান্তের মতানুসারে "বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্;" ইহার কয়েক পংক্তি পরেই আবার বলিতেছেন "তুমি যদি নির্বিষয়ী হইয়া প্রকাশ হও, তবেই তুমি আপ-

নার হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি যে আপনাকে বিষয়ীরূপে ভাবিতেছ তাহাতে বিরত হও।" বিপিন বাবু আপনিই বলিয়াছেন যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্—যেমন-তেমন পৃথক্ নহে কিন্তু অত্যন্ত পৃথক্; তবে কেন তিনি পরক্ষণেই আমাদিগকে এরূপ একটা শাস্ত্র-বহির্ভূত উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, "তুমি যে, আপনাকে বিষয়ী-রূপে ভাবিতেছ তাহাতে বিরত হও!" কেন? তুমি আপনিই তো বলিয়াছ যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্; অতএব তোমার আপনারই কথা-অনুসারে এই রূপ দাঁড়াইতেছে যে, আপনাকে বিষয়ীরূপে ভাবাও যা, আর, আপনাকে বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে ভাবাও তা; তুমি কি তবে আপনাকে বিষয়ীরূপে—বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে—ভাবিতে নিষেধ কর? কোন্ বেদান্তশাস্ত্রই তো তাহা করে না! আপনাকে বিষয়ের সহিত জড়িত রূপে ভাবিতেই বারণ; আপনাকে বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে ভাবা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক্, তাহাই সর্ব্বশাস্ত্র-মতে সর্ব্বথা বিধেয়। অতএব বিপিন বাবুর এ কথা যদি সত্য হয় যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্, তবে লোককে এইরূপ উপদেশ দেওয়াই বিপিন বাবুর কর্ত্তব্য যে, "তুমি আপনাকে বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে ভাবো—বিষয়ীরূপে ভাবো;" তাহা না করিয়া বিপিন বাবু এই যে একটা শাস্ত্র-বহির্ভূত উপদেশ লোক সমাজে প্রচার করিতেছেন যে, "তুমি আপনাকে বিষয়ী-রূপে—বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথকরূপে—ভাবিতে বিরত হও"—এটা কি ভাল কাজ! আর কিছু নয়—বিপিন বাবু মিছামিছি বাক্যাড়ম্বর ও বাক্‌চাতুরী করিতে গিয়া আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া গিয়াছেন। বিপিন বাবু তাঁহার নিজের অজ্ঞাত-সারে একই পরিচ্ছেদের ভিতর একই প্রকরণে—বিষয়ী-শব্দকে একবার এক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—আর-একবার আর-এক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; বিপিন বাবুর কোন কথারই কোন স্থিরতা নাই! ইহার জন্য বিপিন বাবুকে আমরা তত দোষ দিই না—তিনি যেরূপ এক সর্ব্বনেশে বাঁকা পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই পথেরই এ দোষ। প্রথম বারে বিপিন বাবু বিষয়ীকে বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; দ্বিতীয় বারে তিনি বিষয়ী-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, বিষয়ী—কি না বিষয়ের সহিত জড়িত—বিষয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ; সুতরাং এবারকার এ অর্থে বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে। লৌকিক ব্যবহার-স্থলে বিষয়ী-শব্দের অর্থ এইরূপই বটে—বিষয়ী কিনা বিষয়-শৃঙ্খলে জড়িত, যথা;—"লোকটা বড় বিষয়ী"—অর্থাৎ অষ্টপ্রহর কেবল বিষয়-কার্য্যেই রত; কিন্তু তাহা বলিয়া তত্ত্বালোচনা-স্থলে বিষয়ী-শব্দ লৌকিক অর্থে প্রয়োগ করিলে চলিবে কেন? শঙ্করাচার্য্য যেখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে বিবেচ্য, সেখানে বিষয়ীকে বিষয়ের সহিত জড়িত করিয়া ভাবিলে চলিবে কেন? তত্ত্বালোচনা-ক্ষেত্রে বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্ যে, আত্মা, তাহাই বিষয়ী শব্দের বাচ্য;—

স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য যখন এইরূপ কথা বলিয়াছেন তখন বেদান্ত-শাস্ত্রের বিচার কালে তাঁহার ঐ কথার বিরুদ্ধে তোমার আমার পক্ষে কথা কহা কি সাজে? ইহার ন্যায় স্পষ্ট আর কি আছে যে, শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি বলিতে যেমন বিষয়-সম্পত্তি বুঝায় না, সেইরূপ বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ ধর্ম্মী বিষয়ী বলিতে বিষয়াক্রান্ত বিষয়ী বুঝায় না। কিন্তু বিপিন বাবু তাহা বোঝেন না! তিনি বলেন যে, বিষয়ের সহিত জড়িত যে, আভাস-চৈতন্য, তাহাই কেবল বিষয়ী-শব্দের বাচ্য, এ ভিন্ন—বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্ যে, আত্মা, তাহা বিষয়ী শব্দের বাচ্য নহে; তাই তিনি শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থোক্ত "অস্মৎ প্রত্যয় গোচর বিষয়ী" এই কথাটির উপলক্ষে বিষম একটা কূটতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, যথা;—"শঙ্করাচার্য্য কিসে অস্মৎ প্রত্যয়-শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন? বিষয়ীরূপ অহং পদার্থে না নির্ব্বিষয়ীরূপ অহম্পদার্থে? আভাস-চৈতন্যে না স্বরূপ-চৈতন্যে?" ইহার উত্তর আমরা এই দিই যে, "নির্ব্বিষয়ী" এরূপ একটা শব্দ শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানেই আত্মা-অর্থে ব্যবহার করেন নাই,—"বিষয়ী" এই শব্দটিই তিনি আত্মা-অর্থে ব্যবহার করিয়া তদুপলক্ষে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্—বিষয়ী এবং বিষয় ছায়াতপের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব—অথচ লোকে ভ্রম-বশতঃ দুইকে জড়াইয়া ঝোলে অম্বলে মিশাইয়া ফেলে। কিন্তু বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ যে, আত্মা, তাহাকে শঙ্করাচার্য্য বিষয়ী বলিতেছেন না! তবে কি? না বিষয়ের সহিত জড়িত যে, আভাস-চৈতন্য, তাহাকেই শঙ্করাচার্য্য বিষয়ী বলিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য নিজ-মুখে যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, বিষয়ী বিষয়-হইতে অত্যন্ত পৃথক্ এবং পৃথক্‌ধর্ম্মী, তখন বিপিন বাবু কোন্ সাহসে এরূপ কথা মুখে আনেন বলিতে পারি না যে, বিষয়ের সহিত জড়িত যে আভাস-চৈতন্য—বেদান্ত-মতে তাহাই কেবল বিষয়ী-শব্দের বাচ্য। কি আশ্চর্য্য! শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন—না বলিয়াছেন—তাহারই বিচার হইতেছে, অথচ বিপিন বাবুর নিকটে তাঁহার আপনার কথাই পাঁচ কাহন—শঙ্করাচার্য্য নিজে যাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন তাহা কিছুই নহে! যেখানে গায়ের জোরেরই একাধিপত্য, সেখানকার বিচার এইরূপই বটে! শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয়ী এবং যুষ্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয় উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্-ধর্ম্মী—উভয়ের মধ্যে ছায়াতপের-প্রভেদ; অতএব অস্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয়ীতে যুষ্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে, আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত; তথাপি লোকে ঐ কৃত্রিম আরোপটিকে মিথ্যা না বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করে; এইরূপ যে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা, ইহাই অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য।" এ সম্বন্ধে বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "শঙ্করাচার্য্যের ঐ কথার বিরুদ্ধে আমাদেরই কি কিছু বলিবার আছে? কিছুই নাই।" বিপিন বাবুর এ কথায় আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। একজন শয্যাশায়ী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি

ঘুমাইতেছ?" সে উত্তর করিল যে, "শুধু যে কেবল ঘুমাইতেছি তাহা নহে প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে অচেতন-প্রায় রহিয়াছি!" শয্যাশায়ী ব্যক্তির এরূপ কথায় কেহ কি না-হাসিয়া থাকিতে পারে? বিপিন বাবু, বিষয়ের সহিত জড়িত আভাস-চৈতন্যকেই বিষয়ী বলিতেছেন অথচ বলিতেছেন যে, "শঙ্করাচার্য্যের এই যে একটি কথা যে, বিষয়ী এবং বিষয় উভয়ে ছায়াতপের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব ইত্যাদি, ইহা কি আমি অস্বীকার করিতেছি?" শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বিপিন বাবুর এতই যদি প্রগাঢ় ভক্তি, তবে শঙ্করাচার্য্য যেখানে বলিতেছেন "অস্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয়ী বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্"— সেখানে বিপিন বাবু তাহার বিরুদ্ধে এরূপ একটা গায়ে'ব-জুরী কথা বলেন কেন যে, বিষয়ী অর্থাৎ-কিনা—শুদ্ধ কেবল বিষয়ে জড়িত অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত আভাস-চৈতন্য মাত্র! বিষয়ী যে, বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্! আভাস-চৈতন্য তো বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে! আভাস-চৈতন্য যে বিষয়ের সহিত জড়িত! তবুও যদি বলো যে, অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয়ীকে আভাস-চৈতন্য বলাই শঙ্করাচার্য্যের মনোগত অভিপ্রায় তবে লাভের মধ্যে হইবে কেবল এই যে, শঙ্করাচার্য্য অবিদ্যার যেরূপ পাকা-পোক্ত লক্ষণা করিয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই কাঁচিয়া যাইবে। তাহা হইলে, শঙ্করাচার্য্য যেখানে বলিয়াছেন—অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয়ীকে দেহাদির সহিত জড়িত ভাবে উপলব্ধি করাই অবিদ্যা, সেখানে তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, আভাস-চৈতন্যকে দেহাদির সহিত জড়িত-ভাবে উপলব্ধি করাই অবিদ্যা; এ কিরূপ কথা! আভাস-চৈতন্য তো বাস্তবিকই দেহাদির সহিত জড়িত, তবে তাহাকে দেহাদির সহিত জড়িত বলিয়া উপলব্ধি করাকে ভ্রমই বা বলি কিরূপে, অবিদ্যাই বা বলি কিরূপে? যাহা বাস্তবিকই দেহাদির সহিত জড়িত তাহাকে দেহাদির সহিত জড়িত বলিয়া জানা তো সত্য-জ্ঞান—তাহা তো আর অবিদ্যা নহে; যাহা দেহাদির সহিত জড়িত নহে তাহাকে দেহাদির সহিত জড়িত বলিয়া জানাই অবিদ্যা—স্বরূপ-চৈতন্যকে দেহাদির সহিত জড়িত বলিয়া জানাই অবিদ্যা। অতএব, অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয়ীর পরিবর্ত্তে আভাস চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিলে—যাহা অবিদ্যা নহে তাহাই অবিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়। কি আশ্চর্য্য এমন যে ত্রিলোক-পূজ্য মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে দিয়া ইঁহারা অম্লান-বদনে বলাইতেছেন যে, আভাস-চৈতন্য দেহাদির সহিত জড়িত—এই সত্য-জ্ঞানটিই অবিদ্যা; স্বরূপ-চৈতন্য দেহাদির সহিত জড়িত—এই মিথ্যা-জ্ঞানটি অবিদ্যা নহে! হা অদৃষ্ট! শঙ্করাচার্য্যের কপালে এতও ছিল!

ইহার পরে বিপিন বাবু (এক আধটি নয়) ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক সাতটি মন্তব্যের পাহারা বসাইয়াছেন—সে সমস্ত জটিল জঞ্জাল অতিক্রম করিয়া তবে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতে হইবে! তাঁহার প্রথম মন্তব্য এই যে "একদিকে অনাত্ম-সংযোগে অন্তঃকরণ-মধ্যে খণ্ডতা উপস্থিত হইলে—একদিকে ভোক্তা জ্ঞাতা কর্ত্তা

বিষয়ী অহংবৃত্তি, অন্য দিকে ভোগ্য.জ্ঞেয় কার্য্য-রূপ বিষয় ইদংবৃত্তির যুগপৎ অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে।" এ কথা আমারদেরই পুরাতন কথা—প্রভেদ কেবল এই যে, কথাটি বড়ই পাকচক্করে ভাষায় বলা হইয়াছে। আমরা "দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ" এই শীর্ষক ভারতীর একটি প্রবন্ধে যথাসাধ্য প্রমাণ করিয়াছি যে, জ্ঞান-মাত্রেই অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি উভয়েই যুগপৎ কার্য্য করিয়া থাকে; আর, উভয়ের কোনটিই অন্যটিকে ছাড়িয়া একাকী স্বকার্য্য-সাধনে সমর্থ নহে।

বিপিন বাবুর দ্বিতীয় মন্তব্যের চুম্বক এই যে, অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি এ দুয়ের কোনটিকেই জ্ঞান হইতে ছাঁটিয়া ফেলা যাইতে পারে না। এ কথাটিও আমাদেরই পুরাতন কথা।

বিপিন বাবুর তৃতীয় মন্তব্য এই যে, "বেদান্ত-শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ যে, কর্ত্তৃত্বাদি ভাব-বিহীন, উপাধি-বর্জ্জিত, নিরপেক্ষ যে, চৈতন্য, তাহাই আত্মা, অহম্বৃত্তি আপেক্ষিক সুতরাং তাহা সেই নিরপেক্ষ কূটস্থ চৈতন্যকে স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।"

এ কথার উত্তর আমরা এইরূপ দিই, যথা;—বেদান্ত-শাস্ত্রাদির যে-যে-স্থলে আত্মা-শব্দ পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সেই স্থলে আত্মা শব্দে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান-বর্জ্জিত, উপাধি-বর্জ্জিত নিরপেক্ষ চৈতন্য বুঝায়, ইহা আমরা স্বীকার করি। পরমাত্মা নিরপেক্ষ ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে অহম্বৃত্তি-বর্জ্জিত ইহা আমরা কোন-ক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। এ বিষয়ে আমাদের যাহা মন্তব্য তাহা আমরা নিম্নে পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া বলিতেছি—বিপিন বাবু একটু ধৈর্য্য সহকারে তাহার প্রতি প্রণিধান করুন্;—

আমাদের ইদম্বৃত্তির বিষয়-সকলের মধ্যে কতক-গুলি বিষয় এইরূপ যে, তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের নিজের উপরে নির্ভর করে; যেমন আমাদের মানসিক ভাবনা-বিশেষ। কোন-একটি ভাবনা-বিশেষ (যেমন সমুদ্র-ভাবনা) অহং শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—তাহা ইদং শব্দেরই বাচ্য; সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সমুদ্রকে যেমন আমরা ইদং শব্দে নির্দেশ করি—আমাদের ভাবনারূঢ় সমুদ্রকেও তেমনি আমরা ইদং শব্দে নির্দেশ করি, উভয়ের কাহাকেও আমরা অহং শব্দে নির্দেশ করি না; প্রত্যুত, উভয়-বিধ সমুদ্রের জ্ঞাতা যে, সাক্ষী পুরুষ, তাহাকেই কেবল আমরা অহংশব্দে নির্দেশ করি। অতএব বাহ্য-বস্তু সকলের ন্যায় আমাদের মানসিক ভাবনাও ইদংবৃত্তির বিষয়। মানসিক ভাবনা-সকলের অস্তিত্ব আমাদের আপনাদের উপর নির্ভর করে; আমি না থাকিলে আমার মানসিক ভাবনা থাকিতে পারে না। ইদম্বৃত্তির আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ যে, তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের আপনাদের উপর নির্ভর করে না; যেমন বাস্তবিক সমুদ্র, ইত্যাদি। আমাদের ইদংবৃত্তির শেষোক্তরূপ বিষয়-সকলকেই আমরা বাহ্যবস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। আমাদের ইদম্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি বাহ্যবস্তুর উপরে অনেকটা নির্ভর করে;

তাই বলি যে, তাহা বহির্বস্তু সাপেক্ষ। (১) আমাদের ইদম্বৃত্তি বহির্বস্তু-সাপেক্ষ, (২) আমাদের অহম্বৃত্তি ইদংবৃত্তি সাপেক্ষ, (৩) এই জন্য আমাদের অহম্বৃত্তিও ঘটনা-গতিকে বহির্বস্তু-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘটনা-গতিকে—অর্থাৎ যদি আমাদের ইদম্বৃত্তি বহির্বস্তু-সাপেক্ষ না হইত, তাহা হইলে আমাদের অহম্বৃত্তিকে বহির্বস্তু-সাপেক্ষ হইতে হইত না। ইদংবৃত্তি বহির্বস্তু-সাপেক্ষ, অহংবৃত্তি ইদম্বৃত্তি-সাপেক্ষ, অতএব অহম্বৃত্তি বহির্বস্তু-সাপেক্ষ। আমাদের অহংবৃত্তি মুখ্যতঃ, কিনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, শুদ্ধ কেবল ইদম্বৃত্তি-সাপেক্ষ—বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ নহে; কেবল আমাদের ইদম্বৃত্তি বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ বলিয়াই সেই সূত্রে আমাদের অহম্বৃত্তিও বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ। এমন যদি হইত যে, ঘটপটাদি বস্তু-সকল আমাদের নিজেরই সৃষ্টি, তবে ঘটপটাদি বস্তু-সকল আমাদের ভাবনারই সামিল হইত—তাহারা বাহ্যবস্তু হইত না; কেননা, ঘটপটাদির অস্তিত্ব আমাদের কর্তৃত্বের বাহিরে অবস্থিতি করে বলিয়াই ঐরূপ বস্তু-সকলকে আমরা বাহ্যবস্তু-নামে নির্দেশ করিয়া থাকি। অতএব আমাদের ইদম্বৃত্তি বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ হওয়াতেই আমাদের অহম্বৃত্তি অগত্যা বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য আমরা বলি যে, জীবাত্মার অহম্বৃত্তি আপেক্ষিক। কিন্তু পরমাত্মা আপনা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, জগতের নিমিত্ত-কারণও পরমাত্মা—জগতের উপাদান-কারণও পরমাত্মা। সুতরাং পরমাত্মার ইদম্বৃত্তির বিষয় এই যে জগৎ ইহা পরমাত্মার কর্তৃত্বের বাহিরে অবস্থিতি করে না; সুতরাং পরমাত্মার নিকটে জগৎ বাহ্য বস্তু নহে; জগৎ আমাদের নিকটেই বাহ্যবস্তু, পরমাত্মার নিকটে তাহা তাঁহার আপনার ইচ্ছাধীন বস্তু। অতএব পরমাত্মার ইদংবৃত্তির স্ফূর্ত্তি বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। এই জন্য পরমাত্মার অহংবৃত্তির সম্বন্ধে শুদ্ধ কেবল এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার অহম্বৃত্তি তাঁহার নিজের ইদংবৃত্তিকে অপেক্ষা করে; তা ভিন্ন এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, পরমাত্মার অহংবৃত্তি কোন প্রকার বাহ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে; কেন না পরমাত্মার স্বাধীন ইদম্বৃত্তি বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। এস্থলে প্রতিপক্ষ মহাশয় বলিতে পারেন যে, মানিলাম—পরমাত্মার অহম্বৃত্তি বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ নহে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার আপনার ইদম্বৃত্তি-সাপেক্ষ; তবেই তো হইল যে তাহা আপেক্ষিক। ইহার উত্তর আমরা এই দিই যে, পরমাত্মা আপনি আপনার উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন—পরমাত্মা আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন—ইহাতে কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, আপনাকেই হউক্ আর যাহাকেই হউক্ তিনি যখন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন তখন তিনি আশ্রিত; সেইরূপ পরমাত্মার আপনার অহম্বৃত্তি তাঁহার আপনার ইদম্বৃত্তিকে অপেক্ষা করে—এ কথায় কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, অপেক্ষা যখন করে তখন তিনি আপেক্ষিক বৈ কি। এস্থলে প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, যে ব্যক্তি আপনি

আপনার আশ্রিত সে ব্যক্তিকে আমরা আশ্রিত ব্যক্তি বলি না—উল্টা আরো স্বাধীন পুরুষ বলি; কেবল—যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রিত তাহাকেই আমরা আশ্রিত ব্যক্তি বলিয়া সম্বোধন করি; এই প্রকার যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বলিতেছি যে, যাঁহার অহম্বৃত্তি তাঁহার আপনারই ইদম্বৃত্তিকে অপেক্ষা করে,বাহিরের কোন কিছুকে অপেক্ষা করে না, তিনি আপেক্ষিক নহেন; তাহাই কেবল আপেক্ষিক—যাহা বাহিরের কোন সামগ্রীকে অপেক্ষা করে। সকল চৈতন্যেই যেমন সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি অবয়ব পরস্পরাশ্রিত সুতরাং পরস্পরাপেক্ষ—পরমাত্মাতেও সেইরূপ, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না; তেমনি সকল চৈতন্যেই যেমন অহম্বৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি উভয়ে পরস্পরাপেক্ষ,পরমাত্মাতেও সেইরূপ, ইহা স্বীকার করিতে দোষ কিছুমাত্র নাই, বরং তাহা অস্বীকার করিলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, পরমাত্মা মূলেই চৈতন্য নহেন; কেননা অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি দুয়ের যুগপৎ স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে চৈতন্যের কোন অর্থই হয় না। ভারতীতে প্রকাশিত দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ নামক প্রবন্ধে এ বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে সুতরাং এখানে তদ্বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। পরমাত্মা নিরপেক্ষ চৈতন্য এ কথাটি অতি শ্রদ্ধেয় কথা—এ কথাটিকে আমরা পরম ভক্তি সহকারে নত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু এ কথাটির অর্থ আমরা সোজা সুজি এইরূপ বুঝি যে, পরমাত্মা তাঁহার বাহিরের কোন-কিছুকে অপেক্ষা করেন না;—পরমাত্মার ইদংবৃত্তি যখন বহির্বস্তু নিরপেক্ষ তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার অহংবৃত্তিও বহির্বস্তু-নিরপেক্ষ। তাই আমরা বলি যে, পরমাত্মার অহংবৃত্তি বাহিরের কোন কিছুকে অপেক্ষা করে না এই অর্থেই তাহা অনন্য-সাপেক্ষ,—এ অর্থে নহে যে, তাঁহার আপনার অহংবৃত্তি তাঁহার আপনার ইদম্বৃত্তিকেও অপেক্ষা করে না। পরমাত্মা বহির্বস্তু নিরপেক্ষ বলিয়াই আমরা বলি যে, পরমাত্মা স্বয়ম্ভু এবং স্বতন্ত্র। পরমাত্মা যেমন নিরপেক্ষ তেমনি তিনি উপাধি-বিহীন—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু "উপাধি-বিহীন" এ শব্দের অর্থ কি? কেহ যদি বলেন যে, পরমাত্মা জগতের অভ্যন্তরে আছেন অতএব তিনি জগৎরূপ উপাধিতে উপহিত, তবে আমরা তাহার উত্তর এই দিব যে, জগতের অভ্যন্তরে থাকিয়াও তিনি জগতে লিপ্ত নহেন—আসক্ত নহেন; এরূপ যখন—তখন তাঁহাকে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বলা কোন-ক্রমেই শোভা পায় না। পরমাত্মার ইদম্বৃত্তি অভিমান-শূন্য অনাসক্ত এবং নির্লিপ্ত-ভাবে জগতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—এই জন্যই আমরা বলি যে, তিনি জগৎরূপ উপাধিতে উপহিত নহেন—তিনি উপাধি-বিহীন। কি মূল-চৈতন্য—কি শাখা-চৈতন্য—সকল চৈতন্যেই অহংবৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি যুগপৎ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে; কেবল, পরমাত্মার ইদম্বৃত্তি জগতে অনাসক্ত এবং নির্লিপ্ত বলিয়া পরমাত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এবং নিরুপাধিক শব্দের বাচ্য। জীবাত্মার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মা পঞ্চ কোষ-মধ্যে আছে বলিয়াই যে, জীবাত্মা উপাধি-

পরিচ্ছিন্ন, তাহা নহে—পরমাত্মাও তো জীবাত্মার সঙ্গে একত্রে অবস্থিতি করিতেছেন; তা নয়—জীবাত্মা পঞ্চকোষে লিপ্ত বলিয়াই জীবাত্মা সোপাধিক চৈতন্য। অতএব জীবে অহম্বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়াই যে জীবকে আমরা উপাধি-গ্রস্ত বলি, তাহা নহে; জীবের ইদংবৃত্তি বাহ্য বিষয়ে আসক্ত এবং লিপ্ত বলিয়াই আমরা জীবকে উপাধি-গ্রস্ত বলি; আর, পরমাত্মার ইদংবৃত্তি সেরূপ নহে বলিয়াই পরমাত্মাকে আমরা উপাধি-শূন্য বলি। পরমাত্মার নিকটে প্রকৃতি—মায়া, জীবাত্মার নিকটে প্রকৃতি—অবিদ্যা; মায়া পরমাত্মার শক্তি, অবিদ্যা জীবাত্মার অশক্তি, অর্থাৎ, মায়াই পরমাত্মার বশীভূত—পরমাত্মা মায়ার বশীভূত নহেন, জীবাত্মা অবিদ্যার বশীভূত। পরমাত্মা মায়ার বশীভূত নহেন বলিয়াই তিনি উপাধি-মুক্ত; জীবাত্মা অবিদ্যার বশীভূত বলিয়াই জীবাত্মা উপাধি-গ্রস্ত।

বিপিন বাবুর চতুর্থ মন্তব্য এই যে, "যাঁহারা মনে করেন যে, যখন আমি আমাকে ভাবি, তখন আমাকে ইদংভাব-বর্জ্জিত করিয়াই ভাবি তাঁহারা বড়ই ভ্রম বুঝেন।" এ কথাটির অর্থ দুইরূপ হইতে পারে, যথা; প্রথম অর্থ—আমি আপনাকে ইদংভাব-বর্জ্জিত করিয়া ভাবি না—অর্থাৎ আমি আপনাকে ইদংভাবে উপলব্ধি করি। আমি আপনাকে ইঁট্ পাট্কেলের মতো ইদংভাবে উপলব্ধি করি—অহংভাবে উপলব্ধি করি না—এ কথায় আমরা কোন মতেই সায় দিতে পারি না। দ্বিতীয় অর্থ;—আমি আপনাকে ইদংভাব-বর্জ্জিত করিয়া ভাবি না, অর্থাৎ যখনই আমি আপনাকে অহম্ভাবে উপলব্ধি করি, তখনই তাহার সঙ্গে কোন-না-কোন একটা কিছুকে (মনের কোন অবস্থাকে বা মনের কোন ভাবনাকে অথবা বাহিরের কোন বস্তুকে) ইদংভাবে উপলব্ধি করি; এক কথায়—অহংবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন-না-কোন্ প্রকার ইদংবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হওয়া চাই-ই-চাই; এবারকার এ অর্থে আমরা অত্রোক্ত কথাটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে শিরোধার্য্য করি; বলিতে কি—শেষোক্ত অর্থে উপরি-উক্ত কথাটি আমাদেরই একটি পুরাতন কথা (ভারতীতে পূর্ব্ব-প্রকাশিত দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ)। আমরা কোন্ কথাটি শিরোধার্য্য করিতেছি এবং কোন্ কথাটিতে প্রাণান্তেও সায় দিতে পারি না—তাহা নিম্নে আরো স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি। এই পাতাটির যেমন দুই পৃষ্ঠা একসঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তেমনি চৈতন্য মাত্রেই অহংবৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি দুই বৃত্তিই একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি পায়; অপিচ, যেমন এই পাতাটির কোন পৃষ্ঠাই অপর পৃষ্ঠাকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না—পূর্ব্বপৃষ্ঠা-বর্জ্জিত পর-পৃষ্ঠাও থাকিতে পারে না, পরপৃষ্ঠা-বর্জ্জিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠাও থাকিতে পারে না, সেইরূপ উক্ত বৃত্তি-দ্বয়ের কোনটিই অপরটিকে ছাড়িয়া একাকী স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না; ইদংবৃত্তি-বর্জিত অহংবৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, অহম্বৃত্তি বর্জ্জিত ইদম্বৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এই কথাটিই আমাদের পুরাতন কথা—ইহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিই। কিন্তু যদি ঐ কথাটিতেই

ক্ষান্ত না থাকিয়া উহাকে আর এক গ্রাম উচ্চে চড়াইয়া দেও—যদি বল যে, পূর্ব্ব পৃষ্ঠাকে আমরা পরপৃষ্ঠা-ভাবে দেখি, অথবা পরপৃষ্ঠাকে পূর্ব্বপৃষ্ঠা-ভাবে দেখি ; আপনাকে ইদং ভাবে উপলব্ধি করি, অথবা, বহির্ব্বস্তুকে বা মানসিক অবস্থা-বিশেষকে বা ভাবনা-বিশেষকে অহংভাবে উপলব্ধি করি ; তবে এরূপ কথায় আমরা প্রাণান্তেও সায় দিতে পারি না। এই পাতাটির দুই পৃষ্ঠা এক সঙ্গে বর্ত্তমান বলিয়াই যে, এক পৃষ্ঠাকে আর এক পৃষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। চক্র-ফলকে কেন্দ্র এবং পরিধি দুইই তো এক সঙ্গে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কেন্দ্রকেও আমরা পরিধি-ভাবে দেখিনা, আর, পরিধিকেও আমরা কেন্দ্র-ভাবে দেখি না। অতএব অহম্বৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়াই যে, অহংপদার্থকে ইদংভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। তাই আমরা বলি যে, বিপিন বাবু যদি শেষোক্ত অভিপ্রায়ে (অর্থাৎ অহংপদার্থকে আমরা ইদন্তাবে উপলব্ধি করি এই অভিপ্রায়ে) বলিয়া থাকেন যে, কেহই আপনাকে ইদন্তাব-বর্জ্জিত করিয়া ভাবিতে পারে না, তবে তিনি বড়ই ভুল বুঝিয়াছেন—তাঁহার সে কথায় আমরা কোন প্রকারেই সায় দিতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে আমরা অহম্পদার্থকেও ইদংভাবে উপলব্ধি করি না—ইদংপদার্থকেও অহংভাবে উপলব্ধি করি না। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করেন যে, "আমি শরীরকে অহং বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি" তবে তত্ত্বজ্ঞানীর উল্টা আরো তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া বলা উচিত যে, বাস্তবিকই যে, তুমি তোমার শরীরকে অহং বলিয়া উপলব্ধি করিতেছ বা তোমার কোন মানসিক অবস্থা বিশেষকে অহং বলিয়া উপলব্ধি করিতেছ, তাহা নহে ; কারণ, কি শরীরাদি বিশেষ বিশেষ বাহ্যবস্তু কি জাগ্রদাদি বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থা, কি অর্থ চিন্তা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভাবনা, কি সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অনুভব, ইহাদের মধ্যে তুমি যখনই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কর, ভাবনা কর, বা অনুভব কর, তখনই তুমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ-কর্ত্তা ভাবনা-কর্ত্তা অথবা অনুভব-কর্ত্তা বলিয়া—সুতরাং তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া—জ্ঞানে উপলব্ধি কর ; ইহা তুমি একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। অতএব তুমি তোমার আত্মাকে অহংভাবে উপলব্ধি কর এইটিই সত্য—ইদন্তাবে উপলব্ধি কর এটা তোমার একটা মন-গড়া কথা।

বিপিন বাবুর পঞ্চম মন্তব্য কিঞ্চিৎ হাস্যরসোদ্দীপক। তিনি তাঁহার নিজের মন্তব্য নিরীহ বেদান্তের স্কন্ধে চাপাইতেছেন। বেদান্তের একটি সোজা কথার উপরে তিনি তাঁহার পঞ্চম মন্তব্যের গোড়া পত্তন করিয়া তাহার পরক্ষণেই সেই সোজা কথাটিকে তাঁহার পাকচক্রময় সুড়ঙ্গ পথে টানিয়া হেঁচড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাকে গলা টিপিয়া বধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বেদান্তের সোজা কথাটি এই ;—"জাগ্রদবস্থাই অহম্বৃত্তির স্থূল বা মুখ্য উপাধি, স্বপ্নাবস্থাই অহম্বৃত্তির তৈজস বা সূক্ষ্ম উপাধি,

এবং সুষুপ্তির অবস্থাই অহম্বৃত্তির প্রজ্ঞান উপাধি।" এই সোজা কথাটিতে স্পষ্টই এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উক্ত অবস্থাত্রয়ের কোনটিই অহম্বৃত্তি নহে—তবে কি? না তিন অবস্থাই অহংবৃত্তির উপাধি-স্বরূপ—আলয় স্বরূপ; উক্ত অবস্থাত্রয়ের প্রত্যেকেই যখন অহম্বৃত্তির উপাধি, তখন ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গেই অহম্বৃত্তি লাগিয়া রহিয়াছে। জাগ্রদবস্থার সঙ্গে অহংবৃত্তি লাগিয়া রহিয়াছে কিন্তু জাগ্রদবস্থা অহংবৃত্তি নহে; স্বপ্নাবস্থার সঙ্গেও অহম্বৃত্তি লাগিয়া রহিয়াছে কিন্তু স্বপ্নাবস্থা অহম্বৃত্তি নহে; সুষুপ্তি অবস্থার সঙ্গেও অহম্বৃত্তি লাগিয়া রহিয়াছে কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থা অহম্বৃত্তি নহে। এই তো সোজা কথা;—এই সোজা কথাটির মধ্য হইতে বিপিন বাবু এই এক কিম্ভূত কিমাকার অর্থ টানিয়া বাহির করিতেছেন যে, "বেদান্ত শাস্ত্রের মতে স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার নাম অহম্বৃত্তি নহে (অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাই বেদান্ত শাস্ত্র মতে অহংবৃত্তি—চমৎকার সিদ্ধান্ত!) অতএব অহংবৃত্তি বলিলে জাগ্রদবস্থার অহংজ্ঞানই বুঝিতে হইবে!" অনতিপূর্ব্বে বিপিন বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, তিন অবস্থার প্রত্যেকেই অহম্বৃত্তির উপাধি-বিশেষ; তিন অবস্থাই যদি অহম্বৃত্তির উপাধি হইল, তবে শুদ্ধ কেবল জাগ্রদবস্থাই অহম্বৃত্তির উপাধি—অহংবৃত্তি বলিতে শুদ্ধ কেবল জাগ্রদবস্থারই অহংজ্ঞান বুঝিতে হইবে—যেন স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থা মূলেই অহম্বৃত্তির উপাধি নহে—এই নূতন ধরণের কথাটি তিনি কোথা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন? সাধে কি আমরা বলি যে, বিপিন বাবুর কোন কথারই কোন স্থিরতা নাই। বেদান্ত-শাস্ত্রের একটি স্থানেও যদি এমন কথা থাকিত যে, জাগ্রৎকালের অহংজ্ঞানই অহংজ্ঞান—স্বপ্নকালের বা সুষুপ্তি-কালের অহংজ্ঞান অহংজ্ঞানই নহে, তবে বুঝিতাম যে, বিপিন বাবু বেদান্ত-মতেরই উল্লেখ করিতেছেন; কিন্তু বেদান্তের কোন স্থানেই যখন ওরূপ কথার বিন্দু বিসর্গও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বিপিন বাবুর ও-কথাটি নিতান্তই স্বকপোল-কল্পিত। বেদান্ত উল্টা আরো এই বলেন যে, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীরূপী চৈতন্য তিন অবস্থা হইতেই ভিন্ন; আর, তিন অবস্থাতে সাক্ষী চৈতন্যের ইদংবৃত্তি তিন প্রকার বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপৃত হয়; জাগ্রদবস্থাতে বিশ্বরূপী স্থূল বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, স্বপ্নাবস্থাতে তৈজসরূপী সূক্ষ্ম বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, সুষুপ্তি-অবস্থাতে নির্ম্মল আনন্দরূপী বীজ-ভাবাপন্ন বিষয়ে ব্যাপৃত হয়; কিন্তু সাক্ষী চৈতন্যের অহংবৃত্তি সকল অবস্থাতেই শুদ্ধ কেবল আত্মাতে ব্যাপৃত হয়—আত্মেতর (কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কি বীজ-ভাবাপন্ন) কোন বিষয়েই ব্যাপৃত হয় না। অতএব প্রমাণ হইল যে, শুদ্ধ কেবল জাগ্রদবস্থাতে নহে কিন্তু জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই সাক্ষী চৈতন্যের ইদংবৃত্তি এবং অহম্বৃত্তি উভয়েই যুগপৎ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

বিপিন বাবুর ষষ্ঠ মন্তব্য এই যে, উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থা বা উপাধি পর্য্যালো-

চনায় জানা যায় যে, বিষয়ের নিশ্চেষ্টতার পরিমাণানুসারে অহম্বৃত্তিও নিশ্চেষ্টতার ভাব পাইয়া থাকে; সুতরাং বিষয়ের উত্তেজনায় যাহার উত্তেজনা বিষয়ের সূক্ষ্মতায় যাহার সূক্ষ্মতা ও বিষয়ের নিশ্চেষ্টতায় যাহার নিশ্চেষ্টতা, তাহার যে বিষয়ের অভাবে অভাব ঘটিবে—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।" এ তো গেল বিপিন বাবুর নিজের মন্তব্য কথা। কিন্তু এ কথা যে কত দূর শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যথা;—

"শব্দ স্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥
তথা স্বপ্নে হত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
তদ্ভেদোহতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়া হববুদ্ধং তত্তদা ততঃ ॥
স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্ন-বোধবৎ।
এবং স্থান-ত্রয়েহপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্ দিনান্তরে ॥
মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতা গম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥
ইয়মাত্মা ... ... ॥

ইহার অর্থ;—শব্দস্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয়-সকল বিচিত্রতাবশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু সেই সকল বিষয়ের সাক্ষীরূপী যে, চৈতন্য, তিনি একই অভিন্ন (অর্থাৎ বিষয় ভেদে সাক্ষী-চৈতন্যের ভেদ হয় না—আমি দুই বা তিন বিষয় দেখিতেছি বলিয়া আমিও যে দুই বা তিন তাহা নহি—আমি একই। অথবা আমি সাদা কালো বা সবুজ বর্ণ দেখিবার সময়, তাহার সঙ্গে আমিও সাদা কালো বা সবুজ হইয়া যাই না—আমি একই রূপ থাকি)। স্বপ্ন কালেও সেইরূপ; প্রভেদ কেবল এই যে স্বপ্নকালে জ্ঞেয় বিষয়-সকল অস্থির অর্থাৎ অব্যবস্থিত—জাগ্রৎকালে জ্ঞেয় বিষয় সকল সুব্যবস্থিত। সুষুপ্তি-কালের তমো-বোধ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হয়। সুষুপ্তি-কালে যদি প্রসুপ্ত ব্যক্তির তমোবোধ না থাকিত তবে তাহার পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্ত টি তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইতে পারিত না, কেননা পূর্ব্ব-জ্ঞাত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে; অতএব সুষুপ্তি কালের তমোবোধ যখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতেছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সুষুপ্তি-কালে প্রসুপ্ত ব্যক্তির সত্যসত্যই তমোবোধ ছিল;—একেবারেই যে, কোন বোধ ছিল না তাহা নহে। স্বপ্নকালের সাক্ষী চৈতন্য যেমন জাগ্রৎ-কালের সাক্ষী চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে—কেবল—স্বপ্ন কালের বিষয় সকলই জাগ্রৎ কালের বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন, সেইরূপ সুষুপ্তি-কালের সাক্ষী চৈতন্য

জাগ্রৎ বা স্বপ্ন কোন-কালেরই সাক্ষী চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে—কেবল—সুষুপ্তি কালের তমোরূপী বিষয়ই স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উভয়-কালের বিষয় হইতে ভিন্ন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—তিন অবস্থাতেই সাক্ষী চৈতন্য একই অভিন্ন প্রকার (অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাক্ষী চৈতন্যের পরিবর্ত্তন হয় না)। উক্ত অবস্থাত্রয়-ভেদে যেমন সাক্ষী চৈতন্যের ভিন্নতা হয় না—দিন-ভেদেও সেইরূপ। মাস-বৎসর-যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, কেবল এক স্বয়ংপ্রকাশ সাক্ষী চেতন্যই উদয়ও হ'ন না অস্তও হ'ন না (অর্থাৎ কোন পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না)। এই সাক্ষী চৈতন্যই আত্মা।" পঞ্চদশীর এ কথাটি কি বেদান্ত-সম্মত নহে? তবে আর বিপিন বাবুর এ কথা কোথায় রহিল যে, "বিষয়ের নিশ্চেষ্টতার পরিমাণানুসারে অহংবৃত্তিও নিশ্চেষ্টতার ভাব পাইয়া থাকে।" পঞ্চদশীর উপরি-উক্ত কথাতে ইহা জাজ্বল্য রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তনেই অহংবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় না; পরিবর্ত্তিত হইতে কেবল ইদংবৃত্তিই পরিবর্ত্তিত হয়। জাগ্রৎকালে ইদংবৃত্তি বিশ্বের সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বরূপ ধারণ করে, স্বপ্ন-কালে ইদংবৃত্তি তৈজসের সঙ্গে মিসিয়া তৈজসরূপ ধারণ করে, সুষুপ্তি-কালে ইদংবৃত্তি প্রজ্ঞানের সহিত মিসিয়া প্রজ্ঞান-রূপ ধারণ করে—ইদংবৃত্তি অষ্টপ্রহর কেবল সঙ্ সাজিয়াই কালাতিপাত করে; কিন্তু অহংবৃত্তি, সাক্ষী চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালেই সাক্ষী চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতে থাকে;—সাক্ষী চৈতন্য নাট্যের দর্শক স্বরূপ—সুতরাং সঙ্ সাজা তাহার কার্য্য নহে। এখানে বিপিন বাবু এইরূপ একটি কুট তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন "আবার সেই পুরাতন কথা! সাক্ষী চৈতন্যের সঙ্গে অহংবৃত্তিকে জড়াইতেছ কেন? সাক্ষী চৈতন্য অপরিবর্ত্তনীয় ইহা তো আমরা অস্বীকার করিতেছি না—আমরা শুধু কেবল বলিতেছি যে, অহংবৃত্তিই পরিবর্ত্তন-শীল।" অহংবৃত্তি যে সাক্ষী-চৈতন্য ছাড়া আর কোন কিছু এ কথার অর্থ বাস্তবিকই আমরা বুঝিতে পারি না। অহংবৃত্তি বলে কাহাকে? না "আমি জানি" এই জ্ঞানটিই অহংবৃত্তি। যে চৈতন্যের এ জ্ঞানও নাই যে, আমি জানি, তাহাকে কিরূপে সাক্ষী চৈতন্য বলিতে পারি? বিচার-কর্ত্তা কোন একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি বেস্ জান যে, তোমার কথিত বৃত্তান্তটি তুমি স্ব-চক্ষে দেখিয়াছ? আর, সাক্ষী উত্তর করিল যে, "স্বচক্ষে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু আমি জানি না যে, আমি দেখিয়াছি। ঘটনাটি আমার স্বচক্ষে দেখা বটে, কিন্তু আমিই যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি—এ বৃত্তান্তটি আমি মূলেই অবগত নহি।" কি চমৎকার সাক্ষী! সাক্ষী চৈতন্য যদি এইরূপ সাক্ষী হ'ন অর্থাৎ যদি এরূপ হয় যে, সাক্ষী চৈতন্য সমস্তই দেখিতেছেন সমস্তই জানিতেছেন, অথচ "আমি জানিতেছি" এই সোজা কথাটি তিনি জানেন না—তাঁহার অহংবৃত্তি একেবারেই সাড়া-শব্দ রহিত—তবে সেরূপ সাক্ষী চৈতন্য নামেই সাক্ষী চৈতন্য বস্তুতঃ কিছুই নহে; বক্র ঋজুরেখা যেমন কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই—দেখিবে

না শুনিবে না, অহং বর্জ্জিত জ্ঞান—মাথা বর্জ্জিত মাথাব্যথা—সেইরূপ একটা কিম্ভূত কিমাকার কৃত্রিম পদার্থ। অতএব বেদান্তের মতানুসারেই এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সাক্ষী চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া অহম্বৃত্তি নিত্যকালই অটলরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

বিপিন বাবুর সপ্তম মন্তব্য এই যে, "অতএব যখন আমি আমাকে জানিব, তখন হয় বিষয়ের মধ্য দিয়া—না হয় উপাধির মধ্য দিয়াই আমাকে জানিব; উপাধি-বর্জ্জিত নিরপেক্ষ আমি' বা আত্মা স্বরূপতঃ আমার জ্ঞানে অর্থাৎ অহম্বৃত্তি-মূলক জ্ঞানে আসিবে না ও আসিতে পারে না।" ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান-মাত্রই অহম্বৃত্তি মূলক; যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন -ঘট-জ্ঞানই হউক্ পট-জ্ঞানই হউক্, হস্তি-জ্ঞানই হউক্, অশ্ব-জ্ঞানই হউক্—সকল জ্ঞানেই "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞানটি অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত রহিয়াছে। যখন আমি ঘট জানি তখন তাহার সঙ্গে আমি এটাও জানি যে, আমি জানিতেছি; যখন আমি পট জানি তখনও তাই; যখন হাতি জানি তখনও তাই, যখন ঘোড়া জানি তখনও তাই; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, 'আমি জানি' এই জ্ঞানটি আমার সকল জ্ঞানের সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া রহিয়াছে; "আমি জানি" এই জ্ঞানটিই অহম্বৃত্তি; এবং শুদ্ধ কেবল এই অহম্বৃত্তি-বলে আমন্যত বা সাধারণতঃ সকল জ্ঞাতাই আপনার অস্তিত্ব আপনি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক ছাড়িয়া অহংবৃত্তি একাকী থাকিতে পারে না, এ কথাটি আমাদেরই পুরাতন কথা; জীবাত্মার ইদম্বৃত্তি বাহ্য বিষয়-সকলকে অপেক্ষা করে এই জন্য জীবাত্মা বহির্বস্তু-সাপেক্ষ; পরমাত্মা আপনা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এই জন্য পরমাত্মা অনন্য-সাপেক্ষ। সুতরাং পরমাত্মা বাহিরের কোন কিছুর মধ্য-দিয়া অর্থাৎ বাহিরের কোন কিছুর সাহায্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করেন না। জীবাত্মার ইদম্বৃত্তি যদিচ প্রথম কল্পে বাহ্য-বস্তু-সাপেক্ষ তথাপি জীবাত্মা সময়ে সময়ে বাহ্যবস্তু হইতে অপসৃত হইয়া ইদংবৃত্তিকে চিন্তা-রাজ্যে নিয়োগ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় জীবাত্মার অহম্বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে অনন্য-সাপেক্ষ ভাব—স্বাধীন ভাব—ধারণ করে। ইতিহাসে এরূপ অসাধারণ মহাত্মাদিগের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা পৃথিবীর ধূলিকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না দিয়া হৃদয়ের অমৃত-ধারায় পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছেন;—ইঁহাদের ইদংবৃত্তি উচ্চ এক স্বর্গীয় ধ্যান-রাজ্যে স্বাধীন-ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবারই কথা; মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে ইঁহারা দেবতা-স্থানীয়; ইঁহাদের অহংবৃত্তি সমধিক পরিমাণে উপাধি-মুক্ত এবং স্বাধীন। পরমাত্মার অহংবৃত্তি একান্ত পক্ষেই স্বাধীন এবং উপাধি-মুক্ত; কেননা, তাঁহার ইদংবৃত্তি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে জগৎকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বিপিন বাবু বলেন যে, আমরা অহম্বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া খিচুড়ির পর এক মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছি; সেই মিক্‌শ্চারের দ্বারায় অহংবৃত্তিকে

সুষুপ্তির করাল কবল হইতে উদ্ধার করিব—এই আমাদের অভিপ্রায়। অপরাধের মধ্যে আমরা বলিয়াছি সুষুপ্তি একেবারেই অজ্ঞানাবস্থা নহে—তাহা জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুয়ের সন্ধিস্থল; ইহাকেই বিপিন বাবু মিক্শ্চার বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। আমরা ইহার এই উত্তর দিই যে, মিক্স্চারটি আমাদের নিজের কপোল-কল্পিত নহে; প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের প্রস্ক্রিপ্ষণের অনুবর্ত্তী হইয়াই আমরা তাহা প্রস্তুত করিয়াছি। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

"সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমো বোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সাচারবুদ্ধ বিষয়াঽববুদ্ধং তত্তদা ততঃ॥"

"সুষুপ্তি-কালের তমোবোধ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হয়; সুষুপ্তি-কালে যদি প্রসুপ্ত ব্যক্তির সত্য সত্যই তমোবোধ না থাকিত তবে তাহার পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্তটি তাহার স্মৃতি পথে আবির্ভূত হইতে পারিত না, কেন না পূর্ব্ব-জ্ঞাত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে; অতএব সুষুপ্তিকালের তমোবোধ যখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতেছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সুষুপ্তির সময়েও প্রসুপ্ত ব্যক্তির তমোবোধ ছিল।" তমো কি না অজ্ঞান, বোধ কি না জ্ঞান,—সুতরাং তমোবোধ বলিতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুয়ের মিক্শ্চার বুঝায়। কেবল যে, আমাদের দেশের দর্শন-কারেরা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে; স্কট্‌লাণ্ড দেশীয় হামিল্টন, ফরাসীস্ দেশীয় জুফ্রয়, এবং জর্মান দেশীয় লাইব্‌নিট্‌জ সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রার সময়েও মন ভাবনা-শূন্য থাকে না।

অতঃপর বিপিন বাবু আমাদের একটি ছোটোখাটো সোজা কথার কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র বেচারীটিকে তাঁহার বাঁকা পথে হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন—তিনি বলিতেছেন যে, "শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জ্ঞান কাহাকে কহে? না, যাহা অহংবৃত্তি-মূলক, অহম্বৃত্তি-সর্ব্বস্ব,—এক কথায় যাহা অহম্বৃত্তি—তাহাই জ্ঞান।" আমরা বাস্তবিকই বলি যে, জ্ঞান-মাত্রই অহংবৃত্তি-মূলক; ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্য যেমন সৌর জগতের মূল কেন্দ্র, অহম্বৃত্তি সেইরূপ জ্ঞানের মূল-বৃত্তি। বিপিন বাবু বোধ করি চড়া সুর বেশী পছন্দ করেন। আমরা নরম সুরে সেত্যারের তার বাঁধিয়া এই একটি ধ্বনি উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, জ্ঞান অহংবৃত্তি-মূলক; বিপিন বাবু সেতারের তার পঞ্চমে চড়াইয়া তাহাকে করিলেন—জ্ঞান অহম্বৃত্তি সর্ব্বস্ব; তাহার পরে তার-টিকে সপ্তমে চড়াইয়া ঐ কথাটিকে করিলেন—অহম্বৃত্তিই জ্ঞান; তারটির আর যন্ত্রণা সহ্য হইল না—কট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। আমরা এ কথা কোন জন্মে বলি নাই বলিবও না—যে, অহংবৃত্তিই জ্ঞান। দিবালোক সূর্য্য-মূলক এবং জ্ঞান অহম্বৃত্তি-মূলক, এ দুইটি কথা একই ধরণের কথা। তাহার অর্থ এ নহে যে, সূর্য্যই দিবালোক—অহংবৃত্তিই জ্ঞান। সূর্য্যের রশ্মিজাল পৃথিবীর বায়ুতে ব্যতিকীর্ণ (refracted) হইয়া দিবালোক হইয়া দাঁড়ায়। দিবালোকের

মূলে সূর্য্য তাই দিবালোক সূর্য্য-মূলক ; কিন্তু দিবালোকের মূলে যেমন সূর্য্য, তাহার প্রান্তে তেমনি পৃথিবী—সূর্য্য এবং পৃথিবী দুইকে লইয়া দিবালোক জীবন ধারণ করে এটা ভুলিলে চলিবে না। জ্ঞান অহম্বৃত্তি মূলক—ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু জ্ঞানের মূলে যেমন অহম্বৃত্তি—জ্ঞানের প্রান্তে তেমনি ইদংবৃত্তি,জ্ঞান উভয়কে লইয়া বর্ত্তিয়া থাকে এটা ভুলিলে চলিবে না। আমরা কোথাও বলি নাই যে, অহম্বৃত্তিই জ্ঞান অথচ বিপিন বাবু ঐ কথাটি জোর করিয়া আমাদের মুখ দিয়া বাহির করাইতে চা'ন। বিপিন বাবু আরো বলিতেছেন এই যে, আমাদের মতে "অজ্ঞান কাহার নাম—না যাহা অহম্বৃত্তি-বহির্ভূত, সাদা কথায় যেখানে "আমি জানি" এ জ্ঞান থাকে না, তাহাই অজ্ঞান," বিপিন বাবুর এ কথাটি মিথ্যা নহে ; যেখানে "আমি জানি" এ জ্ঞান থাকে না সেখানে কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না ; যেখানে অহংবৃত্তি নাই সেখানে ইদংবৃত্তিও থাকিতে পারে না—যেখানে মাথা নাই সেখানে মাথাব্যথাও থাকিতে পারে না, সুতরাং সেখানে আধিব্যথা একেবারেই নির্ব্যথা—সেখানে শূন্য শূন্য শূন্য সকলই শূন্য—সকলই ভোঁ ভাঁ অজ্ঞান অন্ধকার! আমি দেখিতেছি বটে কিন্তু আমি জানিনা যে, আমি দেখিতেছি—ইহাও কি কখন সম্ভবে!

আমরা যাহা কোন জন্মে বলি নাই—প্রতিপক্ষ মহাশয় তাহা আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে পারৎপক্ষে ত্রুটি করেন না, যথা ;—তিনি বলিতেছেন যে "দ্বিজেন্দ্র বাবু তৈলে ও জলে সংমিশ্রণ করিয়া তদ্দ্বারা এমন একটি অবস্থার সত্তা—কেবল সত্তা মাত্র—স্বীকার করিতেছেন, যেখানে 'আমি জানি' কথা চলে না। অহংবৃত্তির বহির্ভূত সেই অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানিতে সক্ষম না হইলেও তাহার সত্তা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। অতএব তিনি নিজেই সুষুপ্তির ভিতর এমন একটি সত্তা স্বীকার করিলেন, যাহা অজ্ঞেয় ; এবং অজ্ঞেয় বলিয়াই তৎসম্বন্ধে কোন কথা কহা বাচালতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" এমন কথা আমরা কোথাও বলি নাই যে, সুষুপ্তির অবস্থা অহংবৃত্তি শূন্য অজ্ঞেয় সত্তা মাত্র ; আমরা কেবল বলিয়াছি যে, সুষুপ্তি—জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুয়ের সন্ধি স্থল ; সুষুপ্তি যে, অজ্ঞেয়, তাহা নহে ; সুষুপ্তি-কালে আমরা এক প্রকার নির্ম্মল আরামের অবস্থা উপভোগ করি সুতরাং সেই অবস্থাটি আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি—কাজেই "আমি উপলব্ধি করিতেছি" ইহাও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করি—সুতরাং সুষুপ্তি-কালেও অহম্বৃত্তির বিরাম নাই। এমনও কথা আমরা কোথাও বলি নাই যে, অজ্ঞেয় পদার্থ মূলেই নাই ; আমরা কেবল বলিয়াছি যে, আত্মা অজ্ঞেয় নহে—যেহেতু আত্মা আপনার জ্ঞানে আপনি স্বপ্রকাশ। আমরা যদি বলি যে, মেঘমুক্ত আকাশের মধ্যাহ্ন দিবাকর অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নহে, তাহাতে কি এইরূপ বুঝায় যে, আমাদের মতানুসারে অপ্রত্যক্ষ পদার্থ মূলেই নাই ; মধ্যাহ্ন দিবাকরই যেন অপ্রত্যক্ষ নহে ; গ্রহ তারার আভ্যন্তরিক বস্তু-সকল তো আমাদের অপ্রত্যক্ষ। এমন কোটি কোটি বস্তু আছে যাহা আমি জানি না—

কিন্তু তাহা বলিয়া আমি কি তাহার সত্তা স্বীকার করি না? আরেক জন তাহা জানি-লেও আমি তাহার সত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু যাহা কেহই জানে না—স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না—যাহা একেবারেই অজ্ঞেয় (যেমন বক্র ঋজু-রেখা, শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া, অহ-ম্বৃত্তি শূন্য জ্ঞান ইত্যাদি) তাহার সত্তা কেহই স্বীকার করিতে পারে না—কাজেই আমিও স্বীকার করিতে পারি না। আমি হিমালয় দেখি নাই—কিন্তু আর শত কোটি লোক আবহ-মান কাল তাহা দেখিয়া আসিতেছে; তবুও কি আমি বলিব যে, হিমালয় নাই। আমি তো আর উন্মাদ নহি! আমার অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, আমি নিজে হিমালয় না দেখি-লেও আর শত শত ব্যক্তি তাহা দেখিয়াছে—এ জন্য হিমালয়কে আমি অদৃশ্য বলিতে পারি না। তেমনি, আত্মাকে যদি আমি নিজে না-ও জানি—তথাপি শঙ্করাচার্য্য বা অন্য কোন মহাত্মা পুরুষ আত্মাকে জানিয়াছেন এই ঘটনাটিতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা অজ্ঞেয় নহে। আমি নিজে ইংলণ্ড দেখি নাই বলিয়া ইংলণ্ডকে আমি অদৃশ্য প্রদেশ বলিতে পারি না, তেমনি আমি নিজে আত্মাকে জানি না বলিয়া আত্মাকে অজ্ঞেয়-পদার্থ বলিতে পারি না। কিন্তু যদি এরূপ হয় য, আত্মা কাহারো অহম্বৃ-ত্তির গম্য নহে—স্বয়ং ঈশ্বরেরও অহম্বৃত্তির গম্য নহে—তবেই আমরা বলিতে পারি যে, আত্মা অজ্ঞেয়। আর একটি কথা এই যে, যদি এরূপ হয় যে, একজন মনুষ্যও (যেমন শঙ্করাচার্য্য) আত্মাকে জানেন, তবে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, আত্ম-জ্ঞানের বীজ সকল মনুষ্যেরই জ্ঞানাভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে; তবে, কোথাও বা তাহা অল্প-মাত্রায় বিকসিত কোথাও বা অধিক মাত্রায় বিকসিত; কেননা সকল মনুষ্যই এক ছাঁচে গঠিত। একজন চাসা গণিত শাস্ত্র না জানিতে পারে—কিন্তু গণিত-শাস্ত্রের বীজ তাহারও জ্ঞানাভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে; দুই আর দুয়ে চারি হয়—এটা হয় তো তাহার জানা আছে, আর, যাহা তাহার জানা নাই তাহা তাহাকে শেখানো যাইতে পারে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বীজ যে, জ্ঞান-মাত্রেতেই আছে, তাহা অত ঘোর ফের করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন করে না; যিনি যাহা কিছু জানেন তাহারই সঙ্গে তিনি "আমি জানিতেছি" এই বৃত্তান্তটি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া থাকেন,—আমি জানি-তেছি—এই যে জ্ঞান, ইহাই আত্ম-জ্ঞানের বীজস্বরূপ। বিবেক, বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানু-রাগ দ্বারা এই বীজটি বিকসিত হইলে তবেই আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল-ভাবে দীপ্তি পাইয়া উঠে। অতএব, আত্মা অজ্ঞেয় ইহা কোন যুক্তিতেই স্থান পাইতে পারে না।

অতঃপর বিপিন বাবু দেখাইতেছেন যে বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে সুষুপ্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা;—(১) অর্দ্ধ সুষুপ্তি এবং (২) পূরা-সুষুপ্তি। বেদান্ত-শাস্ত্র-মতে যাহার নাম সুষুপ্তি, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে তাহাই অর্দ্ধ সুষুপ্তি—পূরা-সুষুপ্তি তবে কি? বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন

"সমগ্র-লয়ে তু বুদ্ধের্বৃত্তি সামান্যাভাবো মরণাদাবিব ভবতি।
সা চ সুষুপ্তি বৃত্ত্যভাব রূপেতি পুরুষ স্তৎসাক্ষী ন ভবতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মরণাদিতে যেমন মনুষ্যের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, পূরা-সুষুপ্তিতে অবিকল সেইরূপ হয়—আত্মা পূরা সুষুপ্তির সাক্ষী নহে। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, আত্মা যদি পূরা-সুষুপ্তির সাক্ষী না হইলেন—তবে কে তাহার সাক্ষী? কেহই নহে। যে বৃত্তান্তের কেহই সাক্ষী নাই সে বৃত্তান্ত যে, যথার্থই একটি সত্য বৃত্তান্ত, তাহার নিতান্তই প্রমাণাভাব;—যাহা তোমার আমার এবং সকলেরই—এমন কি স্বয়ং বিজ্ঞান-ভিক্ষুরও—ধ্যানের অগোচর, তাহা নিতান্তই একটি না-জানা কথা; এইরূপ না-জানা কথা-সকলের বাণিজ্য ব্যবসায় হইতে যাঁহারা প্রভূত ফল-লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের সে সুখ-স্বপ্নে আমরা কোন প্রকার ব্যাঘাত দিতে চাহি না, আমরা কেবল এই চাই যে, বিপিন বাবু আমাদিগকে সেরূপ জটিল বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পাকচক্রে জড়াইবেন না, কেন না, আমরা তাহাতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ এবং অপটু। আমরা সাদা সীধা এই বুঝি যে, বেদান্তের মতে মনুষ্যের ইহজীবনের প্রাত্যহিক অবস্থা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা;—জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। তবে যে, বিজ্ঞানভিক্ষু সুষুপ্তিকে অর্দ্ধ সুষুপ্তি এবং পূরা সুষুপ্তি এই দুই অবান্তর বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সেটা তাঁহার নিজের কপোল-কল্পিত; কেননা আর কোন বেদান্ত গ্রন্থেই মৃত্যু-নির্ব্বিশেষ সাক্ষি-শূন্য সুষুপ্তির উল্লেখ নাই। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে যাহা অর্দ্ধ সুষুপ্তি, বেদান্ত-মতে তাহাই পূরা সুষুপ্তি, আর, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে যাহা পূরা সুষুপ্তি - সমস্ত শাস্ত্রের মতে তাহাই মৃত্যু। বিজ্ঞান-ভিক্ষু সুষুপ্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আরেক জন সূক্ষ্মতর দার্শনিক পণ্ডিত সুষুপ্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন, যথা;—(১) সিকি সুষুপ্তি, (২) অর্দ্ধ সুষুপ্তি (৩) পূরা সুষুপ্তি। অপর আর-একজন দার্শনিক সুষুপ্তিকে দশ ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন;—যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে। জাগ্রদবস্থাকেও পূরা জাগ্রৎ, অর্দ্ধ জাগ্রৎ, সিকি জাগ্রৎ, দু আনা জাগ্রৎ, ইত্যাদি অশেষ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; স্বপ্নাবস্থাকেও ঐ; কিন্তু এরূপ করিবার কোন অর্থও নাই—কোন মূল্যও নাই। জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনের মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্ট ভেদ-রেখা টানা যাইতে পারে, কোন অবান্তর বিভাগের মধ্যেই সেরূপ পারা যায় না। বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহাকে পূরা-সুষুপ্তি বলিতেছেন—প্রকৃত পক্ষে তাহা সুষুপ্তি নহে; তাহা দেহের মৃত অবস্থা; আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তি সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছে—দেহ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে—দেহের এইরূপ অবস্থাই বিজ্ঞানভিক্ষুর পূরা সুষুপ্তি। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টই বলিতেছেন যে, মরণাদিতে যেমন বুদ্ধি-বৃত্তি লোপ পাইয়া যায়, পূরা-সুষুপ্তিতেও সেইরূপ হয়; আত্মা পূরা সুষুপ্তির সাক্ষী নহেন"—কেমন করিয়াই বা সাক্ষী হইবেন,—আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিয়াছেন, কাজেই আত্মা পরিত্যক্ত দেহের মৃত অবস্থার সাক্ষী নহেন। এরূপ সমগ্র সুষুপ্তিতে আত্মা ইহ-

লোকে থাকেন না—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু লোকান্তরে আপনার অহম্বৃত্তিতে আপনি প্রকাশিত হ'ন। অতএব বিপিন বাবু আমাদের উপর শ্লেষ দিয়া এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, "এই বিজ্ঞান ভিক্ষুই না শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়কে অহম্বৃত্তিতে আত্মা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন?" অর্থাৎ মৃত দেহে যখন অহম্বৃত্তি থাকে না তখন তাহাই বিপিন বাবুর মতে যথেষ্ট প্রমাণ যে, আত্মা অহম্বৃত্তির গম্য নহে—কি চমৎকার যুক্তি-কৌশল! দেহের মৃতাবস্থায় আত্মার অহম্বৃত্তি ইহলোকে না হউক্ পরলোকেও তো স্ফূর্ত্তি পায়! তাহা হইলেই আমাদের এই কথা স্থিরতর থাকে যে, অহংবৃত্তি শূন্য চৈতন্য শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহা-সুষুপ্তি হইতে পুনর্ব্বার দেহে ফিরিয়া আসা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব যেহেতু মৃত্যুর সহিত সেরূপ সুষুপ্তির কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; আমরা যেমন আত্মাকে অনুমান-সিদ্ধ বলি না, তেমনি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও বলি না, কেননা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয় তাহাই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; তবে কি? না আমরা বলি যে, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ আপনিই আপনার প্রমাণ; অথবা যাহা একই কথা—অহম্প্রত্যয়-সিদ্ধ; আত্মাকে আমরা সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করি সত্য—কিন্তু আত্মা নিজেই সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব বিপিন বাবুর এটা বড়ই ভুল যে, আমাদের মতে আত্মা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আত্মা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও নহে—অনুমান-সিদ্ধও নহে—আত্মা স্বতঃসিদ্ধ।

তাহার পর বিপিন বাবু আমাদের একটি সোজা কথাকে বিষম একটা পাকচক্রময় জটিল পথে লইয়া যাইতেছেন, যথা; "অজ্ঞেয় অর্থে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু যে মনে করেন যে, যাহা কখন প্রকাশিত হইবে না ও হইতে পারে না, আমরা তাহাতে সায় দিতে পারি না।" ইহার উত্তর আমরা এই দিই যে, যাহা আমরা জানিনা তাহাকে আমরা বলি যে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত; আর, যাহাকে আমরাও জানিতে পারি না—অন্য কেহও জানিতে পারে না তাহাকেই আমরা বলি অজ্ঞেয়। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে কেহই যাইতে পারে না বলিয়া আমারা বলি যে, তাহা অগম্য প্রদেশ। সেইরূপ কোন জ্ঞানই যেখানে যাইতে পারে না পারিবে না—তাহাকেই আমরা বলি যে, তাহা জ্ঞানের অগম্য। কিন্তু যদি এমন হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত কোন একটি উপায়ে—মনে করিলেই হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তখন আর আমি এ কথা বলিব না যে, ঐ প্রদেশটি অগম্য প্রদেশ। এমন কি, গ্রহাদির অভ্যন্তরস্থিত বস্তু-সকল আমাদের নিকটে যদিচ অজ্ঞাত কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিকটে অজ্ঞাত নহে, তা'ছাড়া, গ্রহাদি যদি কোন প্রকার জ্ঞানবান জীবের বসতি-স্থান হয় তবে তাঁহাদের নিকটেও উক্ত বস্তু-সকল অজ্ঞাত নহে, এ জন্য সে-সকল বস্তুকেও আমরা অজ্ঞেয় বলিতে পারি না।

কিন্তু বক্র ঋজুরেখা বাস্তবিকই জ্ঞানের অগম্য—বাস্তবিকই তাহা অজ্ঞেয় ; তেমনি অহম্বৃত্তি-শূন্য জ্ঞান বাস্তবিকই অজ্ঞেয় ; কেননা, বক্র ঋজুরেখা বলিয়া যে একটি রেখা তাহা কেহই জানিতে পারে না—জানিতে পারিবেও না ; আমি জানি না যে, আমি জানিতেছি, অথচ আমি জানিতেছি—এইরূপ যে, একটি শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া রকমের জ্ঞান, এরূপ জ্ঞানকে কেহ জানিতে পারেও না—জানিতে পারিবেও না। বাস্তবিকই যদি এরূপ হয় যে, কূটস্থ চৈতন্য স্বয়ং আপনাকে আপনি জানেন না—তিনি আপনিই আপনার অহংবৃত্তির গম্য নহেন—তবে বেদ-ব্যাসই বা তাঁহাকে কিরূপে জানিবেন আর শঙ্করাচার্য্যই বা তাঁহাকে কিরূপে জানিবেন? যাহা স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্যের জ্ঞানের অগোচর তাহা কিরূপে অপর কাহারো জ্ঞান-গোচর হইবে ? স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্য যদি আপনাকে আপনি অহম্ভাবে উপলব্ধি না করেন,তবে আর কে তাঁহাকে ত্বংভাবে উপলব্ধি করিবে ? অতএব অহম্বৃত্তি-শূন্য সৃষ্টি-ছাড়া জ্ঞান বক্র-ঋজুরেখার ন্যায় বাস্তবিকই অজ্ঞেয়। কিন্তু বিপিন বাবু ঠিক্ ইহার উল্টা কথা বলেন—তিনি বলেন যে, অহম্বৃত্তি-শূন্য জ্ঞান এক সময়ে প্রকাশ পাইবে, যথা ;—"অহংবৃত্তি প্রতিষিদ্ধ হইলেই সে জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাইবে।". তবে বল না কেন যে, শির বিলুপ্ত হইলেই শিরঃপীড়া অনুভূত হইবে ! অহম্বৃত্তিকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই যে, কোন অংশেই প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার দেখাইয়াছি—সুতরাং তাহা লইয়া আর আমরা মাথা বকাইতে পারি না। ইহার পরে বিপিন বাবু শ্রুতির দোহাই দিতেছেন। শ্রুতি তো উল্টা আরো বলেন যে, আত্মা স্বপ্রকাশ—আপনার জ্ঞানে আপনি প্রকাশিত ; অহম্ভাবে জানা ভিন্ন আপনাকে আর কোন ভাবেই জানা সম্ভবে না—ত্বং ভাবে জানাও সম্ভবে না—ইদং ভাবে জানাও সম্ভবে না ; অতএব আত্মা যখন চিরকালই স্বপ্রকাশ—তখন অবশ্য চিরকালই তিনি আপনার নিকটে অহম্ভাবেই প্রকাশিত—চিরকালই তাঁহাতে অহম্বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, অতএব অহম্বৃত্তি নিত্য। ইহা সত্ত্বেও বিপিন বাবু বলিতেছেন যে "অহম্বৃত্তি অনিত্য বিধায় তাহা প্রতিষিদ্ধ হওন পক্ষে সম্ভবতঃ কোন বাধা দৃষ্ট হয় না।" তাঁহার নিজের কথায় তাঁহার নিজের কোন বাধা দৃষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু অহংবৃত্তি-শূন্য জ্ঞানে এবং সূর্য্য-শূন্য দিবালোকে সাধারণত সকল লোকেই বাধা দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বিপিন বাবুর কথার ভাবে পূর্ব্বে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, তিনি শ্রুতি এবং অনুভব দুয়ের কোন-একটিকেও ছাড়িতে চাহেন না ; কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। যাহা কাহারো অনুভবে কোন প্রকারেই স্থান পাইতে পারে না, শ্রুতির মধ্যে তাহাই তিনি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন ! অহম্বৃত্তি-বর্জ্জিত জ্ঞান কোন অনুভবে স্থান পায় নাই পাইবে না—পাইতে পারে না ; শুধু যে কেবল তোমার আমার অনুভবে স্থান পায় না তাহা নহে ; বক্র ঋজু রেখা যেমন

কোন অনুভবেই স্থান পাইতে পারে না, সেইরূপ—আমি জানি না যে, আমি জানিতেছি অথচ আমি জানিতেছি—এইরূপ অহংবৃত্তি-বর্জ্জিত অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জ্ঞান কাহারো অনুভবে কস্মিন্ কালেও স্থান পাইতে পারে না। শ্রুতির অর্থ যদি কাহারো অনুভব-গম্য না হয় তবে শ্রুতি অর্থহীন শব্দ-রাশি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। শ্রুতির অর্থ যদি পাঠকের অনুভবেই আসিল না তবে শ্রুতির অধ্যয়নে ফল কি? মূল শ্রুতিই যদি অনুভবাতীত আগ্ড়ম-বাগ্ড়ম বাক্য-রাশি হইল, তবে তাহার এত ভাষ্যই বা কেন—টীকাই বা কেন—শঙ্করাচার্য্যের কেবল পণ্ডশ্রমই সার! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে অনুভবের মূলোচ্ছেদ করিলে শ্রুতিরও মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। যেমন এই পাতা-টির এ পৃষ্ঠায় সূচি বিদ্ধ করিলে তাহার ও-পৃষ্ঠাও সূচি বিদ্ধ হইয়া যায়,সেইরূপ সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর অনুভব কর্ত্তিত হইলেই সেই সঙ্গে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সমস্তই কর্ত্তিত হইয়া যায়।

মদ্দা ছাগলের দুগ্ধ-দোহন প্রভৃতি গুটিকত উপমা যাহা আমরা দিয়াছি,তাহার উদ্দেশ্য বিপিন বাবু মনে করিতেছেন—রহস্য কৌতুক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাহার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—অহংবৃত্তি শূন্য জ্ঞান যে কতবড় একটা গুরুতর ভ্রম তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া—এইমাত্র। মদ্দা ছাগলের দুগ্ধ দোহনের উপমাটি আমরা কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি; উহা যদি নিতান্তই অযোগ্য উপমা হইত তাহা হইলে উহা কাণ্টের গ্রন্থে স্থান পাইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বড় বড় দর্শন-কারেরাও ভ্রমের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য উপমার সাহায্য গ্রহণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করেন নাই; ইহার একটি উদাহরণ;—

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥"

—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য।

ইহার অবিকল অর্থ এই;—যে জ্ঞান প্রমাণকে প্রবোধিত করে অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, সেই জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে যা'ন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা কাষ্ঠ দিয়া অগ্নিকে দহন করিতে যা'ন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা এমনি মহা পণ্ডিত যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে সেই জ্ঞানকে তাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন; যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে, সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন।" কেমন সরস যুক্তিপূর্ণ—কেমন সার-গর্ভ—রহস্যোক্তি! ইহাতে করিয়া কেমন সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাক্ষী চৈতন্য অনুমান-সিদ্ধও নহেন—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও নহেন—কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ! অর্থাৎ সাক্ষী চৈতন্যের আপনার অহং জ্ঞানই তাঁহার আপনার প্রমাণ—তিনি আপনিই আপনার প্রমাণ—তদ্ব্যতীত তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত-গণের উদ্ভাবিত মদ্দা ছাগলের উপমাটি ঐরূপই একটি যুক্তিপূর্ণ রহস্য-রত্ন।

কিন্তু আমরা এক ভাবে এক কথা বলিয়াছি বিপিন বাবু তাহা আরেক ভাবে গ্রহণ করিতেছেন ;—বিপিন বাবু বলিতেছেন "এই সকল রহস্য-নিহিত যুক্তি-রত্ন এই — অজ্ঞেয় হইতে জ্ঞান অর্থাৎ অহংবৃত্তির সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের এবম্বিধ যুক্তিকে যদি অকাট্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যবস্থা মতে বিন্দু হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি, অথবা পদার্থদর্শন শাস্ত্রের ব্যবস্থা মতে অণু হইতে পদার্থের উৎপত্তিও অসম্ভব হইয়া পড়ে।" ইহারই নাম ধান ভানিতে শিবের গীত। জ্ঞানের উৎপত্তির কথা আমরা কোন স্থানেই উল্লেখ করি নাই ; তাহা ছাড়া, পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য জ্ঞান--সেই নিত্য জ্ঞানে নিত্যকালই অহংবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে --এ জ্ঞানের সম্বন্ধে উৎপত্তি কথাটাই সংলগ্ন হয় না। আমরা বলিতেছি কেবল এই যে, অহম্বৃত্তি শূন্য সৃষ্টি-ছাড়া চৈতন্য যাহা কাহারো অনুভবে স্থান পাইতে পারে না – কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি জীব, কি ঈশ্বর—কাহারো অনুভবে স্থান পাইতে পারে না—যাহা বক্র ঋজু-রেখার ন্যায় একটা ভ্রম-জ্ঞান মাত্র—সে রূপ চৈতন্যের উপদেষ্টাও যেমন---গৃহীতাও তেমনি—উভয়েই অন্ধের পরাকাষ্ঠা। কেন না, সে চৈতন্য অহংবৃত্তি শূন্য সুতরাং নিজে জানে না যে, আমি জানিতেছি ; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সে চৈতন্য নিজে জ্ঞান-শূন্য, লক্ষ্মী নিজে লক্ষ্মী ছাড়া। জ্ঞানশূন্য চৈতন্য, বক্র ঋজু রেখা, সোণার পাথর বাটি, এ সকল বস্তু দেবতারও জ্ঞানের অগোচর। মনে কর— ঝাপ্সা আলোকে আমার সম্মুখে আমি একটা মূর্ত্তি দেখিতেছি ; তাহা কি জীবন্ত দেবতা, না শুধু কেবল একটা মৃন্মূর্ত্তি, ইহা আমি ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; এরূপ অবস্থায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া আমি যদি বলি যে, "তুমি সকলই জানিতেছ" অথচ যদি এরূপ হয় যে, মূর্ত্তিটি নিজে এটাও জানে না যে, "আমি জানিতেছি," তবুও কি বলিতে হইবে যে, সে মূর্ত্তিটি জীবন্ত দেবতা ? পরন্তু আমি যেমন বলিলাম যে "তুমি সকলই জানিতেছ," তেমনি মূর্ত্তিটিও যদি জানে যে, আমি জানিতেছি ; মূর্ত্তিটির অভ্যন্তরে যদি অহম্বৃত্তি স্ফুরিত হয় ; তবেই এ কথা সপ্রমাণ হয় যে, মূর্ত্তিটির অভ্যন্তরে চৈতন্য জাগিতেছে। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি নিতান্তই বোবা, তাহার সে কথা যেমন বিশ্বাস-যোগ্য, "আমি জানিতেছি বটে কিন্তু আমি জানিনা যে আমি জানিতেছি" এ কথাও সেইরূপ ; বোবার কথা এবং অহংবৃত্তি-শূন্য জ্ঞান—দুইই সমান। অতএব অহম্বৃত্তিই চৈতন্যের একমাত্র প্রমাণ। অহংবৃত্তি-শূন্য চৈতন্য চৈতন্যই নহে ; কাজেই সেরূপ চৈতন্যকে কেহ জানিতে পারেও না—পারিবেও না ; সেরূপ চৈতন্য আপনিই আপনাকে জানে না—অন্যে পরে কা কথা ! এইরূপ না-জানা বিষয়ের শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা-প্রাপ্তি উপলক্ষেই আমরা বলিয়াছি যে, গুরু মন্দা ছাগল দুহিতেছেন, শিষ্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য চালুনি ধরিয়াছেন ; উভয়েই সমান বুদ্ধিমান। এ বলে আমায় দ্যাখ—ও বলে আমায় দ্যাখ।" কি যে মন্দ

কথা বলিয়াছি তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের আর-একটা রহস্যোক্তি এই যে, ওরূপ গুরু শিষ্য—এক অন্ধ আর-এক অন্ধের পথ-প্রদর্শক; এ রহস্যোক্তিটি আমাদের নিজের স্বকপোল-কল্পিত নহে—পরম শ্রদ্ধেয় কঠোপনিষদ্ হইতে আমরা উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিপিন বাবু আমাদের এই সকল কথার উত্তর এই দিয়াছেন যে,"রহস্য পটুতা কখনও যুক্তির সারবত্তার প্রমাণ নহে ও হইতে পারে না।" আমাদের স্বপক্ষে তবু—এই একটি কথা বলিবার আছে যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা আমাদিকে যে পথ দেখাইয়াছেন আমরা সেই পথের অনুগামী হইয়াছি। কিন্তু বিপিন বাবু পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের সোজা পথ ছাড়িয়া যেরূপ বিষম একটা পাকচক্রময় কিম্ভূত কিমাকার বাঁকা পথের অনুগামী হইয়াছেন—তাহাতে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা খুবই প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু বলিতে কি—সমস্তই বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। কেননা তিনি তাঁহার পরম সারবান্ যুক্তি দ্বারা যে বিষয়টি সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন—তাহা যে, কি, তাহা তিনি আপনিও জানেন না—জানিতে পারেনও না—পারিবেনও না, আর-কেহও জানে না—জানিতে পারেও না পারিবেও না, তাহা নিতান্তই ভোঁ ভাঁ ব্যাপার! নিতান্তই অজ্ঞেয়! বিপিন বাবু যদি আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির পরামর্শ নিতান্তই হেয় জ্ঞান না করেন তবে তাঁহাকে আমরা বিনীতভাবে বলি এই যে, অমন সকল মহামূল্য সারবান্ যুক্তি-রত্ন পথে ঘাটে ছড়ানো অপেক্ষা—ঐকান্তিক অজ্ঞাত অপরিচিত বিষয়ের চর্চ্চায় ক্ষান্ত থাকাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। আপনিও জানিব না, অন্যকেও জানিতে দিব না—এইরূপ করিয়া জ্ঞানের পথ জন্মের মত অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়াই যদি তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য হয়, জ্ঞানকে অজ্ঞেয় করিয়া গড়িয়া তোলাই যদি তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য হয়, তবে সেরূপ নূতন ধরণের তত্ত্বজ্ঞান হইতে আমরা যত দূরে থাকি ততই ভাল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্রোহ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাণী খবর নিয়া শুনিলেন রাজা বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রাণী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না, রুক্মাকে সঙ্গে লইয়া দ্বার দেশে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজা একাকী গিয়াছেন কি না, কোনদিকে গিয়াছেন—ইত্যাদি।

প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"হ্যাঁ একাকীই গিয়াছেন—আর ঐ তরু-পথের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। বোধ হয় বেশী দূরে যান নাই, তরুকুঞ্জে বেড়াইতে গিয়া থাকিবেন"।

বলিয়া প্রহরী পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া রুক্মার সহিত সেই দিকে গমন করিলেন। প্রহরী যে ইহাতে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হইল তাহাও নহে। এমন ত প্রায়ই হইয়া থাকে রাজা রাণী উভয়ে রাত্রে ভ্রমণে বাহির হন সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যান না। আর রাজা নিকটে বেড়াইতেছেন শুনিলে তাঁহাকে বিস্মিত করার অভিপ্রায়ে রাণী কখনো কখনো একাকীই তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন—আজত সঙ্গে তবু রুক্মা আছে। আসল কথা রাজপুরীর চারিপাশের ভ্রমণস্থান এত নিরাপদ যে রাত্র বলিয়া ভ্রমণে কাহারো ভয় হয় না।

রাণী খানিকদূর গিয়া যখন তরুপথের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন যেন অস্পষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। এই সময় অন্য পথ দিয়া একজন কাঠুরিয়া ভীল এই তরুপথে আসিয়া পড়িয়া সহসা উর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, "সুহার এখনো হেথায়।" বলিয়া তরুকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। সে নাম রুক্মাও শুনিল—রাণীও শুনিলেন—সেমন্তীর হৃৎপিণ্ডে দারুণ বেগে শোণিত রাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, রুক্মা কাতরকণ্ঠে বলিল, "আর কেন চল ফিরিয়া যাই"—

রাণী কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু না ফিরিয়া অগ্রসর হইলেন, নিজের মৃত্যু নিজে উপভোগ করিতে অগ্রসর হইলেন। উপভোগ? হ্যাঁ উপভোগ বই কি। কষ্টও কি উপভোগ্য নহে? বিশেষ ভালবাসার কষ্ট? এ কষ্ট কেহ পাইতে চাহেনা সত্য—কিন্তু পাইলে কেহ ফেলিতেও চাহে না, জানি না এ কষ্টেরি—কি এত মোহ!

রাণী চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় যাইতেছেন কি করিতেছেন—জ্ঞানহীন হইয়া চলিতে লাগিলেন। সহসা গীত ধ্বনি থামিয়া গেল—রুক্মা তাঁহার হাত ধরিয়া একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর? তাহার পর কম্পমান-দেহ অবসন্ন-মহিষী সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন হইতে সেই নিকুঞ্জ মধ্যে জলাশয় তীরে বালিকা নয়নে নয়নে রাজাকে দেখিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার বিকশিত ভাব একটি ম্লানময় গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এলো বেলো হাসি গল্প আর তাহার ভাল লাগে না, কথায় কথায় কেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, তাহার শুষ্ক মুখ, নীরব ভাব দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা

যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে ত অমনি সুহার চটিয়া উঠে। সুবিধা পাইলেই সে লোকের দৃষ্টি এড়াইতে চায়। প্রতিদিন বিকালে নিয়মিত সেই জলাশয়তীরে বেড়াইতে আসে। কিন্তু আগে এইখানে আসিয়া যেমন তৃপ্তি লাভ করিত, এখন আর তেমন তৃপ্তি লাভ করে না। একটা অতৃপ্তি অভাবের মধ্যে সে চারিদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহে! বাতাসের শব্দেও যেন চমকিয়া উঠে? কেন তাহার এ অতৃপ্তি? কিসের এ অভাব! আগে রাজাকে দূর হইতে দেখিলেই সে সন্তুষ্ট হইত, এখন তবে কি সুহার রাজাকে নয়নে নয়নে দেখিবার প্রত্যাশা করে? সেই জন্যই কি তাহার এ অতৃপ্তি?

কেন অতৃপ্তি বালিকা তাহা বুঝে না—তাহার কেবল সেই দৃষ্টি মনে পড়ে,—সেই মোহময় মধুময় দৃষ্টি, সমস্ত জগতের লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য যে দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেই দৃষ্টি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মরিতে ইচ্ছা করে,—কিন্তু আর একবার সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিবার জন্য সে ব্যস্ত কি না তাহা সে জানে না,—সে প্রত্যাশা তাহার পক্ষে বড় অধিক প্রত্যাশা। প্রতিদিন সে যখন জলাশয় তীরে আসে, তাহার বড় ভয় হয় পাছে মহারাজকে দেখিয়া ফেলে! যখনি তাহার মনে হয়—"যদি মহারাজ আসেন? অমনি সভয়ে সঙ্কোচে যেন মরিয়া যায়। অথচ যখন আসিয়া দেখে—তিনি নাই—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে নিশ্বাস উথলিয়া উঠে, নিজের নিশ্বাসে নিজেই চমকিয়া উঠে, নিভৃত বনপ্রদেশ পর্য্যন্ত যেন চমকিয়া উঠে। বালিকা তখন আস্তে আস্তে জলাশয় তীরে আসিয়া বসে, জলে নয়ন ভাসিতে থাকে। কেন ভাসে—সে তাহা জানে না, রাজাকে দেখিবার জন্য যে সে আকুল সে তাহা জানে না। রাজাকে দেখিবার আশা যে তাহার দুরাশা! সে আশা মনে আনিতেও তাহার সাহস নাই! তাহার জীবনের সম্মুখে যে অনন্তকাল পড়িয়া আছে ইহার এক একটি ক্ষুদ্র প্রতিদিন এইরূপ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কাটিবে—ইহাই সে জানে, তাহার এই দগ্ধ হৃদয় প্রতিদিন এইরূপে তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইবে, ইহাই মাত্র সে জানে। ইহা ছাড়া আর কিছু তাহার মনে আসে না। কেমন করিয়া আসিবে!

ধূমকেতু আকাশের দেবতা মর্ত্ত্যের তরুলতার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের জীবন পথে উদিত হইয়া শুষ্ক করিয়া দিয়া যায়, শূন্যময় দগ্ধজীবন লইয়া তরুলতা অনন্ত কাল ধরিয়া হেথায় পড়িয়া থাকে। যে চলিয়া যায়—সে একবার ফিরিয়া চাহে কি? ক্ষুদ্র হৃদয়দিগকে কিরূপ আকুল করিয়া দিয়া গেল একবার ভাবে কি? সে আকাশের দেবতা আকাশে বিচরণ করে—তাহার দৃষ্টিতে মর্ত্ত্যের কোন প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল তাহা সে ভাবে না! তরুলতা শুষ্ক হৃদয় লইয়া মাটিতে মিশাইতে মিশাইতে কাঁদিয়া মরে।

বালিকা আজ জলাশয় তীরে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। তাহার

সেই আকুল দৃষ্টি হইতে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতে একটা করুণ কাতর ভাব উত্থিত হইয়া চাঁদের প্রাণ যেন সিক্ত করিতেছিল।

রাজা এতদিন পরে আজ আবার সেই নিকুঞ্জ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—বালিকার নিকট দাঁড়াইয়া সেই জ্যোৎস্না চুম্বিত অনুপম মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গীত-সুধা পান করিতেছিলেন। ঘুমন্ত জ্যোৎস্নালোকে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রেমময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সমুখে আজ বিরাজিত। এক মধুর শান্তিতে এক অপরিমিত সুখানন্দে তাঁহার চারিদিক ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি অতীত বিস্মৃত হইয়াছেন, ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়াছেন, বর্ত্তমানের সেই মুহূর্ত্ত ছাড়া আর সকলি বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজা যে কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপে বালিকার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন—তাহা বালিকা জানে না, বালিকা খানিক পরে গান বন্ধ করিয়া যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন সহসা তাহার রাজার দিকে দৃষ্টি পড়িল, বালিকা চমকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ যন্ত্রের সবল স্পর্শে যেন সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল, বালিকা লতিকার ন্যায় কাঁপিয়া উঠিয়া জল মধ্যে পড়িয়া গেল। রাজাও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, দেখিতে না দেখিতে তাহাকে কোলে লইয়া তীরদেশে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন।

বালিকার শরীর কাঁপিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে,—বালিকা অবনত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল, উভয়ে মুগ্ধের ন্যায় উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। বিমল জ্যোৎস্না, বিমল পুষ্পগন্ধময় নিকুঞ্জ, উভয়ের আর্দ্র মুখে মিলনের আনন্দ ভাব, নয়নে বিরহের অশ্রুজল, দুজনের প্রাণের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, দুজনের নিশ্বাস দুজনের মুখে আসিয়া লাগিল—এই সময় একজন ডাকিল—"সুহার"।

হেঁয়ালি নাট্য।*

(সস্ত্রীক নবীন বাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি রাখাল বাবুর কথোপকথন স্থলে নবীন বাবুর ভায়রাভাই নভেল লেখক ব্রজ বাবুর প্রবেশ)

রাখাল। চুপ চুপ ঐ যে ব্রজবাবুই আসছেন!

স্ত্রী। এই যে জামাই বাবু! নাম করতে করতে যে এসে উপস্থিত, অনেক দিন বাঁচবে!

নবীন। দাদাঠাকুর, আসতে আজ্ঞে হোক। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল!

ব্রজ। (বসিয়া) তা বইটা কি পড়া হয়েছিল?

নবীন। আরে, তার কথাই ত হচ্ছিল, চমৎকার!

রাখাল। তোমার এ বইখানার কাছে আর কারো বই দাঁড়াতে পারে না।

ব্রজ। দেখ রাখাল বাবু, তোমাদের সমালোচনা শক্তির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা; এপর্য্যন্ত এমন সমালোচক কিন্তু আর দেখলুম না।

স্ত্রী। জামাই বাবু, তুমি যেমন ওদের কথায় ভোল, এতক্ষণ কি হচ্ছিল শুনবে? বলি তবে?

নবীন। (স্ত্রীকে টিপ্পনি দিয়া) আঃ! ব্রজবাবুকে দেখলেই কি তোমার ঠাট্টা! এমন একঘেয়ে পচা, ঠাট্টার ভিতর ঠাট্টাটাই বা কোথায় তাওত দেখতে পাইনে।

স্ত্রী। তাইত! না জামাই বাবু—

নবীন। (স্ত্রীর প্রতি চুপে চুপে) আরে চুপ করনা—ওকে নিয়ে একটু মজা করি।

ব্রজ। আমি কি না এমনি গাধা আর কি যে, আপনাদের মত সুরুচিসম্পন্ন সমজদার সমালোচক লোক আমার লেখার সত্যি অপ্রশংসা করেন এই আমি বিশ্বাস করব!

স্ত্রী। এখন তোমার এতটা বুদ্ধি হয়েছে সে জ্ঞান আমার ছিল না। ঠিক বলেছ—তোমার দর ওঁরা না বুঝবেন ত বুঝবে কে? তা জামাই বাবু, তুমি যে বলছিলে বইখানা অভিনয় করতে দেবে তার কি হোল?

ব্রজ। শেষে বুঝলুম অভিনয় করতে না দেওয়াই ভাল। না জেনে কোন লোকের নামে কিছু বলতে চাইনে, তবে এইটে বলতে পারি—হিংসাটা মানুষের মনে স্বভাবতঃ প্রবল।

নবীন। তা সত্যি বলেছ।

ব্রজ। তা ছাড়া যারা নিজে লেখে তাদের হাতে বই দেওয়া আমার বড় ভাল মনে হয় না।

নবীন। সেও একটা কথা বটে, চুরি করতে পারে।

ব্রজ। তাই ত আমি বলছি। কার হাতে দেব কে আত্মসাৎ করবে।

রাখাল। (আস্তে আস্তে) তাতে তোমার ত কোন ক্ষতি দেখছিনে, সে লেখা যে চুরী করবে ক্ষতি তারই।

ব্রজ। কি বলছেন?

স্ত্রী। উনি বলছেন—তোমার লেখা যে চুরী করবে ক্ষতি তার।

ব্রজ। ক্ষতি তার! কথাটা ঠিক—

স্ত্রী। এর মানে বুঝলে না—গাধা মহাশয়—তোমাকে গাধা বলছে।

রাখাল। ব্রজবাবু ওর কথা শুনবেন না, উনি নারদের ঢেঁকি, কেবল রাগাবার

ফন্দী। আমি বলছি, আপনার Originality এত অধিক যে আপনার লেখা চুরী করে কেউ হজম করতে পারবে না। জানেন ত Originality গুলো ঠিক লোহার কলাই—তাতে দন্তস্ফুট করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, সে কেবল আপনারাই পারেন।

ব্রজ। (আহ্লাদে) বাস্তবিক বইখানা আপনাদের কোথায় কি রকম লাগলো সেটা শুনলে বুঝতে পারি—

রাখাল। সমস্তই ভাল লেগেছে।

ব্রজ। তবু কোথাও কিছু বদল করার আবশ্যক দেখলেন কি? (নবীন বাবুর প্রতি) আপনি কি বলেন?

নবীন। কোথাও না কোথাও না, আগাগোড়াই ভাল।

ব্রজ। (ঘামিয়া উঠিয়া) আপনারা কিছু সঙ্কোচ করবেন না। উপযুক্ত লোকে যখন আমার লেখার ঠিক দোষটি দেখিয়ে দেয় তাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট এমন কিছুতেই না। বন্ধুরা যদি দোষ সংশোধন না করেন, তাহলে বন্ধুত্বই কি?

রাখাল। এতটা যখন বলছেন—তাহলে আমার একটি কথা বলার আছে?

ব্রজ। কি রকম!

রাখাল। আগাগোড়া বইখানি বেশ হয়েছে—

ব্রজ। বেশ হয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ বেশ হয়েছে—কেবল একটু।

ব্রজ। কেবল একটু কি?

রাখাল। একটু ঘটনার অভাব হয়েছে?

ব্রজ। ঘটনার অভাব! মহাশয় আমায় আশ্চর্য্য কল্লেন।

রাখাল। হ্যাঁ ঘটনা বড়ই কম হয়েছে।

ব্রজ। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! মহাশয় আপনি যদিও একজন সমজদার ব্যক্তি এবং আপনার সমজদারিত্বের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস কিন্তু তবুও এ কথাটায় আমি আপনার সহিত একমত হতে পারছিনে। আমার মতে বরং ঘটনাটা একটু বেশী হয়েছে। নবীন বাবু আপনি কি বলেন?

নবীন। না এ বিষয়ে আমি রাখাল বাবুর সঙ্গে মত দিতে পারছিনে। আমার মতে ঘটনা যথেষ্ট আছে—আর প্রথম দিকের পরিচ্ছেদ গুলি অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক, কিন্তু শেষাশেষি কৌতূহলটা একেবারেই কমে আসে।

ব্রজ। কমে আসে? আপনি বোধ হয় মানে করছেন কৌতূহল বাড়ে, এতই বাড়ে—যে তখন আপনার কৌতূহল-উদ্দীপক বোধ শক্তি বোধ হয় কমে আসে—এই কথাই আপনার বলার উদ্দেশ্য।

নবীন। না আমি সে মানে করছিনে—সত্যই কৌতূহল আর কিছু মাত্র থাকে না।

ব্রজ। কখনোই না, কখনোই আপনি সে মানে করতে পারেন না—নিশ্চয়ই আপনি বলছেন কৌতূহল বাড়ে।

নবীন। আচ্ছা গিন্নিকে জিজ্ঞাসা কর—উনিও তোমার বই পড়তে পড়তে কাল ঐ কথা বলছিলেন।

স্ত্রী। না জামাই বাবু—আমি ও কথা বলিনি—আমি সমস্ত বইখানির কোথাও একটু খুঁৎ পাইনি।

ব্রজ। যাই বল মেয়েরা যেমন ঠিকটি বোঝে, পুরুষেরা অমন বুঝতে পারে না।

স্ত্রী। আমার কেবল মনে হয়—একটু বেশী বড় হয়েছে।

ব্রজ। আকারে বড় হয়েছে—না বলছ ঘটনার আধিক্য বেশী হয়েছে?

স্ত্রী। না না তা নয়, আমি বলছিলুম—অভিনয় করার পক্ষে আকারে একটু বড়।

ব্রজ। শালী ঠাকরুণ, আপনার কথার উপর আমার কথা নেই, তবে এটা কি না ঘড়ির কথা, আমি বলছি পাঁচ ঘণ্টায় অভিনয় হয়, তাহলে বইখানা ত আর বড় হতে পারে না।

নবীন। সে কথা তবে যাক। খবরের কাগজ ওয়ালারা কি বলছে?

ব্রজ। খবরের কাগজ? তাদের মতন মিথ্যাবাদী, হিংসুক, নিন্দুক, বদমাইস, বিবেক-বুদ্ধিহীন——, যাক আমি যদিও তাদের কাগজ পড়িনে।

নবীন। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ কর—তারা যে রকম কঠোর গালাগালি দেয় তাতে তোমার মত কোমল হৃদয় লোকের বিশেষ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

রাখাল। কিন্তু লেখক হতে গেলে সে নিন্দা শোনাটাও দরকার।

ব্রজ। তা যদি বল, তা হলে যার বন্ধু আছে তার খবরের কাগজ পড়ার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আর নবীন বাবু আপনি যে মনে করছেন—খবরের কাগজের নিন্দেতে আমি চটে যাব, তেমন ছেলে আমাকে পাননি। জঘন্য খবরের কাগজের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই আরো ভাল।

রা। তা ঠিক। সে দিন ঐ কাগজটা তোমাকে কি গালই দিয়েছে।

ব্রজ। কি রকম?

নবীন। হ্যাঁ সত্যি সে কি যাচ্ছেতাই রকম গালাগালি?

ব্রজ। (কষ্টে শ্রেষ্টে হাসিয়া) বেশ বেশ—বড় নাকি বয়ে গেল।

নবীন। বাস্তবিক—তাহার ঝালঝাড়া দেখলে হাসিই পায়।

ব্রজ। তবু কি বলেছে? আপনার মনে আছে?

নবীন। রাখাল তোমার মনে আছে? ব্রজ বাবু দেখছি ভারী উৎসুক!

ব্রজ। উৎসুক? না একটুও না। তবে কি না কি বলেছে জানাই যাক না।

নবীন। কি রাখাল মনে আছে? (চুপে চুপে) যা হয় কিছু বলে যাও।

রাখাল। হ্যাঁ কতক কতক মনে আছে বই কি।

ব্রজ। বলুন তবে—শোনাই যাক।

রাখাল। বলেছে—তোমার কল্পনার নূতনত্ব বা নিজত্ব কিছুই নেই। সমস্ত চুরী।

ব্রজ। সত্যি নাকি! এর চেয়ে absurd আর কি হতে পারে? (জোর করিয়া হাস্য) হাঃ হাঃ।

রাখাল। ঠাট্টা তামাসা গুলি সব নিখ্‌তিতে ওজন করা—

ব্রজ। ভারী মজা? হাহাঃ।

রাখাল। তুমি যে চুরী কর তাও ভাল রকম করে করতে পার না, যত যেখানকার বিশ্রী বই আছে তাই থেকে চুরী করে চুরীটাকেও চুরীর অধম করে তোল।

ব্রজ। তাইত—হা হাঃ।

রাখাল। ভাল লেখকের লেখাও যেখানে চুরী করেছ—তারা তোমার ভাষার আবর্জ্জনার মধ্যে পড়ে একেবারেই কলঙ্কিত হয়ে গেছে।

ব্রজ। দেখেছ—হা হাঃ।

রাখাল। দু এক জায়গায় যেখানে দৈবাৎ ভাষা ভাল হয়েছে সেখানে বিকৃত-কল্পনা, কুরুচি এমন ফুটে উঠেছে যে ভাষার সৌন্দর্য্য সেখানে বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মত হয়েছে।

ব্রজ। আর কাজ——হা হাঃ।

রাখাল। আর আমার সব মনে নেই, এই রকম আরো আছে।

ব্রজ। (ক্রোধ দমন করিয়া) আর কেউ হলে এতে নিশ্চয়ই চটে যেত।

রাখাল। তুমি চটবার লোক হলে কি আর তোমাকে এসব বলতুম? তোমাকে হাসাবার জন্যই এতটা বলা গেল।

ব্রজ। বাস্তবিকই বড় হাসি পাচ্ছে। আমার একটু নিজত্ব নেই,—একটু কল্পনা নেই—হা হাঃ।

নবীন। দেখ ব্রজ তোমার কিন্তু একটা প্রতিবাদ লেখা উচিত।

ব্রজ। প্রতিবাদ! কেন? আমি নাকি ওসব কথায় কেয়ার করি তাই প্রতিবাদ!

নবীন। তাত বটে, সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

রাখাল। আমি যে খবরের কাগজের এতগুলা কথা বলে গেলুম, ভরসা করি সে জন্য কিছু মনে করবেন না!

ব্রজ। মনে করব? অবাক! আমি ত আগেই বলেছি ওসব কথায় আমি কিছুই মনে করিনে।

রাখাল। তাত বলেছেন—তবু কি জানি—

ব্রজ। তবু? তবুটার অর্থ কি বলুন দেখি?

নবীন। রাগ কর কেন ব্রজ বাবু ?

ব্রজ। (উগ্রস্বরে) রাগ! আমি একশ বার বলছি আমি রাগ করিনি—তবু ঐ কথা! তোমরা কি মনে কর খবরের কাগজওয়ালাদের আমি কেয়ার করি? তা মনে করলে আমার অপমান করা হয়। আমি খবরের কাগজকেও কেয়ার করিনে, আর যারা ও রকম্ ভাবে তাদেরও কেয়ার করিনে, আমি চল্লেম। (রাগিয়া প্রস্থান)

নবীন। ভায়া বড় রেগেছেন, কাল দেখছি বেনামা প্রতিবাদে খবরের কাগজ ভরে যাবে।

ফুলজানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফুলকুমারীর মার ইহজীবনে আর সব সুখ সাধের সামগ্রী ভাসিয়া গিয়াছিল, বাকী এখন কেবল এই মেয়েটী। সন্তান হইল না হইল না করিয়া অধিক বয়সে একপুত্র সন্তান লাভ হইয়াছিল, কিন্তু বছর ফিরিতে না ফিরিতে সে অসময়ের অমূল্য নিধি মাতৃ অঙ্ক শূন্য করিয়া গেল। তার পর ফুলকুমারীর জন্ম, কাজেই ফুল বাপ মার বড় আদরের ধন। বিশেষ ফুল যে বছর জন্মগ্রহণ করিল, সেই বছর পিতা কেদার নাথ প্রথম মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটী চাকরী পান। তখনকার দিনে—এখনই কি নয়?—বৈষয়িক লাভ লোকসান দিয়া লোকে কন্যা ও পুত্রবধূর গৃহাধিষ্ঠানের শুভাশুভ স্থির করিত, কাজেই কেদারনাথ কন্যারক "মালক্ষ্মী" বলিয়া আদর করিতেন।

অন্তিম শয্যায় কেদারনাথ যখন পত্নী ও কন্যার পরিণাম ভাবিয়া অধীর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার এক মাত্র সান্ত্বনা এই ছিল যে এ সংসারের প্রধান বল যে অর্থ, তাহার অভাবে তাহারা কখন ক্লেশ পাইবে না। তখনকার দিনে চাকরী করিয়া—বিশেষ নবাব সরকারে—লোকে বড় মানুষ হইত, কিন্তু বড়মানুষী দেখাইতে গিয়া অনেকে বিপদগ্রস্ত হইতেন। সে কথা বুঝিতেন বলিয়া কেদারনাথ মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি বাস করিয়া জমীদারী খরিদ করিতে কখন সাহস করেন নাই, কিছু জোৎ-জমা দিয়াই সে সাধ পূর্ণ করেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ তখনকার প্রথা মত গৃহ হর্ম্ম্যতলে প্রোথিত থাকিত,—কিছু সুদে খাটিত। স্বামীর স্বর্গারোহণের পর নিস্তারিণী আগেকার চাল বজায় রাখিয়া চলিলেন, লোকে জানিত সামান্য মহাজনী ও [illegible] অনাথিনী বিধবার জীবনোপায়। দুই একজন প্রতিবেশী একটু বেশী বুঝি-

তেন—তার মধ্যে পুরন্দরের পিতা মহেশ্বর ঘোষ একজন। অতএব মহেশ্বর আগ্রহ করিয়া ফুলকুমারীকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব আপনা হইতে উপস্থিত করিলেন—মৌলিকের ঘর বলিয়া গৃহিনী এবং বান্ধবেরা আপত্তি করিলে তাহাতে কান দিলেন না। মনের মত কথাটা হইলে এখনকার চেয়ে সংস্কৃত শ্লোকের আদর তখনকার দিনে অনেক বেশী ছিল, কাজেই মহেশ্বর যখন তখন বলিতেন,—"স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি!" ইহাতে আর সবারই মুখ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর নথ নাড়াটা কমিল না। ঘোষ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডারে আর একটী শ্লোকরত্ন নিহিত ছিল। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন—"বিশ্বাসো নহি কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ!" অতএব গৃহিনীকে আসল মতলবটা কোন মতে বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ইঙ্গিতে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিলেন না। কাজেই শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দাসী স্বামীর বুদ্ধির মনে মনে অনেক প্রশংসা করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বিবাহের উদ্যোগে ব্রতী হইলেন, এবং ইচ্ছা ও স্বামীর নিষেধ সত্বেও মনের কথাটা সর্ব্বদা তেমন গোপন করিতে পারিতেন না।

নিস্তারিণী অত কথা বুঝিলেন না—বুঝিলেও তাঁহার তাতে আপত্তি ছিল না। মহেশ্বর ঘোষ কিছু অসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না, বিশেষ তিনি মহাকুলীন। পুরন্দরও দিব্য ছেলে। সকলের উপর নিস্তারিণী ভাবিলেন, এ বিবাহ ঘটিলে ফুল ত তাঁর চক্ষের আড়াল হইবে না! অতএব তিনি মহেশ্বরের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। স্বামীর কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি তিনি ইহ জীবনের সার করিয়াছিলেন, প্রতিদিন অহাই পূজা করিতেন, সেই পাদোদক গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ফুলের বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে নিস্তারিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই স্বামী-পাদুকা সম্মুখে লুটাইতে লাগিলেন, তার পর চক্ষের জল মুছিয়া মনঃস্থির করিলেন। সাংসারিক অধিকাংশ ব্যাপারে ইহাই তাঁহার রীতি ছিল। আর কাহারও কাছে কখন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না—কাহারও সঙ্গে বেশী কথা কহিতেন না। ফুলও কখন মার চক্ষে জল দেখিতে পাইত না। গাম্ভীর্য্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান মূর্ত্তি, এবং সে গাম্ভীর্য্য কতকটা আজীবন শোক দুঃখের ফল। কাজেই নিস্তারিণী পাড়া প্রতিবেশিনীদের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন না—সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত; এবং স্বামীর পাদুকা ছাড়া আর কিছু মানেন না বলিয়া তাহারা গোপনে তাঁহার অনেক নিন্দাও করিত। প্রকাশ্যে কেহ কখন কিছু বলিতে সাহস করিত না। লোকে বলিত তিনি নাকি অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানেন, আর রাত্রে দেবতাদের সঙ্গে তাঁহার কথা বার্ত্তাও চলিয়া থাকে। অন্যান্য আপত্তির মধ্যে অমনতর লোককে বেহাইন করিতে পুরন্দরের মার বিশেষ আপত্তি, কিন্তু বিজ্ঞ ঘোষ মহাশয় সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রোজ সকালে ফুলকুমারী মার পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনে। সে ফিরিয়া আসিলে তবে মা নাইতে যান, কেননা বাড়ীতে আর কেহ নাই। ভজহরির মা রাত্রে শোয়, আর ভোর হইতে না হইতে চলিয়া যায়, হাট বার ভিন্ন দিনের বেলায় তাহার বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। কৃষাণ ফনুসেখের সঙ্গে জোৎজমার ভাগে বন্দোবস্ত, কাজেই সকল সময়ে তাহার আসার দরকার হয় না। তবে ফুলি দিদির সাদি নাকি ভারি কাছে, সেই জন্য আজ্ কাল বৈকালে তিনি মাঠাকুরাণীকে এক একবার দর্শন দিয়া যান. আর দূরের হাট বাজারে যাইতে হইলে ত ফনু ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আজ্ সকাল বেলায় ফুলের ফিরিয়া আসিতে বড় দেরি হইতে লাগিল—মার নাইতে যাওয়ার অবসর হয় না। মা ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, ঘরে লোক জন নাই, ৮ দিন পরে বিয়ে, মেয়েটার এ আকেল টুকু নেই যে এখনও সে খেলিয়া বেড়ায়! আবার উদ্বিগ্নও হইলেন'—সে কি! মেয়ে ত তেমন নয়, তবে এত দেরি কিসের জন্যে? শেষে নিস্তারিণী আর থাকিতে পারিলেন না, কলসী কক্ষে বাহির দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া স্নানে চলিলেন। পথে সুগুনির মা বাগদী বউকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, ফুলকুমারীর একবার খোঁজ করে যেন, অনেকক্ষণ হইল মেয়েটা ফুল তুলিতে গেছে, কি জানি এখনও কেন ফেরেনি! সুগুনির মা তখন সুগুনির সঙ্গে বসিয়া সলবণ "পান্তভাতের" প্রতি সুবিচার করিতেছিলেন। কিন্তু ফুলকে মানুষ করিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। ফুল ও কালী দ্রুতপদে আসিতেছিল, রোদে দুজনেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, ফুলকে তার উপর বিষণ্ণ ও ম্লান দেখাইতেছিল, কাজেই বাগদী মা তাহাকে একবার কোলে লইয়া মুখ মুছাইয়া দিতে ব্যস্ত হইলেন। বামুনের মেয়ে কালী দুই হাত পিছাইয়া গেল, ফুলও শুষ্ক ওষ্ঠে হাসি ফুটাইয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,

"ছুঁস্‌নে আমায় বাগদী মা—পূজোর ফুল নষ্ট হবে! কোথা যাচ্ছিস্ তুই?"

বাগদী মা। "কোমনে আর যাব মা—তোরই খোঁজে! বলি হ্যাঁ মা ফুলি, মাকে কি এমনি করে ভাবাতে হয় গা? কাল বাদে পরশু বিয়ে, এমন করে যেমনে তেমনে ঘুরোনা—বাছা, ঠাকুর দ্যাবতার দিষ্টি দেবে!"

ফুল আরও ম্রিয়মাণ হইল। ভয়ার্ত্ত স্বরে বাগদী মাকে সুধাইল, মা কি করিতেছে, আর রাগ করেচে কি না? শেষে সে সইকে অনুরোধ করিল, তাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতে হইবে, মা নেয়ে আসিলে তবে সই বাড়ী ফিরে যাবে। নইলে মা বকবে!

এখন মা যে সত্য সত্যই ফুলকে যখন তখন বকেন, তা নয়। কিন্তু মার একটু অপ্র-

সন্ন দৃষ্টি, একটু ওষ্ঠ কুঞ্চনই কন্যার পক্ষে যথেষ্ট। কালী তা জানিত। হাসিয়া সই-য়ের প্রস্তাবে রাজি হইল। বাড়ীর কাছে তাহারা আসিলে বাগদী মা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছ থেকে চাবি আনিতে দীঘির ঘাটে ছুটিলেন। সে দিনকার মত তাঁর "নুন পান্তার" আশা চলিয়া গিয়াছিল।

এ দিকে সেই বাগদী বুড়ী, লাঠি হাতে গুড়ি গুড়ি, বাঁ কাঁখে গোবরের ঝুড়ি, দীঘির পথে ঘরে ফিরিতে ফুল কুমারীর মাকে পাইয়া বসিল। আর কাউকে দেখিলে বুড়ী হাসিত না, কিন্তু দত্ত বাড়ীর বউমাকে দেখিলে তাহার ভারি আহ্লাদ। নিস্তারিণী আদর করিয়া সুধাইলেন—

"কি ফটীকের মা, কোথা গিয়েছিলে? দু দিন দেখিনি যে?"

কাজেই বুড়ী তাঁহাকে পাইয়া বসিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল, ইচ্ছা সেইপথের মাঝে একটু বসিয়া বউমাকে আপনার দুঃখের কাহিনী জানাইয়া হৃদয় ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে, কিন্তু তাঁহার দাঁড়াইবার বিশেষ সম্ভাবনা না দেখিয়া ফটী-কের মা মন্থরতর গতিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ছেলেরা সব দল বাঁধিয়া বুড়ীর দিকে আসিতেছিল, দত্ত বউকে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না।

দীঘির ঘাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে বুড়ী প্রথমেই ফুলকুমারীর মার কাছে সকাল বেলাকার উদ্যান ভ্রমণের গল্পটা করিল। ফুলকে বটগাছ তলায় সে শয়ানাবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইলেন—আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কেউ সেখানে ছিল কি না?

বুড়ী। ছ্যাল বৈকি বউমা! দেখ্নু যে চক্রবর্ত্তীদের মেয়েটা বাগানের পকুরে সাঁতার দেচ্চে! ভারি বজ্জাত মেয়েটা—আর কি মুই সেথা দেঁড়াতে পারি গা! ছুঁড়ীর ভেতর ঐ চক্রবর্ত্তীদের ছুঁড়িটে, আর ছোঁড়ার ভেতর ঐ ঘোষের বেটা পুরো!—মা গো—মা! গাঁয়ে আর আমায় টেক্‌তে দেলে না! তা হেঁগা বউমা, পুরোর সঙ্গে তুমি নাকি তোমার ফুলির বিয়ে দেবা! আহা অমন সোণার মেয়ে—

নিস্তারিণী দেখিলেন বুড়ী তাঁহার ভাবী জামাতাকে সহজে ছাড়িতে চাহে না। পাছে রাগের মাথায় গালি দিয়া বসে এই ভয়ে কথাটা ফিরাইতে তিনি ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন—"তা বারণ করে দেব পুরনকে ফটীকের মা, আর যেন তোমায় না রাগায়! ছেলে ভাল, তবে ছেলে মানুষ কি না, এখনও মানুষের মর্য্যাদা বোঝেনি! আশীর্ব্বাদ করো, ফুল যেন আমার সুখে থাকে!"

বুড়ীর রুদ্ররস সুতরাং করুণায় পরিণত হইল। চোকের জল মুছিয়া বলিল—"ঠাকুর দ্যাবতা বর কনেকে সুখে রাখুন!—ফুলি যেন তোমার পাকা মাতায় সিঁদুর পরে! তোমার ভালো হবে না ত, কার্ ভালো হবে বউমা—আহা! গরিব দুক্কীর ওপর তোমার যে দয়া! ফটীক বলে, মা তুই বউমার কাছে যাস্—আর কোথাও

যাস্ নে। তা আমি কি চুপ করে বসে থাক্‌তে পারি গা? ভাবি কি তবু ঘুঁঝুড়ি গোবর কুড়িয়ে ফটীকের একটু আসান করি,—বাছার আমার প্যাটে খেতে কুলোয় না,—ছুটো কচি কাচা হয়েচে! আজ্ তোমার কাছেই যেছেলাম বউমা—বলি মাতায় একটু ত্যাল চেয়ে দিয়ে অসি!" তখন বুড়ী আপনার রুক্ষ পক্ক কেশের নুড়ি খুলিয়া ফুলের মাকে দেখাইল। এমন সময়ে সুশুনির মা আসিয়া বউমাকে জানাইয়া দিল যে ফুল বাড়ী আসিয়াছে এবং চাবি লইয়া ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বাগ্‌দী বুড়ীকে বলিলেন যে দুপুর বেলায় তার তেল মাথা আর খাওয়ার নিমন্ত্রণ। বুড়ীর আনন্দ ধরে না। বৌমা নাহিয়া উঠিলে খানিক তাঁর সঙ্গে আসিল, তার পর ঘরে গেল। প্রতিবেশিনীরা স্নানে আসিতেছিলেন, দূর হইতে দেখিয়া পরস্পরে বলিতেছিলেন, "দত্ত বউয়ের যত ভাব ডাইনি মাগীটের সঙ্গে। কাল বাদে পরশু মেয়ের বিয়ে, এখনও মন্তর তন্তর নিয়েই আছেন!—মর্!"

ক্রমশঃ।

অতীত।

বর্ত্তমান হইতে আমরা প্রতিদিন যত নূতন নূতন বর্ত্তমানে উপস্থিত হই—দূর যত ক্রোড়ের নিকট অল্পে অল্পে সরিয়া আসে, আমাদের পশ্চাতে ততই অতীতের ছায়া পড়িতে থাকে। আমাদের পশ্চাতে স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার হৃদয়ে রামধনু ফুটিয়া উঠে—সেই রামধনুর বিচিত্র লাবণ্যে জীবনের শুভ-মুহূর্ত্তগুলি জ্বলিতে থাকে, অন্ধকার আলোক—বিস্মৃতি স্মৃতি মিলিয়া সন্ধ্যার পুষ্পবন রচনা করে—জীবনের সহস্র কুসুম সেই পুষ্পবনে প্রতিদিন ঝরিয়া পড়ে। কত লোকে তাহা দলিত করিয়া যায়, কেহ বা একটী ঝরাফুল কুড়াইয়া লইয়া হৃদয়ে রাখিয়া দেয়—জীবন জ্বালার মধ্যে এক একবার ঝরাফুলের সৌরভে চমকিয়া উঠে। কিন্তু বর্ত্তমান থাকে না। মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তে সে যতই লুকাইয়া বেড়ায় অতীতের দ্রুত অনুসরণ হইতে কিছুতেই রক্ষা পায় না। আশ্রয় লইবার জন্য সে ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ছুটিয়া যায়, অতীত আসিয়া বর্ত্তমানকে ধরিবার ছলে ভবিষ্যতের খানিকটা জমি দখল করিয়া বসে। এইরূপে দিনে দিনে অতীতের দখল বাড়িতে থাকে; কিন্তু লোকে বলে, অতীত বড় উদাসীন। কে জানে অতীতের পরে আমাদের এত টান কেন? অতীতের ছলনায় আমরা চিরদিনই কেন ভুলিয়া থাকিতে চাই, বর্ত্তমানকে কঠোর বলিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার স্থির করিয়া, অতীতকেই জড়াইয়া ধরি। অতীতের সহস্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা সুগভীর শান্তির ছায়া বৈ কিছুই দেখি না—অতীতের বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে প্রেমের চুম্বক-আকর্ষণ, জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে আনন্দের পবিত্র স্পর্শ, অতীতে যেন সক-

লই সুখ—যত দুঃখ বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। কে জানে অতীতের উপর আমাদের একি মায়া!

তবে কি এই অতীতের প্রতি প্রেমের মূল চিরবিরহ? তাহা নয়ত কি। মিলনে প্রেম আরম্ভ হয়, কিন্তু বিরহ না হইলে প্রেম ধরা দেয় না। বিরহে অভাব অনুভব করা যায়, হৃদয়ের আকুলতা ধরা পড়ে, সুপ্ত প্রেম জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান নাকি কেবলই মিলন তাই তাহাতে প্রেম তেমন বিকশিত হইয়া উঠে না। কিন্তু যখনই বর্ত্তমান হইতে আমরা তফাৎ হই—বর্ত্তমান অতীত হইয়া দাঁড়ায় তখনই তাহার প্রতি কেমন একটা টান দেখা যায়। বিরহে প্রেম ঘনাইয়া আসে। সীতাকে বনবাস দিয়া রামচন্দ্র থাকিতে পারিয়াছিলেন, কারণ সীতা তখনও বর্ত্তমান। কিন্তু সীতার সহিত যখন তাঁহার চির-বিরহ হইল, যখন ইচ্ছার উপরে মিলন নির্ভর করিতেছে না, যথার্থ বিরহ হইয়াছে, তখন রাম আর থাকিতে পারেন না—পর্ব্বতের মত অটল হইয়াও রামচন্দ্র অধীর। অতীতের সহিত নাকি সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে—তাহাকে ধরিবার, স্পর্শ করিবার, উপভোগ করিবার উপায় নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অতীতের দুস্বপ্ন ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়, জ্যোৎস্নালোকই পড়িয়া থাকে।

দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন কালকে আমরা কেমন মধুর বলিয়া কল্পনা করি। আমাদের মনে হয়, সে কালে লোকে মিথ্যা কথা জানিত না, অধর্ম্মাচরণ করিত না, সে কাল সত্য যুগ—তখন অসৎ কিছুই ছিল না। কিন্তু আমরা অতীতের প্রতি প্রেম প্রভাবে যাহা কল্পনা করি, তাহা অনেক সময় সত্য হইতে বহুদূর। তখন দেশশুদ্ধ লোক কিছু আর রাম লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, সীতা সাবিত্রী ছিল না। দেশে কৈকেয়ী মন্থরা, রাবণ সূর্পনখা, দুর্য্যোধন দুঃশাসন অনেক ছিল। প্রহ্লাদের সময়ে সকলেই যদি প্রহ্লাদ হইত, তাহা হইলে প্রহ্লাদকে কেহই জানিত না, বিশ্ব শুদ্ধ লোকে শুকদেব হইলে শুকদেবকে জানিবার কেহই থাকিত না। সে যাহা হোক, অতীতকে আমরা যুক্তির বাঁধনে বাঁধিতে চাহি না—হৃদয়ের ভালবাসায় সহস্র ঝঞ্ঝা ঝটিকা রক্তপাত যুদ্ধকোলাহলও শান্তি বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমানকে লইয়া নাকি ঘর করিতে হয়, তাই পদে পদে তাহার দোষ দেখিতে পাই। আর অতীত আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, সুতরাং অতীতের সহস্র বড় বড় খুঁৎও আমরা ধরিতে চাহি না। বিরহে কাতর হইয়া আমরা চিরদিন তাহার জন্য বিলাপ করিতে থাকি। তাহাকে পাইব না বলিয়াই তাহাকে পাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে।

যাহা সকল সময়ে পাওয়া যায় তাহার অভাব কল্পনা করা সহজ নহে—মনে হয় তাহা চিরদিন বুঝি থাকিবে, নয়ত তাহার কথা মনেই হয় না। বাতাস দুই দিন

বন্ধ হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, কিন্তু দায়ে না পড়িলে বাতাসের কথা মুখে আনে কে? বর্ত্তমান চিরদিনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া তাহার অভাব অনুভব করা অত্যন্ত দুরূহ। অতীতের রহস্য-ছায়ায় আমরা ক্রমাগতই হারাইয়া যাইতে চাই—বর্ত্তমানের কথা মনেও করি না। কিন্তু বর্ত্তমানকে আমরা দূরে রাখিতে চাহিলেও পারি না, কারণ বর্ত্তমানের উপরেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। বর্ত্তমানের অভাব হইলে অতীত এবং ভবিষ্যতেরও অভাব হইবে, কালের মধ্যে একটা গোলমাল বাধিয়া যাইবে, কালের প্রলয় আসিয়া দাঁড়াইবে।

মিলনে স্মৃতি নাই—বিরহ স্মৃতিময়। বর্ত্তমানের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। আমরা বর্ত্তমানে অনেক জিনিষ এত বেশী করিয়া দেখি যে, তাহার রহস্যটুকু সৌন্দর্য্যটুকু মুছিয়া যায়। ছবি নিকটে আসিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে, রঙের আতিশয্য বই আর কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে। যখন চক্ষের সম্মুখে একটী খোলার ঘর দেখি, তখন আমরা হয়ত একবার ফিরিয়া চাহি না, কিন্তু চিত্রে যখন সেই ঘরটী দেখি তখন জন্মের মত হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য প্রথমাবস্থায় আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে পাই। চিত্রে তাহার অস্ফুট ছায়া মাত্র দেখি—বস্তু গিয়াছে, ভাবমাত্র অবশিষ্ট। অতীতেও বস্তু গিয়াছে—ভাব আছে মাত্র। সেই ভাবই স্মৃতি। স্মৃতিতেই অতীত মধুর। বর্ত্তমানে বস্তুরই অধিকার—ভাব যেন ফুটিতে পায় না। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থায়ী। এই জন্য অতীত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে—অতীতের জন্য আমরা বিলাপ করি। বর্ত্তমান প্রতিদিন শুকাইয়া যায়। অতীত আসিয়া সেই শুষ্কভূমির উপরে শ্যামল উদ্যান রচনা করে।

কিন্তু তাই বলিয়া অতীতই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। বর্ত্তমানের প্রতি যাঁহার প্রেম নাই—অতীতের স্বপ্নে যে চিরদিন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা সংসারের কোন উপকার সাধিত হয় না। আপনার চতুর্দ্দিকে কুজ্ঝটিকার আবরণ টানিয়া দিয়া বর্ত্তমানের দিকে পা ছড়াইয়া সে সুখে নিদ্রা দিতে চায়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম নাই—অতীতের প্রতি স্বার্থপ্রণোদিত টান আছে মাত্র। আলস্যই তাহার হৃদয়ের অধীশ্বর! অতীতের প্রতি কাল্পনিক প্রেম সেই আলস্যকে সহৃদয়ত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। বর্ত্তমানকে ছাঁটিয়া ফেলা অতীত-প্রিয়তা নহে—আলস্য-প্রিয়তা। তাহাতে মহত্ব কিছুই নাই, সহৃদয়তাও তাহাতে প্রকাশ পায় না। অভিমানীর দুই বিন্দু অশ্রুজল তাহার মধ্যে ফেনাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সমাজের হিতসাধন হইতে পারে না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিবাহ সংঘটন করাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপায় কি ?

ভারতবাসী অতিশয় দরিদ্র। কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অনাবৃষ্টির ত কথাই নাই; এক বৎসর ভাল বৃষ্টি না হইলে, চারিদিকে হাহাকার রব শুনিতে পাওয়া যায়। শিল্পকারদের ব্যবসা চলে না; তাহারা ক্ষুৎপীড়িত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির জন্য লালায়িত। ত্রিশ, চল্লিশ টাকা বেতনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা উমেদার। যেখানে যাও, দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।

দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, অনেকের এরূপ বিশ্বাস। ইহা অমূলক নহে। প্রতি বৎসর দেশ হইতে ন্যূনাধিক বিশ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে। এই প্রকারে কতটাকা চলিয়া গিয়াছে! এক দিকে এইরূপ শোষণ চলিতেছে, অন্যদিকে দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় কয়েক জন ব্যবসায়ী, জমিদার, উকীল ও মোটামাহিনার চাকুরে ব্যতীত, সকলেই নির্ধন। ইঁহারা দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা দেশের ধনবৃদ্ধিতেও কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, অথবা যদি হয় ত অতি অল্প পরিমাণে। ইঁহারা ধনী, গরিব কৃষক ও শিল্পকারের ধনে। দেশের ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে "নিষ্কর্ম্মা" বলা যাইতে পারে। এই সকল "নিষ্কর্ম্মা" লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই অবস্থা ভাল, অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ, কোন রূপ প্রকারে সংসার চলে। কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পকারীদের অবস্থা মন্দ, যাহারা কৃষক ও শিল্পকারীদের উপার্জ্জিত ধনে জীবনধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ। জীবন সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে, আরও হইবে। এক্ষণে উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু, উপায় কি ?

যে শোষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যে অংশের জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী, তাহার হ্রাসের জন্য বিলাতে ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে; গবর্ণমেণ্টও কতকটা চেষ্টা করিতেছেন। অধিক সংখ্যক ভারতবাসী দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কাজ চালাইলে, এবং অন্যান্য উপায়ে তাহার হ্রাস হইতে পারে, এবং কালে হইবেও; কিন্তু অধিক পরিমাণে, সম্ভব নহে। ব্রিটিস রাজ্যে আমরা যে শান্তি এবং অন্যান্য সুফল লাভ করিয়াছি, তাহার মূল্য হিসাবে ধর, অথবা ব্রিটিস রাজ্যের কর হিসাবে ধর, ব্রিটিস সেনা এবং অন্যান্য ব্রিটিস কর্ম্মচারীদের পেন্সনাদির জন্য প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইবে। ইহা অনিবার্য্য। যে পরিমাণে টাকা বিদেশে

চলিয়া যাইতেছে, সেই পরিমাণে দেশের মূলধন কমিতেছে, এবং দেশ গরিব হইতেছে। আরও যাহাতে গরিব না হইয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা কর্ত্তব্য, না করিলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কিন্তু, উপায় কি ?

এই প্রশ্নের সংক্ষেপ এবং সহজ উত্তর—দেশের ধনবৃদ্ধি। ইহা কি কি উপায়ে সম্ভব দেখা যাউক।

প্রথমত। **শিল্পকর্ম্ম।** কৃষিজ, অরণ্যজ, বা খনিজ পদার্থ হইতে অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করাকে শিল্প কর্ম্ম বলা যায়। তুলা হইতে কাপড়, ইণ্ডিয়ারবার হইতে ওয়াটার-প্রুফ, লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ, এবং লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত করা শিল্প কর্ম্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশ ধনী তাহা প্রধানত শিল্পের জন্য। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রিটিস রাজ্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, আমরা নানাবিধ শিল্প বিদেশে রপ্তানি করিতাম। কিন্তু এক্ষণেসে সব শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় শিল্প আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা পরি বিলাতী ধুতি, বিলাতী জামা, মাথায় দি বিলাতী ছাতা। আপীসে যাই বা সভায় বক্তৃতা করি বিলাতী প্যাণ্টুলন, বিলাতী কোট, বিলাতী মোজা এবং বিলাতী জুতা পরিয়া। আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য্য অধিকাংশ জিনিসই বিলাতী, আমাদের মধ্যে যাঁহারা "সভ্য" তাঁহারা আহার করেন বিলাতী বাসনে, বিলাতী ছুরি কাঁটা ও চামচে, পান করেন বিলাতী গেলাসে। আমাদের থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি বিদেশী ধাতু নির্ম্মিত, কিন্তু এখানে প্রস্তুত হয়; তাহাও বোধ হয় কিছু দিন পরে বিলাত হইতে আমদানি হইবে। আর কত নাম করিব? বিলাতী শিল্পের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প মারা যাইতেছে; ইহা চোখ খুলিয়া দেখিলে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, তাহা আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে লৌহ ঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ এবং তন্নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইত। দিল্লীতে "কুতব" নামে যে লৌহ স্তম্ভ আছে, তদ্রূপ স্তম্ভ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কারখানায় নির্ম্মিত হইতে পারিত না। এখনও ইউরোপে অতি অল্প কারখানা আছে, যেখানে এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ প্রস্তুত হইতে পারে। যদিও "কুতব" নামে অভিহিত, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে এই স্তম্ভ প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ১৫০০ বৎসর ইহা খাড়া রহিয়াছে, কত ঝড় বৃষ্টি বাদ্‌লা ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাতে মরিচা ধরে নাই। আরও অন্যান্য স্থানে অনেক বড় বড় প্রাচীন লৌহ নির্ম্মিত কামান ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় "ইস্পাৎ" পূর্ব্বে অতি আদরণীয় ছিল; ইংলণ্ড এবং

অন্যান্য স্থানে যাইত। জগদ্বিখ্যাত ডামাস্কস তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত। এক্ষণে প্রতি বৎসর বিলাতী লোহা ও ইস্পাতের আমদানি বাড়িতেছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশী লোহা ও ইস্পাৎ লোপ পাইতেছে। লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রাদি এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার লৌহ এবং ৫ লক্ষ টাকার ইস্পাৎ বিলাত হইতে আমদানি করিতাম। কিন্তু ১৮৮৫ সালে আমরা অন্যূন ২ কোটি টাকার লোহা এবং ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইস্পাৎ আমদানি করি। অতএব ৩০ বৎসরের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাতের আমদানি প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়াছে। * দেশী লোহা এবং ইস্পাৎ এক্ষণে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ আমাদের দেশে লৌহশিল্পের অনুকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেরূপ লোহার আমদানি বাড়িয়াছে, সেইরূপ কার্পাস বস্ত্রেরও আমদানি বাড়িয়াছে। অথচ আমাদের দেশে কার্পাস অপর্য্যাপ্ত, এখান হইতে কার্পাস ম্যাঞ্চেষ্টারে যায়, এবং সেখানে বস্ত্রে পরিণত হইয়া ফিরিয়া আসে। লোহা এবং কাপড়ের ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিসের আমদানি বাড়িয়াছে, যাহা এখানে প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা প্রস্তুত করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দেশীয় শিল্প ত্যাগ করিতে, এবং বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করিতে হুকুম দেন নাই। বরঞ্চ আমাদের শিল্পোন্নতি চাহেন বলিয়া থাকেন। আমাদের শিল্পোন্নতিতে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে; এবং দেশের ধনবৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ। সত্য বটে ইউনাইটেডষ্টেটস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইয়া, তাহার আমদানি কমাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন না, এবং কখনও করিবেন না। কিন্তু করিলেও বিলাতী শিল্পের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাচীন দেশীয় শিল্প সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইত না। তাহার কারণ স্পষ্ট। আমাদের প্রাচীন শিল্প বিনাশ পাইয়াছে, স্বাভাবিক কারণে। লোকে চায় শস্তা জিনিস। আমাদের প্রাচীন শিল্পকারদের বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য ছিল, কিন্তু তাহা হাতের। আমাদের শিল্প সম্পাদিত হইত হাতে, অথবা এরূপ কলে, যাহাকে বিলাতী কলের কাছে খেলেনা-কল বলা যাইতে পারে। হাতে জিনিস প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অনেক, কাযেই তাহার দাম বেশী। কিন্তু বিলাতী শিল্প সম্পাদিত হয়, কলে। কলে যে কত কায কত অল্প সময়ে সম্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং কলের জিনিস শস্তা। বিলাতী এবং দেশী

---

* লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, এবং গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে যে লোহা আনিয়াছেন তাহা ছাড়া, ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ১৮ বৎসরে আমরা ২৪,৬০,৮৭,৫৪৩ (প্রায় চব্বিশ কোটি একষট্টি লক্ষ টাকার) লোহা আমদানি করিয়াছি।

ধুতির দাম তুলনা করিলে তাহার কত প্রভেদ, কে না জানেন ? অথচ কলের সূতা হইতেই দেশী ধুতি তৈয়ার হয় ! এক্ষণে হস্তনৈপুণ্যের দিন অতীত হইয়াছে ; আজ কাল কল কৌশলের রাজ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই কলকৌশলের বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অল্প পরিশ্রমে সচরাচর ব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ততই তাহার দাম কমিতেছে। এরূপ অবস্থায় হস্ত নির্ম্মিত জিনিসের মরণ নিশ্চয়। আমাদের প্রাচীন শিল্পের পুনর্জীবন, প্রাচীন উপায়ে অসম্ভব ; নব-জীবন সম্ভব, আধুনিক উপায়ে। আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত আমাদের গতি নাই। ইহার জন্য দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

১ম। বিজ্ঞান শিক্ষার, বিশেষত যেরূপ শিক্ষা শিল্পে প্রয়োজনীয়, তাহার বিস্তার। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের মূলভিত্তি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতিই পাশ্চাত্য শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের ইহাতে আস্থা নাই ; বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চেষ্ট। আমরা যে শিক্ষা চাই, তাহাতে কেরানিগিরি বা ওকালতী ভিন্ন জীবন ধারণের প্রায় অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হই না। কলম ও বাক্য ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন সংগ্রামের অন্য কোন অস্ত্র নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের এমন অবস্থা হইবে, যখন অন্যান্য অস্ত্র ব্যতীত চলিবে না। এখনি তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিল্পের উন্নতি সম্ভব, ইংলণ্ডে তাহার বিশেষ বিস্তার হইয়াছে। তথাপি ইংরাজেরা সন্তুষ্ট নহেন ; যাহাতে ঐরূপ শিক্ষার আরও বিস্তার হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়াছে, সভা স্থাপিত হইয়াছে, পার্লিয়া-মেণ্ট বিলপাশ করিতেছেন। আমাদের শিল্প লোপ পাইয়াছে, দেশ গরিব হইতেছে, দেশের অর্দ্ধেক লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তথাপি আমরা কি চেষ্টা করি-তেছি ?

২য়। সমবেত চেষ্টা। দিন কত "টেকনিকাল এডুকেশন" লইয়া সভায় বক্তৃতা ও খবরের কাগজে লেখা হইল। কিন্তু সমবেত এবং ক্রমিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় কোথায় ? শিল্পোন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক প্রথানু-সারে শিল্প চালাইতে হইলে, অনেক মূলধনের আবশ্যক। তাহা সচারাচর এক-জনে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অতএব, বড় বড় কল কারখানা প্রায়ই কোম্পানি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা এইরূপে একত্র হইয়া কতকগুলি সূতার ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে অগ্রসর হন না। তাঁহারা একত্র হইয়া কায করিতে জানেন না। একাকী যিনি যাহা করিতে পারিলেন করিলেন ; একত্র হইয়া কায

সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও নাই। ইতি পূর্ব্বে আমরা একত্র হইয়া কায করি নাই ; সে শিক্ষা আমরা পাই নাই। বর্ত্তমান দুরবস্থার তাহাই একটি প্রধান কারণ। কারণ যাহাই হউক, যতদিন আমরা একত্র হইয়া কায করিতে না শিখিতেছি, ততদিন আমাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

সূতার বল, কাপড়ের বল, কাগজের কল, আর যাহারই বল, এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল কল চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বা ইউরোপীয়দিগের। আমরা ইহা দেখিয়াও দেখি না। সত্য বটে, আমাদের শিল্পোন্নতির পথ সহজ নহে। অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইবেন না। ইহা দেশীয় তরুণ শিল্পের পক্ষে অতিশয় হানিজনক। কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্প কিনিতে প্রতিশ্রুত। যে দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, এবং যাহার মূল্য সেইরূপ বিলাতী দ্রব্য হইতে অধিক নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা এখানে কিনিবেন। আমরাও যদি যথা সম্ভব দেশীয় শিল্প ব্যবহার করি, তাহা হইলে অনেকটা উপকার সম্ভব। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দেশীয় শিল্প ব্যবহার করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা (বাঙ্গালীরা) অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা সভ্য, আমরা বিলাতী জিনিস পাইলে দেশী জিনিস চাই না! আমরা একটিও সূতার কল, একটিও কাপড়ের কল, একটিও কাগচের কল, একটিও কোন রূপ বড় শিল্পের কল চালাইতেছি না!

দেশের দারিদ্র্য শিল্পোন্নতির একটি প্রতিবন্ধক। যেখানে টাকার সুদ শতকরা ১২ কি ১৫ কি ততোধিক, সেখানে যাঁহাদের মূলধন আছে, তাঁহারা যে তাহা কেবল সুদে খাটাইবেন তাহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের দারিদ্র্য যে বোম্বাই প্রদেশের অপেক্ষা অধিক তাহা বোধ হয় না। ভাল করিয়া চালাইলে শিল্প হইতেও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। শিল্পোন্নতি না হইলে দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে ; যে সকল ধনবান্ কি মধ্যবিত্ত লোক দেশের হিত কামনা করেন, তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা যদি সকলে একত্র হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আমরা চেষ্টা করিলে, কেবল যে আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড়, লোহা, কাগচ, প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি এমত নহে, তাহার কোন কোন জিনিস বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারি।

দ্বিতীয়ত। খনিজ পদার্থ দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। শিল্পের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে হীরক এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতু ঘটিত আকরিক পদার্থের খনি ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পের ন্যায় আমাদের খনিকার্য্যও প্রায় লোপ পাইয়াছে। যেরূপ শিল্পে, সেইরূপ ইহাতেও, আমরা

একেবারে নিশ্চেষ্ট। এক্ষণে খনির কার্য্য ইউরোপীয়দিগের প্রায় একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। আমরা যে খরচে ঐ সকল কায করিতে সক্ষম হইতে পারি, তাহা অপেক্ষা নানা কারণে তাঁহাদের অনেক খরচ করিতে হয়। তথাপি তাঁহারা খনির কায করিতেছেন, এবং অনেক স্থলে লাভের সহিত। যে যে উপায়ে শিল্পের সেই সেই উপায়ে খনিকার্য্যেরও উন্নতি সম্ভব,—শিক্ষা এবং সমবেত চেষ্টা। কেহ কেহ বলিতে পারেন পূর্ব্বে যাহারা খনির কায করিত তাহারা কোন শিক্ষা পাইত না, কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্ভবেনা কেন ? তাহার কারণ, প্রথমত, ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ ব্যতীত যে যে খনিজ পদার্থ জমির উপর বা অল্প নীচে ছিল, তাহা প্রায় সব উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল পদার্থের জন্য জমির অনেক নীচে অনুসন্ধান করিতে হয়; তজ্জন্য শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পূর্ব্বে যে সকল উপায়ে ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুত করা হইত, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে! এই সকল নূতন এবং উন্নত উপায় অবলম্বন ব্যতীত, খনিজ পদার্থো-ত্তলনে লাভের সম্ভাবনা নাই; এবং তাহার জন্য শিক্ষা এবং মূলধন আবশ্যক। তৃতীয়ত, পাথুরিয়া কয়লা পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন; পূর্ব্বে উহা খনিত হইত না। উহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা; কিন্তু শিক্ষা এবং যথেষ্ট মূলধন ব্যতীত লাভের সহিত উহার উত্তোলন অসম্ভব।

আমরা "উচ্চশিক্ষা" পাইয়াছি, উচ্চশিক্ষার গৌরব করি। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পেট্রোলিয়ম বা লৌহ-তাম্রাদি ধাতু ঘটিত আকরিক পদার্থ, বা পাথুরিয়া কয়লা কি ? ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ? কিরূপ স্থানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া সম্ভব ? কিরূপে উহা খনিত হইতে পারে ? কোন্ পুস্তকে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব পাওয়া যায় ? তত্ত্ব পাইলেও তাহা বুঝিতে পারি কি না ? এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্ব্বাক হইবেন। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের কোন্ নিভৃত জঙ্গলে কোন্ খনিজ পদার্থ আছে, কোন্ স্থানে কোন্ খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিলে লাভের সম্ভাবনা, তাহার খবর রাখেন; ঐরূপ খবর রাখিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা তাহা পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে খবর ছাপাইয়া থাকেন। খবরাখবর লওয়া এবং ছাপানর খরচ আমরা দিয়া থাকি। অথচ আমরা তাহার কিছুই জানি না। কোথায় খবর পাওয়া যায় তাহাও জানি না; পাইলেও তাহা বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না। অথচ ইংলণ্ডে কোন্ সালে কে রাজা হইয়াছিল, কোন্ যুদ্ধ কোন্ সালে হয়, কে হারে কে জিতে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর উত্তর কণ্ঠস্থ। সেক্সপিয়ার, মিল্টন, যে সকল কথা ব্যবহার করিয়া-ছেন, তাহার টীকা টিপ্পনি অভ্যস্ত।

তৃতীয়ত। কৃষিকর্ম্ম। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ; এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যে সকল জমি উর্ব্বর, বহুকাল হইতে তাহা কর্ষিত হইতেছে। যে সকল সহজ প্রাপ্য সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িতে পারে, আমাদের কৃষকেরা বহুকাল হইতে তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অল্প ব্যয়ে, যে সকল সহজ উপায়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব বহুদিন তাহা অবলম্বিত হইয়াছে। পাট প্রভৃতি চাসের বিস্তারে, কোন কোন স্থানে চাসের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু সে উন্নতি সামান্য। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে মডেল ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এবং কৃষি শিক্ষার বিস্তার দ্বারা কতকটা উন্নতি সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি বিশেষ যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। আজ কয়েক বৎসর হইতে গমের রপ্তানি বাড়িতেছে। তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, গমের চাসের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সন্দেহ স্থল। ইউরোপে আমাদের গম অন্যান্য দেশের গম অপেক্ষা সস্তা মূল্যে বিক্রীত হয়, এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল স্থান দুর্গম ছিল সেখানে রেলওয়ের বিস্তার হইতেছে, গমের রপ্তানিবৃদ্ধির এই দুইটি প্রধান কারণ, ইহাই আমাদের ধারণা। ছত্রিশগড়ে রেলওয়ে যাওয়াতে সেখানকার অনেক গম এক্ষণে রপ্তানি হয়; কিন্তু ছত্রিশগড়ের চাসের বিশেষ কোন উন্নতি বা বৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে সেখানে যে গম সঞ্চিত থাকিত এক্ষণে তাহা বিদেশে চলিয়া যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা দাম অনেক চড়িয়াছে, এবং এই হিসাবে কৃষকের কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাতেও ছত্রিশগড়ের বিশেষ লাভ কি না তাহা সন্দেহ। অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষের সময় তাহা বুঝা যাইবে।

যে সকল চাসে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা—যথা চা এবং তামাকের চাস—তাহাতে কিছু শিক্ষা এবং মূলধনের প্রয়োজন। তাহা আমাদের সাধারণ কৃষকের এক প্রকার সাধ্যাতীত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বড় বড় খনিকার্য্যের ন্যায় এই সকল চাস ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার একচেটিয়া। কোথায় আসামের অস্বাস্থ্যকর জলা জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাঁহারা "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া আসিয়া, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে গিয়া চাস করিতেছেন। আমরা এ সকল কার্য্যে বড় একটা অগ্রসর হই না। ফল এই দাঁড়াইতেছে—ইউরোপীয়চালিত শিল্প এবং খনিকার্য্যের ন্যায় এ সকল কৃষি কর্ম্মেরও লাভ বিলাত চলিয়া যাইতেছে—যে লাভ এখানে থাকিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইত।

আমাদের দারিদ্র্যের জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্ট দায়ী তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া কেবল গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যতটুকু দারিদ্র্যমোচন হইতে পারে তাহার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। এই দারিদ্র্যের জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী, সম্ভবত গবর্ণমেণ্ট

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে। আমরা নিজেরা যে যে উপায়ে আমাদের এবং দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টাবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল কলম এবং বাক্য পরিচালনায়, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হয় নাই, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হইবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

গুপ্ত রাজগণ।

নবনাগা পদ্মাবত্যাং কান্তিপূর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গা
প্রয়াগং মাগধাগুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ২৪ অধ্যায়।

মৌর্য্য বংশের তিরোধানান্তে ও হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল রাজন্যবর্গ আর্য্যাবর্ত্তে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে গুপ্তবংশীয় রাজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত কামরূপ ও ত্রিপুরা হইতে আরব সাগরের তীরবর্ত্তী গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের করতলস্থ ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের ও দক্ষিণাপথের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ ইহাঁদিগকে কর প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা বাহুবলে পারস্যের অধিপতি "ষাহান ষাহি" নরপতিগণ হইতেও কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যে অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। মুসলমান লেখক আবু রিহান আল বিরুনীও ইহাদিগের পরাক্রমের কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। * কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে খোদিত প্রস্তর লিপি, তাম্রশাসন, ও মুদ্রা ব্যতীত, ইহাদের ইতিহাস দূরে থাকুক নামগুলিও জানিবার কোন উপায় নাই। পুরাণে অনেকানেক নগণ্য রাজার গল্প লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণকারগণ এ হেন পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গের নাম গুলিও

* আবু রিহান মাহাম্মদ বিন আহাম্মদ আলবিরুণী ৯৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি জ্যোতিষ জ্যামিতি, ইতিহাস, ও তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঘজনির অধিপতি মহম্মদ যে সময় ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বার রাক্ষস বেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিলেন, সেই সময় আবুরিহান জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য ভারতে উপনীত হইয়া ৪০ বৎসর কাল ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "গুপ্তরাজগণ দুষ্ট কিন্তু পরাক্রমশালী ছিলেন।

লিপিবদ্ধ করেন নাই। বিষ্ণুপুরাণকার "গোলে হরিবল" করিয়া বলিয়াছেন যে "গুপ্ত রাজগণ অনুগাঙ্গ্য প্রদেশে রাজত্ব করিবেন।" যাহা হউক প্রস্তরলিপি, তাম্র শাসন ও মুদ্রার সাহায্যে ইহাঁদিগের ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাই করিয়া অদ্য আমরা পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার মিল ও সুবিখ্যাত প্রিন্‌সেপ সাহেব ইহাঁদিগের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে পণ্ডিতাগ্রগণ্য টমাস ও জেনারল কনিংহাম ইহাদিগের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। যদিচ এই সকল পণ্ডিতবর্গের সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে সামান্য মতভেদ রহিয়াছে, তথাপি আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহারা সাধারণত অনুগাঙ্গ্য প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। * প্রিন্‌সেপ সাহেব সমুদ্রগুপ্তের লাট প্রস্তর লিপির মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মগধ, উজ্জয়িনী ও শূরসেন প্রভৃতি রাজ্য সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গুপ্ত রাজন্য বর্গের অধিকৃত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিগণ যদিচ তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতেন, কিন্তু সেই সকল রাজ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের অধীন ছিল না। ইহাদের রাজধানী কোন স্থানে ছিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রিন্‌সেপ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যক্তিই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে কোন রূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ, স্মিথ সাহেব বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদিচ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এক একটী প্রধান নগরী গুপ্তদিগের এক একটী রাজধানী ছিল বটে, কিন্তু পাটলীপুত্র নগরীকেই তাঁহাদের প্রধান রাজধানী বলিতে হইবে। † কর্ণেল উইলফোর্ড ও ওল্ডহাম সাহেবের বাক্য দ্বারা স্মিথের মত সমর্থিত হইতেছে। আমরাও তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কিন্তু কোন কোন সময়ে গুপ্ত বংশীয় কোন কোন নরপতি উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ নগরেও বাস করিতেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গুপ্ত রাজবৃন্দের অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা এস্থানে সর্ব্বপ্রকার উপাধির সহিত তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদান করিতেছি।

---

* প্রবন্ধের শীর্ষে বিষ্ণুপুরাণের যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উইলসন সাহেব তাহার ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন। সেই ভ্রম পরবর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে।

† J. A. S. B. Vol. LIII. part I. page 159.

বংশ স্থাপন কর্ত্তা—

মহারাজ শ্রীগুপ্তদেব কীলালেন্দ্র।

|

মহারাজ শ্রীঘটোৎকচদেব সর্ব্বরাজচ্ছত্র।

|

মহারাজিধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত দেব বিক্রমাদিত্য। (প্রথম)

মহারাজ্ঞী মহাদেবী কুমার দেবী।

|

মহারাজাধিরাজ, ধর্ম্মরাজ, কৃতান্ত-পরশু-রাজাধিরাজ

শ্রীসমুদ্রগুপ্ত দেব অপ্রতিরথ পরাক্রম।

মহারাজ্ঞী মহাদেবী শ্রীদত্ত দেবী।

|

মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত দেব অজিত বিক্রম শ্রীবিক্রমাদিত্য। (দ্বিতীয়)

মহারাজ্ঞী মহাদেবী শ্রীধ্রুব দেবী।

|

মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত দেব সিংহবিক্রম অজিত মহেন্দ্রাদিত্য।

|

মহারাজাধিরাজ পরম মহাদিত্য শ্রীস্কন্দগুপ্ত দেব ক্রমাদিত্য।

|

মহারাজাধিরাজ শ্রীবুধগুপ্ত দেব।

* * *

মহারাজাধিরাজ শ্রীনরগুপ্ত দেব বালাদিত্য।

... ...

মহারাজাধিরাজ শ্রীপ্রকাশাদিত্য শ্রীবিজয়।

... ...

মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবগুপ্ত দেব।

|

মহারাজাধিরাজ শ্রীমহাভবগুপ্ত দেব।	মহারাধিরাজ শ্রীমহাদেবগুপ্ত দেব।

|

মহারাজাধিরাজ শ্রীমহাশিবগুপ্ত দেব।

... ...

মহারাজ শ্রীদেবগুপ্ত দেব।

মহারাজ শ্রীচন্দ্রাপীড় দেব।

... ...

মহারাজ কৃষ্ণ গুপ্ত দেব।
,, হৰ্ক গুপ্ত দেব।
,, জীবিতগুপ্ত দেব।
,, কুমারগুপ্ত দেব।
,, দামোদরগুপ্ত দেব।
,, মহাসেনগুপ্ত দেব।
,, মাধবগুপ্ত দেব।
* * *
,, হৰ্ক্ষগুপ্ত দেব।
,, আদিত্য সেন।

মহারাজ শ্রীগুপ্তদেব গুপ্তবংশের স্থাপন কর্ত্তা হইলেও তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই। বিজাতীয় রাজাদিগের ভারতাধিকার হইতে আমাদের জাতীয় উপাধিগুলিরও নিতান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্যের বিদ্যাভূষণ উপাধির ন্যায় রাজ্যহীন ব্যক্তিগণ বৃটীস গবর্ণমেণ্টের কৃপায় "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করত জাতীয় অবমাননার মুকুট শীর্ষে ধারণ পূর্ব্বক যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় অপূর্ব্ব সিংহাসনে * অরোহণ করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে সম্রাট ব্যতীত অন্য কোন নরপতি মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিতে পারিতেন না। তাহাতেই আমরা বংশ স্থাপন কর্ত্তা শ্রীগুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচের নাম এই মহৎ উপাধি সংযুক্ত দেখিতে পাই না।

গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে যে সকল নরপতি ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই মহারাজ উপাধি ধারণ করিতেন। এই সকল মহারাজগণও সামান্য নরপতি ছিলেন না। গুর্জ্জরের বিখ্যাত রাজবংশ—(যেবংশ হইতে মিবারের মহারাণাগণ আপনাদের বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই রাজবংশ) গুপ্তসম্রাটদিগের সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত গুর্জ্জর দেশে জয় পাতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ স্কন্ধগুপ্তের সময়ে সেনাপতি ভট্টার্ক (কণকসেন) গুর্জ্জরের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। ভট্টার্কের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধরসেন পৈত্রিক অধিকার ও সেনাপতি উপাধি প্রাপ্তহন। শ্রীধরসেনের মৃত্যুর পর মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্ত শ্রীধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্রোণসেনকে "মহারাজ" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক গুর্জ্জরের রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ দ্রোণসেনের পর তদ্বংশীয় আরও ১৫জন নরপতি গুর্জ্জর দেশ শাসন করিয়াগিয়াছেন। †

---

* A. B. C. D. অক্ষরগুলি তাঁহাদের সিংহাসন।

† সুবিখ্যাত টড সাহেব যৎকালে রাজস্থানের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, সেই সময়

উড়িষ্যার কেশরী বংশের কথা বোধ হয় পাঠকগণ সকলই শ্রবণ করিয়াছেন। যাঁহারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া একটী অক্ষয়

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাশি রাশি তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি অবিস্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে প্রধানত চারণদিগের গ্রন্থের প্রতিই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী চারণ গণ যৎকালে প্রথমতঃ বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, সেই সময় তাহারা অবশ্যই পুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদ হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজপুতকুলের আদি বৃত্তান্ত টড সাহেব বিশুদ্ধভাবে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি পুরাণ ও পুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ প্রত্যেক রাজবংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমরা ত্রিপুরার "রাজমালা" ও কাছাড় "রাজবংশাবলী" সমালোচনা কালে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ও অপ্রাচীন সমস্ত রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কবি-কল্পনায় জড়িত রহিয়াছে। মহাবীর নেপোলিয়ান যৎকালে ফ্রান্সের রাজমুকুট ধারণ করেন সেই সময় তাঁহাকে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা রডল্ফের বংশ ধর প্রচার করিবার জন্য একটী সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কুঁচবিহার রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তাকে দেবাধিদেব মহাদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এজগতে কেহই আপনাকে নীচ বংশজ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, যখন কোন অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখনই তাঁহার অনুচর ও আত্মীয়বর্গ সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে কোন একটী বিখ্যাত বংশজ কিম্বা দেবসন্তান বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। দূরে যাওয়ায় প্রয়োজন কি ? আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ অনুসন্ধান কর। দেখিবে পার্ব্বত্য সরদারেরা সকলেই সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেববংশজ বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ সমস্তই আমাদের ব্রাহ্মণদিগের কীর্ত্তি।

কর্ণেল টড তাঁহার গ্রন্থে মিবার রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের দুইপুত্র জন্মে, যথা লব ও কুশ। এই লব—লবকুটী (লাহোর) নগরী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল এই নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে এই বংশীয় কণকসেন ৬৬ শকাব্দে (১৪৪ খৃষ্টাব্দে) সৌরাষ্ট্রজয় করিয়া বল্লভীনগরে রাজপাট সংস্থাপন করেন। টড সাহেব কণকসেন হইতে নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন—

কণকসেন। মহামদন সেন। সুদণ্ড। বিজয় (অজয়) সেন। পদ্মাদিত্য। শিবাদিত্য। হরাদিত্য। সূর্য্যাদিত্য। সোমাদিত্য। শিলাদিত্য। কশ্য (গোপ বা গ্রহাদিত্য।) নাগাদিত্য। ভগাদিত্য। দেবাদিত্য। অশ্বাদিত্য। কালভোজ। গ্রহাদিত্য।

এই গ্রহাদিত্যের পুত্র বাপ্পা। বাপ্পা মিবার রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তা। কিন্তু আবিস্কৃত তাম্র শাসনে সূর্য্যবংশের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। বংশের স্থাপনকর্ত্তা স্বয়ং রাজা কিম্বা রাজপুত্রও ছিলেন না, তাহার উত্তর পুরুষগণ যখন মহারাজ উপাধিধারণ করত প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন তখনও তাহারা আপনাদের আদিপুরুষকে "মহারাজ" উপাধি দ্বারা বিশোভিত করিতে সক্ষম হন নাই। কিম্বা

কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের জগদ্বিখ্যাত মন্দির অদ্যাপি উড়িষ্যা বক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেই কেশরী রাজবংশ গুপ্ত সম্রাটদিগের দ্বারা উৎকল সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ কত রাজবংশ ভারতের কত স্থানে গুপ্ত সম্রাটদিগের কৃপায় রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাহা স্থির রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন।

রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দেন নাই। মিবার রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত তাহাদের প্রবল উন্নতির সময় কল্পনার তুলিকায় অতি বর্ণে রঞ্জিত হইয়া চারণদিগের গ্রন্থে নিবিষ্ট হইয়াছিল। অন্য উপায় অভাবে টড সাহেব তাহাই স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাম্রশাসন হইতে ইহাদিগের বংশাবলী নিম্ন লিখিত রূপ সঙ্কলিত হইয়াছে।

১। সেনাপতি ভট্টার্ক (ভট্টারক, কণকসেন)।

২। সেনাপতি শ্রীধর সেন। ৩। মহারাজ দ্রোন সিংহ। ৪। মঃ ধ্রুবসেন। ৫। মঃ ধরভট্ট।

৬। মঃ গুহ বা গৃহ সেন।

৭। মঃ শ্রীধর সেন।

৮। মঃ শিলাদিত্য ক্রমাদিত্য। ১ম।　　৯। মঃ খরগ্রহ।

ধর ভট্ট।　　১০। মঃ শ্রীধর সেন　১১। মঃ ধ্রুব সেন

১২। মঃ শ্রীধর সেন।

১৩। মঃ ধ্রুবসেন।　১৪। মঃ খরগ্রহ।　শিলাদিত্য।

১৫। মঃ শিলাদিত্য। ২য়।

১৬। মঃ শিলাদিত্য। খরগ্রহ (৩য়)

১৭। মঃ শিলাদিত্য। (৪র্থ)

১৮। মঃ শিলাদিত্য। মোষলী (৫ম)

১৯। মঃ শিলাদিত্য ধ্রুবভট্ট। (৬ষ্ঠ)

চীন পরিব্রাজক হিয়োন সাঙের সমসাময়িক।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের লাট প্রস্তর লিপিতে তাঁহার করদ ও সামন্ত রাজগণের নাম উল্লেখ হইয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি রাজ্যের নাম এইক্ষণে ঠিক করা দুরূহ। বিখ্যাত প্রিন্‌সেফ সাহেবও ডাক্তর ভাউদাজি এই সকলের পরিচয় পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমরা এইরূপ দুরূহ কার্য্যে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে ইচ্ছা করি না। তবে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বিশেষ পরিচিত কএকটী রাজ্য এবং আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের করদ শ্রেণীতে গ্রথিত থাকার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত লাট প্রস্তর লিপির উনবিংশ পংক্তিতে নেপাল, কামরূপ, ত্রিপুরা ও সমতট (বঙ্গ) প্রভৃতি রাজ্য সমূহের নাম করদ শ্রেণীতে উল্লেখ হইয়াছে।

গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়াবধারণ জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছি; তথাপি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া আশা করিতে পারি না। তবে চেষ্টা দ্বারা যাহা অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় যাহারা পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এই সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবহার নিতান্ত হাস্য জনক। জেনারল ক্যানিংহাম সাহেব একদিন ভ্রম ক্রমে একটী গাভিকে বৃষ বলিয়াছিলেন, তাহার শিষ্যগণ অমনি গাভিকে বৃষ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। গুপ্তদিগের সময় সম্বন্ধে তাঁহারা ও ঠিক এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আবু রিহান আল বিরূনীর ভ্রমপূর্ণ পাণ্ডুলিপির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ক্যানিংহাম সাহেব সর্ব্বপ্রথম ৩১৯ খৃঃ অব্দে গুপ্তদিগের রাজ্যারম্ভকাল অবধারণ করিয়াছিলেন। (আমাদের ভ্রাতাগণ ক্যানিংহামের এই ভ্রমাত্মক মত অন্ধভাবে ধরিয়া বসিয়া আছেন।) কিন্তু ক্যানিংহাম সাহেব টমাস সাহেবের তর্কতরঙ্গে পড়িয়া আত্মভ্রম অনুভব করতঃ ১৩৫ খৃঃ অব্দে শ্রীগুপ্তের রাজ্যারম্ভকাল অবধারণ করিয়াছেন। এবং তাহার পূর্ব্ব মত যে ভ্রমাত্মক ইহা তিনি তৎকালে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন।* আমরা উক্ত পুরাতত্ত্ববিৎগণের ভ্রমাপনোদন জন্য ক্যানিংহামকৃত প্রাচীন ভ্রম

---

* কানিংহাম সাহেবের প্রাচীন ভ্রমাত্মক মতানুসরণ করিয়া যে সকল বঙ্গীয় লেখক স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস রচনা করত ছাত্র বৃন্দের মুণ্ড চর্ব্বণ করিতেছেন, তাহারা শ্রবণ করুণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ক্যানংহাম সাহেব কি লিখিয়াছেন।

In his account of Indian eras, Abu Rihan speaks of the Gupta kal and the Balabhi kal as if they were the same, and he fixes the initial-point of the latter in saka 241, or A. D. 319. But as I have already shown, this could not have been the starting-point of the era of the Guptas, as it disagrees with the week-day of Budha Gupta's inscription. Neither could it have been the starting point of the era used by the Balabhi kings themselves, as it dis-agrees with the date of Dhruvabhata. My

পূর্ব্ব তালিকা ও আধুনিক সংশোধিত তালিকা উভয়ই উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি "বঙ্গের খ্যাত নামা পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস লেখকদিগের" গ্রন্থগুলি উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারেন।

প্রাচীন তালিকা।		নূতন তালিকা।			
		খৃঃঅব্দ	গুপ্তঅব্দ	বল্লভীঅব্দ	নাম
১। গুপ্ত	৩১৯ খৃঃ	১৩৫	...	...	শ্রীগুপ্ত
২। ঘটোৎকচ	৩৪০ খৃঃ	১৬৫	...	...	ঘটোৎকচ
৩। চন্দ্রগুপ্ত ১	৩৬০ খৃঃ	১৯৪	০	...	গুপ্তাব্দ আরম্ভ
৪। সমুদ্র গুপ্ত	৩৮০ খৃঃ	১৯৫	১	...	চন্দ্রগুপ্ত ১
৫। চন্দ্রগুপ্ত ২	৪০০ খৃঃ	২৩০	৩৬	...	সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রম
		২৬৪	৭০	...	চন্দ্রগুপ্ত ২ বিক্রম।
৬। কুমার গুপ্ত	৪২০ খৃঃ	২৯০	৯৬	...	কুমারগুপ্ত মহেন্দ্র।
৭। স্কন্দগুপ্ত	৪৪০ খৃঃ	৩১৯	১১৫	১	বল্লভী অব্দ আরম্ভ
৮। লোকাদিত্য	৪৫২ খৃঃ	৩২৪	১৩০	৬	(দেব গুপ্ত ?)
		৩২৯	১৩৫	১১	স্কন্দগুপ্ত ক্রমাদিত্য
৯। বুধ গুপ্ত	৪৮০ খৃঃ	৩৩৯	১৪৫	২১	(সেনাপতি ভট্টারক সৌরাষ্ট্রের শাসন কর্ত্তা)
১০। তাক্তগুপ্ত	৫১০ খৃঃ	৩৪৯	১৫৫	৩১	বুধ গুপ্ত।
১১। নরগুপ্ত	৫৪০ খৃঃ	৩৬০	১৬৬	৪২	(ভট্টারকের পুত্র শ্রীধরসেন)
১২। বজ্র	৫৭০ খৃঃ	৩৬৬	১৭২	৪৮	মহারাজ দ্রোনসিংহ বুধ গুপ্তের দ্বারা অভিসিক্ত
		৩৬৯	১৭৫	৫১	তোরমান

impression is, that Abu Rihan had found that the Guptas and Balabhis actually used the same era; and as he knew that the era called the Balabhi kal began in saka 241 or AD. 319, he took it for granted that this was the era used by the Gupta and Balabhi kings. At the same time he knew that the Guptas preceded the Balabhis, as he distinctly states that "the era which bore their name was the epoch of their extermination." According to Abu Rehan's views therefore, the Gupta power in western India was extinct in A. D. 319. But we have an inscription of Skanda Gupta, carved on the rock of Junagarh in Surashtra, which is dated in 138 and 139 of the Gupta kal. The Gupta dominion was, there-

প্রোফেসার লাসেন গুপ্ত সম্রাটদিগের নামের সহিত সময়ের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ বিধায় তৎসম্বন্ধে আমরা কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় গুপ্তদিগের সময় সম্বন্ধে কোন রূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বলিয়াছেন যে, কনিংহাম ও টমাসের ন্যায় পণ্ডিতদ্বয় যে বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত নিযুক্ত আছেন, আমি তাহার অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন রূপ গণ্ডগোল বাধাইবার আবশ্যক বোধ করি না। তবে গুপ্তদিগের শাসন পত্রে যে অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শকাব্দ হওয়াই সম্ভব। মহাত্মা টমাশ তাঁহার Imperial Gupta dynasty নামক উপাদেয় গ্রন্থে সাধারণতঃ যে মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনিও গুপ্ত অব্দকে শকাব্দ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করেন। আমরা বিনীত ভাবে এই মত অনুমোদন করিতেছি। * আমাদের দেশে প্রচলিত শকাব্দ গুপ্ত বংশীয় তৃতীয় নরপতি মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস এই সম্রাটের সভায় মহাকবি কালিদাস উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ভাউদাজি ও তাঁহার শিষ্যগণ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাসকে অভিন্ন অবধারণ করিয়া তাঁহাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় স্থূল বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারে না। কালিদাস স্বয়ং আপনাকে কালিদাস নামেই পরিচিত করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্য সমূহের টীকাকারগণও তাঁহাকে মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত করেন নাই। এমত অবস্থায় কোন আধুনিক ব্যক্তি কালিদাসকে মাতৃগুপ্ত অবধারণ করিলে ইহা হাস্যজনক হয় কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

---

fore, still intact in surashtra so late as 139. 194 = 333 A. D. I conclude, therefore; that the Balabhi era, which began in A. D. 319, had no connection whatever with the downfall of the Gupta dynasty.

Having established this point, as I believe, satisfactorily, it remains to be shown how the epoch of 195 A. D., as the 1st year of the Gupta era, agrees with the date which may be gathered from other sources.

Archl. Survey Report. Vol. IX. p. 20.

* জেনারল কনিংহাম সাহেব এই মত অনুমোদন করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা সুদৃঢ় ও বলবৎ বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ্গের সমসাময়িক বল্লভিপতি শিলাদিত্য ধ্রুবভট্ট হইতে ঊর্দ্ধদিকে পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া ক্রমে বল্লভী হইতে গুপ্তাব্দে উপনীত হইতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ছয়শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল এইরূপে অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হইতে পারে কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তাহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েবার সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভায় কবি চূড়ামণি কালিদাস উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রয়াগ নগরের লাট প্রস্তর লিপির "বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেক কাব্যক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিতকবিরাজশব্দস্য" ইত্যাদি বর্ণনাগুলি তাঁহার বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতা পুত্রের সভায় এক জন উপস্থিত থাকা কিছুই অসম্ভব নয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না। গুপ্ত রাজন্যবর্গের নামের সহিত সময়ের যে তালিকা আমরা প্রস্তুত করিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

নাম	শকাব্দ	খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত অব্দ	মুদ্রাঙ্কিত অব্দ
১। শ্রীগুপ্ত	...	...	...
২। ঘটোৎকচ	...	...	...
৩। চন্দ্র গুপ্ত	১	...	...
৪। সমুদ্র গুপ্ত	৩৬	...	...
৫। চন্দ্র গুপ্ত	৭০	৮২, ৯৩	...
৬। কুমার গুপ্ত	১১০	...	১২১, ১২৯,
৭। স্কন্দ গুপ্ত	১৩০	১৩১, ১৩৮, ১৪১, ১৪৪	...
৮। বুধ গুপ্ত	১৫০	১৬৫	...
* * * *			
মহাশিব গুপ্ত	৩৯৬		

গুপ্তসম্রাটদিগের সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

অতৃপ্তি।

ষষ্ঠসর্গ।

অবসান।

সিন্ধুতীর। বনবালা একাকী।

বনবালা।

দেবতা গো দেবতা আমার,
পূজিতে যে চরণ তোমার,
অমূল্য এ হৃদয় রতন
বুকের উপর করি আনি
দিয়াছিনু প্রভু উপহার।

তবে কেন কেন, বল সখা
ক্রোধের ভ্রুকুটি হেন হানি,
দূরে তাহে ফেলি দিলে টানি ?

ক্ষুদ্র এই বালিকা হৃদয়
ও পদের যোগ্য কি গো নয় ?
হলেই বা ক্ষুদ্র অণু সম
ইহা যে গো একটি হৃদয় !

এই ক্ষুদ্র অনুতম হৃদে
অনন্তের প্রেম সখা রাজে,
সমস্ত জগৎময় খুঁজি
আর কোথা পাবে না যা তুমি
পূর্ণ তা এ ক্ষুদ্র হৃদি মাঝে।

এ হৃদয়ে অনন্তের আলো
দেখ দেখ হইছে প্রকাশ,—
এহৃদয়ে স্বরগের প্রেম
দেখ সখা হয়েছে বিকাশ।

তানা হলে তব পদে প্রভু
কেমনে দিব এ উপহার,
তুমি যে গো স্বরগ দেবতা
আমি ক্ষুদ্র বালিকা ধরার।

নাই যদি বুঝিলে তা তুমি
অযোগ্য হইল যদি মনে,—
তবু কি সামান্য উপহার—
গ্রহণ করেনা দেবগণে ?

আমি ত চাহিনে কোন বর—
চাহিনে ত কোন প্রতিদান,—
একটুকু একটুকু শুধু,
পেতে চাই ও চরণে স্থান।

কিছু আর চাহিনে যে স্বামি,
শুধু ও চরণ তলে আমি
পড়ে রব রেণুর সমান,
ক্ষুদ্র এক রেণুর সমান—
তাও প্রভু নাহি দিলে স্থান !

আজীবন আজীবন ভোর
পড়ে রব ও চরণ তলে,—
তুমি দেব তার পর দিয়া
দলিয়া দলিয়া যাবে চলে।

এই এক বড় উচ্চ আশা
এই মোর মহান্ সম্মান,--
ও পদের পরশ আঘাত
অসীম অনন্ত পুণ্য জ্ঞান।
তাও সখা দিলে না থাকিতে,
তাও সখা নারিলে সহিতে
তাতেও কি হোল অপমান!

বিষময় কণ্টকের মত
ঘৃণাভরে ফেলিলে ছুঁড়িয়া!
হৃদি প্রাণ গেল হারাইয়ে,
চূর্ণ চূর্ণ অস্থি শুধু নিয়ে
কত দূরে পড়িনু আসিয়া।

বরষার বারিধির মত
নিঝরের আকরের পারা,
এ হৃদয়ে আছিল লুকান
মরমের যত অশ্রু ধারা।

একে একে শূন্য করি তাহা
সকলিত ঢালিনাম পায়,
অশ্রু জলে বহিল যে নদী
করুণা হোল না তবু তায়!

মর্ত্ত্যের হিংস্র বন্য পশু
বোধ শূন্য হৃদয় পাষাণ,
মর্ম্মভেদী সে দুখের জলে
তাদেরো যে ভিজিত পরাণ!

স্বর্গের দেবতা তুমি হয়ে
একবার দেখিলেনা চেয়ে
ঘৃণায় রহিলে মুখ ফিরে,

কাঁদিল যতেক নরনারী
পাষাণ গলিল সেই নীরে।

আকাশের দিক বধূ যত
করুণা রাখি সে নদী নাম—
অশ্রুতে ঢালিয়া অশ্রুজল
তুলি নিল তাহা স্বর্গ ধাম।

দেখিলে না তুমি একবার
দেখিলে না বারেক চাহিয়া,
দিলে তারে দিলে ছুঁড়ে ফেলে
ছিল যেগো চরণ ধরিয়া।

দেবতা গো নিরদয় দেব
অসহায় শিশুটির মত
ছিল যে চরণ জড়াইয়া,
পারিলে গো পারিলে গো তারে
পারিলে গো ফেলিতে ছুঁড়িয়া?

প্রভু সখা হৃদয়ের স্বামি,
তোমা ছাড়া জানিনে যে আমি,
তুমি ছাড়া—কিছু নাই মোর,
তুমি মম বিশ্ব চরাচর
তুমি মম দেবতা ঈশ্বর।

হারায়েছি হাসি অশ্রু জল
হারায়েছি সুখ শান্তি বল,
গেছে হৃদি গেছে মন প্রাণ
করেছি ও পদে সবই দান।

অসীম এ সংসারের মাঝে,
কিছু নাই, নাই আর কেহ,

একটি ছায়ার মত শুধু
হাসি অশ্রু হৃদয় বিহীন
আছে অবশেষ এক দেহ।

মৃতের নামের মত শুধু
শশাঙ্কের কলঙ্কের হেন,
এমন একটি সেই দেহ
কিছু নয় তবু কিছু যেন।

নিদারুণ আঘাতে তোমার
কতদূরে এসেছি পড়িয়ে,
কিছুই না ছায়াময় এক
দেহের সে আকৃতি লইয়ে।

তুমি যারে দিলেনা আশ্রয়
এই দেখ কোথা তার স্থান।
উদার জলধি, দেখ চেয়ে,
কার তরে পেতেছে পরাণ!

জলধির ও মহান বুকে
এখনি পড়িব গিয়া ঝাঁপি,
দু এক সলিল বিন্দু শুধু
বারেক উঠিবে কাঁপি কাঁপি।

তার পর কোথা চলি যাব
কোথায় যে হইব বিলীন,—!
দেখিতে পাবে না সখা আর
কখনো কখনো কোন দিন।

বহু দিন—বহু দিন পরে
জাগি উঠে অনুতাপ যদি,
নিষ্ঠুরতা বুঝিয়ে যদি গো
একবার কেঁদে উঠে হৃদি।

তখন যদি গো একবার
সাধ উঠে সখা দেখিবার,
পাবে না গো পাবে না দেখিতে,
সমস্ত পৃথিবীময় যদি
খুঁজে খুঁজে ভ্রম নিরবধি
পাবে না গো পাবে না দেখিতে।

একবার দেখিবার তরে
তখন যদি গো দাও প্রাণ,
তবু যে গো পাবে না দেখিতে—
জানিবে না কোথা তার স্থান।

ধরা ত্যজি স্বর্গ ধামে গিয়ে
পাইবেনা খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
হয়ত তখন অভাগিনী
এই হাসি এই কান্না নিয়া—

আবার এ পৃথিবীতে আসি
লয়েছে সে লয়েছে জনম,
এই সুখ দুঃখ আশা নিয়ে
এই প্রেমে হৃদয় ভরিয়ে
ঢাকিয়াছে মরমে মরম।

পুণ্যবান দেবতা গো যদি
নররূপে আস ধরাতলে,
দেখিতে পাবে না, ততদিন
আর কোথা গিয়াছি যে চলে।

একটি আঁখির শুধু ফেরে,
করুণার কথাটি কহিয়া,
আজ যা পাইবে তাহা পরে
পাবে না সহস্র প্রাণ দিয়া।

অনন্ত অনন্ত কাল ধরে
খুঁজিয়া বেড়ালে সখা পরে

চাও সখা একবার ফিরে
কথা কও শুধু একটিরে,
এখনি চরণ তলে লুটি
পড়ি গিয়া ছুটিয়া আবার।

আসিলে না, চাহিলে না ফিরে,
একটু দিলে না পায়ে স্থান!
এই দেখ অপার জলধি
কার তরে পেতেছে পরাণ!

বনবালার পুরাতন উপবন বাটিকা।

ললিতের প্রবেশ।

ললিত।

এনু এ কোথায়!
দুরন্ত ঝটিকা রাতে
যেনরে মলয় বাতে
সহসা শিহরে কায়!
দুঃখের স্বপন ছুটে
আঁধার নয়ন পুটে
এ যেন জোছনা ভায়!
হারান প্রীতির তীরে
যেন কোন স্মৃতিটিরে
ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
সব যেন কার মায়া
সব যেন কার ছায়া
প্রাণ যেন তারে চায়,
কোথায় সে, সে কোথায়!

অদূর বৃক্ষতল হইতে গান।

সখী।

বনের সে ক্ষুদ্র তৃণ ফুল
বনেতেই আছিল ফুটিয়া,
বনেতেই শুকায়ে শুকায়ে
বৃন্ত হতে পড়িত টুটিয়া।

কেন ওগো নিঠুর পবন
কেন তুমি পরশিয়া তারে,
নিরদয় আঘাতে অমন
ছিঁড়িলে পাপড়ি গুলি হা রে!

তুমি যে গো বসন্ত সমীর
কাননের ফুল রাণী তব,
সুন্দরী গোলাপ গরবিনী
শোভাময়ী নলিনী সে নব।

সে একটি অরণ্যের ফুল
দূর হতে তোমারে দেখিত,
দূর হতে হৃদিপ্রাণ দিয়ে
মনে মনে তোমারে পূজিত।

কানন কুসুম বালা যত
ফোটাবার তরে চুমি চুমি,
চমকি সে বনফুল হিয়া
নিতি নিতি তার কাছ দিয়া
কাননে পশিতে যবে তুমি—

একটু করুণা লভিবারে
হৃদয়ের বিনিময়ে তার,
যে বাসনা জাগিত মরমে
লুকাইত মরমে আবার।

অযোগ্যা সে ক্ষুদ্র তৃণ ফুল
করে নাই এমন দুরাশা,
কখনো লভিবে একদিন
দুরলভ তব ভালবাসা।

কেনগো ছুঁইতে ফুলটিরে
মাথাটি করিলে অবনত,
না হয় সে ক্ষুদ্র তৃণফুল
কেঁদে কেঁদে বনেই শুকাত!

কতই না সোহাগ যতনে
রাখিলে গো হৃদয়ের পরে,
কতই না শপথ করিয়ে
বলিলে যে বার বার ক'রে,
রাখিবে হৃদয় মাঝে তব
এমনিই চির কাল তরে।

তাই আজ নিঠুর হৃদয়
একটিও দিন না যাইতে,
পদতলে দলিত করিয়া
দেখিতেছ হাসিতে হাসিতে—

কেমনে সে ছোট ফুলটীর
প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া,—
উছলিছে শোণিত লহরী
তোমার চরণ রাঙ্গাইয়া!

কেন বায়ু নিঠুর হৃদয়
এমন করিলে দশা তার,
কে তোরে সাধিয়াছিল তারে

ভাবিলি কি তুই সমীরণ—
একদিন যবে একদিন,
প্রতিদল আপনি ঝরিবে
প্রতিরেণু খসিয়া পড়িবে
সৌন্দর্য্যের হাসিটি তাহার
অবশ্যই হইবে বিলীন;—

অনিত্য এ সংসারের মাঝে
স্থায়ী নহে কিছুই যখন,
একদিন যদি ফুলটির
অবশ্যই আছয়ে মরণ।

তবে কেন আগে হতে তার
নাশ করি ক্ষুদ্র পরমায়ু,
মারিবার সুখ টুকু তুই
ভোগ না করিয়া লবি বায়ু!

অভাগিনী নিতান্ত অবোধ
সবে ফোটা হৃদয় তাহার,
ভেবেছিল প্রণয় বলিয়া
চপল সে খেয়ালে তোমার!

কিবা পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে
হৃদয় সে সঁপেছিল তোরে?
দিলি যদি প্রতিদান এই
কিছু তাহে দুঃখ তার নেই।

ভালবেসে একদিন তুমি
মৃতপ্রায় যে পরাণে তার—
জীবন করিয়াছিলে দান
তুমিই তা হরিলে আবার।

ভালই করেছ, তোমা স্মরি

আহত সে তৃণ ফুল বালা
অকাতরে ত্যজেছে জীবন।

হৃদি শূন্য কঠোর পাষাণ,
এখন কেন গো তবে আর,
হাসিয়ে 'কোথায় আছে' বলি
সুধাইছ তুমি বার বার!

এখনো সাজে কি সমীরণ
অমন নিঠুর উপহাস!
অভাগিনী দুখিনী সে বালা
ফেলেছে যে অন্তিম নিশ্বাস।

ইহাতেও হইল না তোর
এখনো কি আর বল্ চাস?
মিটিল না, পাষাণ হৃদয়,
এখনো কি শোণিত পিয়াস!

যাত্রা অবসান।

ললিত।

কে আছ গো করুণা করিয়া
দাও দাও পথ দেখাইয়া,
চলিতে শকতি নাহি আর---
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ হিয়া!

যন্ত্রণার মহা দেশ মাঝে
কবে সে যে পড়েছি আসিয়া,
অসীম অনন্ত শূন্যময়
অশান্তির মরু পথ দিয়া।

অবিশ্রান্ত অবিরাম হায়
চলিতেছি কত দিন ধরে,
লক্ষ্য হীন উদ্দেশ্য বিহীন
আশ্রয় আশ্রয় শুধু ক'রে।

বিয়াকুল নিরাশ নয়ানে
যে দিকে যে দিকে ফিরে চাই,
কিছু নাই কিছু নাই, চন্দ্র সূর্য্য তারা নাই,
জল নাই স্থল নাই, জীব নাই জন্তু নাই,
গাছ নাই পাতা নাই, শুষ্ক তৃণটিও নাই,
কি এক ভীষণ শুধু, শূন্যের অপার সিন্ধু
আঁধারে চমকে দিক দেখিবারে পাই!

শ্রান্ত দেহ ভয়ে কম্পমান,
আকুল ব্যাকুল হৃদি প্রাণ,
একটু একটু বল নাই,
প্রতি পদে পড়ে পড়ে যাই,
তবুও চলিতে আরো হবে
এই পথ কখন্ ফুরাবে!

কোথা পাব—কোথায় আশ্রয়
আরো আরো কত দূরে গিয়া!
কোথা সেই সুখের আলয়
কোথা সেই শান্তির আশ্রয়
কত দূরে ফেলে এনু সব
এক দিন পথ হারাইয়া।

শত শত আশা সূর্য্য শালী
দিবসের মহারাজ্য হতে
কবে সেই করেছি প্রয়াণ,
অসংখ্য রবির সেই হাসি
প্রজ্জ্বলন্ত রশ্মি রাশি রাশি
একে একে প্রায় সকলি নির্ব্বাণ।
সে যাত্রার এখনো রে তবু
হোল না হোল না অবসান।

কত দিন—জানি না গো কত দিন
তার পর গিয়াছে চলিয়া,

সুখ শান্তি কথা দুট শুধু
এখনো জাগিছে মনে মনে,
কেমন যে আছিল তাহারা
একেবারে গিয়াছি ভুলিয়া।

মানুষের আঁখির উপর
রবি শশি তারা তার পর
না জানি উঠেছে কতবার
কতবার গিয়াছে নিভিয়া।
না জানি কতেক ঋতু চয়
আসিয়াছে গিয়াছে চলিয়া,
জনম মরণ কত গেছে
অনিত্য ধরার পর দিয়া।
বুঝি বা সে অগণ্য দিবস,
তা না হলে অতীতের স্মৃতি
একেবারে যায় কি মুছিয়া!

সকলেরি আছে আছে সীমা
সকলেরি আছে আছে শেষ,
কোথায় ফুরাবে তবে এই—
যন্ত্রণার অন্তহীন দেশ!

কত জ্যোতি গ্রহ উপগ্রহ
লয়ে রবি নিজ সাথে সাথে,
অসীম আকাশ পথে পথে
বেড়াতেছে করি ছুটাছুটি!
মহা দূর ব্যাপী সে সৌর বিমান
আর এক মহান মহান
আকাশে পড়িছে গিয়া লুটি!

তার শেষ হোল ঐখানে,
ব্রহ্মাণ্ড মিশিছে ব্রহ্মাণ্ডের সনে,
সময় মিলায় সময়ের কোলে,
মিশায় অনন্ত অনন্তের তলে।
ফুরায় রে সকলি ফুরায়
এ যাত্রার শেষ কোথা হায়!

কত দিন—তবে আর কত দিন ধরে,
এমনিই হাহাকার করে,
শূন্যের এ মহা সিন্ধু মাঝে
চলিব গো ভাসিয়া ভাসিয়া!
শত শত রবির কিরণ
জীবন করিয়াছিল আলো,
সব গেছে গেছে মিলাইয়া।
একটি কিরণ রেখা তার
ছিল যেন ছিল অবশেষ
চলেছিনু তাহাই ধরিয়া।

এ কি হোল—কোথায় কোথায়!
সে রেখাটি গেল কি নিভিয়া!
কি ভীষণ নিবিড় আঁধারে
চারিদিক পড়িল ডুবিয়া!

এসেছে কি প্রলয়ের দিন!
স্থান-চ্যুত হ'য়ে লক্ষ্য হীন—
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর
এখনি কি মহাশূন্য মাঝে
চূর্ণ চূর্ণ হইবে বিলীন!

লও দেব হাতটি ধরিয়া,
এ ভীষণ আঁধার ঠেলিয়া
কোথা যাব—যাই বা কেমনে!
লক্ষ্য হীন আছি দাঁড়াইয়া।
আকুল স্তম্ভিত হৃদি প্রাণ
যাই বুঝি—গেলাম পড়িয়া।

নিভিয়াছে জগতের আলো
জ্যোতিহীন মুদিত নয়ান,
পরাণের স্তিমিত প্রদীপ
এইবার হয় রে নির্ব্বাণ!

অশান্তির মহারাজ্য দিয়া
কবে সেই করেছি প্রয়াণ,
সীমা বুঝি ফুরাইল হেথা
সে যাত্রার বুঝি অবসান!

সমাপ্ত।

সূর্য্য। *

আমরা নক্ষত্র জগতের সাধারণ বিবরণ সংক্ষেপে একরূপ বলিয়াছি, এখন যে নক্ষত্রটির সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যাহার উত্তাপ-প্রভাবে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষচালনা হইতে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শৃঙ্গের ধূলিকরণ পর্য্যন্ত সম্পাদিত, এবং যাহার আকর্ষণ-প্রভাবে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় কত গ্রহ-উপগ্রহ-সম্পন্ন সৌরজগতের শৃঙ্খলা সুরক্ষিত, তাহার বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই কোন না কোন এক সময়ে এই সূর্য্যকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা জ্ঞানে পূজা করিত। আদিম অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই অসীম-প্রভাশালী সূর্য্যের গূঢ় রহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া ভয়-বিস্মিত চিত্তে যে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমাদের হৃদয় একদিকে সেই অন্ধ ভয়বিস্ময়ের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দিকে এই সূর্য্যকে সেই জ্যোতির জ্যোতি অনাদি কারণের মহিমা রূপে দেখিয়া উত্তরোত্তর আরো বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

সূর্য্যের দূরত্ব, আয়তন ও ভার।

অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান, জ্যোতির্ম্ময় এই বিশাল সূর্য্য প্রভূত দূরত্ব নিবন্ধন যদিও আমাদের নিকট একটি অনতিবৃহৎ গোলক রূপে প্রতিভাত, তথাপি অন্যান্য তারকাগণের তুলনায় ইহা আমাদের নিতান্ত নিকটে অবস্থিত। অন্যান্য তারকাগণ পৃথিবী হইতে এত দূরে যে তাহাদের দূরত্ব নির্ণয় করা এখনো বৈজ্ঞানিকগণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করেন—কিন্তু সূর্য্যের দূরত্ব তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই, সূর্য্য পৃথিবী হইতে

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সূর্য্য নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,—এ প্রবন্ধটি তাহারি দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রায় ৯১,০০০,০০০ মাইল দূরে বিরাজমান। এখন কোন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হইলে তাহার আয়তন স্থির করাও সহজ, সুতরাং সূর্য্যের দূরত্ব জানিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আয়তনও জানিয়াছেন। সূর্য্যের ব্যাস ৮৫৩,৩৮০ মাইল। অর্থাৎ সূর্য্য তুল্য একটি গোলক প্রস্তুত করিতে হইলে ১২ লক্ষ পৃথিবীরও অধিক পৃথিবী আবশ্যক। অন্য কথায় সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১২০০০,০০০ লক্ষ গুণেরও অধিক বৃহৎ।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ঘণ্টায় ৩০ মাইল যায় এমন একটি রেলগাড়ীতে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস লাগিবে, কিন্তু এইরূপ বেগগামী রেল গাড়ীতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে ৯ বৎসরেরও অধিক সময় লাগে।

এইরূপ তুলনায় সূর্য্যের দূরত্বও অপেক্ষাকৃত সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আলোকে চড়িয়া সাড়ে আট মিনিটে পৃথিবী হইতে সূর্য্যে যাওয়া যায়—কিন্তু যদি উক্তরূপ বেগগামী রেল গাড়ীতে সূর্য্যে যাওয়া যাইত তাহা হইলে প্রায় ৩৩৮ বৎসর লাগিত।

যে পরিমাণে সূর্য্য পৃথিবী হইতে বৃহদাকার সে পরিমাণে কিন্তু পৃথিবী হইতে গুরুভার নহে। সূর্য্যের সমপরিমাণ পদার্থ পৃথিবীর সমপরিমাণ পদার্থ হইতে ৪ গুণ লঘু, সুতরাং সূর্য্যের ন্যায় একটি বৃহৎ গোলক গঠিত করিতে ১২ লক্ষ পৃথিবীর আবশ্যক হইলেও মোট তিনলক্ষ পৃথিবী একত্র করিলেই সূর্য্যের সমান ভার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমগ্র সূর্য্যের ভার পৃথিবী হইতে ৩০০০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্যের অভ্যন্তর।

এই যে গুরুভার বৃহদায়তন, অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, অসীম জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, ইহা একটা প্রকাণ্ড বুদ্‌বুদ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে—ইহার পূর্ব্ব কথিত ব্যাসযুক্ত সুগভীর অভ্যন্তর-দেশ সমস্তই বাষ্পময়। এখানে চাপের যেমন আধিক্য উত্তাপেরও তেমনি প্রাচুর্য্য, তাপ ইহাকে তরল করিয়া ফেলিতে উদ্যত, উত্তাপ ইহাকে বাষ্পাকারে রাখিতে সচেষ্ট, এতদুভয়ের পরস্পর কার্য্য দ্বারা অভ্যন্তর প্রদেশ যেরূপ ঘন বাষ্পাকার অবস্থায় রক্ষিত তাহাতে কোন প্রকার রাসায়নিক কার্য্য হওয়া অসম্ভব। এই অভ্যন্তর দেশই সূর্য্য লোকের মর্ম্ম স্থান। ইহার বাষ্পীয়ত্বই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইবার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

সূর্য্যের আলোকমণ্ডল।

আমরা সূর্য্যের জ্বলন্ত উজ্জ্বল যে গোলাকার অংশ প্রত্যহ চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই উপরোক্ত অভ্যন্তরের আবরণ স্বরূপ। এই স্থান হইতে আমরা প্রধানতঃ আলোক ও উত্তাপ পাই বলিয়া ইহার নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere)। ইহার আলোক-প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। প্রাচীন লোকেরা যখন অন্ধভাবে বলিতেন, সূর্য্য আগ্নেয়-পদার্থ-পরিপূর্ণ, তখন তাঁহারা সূর্য্যের যথার্থ উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ-প্রভাব বুঝিতে

পারিতেন না। আমরা যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পাই, তাহা সূর্য্য কর্ত্তৃক শূন্যে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের ২০ সহস্র লক্ষ ভাগেরও ১ ভাগ $\frac{১}{২২৭০০০০০০০}$ নহে, অথচ ইহাই আমাদের নিকট অপরিমিত বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পুইয়ে, এবং সর জন হার্‌ষেলের মতে আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই তাহাতে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ না থাকিলে একশত ঘন ফুটেরও অধিক পরিমাণ বরফ প্রতি বৎসর গলান যাইত। প্রক্‌টার বলেন প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই, ২৪ ঘণ্টার সেই উত্তাপকে একত্র করিলেই ৫২০ হস্ত গভীর পৃথিবী-ব্যাপী সমুদ্রকে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি * হইতে ১০০ ডিগ্রি † পর্য্যন্ত উঠান যায়, এবং প্রতি সেকেণ্ডের সূর্য্যোত্তাপকে একত্রীভূত করিলে ৯৭৫ লক্ষ ঘন-ক্রোশ-ব্যাপী নীহার-শীতল জলকে ফুটান যাইতে পারে। সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ হইতে সূর্য্যের উষ্ণতা ‡ গণনা করিবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার শেকি বলেন সূর্য্যের উষ্ণতা বহু লক্ষ ডিগ্রি, কিন্তু ডুলঁ ও পেতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা লৌহাদি গলাইবার অগ্নিকুণ্ড হইতে অধিক নহে, তবে সূর্য্যের অভ্যন্তরের উষ্ণতা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক।

আলোকমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ইহা কঠিন, কেহ বলেন ইহা বাষ্পময়, আবার কাহারো মতে ইহা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

যাঁহাদের মতে আলোকমণ্ডল সূর্য্যাভ্যন্তরের কঠিন আবরণ তাঁহারা বলেন, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আলোকমণ্ডল-নির্গত আলোকের প্রকৃতি বাষ্পবিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; কঠিন ব্যতীত বাষ্পীয়াবস্থাপন্ন পদার্থ হইতে এরূপ উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু ইহার প্রতিবাদীগণ বলেন, আলোকমণ্ডল কঠিন হইলে আলোকমণ্ডলস্থ কলঙ্কের এরূপ ঘন ঘন আকারের পরিবর্ত্তন হইত না; ইহা প্রকৃত পক্ষে বাষ্পময় তবে প্রভূত চাপ-প্রভাবেই বাষ্প নির্ম্মিত আলোকমণ্ডলের আলোক কঠিন-পদার্থ-নির্গত আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই, সূর্য্যে অনবরত যেরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব চলিতেছে তাহাতে, বাষ্পময় হইলে আলোকমণ্ডলের কায়া কখনো সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে ইহার প্রান্তদেশ এই উৎপাতে প্রায় সর্ব্বদাই

---

* নীহার শীতল-জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি।

† ফুটন্ত জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি।

‡ কোন বস্তুর অন্তরস্থ উত্তাপের যে অংশ চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের উপর কার্য্য করিতে পারে তাহাই সে বস্তুর উষ্ণতা Temperature.

ক্ষত বিক্ষত আকার ধারণ করিত। পরে দেখা যাইবে আলোকমণ্ডলের উপরিস্থ সূর্য্যের বাষ্পাবরণ-প্রান্ত এইরূপ কারণে সর্ব্বত্র সমান নহে।

আলোকমণ্ডল কঠিন কিম্বা বাষ্পময় হইলে ইহার দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না দেখিয়া কেহ কেহ বলেন ইহা কঠিন ও বাষ্পের মধ্যবর্ত্তী; ইহা অনেকটা মেঘের ন্যায়। তবে আমাদের মেঘ জলকণার সমষ্টি কিন্তু সূর্য্য এবং নক্ষত্রদিগের আলোক মণ্ডল নানা রূপ ধাতব এবং অন্যান্য প্রখর উষ্ণ পদার্থ কণার সমষ্টি। সম্পূর্ণ কঠিন-পদার্থ-নির্গত ও এইরূপ বাষ্পাকারে ভাসমান-কঠিন-কণা-বিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি একই রূপ; সুতরাং এই মতটিই বৈজ্ঞানিক জগতে গ্রাহ্য।

স্বাভাবিক চক্ষুতে দেখিলে আলোকমণ্ডল সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল একটি গোলক বলিয়া মনে হয়. কিন্তু দূরবীন যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, এই আলোকমণ্ডলটি একরূপ ভাসমান ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল রেখারাশিতে বিচিত্রিত, এবং এই বিচিত্রিত মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে দু-একটি দলবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক বর্ত্তমান।

আলোকমণ্ডলের রেখারাশি।

আলোকমণ্ডলে ভাসমান উপরোক্ত রেখারাশি লইয়া বিজ্ঞান-জগতে নানা তর্ক বিতর্কের পর, অধ্যাপক ল্যাংলির পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রকৃতি একরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ল্যাংলি বলেন সূর্য্যাভ্যন্তরের পাংশুবর্ণ কায়ার উপরে এক প্রকার অতি লঘু ধাতব মেঘ ভাসিতে থাকে। দূরদর্শী দুরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘরাশি আমাদের নিকট এক একটি উজ্জ্বল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রকায় ধান্যাকৃতি রূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই উজ্জ্বল কায়ার মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকল এক একটি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ ধারণ করে। এই দুই বর্ণের আকৃতিতে মিশিয়া আলোকমণ্ডলের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য ধাতব-মেঘ-ময় উজ্জ্বল রেখার মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকলের নিম্নস্থিত কৃষ্ণবর্ণ কায়ার দৃশ্যমান অংশই কৃষ্ণ বিন্দুরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই কৃষ্ণ বিন্দু গুলি প্রকৃত পক্ষে উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি রেখার মধ্যস্থিত ছিদ্র, সেই জন্য ইহা ছিদ্র (Pore) নামে অভিহিত।

দুরবীন যন্ত্রের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে আলোকমণ্ডলের কলঙ্কহীন উজ্জ্বল অংশ আমাদের নিকট তিন প্রকার আকার ধারণ করে। অতি সামান্য দুরবীন দিয়া প্রথমে আমরা আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশে লঘু-শ্বেত মেঘ ভাসমান দেখিতে পাই, তদপেক্ষা দূরদর্শী দূরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘই এক একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি রূপে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ-ছিদ্র মধ্য হইতে নিম্নের কৃষ্ণবর্ণ অংশ এক একটি কৃষ্ণ-বিন্দুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর দুরবীনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করিলে সেই ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল মেঘমধ্যস্থ স্বতন্ত্র উজ্জ্বল বিন্দুকণাও দৃষ্টিগোচর হয়।

সৌর কলঙ্ক।

উপরোক্ত বিন্দুরাশি বিচিত্রিত আলোক মণ্ডলের স্থানে স্থানে এক একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সৌর কলঙ্ক বলে। বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত শৈশব কালে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফেব্রিসস্ প্রথমে সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় সৌর কলঙ্ক দেখিবার জন্য অতি অল্পই পরিশ্রম কিম্বা নিপুণতার আবশ্যক। একটি সামান্য দূরবীনের সাহায্যেই আমরা এই কলঙ্ক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কলঙ্কের তথ্যানুসন্ধানকারী জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন কলঙ্কগুলির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটি নিয়মিত গতি আছে; সচরাচর একটি কলঙ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উদয় হইয়া ক্রমে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ১২।১৩ দিনে সূর্য্যের পশ্চিমপ্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে যদি ইহা একেবারে সূর্য্যে না মিশাইয়া যায় তবে আবার ১২।১৩ দিনে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হয়।

সূর্য্য নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কময় থাকে না। সূর্য্য কখনো কয়েক মাস, কখনো কয়েক বৎসর, কখনো বা কয়েক দিন মাত্র নিয়মিত রূপে কলঙ্কযুক্ত থাকিয়া আবার কিছু কালের জন্য একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া পড়ে। তবে যতদিন সূর্য্যে কলঙ্ক থাকে ততদিন পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের গতি হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে, সূর্য্যের নিজ-মেরুদণ্ড-আবর্ত্তন তেমনি ২৫ দিনে সম্পন্ন হয়। সূর্য্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া যখন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে তখন আমাদের নিকট কলঙ্কগুলির দৃশ্যতঃ একটি বিপরীত গতি অনুভূত হয়।

সূর্য্য কলঙ্কের এই যে দৃশ্যতঃ গতি অর্থাৎ সূর্য্যের আবর্ত্তন বশতঃ তাহাদের এই যে গতি অনুভূত হয়—ইহা ছাড়া তাহাদের আবার নিজস্ব গতি আছে। তাহাদের এই গতি মিষ্টার ক্যারিংটন কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যবেক্ষকগণ সূর্য্যের আবর্ত্তন সময়ের কেন যে ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই আবিষ্কার দ্বারা তাহার রহস্য ভেদ হয়। তাঁহারা একমাত্র উল্লিখিত দৃশ্যতঃ গতি ধরিয়াই সূর্য্যের আবর্ত্তন কাল গণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখন দেখা যায় সূর্য্য কলঙ্কের প্রত্যেকের নিজের গতি আছে এবং এই গতির বেগ-সূর্য্যের সকল অংশে সমান নহে। প্রকৃত পক্ষে বিষুবরেখার নিকটস্থ কলঙ্ক তাহার দূর দেশবর্ত্তী কলঙ্ক অপেক্ষা অনেক দ্রুত চলে। বিষুবরেখার কলঙ্কের গতি ধরিলে সূর্য্যের আবর্ত্তন কাল ২৫ দিন আর সূর্য্যের গোলকার্দ্ধবর্ত্তী কোন স্থলের কলঙ্কের গতি ধরিয়া দেখিলে ২৮ দিনে সূর্য্য আবর্ত্তিত হইতেছে দেখা যায়।

ক্ষুদ্র দূরবীন দিয়া দেখিলে সৌর কলঙ্ককে যেমন এক একটি সমান কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপন মনে হয়, দূরদর্শী দূরবীন দ্বারা সেরূপ মনে হয় না। তখন এক একটি কলঙ্কের আবার দুই তিনটি ভিন্ন অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কলঙ্কের মধ্যভাগ যেরূপ ঘনকৃষ্ণ তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ অংশ তদপেক্ষা লঘু। কলঙ্কের চতুস্পার্শ্বস্থ লঘুকৃষ্ণ অংশকে উপ-ছায়া (Penumbra) ও ঘনকৃষ্ণ ভাগকে ছায়া (Umbra) ও এই ঘনকৃষ্ণের মধ্যস্থিত ভাগকে সারাংশ (Neucleus) কহে। কলঙ্করাশির আকার ও গঠন-বিন্যাস সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। ইহারা প্রায়ই দুইটি, কখনো বা দুইটির অধিক একত্রে দলবদ্ধ থাকে, আবার কখনো একটি কলঙ্ক ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটিতে পরিণত হয়।

আমরা নিম্নে ক্ষুদ্র একটি কলঙ্কের ছবি দিলাম।



সৌর কলঙ্কের যুগান্তর কাল

সৌর কলঙ্কের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না। ব্যাপক কালের অনুসন্ধান দ্বারা সূর্য্যকে কখনো অতি-কলঙ্ক কখনো অল্প-কলঙ্ক-ময় থাকিতে দেখা গিয়াছে। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্ক সংখ্যায় ও আয়তনে যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া ক্রমে আবার কমিতে আরম্ভ করে, কমিতে আরম্ভ করিবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে যতদূর কমিবার কমিয়া যায়, আবার ইহার দুই তিন বৎসর পরে অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসে। এখনো এই হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হয় নাই, তবে একবার অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আবার অতি কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসিতে প্রায় ১১ বৎসর লাগে। এই ১১ বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সূর্য্য একেবারেই নিষ্কলঙ্ক থাকে।

সূর্য্যে যখন কলঙ্ক না থাকে তখন আমরা তাহার নিকট হইতে যত আলোক পাই যখন সূর্য্য কলঙ্কময় থাকে তখন সেরূপ পাই না—সুতরাং এই জন্য আমরা সূর্য্যকেও পরিবর্ত্তন শীল তারকা বলিতে পারি, এবং আমরা দেখিয়াছি সূর্য্যের একটি অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আর একটি অতি কলঙ্কের সময় আসিতে ১১ বৎসর লাগে—সুতরাং সূর্য্যের জ্যোতি পরিবর্ত্তনকাল ১১ বৎসর এইরূপ বলা যায়।

মিষ্টার ব্যালফুর ষ্টুয়ার্ট সৌরজগতের গ্রহদিগের গতিবিধির সহিত সৌরকলঙ্কের যুগান্তরকালের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কেন না বৃহস্পতি ১১ বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে কলঙ্কেরও ১১ বৎসরে যুগান্তর হয়, তাহা

ছাড়া সূর্য্যের অতি কলঙ্কময়-অবস্থায়, কম্পাসের চৌম্বক শলাকার আন্দোলন এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্থিত তড়িৎ প্রবাহ—ও উভয় মেরুবর্ত্তী আলোকদ্বয়ের বেগ অন্য সময় অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণ বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—সূর্য্যের বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক সূর্য্যালোক যখন অধিক পরিমাণে শোষিত হয় তখনই সূর্য্য-অতি কলঙ্কময় হয়, সুতরাং সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিলেও কোন গ্রহের গতিবিধি যে সৌর কলঙ্কের কারণ নহে ইহা প্রমাণ হইতেছে। আসল কথা বাহিরের কোন কারণ হইতে সূর্য্য কলঙ্ক উৎপন্ন হয় না; সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ অবস্থাই সৌর কলঙ্কের কারণ।

সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি।

সৌরকলঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা এইবার দেখা যাউক।

ইহা আলোকমণ্ডলের উপর ভাসমান কৃষ্ণবর্ণ ঘনপদার্থ কি না এই লইয়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিসম্বাদ চলিয়াছিল। স্কচ সৌরবৈজ্ঞানিক উইলসন প্রথমে দেখেন, সৌর কলঙ্ক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণ গহ্বর মাত্র।

সৌর কলঙ্ক এক একটি গহ্বর মনে করিয়া উইলসন সূর্য্য সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত মতের প্রবর্ত্তনা করেন, হার্ষেল সেই মতটিকে বিধিমতে সাজাইয়া প্রাণদান দেন। হারষেলের সেই মতে সূর্য্যাভ্যন্তর দুই স্তর মেঘ-বেষ্টিত কৃষ্ণকায় একটি শীতল বস্তু। সূর্য্যের যে আলোকমণ্ডল আমরা প্রত্যহ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই সর্ব্বোপরিস্থ অত্যন্ত উজ্জ্বল মেঘস্তর, এবং তাহার নিম্নে যে আর একটি মেঘস্তর আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল! এই দুইটি স্তর হইতে কখনো কখনো মেঘ সরিয়া গিয়া একরূপ গহ্বর উৎপন্ন করে। সেই গহ্বরই কলঙ্ক। কলঙ্কের লঘু কৃষ্ণ অংশ গহ্বরের চারিধার এবং ঘন-কৃষ্ণ মধ্যভাগ গহ্বরতল। সূর্য্যের শেষোক্ত স্থানে বুদ্ধিমান জীবের নিবসতি। আলোক-মণ্ডলের উত্তাপ সূর্য্যবাসীদিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা দায় হয়, সুতরাং যাহাতে সে উত্তাপ ততদূর না পৌঁছিতে পারে এই জন্যই হার্ষেল আলোকমণ্ডলের নিম্নে পূর্ব্বোক্ত শীতল মেঘস্তরের ব্যবধান বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও সূর্য্যবাসীদিগের একটি বিশেষ এই অসুবিধা যে আমরা যেমন ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পাই সূর্য্যবাসীরা সেরূপ ইচ্ছাক্রমে সূর্য্যের বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পায় না। কালে ভদ্রে দৈবের কৃপায় কখন্ আলোক-মণ্ডলে পূর্ব্বোক্তরূপে গহ্বর উৎপন্ন হইবে এই প্রতীক্ষায় তাহাদের হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, কেন না সেইরূপ গহ্বর উৎপন্ন হইলেই তন্মধ্য দিয়া তাহারা সূর্য্যের বহিঃস্থ জগৎ দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত সূর্য্যবাসীদিগের উপকথা ছাড়িয়া দিলে উপরোক্ত মতটি যে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ অবস্থা এক রকম বুঝাইতে পারে না তাহা নহে।

হার্ষেল দেখিলেন আলোক-মণ্ডল সম্পূর্ণরূপ কঠিন, তরল, কিম্বা বাষ্পময় হইলে কলঙ্কের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ কঠিন হইলে সৌর কলঙ্কের ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না, সম্পূর্ণ তরল কিম্বা বাষ্পময় হইলে সৌর কলঙ্ককে ক্রমান্বয়ে অনেক দিন ধরিয়া দেখা যাইত না; কেননা চতুর্দ্দিকের তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বেগে আসিয়া সেই গহ্বর শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তাহা সমভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সুতরাং হার্ষেলকে অগত্যা অনুমান করিতে হইল আলোকমণ্ডল বাষ্প-সাগরে ভাসমান মেঘ সদৃশ পদার্থরাশি। ইহাকে কঠিন বলা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা তরল ও বাষ্পময় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

তাহার পর গুহাকার সৌর কলঙ্ক-মধ্য দিয়া কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর দেখা যায়, সুতরাং সূর্য্যাভ্যন্তর কঠিন ও শীতল, কেবল আলোকমণ্ডল মাত্র জ্বলন্ত মেঘময়।

কিন্তু এই মত অধুনা আবিষ্কৃত উত্তাপের নিয়ম-সঙ্গত নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন বিশ্বসংসারের শক্তি-সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে শক্তি হইতে উত্তাপ, উত্তাপ হইতে শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি সংরক্ষণের (Conservation of Energy) এই প্রাকৃতিক নিয়ম তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে ইহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই হার্ষেল-কল্পিত মতের পদে কুঠার পড়িল। সূর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে পরিমাণে উত্তাপ বিক্ষেপ করিতেছে সে উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিতে যে পরিমাণ শক্তির উত্তাপ রূপে পরিণত হওয়া আবশ্যক, হার্ষেল-কল্পিত অভ্যন্তর-শীতল অনতি-গভীর উত্তপ্ত-স্তর সম্পন্ন সূর্য্যে সে পরিমাণ শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

হার্ষেলের সময় বৈজ্ঞানিকেরা উত্তাপ দিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে বিশেষ উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে সূর্য্য-বেষ্টক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের উত্তাপ এত অল্প যে নিম্নস্থ মেঘস্তর ভেদ করিয়া তাহা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য সে উত্তাপে সূর্য্যবাসীদিগের কিছুই হানি হয় না।

কিন্তু এখন দেখা যায় যদি বা আলোকমণ্ডলের উত্তাপ কোন অজ্ঞাত উপায়ে চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলেও উত্তাপের সঞ্চালন (Conduction) ও বিকিরণ (Radiation) দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ শীঘ্রই আলোকমণ্ডলের সমান উষ্ণ হইয়া সেখানকার জীবগণের বিনাশ সাধন করিত।

তাঁহারা ভাবিতেন সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া এখানে আসিবার সময়, পরস্পর ঘর্ষণে প্রখর উত্তাপ উৎপন্ন করে। দুই পদার্থের ঘর্ষণে উত্তাপ জন্মে

সত্য, কিন্তু এখন পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, আলোক কোন রূপ পদার্থ (Matter) নহে, সুতরাং আলোক-ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না।

বস্তুতঃ উত্তাপের নিয়ম হইতে জানা যায় সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড বাষ্পময় অগ্নিকুণ্ড না হইলে অক্ষুণ্ণ ভাবে এতকাল উত্তাপ দিতে পারিত না। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ করে। এই রূপ উত্তাপ বিকিরণ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ-ভাণ্ডার ক্ষয় হইবা'র সম্ভাবনা, যেহেতু শক্তিক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হয় না, এবং আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আদিম কাল হইতে উত্তাপ-রূপে শক্তি ব্যয় করিয়াও কি জন্য সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে?

আমাদের পৃথিবীতে আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক, উত্তাপরক্ষার জন্য সূর্য্যেরও তো সেইরূপ কিছু চাই। গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে, গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে তাহা সমভাবে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে। সূর্য্য যে পরিমাণে উত্তাপ বিকীর্ণ করে, তাহা রক্ষা করিতে গেলে ১০০শত বৎসর অন্তর পৃথিবীর মতন একটি বিশাল আয়-তনের গ্রহ সূর্য্যের উপর পড়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা পড়িবার যে কালে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সে কালে সূর্য্যোত্তাপ রক্ষা হইবার কারণ কি? সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থাই ইহার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই আবার তাহা হইতে নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইয়া উত্তাপ রক্ষা করা হঠাৎ পরস্পর কেমন বিসম্বাদী মনে হয়, কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন পদার্থ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়। এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে নিজে শীঘ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে। বাষ্পীয় পদার্থে এ নিয়মটি বিশেষরূপে খাটে। এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য যত দিন তরল না হইবে তত দিন এই নিয়মানুসারে উত্তাপ দিবে, তরল হইলে এ নিয়ম আর তাহাতে সম্পূর্ণ খাটিবে না।

বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে হার্ষেলের মতের ভুল বুঝা গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার যথার্থ প্রকৃতি ও কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফায়োর মতই বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন, প্রভূত উত্তাপ-প্রভাবে সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে নানা প্রকার ধাতব-বাষ্প উর্দ্ধে উঠিতে

থাকে, এবং উপরে অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আলোকমণ্ডলে পতিত হয়, এবং আবার উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ উপরে উঠিতে থাকে। অনবরত সূর্য্যে এই কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকার গতি সূর্য্য-কায়ার সর্ব্বত্র সমান নহে, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সূর্য্যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ ঝটিকা দেখা দেয়। এই ঝটিকা প্রভাবে সূর্য্যের বাষ্পাবরণের উপরিস্থিত বাষ্প (প্রধানতঃ জলজান বাষ্প) নিম্নে আলোকমণ্ডলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে শীতল বাষ্পরাশি সূর্য্যের যে যে স্থানে পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের আলোক অদৃশ্য হইয়া সূর্য্যের গাত্রে কলঙ্ক উৎপন্ন করে। এই সকল কলঙ্ক দেখিতে গহ্বরের ন্যায়, যাঁহারা নদীর পাঁক দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কি করিয়া সৌরকলঙ্কের গহ্বরাকৃতি হয়।

সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়।

সার উইলিয়ম হার্ষেল পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শষ্য উৎপত্তির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। সেই সময়েই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং সৌর কলঙ্কের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে ততই শষ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিষুব-রেখা-সন্নিহিত প্রদেশে প্রায় ১১ বৎসর অন্তরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৌর কলঙ্কের যুগান্তর সময়ও ১১ বৎসর, সুতরাং এই দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তবে অন্য কোন প্রবল কারণাভাবে এরূপ অনুমান কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু নর্ম্মাণ লকিয়ার ও ডাক্তার হণ্টার ইহার পক্ষে বলবত্তর যে একটি কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা দ্বারা সৌর কলঙ্কের সহিত দুর্ভিক্ষের যোগ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে কি, হার্ষেলের মতের বিপরীতে ইহা দ্বারা অধিক-কলঙ্কের সময় হইতে অল্প কলঙ্কের সময়ই দুর্ভিক্ষ প্রমাণীকৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যকায়ার যে যে স্থান হইতে আলোক অদৃশ্য হয় সেই সেই স্থানে আমরা কলঙ্ক দেখিতে পাই। সুতরাং অধিক কলঙ্কের সময় অপেক্ষা, অল্প কলঙ্কের সময় সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা বিষুব-রেখা-সন্নিহিত স্থানেই সূর্য্যোত্তাপ অধিক, সূর্য্যোত্তাপের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধও সর্ব্বত্র বিদিত। বৃষ্টি হইবার জন্য তাপের আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ হইলে আবার অল্প বৃষ্টি হয়। সৌর কলঙ্কের অল্পতার সময় উত্তাপের আধিক্য বশতঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ইহা ব্যতীত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের সহিত সৌর কলঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিতই চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের আধিক্য লক্ষিত হয়। যখনি প্রবল বেগে সূর্য্যে ঘূর্ণ ঝটিকা আরম্ভ হয়, তখনি পৃথিবী-পৃষ্ঠ-স্থিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র চুম্বক শলাকা বিচলিত হয় এবং সেই সময়ে উভয়-মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

ইংলণ্ডে বাল্য বিবাহ ও বিবাহের শুভদিন।

ইংলণ্ডে ফিউডাল শাসন-প্রণালীর আধিপত্য কালে বাল্য-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল—নাইট্ রাজ্যে, পিতার মৃত্যু হইলেই যাহাতে পুত্র তাহার স্থান তৎক্ষণাৎ অধিকার করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি সন্তানের বিবাহ দেওয়া হইত। এ দেশের ন্যায়, অনেক সময় ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু দিন পরেই শিশু সন্তানের বিবাহ হইয়া যাইত; আঁতুর-ঘরেই বিবাহের বাজ্না-বাজিয়া উঠিত এবং তৎপরে সেই দুধের-পলিতা-মুখে-দেওয়া শিশুকে গির্জার দ্বারে লইয়া যাওয়া হইত। বালিকাদিগের জন্য ১২ বৎসর ও বালকদিগের জন্য ১৪ বৎসর বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত ছিল। যদিও এই আইন এখনও ইংলণ্ডে আইন-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তথাপি তাহার ব্যবহার বহুদিন রহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে এত অল্প বয়সে কেহ বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে সমাজ তাহাকে পাগ্লা-গারদে থাকিবার উপযুক্ত মনে করে।

সেকালে ইংরাজদিগের শৈশব অবস্থায় বিবাহ হইত বলিয়া, বর কন্যা নির্ব্বাচন ভার সম্পূর্ণ রূপে পিতামাতার হস্তেই থাকিত। যেমন রাজনৈতিক কারণে সে সময়ে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, আবার নীতিরক্ষার উদ্দেশেও পাদ্রিরা ঐ প্রথা সমর্থন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, লোকেরা মন্দ পথে যায় না। এখনও আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের পক্ষে কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করেন। যদিও সেই ফিউডাল কালের পক্ষে এই বাল্য বিবাহ প্রথা অনেকাংশে সুবিধাজনক ও উপযোগী ছিল, তথাপি সেই সকল বিবাহ লইয়া এক-এক সময়ে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইত। জন্ লর্ড ডেসিসের সহিত ক্যাথেরাইন ফিটজেরাণ্ডের বিবাহের সময় এইরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন লর্ড ডেসিসের বয়স ৮ বৎসর এবং ক্যাথেরাইনের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ছিল। লর্ড ডেসিস্ ১৪ বৎসর না হইতে হইতেই ক্যাথেরাইন Edward Villiersকে আবার বিবাহ করিলেন—সমাজে ঢাটী পড়িয়া গেল। বড় লোকের ঘরে এই কথা ক্রমাগত আন্দোলন হইতে লাগিল, নব-বিবাহিত স্ত্রীকে বৈধ ভার্য্যা বলিয়া গণ্য করা হইবে কি তাহাকে অপরাধিনী বিবেচনা করিয়া সমাজচ্যুত করা যাইবে। আর একটা বিবাহ-বিভ্রাট রাণী অ্যান্ ও প্রথম জর্জের সময় ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। Sir George Dowing, বয়স ১৫, তাহার পিতার সম্মতি ক্রমে, ১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যা Mary Forester এর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়েরই বিবাহ বিধি-সঙ্গত বয়সে হইয়াছিল। তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবামাত্র, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইল। বালক-স্বামী শিক্ষা সমাপ্তির অভিপ্রায়ে বিদেশ-ভ্রমণে যাত্রা করিল এবং বালিকা-স্ত্রী স্বীয় পিতৃগৃহে গিয়া লেখা পড়া শিখিতে

লাগিল। আইনের মতে যদিও তাহারা স্বামী স্ত্রী বলিয়া গণ্য, কিন্তু আর কোনও ভাবে তাহাদিগকে বিবাহিত বলিয়া বুঝা যায় না। য়ুরোপ-মহাদেশে তিন চারি বৎসর ভ্রমণের পর অল্পবয়স্ক Sir George Dowing যখন স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন, সকলেই তাহার বৈধ স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল কিন্তু তিনি তাহা মানিলেন না—সহবাস করা দূরে থাকুক তাহার মুখ দর্শন করিতেও নারাজ হইলেন! Sir George দুশ্চরিত্র ছিলেন না।—যে বয়সে তিনি নিজ কার্য্যের জন্য নিজে দায়ী নন সেই বয়সে একটা স্ত্রীকে ধরিয়া তাঁহাকে গতাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অতএব কেবল আইনের খাতিরে ওরূপ স্ত্রীর সহিত ঘরকন্না করা তাঁহার পোষাইবে না তিনি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেন। স্বামীর মনের ভাব স্ত্রী অবগত হইয়া তিনিও সুদ সমেত সেই অবজ্ঞা ও ঘৃণা স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। উভয়েরই এই এক মাত্র ইচ্ছা হইল, কি করিয়া তাহাদিগের ছাড়াছাড়ি হইতে পারে। কিন্তু আইন বলিল যে স্বয়ং ঈশ্বর দুই আত্মাকে একত্র করিয়াছেন, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে। তাহারা এই কষ্টকর বন্ধন ছেদন করিবার জন্য পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করিল, অনেক সাধ্য সাধন করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছাড়াছাড়ি হইবার অপরাধ-মূলক কারণ না থাকা হেতু পার্লামেণ্ট তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পরিলেন না। ইংলণ্ডে সেই সময়ে এই ঘটনা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আইন যদিও কঠোর ভাবে বলিল, তোমাদের মত থাক্ বা না থাক অন্যের রচিত শয্যায় তোমাদের উভয়কেই শয়ন করিতেই হইবে, কিন্তু সমাজের লোকের অনুকম্পা ঐ দুর্ভাগ্য দম্পতির উপর নিপতিত হইল। বাল্য বিবাহের পুরাতন সুবিধা সকল ভুলিয়া গিয়া এখন লোকে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া এই প্রথার উপযোগিতা বিষয়ে সন্দেহ করিতে লাগিল। সম্প্রতি আমাদের দেশেও এইরূপ বিবাহ বিভ্রাট উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারের পূর্ব্বে, বৎসরের মধ্যে কেবল ৩২সপ্তাহ বিবাহের কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল—এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিবাহ করিতে পারিতেন। যে সকল রবিবারে ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপবাস কিম্বা ভোজ নির্দ্দিষ্ট সেই সকল রবিবারের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

ধর্ম্ম-সংস্কারের পরে যদিও এই সকল নিষেধ-নিয়ম অনেক পরিমাণে উঠিয়া যায়, তথাপি সপ্তদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত (কিম্বা ততোধিক) এইরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত ছিল। এমন কি এখনও পর্য্যন্ত প্রধান একদল পাদ্রি ও প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী খৃষ্টীয়-সাধারণের মধ্যে Lent মৌশমে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এরূপ পবিত্র সময়ে বিবাহ-আমোদ উপভোগ করা তাঁহারা পাপ বলিয়া মনে করেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বড় লোকের মধ্যে এ নিয়ম আর পালিত হয় না—তার সাক্ষ্য ১৮৭১ সালের লেণ্ট মৌসমে Princess Louise-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এখনও আধুনিক ইংরাজগণ

প্রত্যেক সপ্তাহের এক একটা বিশেষ দিনকে বিবাহের অনুপযুক্ত মনে করেন! সেই সকল দিন তাঁহাদের নিকট এত পবিত্র যে তাহা বিবাহ-আমোদে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতেই কতকটা বুঝা যায়, বিবাহকে আমরা যতটা গুরুতর ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করি, ইংরাজেরা ততটা মনে করেন না—তাঁহারা বিবাহটাকে আমোদের হিসাবে দেখেন। এবং আমোদের ব্যাপার বলিয়া যেন ধর্ম্মের সহিত একটু বিরোধ আছে বলিয়া অনুভব করেন।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পণ্য গ্রহণে যে বিবাহ হইত তাহা রবিবারে হইবার নিয়ম ছিল। একটা পুরাতন গাথায় এইরূপ বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি একটা স্ত্রীকে ক্রয় করিয়া বাড়ি আনিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাকে নিকেশ করিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করে।

"কিনি কনে রবিবারে
বাড়ি আনি সোমবারে
উত্তম মধ্যম মঙ্গলবারে
শয্যাগত বুধবারে
অক্কা পেলে বিস্‌সুতবারে
গোর হল শুক্রবারে
স্ফূর্ত্তি মোর শনিবারে
কিনব ফের অন্যটারে।"

সাধারণতঃ রবিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিয়মটি ক্রম্‌ওএলের সময়ের শুদ্ধাচারী (Puritans) নামক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

মে মাসে বিবাহ করা অশুভ এই বিশ্বাস এখনও ইংলণ্ডের কোন কোন পল্লি প্রদেশে বিদ্যমান—বোধ হয় পুরাতন রোমকদিগের নিকট হইতে এই বিশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে। তাহারা মে মাস ও ফেব্রুয়ারি মাসকে বিবাহের অনুপযুক্ত কাল বলিয়া মনে করিত। ইংরাজদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে—

"বিয়ে কর মে মাসে
পস্তাতে হবে শেষে।"

যদি ও মে মাস বিবাহের অনুপযুক্ত কাল কিন্তু ফ্যূডাল কালে ঐ মাস প্রেমিকদিগের প্রেমালাপের পক্ষে প্রশস্ত কাল বলিয়া গণ্য হইত।

আমাদের দেশে যেমন বৃহস্পতিবার, ইংলণ্ডে সেইরূপ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে শুক্রবার অশুভ দিন বলিয়া গণ্য, সে দিন কোন মহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। এই বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়া এখনও অনেক মহিলা শুক্রবারে কোন ক্রমেই বিবাহ করিতে চাহেন না।

বারের শুভাশুভ লইয়া একটা ছড়া ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে:—

সোমবারে ধন
মঙ্গলে স্বাস্থ্য
বুধবার সকলের সেরা।
বৃহস্পতিতে ফাঁড়া (crosses)
শুক্রবারে ক্ষতি
শনিবারে ভাগ্য নাহি ফলে।

দেখা যাইতেছে এক সময়ে ইংলণ্ডেও বৃহস্পতিবার ফাঁড়ার দিন বলিয়া গণ্য হইত।

পুরাকালের পৈশাচ বিবাহ (অর্থাৎ চুরি করিয়া বিবাহ) উঠিয়া যাইবার পর হইতে ইংলণ্ডে রাত্রিতে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিয়ম ফ্যুডাল সময়ে ছিল—এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা নিয়ম। কিন্তু এখন ইংরাজেরা এই নিয়মটি অসুবিধাজনক ও এ-কালের অনুপযোগী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন সে-কালের আহার বিহারাদির প্রথা আলাদা ছিল—এক্ষণে অধিক রাত্রিতে গুরু ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করিয়া অত পূর্ব্বাহ্ণে আবার বিবাহের রীতিমত গুরুতর ভোজে যোগ দেওয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিতান্তই জুলুম।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানবীকরণই বটে।

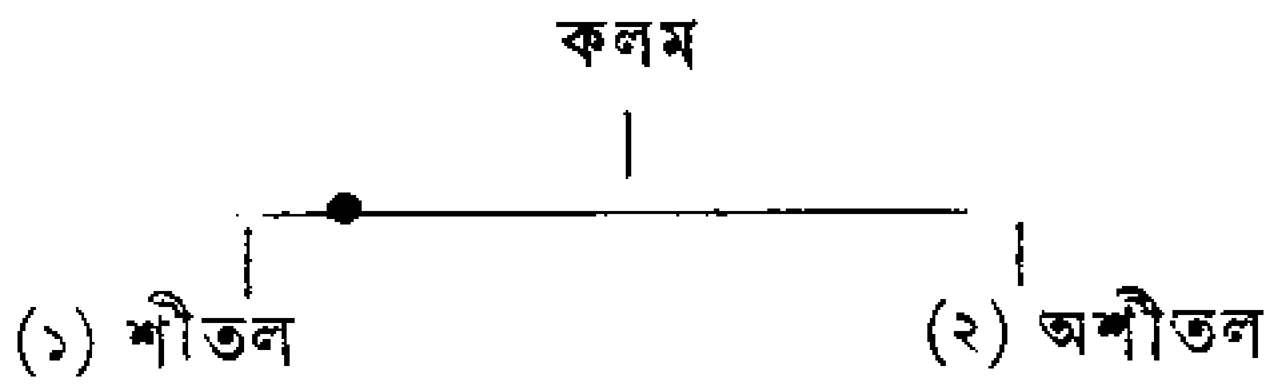
তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা অতি দীর্ঘকাল পরে আমাদের প্রতিশ্রুত প্রস্তাব লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এত বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা বিষয় কার্য্য এবং পারিবারিক পীড়া নিবন্ধন এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পরি নাই। সম্প্রতি কিছু অবকাশ হওয়াতে আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

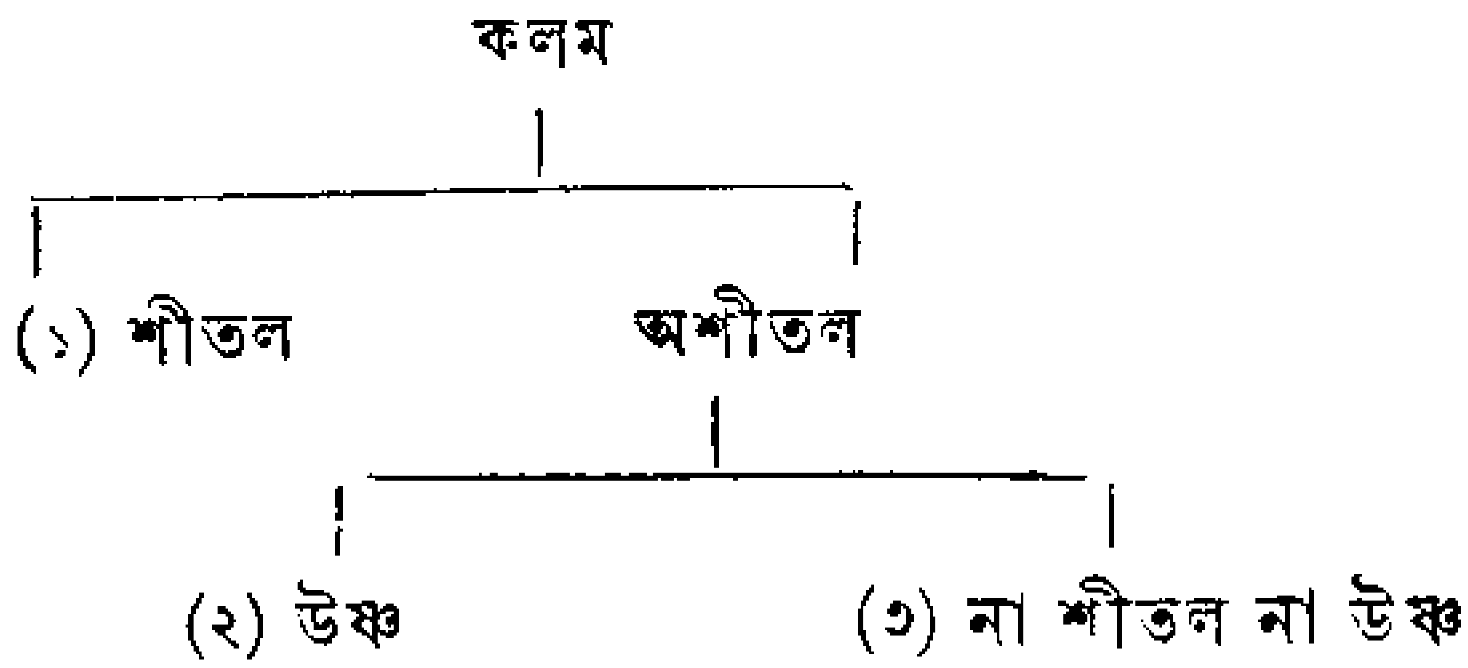
আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচনা করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলেন যে, "যাঁহারা বাস্তবিক মনে করেন যে, ঈশ্বর চেতন পদার্থও নহেন—অচেতন

পদার্থও নহেন, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ, তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই জানেন। ইত্যাদি।” এই স্থলে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে, কেবল “ঈশ্বর চেতন ও নহেন এবং অচেতনও নহেন”—এই কথার অর্থ “ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ” করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তিনি ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া ঝগড়া করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি “ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন”—এই কথার অর্থ কি “ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?” যদি আমি বলি যে, আমার হস্তের কমলটী উষ্ণও নহে এবং শীতলও নহে তাহা হইলে কি দ্বিজেন্দ্র বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, আমার হস্তে একটী উষ্ণ শীতল কমল আছে?

[প্রভাত বাবুর হস্তের কলম যদি শীতল না হয় তবে তাহা অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু অশীতল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উষ্ণ এবং (২) না শীতল না উষ্ণ। অতএব এই পর্য্যন্তই বলিতে পারা যায় যে, কলমটি প্রথম শ্রেণীর অশীতল নহে—উষ্ণ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে মূলেই অশীতল নহে, তাহা নহে; কলমটি যখন—না শীতল না উষ্ণ—তখন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলমটিকে চাই দুই শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,



চাই তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,



তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। প্রভাত বাবুর এইটি কেবল জানা উচিত যে, কলম পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্, আর শেষোক্ত তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্—উভয়-পক্ষেই এটা স্থির যে, কলমটি যদি শীতল না হয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অশীতল। এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয় তবে তাহা অনুষ্ণ; কিন্তু অনুষ্ণও দুইটি অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—

কলম

(অ) উষ্ণ — (আ) অনুষ্ণ

(আ) অনুষ্ণ: (ই) শীতল — (উ) না শীতল না উষ্ণ

স্পৃশ্য বস্তু অ আ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক, আর, অ ই উ এই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; উভয় পক্ষেই এ কথাটির এক চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা অনুষ্ণ। এ যেমন, তেমনি—সচেতন কিম্বা অচেতন যতই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হউক্ না কেন—এ কথাটি কিছুতেই টলিবার নহে যে, যাহা সচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই অচেতন ও যাহা অচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই সচেতন।

পদার্থ

(ক) সচেতন — (খ) অচেতন

(খ) অচেতন: (চ) তাড়িতাদি সূক্ষ্ম ভূত — (ট) স্থূল ভূত

পদার্থ সমূহ ক খ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও যেমন, আর, ক চ ট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তেমনি, উভয়-পক্ষেই এ কথাটি যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত যে, যে-কোন পদার্থই হউক্ না কেন তাহা যদি সচেতন না হয় তবে তাহা অচেতন। এত কথায় কাজ কি—প্রভাত বাবুর ন্যায় একজন কৃত বিদ্য ব্যক্তি অবশ্য বীজগণিত জানেন তাহাতে আর ভুল নাই। বীজ গণিতের নিয়মানুসারে এইরূপ ধার্য্য করা হউক্ যে, চেতন-পদার্থ = চে, অচেতন পদার্থ = অচে, এবং নিখিল সমস্ত—যাহার বাহিরে অন্য কোন সামগ্রীই নাই—সেই নিখিল সমস্ত = নিখি; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতনকে বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে? একজন পাঠশালার বালকও ইহার এইরূপ উত্তর দিবে যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতন অপহৃত হইলে অচেতনই অবশিষ্ট থাকে; বীজ-গণিতের ভাষায়—

নিখি — চে = অচে ; অতএব, অচে + চে =

(নিখি — চে) + চে = নিখি

(১) কিন্তু নিখিল সমস্তের বাহিরে অন্য কোন সামগ্রীই নাই।

(২) উপরে পাওয়া গেল যে, চে + অচে = নিখি।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, চে + অচে, ইহার বাহিরে অন্য কোন পদার্থই নাই; কাজেই, যে-কোন পদার্থই হউক্ না কেন—তাহা হয় চেতন পদার্থ—নয় অচেতন পদার্থ—তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রভাত বাবুর একটি কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তিনি অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই কথার অর্থ কি ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" হায়! এটাও কি প্রভাত বাবুকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে যে, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন—এ কথাও যা, আর, অচেতনও বটেন চেতনও বটেন (এক কথায়—অচেতন চেতন) এ কথাও তা—দুইই অবিকল সমান? প্রভাত বাবু তবে নিম্নে একটু প্রণিধান করুন;—এই মাত্র আমরা বীজগণিতের নিয়মানুসারে প্রমাণ করিলাম যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন এবং যাহা অচেতন নহে তাহা চেতন; অতএব—

চেতনও নহেন = অচেতন

অচেতনও নহেন = চেতন

অতএব, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন = অচেতন চেতন।

অথবা

না চেতন = অচেতন (যেহেতু না = অ)

না অচেতন = চেতন (যেহেতু দুই না = এক হাঁ)

অতএব প্রমাণ হইল যে, না চেতন না অচেতন = অচেতন চেতন। শ্রী বি]

বাস্তবিক আমরা কোথায়ও ঈশ্বরকে অচেতন চেতন পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, এক প্রকার ঈশ্বর বিশ্বাসী মনুষ্য আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই বলেন না কিন্তু এমত গুণ বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন যাহার কোনও রূপ জ্ঞান জগৎ দর্শন করিয়া উপলব্ধ করিতে পারা যায় না।

[জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ কথাটিও স্বীকার্য্য যে, জগৎ ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে—সুতরাং জগৎ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। "মানবী করণ" প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ সত্য-মাত্র, মনুষ্য—সত্য এবং জ্ঞান দুইই একাধারে, ঈশ্বর—সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত তিনই একাধারে। অতএব জগৎও সত্য, ঈশ্বরও সত্য—প্রভেদ কেবল এই যে, জগৎ অপূর্ণ সত্য ঈশ্বর পরিপূর্ণ সত্য। তেমনি, মনুষ্যও চেতন পদার্থ, ঈশ্বরও চেতন পদার্থ—প্রভেদ কেবল এই যে, মনুষ্য অপূর্ণ চৈতন্য, ঈশ্বর পরিপূর্ণ চৈতন্য। কিন্তু প্রভাত বাবু ইহার বিপরীতে এইরূপ বলেন যে, জগতের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা

ঈশ্বরেতেও আছে ; প্রভাত বাবুর এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, অস্তিত্ব বলিয়া যে একটি লক্ষণ—যাহা জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না—ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ;—যেহেতু জগতের মধ্যস্থিত কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না ! এ কিরূপ কথা ! স্বয়ং ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব নাই তবে জগতের অস্তিত্ব কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে ? জগতের সকলই তো আপেক্ষিক ; আপেক্ষিক সত্তা কি আপনার উপরে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ? তাহা যদি সে পারে—তবে আর তাহা আপেক্ষিক কিসে ? তবে তাহাই তো পূর্ণ সত্তা। আপেক্ষিক সত্তা যদি আপনার উপরে দাঁড়াইয়া নাই তবে কিসের উপরে দাঁড়াইয়া আছে ? পূর্ণ সত্তার উপরে—তাহাতে আর ভুল কি ? অতএব, জগতের সত্তা আছে বলিয়া এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বরের সত্তা নাই—তাহাতে উল্টা আরো এইরূপ প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত -চেতন এবং অচেতন ; অচেতনের সত্তাকে যদি একগুণ সত্তা বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, চেতনের সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। কেননা অচেতনের আপনার সত্তা তাহার আপনার নিকটে প্রকাশ পায় না—তাহার আপনার সত্তা তাহার আপনার ভোগে আসে না ; অচেতনের সত্তা পর-ভোগ্য। চেতনের সত্তা নিজ-ভোগ্য, কেননা চেতনের আপনার সত্তা আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। অতএব সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা

সত্তা

নিজ-ভোগ্য সত্তা | পরভোগ্য সত্তা

পরভোগ্য সত্তাতে সত্তার শুদ্ধ কেবল ভোগ্য অবয়বটিই—জ্ঞেয় অবয়বটিই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভোক্তৃ-অবয়বের বা জ্ঞাতৃ-অবয়বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই জন্য বলি যে, তাহা একগুণ মাত্র সত্তা। নিজভোগ্য সত্তা আপনিই আপনার ভোগ্য এবং আপনিই আপনার ভোক্তা—অতএব নিজভোগ্য সত্তাতে সত্তার ভোগ্য অবয়ব এবং ভোক্তৃ-অবয়ব দুইই একাধারে বর্ত্তমান ; এই-জন্য আমরা বলি যে, নিজভোগ্য সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। পূর্ব্বোক্ত রূপ একগুণ সত্তাকেই আমরা বলি অচেতন সত্তা, আর, শেষোক্তরূপ দ্বিগুণ সত্তাকেই আমরা বলি চেতন সত্তা। ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা, সুতরাং তাঁহাতে শুধু যে কেবল একগুণ সত্তাই আছে—দ্বিগুণ সত্তা নাই—ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরের সত্তা যখন পরিপূর্ণ সত্তা, তখন তিনি অবশ্য জ্ঞান-স্বরূপ। মনুষ্যেরও জ্ঞান আছে—কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে—মনুষ্যের জ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বিগুণ সত্তা অবশ্য জড়পদার্থের একগুণ সত্তা

অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, তথাপি তাহাতেও সত্তার অভাব আছে; কেবল, যিনি পূর্ণজ্ঞান তিনিই পূর্ণ সত্য, যেহেতু তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই। সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে;—জগতে আমরা দুইরূপ সত্তা অবলোকন করি নিজ-ভোগ্য এবং পরভোগ্য। জগতের মধ্যস্থিত এই উভয়-প্রকার সত্তাই আপেক্ষিক সুতরাং উভয়ই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ণসত্তাতে কোন সত্তারই অভাব নাই সুতরাং তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা নহে, তাহা পরভোগ্য অচেতন সত্তা নহে;—তাহা নিজভোগ্য চেতন-সত্তা। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন-সত্তা নহে, তাহা পরিপূর্ণ চেতন-সত্তা; কেননা পরিপূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, পূর্ণ সত্তাই চেতনাচেতন সমস্ত আপেক্ষিক সত্তার মূলাধার, আর, পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না; অতএব যিনি সর্ব্ব মূলাধার পরমেশ্বর তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ। শ্রীদ্বি]

যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু নাস্তিকতা রক্ষা করিয়া বলিতেন যে তিনি জগতে চেতন ও অচেতন এই দুই পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিটীর মূলে যে কোনও দোষ আছে ইহা আমরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতাম না। কারণ নাস্তিকগণ পার্থিব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। সেই পার্থিব পদার্থ সকল হয় চেতন, না হয় অচেতন এই দুয়ের এক হইবে।

[অনতিপূর্ব্বে আমরা কঠোর গণিত-শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, কি পার্থিব পদার্থ কি অপার্থিব পদার্থ—সকলই—যে-এক নিখিল সমস্তের অন্তর্ভূত, সেই নিখিল সমস্ত হইতে চেতন পদার্থ অপহৃত হইলে শুদ্ধ কেবল অচেতন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে; অতএব ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, যাহা চতুষ্কোণ নহে তাহা অচতুষ্কোণ, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। শ্রীদ্বি]

পরন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন আপনাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন তখন অন্যবিধ আস্তিক গণ যে, বাস্তবিক ঈশ্বরকে কি বলিয়া মনে করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান না করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

[সাধারণতঃ সকল আস্তিকই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ; তবে যদি এক আধ জন আস্তিক উহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে তাহার উত্তর আমাদের যাহা দিবার তাহা আমরা যথেষ্টই দিয়াছি। আমরা বারম্বার প্রতিবাদীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন সত্যের পূর্ণতা হয় না, আর, পূর্ণ সত্যের আশ্রয় ব্যতীত আপেক্ষিক সত্যের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শ্রীদ্বি]

এখন ডাঃ ড্রিস্ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উক্তরূপ বিশ্বাসের কোনও যুক্তি আছে কি

ইন্দ্রিয় সমুদয়ই আছে। যদি তোমাকে ইন্দ্রিয় কয়টী—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তুমি দর্শন, শ্রবণ আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিবে। কিন্তু জোঁক বা শকুনি যদি কথা কহিতে এবং আমার কথা বুঝিতে পারিত এবং আমি যদি উহাদিগকে কয়টী ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তাহার কি উত্তর প্রাপ্ত হইতাম? জোঁক সম্ভবতঃ বলিত যে, ইন্দ্রিয় তিনটী এবং শকুনি বলিত যে তাহা ৪টী মাত্র। জোঁক ও শকুনির এমত উত্তর দিবার কারণ কি? বাস্তবিক সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। জোঁকের জ্ঞানে ৩টী এবং শকুনির জ্ঞানে ৪টী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে। তদ্রূপ মনুষ্যের মতেও ৫টী মাত্র ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইহাই কি অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত? পাঠক! তুমি পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় দেখ না বলিয়াই কি নিশ্চয় বলিতে পার যে কোন ষষ্ঠ বা সপ্তম ইন্দ্রিয় নাই? এখন মনে কর চেতন এবং অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থ মাত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা হইলেই কি তোমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলা উচিত যে এই দুয়ের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ হইতে পারে না? কোন অতিরিক্ত পদার্থ যে নাই তাহা তুমি কিরূপে অবগত হইয়াছ? তোমার নিজের জ্ঞানই কি জগতের সীমা?

[আমার না হয় পাঁচটা ইন্দ্রিয়, আর এক জনের না হয় দশটা ইন্দ্রিয়; আমার না হয় হিমবিন্দু-পরিমাণ জ্ঞান, আর এক জনের না হয় সাগর-পরিমাণ জ্ঞান; সে কথা এখানে হইতেছে না। এখানে কথা হইতেছে কেবল এই যে, অচেতন চেতন পদার্থ কেবল যে, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, তাহা নহে, তাহা সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য। যেমন, দু-কুড়ি পঞ্চাশ, মাথা নাই মাথা ব্যাথা, পরিধি-বিহীন চক্র, সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য, অচেতন চেতন সেইরূপ একটা নিতান্তই অর্থশূন্য অসঙ্গত কথা। কোন এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি একটা কথা বলে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটি আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু এক জন পাগল যদি একটা প্রলাপোক্তি করে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটা কিছু আর আমার বুদ্ধির দোষ নহে, তাহার সে প্রলাপোক্তির ভিতর বুঝিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। একজন দেবতা আসিয়া যদি আমাকে বলেন যে, "আমার পঞ্চাশ ইন্দ্রিয় এবং তাহাতে আমি এত বিচিত্র বিষয় অবলোকন করি যে, তাহা তোমার স্বপ্নের অগোচর; তুমি যদি চাও, তবে তোমাকেও আমি সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারি"; তবে আমি তাঁহাকে বলি যে, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু যদি আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলে যে, আমার ধ্যান-চক্ষু এমনি প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা আমি তমোময় আলোক, অচেতন চেতন, জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে তাঁহাকে আমি বলি যে "এই বই নয়? এ তো অতি সামান্য বিষয়; আমি এক ব্যক্তিকে জানি—তিনি সোণার পাথরে ভাত

খান ; তিনি হস্ত-পদ-বিহীন অথচ অসি-যুদ্ধে এমনি সুনিপুণ যে, বড় বড় যোদ্ধারা তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না ; তিনি একেবারেই মূক ও বধির, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত যদি একবার শোনো তবে সেই দণ্ডেই মোহিত হইয়া যাও।" এ সকল কথার কি কোন মাথা আছে, না মুণ্ড আছে ? অচেতন চেতন পদার্থ এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা! আগে একটা কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহার পরে তবে তো তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার হইবে—কিন্তু "অচেতন চেতন" এ কথাটির মূলেই কোন অর্থ নাই ;—অতএব মিছামিছি আর কেন! যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন—এই সহজ সত্যটি একজন বালকেও বুঝিতে পারে ; আর, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন নহে—ইহা স্বয়ং বৃহস্পতিও বুঝিতে পারেন না—যেহেতু ইহা অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রীদ্বি]

তবে তুমি বলিতে পার যে, চেতন ও অচেতন এই দুই ভিন্ন যে কোন তিন হইতে পারে তাহা আমি চিন্তাই করিতে পারি না। তাহা হইলে শকুনিও তো বলিতে পারে যে, চারির অধিক যে ইন্দ্রিয় হইতে পারে তাহা সে চিন্তা করিতেও পারে না। শকুনির এই উক্তি কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে ?

[শকুনি যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান জীব হইত তবে সে এইরূপ বলিত—"আমার পক্ষ আছে বলিয়াই যে, সকল জীবেরই পক্ষ থকিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই ; তেমনি আমার চারিটির অধিক ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া যে, সকল জীবেরই সেইরূপ হইতেই হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই ; কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, কোন জীবেরই অনিন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এরূপ একটা অবয়ব থাকিতে পারে না—যাহা ইন্দ্রিয়ও নয়—অনিন্দ্রিয়ও নয়। শ্রীদ্বি]

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবগত আছে বলিয়াই শকুনির কথা স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এমন কি কেহ আছে যে, সে চেতন ও অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে ?

[যে ব্যক্তি বলে যে, আমি শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া অনুভব করিয়াছি, আর, যে ব্যক্তি বলে যে, আমি চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত পদার্থ—অচেতন চেতন পদার্থ—দেখিয়াছি, উভয়েরই কথা সমান বিশ্বাস-যোগ্য। যাঁহারা শব্দের কাঙ্গালী কিন্তু অর্থের কোন ধারই ধারেন না, তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অর্থ-শূন্য প্রলাপোক্তি শোভা পায়। শ্রীদ্বি]

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য অনেকেই আছে। বাস্তবিক আস্তিকগণই এরূপ মনুষ্য। দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজেই এরূপ অতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বাসকারী আস্তিক। যদি আমি একটী আম্র-অষ্টি হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা চেতন না অচেতন ? তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে ইহা অচেতন বস্তু।

কিন্তু যদি আবার জিজ্ঞাসা করি যে, এই আম্র-অষ্টি ভূমিতে রোপণ করিলে যে, তাহা হইতে আম্র-বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা কে উৎপাদন করে? চেতনে? না, অচেতনে? দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার কি উত্তর দিবেন তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

[আমরা তো গত বারেই ইহার উত্তর দিয়া চুকিয়াছি, যথা;—বৃক্ষোৎপত্তির মূল কারণ পরমাত্মা তিনি সচেতন; বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতি—তাহা অচেতন। যিনি চেতন তিনি চেতন—যাহা অচেতন তাহা অচেতন; চেতনও অচেতন নহে—অচেতনও চেতন নহে। শ্রীদ্বি]

তবে এইস্থলে আমরা রামানুজ দর্শনের পদার্থ বিভাগের কথা উল্লেখ করিতেছি। রামানুজ মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর। দ্বিজেন্দ্র বাবু রামানুজের এইরূপ পদার্থ বিভাগের কি অর্থ করিবেন? যদি তিনি বলেন যে এইরূপ পদার্থ বিভাগের কোনও ভিত্তি নাই, তাহা হইলে ভরসা করি তিনি এরূপ উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।

[রামানুজের ঐ কথাটি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর ইহার অর্থ আস্তিক মাত্রেই এইরূপ বুঝেন যে, চিৎ কিনা অল্পজ্ঞ জীব চৈতন্য, অচিৎ কিনা অচেতন জড়পদার্থ, ঈশ্বর কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ চৈতন্য। মানবী-করণ প্রবন্ধে এ তিনের প্রভেদ আমরা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি, যথা;—অচিৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং; চিৎ—সত্যং জ্ঞানং; ঈশ্বর—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শ্রী দ্বি]

এই তো গেল আস্তিকের কথা। নাস্তিকের মতে চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে কি না? নাস্তিক বাস্তবিক অচেতনের অতিরিক্ত কোনও পদার্থই স্বীকার করে না তাহার মতে চেতনা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু চেতন ও অচেতন জড়পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। একই মানব দেহ এক সময়ে চেতন এবং আর এক সময়ে অচেতন পদার্থ বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ অবস্থা যে কেবল জীবন থাকিতে এবং মৃত্যু হইলেই হয় এমত নহে, জীবিত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়েও হইয়া থাকে।

[এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহ মূলেই চেতন পদার্থ নহে—দেহীই চেতন পদার্থ—আত্মাই চেতন-পদার্থ। আর, দেহের যে কোন অবস্থাই হউক্ না কেন—সেই অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই চেতন পদার্থ, সে অবস্থা নিজে চেতন পদার্থ নহে, কেননা অবস্থার সাক্ষী অবস্থা হইতে ভিন্ন। শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু অন্য এক স্থলে "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন" এই বাক্যকে আলঙ্কারিক ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তদুপলক্ষে বলেন যে, "প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, এরূপ আলঙ্কারিক ভাষা এক শোভা পায় কবিতাতে—

আর শোভা পায় ঘরাও কথা বর্ত্তায় —এ ভিন্ন বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে তাহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।"

[শুধু যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা নহে, উহার প্রমাণও দেখাইয়াছি ; যথা ;—যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বর অচেতনও নহেন এবং আমাদের ন্যায় অপূর্ণ চেতনও নহেন ; কিন্তু ঈশ্বর যে, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে, পরিপূর্ণ চেতন, ইহা তাঁহারা নিজ মুখেই স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার ব্যক্ত করিয়াছেন। তবেই হইতেছে যে, "ঈশ্বর অচেতনও নহেন চেতনও নহেন" এটা কঠোর বৈজ্ঞানিক ভাষা নহে কিন্তু ভাবে বুঝিয়া লইবার ভাষা—আলঙ্কারিক ভাষা। শ্রীদ্বি।]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বাক্য হইতে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিতেছি যে, ডাঃ ড্রিস্‌ডেল ও মেং প্রকটারের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আর যদি আমরা তাহা সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকি তবে এরূপ ভাষা বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আমরা বিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু বুঝি এবং তত্ত্বজ্ঞান এমন কঠিন বিষয় যে তাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশই করিতে পারে না। অতএব এতদ্রূপ ভাষা বিজ্ঞানের অনুগত কি না তাহা আমরা সত্বরেই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলিব না।

আমরা ডাক্তর ড্রিস্‌ডেল এবং মেং প্রক্টারের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছি কি না প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। ডাঃ ড্রিষ্‌ডেল "প্রোটোপ্লাজ্‌মিক থিওরী অব্ লাইফ" নামক গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ;—"I am content to belive in no God, angel, or spirit, or the immortal soul of man except as made known to us through the miraculous specific revelation contained in our scriptures. At the same time these beings are of a nature to us wholly incomprehensible and inconceivable. The cardinal doctrines of revealed religion are thus dogmas, not resting on any proofs derived from observation or science at all. These dogmas are also mysteries, not only incapable of scientific proof or disproof, but also above and beyond the comprehension of the human intellect."

এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ অতি কঠিন বোধ হওয়াতে আমরা এস্থলে স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। বাইবলের প্রকাশিত ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর, অথবা প্রেত, বা অমর মানবাত্মা ভিন্ন আমি আর কোনও ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর আদিতে বিশ্বাস করি না। আবার এই সমস্ত ব্যক্তির প্রকৃতি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অবোধ্য এবং অননুভবনীয়। আর বাইবল প্রকাশিত ধর্ম্মের মূল সত্য সকল এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ বা বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোনও প্রমাণের উপর সংস্থিত নহে। এই সমস্ত মত প্রকৃত রূপে এমন

রহস্য যাহা যে, কেবল বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত বা অপ্রমাণ হইতে পারে না এমত নহে, তাহা আবার মানব বুদ্ধির অগম্য।

মেং প্রক্‌টার ১৮৮৭ সালের জুলাই সংখ্যা "নলেজ" নামক পত্রিকার ১৯৭ পৃষ্ঠায় আপনাকে এক প্রকার অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া স্বীকার করেন এবং আরো বলেন যে, "A God understood is no God at all" পরিজ্ঞাত ঈশ্বর ঈশ্বরই নহে। এরূপ ভাষাকে সরল ভাব ব্যঞ্জকই বলা যাইবে, না অলঙ্কার যুক্তই বলা যাইবে তাহা পাঠক-বর্গই বিচার করিবেন।

[ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন—শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন—রামানুজ কি বলিয়াছেন—প্রক্টর তাহার বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ করেন নাই;—কেনই বা করিবেন! আমরাও প্রক্টর কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করি নাই—করিতে চাহিও না। কোন্ আস্তিক কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া বলা মানবীকরণের উদ্দেশ্যই নহে; শুদ্ধ কেবল এইটি প্রমাণ করাই মানবীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ বা সর্ব্বজ্ঞ বলিলে মানবীকরণের দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, আর, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন বলা মানবীকরণই বটে; ডিস্‌ডেল-সম্মত বাই-বেল শাস্ত্র অনেক স্থানে এইরূপ মানবীকরণ দোষে লিপ্ত হইয়াছে। মানবী-করণ প্রবন্ধের একটিও কোন কথায় প্রভাত বাবু যদি কোন প্রকার যুক্তি-দোষ দেখিয়া থাকেন তবে তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন্—তাহার আমরা উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি এ'র ও'র তা'র দোহাই দেন কেন? আমরা বীজ-গণিতের নিয়মানুসারে—অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-অনুসারে—দেখাইয়াছি যে, চেতনও নহে অচে-তনও নহে=অচেতন চেতন—যাহার কোন অর্থই হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Reductio ad absurdum অর্থাৎ অর্থ-শূন্য প্রলাপ বাক্যে পরিসমাপ্তি! প্রক্টর বা অন্য কেহ যদি আমাদের এই অকাট্য যুক্তির কোন প্রকার প্রতিযুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে সেই প্রতিযুক্তিটি যে, কি, প্রভাত বাবু নিজেই তাহা আমা-দিগকে বলুন না কেন, তাহা হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদেরও যাহা বলিবার আছে আমরা তাহা বলিতে পারি—তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু প্রভাত বাবু সেরূপ কোন প্রতিযুক্তির কথাই উল্লেখ করিতেছেন না—কেবল বলিতেছেন যে, প্রক্টরের মতানুসারে অচেতন চেতন থাকিলেও থাকিতে পারে। গণিত-শাস্ত্রীয় অকাট্য যুক্তি আমা-দের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—প্রক্টর প্রভৃতির শুদ্ধ কেবল একটি মুখের কথা প্রভাত বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—এখন জিজ্ঞাসা করি যে, অকাট্য যুক্তি বড় না মুখের কথা বড়? পাঠক কি বলেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এইটিই বিচার সঙ্গত মনে হয় যে, যুক্তি-হীন মুখের কথা অপেক্ষা অকাট্য যুক্তির মূল্য শত সহস্র গুণ অধিক। তবে, প্রক্টর

অর্থ স্বতন্ত্র; ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে,- ঈশ্বরকে আমরা রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না—এ নহে যে, ঈশ্বরকে আমরা সচেতন বলিয়াও জানি না। ক্ষুদ্র বালক অবশ্য পিতার মনের ভাব রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু পিতা যে সচেতন ইহা সে খুবই জানে—ইহাও জানে যে, তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ, আস্তিক মাত্রই জানেন যে, ঈশ্বর সচেতন এবং তদপেক্ষা অনন্ত-গুণে অধিক—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন্ আস্তিক এত বড় একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে উচ্চারণ করিতে—এমন কি মনের এক কোণেও স্থান দিতে—আপনাকে পাপ-ভারে প্রপীড়িত মনে না করেন যে, ঈশ্বরকে আমি রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিয়াছি? আর-একদিকে এইরূপ দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ দে'ন যে, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, Seek and ye shall find, অন্বেষণ কর—পাইবে; ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টে কি মনে হয়? ইহাই মনে হয় যে, পিতার মনের ভাব আমি সমস্তই বুঝি—ইহাই বালকের অনুচিত স্পর্দ্ধাবাক্য; কিন্তু পিতার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা উল্টা আরো বালকের কর্ত্তব্য; এবং যত সে চেষ্টা করিবে ততই তাহার চক্ষু ফুটিবে। এইরূপ, ঈশ্বরকে যতই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব ততই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; এ ভিন্ন, অনন্ত পরব্রহ্মের অন্ত কেহ কখন পায়ও নাই পাইবেও না। অতএব ঈশ্বরকে রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; উহা কেহ করেও নাই করিবেও না—ইহা আস্তিক মাত্রেই করিয়া থাকেন। অতএব ইহা যেমন সত্য যে, A God understood is no God at all, ইহাও তেমনি সত্য যে, A God without knowledge is no God at all.

শ্রীদ্বি]

এখন মনে করা যাউক যে ডাং ড্রিস্‌ডেল এবং মেং প্রকটারের ভাষা আলঙ্কারিকই বটে। তাহা হইলে আমরা যে, ঈশ্বরকে চেতন এবং অচেতন ইহার কিছুই নহে বলিয়াছি তাহা বিজ্ঞান অনুগত কি না সে বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। এই কথা হইতে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে। ১। বিশিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলে? এবং ২। কি বিষয়ের জ্ঞান? হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মতে "সামান্য জ্ঞানের উচ্চতর বিকাশের নাম বিজ্ঞান।" এই সংজ্ঞাও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইলে "সামান্য জ্ঞান" এবং "উচ্চতর বিকাশ" এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। সামান্য জ্ঞান বলিতে এমত জ্ঞান বুঝা যায়, যাহা কোন বস্তু দর্শনে সহসাই উদিত হয়। যথা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করিলে সহসা এই প্রতীতি জন্মে যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই সামান্য জ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান নহে। কারণ ইহা প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে, বিজ্ঞানের

উন্নীত হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী এত বৃহৎ এবং সূর্য্য এত দুরবর্ত্তী যে উহাদিগকে পরীক্ষার অধীন করিয়া উক্ত সামান্য জ্ঞানকে বিকসিত করা সহজ কার্য্য নহে। এজন্য এস্থলে কেবল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্ব্ব প্রথমে কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই এই সামান্য জ্ঞানকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই প্রমাণ এই ঃ—গ্রহ ও নক্ষত্রগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যহ উদিত এবং অস্তগত হয়। এই হেতু গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ সূর্য্যের পর্য্যটনের প্রমাণ মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে, কেবল পৃথিবীকে দৈনিক প্রদক্ষিণ করে এমত নহে উহারা বাস্তবিক বার্ষিকও পরিবেষ্টন এবং তদতিরিক্ত গ্রহগণ আবার স্থির নক্ষত্র মধ্যে নানা রূপ বিশৃঙ্খল ভাবে পর্য্যটন করিয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের এতদ্রূপ গতির সহিত সূর্য্যের পরিভ্রমণের তুলনা করিলে আর পৃথিবীকে সূর্য্যের দৈনিক প্রদক্ষিণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারে না। তখন ইহা পরিশোধিত হইয়া এই-রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে, পৃথিবীই ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। ইহারই নাম বিশিষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত জ্ঞান, সুতরাং তখন উহা বিজ্ঞান নামে অভি-হিত হইয়া দাঁড়ায়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন্ বিষয়ের জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান? যখন সামান্য জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা পরিশোধিত হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হয়, তখন তাহা এমত বিষয়ের হওয়া চাই, যাহার উপর পরীক্ষা ও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থই পরীক্ষণীয় ও প্রমেয় বস্তু। অতএব জড় পদার্থের জ্ঞানই বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক এক মাত্র জড় পদার্থই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু জ্ঞান আমরা উপলব্ধ করি তাহা জড় পদার্থের মাত্র। এজন্য আমরা কোনও কথাই চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি না যাহা এ জড় জগতে কদাপি দর্শন আদি করিতে পারি নাই।

[আমি স্বচ্ছন্দে চিন্তা করিতে পারি যে, প্রভাত বাবু আমার লিখিত এই কথাটি বুঝিতেছেন; অথচ, জড় জগতের কোন স্থানেই আমি বোধ-ক্রিয়ার চিহ্ন মাত্রও দেখি নাই—চেতন রাজ্যেই আমি বুদ্ধি ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি। সভ্য মনুষ্য-মাত্রেই বারো আনা অংশ চেতন লইয়াই ব্যাপৃত থাকে—কেননা তাহার পরিবার বর্গ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই চেতন-পদার্থ। জন-শূন্য উপদ্বীপের রবিন্‌সন্ ক্রুসো—যাঁহার ত্রিসংসারে কেহই ছিল না, তিনিও মানব-চেতনের জন্য হাহাকার করিয়া কাল-যাপন করিতেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, মনুষ্যের চিন্তা শুদ্ধ কেবল জড়জগতেই আবদ্ধ। প্রভাত বাবু বলিতে পারেন যে, লোকের কথাবার্ত্তা শুনিলে এবং কার্য্যাদি দর্শন করিলে তবেই আমরা তাহাদের বুদ্ধি ক্রিয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হই ;—কিন্তু

কথাবার্ত্তা মুখের বায়ু-মাত্র ও আচার ব্যবহার অঙ্গ-চালনা মাত্র, সুতরাং দুইই জড়জগতের অন্তর্গত। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমাদের নিজের নিজের বুদ্ধি-ক্রিয়াকে চেতন-রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি না করিতাম তবে অন্যের বুদ্ধি-ক্রিয়া আমাদের ধ্যানের অগোচর হইত। অতএব বুদ্ধি-ক্রিয়াকে যখন আমরা আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, তখন চেতন রাজ্যেই তাহাকে আমরা উপলব্ধি করি। বুদ্ধি-ক্রিয়া তো দূরের কথা—সামান্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও চেতন-জগতের অন্তর্গত; ধর যেন—উত্তাপ; উত্তাপ অবশ্য জড়জগতেরই অন্তর্গত; তাহা এক প্রকার আণব (Molicular) গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে—সুতরাং তাহা ভৌতিক ক্রিয়া; কিন্তু উত্তাপ যেমন ভৌতিক ক্রিয়া উত্তাপের অনুভবও কি সেইরূপ ভৌতিক ক্রিয়া? কখনই না—উত্তাপের অনুভব এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া সুতরাং তাহা চেতন-জগতেরই অন্তর্গত। শ্রীদ্বি]

যদি সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধ শূন্য হয়, তবে তাহা সামান্য জ্ঞান এবং কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধযুক্ত হইলেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত।

এখন ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই বাক্যটী বিজ্ঞানের অনুগত কি না আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জগতে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ পদার্থ মাত্র বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি চেতনের স্বাধীন বিদ্যমানতা কে দর্শন করিয়াছে? তাহা কি অচেতন জড় পদার্থের আশ্রয় ভিন্ন স্বাধীন অবস্থায় দর্শন করিতে পারা যায়? যদি উহা জড় পদার্থে ভিন্ন স্বাধীন ভাবেই দৃষ্টি-গোচর না হয় তবে তাহা যে জড় পদার্থেরই গুণ নহে ইহা কে প্রতিপাদন করিতে পারে? বস্তুত্বের লক্ষণ কি? যাহা এখন আছে, পরক্ষণে নাই, পরে আবার দেখা দেয় এবং পুনরায় অন্তর্হিত হয় তাহাকে কি বস্তু বলা যাইতে পারে? যথা, বীণা যন্ত্রের ধ্বনি। তাহা এই উৎপন্ন হইল, এই রহিত হইয়া গেল, আবার উৎপন্ন হইল এবং পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হইল। এরূপ ধ্বনি কি বাস্তবিক কোন বস্তু, না তাহা ক্রিয়া বিশেষের প্রকাশিত ফল? বিজ্ঞান মতে ইহা ক্রিয়া বিশেষের ফলই বটে। পাঠক! এখন চিন্তা করিয়া দেখ দেখি বীণা ধ্বনির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি না? চৈতন্য এই আছে, এই নাই, আবার আসিল এবং পুনরায় অন্তর্হিত হইল। এতদ্রূপ পুনঃ পুন বিনাশশীল চৈতন্য কি স্বাধীন বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ইহা কি ধ্বনির ন্যায় ক্রিয়া বিশেষের ফল নহে?

[কালিকের বীণা ধ্বনি ভিন্ন, এবং আজিকের বীণাধ্বনি ভিন্ন; কিন্তু যে প্রভাত বাবু প্রথম সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক, সেই প্রভাত বাবুই তৃতীয় সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক—প্রভাত বাবু একই প্রভাত বাবু; পাঠক কি বলিবেন যে, না তাহা নহে—কালিকের তোপধ্বনি যেমন আজিকের তোপধ্বনি নহে, তেমনি কালিকের সে প্রভাত বাবু আজিকের এ প্রভাত বাবু নহে? কল্যও আমি সুখে ছিলাম—অদ্যও আমি সুখে

আছি; অদ্যকার সুখের অবস্থা কল্যকার সুখের অবস্থা হইতে ভিন্ন, কেননা, কল্যকার সে সুখ অদ্যকার এ সুখ নহে; কিন্তু অদ্যকার আমি কল্যকার আমি হইতে ভিন্ন নহি, কেননা কল্যকার সেই আমিই অদ্যকার এই আমি। "আমার বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী-স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা কি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন? না ধ্রুব পদার্থের ন্যায় সকল মুহূর্ত্তেই একই অভিন্ন?" এ কথা পাঠককে জিজ্ঞাসা করাও যা', আর, এ কথাও তা, যে, "আমার কি জিহ্বা আছে—না মূলেই আমার জিহ্বা নাই? —একবার দেখ তো হে বাপু!" যদি আমার জিহ্বা না থাকিত তবে আমি ও-কথাটি উচ্চারণ করিতেই পারিতাম না। প্রভাত বাবুর সাক্ষী চৈতন্য যদি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন হইত, তবে কে-ই বা পাঠককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে—কাহাকেই বা পাঠক উত্তর প্রদান করিবেন? পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের প্রভাত বাবুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; পর-মুহূর্ত্তের আর-এক প্রভাত বাবুকে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া ফল কি? যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকে উত্তর প্রদান করাই তো বিধেয়! ইহাকেই বলে Reductio ad absurdum! আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানের মূল প্রদেশে এরূপ কতকগুলি সত্য রহিয়াছে যাহা একেবারেই অকাট্য এবং অপরিবর্ত্তণীয়—যেমন পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—পরিপূর্ণ সত্য অপূর্ণ সত্যের আশ্রয়—ইত্যাদি; সুতরাং জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ মূল প্রদেশটি পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহা জানে না। জ্ঞানের প্রান্ত-স্থানীয় শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাই পরিবর্ত্তন-শীল—কিন্তু জ্ঞানের কেন্দ্র-স্থানীয় আত্মা অটল এবং অপরিবর্ত্তনীয়; যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের কেন্দ্র যেখানকার সেইখানেই থাকে, কিন্তু তাহার পরিধির প্রত্যেক অংশ ক্রমাগতই স্থান পরিবর্ত্তন করে—উহাও সেইরূপ। প্রভাত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীব চৈতন্য স্বাধীন কি না? ইহার উত্তর এই যে, জীব-চৈতন্য কোন্ অংশে স্বাধীন কোন্ অংশে পরাধীন—ইহা প্রতি মনুষ্যেরই আপনি বুঝিবার কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে; লোহার সিন্ধুকের মধ্য হইতে টাকা বাহির করিয়া দর্শনার্থী ব্যক্তিকে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতাকে বক্ষ চিরিয়া বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না; তবুও যদি বল যে, আত্মার স্বাধীনতার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এইরূপ যথা;—আপনার অধীনতাই স্বাধীনতা, অন্যের অধীনতাই পরাধীনতা; পরাধীনতা জড়জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাধীনতা জড়জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না;—তবে "স্বাধীনতা" এ কথা আমরা পাইলাম কোথা হইতে? অবশ্য আমরা আপনার অভ্যন্তরে কোন-না-কোন-প্রকার স্বাধীনতার ভাব উপলব্ধি করি, তাই সেই ভাবটি অন্যের নিকটে জ্ঞাপন করিবার জন্য "স্বাধীনতা" এই শব্দটি ব্যবহার করি। "আমি আপনি যাহা বুঝি—তাহা আমি প্রভাত বাবুকে বুঝাইব" আমি আপনিই এইরূপ একটি নিয়ম স্থির করিয়াছি এবং আমার আপনার সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি অদ্যকার এই প্রস্তাবটি

লিখিতেছি;—তাই আমি বলি যে, আমি স্বাধীনভাবে লিখিতেছি। কিন্তু এক অংশে যেমন আমি স্বাধীন—আর এক অংশে তেমনি আমি পরাধীন; দোয়াত কলম না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—আমার শরীর সুস্থ না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—ইত্যাদি। অতএব, স্বাধীনতার ভাব আমি আপনার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটাও আমি জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বোতো ভাবে স্বাধীন নহি;—কোন আপেক্ষিক সত্যই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে সুতরাং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে; পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। শ্রী দ্বি]

ধ্বনির সহিত চৈতন্যের সাদৃশ্য যে এই স্থলেই শেষ হইয়াছে এমত নহে। ধ্বনির উৎপত্তি জন্য যেরূপ বীণা এবং বাদক আবশ্যক, চৈতন্যের উদ্রেক জন্যও মস্তিষ্ক এবং আলোক আদি উত্তেজন আবশ্যক। ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞানেরই কথা, কল্পনার কথা নহে। মস্তিষ্কই যে বাস্তবিক চৈতন্যের যন্ত্র ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া আমরা ডাং ফেরিয়ার কৃত "মস্তিষ্কের ক্রিয়া" নামক গ্রন্থের ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে নিম্ন লিখত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত স্বতঃসিদ্ধ। মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে যে চৈতন্যের কোনও অবস্থার স্বাতন্ত্র্য আছে এমত প্রমাণ নাই। পরন্তু কোন কিছু যে (মস্তিষ্কে) অতিরিক্ত সংযুক্ত আছে অথবা সরলতম স্নায়বিক যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে যে বাল্কল (cortical) কেন্দ্র সকলের ক্রিয়ার কোন পার্থক্য ভাব আছে তাহাও বিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কিন্তু সরলতম প্রতিক্ষেপিকা ক্রিয়া এবং জটিলতম মানসিক কার্য্য মধ্যে যে ধারাবাহিক অচ্ছিন্ন প্রকার (gradation) আছে তাহারই বরং প্রমাণ পাওয়া যায়।"

[মস্তিষ্ক যে, একটা যন্ত্র, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু মস্তিষ্ক কাহার যন্ত্র? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন—যন্ত্রী যন্ত্র হইতে ভিন্ন। আলোক কাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য আলোক এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। সরলতম স্নায়বিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা, আর, জটিলতম কৈন্দ্রিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা? না সাক্ষী-চৈতন্য; সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য স্নায়বিক এবং কৈন্দ্রিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। অতএব প্রভাত বাবু ঐ সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষী চৈতন্যকে জড়াইয়া ঝোলে অম্বলে মিশাইবেন না। শ্রী দ্বি]

আলোক আদির উত্তেজন ব্যতীত যে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। আমাদের শারীরিক প্রকৃতি এরূপ দেখা যায় যে, কিছু কাল পরিশ্রম করিলে শ্রম শক্তি ক্রমে লাঘব হইতে থাকে, অবশেষে এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। তখন সমুচিত কাল বিশ্রাম না করিলে আর শ্রমক্ষম হইতে পারা যায় না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, বিশ্রাম দ্বারা স্নায়ু ও

মাংসপেশীতে এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত শক্তির বিকাশ প্রভাবেই পরিশ্রম করিতে পারা যায় এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার ক্ষয় হইলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। (শারীর বিধান বিদ্যা মতে পরিশ্রম দ্বারা এক প্রকার ক্লান্তিজনক পদার্থও মাংসপেশীতে উৎপন্ন হইয়া পরিশ্রম শক্তি লাঘব হয়। সুতরাং ক্লান্তিজনক পদার্থের উৎপত্তিও পরিশ্রম শক্তি লাঘবের এক উপাদান।) চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চেতনা থাকিলে চিন্তা শক্তির কিছু না কিছু চালনা হয়ই হয়। তদ্ধেতু সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, নিদ্রিত হইয়া সমুচিত বিশ্রাম না করিলে সুবিধা ও শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করা দূরে থাকুক দীর্ঘকাল জাগ্রৎ থাকিতেও পারা যায় না। এই হেতু চিন্তা করিবার এবং চেতন থাকিবার জন্যেও মস্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ প্রকার শক্তি সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ পেশী মধ্যে ক্লান্তি-জনক পদার্থ জন্মে মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সেইরূপ কোন পদার্থ মস্তিষ্ক মধ্যে উৎপন্ন হয় এমত প্রমাণ নাই। অতএব কেবল মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষয়ই চিন্তা ও চেতনা শক্তি লাঘবের একমাত্র কারণ।

[অত কথা না বলিয়া এক কথায় বলিলেই হয় যে, শরীর ভাল থাকিলেই চিন্তা-শক্তি রীতিমত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। কিন্তু বাহ্য বস্তুও যেমন—মানসিক চিন্তাও তেমনি—উভয়ের কোনটিই সাক্ষী চৈতন্য নহে; হস্তীও আমি নহি—হস্তি-চিন্তাও আমি নহি; শরীরও আমি নাহি—শরীর-চিন্তাও আমি নহি, তবে কি? না সেই সকল বস্তুর এবং সেই সকল চিন্তার সাক্ষী পুরুষই আমি-শব্দের বাচ্য। সাক্ষী চৈতন্য সাদা বস্তু দেখিবার সময় সাদা হয় না—কালো বস্তু দেখিবার সময় কালো হয় না; দুই বস্তু দেখিবার সময় দুই হয় না—তিন বস্তু দেখিবার সময় তিন হয় না; সাক্ষী চৈতন্য হস্তি-চিন্তার সময়েও হস্তী হয় না—অশ্ব-চিন্তার সময়েও অশ্ব হয় না; বস্তু-বৈচিত্র্যে সাক্ষী-চৈতন্যের বৈচিত্র্য হয় না; সুতরাং চিন্তার হ্রাস বৃদ্ধিতে সাক্ষী চৈতন্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাক্ষী চৈতন্য আপনার সতেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী—নিস্তেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী। নিদ্রাকর্ষণের সময় তো চিন্তাশক্তি খুবই নিস্তেজ হয়, কিন্তু তখনও সাক্ষী চৈতন্য এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থায় প্রবেশ করিয়া পরম সুখ উপলব্ধি করে; এই জন্যই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মুখে এ কথা শোভা পায় যে, "কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"; কারণ, নিদ্রাকালে যদি সে ব্যক্তি পরম সুখের অবস্থা উপলব্ধি না করিত, তবে পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্তটি কখনই তাহার স্মৃতি পথে আবির্ভূত হইতে পরিত না; কেননা পূর্ব্বে যে-বিষয় সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয়ই কেবল পশ্চাতে স্মরণে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির যখন দিব্য স্মরণ হইতেছে যে, কল্যরাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন নিদ্রাকালে সে সুখ অবশ্যই তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল।

আমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রভাত বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছি—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত সময়ে (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) বাস্তবিকই আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এইরূপ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই যে একটি বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে যে, কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে নিদ্রাকালে সে ব্যক্তি (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) পরম সুখ অনুভব করিয়াছিল। অতএব নিদ্রাবস্থায় যখন চিন্তা-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—সাক্ষী চৈতন্য তখনকারও সুখাবস্থার সাক্ষী—সুতরাং সে আপনি সে অবস্থা হইতে ভিন্ন। সাক্ষী চৈতন্য নিজে জাগ্রদবস্থাও নহে, স্বপ্নাবস্থাও নহে, সুষুপ্তি অবস্থাও নহে—পরন্তু তিন অবস্থারই সাধারণ সাক্ষী। শ্রী দ্বি]

মাংসপেশী ও মস্তিষ্কে যে শক্তি সঞ্চয়ের উল্লেখ করা গেল সেই সঞ্চিত শক্তি বাস্তবিক কিরূপ তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অণুক্ষণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। এই দ্বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত এবং প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু হইতে অম্লযান গৃহীত হয়।* পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিদ্রাকালে যে পরিমাণ (মুক্ত ও মিশ্রিত) অম্লজান নিঃশ্বাস যোগে বহির্গত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রশ্বাস যোগে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গৃহীত অতিরিক্ত অম্লজান শোণিত আদিতে সঞ্চিত থাকে। সেই সঞ্চিত অম্লজান শারীর পদার্থের সহিত রাসায়নিক আদি রূপে মিশ্রিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। সেই উৎপন্ন তাপই বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার শারীর শক্তির মূল। এ জন্য যদি কোন কারণবশতঃ অম্লজান গ্রহণের ব্যাঘাত হয় তবে শারীর ক্রিয়া এবং মানসিক কার্য্য সমুদয়েরই ব্যত্যয় জন্মে। এই হেতুই পীড়া বিশেষে মানসিক বিকার এবং প্রলাপ আদিও হইতে দেখা যায়।

[নিশ্বাস প্রশ্বাসজ উত্তাপ ব্যতিরেকে শরীর কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া সে উত্তাপকে সাক্ষী চৈতন্য বলা যাইতে পারে না; কে তবে সাক্ষী চৈতন্য? না সেই উত্তাপের ফলভোক্তা—সেই উত্তাপের উপলব্ধি কর্ত্তা—সেই উত্তাপের জ্ঞাতা। শ্রী দ্বি]

---

* প্রভাত বাবু এখানে একটি শব্দের ভুল করিয়াছেন; নিশ্বাস না লিখিয়া তিনি নিঃশ্বাস লিখিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই নিঃশ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাষায় নিঃশ্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। নির্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত বটে কিন্তু নিবাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষার নিঃ= লাটিন ভাষার ex; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নি=লাটিন ভাষার in। নিশ্বাস-কিনা in-breathing। সংস্কৃত ভাষার প্র=Latin ভাষার pro=ইংরাজি ভাষার forth; প্রশ্বাস-কিনা প্রক্ষিপ্ত propelled শ্বাস—breathing forth; অতএব, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই প্রশ্বাস। শ্রীদ্বি।

জীব-শরীরে দুই প্রকার পদার্থ আছে। মৃত এবং জীবিত। যথা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু মণ্ডলের মধ্যস্থ শ্বেত ও ধূসর পদার্থ। শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শারীর মৃত এবং জীবিত পদার্থের সহিত এক দিকে কাষ্ঠ ও দহনোৎপন্ন জল আদি এবং অন্য দিকে অনলের তুলনা হইতে পারে। যখন কাষ্ঠস্থিত ইন্ধন বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণশীল অবস্থার নাম অনল। উক্ত মিশ্রণ সমাপ্ত হইয়া যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা জল আদি। এস্থলে কাষ্ঠ ও জলকে মৃত এবং অনলকে জীবিত বলা যাইতে পারে। কারণ শারীর মৃত পদার্থ সকল কাষ্ঠ বা জলের ন্যায় শরীরান্তর্গত বিশেষ প্রকার মিশ্রণ কার্য্যের পূর্ব্ব এবং শেষ এবং দৈহিক জীবিত পদার্থ অনলের ন্যায় সেই বিশেষ প্রকার মিশ্রণশীল অবস্থা। আর যেরূপ দহন হইতে তাপ উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন কাষ্ঠকেও দগ্ধ অর্থাৎ দহনে পরিবর্ত্তিত করে, সেইরূপ জৈবনিক মিশ্রণ হইতেও বিশেষ প্রকার বল উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন মৃত পদার্থকে জীবিত পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনলে যেরূপ সদৃশ অনল উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করে, শারীর জীবিত পদার্থেও সেইরূপ সদৃশ জীবিত পদার্থ উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব অনল এবং জীবিত পদার্থ উভয়েই বিশেষ বিশেষ বলের আকর। কিন্তু কাষ্ঠ এবং মৃত পদার্থে বিশেষ বিশেষ প্রকার বল আবদ্ধ থাকিলেও উহারা অনল ও জীবিত পদার্থের ন্যায় বলশালী নহে।

[প্রভাত বাবু এতগুলা কথা কি উদ্দেশে বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয় যে, ধূসর পদার্থই সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা, তবে তাঁহার সে কথায় আমরা কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না। আমরা বলি যে সেই ধূসর পদার্থের জৈবনিক কার্য্যের ফলভোক্তাই আত্মা; কেননা ধূসর পদার্থ নিজে কিছু আর তাহার নিজের কার্য্যের ফল-ভোগ করে না। শ্রী দ্বি]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শ্বেত পদার্থ আবার সূত্রাকৃতি। সূত্র সকল স্নায়বীয় কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে পারিধ (peripheral) প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। স্নায়বীয় সূত্র সকল আবার অল্প অল্প দূর অন্তর জীবিত ধূসর পদার্থের পুঞ্জ সম্বলিত। ইহাতে স্নায়বীয় বল চালনার এই সুবিধা হয়:—কোন স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইলে তাহা প্রবাহমান হইতে থাকে আর বাহক সূত্রের মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থ পুঞ্জ সকল হইতে বল গ্রহণ করিয়া ক্রমে পোষিত হইতে হইতে চলিতে আরম্ভ করে। এখন মনে কর তোমার হস্তাঙ্গুলিতে আমি চিমটি কাটিলাম। ইহাতে চিমটির স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইল। সেই বল স্নায়ুযোগে প্রবাহিত হইয়া বোধগ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে যাইয়া কার্য্য করিল তাহাতে তথায় আর একটী বল উৎপন্ন এবং

অঙ্গুলিতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিমটির উত্তেজনা হইতে অপসারিত করিল। এস্থলে যদি তুমি জাগরিত থাক তবে সেই বোধগ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার। কিন্তু যদি তুমি নিদ্রিত থাক তবে উক্ত বল তোমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্গুলীকে চিমটি হইতে অপসৃত করিবে। যদি ভেকের মস্তিষ্ক ফেলিয়া দিয়া এই পরীক্ষাটী করা যায়, তবে আমাদের এই উক্তি আরো বিশদ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ, পরিচালনা ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেতনা আবশ্যক নহে।

[প্রভাত বাবু এইমাত্র বলিলেন যে "যদি তুমি জাগরিত থাক তবে তোমার বোধগ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার।" তাই আমরা বলি যে, স্নায়বিক কার্য্যের উপর আমাদের ঐ যে কর্তৃত্ব—উহা স্নায়ু যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে, কিন্তু স্বয়ং সাক্ষী চৈতন্যের। নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিতে পারে; এ ভিন্ন, স্বকার্য্য করা না করা কোন যন্ত্রেরই কর্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ কর্তৃত্ব যাহার আছে, তাহা স্নায়বীয় যন্ত্র নহে কিন্তু স্নায়বীয় যন্ত্রের যন্ত্রী—সাক্ষী চৈতন্য আত্মা। শ্রীদ্বি]

যে চৈতন্য স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ করে তাহা বাস্তবিক কিরূপ দ্রব্য এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। বিজ্ঞান মতে বলের (তাহা তাপাদির আকারেই হউক, বা সামান্য জড় কণিকার গতিরূপেই হউক) কর্তৃত্ব ভিন্ন কোন বস্তুর গতি জন্মিতে পারে না। এবং কোন গতি উৎপন্ন হইলে তাহা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চিমটি কাটার দরুণ যে বল উৎপন্ন হইয়া স্নায়ু যোগে মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবেই জড়ীয় গতি।

[এইরূপ জড়ীয় গতি ভৌতিক রাজ্যেই দেখা গিয়া থাকে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঘড়ির নিজের চলা-ফেরা'র উপরে যেমন তাহার নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃতির নিজের জড়ীয় গতির উপরে তেমনি প্রকৃতির নিজের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; আত্মাই কেবল প্রকৃতির গতি'কে অভীষ্ট পথে নিয়মিত করিতে পারে। শ্রীদ্বি]

যদি চৈতন্য না থাকে তবে সেই গতি নিবন্ধন মস্তিষ্কের সঞ্চার-বিশেষ হইতেই আর একটী গতি উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি চৈতন্য থাকে তবে উক্ত দ্বিতীয় গতি মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে এবং না হইতেও পারে।

[অতএব প্রমাণ হইল যে, এরূপ কর্তৃত্ব চৈতন্যেরই কর্তৃত্ব—স্নায়ু-যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক-যন্ত্রেরও নহে। কেননা, কোন যন্ত্রই আপনার গতিকে আপনি নিয়মিত করিতে পারে না; এক কেবল চৈতন্যই তাহা পারে। শ্রীদ্বি]

গতি যদি উৎপন্ন হয় তবে কিসে তাহা উৎপন্ন হয়? প্রথম গতিতে? না, চৈতন্যে? যদি প্রথম গতিতেই দ্বিতীয় গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হয়। আর যদি চৈতন্যের প্রভাবে গতি উৎপন্ন হয়,তবে তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? বিজ্ঞান মতে কোন জড় পদার্থ একবার গতি বিশিষ্ট হইলে যে পর্য্যন্ত অন্য কোন জড় বস্তু আসিয়া তাহা গ্রহণ না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহা গমনই করিতে থাকিবে এবং কোন গতির কর্তৃত্ব ভিন্ন কোন জড়ের গতি উৎপন্ন হইতেও পারে না। সুতরাং চৈতন্য যদি কোন জড়াতীত ব্যক্তিই হয়, তবে তাহা যে কিরূপে প্রথম গতি রহিত করিয়া দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করে ইহা চৈতন্যবাদীরাই বলিতে পারেন, বিজ্ঞানে বলিতে পারে না।

[প্রভাত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি কিরূপে আর-একটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়—এই সোজা বৃত্তান্তটিও বিজ্ঞানে বলিতে পারে কি? আর, বিজ্ঞানে তাহা বলিতে পারে না বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি আরেকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হইতে পারে না? আশ্চর্য্য ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি স্পেন্‌সর কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হৌ'ক্;—

"It is an ostablished mechanical truth that if a body moving at a given velocity. strikes an equal body at rest in such wise that the two move on together, their joint velocity will be but half that of the striking body. Now it is a law of which the negative is inconceivable that in passing prom any one degree of magnitude to another all intermediate degrees must be passed through. or in the case before us, a body moving at velocity 4 cannot by collision,be reduced to velocitty 2, without passing through all volocities between 4 and 2. But were matter truly solid—were its units absolutely incompressible and in unbroken contact—this "law of continuity" would be broken in every case of collision. For when of two such units, one moving at velocity 4 strikes another at rest, the striking unit must have its velocity 4 instantaneously reduced to velocity 2; must pass from velocity 4 to velocity 2 without any lapse of time, and without passing through intermediate velocities; must be moving with velocities 4 and 2 at the same instant, which is impossible."

ইহার ভাবার্থ এই;—

বিজ্ঞানের একটি স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, একই ওজনের দুইটি গোলা যদি ঐকান্তিক নিরেট হয় অর্থাৎ যদি কোন অংশেই স্থিতিস্থাপক না হয়, আর, একটির স্থির অবস্থায় আর একটি যদি তাহাকে চারি-মাত্রা বেগে আঘাত করে তবে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারী গোলাটির চারিমাত্রা বেগ ঘুচিয়া গিয়া দুইটি গোলাই দুই মাত্রা বেগে চলিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু চারিমাত্রা বেগ ক্রমে ক্রমে না কমিয়া এক মুহূর্ত্তেই কেমন করিয়া দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় ইহা কোন বিজ্ঞানেই বলিতে পারে না। এই তো গেল স্পেন্সরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান যাহা বলিতে পারে তাহা সে বলিতে পারে, যাহা সে বলিতে পারে না তাহা সে বলিতে পারে না; কিন্তু যাহা সে বলিতে পারে না, তাহা বলিতে না পারিবার অপরাধে যাহা সে বলিতে পারে তাহা কাঁচিয়া যায় না। বিজ্ঞান এটা যদিও বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া আঘাতকারী গোলার চারিমাত্রা বেগ এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় অথবা কেমন করিয়া স্থির গোলাটিতে এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা বেগ সঞ্চারিত হয়, তথাপি বিজ্ঞানের এটা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে, গোলাদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থায় তাহাদের গতি ঐরূপ হইতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাটি বিজ্ঞান বলিতে পারে না বলিয়া বিজ্ঞানের শেষোক্ত স্থির সিদ্ধান্তটিও কি কিছুই নহে? অতএব, এ কথা যদি সত্যও হয় যে, চৈতন্য নিজে গতি-শূন্য হইয়া কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে—ইহা আমরাও বলিতে পারি না—বিজ্ঞানও বলিতে পারে না, তথাপি, চৈতন্য বাস্তবিকই যে ঐরূপ করে—ইহা স্বীকার করিতে আমাদেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, বিজ্ঞানেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। সূর্য্য লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কেমন করিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে—বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান বলে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তেমনি চৈতন্য গতি-হীন হইয়াও কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তন করে—তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথচ এটি আমরা ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, চৈতন্য বাস্তবিকই তাহা করে। কেন না, যিনিই যখন আপনার হস্তপদ চালনা করেন, তিনিই তখন অন্তঃকরণে ধ্রুব-রূপে উপলব্ধি করেন যে, আমিই আমার হস্তপদ চালনা করিতেছি। আমি যখন এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি তখন স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়াও যদি আমাকে বলেন যে, তোমার লেখনীটিকে তুমি চালাইতেছ না—আর কেহ চালাইতেছে, তবে তাঁহার কথা আমি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিব না। আমার আপনার কর্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের কর্তৃত্ব উপলব্ধি করি; অন্যের কর্তৃত্ব মূলক কার্য্যে আমি অনুমান-বলে চৈতন্যের কর্তৃত্ব উপলব্ধি করি। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জড়বস্তুর আপনার গতির উপর তাহার আপনার কোন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, তখন কাজেই ঐরূপ কর্তৃত্ব কার্য্য দেখিবামাত্রই আমরা তাহাতে চৈতন্যেরই হস্ত উপলব্ধি করি। চৈতন্য কোন রূপ গতি দ্বারা নহে—শুদ্ধ কেবল ইচ্ছা দ্বারা—হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে। প্রভাত

বাবুর এই যে, একটি যুক্তি যে, চৈতন্য কেমন করিয়া হস্তপদাদি চালনা করে তাহা যখন আমরা বলিতে পারি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চৈতন্য হস্তপদাদি চালনা করে না, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। কালিদাসকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কেমন করিয়া শকুন্তলার ন্যায় এমন একটা নিরুপম কাব্য-মাধুরি উদ্ভাবন করিলে? কালিদাস হয় তো তাহা বলিতে পারিবেন না; তাহা হইলেই কি প্রমাণ হইল যে, তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, তখন তিনি শকুন্তলার রচয়িতা নহেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কেমন করিয়া তুমি লেখ? আমি বলিব "লেখনী চালনা দ্বারা।" কেমন করিয়া তুমি লেখনী চলনা কর? অঙ্গুলি চালনা-দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি অঙ্গুলি চালনা কর? স্নায়ু বলের উত্তেজনা-দ্বারা। কেমন করিয়া স্নায়ু-বলের উত্তেজনা কর? ইচ্ছা দ্বারা। কেমন করিয়া ইচ্ছা কর? এই স্থানটিতে "কেমন করিয়া" এ কথাটি জিজ্ঞাসা করা নির্ব্বোধের কার্য্য; কেন না, কেমন করিয়া ইচ্ছা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা পর'কে বুঝাইবার কথা নহে, আপনি বুঝিবারই কথা। শ্রীদ্বি]

পরন্তু উহাঁরা যদি এই কথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলেন তবে তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আর যদি বিজ্ঞান মূলক বলেন তবে আমরা সেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

এখন মনে কর যে, চৈতন্য জড়াতীত ব্যক্তি নহে, কিন্তু জড় শক্তি বিকাশের ফল মাত্র। এই অভ্যুপগম অনুসারে বিচার করিলে জানা যাইবে যে চিমটি কাটিলে যে প্রথম গতি উৎপন্ন হয় তাহা মস্তিষ্কে যাইয়া বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তথায় এমত ভাবে ক্রিয়া করে যাহাতে সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইয়া চৈতন্য উৎপন্ন হয় অথবা চৈতন্য বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ বেদনা জন্মিয়া থাকে।

[আমরা তো জানি—বিজ্ঞান শুধু বলে যে, গতি হইতে (সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়) গতিই কেবল উৎপন্ন হয় (যেমন, সামান্য গতি হইতে সামান্য গতিও উৎপন্ন হইতে পারে, আর, বৈদ্যুতিক, ঔত্তাপিক, প্রভৃতি আণবিক (molicular) গতিও উৎপন্ন হইতে পারে) এ ভিন্ন কোন্ বিজ্ঞানে এরূপ কথা বলে জানি না যে, গতি হইতে গতির ফল-ভোক্তা, বা গতির নিয়ামক, বা গতির উপলব্ধি-কর্ত্তা, উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-বেত্তা পণ্ডি-তেরা যদি গতি-সম্বন্ধীয় অমন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সত্য সত্যই আবিষ্কার করিয়া থাকেন—তবে এত দিনে তাহা গতি বিজ্ঞানে (Dynamics) স্থান পাইত—তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। কিন্তু কই? কোথাও তো তাহা দেখিতে পাই না। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের ক-অক্ষরও জানেন না—তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অমূলক কথা শোভা পায়, প্রভাত বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের মুখে তাহা কোন-ক্রমেই শোভা পায় না। শ্রীদ্বি]

অতএব চৈতন্য এবং বেদনা বোধ যখন সঞ্চিত জড় শক্তির বিকাশ মাত্র, তখন তাহাতে যে একটী দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করিবে ইহা সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান বহির্ভূত নহে।

[পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, একটা ধাবমান গোলাতে তো যথেষ্ট জড়-শক্তির বিকাশ আছে—কিন্তু তাহা সত্বেও তো বিজ্ঞান বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া তাহা একটা স্থির গোলাতে গতির সঞ্চার করে। অতএব কেমন করিয়া গতি সঞ্চারিত হয়—ইহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না—আমরাও বলিতে পারি না; কিন্তু বিজ্ঞানেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশীল বস্তু হইতে স্থির বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হয়, আমাদেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশূন্য চৈতন্য কর্ত্তৃক হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা যদি বলিতাম যে গতিশূন্য চৈতন্য হইতে গতির সৃষ্টি হয়; তাহা হইলে অবশ্য প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, ও কথাটি নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেননা, বিজ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত জড়জগতের মোট গতির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবে না। আমরা কেবল বলিতেছি এই যে, চৈতন্য শুদ্ধ কেবল গতির পরিবর্ত্তন কর্ত্তা—গতির নিয়ামক। আমরা যদি বলিতাম যে, গতিশূন্য চৈতন্য বহির্জগতে গতি প্রদান করে তাহা হইলেই প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, চৈতন্যের নিজেরই যখন গতি নাই তখন সে কিরূপে গতি প্রদান করিবে? যাহার ধন নাই সে কিরূপে ধন-দান করিবে? কিন্তু আমরা আদবেই তাহা বলি না; আমরা বলি এই যে, সমস্ত জড় জগতের মোট গতি যাহা আছে—তাহার ইয়ত্তা (Quantity) চিরকালই সমান; কোন-কালেই তাহার ন্যূনাধিক হয়ও না হইতে পারিবেও না। ইহা সত্বেও গতির পরিবর্ত্তন দুইরূপে সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যথা;—(১) এক জড়বস্তুর গতি অন্য জড়বস্তুর গতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; (২) চৈতন্য দ্বারা জড়বস্তু বিশেষের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। গতির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে—গতির নূতন-সৃষ্টিই বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। চৈতন্য নিজে বর্ণহীন হইয়াও যদি শ্বেতাদি বর্ণ দর্শন করিতে পারিল তবে সে নিজে গতিহীন হইয়াও হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তন করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রীদ্বি]

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চৈতন্য স্থির পদার্থ নহে। তাহা কখন কখন বিদ্যমান থাকে ও কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এবং কিছু কাল বিদ্যমান থাকিলে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে আর বিদ্যমান থাকিতে পারে না; তখনই নিদ্রা আবশ্যক হয়। সেই নিদ্রা নিবন্ধন বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হইলে চৈতন্যের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে।

[নিদ্রাবস্থাতেও যে সাক্ষী চৈতন্য অন্তর্হিত হ'ন না, তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রার সময়ে এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থা জ্ঞানে অনুভূত হয় তাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাকালে যদি আমার জ্ঞান একেবারেই

বিলুপ্ত হইত, তবে জাগিয়া উঠিবার সময় আমি নিছক অজ্ঞানের গর্ত্ত হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতাম,—সুতরাং তাহা হইলে আবার আমাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতে হইত। শ্রী বি]

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি চৈতন্য জড় শক্তিরই বিকাশ হয়, তবে তাহা কিরূপে আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বাস্তবিক আলোক আদির উত্তেজনাই চৈতন্য বিকাশের কারণ। প্রাণিগণ সর্ব্বদাই আলোক তাপ আদিতে পরিবেষ্টিত। সেই পরিবেষ্টক আলোক আদি নিয়তই প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়া নিবন্ধন মস্তিষ্কের কার্য্য হইতে থাকে আর তথাকার সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তাহা অবশেষে এরূপ লাঘব হইয়া পড়ে যে আলোক আদির সামান্য উত্তেজনায় চেতনা রক্ষা করিতে পারে না। এই হেতুই শীত কালের দুর্ব্বল তাপে মর্ম্মট প্রভৃতি শীতাসহ জন্তুগণকে জাগরিত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমুচিত নিদ্রা হইয়া শক্তির পুনঃ সঞ্চয়ের সহিত মস্তিষ্ক সতেজ হইয়া উঠিলে উক্ত সামান্য উত্তেজনেই আবার চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে। এই হেতুই সুস্থ ব্যক্তিগণ দিবালোক প্রকাশিত হইলে আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

[বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, জড়-শক্তির বিকাশ দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; যেমন, সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ হয় কোথায়—ফল ফলে কোথায়? না পৃথিবীর বাৎসরিক গতিতে; জড়-শক্তি যদিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা;—যান্ত্রিক রাসায়নিক এবং জৈবনিক; তথাপি, সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া—শুদ্ধ যদি কেবল জড়-বস্তুর প্রতিই লক্ষ নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যান্ত্রিক (Mechanical) শক্তিই কেবল জড় বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি; কেননা, যান্ত্রিক শক্তি-দ্বারাই জড়বস্তু সকল পরস্পরের গতি পরিবর্ত্তন করে; আর, এই যে গতি পরিবর্ত্তন—ইহা শুদ্ধ কেবল জড়-বস্তুরই গতি-পরিবর্ত্তন—চেতনের নহে। কিন্তু রাসায়নিক অথবা জৈবনিক শক্তি দ্বারা জড়-বস্তুর গুণ-পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হয়—সমস্তই ইন্দ্রিয় মূলক; সুতরাং তাহা জড়বস্তুর নিজের গতি-পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু জীব চৈতন্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন। উদজন এবং অম্লজন বাষ্প যথা পরিমাণে মিশ্রিত হইলে আমাদের নেত্র-সমক্ষেই তাহা জল রূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু উক্ত বস্তু দ্বয়ের নিজের অভ্যন্তরে শুদ্ধ কেবল যান্ত্রিক শক্তিই কার্য্য করে, এবং তাহার ফল শুদ্ধ কেবল আণবিক গতি-পরিবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয়। এ যাহা বলিলাম—মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে—সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া জড়-বস্তুকে স্বতন্ত্ররূপে ভাবা—মনুষ্যের শুধু নয়—দেবতারও সাধ্যাতীত। যখন আমি আলোক ভাবি, তখন আমি চক্ষে দেখা আলোক ভাবি; যাহা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই ও দেখিতে পারে না—এরূপ আলোক আলোকই নহে। শূন্য আকাশকে আমরা চর্ম্ম-চক্ষে দেখি না বটে—কিন্তু

তথাপি তাহাকে আমরা মনশ্চক্ষে দেখি। গতি কাহাকে বলে ? না সেই মনশ্চক্ষে দেখা আকাশের স্থান-পরিবর্ত্তন। কিন্তু মোটামুটি এরূপ বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না যে, যান্ত্রিক শক্তি-প্রবর্ত্তিত গতিই কেবল জড়-বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি তা ভিন্ন জড়-বস্তুর আর যত প্রকার গুণ আছে সমস্তই ঐন্দ্রিয়ক গুণ—সুতরাং চেতন-সাপেক্ষ। অতএব শুদ্ধ কেবল জড়-শক্তি দ্বারা—যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা—গতি ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না ; আলোকাদির উত্তেজনা চেতন-সাপেক্ষ। অগ্রে প্রাণী এবং তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিলে তবে তো আলোক দ্বারা তাহার দৃষ্টি-শক্তি উত্তেজিত হইবে! অতএব আলোকাদি-জনিত উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণীর বিদ্যমানতা আবশ্যক ; কেন না, অগ্রে প্রাণী না থাকিলে আলোকাদি দ্বারা কাহার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবে ? তবেই হইতেছে যে, প্রাণী আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে— প্রত্যুত তাহা উক্ত উত্তেজনার আধার-স্বরূপ। যদি বল যে, আলোকাদির উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণী ছিল বটে কিন্তু তখন সে জড় পদার্থ মাত্র ছিল, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে না—সে বস্তু আলোকাদি-দ্বারা উত্তেজিত হইতেও পারে না ; এক কথায়, জড়বস্তু আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে না ; কেবল যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে সেই বস্তুই (এক কথায় সচেতন বস্তুই) আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু "উত্তেজিত" এই শব্দের অর্থ ভুল বুঝিলে চলিবে না ; দপ্ করিয়া যখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, অগ্নি উত্তেজিত হইল ; উত্তেজনা একটি মাত্র কথা, কিন্তু ইহাতে দুইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে ; এক অর্থ—আণবিক (Molicular) গতির বেগাধিক্য—যাহা অগ্নির অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে ; আর এক অর্থ—গতি নহে কিন্তু দীপ্তি-বোধ—যাহা সচেতন জীবের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এখানে আলোকাদির উত্তেজনা বলিতে পূর্ব্বোক্ত রূপ উত্তেজনা (কিনা গতি-বেগ মাত্র) বুঝিলে চলিবে না। কেন না, উত্তাপ জড়-বস্তুতে তীব্রবেগ সম্পন্ন গতি উৎপাদন করিতে পারে ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না ; আমাদের মন্তব্য কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, উত্তাপ সচেতন প্রাণী ভিন্ন কোন প্রকার অচেতন পদার্থে তাপবোধ উৎপাদন করিতে পারে না। উত্তাপের অনুভব শক্তি যাহার আছে এমন যে সচেতন জীব, উত্তাপ কেবল তাহারই স্পর্শেন্দ্রিয়কে তাপানুভব দ্বারা উত্তেজিত করিতে পারে। অতএব অগ্রে অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন সচেতন জীব—তাহার পরে আলোকাদির উত্তেজনা ; এ নহে যে, অগ্রে আলোকাদির উত্তেজনা—তাহার পরে সচেতন জীব। তবেই হইতেছে যে, সচেতন জীব আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে কিন্তু আধার-স্বরূপ। শ্রীদ্বি]

অতএব বিজ্ঞান মতে মস্তিষ্কই চিন্তার যন্ত্র। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষ হই-

তেই মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর মানসিক কার্য্য সমঞ্জস ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে মস্তিষ্কের এমত অবস্থা থাকারই নাম চৈতন্য। অতএব মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। যেখানে মস্তিষ্ক আছে সেইখানেই চৈতন্য জন্মিতে পারে যেখানে মস্তিষ্ক নাই তথায় চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্কের অভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এমত বলা "সৃষ্টি ছাড়া কার্য্য" এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত।

[প্রমেয় বিষয় দুই রূপ —(১) পরীক্ষাসিদ্ধ এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ। পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য অকাট্য রূপে প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য ঘরে বসিয়াই প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রভাত বাবুর এই যে একটি কথা যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের চৈতন্য মস্তিষ্ক-যন্ত্র-বিশিষ্ট, ইহা বাস্তবিকই যদি পরীক্ষাসিদ্ধ হয়, তবে তাহা শিরোধার্য্য করিতে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালু-কণাও নহে; আমরা কেবল এই টুকু মাত্র জানি যে, পৃথিবীস্থ জীব-গণেরই মস্তিষ্ক যন্ত্র আবশ্যক—তাঁহাও আবার সকল জীবের নহে; আমীবিয়া-নামক জীব শুদ্ধ কেবল একটা তল্‌তলে পিণ্ড মাত্র—তাহার না আছে মস্তিষ্ক—না আছে কিছু। প্রভাত বাবু যদি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, জীব-মাত্রই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট, তবে আমরা শুদ্ধ কেবল এই বলিব যে, তাঁহার পরীক্ষা-শক্তির পক্ষ প্রলয় বিস্তীর্ণ; আমাদের পরীক্ষা শক্তি পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র, কাজেই এ'র অত বড় একটা পালখ উঠিলে—এ তাহার ভারে চাপা পড়িয়া তদ্দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিবে। বহু পূর্ব্বে এককালে যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জলে জলাময় ছিল, তখন পৃথিবীতে মেরুদণ্ডধারী প্রাণীদিগের মধ্যে শুদ্ধ কেবল মৎস্য কুম্ভীরাদি শীতল-শোণিত জীবদিগেরই একাধিপত্য ছিল—পৃথিবীতে তখন এই রূপ ছিল বলিয়া কিছু-আর এটা প্রমাণ হয় না যে, তখন সমস্ত জগতেরই মেরুদণ্ডধারী জীব শীতল-শোণিত ছিল; তেমনি, অদ্যকার এই পৃথিবীতে উচ্চ শ্রেণীর জীব মাত্রেই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত হইলেও তাহাতেই কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, সমস্ত জগতের সমস্ত উচ্চশ্রেণীর জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; কেননা, সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এমন হইলেও হইতে পারে যে, সমস্ত জগতের সমস্ত জীবই মস্তিষ্ক-যন্ত্র বিশিষ্ট; তবে কি—না তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ; সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে আমরা সে বিষয়ে হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না। অতএব প্রভাত বাবু যে কথাটি বলিতেছেন তাহা নিতান্তই পরীক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যে কথাটি বলিতেছি তাহা স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং পরীক্ষা-নিরপেক্ষ; তাহা এই;—জগতের সকল বস্তুই পরের আকর্ষণে বিধৃত, সুতরাং পরাধীন; সুতরাং সমস্ত জগৎই পরাধীন বস্তুর সমষ্টি; প্রত্যেক সেনাই

যদি পরাধীন হয়, তবে সমস্ত সৈন্য মণ্ডলী কাজে-কাজেই পরাধীন। অতএব, জগতের সমস্ত বস্তুই যখন পরাধীন, তখন অবশ্য সমস্ত জগৎই পরাধীন। অতএব সমস্ত জগৎ কাহারো না কাহারো আশ্রয়াধীন; সমস্ত জগৎ যাঁহার আশ্রয়াধীন, তিনি নিজে পরাধীন হইতে পারেন না; কেননা এক পরাধীন অন্য পরাধীনকে আশ্রয় দান করিতে পারে না, ভীরু ভয়ার্ত্তকে অভয়-দান করিতে পারে না, অন্ধ অন্ধ'কে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ, সুতরাং তিনি মস্তিষ্কের অথবা বাহিরের অন্য কোন সামগ্রীর সাহায্য-নিরপেক্ষ। পরিপূর্ণ দ্বিগুণ সত্তাই—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সচেতন সত্তাই—যে, সমস্ত অপূর্ণ সত্তার মূলাধার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। খণ্ড আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত এ সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য অশেষ বিধ খণ্ড আকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই,—আমরা ঘরে বসিয়াই অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত। পুনশ্চ, এক-স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে সরল পথই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ, এই সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য বক্র পথ মাপিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, উহা স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ, অপূর্ণ পরাধীন জগৎ যে, পূর্ণ স্বাধীন পুরুষের আশ্রয় সাপেক্ষ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ—তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। অতএব, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ তিনি মস্তিষ্ক যন্ত্রের অধীন নহেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীদ্বি]

এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়, না আরোপ না করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়? সুতরাং ডাক্তার ড্রিষ্‌ডেল্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহাতে চৈতন্য আরোপ করিতে চাহেন না তাহাই বিজ্ঞান অনুগত? না, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্ক হীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞান সঙ্গত? যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক যুক্ত ব্যক্তিই বলেন তবে তাঁহার ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর যদি তিনি ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক হীন বলিয়া তাঁহাতে চেতনা আরোপ করিতে চাহেন তবে তিনি এরূপ ব্যক্তির আদর্শ কোথায় দর্শন করিয়াছেন? যাহার কোন আদর্শ-পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কল্পনা যে বিজ্ঞান সঙ্গত ইহা তিনি কোন্ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন করিবেন?

[নিউটন কি কোথাও দেখিয়াছেন যে, কোন একটি জড়পিণ্ড অবাধিত গতিতে চলিয়া অনন্তকাল সরল-রেখা পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে? তিনি তাহা কস্মিন্‌কালেও দেখেন নাই—আর-কেহও তাহা দেখে নাই দেখিবে না। অথচ তিনি এই সত্যটি বৃত্তবিদ্যা-সমাজে প্রচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই যে, কোন একটি চলমান বস্তু

কোন প্রকার বল দ্বারা বাধিত না হইলে, তাহা অনন্তকাল সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটনের এ কথাটি এরূপ নহে যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে; এক কথায়—তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যথা;— পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাই—কারণ ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না—এ তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং বিনা কারণে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অতএব চলমান বস্তু বল দ্বারা বাধিত না হইলে একই সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটন্ কোন জড়পিণ্ডকেই অনন্ত কাল সরল রেখা পথে চলিতে দেখেন নাই ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহার উপরিউক্ত সিদ্ধান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া গেল? আমরা জগতের কুত্রাপি পরিপূর্ণ সত্য দেখি নাই দেখিবও না, ইহা তেমনিই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি এই সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি একেবারেই কিছুই না যে, অপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল-প্রমাণেরই মূলাধার; যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন, তাঁহাদের উপর শ্লেষ দিয়া আমাদের দেশের এক-জন প্রসিদ্ধ দর্শনকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমনি মহাপণ্ডিত যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে সেই জ্ঞানকে (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে) তাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন; যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন।" ইহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত;—মনে কর চন্দ্র-লোক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে, চন্দ্র-লোকে সমস্ত কাকই শ্বেতবর্ণ; ইহার আমি এই উত্তর দিব যে, সাদা কাক আমিও দেখি নাই পৃথিবীস্থ অন্য কোন মনুষ্যও দেখে নাই, কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ যে, চন্দ্র-লোকের সকল কাকই শ্বেতবর্ণ তখন তোমার কথায় অবিশ্বাস করিবার আমি কোন কারণ দেখি না; তুমি যাহা বলিতেছ তাহা হইলেও হইতে পারে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বলে যে, চন্দ্র-লোকে একটা গোলাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গড়াইয়া দিলে কিয়দ্দূর পশ্চি-মাভিমুখে গিয়াই তাহা বিনা কারণে উত্তরাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি বলিব যে, কখনই না—তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কারণ-ব্যতিরেকে কোন পরিবর্ত্তনই যখন ঘটিতে পারে না, তখন কারণ ব্যতিরেকে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিবে? কাক সাদা হয় এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই, আর, বিনা কারণে পরিবর্ত্তন ঘটে এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই; তবে, ওটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "হইলেইও হইতে পারে" আর এটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, "কখনই না!" এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, যাহা কেবল-মাত্র পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে—দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে তাহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে;

পরীক্ষা-সাপেক্ষ হওয়া দূরে থাকুক—তাহা সকল পরীক্ষারই ভিত্তিভূমি; কেননা, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাইই-চাই এই তত্ত্বটি পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই পরীক্ষার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ কারণ অন্বেষণ করিতে তৎপর হই। এ যেমন, তেমনি অপূর্ণ সত্য মাত্রই পূর্ণ সত্যের আশ্রয় সাপেক্ষ—ইহা একটি পরীক্ষা-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ভক্ত সাধকেরা নিঃশংসয়ে এবং অকুতোভয়ে ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কি বিজ্ঞান—কি তত্ত্বজ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আশ্রয়-ব্যতিরেকে কেহই এক পদও চলিতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তিনি তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমর্থন করিতে যান, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ তাহা তাঁহার নিজেরই সম্পত্তি। তিনি আপন সম্পত্তিকে যাহা ইচ্ছা তাহাই মনে করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।

[জগৎশুদ্ধ জীবের মস্তিষ্ক যদি প্রভাত বাবুর সম্পত্তি হইতে পারিল, তবে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যাহা বাস্তবিকই জ্ঞানবান্ জীব মাত্রেরই (কাজেই প্রভাত বাবুরও) পৈতৃক সম্পত্তি—তাহার অংশ আমাতেও যৎকিঞ্চিৎ বর্ত্তিবে—ইহা তো হইবারই কথা! শ্রী দ্বি]

এখন দ্বিজেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ডাং ড্রিস্‌ডেলের মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই না বলেন এবং তিনি যে কিরূপ পদার্থ তাহাও বলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, উঁহাদের ঈশ্বর জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুগত নহে। তাহা কেবল বিশ্বাসেরই অনুগত। বিশ্বাস বাস্তবিক চক্ষুহীন অন্ধ। সে বিজ্ঞানের কথা গ্রহণ করিতে চাহে না, এবং গ্রহণ করিতে সক্ষমও নহে। এই অন্ধ বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্র বাবুতেও বলবান্ রহিয়াছে। তাহাতেই তিনি বিজ্ঞানের সমস্ত উপদেশ ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের অনুকূলে অবৈজ্ঞানিক কথারও যোজনা করিতেছেন। এবং অন্য কেহ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতি কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না।

[স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বতন্ত্র, আর অন্ধ বিশ্বাস স্বতন্ত্র। "অমুক বড়লোকে (যেমন প্রক্টর বা ড্রিস্‌ডেল) এই কথা বলিয়াছেন অতএব ইহা বেদবাক্য" ইহারই নাম অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে—খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত—অপূর্ণ সত্য মাত্রই পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন—এরূপ ধ্রুব তত্ত্ব সকল অন্ধ বিশ্বাস নহে কিন্তু জাগ্রত জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করিলে যদি লোককে অবৈজ্ঞানিক হইতে হইত, তাহা হইলে নিউটন্‌ও অবৈজ্ঞানিক; যেহেতু, এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে। স্বতঃসিদ্ধ সত্য-সকল সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তি-মূল। কাজেই, যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি বিমুখ হইয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন

করেন তাঁহারা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালেন; তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্মের অভ্যন্তরে তলাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্, যথা,—A little philosophy inclineth man's mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. অল্প জ্ঞান মনুষ্যের মনকে নাস্তিক্যের দিকে টানে; গভীর জ্ঞান লোকের মনকে ঈশ্বর-ভক্তির দিকে টানে। শ্রী দ্বি]

আমরা সম্প্রতি এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। কারণ একত্রে আর অধিক বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে না। আমরা এই প্রস্তাবে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহারই যে, কত ডাল পালা বহির্গত হয় তাহা বলা যাইতে পারে না।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

বিদ্রোহ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেতিয়া দূর হইতেই সুহার বলিয়া ডাকিয়াছিল। তাহার ডাকে সুহারের চমক ভাঙ্গিল, রাজা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেতিয়া যখন জলাশয় তীরে আসিয়া পৌছিল, তখন তাঁহারা একত্র নাই, কিন্তু ক্ষেতিয়া তাহাতেই চমকিয়া উঠিল, এই নির্জ্জন নিকুঞ্জে রাত্রিকালে সুহার একাকী রাজার সহিত? সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে তাহার কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় যদি তাহার হাতে বাণ থাকিত ত সে রাজার প্রতি অসঙ্কোচে নিক্ষেপ করিতে পারিত। কিন্তু এখন অন্য উপায় অভাবে তাহার সমস্ত ক্রোধ রাশি মাত্র তীব্র প্রাণভেদী কটাক্ষে রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সুহারকে রোষ গর্জ্জিত স্বরে বলিল—"সুহার চলিয়া আয়"। ক্ষেতিয়ার সেই ব্যবহারে সুহারেরও রাগ হইল, কিন্তু যে অপরাধী তাহার পথের লোকের অপমানও সহ্য করিতে হয়, মনের ভাব মনে চাপিয়া লইয়া বালিকা নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। একবার ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। পথের মধ্যে দুইজনে কোন কথাই কহিল না—দুই জনেই আপনাপন মনের ভাব বহন করিয়া নীরবে চলিতেছিল। সুহারকে ভালবাসিয়া রাজা যে তাহাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাই-তেছেন ক্ষেতিয়া ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এ ভালবাসা তাঁহার ভালবাসা নহে, সুহারের প্রতি অপমান, সুহারের পিতার প্রতি

করিতে হইল! রাগে কষ্টে অপমানে সে জ্বলিয়া যাইতেছিল ; সুহার তাহাকে না ভালবাসার কষ্ট এই নূতন কষ্টের মধ্যে আর ক্ষেতিয়ার মনে ছিল না; ক্ষেতিয়া হৃদয়ে সমুদ্রের আলোড়ন ধরিয়া নীরবে চলিতেছিল। আর সুহার ? ক্ষেতিয়ার প্রতি তাহার যে রাগ হইয়াছিল,দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কেবল সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই মধুর দৃষ্টি, সেই মধুর নিশ্বাসের মধুর স্পর্শ মনে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, ক্ষেতিয়া যে তাহার সঙ্গে আছে বালিকা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে,আপনার চিন্তার মধ্যে আপনি এতখানি সে অভিভূত। কুটীরের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া যেন সুহারের হুঁস হইল ক্ষেতিয়া তাহার সঙ্গে। দ্বারদেশে পৌঁছিয়া ক্ষেতিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, সুহারও দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল, এ দৃষ্টি ক্রোধের দৃষ্টি নহে, একটি কোমল প্রশান্ত অনুনয়ের ভাব এই দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। বালিকা কি যেন তাহাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল। বালিকা যখন চলিয়া গেল তখন সহসা যেন ক্ষেতিয়ার প্রাণের রুদ্ধ আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, ক্ষেতিয়ার ভীমবলদেহ সামান্য লতার ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষেতিয়া নিকটের বৃক্ষশাখা ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহার তলে বসিল। তখনো রাত অধিক হয় নাই, উত্তরের সপ্তর্ষিমণ্ডল তখনো ধ্রুবতারার মস্তক অতিক্রম করে নাই, চন্দ্রমা তখনো ক্ষেতিয়ার মাথায় উপরে, তারকা রাজ মৃগব্যাধ অদ্ভুতাকৃতি মৃগমণ্ডলির পশ্চাৎ হইতে তখনো তাহার চোখের উপর দক্ষিণে জ্বল জ্বল করিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষেতিয়া ভাবিতেছিল—"ইহার উপায় কি ? রাজার হাত হইতে বালিকাকে রক্ষা করিবার উপায় কি ? কি করিয়া সুহারকে সাবধান করা যায় ? কি করিয়া রাজার উপর হইতে তাহার মন ফিরান যায় ? হাঁ মন ফিরান যায় ? মন ফিরিলে সে আর রাজার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, নহিলে অন্য উপায় নাই—নহিলে সে বুঝিবে না। রাজা তাহাকে যে অপমান করিতেছেন—সে তাহা বুঝিবে না, সেই অপমানই বালিকা ভালবাসা বলিয়া বুঝিবে,—নির্ব্বোধ বালিকা সে তাহা ভালবাসা বলিয়া বুঝিতেছে।" ক্ষেতিয়া আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভাবিল—"না সে কিছুতেই বুঝিবে না, সে সাবধান হইবে না, আমি তাহাকে ঢের বলিয়াছি, ঢের বুঝাইয়াছি—সে বোঝে না—বুঝিবে না, আমি বলিব—জঙ্গুকে বলিব, নহিলে উপায় নাই, অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, কিন্তু আর না,আমি বলিব, জুমিয়াকে বলিব, প্রতিশোধই ইহার একমাত্র উপায়, প্রতিশোধ—রাজার প্রতি প্রতিশোধ, অন্য উপায় নাই!" বালিকার সেই কোমল দৃষ্টি সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সেই অনুনয়ের দৃষ্টি, সেই আকুল প্রার্থনার দৃষ্টি সে চোখের সমুখে দেখিতে লাগিল, সে বুঝিল বালিকা তাহাকে কি কথা বলিতে গিয়াছিল—কি ভিক্ষা তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্ষেতিয়া কাতর হইয়া পড়িল—মনে মনে বলিল, "না না বলিব না, সুহার

একথা আমি জঙ্গুকে বলিব না, জুমিয়াকে বলিব না, বলিলে তোমাকে তাহারা লাঞ্জনা গঞ্জনা দিবে, তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে; আমি তাহাদের কাহাকেও একথা বলিব না, আমি কেবল তোমার মন ফিরাইব, তাহার উপর হইতে মন ফিরাইব, তাহাকে দেখিলে তুমি ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার অপমান তখন আমার মত এমনি করিয়া বুঝিবে"—

ক্ষেতিয়া তখনি সেই গণৎকারের নিকট গমন করিল। গণক তখন বিছানায় আরাম করিতেছিলেন, বহু কষ্টে সে তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিল—তুলিয়া সমস্ত কথা বলিল। গণক বলিলেন—"আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম—সব কর নাই সেই জন্যই এই সব ঘটিতেছে।"

ক্ষেতিয়া বলিল "সব করিয়াছি কেবল একটী বাকী। রাজা যে ফুল দিয়াছিলেন তাহাই মাত্র ফেলিয়া দিতে পারি নাই"—

গণক। যদি তাহা না ফেলিতে পার—ত কোনই ফল হইবে না, আমার কাছে আসা বৃথা"—

ক্ষেতিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"কি করিয়া ফেলিব? সুহার যে সে কোথায় রাখিয়াছে খুঁজিয়া কিছুতেই পাই না, আপনি বলুন কোথায় আছে?"

গণক গণিয়া বলিলেন—"কোন গুপ্ত স্থানে, তাহার নিজের কোন কৌটাদির মধ্যে, বিশেষ করিয়া না খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।

ক্ষেতিয়া হতাশ হইয়া বলিল, "যদি নিতান্তই খুঁজিয়া না পাই তাহা হইলে কি হইবে?

গণক। "তাহা হইলে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিতে হইবে?"

ক্ষেতিয়া। "প্রভু ক্ষমা করুন—তাহা পারিব না——তাহা হইলে সুহার —— আমি শুধু ওষুধ চাই।"

গণৎকার রাগিয়া গেলেন—বলিলেন "ওষুধ চাই? নির্ব্বোধ, হতভাগা ওষুধ! জঙ্গুকে বলাই ওষুধ। জঙ্গুকে বলিলেই সব ঠিক হইবে। সুহারের মন বদলিয়া যাইবে। ওষুধ দরকার হয় তাহার পর দিব।" ক্ষেতিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিল না। আস্তে আস্তে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জল হইতে যে কমল তুলিয়া সুহারকে দিয়াছিলেন—বালিকা যে তাহা ফেলিয়া দেয় নাই তাহা ক্ষেতিয়া জানিত। ক্ষেতিয়ার কাছ হইতে সে কথা জানিয়া লইয়াই গণক সে ফুল ক্ষেতিয়াকে ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। গণৎকারের বিশ্বাস—সেই ফুলই রাজার ভালবাসা তাহার মনে বদ্ধমূল রাখিতেছে। সেই ফুল প্রথমে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া পরে রাজার সহিত তাহার দেখাশুনা বন্ধ করিলে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া

যাইবে। আশ্চর্য্য গণনা শক্তি বটে। তবে আজকালের লোকেরা বিনা গণনাতেও এরূপ অনুমান করিতে পারেন।

বালিকার নিকট সত্যই সে ফুলটি একটি অমূল্য রত্ন। প্রাণের মত করিয়া সে ঐ ফুলটিকে একটি কৌটাতে পূরিয়া কুটীরের বাহির দিকের একটি দেয়ালের একটি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল, প্রতিদিন লুকাইয়া সেখান হইতে ফুলটিকে বাহির করিয়া সে দেখিত আবার লুকাইয়া তুলিয়া রাখিত। সেই শুষ্ক মলিন ফুলটিতে সে রাজার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, দেখিতে দেখিতে সেই ফুলটি হইতে দেবাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া যেন তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করিত। গণৎকারের কথায় ক্ষেতিয়া সেই ফুলটির সন্ধানে ব্যগ্র হইল।

কয়দিন হইতে সে সর্ব্বদাই জুমিয়ার কুটীরে যাইতেছে, সুহারের সঙ্গে দেখাও হইতেছে—কিন্তু দুজনের আর কথাবার্ত্তা হয় না, সুহার ক্ষেতিয়াকে দেখিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কোন কাজের ছুতা করিয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া যায়, ক্ষেতিয়ার আসন্ন প্রাণ তাহাতে আরো অবসন্ন হইয়া পড়ে, কথা কহিবার আর সামর্থ্য থাকে না। তবে একটা সুলক্ষণ এই, কয়দিন হইতে সুহার আর জলাশয় তীরে যায় না। সেখানে যাইতে আর তাহার পা সরেনা। ক্ষেতিয়া প্রায় সারাদিনই তাহাদের কুটীরে থাকে, কয়দিন হইতে সে আর কাঠ ভাঙ্গিতেও বড় যায় না, তাহাকে এড়াইয়া কি করিয়া বালিকা সেদিকে যাইবে? তাহা হইলে সে ও সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। সেদিনকার রাতের কথা সে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত বলে নাই বটে কিন্তু আর একদিন যদি সুহারকে সেই দিকে যাইতে দেখে ত সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না—সুহার তাহা মনে মনে বুঝিয়াছে। ইহার উপর আবার স্বাভাবিক সঙ্কোচ—রাজা যদি আবার তাহাকে সেখানে দেখেন ত কি মনে করিবেন? ভাবিবেন বুঝি তাঁহাকেই দেখিতে আসিয়াছে। ছিঃ তাহা মনে করিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে, তাহা হইতে বরঞ্চ আজীবন সে আর তাঁহাকে দেখিবে না!

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর সেদিকে যায় না, যাইবার ইচ্ছায় বুক যেন ফাটিয়া উঠিতে থাকে, তবু সে সেদিকে যায় না, কোন মতে আপনাকে চাপিয়া রাখে। যখন মনে হয়, সে আর আপনাকে সামলাইতে বুঝি পারে না তাড়াতাড়ি সেই ফুলটিকে বাহির করিয়া দেখে। এইরূপে ফুল দেখাটা তাহার বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, সময় অসময় নাই সে বাগানের দিকে যায়, যাইয়া যখন তখন লুকাইয়া সেই দেয়াল হইতে কৌটাটি বাহির করে, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আবার ভয়ে ভয়ে তখনি রাখিয়া দেয়। এত সাবধান হইয়া সে এ কাজ করে, তবু তাহার মনে হয় ফুল দেখিবার সময় তাহার যত দুর সাবধান হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততদূর সাবধান হইতে পারে নাই। এমন কি একদিন সন্ধ্যাকালে ফুলের কৌটাটি রাখিয়া যখন সে ঘরে যাইতেছিল সে দেখিল ক্ষেতিয়া

বাগান দিয়া আসিতেছে—ছি এমনি সে অসাবধান! সেই রাত্রে সুহার ভয়ে ভয়ে আর একবার দেয়ালের নিকট আসিয়া দেখিল—কৌটা আছে কি না? কিন্তু যখন দেখিল কৌটাও আছে ফুলও আছে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইহার দুইদিন পরে কৌটাটি খুলিয়া সত্যই আর ফুল দেখিতে পাইল না। সে যেন বজ্রাহত হইল। এ কয়দিন সে ক্ষেতিয়ার সঙ্গে একটিও কথা কহে নাই—কিন্তু আজ ক্ষেতিয়া আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল="আমার ফুল লইয়াছ?" গণৎকার যদিও ক্ষেতিয়াকে বলিয়াছিলেন—তুমি ফুল লইয়াছ তাহা সুহারকে জানাইও না। কিন্তু মিথ্যা কওয়া ক্ষেতিয়ার অভ্যাস নাই—সে নিরুত্তর হইয়া রহিল! বালিকা আগেই সন্দেহ করিয়াছিল সেই লইয়াছে—এখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না।—বুঝিল ঈর্ষা পরবশ হইয়া সে তাহা চুরী করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় রাখিয়াছিস?"

ক্ষেতিয়া অপরাধীর মত বলিল—"ফেলিয়া দিয়াছি!"

বালিকার আর রাগের সীমা রহিল না। ক্ষেতিয়াকে সুহার না ভাল বাসুক তাহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিত, তাহার কষ্টে সে দুঃখিত হইত, কিন্তু আজ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সমস্ত হৃদয় তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল—সে বলিল—"ক্ষেতিয়া তুই আর এখানে আসিসনে, আমি তোর মুখ দেখিতে পারিনে।"

বালিকার আর তখন ইহাও মনে আসিল না—ক্ষেতিয়াকে রাগাইলে সে বিপদে পড়িতে পারে—সে রাতের কথা ক্ষেতিয়া তাহার বাবাকে বলিয়া দিতে পারে। ঐ কথা বলিয়া বালিকা চলিয়া গেল, কষ্টে ক্ষেতিয়ার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সে অপেক্ষা করিয়া রহিল, গণক বলিয়াছেন ফুল ফেলিয়া দিলে সুফল হইবে। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল—সুহারের ভাবের কিছুমাত্র ব্যতায় দেখিল না। তাহাকে দেখিলেই সুহারের সেই মধুর সুন্দর মুখ ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠে, তাহাকে সর্পের মত ভাবিয়া সুহার তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যায়। আরও কিছুদিন চলিয়া গেল, ক্ষেতিয়া আর পারিল না; আবার গণৎকারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গণৎকার সব শুনিয়া আবার রাগ করিলেন, বলিলেন—"সমস্তই তোর দোষ। আমি বলিয়াছিলাম জঙ্গুকে গিয়া বল, সব চুকিয়া যাইবে, তা হইল না। ভোগ্ এখন নিজের বুদ্ধির ফল ভোগ।"

ক্ষেতিয়া বলিল—"কিন্তু আপনি বলিয়াছিলেন—আগে ফুল ফেলিয়া দিতে—তাহাতে যদি ফল না হয় তখন—"

গনক। চুপকর। "তোর মত নির্ব্বোধের সহিত কথা কহা বৃথা।"

ক্ষেতিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"একটা মস্ত ভেড়া রাখিয়াছি।—"

গণৎকার বলিল—"শোন তবে! আর বিলম্ব না করিয়া জঙ্গুকে সব কথা খুলিয়া বল। আর আমার নাম করিয়া বল রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।"

ক্ষেতিয়া কাতরভাবে বলিল—আপনাকে দুইটা ভেড়া দিব, কিন্তু জঙ্গুকে—

গণৎকার। হাঁ জঙ্গুকে আমার নাম করিয়া বল রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।

ক্ষেতিয়া কহিল—"কিন্তু—কিন্তু রাজার সহিত সুহারের আর ত দেখা হয় না—সুহার দেখা করিতে যায় না। তবে জঙ্গুকে ওকথা নাই——

গণৎকার বলিলেন—"সুহারের সহিত আর রাজার দেখা হয় না?——

তবে কেন বলিলি ফুল ফেলার ফল হয় নাই! কাল তিনটি ভেড়া আনিবি—বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া বলিল—"আনিব, কিন্তু সে যে আমার মুখ দেখিতে চাহেনা।"

গণৎকার। সে ক্রমে হইবে। দিনকতক রাজাকে আগে ভুলুক। তবে আবার যদি রাজার সঙ্গে দেখা করে তখন জঙ্গুকে বলিবি বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া। কিন্তু তাহাতে ত কোন ভয় নাই! সুহারের ত—

"গণৎকার অধীর হইয়া বলিলেন "না না তাহাতে কোন ভয় নাই, যাহা বলিতেছি তাহাতে সব ভাল হইবে। আর কথা কহিস না।"

ক্ষেতিয়া আর কথা না কহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

গণৎকার উচ্চৈঃস্বরে আবার কহিলেন—"কাল তিনটি ভেড়া আনিতে ভুলিসনে।"

দারজিলিং।

আমাদের কলিকাতায় ফিরিবার দিন ত নিকটে আসিয়া পড়িল, এই চিঠিই হয়ত এখানকার শেষ চিঠি। আমার একজন বন্ধু গল্প করিয়াছেন দারজিলিং হইতে যাইবার সময় তিনি কাঁদিয়া গিয়াছিলেন, আমি ততদূর না বলিতে পারি, আমার দশাও তাঁর কাছাকাছি বটে।

তুমি যে ঠাকরুণ এই কথায় ভ্রূ তুলিয়া ঠোঁট টিপিয়া মুচকি হাসিয়া অস্থির হইলে? বুঝিয়াছি তোমার ভাবখানা, তুমি বলিতেছ 'চিরকাল কলকাতায় থেকে তার উপর আমাদের অতটা মায়া হোল না—আর তোমার দুদিনে এত!' তোমার মত কবিমানুষের মুখে কিন্তু এরূপ কথা নেহাত বেখাপ্পা শোনাচ্ছে? দুদিনে এত! কেন গা দুদিন ত দুদিন—একদিন একমুহূর্ত্তের শুভদৃষ্টিতেই ভালবাসা—এটাত তোমাদেরই কথা? তা যদি মানুষ সম্বন্ধে এ কথা খাটে স্থান সম্বন্ধেই বা কেন না খাটিবে? সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অনুভবই যদি ভালবাসা হয় আর সুন্দরের সহিত মিলন লাভই যদি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা হয়—তবে এমন সুন্দর এমন মধুর যে দৃশ্য তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে যদি প্রাণ না কাঁদিবে ত কাঁদিবে কিসে?

দেখ না কথার শ্রীখানা—ছুদিনে এত ? কেন ছুদিনই ত ভালবাসার সব। ভালবাসার ছুদিন যদি ধরিয়া রাখিতে পার তাহা হইলে ভালবাসাকেও ধরিয়া রাখিতে পার—নহিলে ছুদিন ফুরাইলে ভালবাসাও ফুরায়।

একথার মর্ম্ম, নূতনের মর্য্যাদা কবিরা যেমন বুঝেন এমন কি আর কেহ? তবে কেন বল দেখি ছুদিনের উপর হঠাৎ তোমার আজ এতটা আক্রোশ ?

কলিকাতার উপর তোমার যদি তেমন মায়া না থাকে সে কেবল সেখানে তোমার ছুদিনের বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া বইত নয়। একটি কবিতা মনে পড়িতেছে —

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূর স্মৃত কাহিনী কেবলি
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তবু মনে রেখো যদি বড় কাছে থাকি
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

বড় ঠিক কথা, কেবল দূরে গেলেই যে লোকে ভুলিয়া যায় এমন নহে, বেশী কাছাকাছি থাকিলেও অনেক সময় আবার বেশী ভুলিতে হয়। কলিকাতার সৌন্দর্য্য যে আমাদের চোখে লাগে না—সে কেবল আমরা কলিকাতার বড় বেশী কাছে অর্থাৎ প্রাণের ভিতর থাকি বলিয়া। সেই কারণে কলিকাতার সম্পর্কে তোমার মনে নাকি ছুদিনের ভাব একেবারে নাই তাই আর কি ছুদিনের উপর তোমার এত অবিশ্বাস, এত অনাদর। আমার কিন্তু ভাই এখানে মোটেই বেশীদিন হয় নাই, সত্য সত্যই আমি এখানে নিতান্ত ছুদিন আসিয়াছি; এখানে বাস করিয়া এখানকার দৃশ্য দেখিয়া আমার এখনো আশ মিটে নাই; গাছ পালা, মেঘ পর্ব্বত যা দেখি তাহাতেই ভোর হইয়া থাকি, আর নূতন প্রেমিকের মত মনে হয় চিরদিন এই দৃশ্যের মধ্যে থাকিলেও আমার নিকট ইহা পুরাতন হইবে না।

ইহার মধ্যে আমরা যে আর কোন নূতন দৃশ্য দেখি[redacted]তাহা যদিও নহে, নহেই বা কেন, একদিন আমরা জেল দেখিতে গিয়াছিলাম—জেলের বাহিরের দৃশ্য আমাদের কাছে নূতন না হউক, ভিতরের দৃশ্য আমাদের সম্পূর্ণ নূতন লাগিল, আমার ত এই প্রথম জেলখানায় প্রবেশ।

এখানকার সব-জজ পার্ব্বতী বাবু হপ্তায় ছুইবার জেল দেখিতে যান, তিনিই আমা-

আমাদের বাড়ী হইতে জেলখানা অনেকটা নীচে, বটানিকাল গার্ডেন ছাড়াইয়াও খানিকটা নামিতে হয়। অতটা হাঁটিতে আমাদের ভরষা হইল না, আমরা স্ত্রীলোকেরা কয় জন ডাণ্ডিতেই গিয়াছিলাম।

এখানকার এসিস্‌টেণ্ট-জেলার একজন বাঙ্গালী বাবু, আমরা জেলের বাগানে নামিতেই পার্ব্বতী বাবুর কথায় তিনি আমাদিগকে মৌমাছির বাসা দেখাইলেন। গভর্ণমেণ্টের খরচে এই মৌমাছি পালিত। একটা উঁচু রকম কাঠের বাক্স, তাহাতে মেলাই থাক, থাকগুলি মৌমাছিতে ভরা! আ্যাসিস্‌টেণ্ট বাবু থাকগুলি খুলিয়া বেশ যত্ন করিয়া আমাদিগকে সেসব দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে গায়ে মৌমাছি ভরিয়া গেল—চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, আমাদের ভয় হইতে লাগিল—বুঝি আমাদেরো ধরে—আমরা একটু সাবধান হইলাম—কিন্তু মৌমাছি-মাখা হইয়াও জেলার বাবুকে কিছুমাত্র চঞ্চল দেখিলাম না। শুনিলাম উহারা তাঁহাদের এত পোষা যে অসময়ে নিতান্ত বিরক্ত না করিলে তাহারা কামড়ায় না। এই এক একটি বাক্সে অসংখ্য মৌমাছি, সকলগুলি একটি রাণী মৌমাছির সন্তান ও আজ্ঞাকারী। রাণীর পালক কাটা, উড়িতে না পারিয়া তিনি বাক্সের মধ্যেই থাকেন, কাজেই তাঁহার সন্তানেরা বাঁধা না হইয়াও এইখানে বাঁধা থাকিতে বাধ্য, তাহারা মধু আহরণ করিয়া আনিয়া এই বাক্সের মধ্যেই চাক প্রস্তুত করে। এই মৌমাছিদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যকই পুরুষ মৌমাছি, তাহারা কোন কাজ করে না বসিয়া বসিয়া খায়, আর অন্যেরা যাহারা কাজ করে তাহারা যদিও পুরুষ নহে, কিন্তু ঠিক মেয়েও নহে কেননা তাহাদের সন্তান হয় না। যদি দৈবাৎ রাণীর একটি মেয়ে সন্তান হয় তবেই মুস্কিল। তাহার আবার সন্তান হইতে থাকে, সেই সন্তানদিগের সে রাণী হইয়া পুরাতন রাণীর প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে। তখন পুরাণো রাণী প্রমাদ গণিয়া নিজের দলবল লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি জেলখানার মৌচাকের একটি রাণী উক্ত কারণে তাহার বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল. অন্য আর একটি বাক্স তাহাকে দিতে হইয়াছে।

রাণীকে দেখা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না—তিনি তাঁহার চাকের ভিতর বসিয়াছিলেন—আমাদের দেখা দিতে বাহির হওয়া অপমান জনক জ্ঞান করিলেন।

শুনিলাম মৌমাছি পোষা বেশ লাভ জনক, আমাদের দেশের কৃষকেরা যদি এই কাজ করে ত ভাল হয়।

মৌমাছির বাসা দেখিয়া আমরা কয়েদখানার দিকে অগ্রসর হইলাম। রুদ্ধ গেটের সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী, আমাদের দেখিয়া গেটের তালা খুলিয়া গেট খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিবা মাত্র আবার সশব্দে আমাদের পশ্চাতে গেট বন্ধ হইল, তাহাতে তালা চাবি পড়িল, আমাদের গাটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, আমরাও বন্দী হইলাম। গেটের ভিতরেও সশস্ত্র প্রহরী, সে পাহারা অতিক্রম করিয়া আমরা

কয়েদ থানার কমপাউণ্ডে পড়িলাম, সেখান হইতে প্রথমে মেয়ে-কয়েদীদিগের গৃহে প্রবেশ করিলাম। একটি মাঝারি রকম, অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছয়জন কয়েদী, দুই জনের কোলে কচি ছেলে, একটি ৪।৫ দিন মাত্র জেলগৃহেই প্রসূত হইয়াছে।

ছয়জন অপরাধীর মধ্যে ৫ জনের অপরাধ সামান্য,দুইজন বিনা লাইসেন্সে মদ প্রস্তুত করিয়াছে আর তিনজনের সামান্য চৌর্য্যাপরাধ। এই তিন জনের একজন নিতান্ত বালিকা, এত অল্প বয়স হইতে এই কাজে তাহাকে ব্রতী হইতে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল।

অবশিষ্ট অপরাধীর অপরাধ গুরুতর, সে খুন করিতে গিয়াছিল, যাহাকে তাহাকে নহে নিজের স্বামীকে। শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমাদের একজন সঙ্গী বন্ধু মহাশয় তাহাকে বলিলেন—"উঠিয়া দাঁড়াও"। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। সকলের চোখ তাহার মুখের দিকে পড়িল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্য হইলাম, খুনী শুনিলে যেরূপ ভীষণ দেখিতে মনে হয়, সেরূপ দেখিলাম না। তাহাকে দেখিতে বরঞ্চ ভাল, বয়স অল্প, চেহারা মন্দ নয়, মুখে ভীষণতা কিছুই নাই, তাহার পরিবর্ত্তে একটা অনুতাপের ভাবে একটা সঙ্কোচের ভাবে তাহাকে যেন অবনত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা হইল না, একটা গভীর দুঃখে হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল, কেবলি মনে হইতে লাগিল, এমন কুমতি মানুষের কেন আসে!

সে দাঁড়াইলে আমাদের উল্লিখিত বন্ধু মহাশয় অতি নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ দেখ—যে স্বামীকে খুন করিতে গিয়াছিল তাহাকে ভাল করিয়া দেখ" তাঁহার এই নিষ্ঠুরতায় আমাদের ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। সে যাহা করিয়াছে তাহার জন্যই কি সে যথেষ্ট মরিয়া নাই--তাহার উপর কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। আমরা তাঁহাকে একটু তিরস্কার করিয়া চুপ করিতে অনুনয় করিলাম—তিনি উত্তর দিলেন—"সেত বাঙ্গালা জানে না।" কিন্তু তখনি শোনা গেল সে রংপুরী বাঙ্গালী। একটু পরে তাহাদের ঘরের বাহিরের দালানে তাহাদের খাবার দিয়া গেল। আমরা তাহাদের খাওয়া দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, শুনিলাম তাহারা পুরুষের নিকট খাইবে না—পুরুষেরা চলিয়া গেলেন, ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা খাবার সম্মুখে করিয়া বসিল, আমরাও বাহিরে আসিয়া তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম এক এক খানি লোহার ছোট ছোট তাওয়ার উপর কাল জলের মত কড়াইয়ের ডাল, আর সঙ্গে সঙ্গে চেপটা চেপটা এক একখানি পাঁউরুটি। যাহাদের কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহারা শুনিলাম রুটি বা ভাতের সঙ্গে কিছু কিছু মাংস পায়।

এদেশী স্ত্রীলোক কয়জন তখনি খাইতে বসিয়া গেল—কিন্তু রংপুরী সেই অপরাধী

বসিয়া রহিল—আমাদের সাক্ষাতে খাইতে তাহাদের লজ্জা করিতে লাগিল। এই সময় সেই রংপুরীকে আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সত্য কি তুমি খুন করিতে গিয়াছিলে ?

"হাঁ৷ আমি খুন করিয়াছিলাম"

"কেন ?"

"আমার স্বামী আমাকে বাপের বাড়ী যাইতে দিত না"

"তোমার বয়স তখন কত ?"

"১০ বৎসর" (দেখিতে তাহাকে ২০।২২)

'কেহ শিখাইয়া দিয়াছিল ?"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কলের পুতুলের মত উত্তর দিয়া যাইতেছিল। যেন সেই কথা গুলা ক্রমাগত বলিয়া বলিয়া তাহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে এখন তাহার নিকটে সে কথার একটা কোন অর্থ নাই। কিন্তু যেই জিজ্ঞাসা করা হইল—"তোমাকে কেহ শিখাইয়া দিয়াছিল ?"—

অমনি তাহার সেই নির্জ্জীব স্বর সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল, সে প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"না আমাকে কেহ শিখায় নাই আমি আপনি খুন করিয়াছিলাম"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে জন্য কষ্ট হয় ?

বলিল—"তা আর হয় না—তার পর থেকেই কষ্ট হইয়াছে"

"খালাস হইয়া কোথায় যাইবে ?

"বাপের বাড়ী"

"যদি বাপ না নেয়" ?

"কলকাতায় যাইব"

(কলিকাতা আর কি পাপী তাপীদের আশ্রয়)

"তোমার স্বামীর কাছে যাইবে না ?"

'না'

তাহার কথার মধ্যে দুইটি ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিলাম। একটি, সে কখনো বলে না—'আমি খুন করিতে গিয়াছিলাম'; সব সময়ই বলে 'খুন করিয়াছিলাম,' তাহার মনে যেন সেই খুনের চেষ্টা খুনের মতই অঙ্কিত হইয়া গেছে। দ্বিতীয়, অন্যে যে তাহার খুনের সঙ্গে লিপ্ত ছিল এইটি লুকাইবার জন্য একটি বিশেষ আগ্রহ। তাহার কথায় মনে হইল তাহাকে ফাঁসি কাঠে লইয়া গেলেও যেন সে কাহারো নাম প্রকাশ করিবে না। তাহার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হইতে লাগিল—বুঝি তাহার অপরাধের মধ্যে সত্যই আর কেহ লিপ্ত ছিল। আমাদের এই সন্দেহ যে অকারণ নহে তাহাও পরে জানিলাম। আর ইহাও জানিলাম অপরাধী মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিয়াছে

কিন্তু পুলিসের সহস্র চেষ্টাতেও অন্যের দোষ স্বীকার করে নাই। তাহার ভীষণ পাপের মধ্যেও একটা খাঁটি অনুরাগের বন্ধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাহার বয়সের কথা সে আমাদের যাহা বলিয়াছিল—শুনিলাম তাহা ঠিক নহে। তাহার যখন বয়স আঠার উনিশ তখন সে জেলে আসে—জেলে তিন বৎসর রহিয়াছে। আরো ৪ বৎসর পরে তাহার মুক্তি হইবে।

অপরাধী জানিয়া শুনিয়া যে নিজের বয়স ভাঁড়াইয়াছিল—এরূপ মনে হয় না। ছোট জাতের মেয়েদের মনে তাহাদের বয়স সম্বন্ধে প্রায়ই একটা গোলমাল দেখা যায়, বয়সটা তাহারা কখনই প্রায় ঠিক বলিতে পারে না।

মেয়েদের কাছ হইতে আমরা পুরুষ বন্দীদিগের ঘরের দিকে গেলাম। এক ঘরে ছোট লোকদের সঙ্গে একজন ভদ্র ছোকরা হাজতে রহিয়াছে দেখিলাম। সে পোষ্ট আফিসে কাজ করিত, চিঠি পত্র খুলিয়া নোট চুরীর চেষ্টা করিতে গিয়াছিল। বেচারাকে দেখিলে মায়া হয়—নেহাত ছেলেমানুষ। আর এক জন ভদ্রলোক পোষ্ট মাষ্টার তহবিল ভাঙ্গার অপরাধে বন্দী। পীড়িত বলিয়া একটি আলাদা ঘরে তাহাকে রাখা হইয়াছে। আলদা ঘর হইলে কি হয় দারজিলিংয়ের এই শীতে এই অসুখ শরীর লইয়া বেচারা মেজেতে পড়িয়া আছে। শুনিলাম একজন সামান্য ইংরাজ হইলেও কয়েদখানায় সে একখানি খাটিয়া পায় আর দেশের লোক যতই সম্ভ্রান্ত হউন না কেন ভূমি শয্যাই তাহার শয্যা। তাহা ছাড়া ইংরাজ কয়েদী ও দেশীয় কয়েদীর আহার্য্যের ত তুলনাই নাই, দেশীয়দের খাদ্যের কথা ত বলিয়াছি, ডাল নামের কাল জল—আর একখানা রুটি, কিম্বা ভাত, ইহার সঙ্গে যাহারা দুই এক টুকরা মাংস পায় তাহাদের ত মহাভোজ—কিন্তু ইংরাজদের রীতিমত মদ মাংসের বন্দবস্ত। কিন্তু ইহাতেও আমাদের দুঃখ নাই, বাস্তবিক আমাদের ছোটলোকদের অপেক্ষা ইংরাজ ছোটলোকদের ভাল খাওয়া অভ্যাস—সুতরাং ইংরাজ বাঙ্গালীকে একইরূপ খাদ্য দিলে ইংরাজদিগের প্রতি অযথা আচরণ করা হয়। কিন্তু আমাদের ভদ্রলোকদিগেরও ত তেমনি ছোটলোকদের অপেক্ষা ভাল খাওয়া অভ্যাস, তাঁহাদের বেলাও কেন আমরা গভর্ণমেণ্টের এই বিবেচনাটুকু দেখিতে পাই না?

খাদ্য ত এখানে ভদ্র অভদ্রের একই, কেবল তাহাই নয়, যত বড় ব্রাহ্মণই হউন না কেন তাঁহার হাড়ি ডোম সকলের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া খাইতে হয়। আমাদের জাতিপ্রথা ধর্ম্মের সহিত জড়িত, গভর্ণমেণ্ট যদি ইংরাজদিগের ক্ষুদ্র আবশ্যকের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন ত আমাদের এত প্রধান আবশ্যকের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিবেন না? আমাদের দেশহিতৈষীগণ এতদিকে এত আবেদন করিতেছেন আর হতভাগ্য কয়েদীদিগের কয়েদ-কষ্ট লাঘবের জন্য কেন যে চেষ্টা না করেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা নিজে একবার কয়েদখানায় গিয়া কয়েদীদিগের বিশেষতঃ ভদ্রকয়েদীদের এই সকল কষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করুন—যদি

তাঁহাদের হৃদয় থাকে ত তাঁহারা এই কষ্ট প্রশমনের চেষ্টা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না।

আমরা সেদিক ছাড়াইয়া একটি বড় উঠানে আসিয়া পড়িলাম। মস্ত উঠান্ পুরুষ-কয়েদীতে ভরা, তাহারা সকলে খাইতে বসিয়াছে। অনেকে এ সময়েও শিকলি বাঁধা, যাহারা কয়েদখানা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের এই শাস্তি। এক সঙ্গে এতগুলা কয়েদীর পাপতাপের কষ্ট দুঃখের মুখ দেখিলে মনে যে কিরূপ একটা কষ্টের ভাব হয় তাহা বলা যায় না। এখানে কয়েদীদিগের মধ্যে একজন খুনীও ছিল।

আমরা উঠানের ধার দিয়া রুটি প্রস্তুতের যে কলঘর সেইখানে গমন করিলাম। তখনো অনেক কয়েদী কলঘরে কাজ করিতেছিল। যেখানে রুটি সেঁকা হইতেছে—সে ঘরে এত তাপ যে আমরা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। উনুন ঘরের পাশেই ময়দার ঘর—এই ঘরের দেয়ালের একস্থান নূতন মেরামৎ দেখিলাম। এইখানে গর্ত্ত করিয়া কয়েকজন কয়েদী পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। গর্ত্ত প্রায় যখন শেষ হইয়াছে একখানা ইটের মাত্র ব্যবধান আছে সেইখানা ঠেলিয়া ফেলিলেই হয়—এই সময় প্রধান অপরাধী যাহার উপদেশে অন্যেরা এই কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তিনিই প্রহরীকে খবর দিলেন যে কয়েদী পলাইতেছে! ! তিনি ভাবিলেন তিনি পুরস্কৃত হইবেন। কিন্তু যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—তাহার শুদ্ধ শাস্তি হইল।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। জেল খানা ছাড়াইয়াও ক্রমাগত জেলখানার কথাই মনে পড়িতে লাগিল। আমাদের চারিদিকে মধুর সুন্দর দৃশ্য,—আশে পাশে তরুশ্রেণী, তরু রাজির মধ্যে মধ্যে জল প্রপাতের উচ্ছ্বাস, সম্মুখে সুবর্ণমেঘচূড়-পাহাড়,—মাথায় নীলাকাশ, নিম্নে শ্যাম-পর্ব্বতের তরঙ্গ নিচয়—এই সুখ-কর শান্তিময় দৃশ্যের মধ্যে জেলের সেই দুঃখকষ্ট পাপতাপের চিত্রই মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে চন্দ্র উঠিল, আমাদের বামদিকে ঘন বৃক্ষরাজির উপর মৃদুনীলাভ আকাশে চাঁদ, সম্মুখে দারজিলিং পাহাড়ের শ্যামল গাত্রে শুভ্র বাড়ীর স্তর-বিন্যাস—দক্ষিণে দিগন্তে পাহাড়ের উপর ঘনঘোর কালমেঘ, অস্তমান সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো সেই কাল মেঘের উপর পড়িয়া কি মনোহর ভাবে চিক চিক করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ প্রশান্ত, কখনো গাছ পালার মধ্য দিয়া—কখনো চাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা আমাদের লইয়া কেবল হুহু শব্দে ছুটিতেছে—মলিন চন্দ্রালোকে সেই বিজনতা, সেই প্রশান্ততা—আমাদের প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত যেন পৌঁছিয়া দিতেছিল।

বাড়ী পৌঁছিয়াও আমরা ঘরে থাকিতে পারিলাম না; সেই রাত্রে আমরা কয়জনে মিলিয়া মলরোডে যাত্রা করিলাম।

সূর্য্যালোকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যেরূপ ঝলসিত জমাট মূর্ত্তি দেখায়—এখন জ্যোৎস্না

লোকে তাহার স্বতন্ত্র শ্রী, এখন কাঞ্চন-জঙ্ঘার শ্রেণী মেঘের গায়ের উপর উজ্জ্বল সুদীপ্ত তরল মেঘের মতই দেখাইতেছিল। আমাদের বামদিকে সেই মুক্ত পাহাড় দৃশ্য, আর দক্ষিণদিকে অবজারবেটরি পাহাড়ের দুই ঝাউ গাছের ভিতর জমাট নীলাকাশের মধ্যে চাঁদ। আমরা যখন নিস্তব্ধে সেই নির্জ্জন পাহাড় তলে দাঁড়াইয়া চাঁদের দিকে চাহিয়াছিলাম, আমার মনে হইল—তখন আমরাও যেন চন্দ্রলোকের লোক হইয়া গিয়াছি।

সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ঘরের চারিপাশে যখন আবদ্ধ হইলাম তখন প্রকৃতির সে মুক্তশোভা মন হইতে মুছিয়া গেল, জেলের সেই রংপুরী অপরাধীর ছবিই মনে পড়িতে লাগিল, বারবার মনে হইতে লাগিল "কেন সে এমন কাজ করিয়াছিল?"

তাহার পর এ পর্য্যন্ত নূতন কোন জায়গায় আর আমরা যাই নাই, নূতন আর পাই-বই বা কোথা? দারজিলিংয়ের ভিতর দেখিবার যাহা আছে কিছুইত প্রায় বাকী রাখি নাই, বাকী যা আছে সে সব এখান হইতে অনেকটা দূরে দূরে—যেমন রংরুণ, রঞ্জিত ও তিস্তার মিলন, সমডুকফুক ইত্যাদি। সমডুকফুক দারজিলিং হইতে প্রায় দুই তিন দিনের পথ। আমাদের কয়েকটি বন্ধু কিছু দিন হইল সেখানে গিয়াছিলেন। দারজিলিং হইতে তাহা এত উঁচুতে যে সেখানে এখন বরফ জমা দেখা যায়। মলরোড ও পার্ক ছাড়া—দূরে যাওয়ার মধ্যে আমরা এখন কাকঝোরা দেখিতে প্রায়ই যাইয়া থাকি। সেই গভীর গম্ভীর নিনাদশীল জলোচ্ছাস রাশির যে আকর্ষণ শক্তি তাহা ত তোমাকে বলিয়াছি—কিন্তু আর একটি কথা গোপনে বলি, ইহা ছাড়াও এস্থানের আর একটি গুরুতর আকর্ষণ আছে, সেটি সন্দেশের লোভ।

ভুটিয়াস্কুলের হেড মাষ্টার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কাকঝোরার অতি নিকটে বাস করেন। এলাহাবাদের যেমন মিত্র মহাশয়েরা দারজিলিংয়ের তেমনি ত্রৈলোক্য বাবুরা। দারজিলিং আসিয়া ইহাঁর নিকট উপকৃত হন নাই এমন বাঙ্গালীই নাই।

ইহাঁর স্ত্রী নিজে যেমন ঢালাগোলা সাদাসিধে মিষ্টি লোক, তেমনি মিষ্টি রকম তিনি সন্দেশ প্রস্তুত করিতে পারেন। এই দুই মিষ্টিতে মিলিয়া আমাদের এতটা মজাইয়া তুলিয়াছে—যে মরিবার আশা আছে—তবু ইহাদের ভুলিবার আশা নাই। আমার মনে হইতেছে কলিকাতায় যখন ফিরিব তখন তাঁহাকে মনে করিতে তাঁহার সন্দেশ মনে পড়িবে তাঁহার সন্দেশকে মনে করিতে তাঁহাকে মনে পড়িবে—এইরূপে কোনটাই আর ভোলা হইবে না। ইহাঁদের বাড়ী ও স্কুল একই বাড়ীতে। আমরা একদিন স্কুলের সময় আসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়াছিলাম। স্কুলে ছোকরা নিতান্ত অল্প। সব শুদ্ধ বোধ হয় ২০।২২টি ছাত্র। তাহার মধ্যে দুএকটি মাত্র উঁচু ক্লাশের। ভুটিয়ারা যাহাতে ছেলে স্কুলে দেয় সেজন্য গর্ভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা। এ স্কুলের ত বেতন নাই আবার যাহারা বোর্ডার তাহারা গভর্ণমেণ্টের খরচে এইখানে খায়, পরে, থাকে।

আশ্চর্য্য এই তবুও ছাত্র বেশী মেলে না। দুএকটি ছোকরা বাঙ্গলা বোঝে, ত্রৈলোক্য বাবুর ছেলেদের কাছে শিখিয়াছে। যে ছেলেগুলি বোর্ডার তাহাদের ওরি মধ্যে তবু পরিষ্কার কাপড় চোপড়—তাদের কি না একটা নিয়মে থাকিতে হয়। কিন্তু অন্যদের কাপড় এত ময়লা, চেহারা এত অপরিষ্কার যে মুটে মজুরের সঙ্গে কিছুই প্রায় তফাৎ নাই। আগেই ত বলিয়াছি, স্নান করিতে কাপড় বদলাইতে এদেশের লোক যেন জানে না।

ভুটিয়া স্কুলে যাইতে হইলে বাজারের নিকট দিয়া যাইতে হয়। বাজার বেশ বড়। শুধু বড় নহে, কলিকাতার সকল খাদ্য দ্রব্যই প্রায় এখানে পাওয়া যায় তবে দাম প্রায় দেড়া। এখানে কেবল পাওয়া যায় না তাজা মাছ এবং কলিকাতার সকল রকম মিষ্টান্ন। মাছ কলিকাতা হইতে রোজই এখানে আসে বটে, কিন্তু নুনের ভিতর বন্দী হইয়া আসে, নহিলে এখানে আসিয়া পৌঁছিবার আগেই তাহা অখাদ্য হইয়া যাইত। তাজা মাছ যে একেবারেই পাওয়া যায় না তাহাও নহে, কখনো কখনো রঙ্গিতের মাছ এখানে বিক্রয় করিতে আনে—সে বেশ তাজামাছ। ঘি মাখন এখানে বাজারে যা পাওয়া যায় তা প্রায় ভাল নয়। আমরা বিশ্রী মাখনের জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন হইয়াছিলাম। এখন খুব ভাল মাখনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, দাম কিন্তু তার তেমনি বেশী—২॥ টাকার এক সের! কি করা যায় তাহাই লইতে হয়। এখন জানা যাইতেছে—বাছিয়া লইতে পারিলে ঘিও নাকি বেশ ভাল পাওয়া যায়। এখানকার ফলের মধ্যে কমলালেবু ও পিচই বেশ ভাল। কমলালেবু যদিও ছোট ছোট কিন্তু বেশ মিষ্ট। পিচ বেশ বড় বড় ও সুস্বাদু। কিন্তু এখানকার বড় এলাচ খাইতে যেমন ভাল এমন অন্য কিছুই না। আসল কথা, কলিকাতায় আমরা ত সুপক্ক তাজা বড় এলাচ খাইতে পাই না যাহা পাই সবই শুকনো, সুতরাং এখানকার পরিপক্ক তাজা এলাচে আর কলিকাতার সেই শুকনো এলাচে পাকা আম—ও আমসত্ত্বের প্রভেদ। আমি যখন যাইব তোমাদের জন্য কিছু কিনিয়া লইয়া যাইব—কিন্তু সেই আশায় তুমি যদি এখন হইতে বড় এলাচ কেনা বন্ধ কর—তাহা হইলে তোমার পক্ষে আমার পক্ষে কাহার পক্ষেই সেটা সুবিধার বিষয় নহে।

একদিন আমরা ডাণ্ডি করিয়া ভুটিয়া স্কুলে যাইতেছিলাম—দেখি লেডি বেলির ঝিংরিক্সা (মানুষে টানা ছোট বগ্গি) ও তাঁহার তকমাধারী বেহারাগণ বাজারে দাঁড়াইয়া। পরে শুনিলাম লেডি বেলি বাজার দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে নিজে জিনিসপত্র কিনিয়াছেন আর বাজারে ছোট ছেলেদের পয়সার হরির লুট বিলাইয়াছেন।

পয়সা ফেলিয়া ছোটছেলেদের ছুটান এখানকার একটি খেলা। আমরা যখন দারজিলিং আসি, দেখি গাড়ী ষ্টেসনে আসিবার আগে হইতে গাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি ছেলে ছুটিয়া ছুটিয়া ভিক্ষা করিতেছে, আর গাড়ী হইতে মাঝে মাঝে পয়সা পড়িতেছে—এই

রূপে তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা চলিতেছে। ষ্টেসনে ষ্টেসনে ছোট ছোট ছেলেরা নানা-রকম তাজা ফার্ণ, পরগাছা, এক রকম লাল লাল পোকা এই সব বিক্রিও করিয়া বেড়ায়। আসিবার সময় তাহা কেনা বৃথা মনে হইল,—যাইবার সময় ভাবিতেছি কতকগুলি কিনিয়া লইয়া যাইব।

ডীন জোনাথান সুইফ্‌ট্‌।

যে সকল প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভাময়ী লেখনীর গুণে রাণী অ্যানের রাজত্ব-কাল ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির কাল বলিয়া গৌরব লাভ করিয়াছে, সুইফ্‌ট তাহার একজন প্রধান লেখক। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের অনেকেই সুইফ্‌টের নাম জানেন; কিন্তু তাঁহার রচিত গলিবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য রচনা সাধারণের প্রায় পরিচিত নহে, সেই জন্য সাহিত্য সমাজে সুইফ্‌টের নাম আছে কিন্তু তত আদর বা প্রতিপত্তি নাই। সুইফ্‌ট যে শুধু একজন লেখক ছিলেন তাহা নহে তিনি সেই সময়ের রাজনৈতিক কার্য্যের একজন প্রধান নেতা ছিলেন, তিনি দেশের মধ্যে একজন বীর-পুরুষ ছিলেন। স্বজাতির হিতার্থে তিনি জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন, দুর্ব্বল প্রজা-দের ন্যায্য অধিকারের জন্য রাজা ও তাঁহার প্রিয় ব্যক্তিদের সহিত প্রাণপণে নির্ভয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কার্য্যেই তাঁহার লেখনী শক্তি অধিক সঞ্চালিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার জলন্ত বিদ্রূপময় লেখায় তাঁহার পক্ষীয় রাজমন্ত্রীদের অভীষ্টও সিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার স্বাধীন-ভাবপূর্ণ লেখায় তিনি সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু এ লেখা সেই সময়ের ঘটনা, অবস্থা ও ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে লিখিত সুতরাং সেই সেই ঘটনা ও ব্যক্তিগণের প্রাধান্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে লেখারও উদ্দেশ্য চলিয়া গিয়াছে। সাময়িক সংবাদ পত্রের এক একটী উৎকৃষ্ট রচনা লোকের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা সাময়িক অনেক গুরুতর কার্য্য সিদ্ধি হয় কিন্তু একবার কার্য্য সিদ্ধি হইয়া গেলে তৎসমুদায়ের আর সাধারণের নিকট মূল্য থাকে না। তত্ত্ব-অন্বেষক ইতিহাস লেখক ভিন্ন কেহ আর আগ্রহের সহিত সে সকল রচনা পাঠ করেন না। এই কারণে সুইফ্‌টের লেখারও পরে তত আদর রহিল না। সুইফ্‌ট তাঁহার নিজ মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া স্বলিখিত কবিতার মধ্যে তাঁহার লেখার পরিণাম নিজেই এইরূপ সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"বন্ধুগণ তরে মোরা কেন করি শোক,
এ ক্ষতি হয় যে পূর্ণ সব চেয়ে ত্বরা ;
বৎসর একটী গেলে সব চলে যায়,
আর ত ডীনের নাম কেহ নাহি করে,
তার তরে হৃদি শূন্য নহেত কাহারো,
মনে হয় নাক সে যে ছিল এক দিন।
অ্যাপলোর প্রিয়পুত্র কোথায় সে এবে !
সে গিয়েছে চলে, যাবে লেখাও তাহার,
সাধারণ অদৃষ্ট সে সহিবে নিশ্চয় ;
কেহ না আদরে আর সে রূপ লেখার।
পাড়াগেঁয়ে জমীদার কোন একদিন
লিণ্টন * দোকানে গিয়ে বলিবে মশায়
"কবিতা ও সাহিত্যের বই চাহি আমি—
সুইফ্‌টের লেখা ;" "শুনিয়াছি নাম বটে,
মরেছে সে বৎসরেক ?" উত্তরি লিণ্টন—
বৃথা তন্ন তন্ন করি খুঁজিয়া দোকান
বলিবে তখন "সে পুস্তক মহাশয়
নাই হেথা, ডক-লেনে † পাইবেন তাহা।
পুরাণ পুস্তক যত ছিল সব আমি
ময়রার দোকানেতে দিয়াছি পাঠায়ে।
আশ্চর্য্য লাগিছে মোর বৎসরেক হ'ল
তবু সে পুরাণ লেখা আছয়ে বাঁচিয়ে !
বোধ করি হেথা তুমি এসেছ নূতন !
সহরের রীতি নীতি কিছুই না জান।
বিখ্যাত ছিলেন ডীন তাঁহার সময়ে,
লিখিতেন তিনি ছন্দ মিলান পয়ার,
সে ধরণ লেখার যে কাল গেছে চলে,
সহরের রুচি এবে হয়েছে উন্নত,
পুরাতন বই সে হেথায় নাহি থাকে
হেথা আছে ভাল ভাল নব যত বই"

* * * *

---

* প্রধান পুস্তকের দোকান।

† যেখানে পুরাণ বই পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের বটতলা।

স্বইফ্‌ট্ বিদ্রূপ ছলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন আজ যথার্থই তাহা ঘটিয়াছে। তাঁহার সময়ে যে লেখায় ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, রাজা হইতে সামান্য ভিখারী পর্য্যন্ত যে লেখায় আকৃষ্ট হইয়াছিল আজ তাহা সাধারণের নিকট আকর্ষণ-হীন। কিন্তু প্রতিভা কখন লয় পায় না। এই লেখার মধ্যেই স্বইফ্‌ট যে অসাধারণ প্রতিভা রাখিয়া গিয়াছেন সেই প্রতিভার গুণে এখনও তাঁহার লেখা অমর, এখনও লোকে তাহা পড়িয়া চমৎকৃত হয়। স্বইফ্‌টের জীবন আমাদের একটী শিক্ষা স্থল। প্রতিভার বলে দীন দরিদ্র আশ্রয়হীন স্বইফ্‌ট সকলের সম্মাননীয় ও রাজ্যের একজন প্রধান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন প্রতিভার জয় হইবেই; দেখাইয়া গিয়াছেন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। আবার এই স্বইফ্‌ট জীবনের শেষভাগে ক্ষমতা হারাইয়া সম্মান হারাইয়া অনাদরে নির্ব্বাসনে দিন কাটাইয়া জ্ঞান শূন্য অন্ধ উন্মত্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন অহঙ্কারের পতন হইবেই, দেখাইয়া গিয়াছেন প্রতিভা বা পার্থিব ক্ষমতা বা রাজনৈতিক খ্যাতি কিছুই যথার্থ সুখ প্রদানে সক্ষম নহে।

স্বইফ্‌টের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাঁহার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দুঃখ তাঁহার সহচর। স্বইফ্‌টের পিতা ডবলিনের অন্তঃপাতী King's Inn নামক হোটেলে ষ্টুয়ার্ড বা তত্ত্বাবধারকের কর্ম্ম করিতেন। একটী কন্যা ও গর্ভবতী স্ত্রী রাখিয়া ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী কন্যার ভরণপোষণোপযোগী কোন উপায় করিয়া যান নাই, এমন কি মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীকে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন যে পরে স্বামীকে কবর দিবার নিমিত্ত তিনি সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর এই বিধবার ভরণপোষণের ভার তাঁহার ভ্রাতা গডউইন গ্রহণ করিলেন। গডউইনের অবস্থাও এখন পূর্ব্বকার ন্যায় সচ্ছল ছিল না, নানা প্রকার ঘটনা বশতঃ তিনিও এই সময় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ভগিনীকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিতে পারিতেন না। বিধবার নিতান্ত দরিদ্র ভাবে বাস করিতে হইত। এই দুঃসময়ে পিতার মৃত্যুর ৮ মাস পরে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ভবিষ্যৎ ডীন স্বইফ্‌ট দরিদ্র অবস্থায় ডবলিন নগরে জন্মগ্রহণ করিলেন।

স্বইফ্‌ট আয়র্লাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু জাতিতে তিনি ইংরাজ ছিলেন। এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে অদৃষ্ট চক্রে স্বইফ্‌ট প্রথম ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিলেন। এই সময়] তাঁহার ধাত্রী তাহার ইংলণ্ডস্থ কোন আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া অর্থ প্রাপ্তির আশায় এই আত্মীয়ের নিকট গমন করে এবং স্বইফ্‌টের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাঁহাকেও গোপনে সঙ্গে লইয়া যায়।

স্বইফ্‌টের মাতা পরে পুত্রের সন্ধান পাইলেন, কিন্তু স্বইফ্‌ট অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন পাছে উপর্য্যুপরি সমুদ্র যাত্রায় তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় সেই ভয়ে তাঁহাকে পুনরায়

তখন আয়র্লাণ্ডে আনিতে সাহস করিলেন না। সুইফ্‌ট ৫ বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে আয়র্লাণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় তিনি সহজ বানান ও বাইবেল পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। আয়র্লাণ্ডে আসিবার অল্পদিন পরেই গডউইন তাঁহাকে নিজব্যয়ে স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। ৮ বৎসর স্কুলে থাকিয়া সুইফ্‌ট তথাকার উপযুক্ত লেখাপড়া এক প্রকার শিখিয়া ১৪ বৎসর বয়সে ট্রিনিটী কলেজে প্রবেশ করিলেন। এখানেও গডউইন তাঁহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। এই দারিদ্রতা ও নির্ভরতার অপমানে সুইফ্‌ট বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মর্ম্ম পীড়িত হইতেন এবং তাঁহার জীবনে যত দোষ দেখা যায় তাহাও ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুইফ্‌টের চরিত্রের একটী দোষ কৃতজ্ঞতাহীনতা। গডউইনের অনুগ্রহের নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক তিনি গডউইনকে ঘৃণা করিতেন। সুইফ্‌টের কলেজের জীবনও বড় প্রশংসা-যোগ্য নহে। কলেজে তিনি নিতান্ত নিয়ম-বিরুদ্ধ ভাবে ও আলস্যে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কলেজের পাঠ্য-পুস্তক না পড়িয়া আপনার নির্ব্বাচিত কাব্য ইতিহাস পাঠ করিতেন, শিক্ষকদের কথা পালন করিতেন না এবং অন্যান্য দুষ্ট বালকদিগের সহিত যোগে কলেজের নিয়ম বিরুদ্ধ অনেক কর্ম্ম করিতেন। নির্ভরতার প্রতি ঘৃণার ভাব হইতে উৎপন্ন এই অবাধ্যতা দোষে তিনি অনেক নিয়ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও অপকর্ম্ম করেন নাই। এই দোষে তিনি সময় মত বি এ ডিগ্রী পাইলেন না, যখন অনেক দিন পরে ডিগ্রী পাইলেন তখনও "অনুগৃহীত" চিহ্নিত ডিগ্রী পাইলেন। অনুগৃহীত চিহ্নিত ডিগ্রী অর্থাৎ ছাত্র নিজগুণে এ ডিগ্রীর অধিকারী নহে, তবে ইউনিভার্সিটি দয়া করিয়া তাঁহাকে এ ডিগ্রী প্রদান করিতেছেন—এই ডিগ্রী পাইয়া সুইফ্‌ট সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিয়ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই দোষে তিনি ৭০টী শাস্তি পাইয়াছিলেন। অবশেষে কলেজের ডীনকে অপমান করা অপরাধে তিনি সাধারণের সম্মুখে ডীনের নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হয়েন এবং তাঁহার ডিগ্রী কাড়িয়া লওয়া হয়। এই অপমানের পর সুইফ্‌ট কলেজ ছাড়িয়া ২১ বৎসর বয়সের সময় দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তাঁহার কলেজে বাস করিবার মাঝামাঝি সময়ে গডউইনের মৃত্যু হইয়াছিল এবং গডউইনের ভ্রাতা ড্রাইডেনের হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের ভার পড়িয়াছিল। ড্রাইডেন গডউইন অপেক্ষা দরিদ্র ছিলেন সুতরাং কলেজে সুইফ্‌টের অর্থসঙ্গতি নিতান্ত অল্প ছিল। কিন্তু অর্থব্যয় সম্বন্ধে সুইফ্‌ট খুব সতর্ক ও মনোযোগী ছিলেন সেই জন্য কলেজে অর্থ সম্বন্ধে কোন গোলে পড়েন নাই। বন্ধুহীন, সঙ্গতিহীন সুইফ্‌ট কলেজ ছাড়িয়া প্রথমে মাতার আবাসে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতারও তাঁহাকে সাহায্য করিবার মত সচ্ছল অবস্থা ছিল না, তিনি সুইফ্‌টকে সাহায্য পাইবার জন্য তাঁহার আত্মীয় লেডী টেম্পলের নিকট

প্রেরণ করিলেন। সার উইলিয়ম টেম্পল তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজ ভবনে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার আবাসে বাস করিবার সময় সুইফট গত জীবনের কলঙ্ক অপনীত করিবার মানসে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন কালের মধ্যে সুইফ্‌ট একবার গুরুতর পীড়িত হইলেন জীবনের আর আশা রহিল না। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল কিন্তু এই রোগের ফল সুইফ্‌ট আজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। কখনও তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ অধ্যয়ন গুণে এবং স্যর টেম্পলের সন্তোষকর নানা বিধ কর্ম্ম করিয়া ক্রমে সুইফ্‌ট স্যর টেম্পলের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইলেন। টেম্পল সুইফ্‌টকে এত দূর বিশ্বাস করিতেন যে তিনি নিজে যখন বাত রোগে শয্যাগত ছিলেন সুইফ্‌টের হস্তে অনেক বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মের ভার প্রদান করিতেন এবং ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় উইলিয়ম যখন টেম্পলের আবাসে আগমন করিতেন তখন সুইফ্‌ট তাঁহার অভ্যর্থনার্থে প্রেরিত হইতেন। রাজাও সুইফ্‌টকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন এবং তাঁহাকে সৈন্যধ্যক্ষ পদ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সুইফ্‌টের বরাবর ইচ্ছা ছিল তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন সুতরাং সৈনিক বিভাগে যাইতে সম্মত হইলেন না। সুইফ্‌ট রাজাকে তাঁহার এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তিনি পরে সুইফ্‌টকে একটী ধর্ম্ম বিভাগীর কর্ম্ম দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

সুইফ্‌ট যদি এই সময় রাজদত্ত কর্ম্ম লইতেন তবে তাঁহার পরজীবন বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুখময় হইত। বাক যুদ্ধে লেখনী যুদ্ধে সুইফ্‌ট যে অসাধারণ তৎপর ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহার উপর তিনি তাঁহার মমতাহীন বিদ্রূপবাণ একবার বর্ষণ করিয়াছেন সে জীবন থাকিতে তাহা ভোলে নাই। তাঁহার সংগ্রামপ্রিয় ক্ষমতাপ্রিয় অমার্জ্জিত অস্থির প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে শান্তিময় আকাঙ্খাহীন ধর্ম্ম বিভাগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। এই অনুপযোগী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তিনি প্রতিপদে আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন বিষময় হইয়াছিল। এইরূপে ৫ বৎসর কাল অধ্যয়নের পর সুইফ্‌ট অক্সর্ফোড কলেজে যাইয়া এম এ পরীক্ষা প্রদান করিয়া ডিগ্রী লাভ করিলেন। এই সময় সার উইলিয়ম টেম্পলের অনুগ্রহে সুইফ্‌ট অনেক বড় লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, ডিগ্রীলাভ করিলে ইহাঁরা সুইফ্‌টকে তদুপলক্ষে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সম্মান লাভের নিমিত্ত তিনি অক্সফোর্ড কলেজকে খুব ভাল বাসিতেন কিন্তু তাঁহার অপমানের স্থল ডবলিন কলেজের নামে জলিয়া যাইতেন।

ডিগ্রী পাইবার পরও সুইফ্‌ট্ দিনকতক খুব অধ্যয়ন করিতেন এবং কবিতা ও অন্যান্ত বিষয় লিখিতেন। এই সময়েই তিনি বিখ্যাত A Tale of a Tub লিখিতে আরম্ভ করেন। অক্সফোর্ড হইতে প্রত্যাগমন করিবার কিছু দিন পরেই সুইফ্‌টের সহিত সার

উইলিয়মের মনান্তর উপস্থিত হয়। চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া করিয়া নির্ভরতা সুইফ্‌টের নিকট ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ভিন্ন উল্লিখিত সম্মান লাভের পর সুইফ্‌ট আপনার মূল্যও বুঝিতে পারিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে একটী কর্ম্ম করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি সার উইলিয়মকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র কর্ম্ম প্রাপ্ত না হওয়াতে—সার উইলিয়ম নিজ কর্ম্মের ব্যঘাত হইবে বলিয়া স্বার্থের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্যত্র কর্ম্ম দিতেছেন না স্থির করিয়া সুইফ্‌ট তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং শীঘ্র কর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য ক্রমাগত বিরক্ত করিতে লাগিলেন। টেম্পলও এই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়া অকৃতজ্ঞতা ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই দোষের জন্য তাঁহাকে উচ্চকর্ম্ম না দিয়া রোল্‌স্‌ আফিসে একটী সামান্য কর্ম্ম প্রদান করিতে চাহিলেন। সুইফ্‌ট তাহা গ্রহণ না করিয়া আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন এবং লর্ড কাপেলের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড বেতনে কিলরুটের প্রিবেণ্ড (Prebend) নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুইফ্‌টের ধর্ম্ম বিভাগের কর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বেচ্ছায় এই কর্ম্ম নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন।

সুইফ্‌ট কিলরুটে অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। সার উইলিয়ম এই সময় সুইফ্‌টের অভাব অনুভব করিলেন। তিনি সুইফ্‌টকে যথার্থ ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার কাজকর্ম্মেরও সুইফ্‌টের দ্বারা অনেক সুবিধা হইত, সুতরাং সুইফ্‌টের যাইবার অল্পদিন পরেই তিনি সুইফ্‌টকে পুনরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সুইফ্‌টেরও কিলরুটে থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না এবং তিনিও সার উইলিয়মকে যথার্থ ভাল বাসিতেন সুতরাং আসিতে ইচ্ছুক হইয়াও অহঙ্কার বশতঃ ইতস্তত করিতেছিলেন এমন সময় একজন দরিদ্র কিউরেটকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মায়া হইল এবং তাহাকে নিজ কর্ম্ম প্রদান করিয়া আপনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর ৪ বৎসরকাল সুইফ্‌ট সেক্রেটরীরূপে সার উইলিয়ম টেম্পলের আবাসে রহিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি Tale of a Tub লেখা শেষ করেন এবং Battle of Books প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ৪ বৎসর পরে সার উইলিয়মের মৃত্যু হয়। সুইফ্‌ট মানব-বিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু সার উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে সুইফ্‌ট লিখিয়াছিলেন—"পৃথিবীর যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। সার উইলিয়মকে যে সুইফ্‌ট ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন তাহা এই কয়টী কথা হইতেই বুঝা যায়।

টেম্পলের মৃত্যুর পর সুইফ্‌ট তাঁহার (সার উইলিয়মের) অমুদ্রিত লেখাগুলিকে সংশোধন ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডরাজকে উৎসর্গ করেন ও তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া সেই সঙ্গে নিজের জন্য একটী কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। রাজা সুইফ্‌টের সে কথায় মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু সে সময়

সুইফ্টের যেরূপ প্রতিপত্তি তাহাতে রাজার নিকট নিরাশ হইয়াও অন্য কর্ম্মের তাঁহার অভাব হইল না। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড বার্কেলির চাপলেন ও সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হইয়া আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন। অল্পদিন পরে সুইফ্টকে কেবল সেক্রেটরী করিয়া লর্ড বার্কেলী Mr Bushe কে চাপলেন পদ প্রদান করিলেন। সুইফ্ট ধর্ম্ম বিভাগীয় কর্ম্মই চাহিতেন সুতরাং চাপলেনের কর্ম্ম না থাকায় সেক্রেটরীর কর্ম্ম তাঁহার পসন্দ হইল না; লর্ড বার্কেলিও তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহাকে অন্যত্র কর্ম্ম দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় ডেরীনগরের ডীনের পদ শূন্য হয় কিন্তু লর্ড বার্কেলী ও বুসী ১০০০ পাউণ্ড উৎকোচ না পাইলে এই পদ সুইফ্টকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে সুইফ্ট রাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। লর্ড বার্কেলী এ কর্ম্মটী ১০০০ পাউণ্ড মূল্যে আর একজনকে প্রদান করিলেন, কিন্তু সুইফ্টের লেখনার ভয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একটী অপেক্ষাকৃত হীনপদ লারাকোর ও রাথবেগিনের রেক্টরী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লর্ড বার্কেলীর স্ত্রী কন্যাগণের সহিত সুইফ্টের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে খুব বিদ্রূপ ব্যঙ্গ চলিত। ধার্ম্মিক লেডী বার্কলিকে সুইফ্ট খুব শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করিতেও ছাড়িতেন না। রঙ্গ করা সুইফ্টের স্বভাব। তিনি যখন লর্ড বার্কেলীর চাপলেন ছিলেন লেডী বার্কেলী তাঁহাকে প্রতিদিন Boyle's meditation নামক পুস্তক হইতে একটী করিয়া উপদেশ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। সুইফ্টের নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইত, অবশেষে এই অপ্রিয় কর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার সুইফ্ট এক উপায় আবিষ্কার করিলেন। Boyleএর কথার ধরণে আপনি "ঝাঁটার কাটীর উপর চিন্তা" এই নামে একটী উপদেশ লিখিয়া বয়েলের বইএর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অনুবাদে লেখার সরসত্ব থাকে না, সুতরাং অনুবাদ করিয়া ইহার রস পাঠকদের বুঝাইতে আমরা অক্ষম, তথাপি যথাসাধ্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

এই যে ঝাঁটার কাটীটী এখন যে নিতান্ত দীনভাবে ধূলায় এক কোণে পড়িয়া আছে—একদিন ইহা অরণ্যে সুখে ছিল—এক দিন ডাল পাতার রসে ইহা পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন মানুষ, প্রকৃতির সহিত শিল্প কৌশল লইয়া বৃথা যুদ্ধ করিতেছে, বৃথা এই নীরস শুষ্ক কাটীগুলি একত্রে বন্ধন করিতেছে, এখন ইহাকে সহস্র চেষ্টা করিলেও ইহা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা আর হইবে না, তাহার উল্টা হইবে—ইহার মাথার দিক নীচে মাটীতে পড়িবে এবং নীচের দিক শূন্যে উঠিবে, আর যে সে অপরিষ্কার দাসী ইহাকে জঘন্য কার্য্যে ব্যবহার করিবে। অদৃষ্ট দোষে ইহা দ্বারা অন্য দ্রব্য পরিষ্কার হইবে কিন্তু নিজে সে সতত অপরিষ্কার থাকিবে। অবশেষে দাসীদের হস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যখন ইহার গোড়ামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে তখন ইহাকে গৃহের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইবে নয়ত শেষে অগ্নি জ্বলিতে ব্যবহৃত হইবে। যখন আমি এ বিষয় চিন্তা করি আমার

মনে দারুণ কষ্ট হয়; আমার মনে হয় মানুষও এই ঝাঁটার কাটীর মতন। প্রকৃতি তাহাকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া গঠন করে তাহার মস্তক-জ্ঞান বৃক্ষ কেশরূপ ডাল পালায় সজ্জিত করে। কিন্তু মদ্যপান রূপ কুঠারে তাহার হরিত মাথা শুখাইয়া যায়, তখন মানুষ শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করে। মাথায় এক রাশ পাউডার মাখান পরচুলা পরে। মনে কর এই ঝাঁটার কাটী যদি মহিলাগণের গৃহের ধূলি মাখিয়া এবং তাহার নিজের নহে এরূপ অন্য কুড়ান ঝাঁটান দ্রব্য রাশি লইয়া আসিয়া আমাদের নিকট স্পর্দ্ধা করে তবে আমরা তাহাকে গর্ব্বিত বলিয়া কত ঘৃণা করি। হায়! মানুষ নিজগুণের এবং পরদোষের পক্ষপাতী বিচারক! তুমি বলিবে ঝাঁটার কাটীর মাথা নীচে থাকে, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি মানুষও কি একটা উল্টাপাল্টা জিনিস নহে? তাহার পাশবিক বৃত্তি কি ক্রমাগত মানবিক জ্ঞানের উপর জয়লাভ করিতেছে না? তাহার মাথা পায়ের স্থান অধিকার করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে না? অথচ এই দোষপূর্ণ মানুষই আপনাকে পৃথিবীর উপকারক, দোষের সংশোধক, দুঃখের অপহারক বলিয়া পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেকের হৃদয়ের নিভৃত খুঁজিয়া মন্দ বাহির করিতেছে, যে স্থানে আগে ধূলা ছিল না সেখানে ধূলা উড়াইতেছে এবং যে ধূলা সাফ করিতেছে বলিয়া ছলনা করিতেছে, তাহা নিজেরই অঙ্গে মাখিতেছে। তাহার জীবনের শেষ ভাগ অযোগ্য স্ত্রীলোকের সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। অবশেষে যখন একেবারে সে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় তখন ঝাঁটার মত হয় তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় কিংবা অন্যকে গরম করিবার জন্য তাহার দ্বারা আগুণ জ্বালা হয়।"

এই উপদেশ পড়িবার সময় লেডী বার্কেলী ক্রমাগত বয়েলের প্রশংসা করিতেছিলেন এবং সামান্য ঝাঁটার কাটী দেখিয়া তাঁহার এত গভীর ধর্ম্ম ভাব উদিত হইয়াছে বলিয়া চমৎকৃত হইতেছিলেন। সুইফ্‌ট কোনরূপে হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে সমস্ত পড়িয়া কাজের ছল করিয়া বাহিরে উঠিয়া গেলেন। লেডী বার্কেলীর নিকট এই সময় জন কতক লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, লেডি বার্কেলি তাহাদের নিকট বয়েলের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন "বিশেষ আজ চাপলেন যে উপদেশটী পড়িলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল"।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল কোনটা? লেডী বার্কেলী সরল ভাবে বলিলেন "ঝাঁটার কাটীর উপদেশ"। লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, কেহই একথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। অবশেষে বই খুলিয়া দেখা গেল, তাহা সুইফ্‌টের নিজের লেখা, বয়েলের উপদেশ নহে। তখন খুব হাসির ধূম পড়িয়া গেল। লেডী বার্কেলী খুব রঙ্গপ্রিয় ছিলেন সুতরাং তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য সুইফ্‌টের ইহার পর হইতে আর উপদেশ পাঠ করিতে হইত না। এইরূপ আমোদ প্রমোদে বার্কেলী পরিবারে সুইফ্‌ট বেশ সুখে ছিলেন। লারাকোরে আসিয়া সুইফ্‌ট যত্ন ও মনোযোগের সহিত

আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। শুধু রবিবারে উপদেশ না দিয়া বুধ ও শুক্র বারেও বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা উত্তেজক ও হৃদয় আকর্ষক হইত, লোকেরা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে আসিত। সুইফ্‌ট তাঁহার গির্জ্জারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং লারাকোরে সকলের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপ শান্তিময় কাজ কর্ম্মে ও তাঁহার হৃদয় দেবী ষ্টেলার সহবাসে সুইফ্‌টের জীবন সুখে সচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এইখানে আমরা ষ্টেলার একটু পরিচয় দিব।

ষ্টেলা সুইফ্‌টের জীবনের উজ্জ্বলতম রত্ন। ষ্টেলাকে ছাড়িয়া সুইফ্‌টের জীবন লেখা বৃথা, ষ্টেলার জন্তই আমরা সুইফ্‌টের জীবন লিখিতে বসিয়াছি। ষ্টেলার গভীর ভালবাসা, অবিশ্রাম যত্ন, স্বর্গীয় করুণা, ও অনুপম ধৈর্য্যের গুণে ষ্টেলা আজ আদর্শ রমণী সমাজে বরণীয়া হইয়াছেন। ষ্টেলার চরিত্রগুণে ইংরাজ সমাজ মুগ্ধ হইয়াছেন। সুইফ্‌টের দুঃখময় আঁধার জীবনাকাশে ষ্টেলাই এক মাত্র তারা। সুইফ্‌টের মত দুঃখময় জীবন কয়জনের হয়? শৈশবে পিতৃহীন-শিশু মাতার ক্রোড় বিচ্যুত হইয়া, জ্ঞান সঞ্চারে দরিদ্রতা ও নির্ভরতায় পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া, যৌবনে ইচ্ছিত পদার্থ লাভে পদে পদে নিরাশ হইয়া, বহুকষ্টে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা হারাইয়া নির্ব্বাসিত হইয়া, বৃদ্ধাবস্থায় উন্মাদভাবে প্রাণ ত্যাগ করিয়া তিনি যে আজন্ম দুঃখের কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়েরও চক্ষে জল আসে, কিন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও ষ্টেলার ন্যায় রমণীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিতে হইবে। প্রথম সুইফ্‌ট যখন ষ্টেলাকে দেখেন তখন সুইফ্‌ট সঙ্গতিহীন পরাশ্রিত সামান্য একজন সেক্রেটরী মাত্র। সুইফ্‌ট দ্বিতীয়বার যখন স্যার উইলিয়মের ভবনে আসিলেন তখন একটী নূতন বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। কাল কাল কেশ রাশির মধ্যে সৌন্দর্য্য পূর্ণ মমতাময়ী মুখখানি ও করুণা মাখান চক্ষু দেখিয়া সুইফ্‌ট আত্মহারা হইলেন। অভাগ্য সুইফ্‌টকে অমন মমতা পূর্ণ স্নেহময় চক্ষে আর কেহ দেখে নাই, ষোড়শী রূপসীর মমতায় সুইফ্‌টের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আর একজন রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে ছবি তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সুইফ্‌ট পুর্ব্বে যে যুবতীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহার নাম জেন ওয়েরিং কিন্তু সুইফ্‌ট্‌ তাঁহাকে আদর করিয়া ভারিনা বলিয়া ডাকিতেন। সার উইলিয়মের সহিত মনান্তর হইবার পর সুইফ্‌ট যখন আয়র্লাণ্ডে গমন করেন তখন তাঁহার এই যুবতীর সহিত আলাপ হয়। আলাপের কিছুদিন পরে সুইফ্‌ট তাঁহাকে একখানি প্রেমলিপি প্রেরণ করেন ইহাতেই সুইফ্‌ট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারিনা বিবাহে সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রদান করিলেন না, সুইফ্‌ট তাঁহাকে বরাবরই পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সুইফ্‌ট ইংলণ্ডে আসিয়া ষ্টেলাকে দেখিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারিনার প্রতি ভাল-

বাসাও হারাইলেন। সুইফ্‌টের এই সময়ের লিখিত পত্রে ভালবাসার অভাব দেখিয়া ভারিনা ক্রোধভাবে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সুইফ্‌টও তাহার এরূপ ক্রোধ পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিলেন যে সেই অবধি ভারিনার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। ষ্টেলা তাঁহার হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। ষ্টেলা তথনও ভাল লেখাপড়া জানিতেন না; সুইফ্‌ট তাঁহার শিক্ষকতার ভার লইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। সুইফ্‌টের নিকট পড়িতে পড়িতে বিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা প্রেমশিক্ষাই ষ্টেলা অধিক শিখিলেন। গুরুকে ষ্টেলা হৃদয়ের দেবতা পদে বরণ করিলেন। ষ্টেলা সুইফ্‌টকে ভালবাসিতেন বলিলে তাঁহার প্রণয়ের গভীরতা ব্যক্ত হয় না, ষ্টেলা সুইফ্‌টকে পূজা করিতেন। সুইফ্‌টের বিন্দুমাত্র সুখের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারিতেন। হায়! সুইফ্‌ট এ ভালবাসার আদর করিতে পারিলেন না। তিনি ষ্টেলাকে ভালবাসিতেন কিন্তু ষ্টেলার ভালবাসার শতাংশের সহিতও তাঁহার ভালবাসার তুলনা হয় না। ষ্টেলাকে সুইফ্‌ট রূঢ় কথা ও কর্কশ ব্যবহারে যন্ত্রণা দিতেন, ষ্টেলার নিকট প্রায়ই থাকিতেন না। তবুও ষ্টেলা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিত, নীরবে তাঁহার অনাদর সহ্য করিত। ষ্টেলাকে যে তিনি কত কষ্ট প্রদান করিতেন তাঁহার সহিত কিরূপ মন্দ ব্যবহার করিতেন তাহা সুইফ্‌ট নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সার উইলিয়মের ভবনে ৪ বৎসর কাল ইঁহারা একত্রে ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর উভয়ের ছাড়াছাড়ি হইল। বিচ্ছেদের প্রথম যন্ত্রণায় উভয়েই ব্যথিত হইলেন। ষ্টেলার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা মনে করিয়া, ষ্টেলার স্নেহময় প্রেমময় অবিরাম যত্ন হারাইয়া সুইফ্‌ট নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। ষ্টেলাও তাঁহার উপাস্য দেবতাকে না দেখিতে পাইয়া, ইংলণ্ডের অচেনা কঠোর সমাজে বন্ধুহীন হইয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। সুইফ্‌ট যখন লারাকোরে আসিলেন তখন ষ্টেলাকে তাঁহার নিকটে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। ষ্টেলাও ত তাহাই চাহেন বিশেষ সুইফ্‌টের কথা না শুনিয়া কি ষ্টেলা থাকিতে পারেন? সুইফ্‌ট না জানি একাকী কত কষ্টই পাইতেছেন। ষ্টেলা বিষয় দেখিবার ছল করিয়া লারাকোরে আসিলেন। সার উইলিয়ম ষ্টেলাকে লারাকোরের নিকটবর্ত্তী উইকলো নামক একটী ক্ষুদ্র জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্টেলার পিতা বণিক ছিলেন এবং সার উইলিয়মের অনেক কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। সার উইলিয়মের ভগিনী লেডী গিফার্ডের সহিত ষ্টেলার মাতার সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য ছিল। সেই কারণে ষ্টেলার পিতার মৃত্যুর পর লেডী গিফার্ড ষ্টেলাও তাহার মাতাকে নিজালয়ে স্থান দান করেন, আর সার উইলিয়ম পরে আপনার মৃত্যুকালে ষ্টেলাকে ১০০ পাউণ্ড মুদ্রা ও উইকলো সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান। তিনি যে ষ্টেলাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। পিতৃ দত্ত সম্পত্তি সহ ষ্টেলা প্রায় ২০০০ হাজার পাউণ্ডের অধিকারিণী

ছিলেন। এই বিষয় দেখিবার ছল করিয়া ষ্টেলা লারাকোরে আসিলেন কিন্তু সাধারণে তাঁহার ছলে ভুলিল না, ষ্টেলার নামে অনেক কলঙ্ক প্রচারিত হইল। ষ্টেলার সৌন্দর্য্য, গুণ ও অর্থের জন্য ক্রমে অনেকে তাঁহার হস্তপ্রার্থী হইল। সার উইলিয়ম সুইফ্‌টকে ষ্টেলার রক্ষক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, ষ্টেলাকে যে অন্য কাহাকেও দান করিতে সুইফ্‌ট নিতান্ত অনিচ্ছুক হইবেন তাহা আর বলিতে হইবে না, বিবাহ না দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিবাহার্থীদিগের নিকট অযথা পণ চাহিলেন। এইরূপে ছলে কৌশলে ষ্টেলার বিবাহ না দেওয়াতে ষ্টেলার নামের অপবাদ আরও বৃদ্ধি পাইল। সুইফ্‌টের জন্য কিছুই সহ্য করিতে ষ্টেলা অসম্মত ছিলেন না, বিশেষতঃ এইরূপে তাঁহার বিবাহ না দেওয়াতে যে তিনি দুঃখিত হইলেন তাহা নহে, তিনি মনে মনে অনেক দিন হইতেই সুইফ্‌টকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং সুইফ্‌টও যে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন ইহা তাঁহার মনে স্থির ধারণা ছিল। সাধারণের মিথ্যা অপবাদে ষ্টেলা ভীত না হইলেও তাঁহার চরিত্রে পাছে মাতা ও বন্ধু বান্ধবেরা অসন্তুষ্ট হয়েন সেই ভয়ে ষ্টেলা সুইফ্‌টের সঙ্গে কখন একাকী একত্রে থাকিতেন না। ষ্টেলার সহবাসিনী Mrs Dingley বা অন্য কেহ তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। সুইফ্‌টকে দেখিবার নিমিত্ত ষ্টেলা এত করিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিবার নিমিত্ত মিথ্যা কলঙ্ক পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন, কিন্তু তবুও হতভাগিনীর ভাগ্যে সে সুখ বেশী দিন ঘটিল না। আজীবন দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই ষ্টেলা সুইফ্‌টকে ভালবাসিয়াছিলেন, সুখ তাঁহার কপালে হইবে কেন? লারাকোরের শান্ত কাজ কর্ম্মে সুইফ্‌টের স্বাভাবিক অস্থির প্রকৃতি কতদিন সন্তুষ্ট থাকিবে? ষ্টেলার আদর ও ভালবাসায় কতদিন আর সুইফ্‌ট ভুলিয়া থাকিবেন। তিনি লণ্ডনে গিয়া রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দিলেন। তাহার তীক্ষ্ণ বাক্যাঘাতে বিপক্ষগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও ষ্টেলা সুইফ্‌টের দর্শন সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলেন না। লারাকোরে থাকিতে সুইফ্‌টের আর ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহার মাঝে মাঝে এখানে আসিতে হইত। এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য এক কর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য সুইফ্‌ট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতি রাণীর বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ই তাঁহার Tale of a Tub পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে এক পিতা ও তাহার তিন পুত্রের গল্পচ্ছলে সুইফ্‌ট ইংলণ্ডে তিনটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দোষগুলির আলোচনা করিয়াছিলেন, যদিও পুস্তকের উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু সমগ্র পুস্তকখানি এরূপ বিদ্রূপ পূর্ণ ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে রাণী অ্যান এবং তাঁহার সভাসদগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

সুইফ্‌ট এ গ্রন্থ লিখিয়া ইচ্ছা করিয়া ভূতের বোঝা নিজ স্কন্ধে চাপাইলেন, ইহা হইতে তাঁহার অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। সুইফ্‌ট আপনাকে এগ্রন্থের রচ-

য়িতা বলিয়া স্বীকার না করিলেও তিনিই যে বাস্তবিক লেখক সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না, সুতরাং লারাকোর হইতে অন্যত্র কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য অনেক চেষ্টা সত্বেও রাণীর অপ্রসন্নতা হেতু তাহাতে আশু কোন ফল হইল না, সুইফ্‌ট কিছু দিন লারাকোরে ও কিছুদিন লণ্ডনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা পাইয়াই ষ্টেলা আপনাকে সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন। হায়! ষ্টেলা এ সুখও তোমার ভাগ্যে নাই। কিছুদিন পরেই সুইফ্‌ট আবার ইংলণ্ডে দীর্ঘ বাস করিতে চলিলেন। ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পূর্ব্বে ইংলণ্ডে "প্রথম ফল" নামক একটী কর স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডস্থ দরিদ্র ধর্ম্মযাজকদিগের সাহায্যার্থে এই কর প্রদত্ত হইত। আয়র্লাণ্ড বাসীরা এই করের কিছু অংশ প্রাপ্তির নিমিত্ত আবেদন করিবার জন্য আসোরী ও কিলোরের বিশপদ্বয় এবং সুইফ্‌ট এই তিন জনকে তাহাদের প্রতিনিধি রূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিল। সুইফ্‌ট ইংলণ্ডে যাইয়া রাজনৈতিক ঝটিকার প্রবল তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। ষ্টেলার অদৃষ্টে দ্বিতীয়বার দীর্ঘ বিরহ ঘটিল। এই বিরহে ষ্টেলার এক মাত্র সান্তনা সুইফ্‌টের পত্র। সুইফ্‌ট রাজনৈতিক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও প্রতিদিন ষ্টেলাকে সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে ভুলিতেন না। এই পত্র গুলির প্রতিছত্রে সুইফটের ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। সুইফ্‌ট যে ষ্টেলাকে ভাল বাসিতেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সুইফ্‌ট যখন ক্ষমতা ও সম্মানের সর্ব্বোচ্চসীমায় আসীন তখনও তিনি ষ্টেলাকে লিখিতেছেন—

"আমার জীবনের আনন্দ, প্রাণের প্রাণ ষ্টেলা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি, আমার মনে তোমার প্রতি ভালবাসা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট দুইবার করিয়া প্রার্থনা করি, ঈশ্বর ষ্টেলা ও আমাকে একত্রে রাখিয়া সুখী করুন। আজ আমি একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আজ সকলে আমার আজ্ঞাকারী, কিন্তু কে জানে দুদিন পরে এ ক্ষমতা থাকিবে কি না! নাই থাকিল। ইহাতে আমার কি আবশ্যক? ষ্টেলার সহবাসে যে সুখ তাহার সঙ্গে কি ইহার তুলনা হয়? এখনকার এই তরঙ্গময় জীবনে আমার এক মাত্র সুখ ষ্টেলার চিঠি পাওয়া এবং ষ্টেলাকে চিঠি লেখা। আমি আজীবন ষ্টেলার থাকিব। ষ্টেলা আমার থাকিবে ইত্যাদি।"

"কে জানে দুদিন পরে এ ক্ষমতা থাকিবে কি না" সুইফ্‌টের এ কথা যথার্থ হইয়াছিল, দুদিন পরে তাঁহার এক্ষমতা ছিল না কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন "নাই রহিল, ইহাতে আমার আবশ্যক কি?" তখন আর এ কথা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ষ্টেলার ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি কোন অত্যুক্তি করেন নাই তখনও ষ্টেলা মূর্ত্তিমতী আশা ও সান্তনা হইয়া সুইফ্‌টকে সুখ প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্টেলাই তাঁহার জীবনের একমাত্র বন্ধু। সুইফ্‌টের অন্য বন্ধু কেহ ছিল না। সুইফ্‌ট নিজ দোষেই বন্ধু পান নাই। ছেলেবেলায় তাঁহার সহিত যে একটু ভদ্রতা ভাবে কথা কহিত সুইফ্‌ট ভাবিতেন তাঁহার

দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহার প্রতি সে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অপমানিত করিতেছে এবং সেইজন্য কাহারও সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না। রাজকার্য্যে যখন লিপ্ত ছিলেন তখন কেহ তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিলে তিনি ভাবিতেন খোষামোদ করিতেছে এবং সেই কারণে তিনি নিজেও তাঁহার সহযোগীদের সহিত অত্যন্ত মন্দব্যবহার করিতেন। পাছে ভাল করিয়া কথা কহিলে তাঁহাকে অনুগ্রহপ্রার্থী ভাবে সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া তিনি কর্কশ ও অভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য বড়লোকদের প্রতি যথেচ্ছা আচরণ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছায় এই লোকদের উঠিতে বসিতে হইত। কিন্তু তাঁহার কলমের এমনি জোর ছিল যে ইঁহারা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও কলমের সাহায্য লাভার্থে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিত। সুইফ্‌টের অমার্জ্জিত রুচির ইহাই যথেষ্ট পরিচয়। সুইফ্‌ট বলিতেন যে কদিন আমি ইহাদের কাজে লাগিব সেকদিনই ইহারা আমার আদর করিবে, কাজ হইয়া গেলে কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিবে, আমিও যতদিন পারি যতদিন আমার ক্ষমতা আছে ইহাদিগকে কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করি।

সেই কারণে রাজনৈতিক মন্ত্রীগণের মধ্যে তাঁহার যথার্থ বন্ধু কেহ ছিল না, তাঁহার সাময়িক লেখকগণের মধ্যে আডিসন, ষ্টীল, কনগ্রীভ, রো, বর্ণেট, পোপ গে প্রভৃতি অনেকেরই সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার রাজনৈতিক মতের অনৈক্যতা হেতু সকলের সহিত সদ্ভাব ছিল না, যাহাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল তাহারাও প্রকৃত বন্ধু নামের বাচ্য হইতে পারেন না। ইহাঁদের নিকট সুইফ্‌ট তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন না। তিনি পদে পদে যে অপমানের যন্ত্রণা, নিরাশার মর্ম্মপীড়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ভীষণ ক্রোধোচ্ছাস সহ্য করিতেন তাহার কাহিনী কেবল ষ্টেলার কর্ণেই ঢালিতেন। ষ্টেলাই তাঁহাকে সুখে দুখে বিপদে সম্পদে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার নিজের কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া সুইফ্‌টের দুঃখ মোচন করিয়াছে, চিররুগ্না ষ্টেলা অবিশ্রাম যত্নে সুইফ্‌টের সেবা করিয়াছে। সুইফ্‌ট যে ষ্টেলার এ মধুর চরিত্র, এ গুণ রাশি বুঝিতেন না তাহা নহে। তিনি ষ্টেলার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। রোগে ষ্টেলা যখন তাঁহার সেবা করিতেছে সুইফ্‌ট বলিতেছেন —

রোগের শয্যায় যবে থাকি আমি শুয়ে
দিনরাত যন্ত্রণায় ছট ফট করি,
নারীর মতন হায়! রোগ মুক্তি তরে
দেবতার পদে কাঁদি দয়া ভিক্ষা চাহি,
ষ্টেলা মোরে শান্তি দিতে ছুটে আসে কাছে,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মুখে তবু হাসে,
আমা হতে ঘোরতর রোগের যন্ত্রণা,
বিধাতার নিগ্রহে যে সহে অবিরত

তবুও কেবলি তার ভালবাসা বলে—
সে যত করে গো কাজ আনন্দের সনে,
দাসের নিকট হ'তে তার চেয়ে বেশী
চাহিতে পারে না প্রভু অতি যে নিঠুর।
নীরবেতে থাকি মোর বিছানার পাশে
হাতের ও নয়নের ঔষধে তাহার
মুহ্যমান হিয়া মোর দেয় জাগাইয়া।
প্রণয়ের উজ্জ্বল আদর্শ! সাবধান,
জাননাক কি যে মূল্য দিতেছ গো তুমি!
তোমার অমূল্য প্রাণ করিছ সংশয়
শুশ্রূষা করিয়া মোর জীবন রক্ষিতে!
এমন নির্ব্বোধ হায় কে আছে ধরায়?
পুরাতন অট্টালিকা সারাবার তরে
সুন্দর প্রাসাদ ভাঙ্গি আনে অকাতরে!

* * *

সুইফ্‌ট ষ্টেলার এরূপ অনেক প্রশংসা-গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। ষ্টেলার প্রশংসা গাইয়া তাঁহার কখন তৃপ্তি হয় নাই।

অতুলন মহিমার গীতি তব ষ্টেলা
গাহিতে হৃদয়ে মোর দুঃখ হয় এই,
গুণ যোগ্য গান তব নাহি হোলো গাওয়া।
প্রতিদিন নব গুণে শোভাময়ী তুমি,
প্রতিদিন দিন মোর যেতেছে ফুরায়ে,
প্রতিদিন তুমি যত উচ্চে উঠিতেছ
আমার বীণার তার যেতেছে নামিয়া,
গান গাওয়া প্রতিদিন যেতেছি ভুলিয়া।
দুদিন পরে এ বীণা আর না বাজিবে,
শেষ করা হ'ল নাক তব গুণ গান।
কৃতজ্ঞতা ঋণ তব নারিনু শুধিতে।
আমা পরে আর শত কবি হবে যত,
তাহাদের শক্তি নাই এ গান গাহিতে,
আমি বিনা তব গুণ কেবা জানে আর?
ইত্যাদি　　*　　*

কিন্তু শুধু প্রশংসা গীতি গাহিলে কি হইবে? সুইফ্‌ট ষ্টেলার প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন তাহা শুনিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি উপস্থিত হয়। তিনি যে ষ্টেলার ভালবাসার মূল্য বুঝিয়া তাঁহার গুণ জানিয়াও তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই সেই জন্য তিনি আরও দোষী। ষ্টেলা এ সকলি নীরবে সহ্য রিয়াছিলেন। সুইফ্‌ট যখন আর একজনকে ভালবাসিলেন তখন ও ষ্টেলা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া-

ছিলেন, আপনার কষ্টে মন না দিয়া তাঁহার কষ্ট মোচনে যত্ন করিয়াছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত কয়টী আছে? ষ্টেলাকে ছাড়িয়া আসিয়া সুইফ্‌ট রাজনৈতিক কার্য্য লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। সুইফ্‌টের বাটীর নিকটেই একজন ডেন্মার্ক দেশীয় ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী ও কন্যাগণ বাস করিতেন। ক্রমে সুইফ্‌টের সহিত ইহাঁদের বিশেষ পরিচয় হইল সুইফ্‌ট সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

বিধবার জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও বিদ্যানুরাগিনী ছিলেন। এই রমণীর যথার্থ নাম ইষ্টার। কিন্তু ভানেসা নামেই তিনি এখন লোক সমাজে পরিচিত। সুইফ্‌ট তাঁহাকে ভানেসা নাম প্রদান করেন। সুইফ্‌ট তাঁহার প্রণয়িনীগণকে তাহাদের যথার্থ নামে না ডাকিয়া নূতন নাম দিতেন তাঁহারাও সুইফ্‌টকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সুইফ্‌টের পত্রে সেই নাম স্বাক্ষর করিতেন। জেন ওয়েরিংকে ভারিনা, ইষ্টার ভান্‌হোম্রিগের ভানেসা নাম দিয়াছিলেন এবং ষ্টেলারও যথার্থ নাম ইষ্টার জনসন। ষ্টেলা এই নামটী সুইফ্‌টের প্রদত্ত। আশ্চর্য্য এই, ষ্টেলা ও ভানেসা উভয়েরই আসল নাম ইষ্টার।

সুইফ্‌ট তাঁহাকে পুস্তক নির্ব্বাচন, পুস্তকের কঠিন স্থলগুলি বুঝাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এরূপ সাহায্যের ফল সুইফ্‌টের চরিত্রে কি হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ষোড়শী যুবতী ষ্টেলাকে পড়াইতে গিয়া সুইফ্‌ট প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতীকে পড়াইতে গিয়াও সুইফ্‌ট সেই শিক্ষা দিলেন। উভয়ের হৃদয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুইফ্‌ট যে ইচ্ছা করিয়া ফাঁদে পড়িয়াছিলেন তাহা নহে, ষ্টেলার কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম আপনাকে দূরে লইয়া যাইতে খুব চেষ্টা করিতেন কিন্তু ষ্টেলা তখন সুদূরে, ভানেসা নিকটে, সুতরাং সুইফ্‌ট ষ্টেলা অপেক্ষা ভানেসাকে অধিক ভালবাসিতে শিখিলেন। এই সময়ের ভালবাসাকে উল্লেখ করিয়া প্রেম নামক একটী কবিতাতে সুইফ্‌ট লিখিয়াছিলেন।

"যথা ইচ্ছা সুখী কিবা হইতাম আমি,
মহান মোহিনী প্রেম না থাকিলে তুমি;
* * এমন দুর্ব্বল তুমি,
নির্ব্বোধেরা তব শক্তি নাহি করে ভয়!
* * এমন সবল তুমি,
জ্ঞানীগণ তব কাছে মানে পরাজয়!
কি অদ্ভুত পাত ফাঁদ কিবা মায়া জান!
অস্থির না পড়ে ফাঁদে পড়ে সাবধান।"

ষ্টেলাকে এই সময় সুইফ্‌ট যে পত্র লিখিতেন তাহাতে তাঁহার দৈনিক কার্য্যের সামান্য বিবরণটী পর্য্যন্ত লিখিতেন, কাহারও সহিত মূহূর্ত্তমাত্র সাক্ষাৎ হইলেও সে বিষয় ষ্টেলাকে জানাইতেন কিন্তু* একবার ভিন্ন কখনও ভানেসার কোন কথা

পত্রে উল্লেখ করেন নাই। একবার কেবল আছে "আজ আমার প্রতিবেশিনী মিসেস ভানোম্রিগের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে আমার তাঁহাদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল"। ইহাতে প্রকাশ হইবার কিছুই নাই। অনেকে সুইফ্‌টের এ ভালবাসার অর্থ বুঝিতে পারেন না। তিনি যে ষ্টেলাকে ভালবাসিতেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই, এক জনকে ভাল বাসিলে কি আর একজনাকে ভালবাসা যায়, তবে ভানেসাকে কিরূপ করিয়া ভালবাসিলেন ? উভয়ের প্রতি ভালবাসার প্রকৃতি দেখিলে এ কথাটী সহজেই বুঝা যায়। সুইফ্‌ট ষ্টেলাকে ভাল বাসিতেন সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় প্রেমের ধর্ম্ম নাই। যে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া লোকে বলে প্রেম সুধা না গরল এ প্রেমে সে উন্মত্ততা নাই। ষ্টেলাকে সুইফ্‌ট যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহাতেই যে তাহা প্রেম নহে বুঝা যায়। প্রেমে হয় দেবতা বলিয়া পূজা করে নয়ত প্রেম ফুরাইলে ঘৃণা করে, কিন্তু ভালবাসা ও নিষ্ঠুরতা উভয়ই যেখানে থাকে তাহা প্রেম নহে। ষ্টেলা যদি সুন্দরী ও অল্পবয়স্কা না হইতেন তবে সুইফ্‌টের মনে প্রেমের কোন কথাই উঠিত না। সুইফ্‌ট ষ্টেলাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন তাহাকে মাতার ন্যায় ভালবাসা বলা যাইতে পারে। সুইফ্‌ট ষ্টেলার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা দুষ্ট আব্দারে ছেলেরা মায়ের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করে সেইরূপ। বাহিরের লোকের নিকট কষ্ট পাইলে ছেলেরা যেমন মায়ের উপর আসিয়া অত্যাচার করে, আমাদের দেশে যেমন ঝিকে মারিয়া বৌকে শিখান হয় সুইফ্‌টও ষ্টেলার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। বাহিরে তাঁহার যথেষ্ট দুঃখ সহ্য করিতে হইত তাহারই কিঞ্চিৎ ষ্টেলাকে প্রদান করিতেন তাই বলিয়া যে তাহাকে ভাল বাসিতেন না বা তাঁহার গুণ বুঝিতেন না তাহা নহে। সুইফ্‌ট যখনই কষ্ট পাইয়াছেন, শিশু যেমন মাতার নিকট আসিয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদে সেইরূপ ষ্টেলার নিকটই ছুটিয়া আসিয়াছেন, ষ্টেলাকে আপনার দুঃখ জানাইয়াছেন। সুখে দুখে ষ্টেলার মুখে চাহিয়াছেন। ষ্টেলার মাতার ন্যায় যত্ন ও সেবায় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। সুইফ্‌ট নিজেই হয়ত তাঁহার এ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতেন না, তখন কেহ যদি তাঁহাকে বলিত তিনি ষ্টেলাকে যে ভাল বাসেন তাহা প্রেম নহে তবে অবিশ্বাস করিতেন, তখন সাধারণে এ ভাব বুঝিবে কি করিয়া ? কিন্তু সুইফ্‌ট ভানেসাকে যে ভালবাসা দিয়াছিলেন তাহা যথার্থ প্রেম। যে প্রেমে প্রেম সুধা কি বিষ বোঝা যায় না, যে প্রেমে শিরায় শিরায় উন্মত্ততা জন্মে, যে প্রেমে জগৎ সংসার ভাসিয়া যায়, মানুষ আত্মহারা হয়, এমন কি ন্যায় অন্যায় সৎ অসৎ পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না এ সেই উন্মত্ত প্রেম। সুইফ্‌টেরও ভালবাসায় যেমন দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতি দেখা যায়, তাঁহার প্রণয়িনীদের উভয়ের ভালবাসার প্রকৃতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ষ্টেলার প্রতি সুইফ্‌টের ভালবাসার প্রকৃতি প্রেম না হইলেও, ষ্টেলা সুইফ্‌টকে যে ভালবাসিতেন তাহা প্রেম। কিন্তু ইহা প্রেমিকের উন্মত্তপ্রেম নহে তাহা প্রণয়ীর হৃদয়ের পূজা। ক্ষুদ্র বন ফুল

যেমন তারাকে পূজা করে ষ্টেলা সুইফ্‌টকে সেইরূপ পূজা করিতেন। তাঁহার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই উদ্দেশে আপনার সুরভি রাশি ব্যয় করিয়াছিলেন। ভানেসার প্রেম এরূপ ফুলের মত সুমধুর মৃদুরূপ নহে, তাহা সাগরের মত অস্থির উন্মত্ত, তাহা সাগরের মত গভীর। সাগর যেমন বাধা বিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া মহাসাগরে লীন হইতে যায় ভানেসাও সুইফ্‌টকে সেইরূপ ভালবাসিতেন, সেইরূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লজ্জা মান ত্যাগ করিয়া সুইফ্‌টের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সুইফ্‌ট ভানেসাকে ভাল বাসিলেও তাঁহার নিকট আপনার ভালবাসা স্বীকার করিতে পারিলেন না। ভালবাসা স্বীকার করিয়া ফল কি। ধর্ম্মতঃ তিনি ষ্টেলার, ভানেসাকে বিবাহ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি মুখে স্বীকার না করিলে কি হইবে। প্রেমের চোখে কি প্রেম লুকান থাকে? ভানেসা তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি দৃষ্টিতে এ প্রেমের কাহিনী বুঝিতে পারিলেন। তিনি ত আর ষ্টেলার কথা জানিতেন না সুইফ্‌টের প্রেম স্বীকার না করার অন্যরূপ অর্থ করিলেন। পাছে বিবাহের প্রস্তাবে ভানেসা অসম্মত হয়েন এই অপমানের ভয়ে অহঙ্কারী সুইফ্‌ট আপনার ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছেন না ভাবিয়া উন্নতমনা ভানেসা তাঁহাকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্ত্রীলজ্জা সুলভ প্রথার বিরোধী হইলেও আপনিই সুইফ্‌টের নিকট অগ্রে তাঁহার ভালবাসা স্বীকার করিলেন। তাঁহার এই প্রেম স্বীকার শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের মহানতা বুঝিয়া সুইফ্‌ট মোহিত হইলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভানেসার সহিত তাহার ন্যায় সরল ব্যবহার করিতে পারিলেন না। সুইফ্‌ট যদি এই সময় ষ্টেলার কথা বলিয়া এইখানেই ভানেসার প্রেমকে নিরাশ করিতেন তবে তাঁহারও মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইত কিন্তু সুইফ্‌ট তাহা না করিয়া তাহার বিপরীত করিলেন। সুইফ্‌টের জীবনের প্রধান কলঙ্ক রাখিয়া গেলেন। ষ্টেলার কথা জানাইলে ভানেসার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু ভানেসা এখন তাঁহার প্রাণ সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিতেও পারিলেন না, সরলা বালিকার স্পষ্টকথায় স্পষ্ট উত্তর না দিয়া হাঁ, না কিছু না বলিয়া নানা প্রকার ক্রীড়াময় বিদ্রূপ পূর্ণ উত্তর দ্বারা ভানেসাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। ভানেসার ইহাতে সুইফটের প্রেমের আশা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুইফ্‌ট তাঁহাদের এই প্রেমের কাহিনীটী দিয়া একটী গাথা রচিয়া ভানেসাকে উপহার দিয়াছিলেন। কবিতাটী অতি সুন্দর হইলেও আমরা স্থানাভাবে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না কেবল ভানেসার বর্ণনা হইতে একটী স্থান উঠাইয়া দিতেছি।

"প্রত্যেক গুণের বাস খুঁজিব গো আমি
রাজার প্রাসাদ হতে দরিদ্র কুটীর,

জ্ঞানীর রচনা আর ধর্ম্ম উপদেশ,
যত কিছু আছে সব সমষ্টি তাহার,
ক্ষুদ্র এ শিশুর মনে অঙ্কুরিত করি
মানবেরে উপহার, করিব প্রদান ?
এত বলি ভিনোদেবী স্বর্গ কুঞ্জ হ'তে
স্বর্গীয় কুসুম এক করিয়া চয়ন,
তিনবার করি তায় অমৃত সিঞ্চন,
স্বর্গীয় কিরণে তারে করিয়ে উজ্জ্বল,
সঙ্গিনী সুন্দরীগণে পাশে ডাকি তাঁর,
তিনবার স্পর্শিলেন নবকুমারীটী।
স্পর্শ গুণে দেহ হ'তে বাহিরিল তার
সমস্ত সুরভি হতে মধুর সৌরভ,—
দেহ হ'ল দাগ শূন্য সুপবিত্র অতি
মন হোল নম্রময়ী মাধুরীতে ভরা।

*　　*　　*

সুন্দরী রমণীগণ এল তার পরে
বেশী কিছু তাদের ছিল না করিবার,
কাজ যা তাদের তা আধ করা ছিল,
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেতে পূর্ণ ছিল শিশু।
তবুও প্রত্যেকে তারে ছুঁলে তিনবার
হাব ভাবে সৌন্দর্য্যতা করিয়ে প্রদান
আশীষ করিল তারে, পৃথিবীর মাঝে
ভানেসা নামেতে তব ব্যাপ্ত হবে খ্যাতি।

*　　*　　*

কোমল মনেতে তার অঙ্কুরিল বীজ
যে বীজ নারীর ভাগ্যে কভু ঘটে নাই,
হিতাহিত বিবেচনা জ্ঞান বুদ্ধি আর
পুরুষেরি প্রধানত উপযোগী যাহা,
সহসা করিল তার আত্মা পরিপূর্ণ। ইত্যাদি

সমস্ত কবিতাটীতে সুইফ্‌ট ভানেসাকে যেরূপ দেবী ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে ভানেসার রূপ গুণ যে সুইফ্‌টের মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। ভানেসার প্রতি এই ভালবাসা স্বীকার করিবার অল্প দিন পরেই রাণী আনের মৃত্যু হওয়াতে টোরীদিগের ক্ষমতার অবসান হয় এবং নির্ব্বাসিত প্রায় সুইফ্‌ট সেণ্ট পাট্রীকের ডীনের কর্ম্মে আয়র্লাণ্ডে গমন করিলেন সুতরাং আপাততঃ ভানেসার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া আবার ষ্টেলার নিকট আসিয়া পড়িলেন। এখন সুইফ্‌টের হৃদয় ভানেসার জন্য ব্যগ্র ছিল ষ্টেলাকে এখন আরও অযত্ন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন হইতেই ষ্টেলা এ প্রেমহীনতার ভাবে ব্যথিত হইতেছিলেন সুইফ্‌টের শেষ দিনের পত্র

পড়িয়া ষ্টেলার মনে হইল সত্যই সুইফ্‌ট তাঁহাকে ভালবাসেন না। সুইফ্‌টের নিষ্ঠুর ব্যবহারে ষ্টেলা মর্ম্মপীড়িত হইয়া ক্রমে শারীরিক পীড়িত হইলেন। বিষপ কগনার ষ্টেলাকে অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে ষ্টেলা অবশেষে তাঁহার নিকট আপনার মনের ব্যথা জানাইলেন। বিসপ ষ্টেলার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিশেষ এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে সুইফ্‌টের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল ব্যক্ত করিয়া ষ্টেলাকে শীঘ্র বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। এ কথায় সুইফ্‌ট 'না' বলিতে পারিলেন না। ষ্টেলা এতদিন ধরিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহার জন্য মস্তকে মিথ্যা কলঙ্কভার বহন করিতেছে এখন তাহাকে না বিবাহ করিলে যে অত্যন্ত অন্যায় হয় তাহা সুইফ্‌ট বুঝিলেন। সুইফ্‌ট ষ্টেলার প্রতি অনেক অন্যায় করিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ অন্যায় করিতে তাঁহার মন উঠিল না। ষ্টেলাকে বিবাহ করিতে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্য বিবাহ করিলে ভানেসা এ কথা জানিতে পারিবে, এবং তাহা হইলে ভানেসার সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ থাকিবে না—এ চিন্তা সুইফ্‌টের অসহ্য হইল, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, ষ্টেলাকে গুপ্ত বিবাহ করিতে চাহিলেন। গুপ্ত বিবাহ না হইলে তিনি এখন বিবাহ করিতে পারেন না বলায় অগত্যা ষ্টেলা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিসপ কগনার তাঁহাদের বিবাহ দিলেন, তিনি ভিন্ন একথা আর কেহ জানিতেও পারিল না। কিন্তু সুইফ্‌টের এ লুকাচুরী বৃথা হইল। ইহার মধ্যে ভানেসার মাতার মৃত্যু হইল। স্বাধীন ভানেসা তাঁহার সাগর গামী প্রেমের বলে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আয়র্লাণ্ড আসিলেন। সুইফ্‌টের প্রেম লাভার্থে সুইফ্‌টকে বিবাহ করিবার আশায় তাঁহার নিকটেই আপন বাসস্থান স্থাপন করিলেন। সুইফ্‌ট বিষম সমস্যায় পড়িলেন। পরস্পরের নিকট-বর্ত্তিনী দুই প্রণয়িনীকে পরস্পরের নিকট গোপন রাখা এবং দুই জনকেই সন্তুষ্ট রাখা সহজ ব্যাপার নহে। চতুর সুইফ্‌ট কিছুদিন পর্য্যন্ত এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে ভানেসা ষ্টেলার কথা শুনিতে পাইলেন। ভানেসা জানিলেন সুইফ্‌টকে তিনিই ভালবাসেন দুদিন পরে তাঁহারই সহিত বিবাহ হইবে। ভানেসা আশ্চর্য্য হইলেন এবং সুইফ্‌টের সঙ্গে ষ্টেলার যথার্থ কি সম্বন্ধ জানিতে চাহিয়া ষ্টেলাকে এক পত্র লিখিলেন। ষ্টেলা পত্র পাইয়া শিরায় শিরায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি এতদিন সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন জানিলেন সুইফ্‌ট আর একজনকে ভাল বাসেন যখন বুঝিলেন সুইফ্‌ট তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন তাহা আর ষ্টেলা সহ্য করিতে পারিলেন না। ভানেসার পত্রোত্তরে নিজের পরিচয় দিয়া ষ্টেলা সুইফ্‌টের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই বিবরণ বলিয়া কুপিতা ব্যথিতা ষ্টেলা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ষ্টেলা জীবনে এই একবার মাত্র সুইফ্‌টের উপর রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুইফ্‌ট এই

সকল বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতে ভানেসা পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ প্রকাশার্থে ভানেসার আবাসে গমন করিলেন। ভানেসা ষ্টেলার পত্র পাইয়া, যখন বুঝিলেন সুইফ্‌ট বিবাহিত হইয়া তাঁহাকে এতদিন মিথ্যা ছলনা করিতেছেন, সুইফ্‌ট আর জীবনে তাঁহার হইবেন না, তখন ভানেসা দুঃখে বজ্রাহতের ন্যায় কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময় সুইফ্‌ট আসিলেন। নির্দ্দয় সুইফ্‌ট আপনার ক্রোধে হিতাহিত শূন্য হইয়া ভানেসাকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক একটী কথা ভানেসার হৃদয়ে শেল সম বাজিতে লাগিল। এই নিষ্ঠুর বাক যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া ভানেসা পীড়িত হইলেন এবং এই আঘাতেই অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। যে হৃদয় সুইফ্‌টের জন্যই বাঁচিয়াছিল নিষ্ঠুর আঘাতে সুইফ্‌ট তাহাকে বধ করিলেন। ভানেসার মৃত্যুর পর সুইফ্‌টের মনে অনুতাপ কষ্ট জাগিয়া উঠিল, তিনি যে ভানেসার নিকট কত দোষ করিয়াছেন, তিনিই যে ভানেসার মৃত্যুর কারণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জনহীন জঙ্গল প্রদেশে সুইফ্‌ট দুই মাস কাল ভানেসার ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন। দুই মাস পরে তাঁহার দুঃখের তীব্রতা কমিয়া আসিল তখন পুনরায় সহরে ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেলার নিকট সানুনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মমতাময়ী ষ্টেলা সুইফ্‌টের সহিত ওরূপ ক্রুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন ভাবিয়া নিজেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ভাবিতেছিলেন সুতরাং তাঁহাকে সহজেই ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

ষ্টেলা আবার সুইফ্‌টকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন বটে কিন্তু তাহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার-দলিত হৃদয় আর কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইল না; এই আঘাতে তিনি যে রোগ শয্যাশায়ী হইলেন তাহা হইতে আর তাঁহার উঠিতে হইল না। বনফুল ষ্টেলা নীরবে সুইফ্‌টের পূজা করিতে করিতে শুখাইতে লাগিলেন।

সুইফ্‌ট এতদিন নিজের স্বার্থের জন্যই রাজনৈতিক বিবাদে আপনার লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। এখন মহত্তর কর্ম্মে তাহা সঞ্চালিত হইল। সুইফ্‌ট আবার মন্ত্রীপক্ষ পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রথম তিনি হুইগদের পক্ষে ছিলেন, তাঁহার প্রসাদে হুইগদের অনেক উপকার হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলেন হুইগদের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইল না, রাণীর বিদ্বেষাবনত হুইগরা তাঁহাকে লারাকার হইতে অন্যত্র কর্ম্ম দিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার 'প্রথম ফল' প্রাপ্তির আবেদন গ্রাহ্য হইল না, রাজমন্ত্রীগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিলেন না, তখন হুইগ পক্ষ ত্যাগ করিয়া টোরী পক্ষে যোগ দিলেন, লেখনীর বলে হুইগদের ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন করিয়া আপনি সম্মান ও ক্ষমতার উচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাণী আনের মৃত্যুতে যখন টোরীদিগের

ক্ষমতার অবসান হইল, তাঁহার বন্ধুগণ কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইলেন, নিজে ক্ষমতাহীন হইলেন তখন অনাদৃত নির্ব্বাসিত প্রায় সুইফ্ট রাজ-ক্ষমতার নশ্বরতা বুঝিলেন, যখন ভানেসার মৃত্যুতে হৃদয় জর্জ্জরিত হইল তখন স্বার্থের পরিবর্ত্তে দরিদ্র দুর্ব্বলের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হইল। আয়র্লণ্ডের দুর্ব্বল প্রজাদের সাহায্যার্থে লেখনী সঞ্চালিত করিলেন। সুইফ্ট লেখনী বলে কি না করিতে পারিতেন? লেখনী বলে তিনি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় প্রতিপন্ন করিতেন। এমন কি জীবিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত মৃতের রাজ্যে প্রেরণ করিতেন। একবার সুইফ্ট জ্যোতির্ব্বিদগণকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বা পঞ্জিকা লেখক বিকারষ্টকের মৃত্যু হইয়াছে এই মিথ্যা সম্বাদ লেখাতে, লোকে লেখার ধরণে তাহা এরূপ সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিল যে জীবিত বিকারষ্টক যখন "আমি মরি নাই বাঁচিয়া আছি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রচার হইতে লাগিল, তখন লোকে তাহা প্রবঞ্চনা মনে করিল। যথার্থ বিকারষ্টক যে মরিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত করিবার অধিকার বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবিত বিকারষ্টক বেচারার ব্যবসা বন্ধ হইল।

এখনও আয়র্লণ্ডে অন্যায় অবিচার অত্যাচার চলিতেছে, এখনো দুর্ব্বল আয়র্লণ্ডবাসী মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে সাহস করে না এখনও তাহাদের ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয় না, প্রায় দেড়শত শতাব্দী পূর্ব্বে সুইফ্টের জীবন কালে যে তাহাদের কি ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইত তাহা কি আর বলিতে হইবে। আমাদের নিজেদের দৃষ্টান্তে কি আমরা তাহা পদে পদে বুঝিতে পারিতেছি না? ইংরাজেরা আয়র্লণ্ডের উপর অন্যায়ের উপর অন্যায় করিতে লাগিলেন। অত্যাচারে অত্যাচারে আয়র্লণ্ডবাসীরা জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তাহাদের ধন প্রাণের স্বাধীন অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহারা রাজার নিকট কত প্রার্থনা কত আবেদন করিল। রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রাজকর্ম্মচারীগণ স্বার্থের নিমিত্ত অত্যাচারে দেশ পূর্ণ করিল, দুর্ব্বল প্রজার নীরব ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় রহিল না। এ অত্যাচার সুইফ্টের সহ্য হইল না এ অন্যায় নীরবে বহন করিতে পারিলেন না। "ড্রাপিয়ারের পত্র" এই নাম দিয়া তিনি ক্রমাগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্র লিখিতে লাগিলেন, তাঁহার উত্তেজনা পূর্ণ জলন্ত লেখায় দুর্ব্বল আয়র্লণ্ডবাসীরাও উত্তেজিত হইয়া আপনার অধিকারের প্রার্থনা করিতে লাগিল, প্রমাদ গণিয়া ইংলণ্ড হইতে বড় বড় রাজকর্ম্মচারী আসিয়া এ জাতীয় বিদ্রোহ দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুইফ্ট্ অভীষ্ট বস্তু না পাইলে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আরও উত্তেজনা পূর্ণ পত্র লিখিতে ... অনেকে শাস্তি সহ্য করিল তথাপি শান্ত হইল না।

গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাকরকে কয়েদ করিলেন এবং পত্র লেখককে যে ধরিয়া দিবে তাহাকে ৩০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু তথাপি পত্র বাহির হইতে লাগিল, অত্যাচার পীড়িত আয়লণ্ডবাসী পুরস্কারের লোভে ভুলিল না, সুইফ্‌ট ধরা পড়িলেন না। গভর্ণমেণ্ট আরও ৩০০ পাউণ্ড পুরস্কার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন তথাপি কোন ফল হইল না। সুইফ্‌ট্‌ জানিতেন তাঁহার জীবন শঙ্কট, গভর্ণমেণ্ট ধরিলে তাঁহার নিশ্চয় বিপদ, কিন্তু তথাপি তিনি পত্র লেখা বন্ধ করিলেন না। আয়র্লাণ্ডবাসীদের জন্য তিনি নির্ভয়ে প্রাণপণে অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিলেন। সুইফ্‌ট নিজেই এই সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

আয়রিশ দুঃখ কথা শুনিলে, তাঁহার
কি দারুণ দুঃখ মনে হইত উদয়!
তিনি চাহিতেন শুধু ন্যায্য স্বাধীনতা,
তার তরে মরিবারে ছিলেন প্রস্তুত।
যুঝেছেন তার তরে একাকী নির্ভয়ে,
তার তরে করেছেন আত্মবিসর্জ্জন।
পুরস্কার বিজ্ঞাপন দুই দুই বার
মস্তকের তরে তাঁর ঘোষিল রাজত্বে।
কিন্তু গো স্বদেশদ্রোহী কে আছে এমন
পুরস্কার লোভে তাঁরে করিবে বিক্রয়!

গভর্ণমেণ্ট অবশেষে অযথা মূল্যের তাম্র মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান অন্যায় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সমুদয় আয়র্লাণ্ডবাসী সুইফ্‌টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। পথে ঘাটে হাটে মাঠে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। সমুদায় দ্রব্যে তাঁহার সম্মানার্থে ড্রাপিয়ারের ছবি অঙ্কিত হইল। উদ্ধার কর্ত্তা সুইফ্‌টকে আয়র্লাণ্ডবাসী দেবতা জ্ঞান করিল।

এই জাতীয় বিবাদ মিটিয়া যাইবার পরম সুইফ্‌ট তাঁহার বন্ধু ডাক্তার সেরিডেনের আবাসে গমন করেন ও গলিবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লেখেন। ইহার ১২ বৎসর পরে তিনি আবার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। পুরাতন বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, রাজপরিবার কর্ত্তৃকও তিনি যথেষ্ট সম্মানিত ও আদৃত হইলেন। ইংলণ্ডে আসিবার অল্পদিন পরেই ষ্টেলার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া সুইফ্‌ট আয়র্লাণ্ড পুনরাগমন করিলেন। ষ্টেলার পীড়ার মূল মানসিক কষ্ট। সুইফ্‌টকে দেখিয়া ষ্টেলা অনেক শান্তি লাভ করিলেন তাঁহার পীড়াও অনেক আরোগ্য হইল। তখন সুইফ্‌ট পুনরায় ইংলণ্ড যাইয়া সেখান হইতে ভ্রমণার্থে ফ্রান্সে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া আসাতে ষ্টেলার পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল, ষ্টেলার পীড়া গুরুতর হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সুইফ্‌ট আবার আয়র্লাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। অল্পকাল পরেই ষ্টেলা এই দীর্ঘ রোগ

যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ষ্টেলার মৃত্যুর পূর্ব্বে সুইফ্‌ট তাঁহাদের বিবাহ প্রকাশ করিতে চাহিলেন কিন্তু ষ্টেলা বলিলেন "এখন আর আবশ্যক নাই"। ভানেসার মৃত্যুতে সুইফ্‌ট অস্থির হইয়া অরণ্যে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, ষ্টেলার মৃত্যুতে শান্ত ভাবে বসিয়া ষ্টেলার জীবনের একখানি বিবরণী লিখিলেন। ষ্টেলার গুণ ষ্টেলার ভালবাসার কথা লিখিলেন। সুইফ্‌ট লিখিয়াছেন ষ্টেলার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী বিশেষতঃ বুদ্ধির সদ্ব্যবহারকারিণী এমন আর দেখি নাই। ষ্টেলার মৃত্যুর কথায় বলিয়াছেন, ষ্টেলা আজ ছয় মাস কাল ধরিয়া মৃত প্রায় ছিলেন। কিন্তু ছয় মাস কেন? ছয় বৎসরেরও বেশী ষ্টেলা তাঁহার ব্যবহারে ধীরে ধীরে শুখাইয়া আসিতেছিলেন। ভানেসা ও ষ্টেলার মৃত্যুকালে সুইফ্‌টের আচরণের ভিন্নতা তাঁহার প্রণয়ের ভিন্ন ভাবের আর একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। ভানেসা যেন ধূমকেতুর ন্যায় তাঁহার জীবনে একবার উদিত হইয়া আলোকে তাঁহার চক্ষু ধাঁধাইয়া, তাঁহার জীবন ছার খার করিয়া মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু ষ্টেলা তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা। আঁধারে আলোকে সমভাবে তাঁহার উপর স্বর্গীয় কিরণ বর্ষণ করিয়া সংসারে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

ষ্টেলার সঙ্গে সঙ্গে সুইফ্‌টের প্রকৃত জীবনের অবসান হইল। সুখ দুখের সাথী ষ্টেলাকে হারাইয়া আশ্রয় হারা সুইফ্‌ট পৃথিবী শূন্য দেখিলেন। আশা ভরসা সুখ শান্তি সকলি চলিয়া গেল, সেই অবধি সুইফ্‌ট পৃথিবী ও মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জীবন তাহার নিজের ও পরের নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। দিন কতক সুইফ্‌ট লেখায় অতিবাহিত করিলেন কিন্তু ক্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল, চক্ষু তেজ হীন হইল, বধিরতা রোগে এক বৎসর কাল অকর্ম্মণ্য ভাবে জীবন যাপন করিলেন। বধিরতা রোগ হইতে মুক্ত হইতে না হইতে তিনি এরূপ দারুণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলেন যে তাঁহার রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইল। অনেক দিন পরে একবার মাত্র তিনি এই উন্মত্ততার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, ২। ১ দিনের জন্য জ্ঞান লাভ করিলেন কিন্তু ২। ১ দিন পরেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। আর আরোগ্য লাভ করিলেন না। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর তারিখে ৬৮ বৎসর বয়সে অজ্ঞানাবস্থায় জোনাথান সুইফ্‌ট বিনা কষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সুইফ্‌ট খোষামোদ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সমকক্ষ লোকদিগের বা বড় লোকদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না বটে কিন্তু তাহাদেরও উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগকে সুইফ্‌ট যথেষ্ট দয়া করিতেন তিনি দরিদ্রদিগের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তাঁহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত রূপে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই দরিদ্রগণের মধ্যে এবং তিনি প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া যে আয়-

সকলে তাঁহাকে শেষবার দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। যে তাঁহার মাথার একগোছা চুল লাভ করিতে পারিল সে আপনাকে মহা সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিল ও পুত্র পৌত্রাদির জন্য সযত্নে এই বহু মূল্য দ্রব্য রাখিয়া দিল। এখনও আয়র্লাণ্ডে সুইফ্‌টের চুল মহা যত্নে রক্ষিত। এই লোকদের ভালবাসার আতিশয্যে মৃত্যুর ১ ঘণ্টা পরে সুইফ্‌টের মাথায় একগাছিও চুল রহিল না। শুনিতে হাস্যকর হইলেও ইহাতে তাহাদের ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। সুইফ্‌টের কথা মত তাঁহাকে গম্ভীর নিশীথে চুপিচুপি কবর দেওয়া হইল। তাঁহার নিজ লিখিত এই কথাগুলি কবরে অঙ্কিত করা হইল। "এই স্থানে এই ধর্ম্ম মন্দিরের ডীন জোনাথান সুইফ্‌ট এফ্‌, টি, পির দেহ রক্ষিত হইয়াছে।"

"মানবের দুর্ব্বলতা এবং দোষের প্রতি দারুণ ঘৃণাও তাঁহার মানবের প্রতি আন্তরিক শুভ ইচ্ছাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই।"

"পথিক তুমি যাও এবং যদি পার ত তাঁহাকে—মানবের স্বাধীনতার প্রাণপণকারী রক্ষককে অনুকরণ কর।"

সুইফ্‌টের জীবন একটী ঘোর রহস্য।

তিনি একজন ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তি, কিন্তু তিনিই আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বিদ্রূপ করিয়াছেন যে লোকে তাহা পড়িয়া আশ্চর্য্য হয়। তাঁহার চরিত্র ধর্ম্মহীন জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করে। তিনি স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইয়াও স্পষ্ট বক্তাকে দেখিতে পারিতেন না।

তিনি আমোদ প্রিয় হইয়াও আমোদপ্রিয় ব্যক্তিকে ঘৃণা জ্ঞান করিতেন। তিনি নিজব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত কৃপণ হইয়াও সৎকর্ম্মে ও দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতেন। তিনি মানব বিদ্বেষী হইয়াও সর্ব্বদা মানুষের যথা সাধ্য উপকারের চেষ্টা করিতেন।

তিনি ঘোর স্ত্রীলোক ভক্ত হইয়াও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার জীবন যেমন পবিত্র ও নিষ্পাপ তাঁহার লেখা সেইরূপ অপবিত্র ও অশ্লীলতা পূর্ণ। তিনি কবি, সর্ব্বদা কল্পনার সূক্ষ্ম রাজ্যে বিচরণ করিতেন অথচ স্থূলজগৎই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। অন্যায় দমনে বা সৎকর্ম্মে তিনি প্রাণের ভয় করিতেন না কিন্তু বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন।

এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই সুইফ্‌টের চরিত্রে দুইটী ভিন্নভাব দেখা যায়। সুইফ্‌টের ন্যায় সুপ্রসন্ন অথচ মন্দভাগ্য ব্যক্তিও আর দেখা যায় না। সুইফ্‌ট ক্ষমতার উচ্চ আসন অধিকার করিয়াও তাহা রাখিতে পারিলেন না, দুই দলেরই কর্ম্ম করিয়া অবশেষে এই চপলতা বশতঃ কোন পক্ষেই আদৃত হইলেন না। দুই জন সাধ্বী মহিলার অমূল্য প্রেমরত্ন পাইয়াও একজনকেও সুখী করিতে পারিলেন না—আপনিও সুখী হইলেন না।

সুইফ্‌টের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। তিনি যাহার উপর বিরক্ত হইতেন সত্য মিথ্যা যাহা ইচ্ছা লিখিয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে ব্যথিত করিতেন। লোকের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন না। সুইফ্‌টের চরিত্র স্বার্থপর প্রতিহিংসা ও দারুণ ক্রোধপরায়ণ। অথচ সুইফ্‌টের চরিত্রে গুণের অভাব ছিলনা, এ সকল দোষ সত্বেও তিনি একজন মহৎলোক।

ফুলজানি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দীঘির ঘাট হইতে ফিরিতে সুগুনির মা বাড়ীর কাছে আসিয়া কন্যারত্নের সাক্ষাৎ লাভ করিল। সুগুনি আপনার জঠরানল নির্ব্বাপণ করিয়া উঠিয়া দেখিল, সব ভাত সে খাইতে পারে নাই, অতএব তাহার মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল! সে কাজেই বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মাতার পথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। মাকে দেখিয়া ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের খবর দিল এবং তাহার হাতের চাবি কাড়িয়া লইয়া ফুলকুমারীর কাছে গেল।

অতএব বাগ্‌দীমার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ ফুলকুমারী যখন সুগুনি দিদিকে আগ্রহে সুধাইল যে—মার নেয়ে ফির্‌তে কত দেরি, কি বলিল এবং রাগ করেছে কি না, সে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। কালী সইয়ের ভাবনার ভাগিনী নহে, ভাবনার কারণও তার বিবেচনায় কিছু ছিল না, অতএব সে দাওয়ায় বসিয়া পা ছড়াইয়া মহাআনন্দে সুগুনির সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ীর গল্প জুড়িয়া দিল। ফুল ছোট ছোট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহা শুনিতেছিল, এক একবার চকিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল—মা আস্‌ছে কি না!

একটু পরে পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মা আসিয়া পৌঁছিলেন। ফুল মার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, অধোমুখে ফুল গুছাইতেছিল। কালী দেখিল, সইমার মুখে রাগের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, সচরাচর যেমন দেখে ম্লান গম্ভীর মুখচ্ছবি, তাহার কোন বৈলক্ষণ্য দেখিল না। কাজেই সে সাহস পাইয়া সইয়ের দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হইল। হাসিয়া ডাকিল—"সইমা!"

নি। কেন মা?

কা। তুমি নাকি সইয়ের উপর রাগ করেচো? তা সইয়ের কোন দোষ ছিল না গো, আমি তাই তোমায় বল্‌তে এয়েছি। সই ভয় পেয়েছিল বলে আমরা অনেক ঘুরে এলাম।

নি। ফটীকের মাকে দেখে বুঝি ?

কা। বাগ্‌দী বুড়ীর কথা বল্‌চো ? কেমন করে জান্‌লে তুমি সইমা ?

নি। আর তুই নেংটো হয়ে সাঁতার দিচ্ছিলি, ফুলি বটগাছ তলায় শুয়েছিল,—না ?

কালী ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখনও ফুল অধোমুখে। নিস্তারিণী বালিকা-দের এই ভয়ে কৌতূহলে মাখামাখি সরল সুন্দর ভাব দেখিয়া আনন্দানুভব করিতে-ছিলেন। কালী সইমার মুখের দিকে চাহিয়া আব ার সুধাইল—"বল দেখি, কেন জলে নেমেছিলাম সইমা !"

নিস্তারিণী কমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন, পদ্ম তুল্‌তে ! ফুলির ভারি ভয়, তার মানা শুনিস্‌নি বটে ?

এবার ফুল মা ও সইয়ের দিকে চাহিয়া লজ্জায় মৃদু হাসিল। সে বুঝিল মেঘ কাটিয়া গেল, মা আজ আর বকবে না। কালী বলিল "সইমা, তুমি খুব মন্তর তন্তর জান লোকে বলে !"

সইমা সে কথার জবাব দিলেন না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তুই বাছা ফটীকের মাকে অমন করে ক্ষেপাস কেন ? পুরনও ক্ষেপায় ! আহা গরির মানুষ, কেন এমন করিস্‌ বাছা ?"

কালী হাসিয়া বলিল—"বুঝেছি সইমা, বাগ্‌দী বুড়ী সব তোমায় বলেচে। তা গাল দেয় কেন,—ডান মাগীটে—তাই ত ক্ষেপাই সইমা ! পুরো দাদা আবার তা মাতায় নুন ছিটিয়ে দেয়, মাগী যে নেচে ওটে গো ! ওঃ বুঝেচি, তোমার মন্তর মি সইমা,—সেই তোমায় সব লাগিয়ে দিয়েচে।"

নি। তা মিছে ত কিছু বলেনি বাছা ! আমার মাথা খাস্‌ কালী, আর রাগাস্‌নে—পুরনকে একবার ডাকিস্‌ তো—আমি মানা করে দেব। আহা বুড় গরিব মানুষ, কত মন্নি করে।

চুপ করিয়া সুবুদ্ধি মেয়ে এ অনুযোগ ও অনুরোধ শুনিল। তার পর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা সইমা, আমি আর কখন রাগাবো না বাগ্‌দী বুড়ীকে, কিন্তু তুমি বাছা মাকে বলে দিতে পারবে না যে আমি নেংটো হয়ে সাঁতার দিয়েচি !"

নিস্তারিণী মৃদু হাসিয়া সম্মত হইলেন, কালীকে বলিয়া দিলেন যে আজ ও একবার তার মা ও পিসিমাকে দুপুর বেলায় যেন পাঠিয়ে দেয়। একলা মানুষ, বিয়ের কাজ আর হয়ে ওঠে না। দুষ্ট মেয়ে এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্রী নহে। বলিয়া রাখিল, সেও আস্‌বে সইকে নিতে, গা ধুতে যাবার জন্যে। তখন নিস্তারিণী কাপড় ছাড়িয়া ফুল লইয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুশুনিও উঠিয়া গেল। তখন ফুল চুপি চুপি সইকে বলিল,—তবে আর দুপুর বেলায় কাপড় কাচ্‌তে গিয়ে কাজ নেই ! কালী মাথা নাড়িল, না গেলে পুরো দাদা

বল্‌বে "মিচ্‌কতারি!" তার উপরও ফুল ছুইবার অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু শেষে সইকে পারিয়া উঠিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ভাষায় কোন কবি বোধ করি "মধ্যাহ্নের" সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবিতা লেখেন নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সে কবিতাও কবির কোমল বয়সের লেখা। বাস্তবিক মধ্যাহ্নের যে প্রচণ্ড শোভা, ছেলেরা ভিন্ন আর কেহ উপভোগের প্রকৃত অধিকারী নহে। কি সুখে যে তারা সেই চৈত্র বৈশাখের মার্ত্তণ্ড-তলে আঁব বাগানে মাতামাতি করিয়া বেড়ায়, তাহা আর এক-বার ছেলে হইয়া ভোগ করিতে না পারিলে বুঝা যায় না।

গুরুমহাশয়কে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া পাঠশালার ছেলের দল ভোলা আর মধোকে ধরিতে চলিল—পথ প্রদর্শক পুরন্দর নিজে। যে পথে আঁব বাগান বেশী, তাল পুকুর যাইবার অন্য সোজা পথ থাকিলেও পুরন্দর সেই পথে চলিল। গাছের ছায়ায় রাখালেরা কোথাও খেলিতেছে; অদূরে সবৎস গাভীর পাল একমনে তৃণ ভোজনে রত, কেহ বা সে মায়া ভুলিয়া সুপক্ক যব ও গোধুম ক্ষেতের দিকে ছুটিতেছে। কোথাও কোন ভাবুক রাখাল ছায়াতলে অর্দ্ধ শয়ানাবস্থায় দূরে মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা লক্ষ্য করিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া কখন সঙ্গীত সুধা কখন বা গোগণের প্রতি গালি বর্ষণ করিতেছে। কোথাও বটগাছের ডালে ঝুলন যাত্রার উৎসব পড়িয়া গেছে—কোথাও ক্লান্ত শাখা-মৃগের অনুসরণে পাঁচনী ও ঢিল হস্তে ছোট বড় রাখালেরা ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও কেহ নব ঘন শ্যাম আম্র স্তবকের দিকে পাঁচনী লক্ষ্য করিতেছে, কেহ ঢিল ছাড়িতেছে, কেহ অদৃষ্ট এক বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া চাহিয়া আছে—কখন্ একটী আঁব পড়িবে। অতএব তালপুকুর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার যে সহিষ্ণুতা এবং আকর্ষণ, তাহা এক পুরন্দরেরই রহিল।

পুরন্দরের প্রথম চেষ্টা ভোলা আর মধোকে ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হোক্, তাড়াইতে হইবে। অতএব সে পুকুরের উত্তর কোণ হইতে অলক্ষ্যে ভোলা ও মধোর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তখনও ভোলা সচকিতে চারিদিকে চাহিতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে মহাসাবধানে অতি সন্তর্পণে কাককুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইতেছিল। তখন মতলব আঁটিয়া পুরন্দর নিকটবর্ত্তী সদ্যঃ কর্ষিত ভূমি হইতে এক কোঁচড় ঢিল সংগ্রহ করিল এবং ঘুরিয়া অপেক্ষাকৃত দূর পথে বটতলার দিকে গেল। হঠাৎ মধোর পিঠের উপর চারি পাঁচটা ঢিল গিয়া গিয়া লাগিল—সে ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতে ভোলার ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিল। ভোলা ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—"মধোরে ভূতে ঢেলা মেরে অশ্বত্থ গাছে চড়েছে।"

বাস্তবিক ততক্ষণ ভূত মহাশয় অশ্বত্থ গাছের ঘন পত্রান্তরাল আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা আন্দোলিত করিতেছিলেন এবং সময় বুঝিয়া আর একবার ছোট বড় লোষ্ট্রের রাশি মধ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কাজেই মধ্যে পড়িতে পড়িতে তিন লাফে মাটীতে পড়িল এবং পশ্চাৎ আর না দেখিয়া ভোলার অনুসরণ করিল। তখন পুরন্দর সেই গাছের ডালে বসিয়া আপন মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইল। তারপর কাকের বাসায় কোকিলের ছানা দেখিতে বটগাছে উঠিতে লাগিল। কিন্তু এবার অলক্ষ্যে উঠিতে পারিল না। কাকদম্পতি কুলায়ে উপস্থিত হইয়াই একবার আশ্রয়দাতা বটবৃক্ষের আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। পুরন্দর তত সাবধানে উঠিতেছিল না, উঠিলেও বায়স চক্ষু এবং চঞ্চুকে প্রতারিত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব মুহূর্ত্ত মধ্যে কাক রাজ্যে বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান কাক-সমাকুলিত হইয়া উঠিল। মনুষ্য মণ্ডলীর ন্যায় পুরন্দরের কাক মণ্ডলীতেও যথেষ্ঠ নামযশ ছিল—অনেক বায়স শিশু তাঁহার কল্যাণে অকালে কাকদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই চঞ্চুর উপর চঞ্চুর-খরাঘাতে পুরন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার বাগিন্দ্রিয় পঞ্চমে এবং হস্তপদ বিংশতিতে যুগবৎ পরিচালিত হইলেও তৎক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারিল না।

এদিকে ছোট ছোট মেয়ে দুটি ছোট ছোট কলসী কাঁখে তাল পুকুরের ন ঘাটে আসিয়া নামিল। পুরন্দর তাহা দেখিল, কিন্তু আরও একটু রঙ্গ করিতে ত ইচ্ছা ছিল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া কালী কোথাও পুরন্দরকে দেখিতে পাইত ফুলের দৃষ্টি জলের উপর। পুকুরের পাড়ের দিকে চাহিতেই পারিতেছিল না। শেষে যখন কালী বলিল—"দাদা বুঝি এলো না," তখন ফুলের চক্ষু তৎক্ষ গাছের পানে উঠিয়া আবার জলের দিকে নত হইল। সেই ভাবে ফুল আ সইকে বটগাছের দিক দেখাইয়া দিল, আর অনুরোধ করিল—মানা করিয়া ত না মারে।

কালী মানিল, এ হতে পারে বটে, পুরো দাদা বটগাছে উঠেচে কাকের ছা পারতে, নইলে কাক পোড়ারমুখোরা অমন করে মরবে কেন!

অতএব সকলসী সই এবং আপনার কলসী ঘাটে ফেলিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কালী বট গাছের দিকে ছুটিয়া চলিল। পুরন্দর তাহা দেখিল, বোন্‌টী কষ্ট পাইয়া অতদূরে না এসে, এ দয়াটুকুর বোধ করি সঞ্চার হইল। কাজেই কালী অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে দেখিল, বটগাছের যে ডালটা পুকুরের পানে হেলিয়া আছে, তাহা হইতে কে একজন জলে লাফাইয়া পড়িল। চিনিল—আর কে, পুরো দাদাই বটে!

সাঁতার দিতে দিতে পুরোদাদা অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন। মাথার উপরে সূর্য্যের দিকে মুখ এবং হাত দিয়া জল ছিটাইতেছিলেন, কখন ডুবিয়া কখন চিৎ হইয়া শান্ত

জলরাশিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। আর কখন কখন আদর করিয়া "বোন্‌টী" বলিয়া এমনি চীৎকার করিয়া উঠিতে ছিলেন যে সে রব প্রতিধ্বনিত হইয়া তাল-রাজি-শিরস্থ ছায়া-প্রয়াসী পক্ষীগণের বিষম ভীতির কারণ হইতেছিল। কালীর তাহাতে মহা আনন্দ, কিন্তু তাঁর সইয়ের ঠিক্‌ বিপরীত ভাব। ভয়, পাছে গোলমাল শুনিয়া কেহ সেখানে আসিয়া পড়ে! যদি দেখে কনে বরের সাঁতার দেওয়া দেখিতেছে, তাহলে কি হবে! কাজেই তিনি যুবতীর মত লজ্জা রাখিতে ঠাঁই না পাইয়া জল হইতে উঠিয়া পলাইলেন এবং গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, সই কাছে আসিলে তার উপর অভিমান করিয়া কথা কহিলেন না, সে আদর করিয়া হাত ধরিয়া টানিলে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর কোথাও যাব না!" এখন সইয়ের মুখ দেখিলেই কালী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে, কাজেই তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, কেন অনর্থ ঘটিয়াছে। ততক্ষণে পুরন্দর ঘাটে আসিয়া হাজির হইলেন এবং দ্বিগুণ স্বর চড়াইয়া বোনটীকে ডাকিতে লাগিলেন।

কালী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অত চেঁচিও না।"

পু। বামুন হয়ে পায়ে পড়লি বোন্‌টী—আমার যে পাপ হবে। তা আর চেঁচাবনা, খন্‌ বল কি কথা? শীগ্‌গির বল!

কা। মাথাটা আগে মুছে ফেল দাদা,—এই গামছা নাও। ছি আবার নইলে মো হবে যে!

অপ্রতিভ হইয়া পুরন্দর কালীর দত্ত গামছায় মাথা মুছিল। বোন্‌টী তখন সাহস দাদাকে দুইটী অনুরোধ করিলেন—কাকের ছানা না মারতে আর বাগ্‌দী বুড়ীকে াতে!

কে। (হাসিয়া) তা এই কথা বল্‌তে ডেকেছিলি বোনটী?—তুই ভারি দুষ্টু কংছিস্‌!

কা। তা দুষ্টু হই আর যা হই, মাথা খাও দাদা, তুমি আর অমন করে কাকের ছানা পেড়ো না—সই কত দুঃখু করে! সত্যিই ত, তাদের মারা কত কাঁদে। তোমার কি মায়া হয় না দাদা? আর সইমা তোমায় একবার ডেকেচে বাগ্‌দী বুড়ীকে আর ক্ষেপিও না।

কথা গুলি বলিতে কালীর মুখে বিষাদে আনন্দে মাথা মাখি একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—আপনা ভুলিয়া পুরন্দরের মুখ পানে স্থির করুণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বালিকা আর্ত্ত জীবের জন্য করুণা ভিক্ষা করিল। সেই শুভক্ষণে ফুলকুমারী সই ও পুরন্দরকে লুকাইয়া দেখিতে গিয়া ভাবী স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। পুরন্দর সে নয়নে দেখিল কেবল করুণা, কালীর কথার চিত্র যেন সেই শান্ত করুণ নয়নে ভাসিতেছিল। পরের দুঃখের কথায় আর কখন পুরন্দরের হৃদয় কাঁপে নাই—আজি এই প্রথম কাঁপিয়া

উঠিল। সে আর দাঁড়াইল না, খানিক দৌড়িয়া গিয়া "আচ্ছা বোন্‌টী" বলিয়া আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। কাজেই সকালবেলাকার কোন কথা শোনা হইল না। কালীও তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইল না।

অদ্ভুত রোদন ও অদ্ভুত সুখ।

অদ্ভুত রোদন।

১

হেরিলে শিশুর হাসি করি গো রোদন,
না জানি আমার ভাগ্যে কেমন লিখন!
শিশুমুখ পদ্ম মরি,　ফুটে উঠে ধীরি ধীরি,
জননীর নয়নের বালার্ক কিরণে!
যেন কোন গুপ্তনিধি, যেন কোন হারানিধি,
দেখিতে পেয়েছে শিশু মায়ের বদনে!
জনম জনমে যাহা,　বুঝিতে নারিনু আহা,
সে রহস্য শিশু যেন বুঝেছে সকলি;
নতুবা মায়ের পানে, চাহে শিশু ঘনে ঘনে,
কেন এত, কেন তার আকুলি ব্যাকুলি?
মায়ের বদন হেরি,　স্বরগের কথা স্মরি,
পুলকে নাচিয়া উঠে আঁখি সুকুমার;
হায়রে আমার নেত্রে বহিছে আসার!

২

"এত দিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর——
রাখ্ বোন্ ফুল, তেল,　পুঁজিকাটি তোর;
সময় বহিয়া যায়, কি হবে সাজ সজ্জায়!
রুক্ষবেশে, রুক্ষ কেশে, ভেটিব তাঁহায়।
পরেছি সিন্দুর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী,
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায়?
চল্ বোন্ রান্না ঘরে, আজি পরিপাটি ক'রে
রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন;
বিদেশ বিভুমে হায়,　অনাহারে অনিদ্রায়,
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ!
সকলি মোদের তরে;—চল্ চল্ ত্বরা ক'রে,
আমাদের বসে থাকা সাজে কি এখন?"
বাড়ী ফিরে এল পতি,　চিরবিরহিনী সতী
হাসিছে মধুরে কিবা গাল ভরা হাসি;
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি!

৩

পড়ে গেল হুলুস্থুল পাড়ার ভিতরে।
করিয়ে শ্বশুর ঘর,　বহু বহু দিন পর,
এসেছে, এসেছে কন্যা, নিজ পিতৃ ঘরে।
বহুক্ষণ মার কাছে; খানিক পিতার কাছে;
খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে;
খুকির ধরিয়া কর,　দেখে তার খেলা ঘর;
দুটি কথা খানিক সইর কানে কানে;
ঝিমারে বসায়ে দূরে, সলিতা পাকায় ধীরে;
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে ব'সে;
ছোট বৌর হাত হ'তে,কাড়ি লয়ে আচম্বিতে,
নিজে কভু সাজে পান মনের হরষে।
বহু বহুদিন পরে,　কন্যা আসি পিতৃ ঘরে,
মূর্ত্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়!
হায়রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায়।

অদ্ভুত সুখ।

১

এমনি স্বভাব মোর! কচি ছেলে পেলে,
অমনি কাঁদাই তারে মহা কুতূহলে।
মায়ের কোলেতে উঠি,ফোলো ফোলো ওষ্ঠদুটি,
ডাগর নয়ন দুটি আকর্ণ বিস্তার,
শিশু যবে ডুকুরিয়া করে গো চীৎকার,
বসি আমি একভিতে, মার চক্ষু মুকুরেতে
বিস্মিত শিশুর মূর্ত্তি হেরি বার বার।
অশুষ্ক নয়ননীর, ওষ্ঠে বহে স্তনক্ষীর,
ললাটে কজ্জল রেখা, মরি কি বাহার।
হেরি সেই অশ্রুবারি,হাসিকি রাখিতে পারি?
এমনি স্বভাব মোর, এমনি ব্যভার!

২

বিধবার নির্ব্বাপিত স্মৃতির অনলে,
দিগো আমি ঘৃতাহুতি কত কুতূহলে।
ভুলিয়ে মরম জ্বালা, আনমনে হাসে বালা;
সে হাসিকি লাগে ভাল? পাড়ি আমি ছলে—
'তার' কথা—দিগো আমি হুতাশন জ্বেলে।
উষায় পল্লব যথা, ভিজে যায় আঁখিপাতা,
পাণ্ডুরাগ ছেয়ে ফেলে গণ্ড ও কপোলে;
ক্ষাম সেই অঙ্গযষ্টি, শূন্য সেই অধোদৃষ্টি,
উপমার বস্তু কিছু আছে কি ভূতলে?
হেরি সে পবিত্র দুঃখ উপজে অপূর্ব্ব সুখ?
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে।

৩

জৈন বৈষ্ণবের কাছে বসিয়া বিরলে,
গো হত্যার কথা পাড়ি মহা কুতূহলে।
ধবলে পাটলরেখা বর্ণধেনুটির,
বৃহৎ পালান্ কিবা প্রকাণ্ড শরীর।
ক্রুর মুসলমান্ তারে, লয়ে যায় হত্যাগারে;
পথে ছিল এক জন হিন্দুর আলয়,
প্রাণ ভয়ে ধেনু তথা লইল আশ্রয়।
যবন পশিল গৃহে; গৃহ স্বামী আসি কহে
"যত মূল্য এর তার লও চতুর্গুণ,
গরীব ধেনুরে তুমি কর না গো খুন।
'কাফেরের দান তুচ্ছ,' এতেক বলিয়া ম্লেচ্ছ
গলে রজ্জু দিয়া তারে লয়ে যায় টানি;—
গৃহস্বামী পানে হায়, সিক্ত নেত্রে গোরু চায়;
হেরি সেই নন্দিনীর আকুল তাকানি.
গৃহস্থের দর দর নেত্রে বহে পানি!
শুনিয়ে আমার কথা, মনে পায় ঘোর ব্যথা,
জৈন বৈষ্ণবের নেত্র ভেসে যায় জলে;
হেরি সে পবিত্র দুঃখ উপজে অপূর্ব্ব সুখ
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অনেক দিন পূর্ব্বে ভারতীতে একজন খ্যাত নামা লেখক বলিয়াছেন——

"ভাবের সরোবরে আমরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না, ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। মাছ ধরিবার জাল আবিষ্কার হয় নাই, জানি না, কোন কালে হইবে কি না। ছিপ্ ফেলিয়া বসিয়া আছি, কখন মাছ আসিয়া ঠোকরায়। কিন্তু ঠোকরাইলেই হইল না, মাছকে ডাঙ্গায় তোলাই আসল কাজ। জলের মধ্যে অনেক ভাব কিল্‌বিল্ করিয়া থাকে,

কিন্তু তাহাদের ডাঙ্গায় উঠাইয়া তোলা সাধারণ ব্যাপার নহে। ঠোক্‌রাইল, বঁড়শি লাগিল না ; বঁড়শি লাগিল, ছিঁড়িয়া পলাইল। অনেক মাছ যতক্ষণ জলে আছে, যতক্ষণ খেলাইতেছে, ততক্ষণ মনে হইতেছে প্রকাণ্ড, তুলিয়া দেখি, যত বড় মনে হইয়াছিল, তত বড়টা নয়। ভাব আকর্ষণ করিবার জন্য কত প্রকার চার ফেলিতে হয়, কত কৌশল করিতে হয়, তাহা ভাব ব্যবসায়ীরা জানেন। জাল নাড়া না পায় খুব স্থির থাকে ; ভাব যখন বড়শি-বিদ্ধ হইল, তবুও জোর করিতেছে, উঠিতেছে না, তখন যেন অধীর হইয়া, টানা হেঁচড়া করিয়া উঠাইবার চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, যথেষ্ট খেলাইয়া আয়ত্ত করিয়া তুলিবে। আমরা পরের মনঃ সরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার এক পুষ্করণী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসর মত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানা প্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছ গুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি, ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি। কাহারো বা মন ডোবা, কাহারো বা পুষ্করিণী, কাহারো বা নদী, কাহারো সমুদ্র। কাহারো বা মনে মাছ ঢের, কাহারো বা মনে মাছ নাই, কাহারো বা মনে কতকগুলা কাঁকড়া ও অখাদ্য মাছ আছে।"

মনঃ সরোবরে ভাবের মাছ ধরা সম্বন্ধে এই যে কথাগুলি ইহার উত্তরাকাণ্ডের আবশ্যক।

যদি বঁড়শীতে টোপ গাঁথিয়া জলে ফেল আর সমস্ত দিন ছিপ হাতে করিয়া বসিয়া থাক তাহা হইলেও ছিপে সূতা না থাকিলে কিছুতেই মাছ উঠিবে না—হইবে কেবল শ্রান্তিটুকু উপরি লাভ ও টোপ বঁড়শি লোকসান। ভাষা হীন ব্যক্তির ভাবিতে যাওয়া কেবল শান্তির কাদামাখা সার, মাছ ধরা আর হয় না। চার (ড়) টার (ড়) করিয়া ভাবের মাছ ধরিতে গেলে চারে ছোট বড় অনেক রকম মাছ আসিয়া ঘাই দেয়, কিন্তু সে সকল চারের মাছের লাফানি ঝাঁপানি দেখিবার জন্য যদি তুমি লক্ষ্য সিদ্ধ না হইতেই নজর তুলিয়া লও তাহা হইলে কথামালার কুকুর ও প্রতিবিম্বের গল্পটা একবার তোমার উপরই অভিনীত হইয়া যায়। জলের মাছ কখনও ডাঙ্গায় উঠাইতে পার না, লাভে হইতে তোমার টোপটি যায়। এরকম মাছ ধরিবার সময় আর একটা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। দেখ, যেন কোন গুরুর গুরু বাক্যের ঈট হঠাৎ জলে পড়িয়া চার না গুলাইয়া দেয়। তাহা হইলেই সমুদায় মাছ একবারে গভীর জলে পলাইয়া যাইবে।

পুকুরে মাছ থাকিলেও সকল সময় তাহা ধরা যায় না। সেই জন্য বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে দিন কয়েক আগে হইতেই মাছ ধরা আরম্ভ করিতে হয়। তাহার পর তাহাদিগকে হয় কাগজস্থ করিয়া জীয়াইয়া রাখ আর না হয় ধরা মাছের কানাচীতে ভাষার সূতা বাঁধিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিয়া রাখ। তাহা হইলে মাছ আর হারাইবে না। সূতা ধরিয়া টানিলেই তাহা উঠিয়া আসিবে। উল্লিখিত প্রসঙ্গে লেখক যে বলিয়াছেন ভাব ধরিবার জন্য কখনই জালের দরকার হয় না সে কথাটা কিছু বেশি একদিক্ ঘেঁসা। ভদ্রলোকেরা কখনোই প্রায় জাল দিয়া মাছ ধরেন না—মাছ ধরিয়া কয়েক টাকা বাঁচানর অপেক্ষা আমোদ লাভ করাই তাঁদের আসল ইচ্ছা। কিন্তু তাই বলিয়া জালের যে কখনই ব্যবহার হয় না তাহা নয়। অনেকে রাত্রের বেলা চোরা গোপ্তায় মৃত বা জীবিত এক ব্যক্তির মনে ঝপাৎ করিয়া একবার জাল ফেলিয়া যাহা পান তাহা লইয়াই সরিয়া পড়েন। অনেক সময় ইহাদের জালে কেবল পচা পাঁক, গাঁজ ও গোহাড় মাত্র উঠে, আর ইহারা তাহাই লইয়া পালান—জালটা ত' ভারি হয়, আর চোরাই জিনিস বেশীক্ষণ [illegible]

ইহা ছাড়া সাহিত্য জগতে অনুবাদক নামে আর এক ঘর জেলে আছেন তাহাদের নিজের পুকুর নাই পরের পুকুর জমা লইয়াই চলে।

আমাদের জীবনের সঙ্গে বর্ণমালার কি যোগ বহু দিন পূর্ব্বে ভারতীতে একবার তাহার রহস্য ভেদ হইয়াছিল। রহস্য ভেদকের মতে "অ আ, প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি আমাদের জীবনের অনুভাব সমূহ। এই গুলি ব্যতীত কোন ব্যঞ্জন বর্ণ দাঁড়াইতে পারে না। জীবনের যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন তাহার সহিত অনুভাবের একটা স্বর বর্ণ লিপ্ত আছেই, কখন বা তৃপ্তি সূচক 'আ' কখন বা তীব্র যন্ত্রণা সূচক 'ই' কখন বা গভীর যন্ত্রণা সূচক 'উ' আমাদের ঘটনার ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হয়।"

কিন্তু আমি দেখিতেছি আ, ই, উ, এই তিন স্বরকে এই সম্পর্কে প্রাধান্য দিতে গিয়া তিনি "ঐ" কারের ভাষ্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার তো মনে হয় মনুষ্য-জীবনের সমস্ত রহস্যই এই স্বর বর্ণের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। সুখ দুঃখ শীল মনুষ্য জীবন, এই স্বরটি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গলা ভাঁজা মাত্র। ঐ! ঐ! করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি আর ঐঃ! (যাঃ) করিয়াই আমাদের জীবন কাটে। আমাদের চরম লক্ষ্য "ঐ" কখন 'এ'-'ই' এই দুইটি স্বর বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইবে সর্ব্বদা ইহা ভাবিয়া আমরা আকুল—কিন্তু এ বাসনা যে কখন পূর্ণ হইবে অর্থাৎ "ঐ" কখন "এই" হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

"পৃথিবী নাট্য শালা" এই পুরাতন বাক্যটী মধ্যে মধ্যে আমাদের মুখে শোনা যায়, কিন্তু নাট্যশালা হইতে পৃথিবীর যে প্রধান প্রভেদ সেটা সকল সময় আমাদের চক্ষে পড়ে না। এই তুমি দেখিলে রঙ্গভূমিতে রামরাবণে প্রলয় যুদ্ধ হইয়া রাবণের মৃত্যু হইল, আবার সেই নাট্যশালার পার্শ্বস্থ নেপথ্যে রাম, রাবণ ও মিতা বিভীষণ সকলে সাজ খুলিয়া একত্রে পান ভোজন করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীর নাট্যশালায় অভিনেতৃদিগের সম্মিলনের জন্য নেপথ্য নাই; সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে রঙ্গবেশে মুখে রং মাখিয়া থাকিতে হয়। যদি মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও রং মুছিয়া যায় তাহা হইলে তাহার অন্ন মারা গেল—বেচারী গরীবকে সেই অবধি উন্মাদের পালা গাহিতে হয়। মহাপ্রস্থানের পর কোথায় যে সম্মিলন গৃহ আছে যেখানে দণ্ড আপনাকে আপনি দেখিয়া সুখী হইব তাহা সর্ব্বজ্ঞ ষ্টেজ-ম্যানেজারই জানেন।

আমরা অনেক সময় আমাদের ভালবাসার পাত্রকে কষ্ট দিয়া সুখী হই। কথাটা শুনিবা মাত্র হঠাৎ কেমন কেমন লাগিতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে চমকাইবার কিছুই নাই। সন্দেহের অন্ধকার রাত্রে বেড়াইবার সময় যখন মনে হয় যে আমাদের ভালবাসার পাত্রের হৃদয়ে আমাদের উপর ঔদাস্যরূপ কালফণি দংশন করিয়াছে, তখন সভয়ে তাহার হৃদয়ে আমরা নিষ্ঠুর কথা বা ব্যবহারের একটা কঠিন চিমটি কাটিয়া ফেলি, দেখি যে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অনুভাব শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে কি না। যখন দেখি চিমটি জ্বলিয়া উঠিল তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হস্ত সঞ্চালন করিয়া ফুঁদিতে থাকি ও নীরবে চোকের জল ফেলি। কিন্তু এই কষ্টের ভিতরও আমাদের হৃদয় যাহার পর নাই আনন্দ পূর্ণ হইয়া উঠে; মনে এই একটা আশ্বাস হয় যে ঔদাস্যের সর্পাঘাত হইতে সে হৃদয় রক্ষা পাইয়াছে। সে যাহা হউক এ পরীক্ষা যেন বার বার অভিনীত না হয়, এমন অনেক

সময় ঘটে যে কল্পনার বিকৃতির জন্য আমরা এ চিমটির ফল দেখিতে না পাইয়া আপনিও কাঁদি, আর অন্য দশজনকেও কাঁদাই। এরকম কান্নার দায়ে অনেক ঘরে সোনার মুখে কালি পড়িয়াছে। এরোগের ঔষধ নাই—এসম্বন্ধে ডাক্তারের পরামর্শ,

Therein the patient
Must minister unto himself.

কিন্তু সকলের সাবধানের জন্য একটা বলিতে হইবে এই যে, অন্যায়স্বরূপ চিমটি কাটিতে কাটিতে যথার্থই হৃদয়ে কড়া পড়িতে পারে। এক খণ্ড 'রবার' টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা পূর্ব্বেকার আয়তন ফিরিয়া পায় বলিয়া তাহার উপর বার বার ঐরূপ অত্যাচার করা অনিষ্ট শূন্য নহে। ঐরূপ করিতে করিতে এমন এক সময় আসে যে পূর্ব্বায়তন ফিরিয়া পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও তাহা আর ফিরিয়া পায় না।

হেঁয়ালি নাট্য। *

নব বিবাহিত মতি বাবু বিষণ্ণ ভাবে উপবিষ্ট, তাঁহার ভগিনীপতি বন্ধুবর মাধবের প্রবেশ।

মা। কি হে মতি অমন করে গ'লে হাত দিয়ে কি ভাবা হচ্ছে? উঠতে আজ্ঞা হোক, আমাদের ওখানে একটা মজলিস আছে তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

মতি। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই—যেতে পারব না।

মা। তাকি হয়—তুমি না গেলে আমি ছাড়ব না।

মতি। ভাই মাপ কর—মজলিসে মেশার মত মন এখন আমার নেই—আমার অবস্থাত জানই?

মা। তুমি কি ক্ষেপলে নাকি? আর কি কেউ বিয়ে করে না,—আমাদের কি স্ত্রী নেই?

মতি। তাত আছে—কিন্তু—

মা। 'কিন্তু' এই মাত্র, তোমার স্ত্রীর বয়স ১০ বছর,—আর আমাদের স্ত্রী—স্ত্রীর মতন। সেই ১০ বছরের মেয়ের প্রেমে তুমি এতটা যে কি রকম করে হাবু ডুবু খাচ্ছ, এতটা ফোঁশ ফোঁশ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছ তাত আমি বুঝতেই পারিনে।

মা। হায়! তা তুমি কি করে বুঝতে পারবে? আমার প্রাণের প্রাণ—জীবনের জীবন,—আহা না জানি সে আমার জন্য কতই কাতর। একটু গরম হলে, একটু বৃষ্টি হলে, একটু মৃদু বাতাস বইলে একটু জোর বাতাস হইলে আমার বিরহে তাহার প্রাণ বোধ হয় আমারি মত আকুল হয়ে উঠে, হায় কে বলে দেবে——

মা। আমি বলে দিচ্ছি—অত ভাববার কোন কারণ নেই—আমি এই মাত্র—

মতি। এইমাত্র?—মতি বাবু—বল বল—কি এইমাত্র—? সেত ভাল আছে—সুখে আছে মাধব বাবু—? সে সুখে আছে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তার কথা শোনার জন্য যে আমি হা প্রত্যাশ করে আছি,—সে জল—আমি যে মীন—সে চাঁদ আমি যে চাতক—

---

* গত বারের উত্তর দরকার। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

মা। চাতক না চকোর — ? তা যাই হও—আমি ভরষা দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, সে ভালও আছে—সুখেও আছে। আমি গাড়ী করে আসবার সময় দেখে এলাম — নলিনী তাদের বাড়ীর বাগানে ছুট ছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

মতি। সত্যি ? সত্যি ? তাকে ছুটছুটি করতে দেখলেন ? আমি সেখানে নেই, আমা হারা হ'য়েও সে হেসে খেলে আমোদ করে বেড়াচ্ছে ? আমার শ্যালি যে লিখেছেন, নলিনী আমার বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে,—হায় !

(হরি বাবুর প্রবেশ।)

মা। এই যে তোমার ভায়রাভাই হরি বাবু এসেছেন —তাঁকে জিজ্ঞাসা কর না,— উনি বল্লেত বিশ্বাস হবে ? হরি বাবু নলিনা কেমন আছে ?

হরি। আমাদের নোলু ?

মতি। (স্বগতঃ) আমাদের নোলু — ? উঃ এতখানি আস্পর্দ্ধা ?

মা। হ্যাঁ তার কথাই বলছি মতি বাবু শুনেছেন—সে অসুস্থ—তাই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ?

মা। হা হাঃ অসুস্থ ? এই মাত্র আমরা সকলে বাগানে খেলা করছিলেম। তার সঙ্গে ছুটে ছুটে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে —আমার পকেট থেকে চাবি চুরী করে আর দেবে না।

মতি। (স্বগতঃ) পকেট থেকে চাবী চুরী,—পর পুরুষের অঙ্গস্পর্শ, নলিনী এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার প্রেম ! হায় কি বিশ্বাসঘাতকতা !

মা। তাপর চাবিটাত পেয়েছেন ? একজনের হৃদয়ে সে এমন চাবি দিয়েছে — যে আমি এত চেষ্টা করেও খুলতে পারছিনে, আবার আপনার শুদ্ধ মনের চাবি হারাবে না ত ?

মতি। (সক্রোধে) মাধব ও ঠাট্টা করো না—জান—

হরি। মতি বাবু আপনার ভয় হচ্ছে নাকি ? তা ভয় নেই। জানেন আজ দুটি গালে দুটি চড় মেরে তার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়েছি, মন চাবি যদি চুরি করে ত সেই রকম করে না হয় কেড়ে নেওয়া যাবে।

মতি। (দ্বিগুণ ক্রোধে) হরি বাবু জানেন সে পরস্ত্রী। সে আমার স্ত্রী ? তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে জানেন আপনি কতদূর অভদ্রতা করেছেন ? এর জন্য আমার কাছে মাপ চাওয়া উচিত ?

মা। মতি, তুমি কি সত্যই ক্ষেপেছ ?

মতি। আমি ক্ষেপেছি ? তোমার ধমনীতে একটুও আর্য্য শোনিত নেই, তাই তুমি ওকথা বলছ, হরি বাবু—দাঁড়ান—দাঁড়ান—যদি ভরষা থাকে দাঁড়ান, যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই"

(হস্ত আস্ফালন করত দণ্ডায়মান)

(হরি বাবু হাসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় চৌকিতে বসাইয়া) মাধব বাবু একটু জল আনুন, সত্যই মতি ক্ষেপেছেন।

মতি। (অবসন্নভাবে চৌকীতে মাথা হেলাইয়া) আঃ, কি ভয়ানক ! কি অত্যাচার ! কি অপমান ! প্রাণ থাকিতেও এ অপমান আমি ভুলিব না ? প্রিয়ে তোমার মনে, এই ছিল !

বেলিগার্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্যর হেন্‌রি ও লর্ড ক্যানিং।

মীরট ও দিল্লীর বিদ্রোহ ব্যাপার অবগত হইবার পর স্যর হেন্‌রি কলিকাতায় লর্ড ক্যানিংকে তারে সংবাদ পাঠাইলেন—"দিল্লী ও মীরটে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, লক্ষ্ণৌতে সেরূপ ঘটনা সুদূর-পরাহত নহে! এ প্রকার স্থলে কমিশনরের সকল বিভাগে একচ্ছত্রা ক্ষমতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন—আপনি আমাকে লক্ষ্ণৌএ সমগ্র সেনাদল পরিচালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করুন।" লর্ড ক্যানিং ইহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আপনার প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি অযোধ্যা প্রদেশের সমগ্র সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন এবং যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে জঙ্গ বাহাদুরের নিকট গুরখা সৈন্যেরও প্রার্থনা করিতে পারেন।"

এইবার হেনরি লরেন্স নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার মতানুসারে সহরের নানা স্থান সুরক্ষিত হইতে লাগিল। যেখানে বেটি করিলে সিপাহীদিগের সহিত অব্যাহত ভাবে যুঝিতে পারা যায় এবং উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই আয়োজন হইতে লাগিল। রেসিডেন্সি, মচ্ছিভবন, ও নবাবের অন্যান্য কয়েকটি প্রাসাদ লক্ষ্ণৌ সহর ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল, ইহার মধ্যে রেসিডেন্সি ও তাহার পার্শ্বস্থ কয়েকটি সৌধমালা উন্নত স্থানে অবস্থিত থাকাতে চারিদিক হইতে ইহার উন্নত প্রাকার, ও সৌধচূড়া পরিলক্ষিত হইত। ইহার পর মচ্ছিভবন। ইহা অতি প্রাচীন এবং সুদৃঢ় দুর্গ এবং পার্শ্ববাহিনী গোমতী হইতে ইহার দূরত্ব অতি অল্প। এই সমস্ত সৌধমালার দক্ষিণে সুপ্রশস্ত লক্ষ্ণৌ নগরী। ইহার মধ্যস্থলে একটি খাল—খালটি বরাবর লামার্টিনিয়ারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্ববাহিনী হইয়া গোমতীতে গিয়া মিশিয়াছে। লামার্টিনিয়ারের কিছু দক্ষিণে দিলখুসী। ইহা নবাবের প্রমোদ কানন; এই স্থানে বসিয়া তিনি মৃগয়াদি করিতেন। রেসিডেন্সির উত্তর পূর্ব্বে এবং গোমতীর দক্ষিণ পার্শ্বে ক্যান্টনমেণ্ট। ক্যান্টনমেণ্ট হইতে এ পারে আসিবার জন্য দুইটি লৌহময় সেতু গোমতী-বক্ষে সংস্থাপিত। সেতু দুইটির মধ্যে একটি মচ্ছিভবনের সন্নিধানে ও অপরটি রেসিডেন্সির সম্মুখে অবস্থিত ছিল। ইহা ভিন্ন লামার্টিনিয়ার ও রেসিডেন্সির মধ্যে নবাবী আমলের "মতি মহল," "সেকেন্দরাবাগ," "ফেরোদ বক্‌স কুঠী" নামক কয়েকটি উন্নত প্রাসাদ ছিল। নগরের দক্ষিণে রেসিডেন্সি হইতে দুই ক্রোশ দূরে কানপুরের

আত্ম-রক্ষার নূতন বন্দোবস্ত।

কোম্পানীর দখলে যে সকল বড় বড় বাড়ীগুলি ছিল, তাহাদের সংস্থান উপরে দেখাইলাম; ইহা ভিন্ন সহরের মধ্যে ও তাহার আশেপাশে আটটি প্রধান প্রধান স্থানে ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্যদিগের ছাউনী ছিল। স্যার হেন্‌রী ভাবী বিপদাশঙ্কায় এই আটটি আড্ডা কমাইয়া চারিটিতে পরিণত করিলেন। চারি দিকে দেশীয় সৈন্য ছড়াইয়া না রাখিয়া এক স্থলে কেন্দ্রীভূত করা যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ—ইহা তাঁহার স্থির ধারণা ছিল। যে সকল স্থানে কেবল দেশীয় সৈন্য ছিল, সে সকল স্থানে তিনি তাহাদের সহিত বিলাতী সৈন্য সংমিশ্রিত করিয়া দিলেন। সিপাহী সৈন্য একক থাকিলে যে প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা, এই উপায় দ্বারা তাহার অনেকটা প্রতিবিধান হইল। সর্ব্বাগ্রে তিনি মচ্ছি ভবন ও রেসিডেন্সি সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। উদ্বৃত্ত বারুদ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি এবং প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ সৈন্য মচ্ছিভবনে পাঠাইয়া তাহা সুদৃঢ় করা হইল; সেই প্রাচীন দুর্গের আশে পাশে নূতন ও পুরাতন অনেক বড় বড় কামান সাজান হইল, রেসিডেন্সিতে পাহারা দিবার জন্য দেশীয় ও বিলাতী সৈন্যের সংমিশ্রণ করা হইল। খাজানা খানায় ইংরাজের যথা সর্ব্বস্ব—কিন্তু এ ভয়ানক সময়ে তাহার রক্ষা ভার দেশীয় সৈন্যের উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা বাতুলতার কার্য্য—সুতরাং দেশীয় সিপাহী ও বিলাতী গোরা পালাক্রমে তাহা চৌকী দিতে লাগিল। রেসিডেন্সির চারি দিকে কতকগুলি বড় বড় আঠার পাউণ্ডার কামান সাজান হইল। কামানগুলি এ প্রকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, সামান্য গোলযোগ দেখিলে তাহা হইতে অগ্ন্যুদ্গীরণ করিয়া সিপাহীর মস্তক উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া হেনরি লরেন্স এই সুরক্ষিত নিরাপদ রেসিডেন্সি মধ্যে বাহিরের ইংরাজ রমণী, বালক বালিকা ও বৃদ্ধগণকে আনাইলেন। তাহারা উপযুক্ত আশ্রয় পাইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইল। বাহিরে গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত কার্য্যালয় ছিল, তাহার কেরাণী প্রভৃতি কর্ম্মচারীরাও এই সঙ্গে রেসিডেন্সিতে আসিল। হেন্‌রি লরেন্স তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করিয়া সৈনিক নিয়মে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। কেরাণীরা কলম ছাড়িয়া তরবার ধরিল—কাষ্ঠাসন পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ প্রাচীরে সঙ্গিন হস্তে দণ্ডায়মান হইল।

দুইটি রক্ষিত স্থানের কথা উপরে বলা হইল, এক্ষণে অবশিষ্ট দুইটির কথা বলিব। নদীর অপর পারে লক্ষ্ণৌ ক্যাণ্টনমেণ্ট, এবং গোমতীর উপর রেসিডেন্সির সম্মুখেই দুইটি লৌহ ও প্রস্তরময় সেতু। এই দুইটি সেতুর পুরোভাগ বন্ধ করিতে পারিলে ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীদের সহিত সহরের সিপাহী ও অন্যান্য দুষ্ট লোকের সকল সংশ্রব বন্ধ হইয়া যায়। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চারি শত ইংরাজ সৈন্য দুইটি

বড় বড় কামান লইয়া সেতু রক্ষায় নিয়োজিত হইল এবং এই সঙ্গে সঙ্গে নদীর অপর পারে ক্যান্টনমেন্টও সুরক্ষিত করা হইল।

মহাবিপ্লবের পূর্ব্ব সূচনা—ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ও সিপাহীর প্রতিহিংসা।

লক্ষ্ণৌএ কিপ্রকার মহাঝটিকা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তৎপ্রতিবিধানার্থে স্যার হেন্‌রি এই সমস্ত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন; কিন্তু সিপাহীরা ভাবিল ফিরিঙ্গিরা বড়ই ভয় পাইয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে বড়ই ফাঁদে ফেলিয়াছে। দিনের পর দিন যায়—সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হয়—কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস কোন ক্রমেই দূরীভূত হয় না—একবার ইংরাজদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিবে ইহাই তাহাদের প্রধান সংকল্প। ইংরাজের পুলিশ এত হুঁসিয়ার, তথাপি এই সময়ে গভীর নিশীথে, নগরের প্রকাশ্য স্থলে—কে যে বিদ্রোহসূচক বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়া যায়, তাহা তাহারা ধরিতে পারে না। এই সকল বিজ্ঞাপনে প্রায়ই লেখা থাকিত—"ভাই সকল একবার সাহস করিয়া দল বাঁধিয়া সঙ্গিন লইয়া দুবৃর্ত্ত ফিরিঙ্গীকে লক্ষ্ণৌ হইতে তাড়াইয়া দাও—বা তাহাদের শীতল শোণিতে লক্ষ্ণৌ-বক্ষ প্লাবিত কর।" এই সমস্ত বিদ্রোহাত্মক, বিভীষিকা যে কেহই প্রচার করুক না কেন—ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বুঝিলেন—নগরবাসী উন্মত্ত মুসলমানগণের এই কার্য্য। ইহা ভিন্ন প্রতি দিন জনরব উঠিতে লাগিল যে রাত্রে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া নগরস্থ ইংরাজদিগকে হত্যা করিবে।

পরিশেষে ৩০শে মে এই জনরব সত্যভাব ধারণ করিল—অনুমান, আশঙ্কা, ও কল্পনার কুহেলিকা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হইয়া গেল। বহনোন্মুখ ঝটিকার প্রথম সঞ্চারের ন্যায় সহসা চারিদিক ঘোর তমসাবৃত হইল—স্থির সমুদ্র বক্ষ ভয়ানক বাত্যোচ্ছাসে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ধূমায়িত অগ্নি সহসা মহাশব্দে চারিদিক আলোকময়ী করিল। সেই দিন রাত্রে লক্ষ্ণৌএ যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল—তাহা হইতে ইংরাজ বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলেন। অনেক বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীর শীতল রক্তে পরিশেষে সেই দিনের মত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

রাত্রি নয় ঘটিকার সময় প্রতিদিনই ক্যান্টনমেন্ট হইতে তোপ পড়িয়া থাকে। স্যার হেন্‌রি লরেন্স এই সময়ে সহরের রেসিডেন্সি ছাড়িয়া ক্যান্টনমেন্টের রেসিডেন্সিতে সহচরবৃন্দ পরিবৃত হইয়া আহারে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"শুনিয়াছি অদ্য রাত্রে নয়টার তোপের পর বিদ্রোহীগণ এই ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করিবে, আমাদের সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।"

ঠিক এই সময়ে নয়টার তোপ পড়িল; সেই শব্দ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া, নৈশ-গগনের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া, গোমতীর মৃদু তরঙ্গোচ্ছাসের সহিত মিলিয়া বায়ুসাগরে বিলীন হইল। স্যর হেন্‌রি সেই শব্দ শুনিয়া হাস্য বদনে উল্লিখিত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বিদ্রোহীরা কই—নয়টাত বাজিয়া গেল—আপনি তাহাদের যতদূর নিয়মিত ভাবিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত ততদূর নহে।" স্যর হেনরি সমস্ত দিন ক্যাণ্টনমেণ্টে ছিলেন; সিপাহীর স্থির গম্ভীর ভাব যাহা তিনি প্রতিদিনই দেখিতেন, সেদিন তাহাই দেখিয়াছিলেন—সুতরাং সহসা এপ্রকার ঘটনা ঘটিবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতে একবারে অসংখ্য বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হইল। অসংখ্য অনলরেখা নৈশান্ধকার বিদূরিত করিয়া শত সহস্র মুখ ব্যাপৃত করিয়া সকলকে মহা বিভীষিকা দেখাইল।

স্যর হেন্‌রির প্রশান্ত হৃদয় এই মহাশব্দে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ আকুলিত হইয়া উঠিল; তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাবোচ্ছাস তাঁহার সহচর বৃন্দের হৃদয়-কন্দরে প্রতিঘাত হইল—তাঁহারা সকলেই আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রস্তে গৃহ দ্বার সন্নিকটস্থ হইলেন—সকলেরই হস্তে যুগপৎ অসিকোষ ন্যস্ত হইল! তাঁহারা সকলেই উন্মুক্ত বিস্ময় স্তিমিত লোচনে দেখিলেন অদূরে কুপার সাহেবের বাঙ্গলা চারিদিকে অনল শিখা বিস্তার করিয়া সেই নৈশ গগনের ঘোরান্ধকার বিদূরিত করিয়া মহাশব্দে জ্বলিতেছে। তাহার ভয়ানক শব্দের সহিত উন্মত্ত সিপাহীগণের রণ-কল্লোল ও বন্দুকের আওয়াজ মিশিয়াছে। এই সকল দেখিয়া হেনরি লরেন্স কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—কিন্তু সাহস ও আশা হারাইলেন না, সুতরাং সহচরগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—স্বীয় অশ্ব সেবককে অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এই ঘটনায় বোধ হয় মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত, কিন্তু ভবিতব্যের লিপি অন্য প্রকার বলিয়া তাহা ঘটিল না। সেই দ্বার দেশে সোপান মুখে স্যর হেন্‌রি ও অন্যান্য প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীগণ দাঁড়াইয়া যখন অশ্বের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা রেসিডেন্সি রক্ষাকারী সুবাদার সঙ্কেত শব্দ দ্বারা তাহার নিজ অধীনস্থ সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সহসা সুবাদারকে স্বীয় কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া এই স্থানে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন কিন্তু কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না। সুবাদার আসিয়া সেই দলমধ্যবর্ত্তী কাপ্তেন উইলসনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমি আমার সৈন্যগণকে বন্দুক ঠাসিতে আদেশ করিব কি?" উইলসন স্যর হেন্‌রির মুখের দিকে চাহিলেন—তাঁহার দৃষ্টি সম্মতিব্যঞ্জক—সুতরাং সুবাদার তাঁহার সৈনিকগণকে বন্দুক ঠাসিতে আজ্ঞা দিল। তাহার মনে [illegible] ইহাই স্যর হেনরির প্রথম দলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল কিন্তু

সেই সময়ে তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখাইলে তাঁহাদেরই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা—এই জন্য তিনি মন্ত্র মুগ্ধবৎ তাহাদের বন্দুক ঠাসিতে আজ্ঞা দিয়া নীরবে তাহাদের কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ঠাসা হইয়া গেল, সিপাহীরা বন্দুক তুলিয়া অংশোপরি রাখিল—কেবল সুবাদারের আজ্ঞার অপেক্ষা, তাহা হইলেই কাওয়াজ আরম্ভ হয়। সকলেরই মনে তখন ঝটিকা বহিতেছে, সিপাহীদিগের মনে—সেই আজ্ঞাকারী সুবাদারের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে—কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা তাঁহারা কি করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবেন ? তাহারা যে অবিশ্বাসী নহে—ইহারই বা প্রমাণ কি ? কিন্তু এই সময়ে কয়েকটি সুসজ্জীভূত অশ্ব আসিয়া সোপানতলে পৌঁছিল—তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বারোহণে মহার্ণবে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন। সুবাদার কোন বাধা দিল না, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই সে সেই খানেই সমস্ত গোলযোগ এক মুহূর্ত্তে মিটাইতে পারিত। ছয় মাস ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া সিপাহীগণ যাহা না করিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তেই তাহা এই বাঙ্গলার নিকট সম্পাদিত হইত।

স্যর হেনরি আহার করিতে করিতে যাহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা এক সপ্ততি গণিত দলের লোক। তাহাদের সঙ্গে অষ্ট চত্বারিংশ ও ত্রয়োদশ গণিত দলেরও কতক লোক ছিল। অন্য প্রকারে প্রতিহিংসা ও রোষ প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া তাহারা উর্দ্ধতম ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গলায় আগুণ লাগাইয়া দিতে দিতে লুটপাঠ করিতে লাগিল। ইহাদের বন্দুকের আওয়াজ পাইয়াই ব্রিগেডিয়ার হ্যান্স কুম্ব (ইনিই একবার সিপাহীদের বুঝাইতে গিয়াছিলেন) সসজ্জ হইয়া অশ্বারোহণে বাহিরে আসিলেন কিন্তু তিনি কোন প্রকার বাধা দিবার পূর্ব্বেই সিপাহীর গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কোষ-নিবদ্ধ অসি ও হস্তস্থ বন্দুক হস্তেই রহিয়া গেল। হ্যান্সকুম্বকে পতিত হইতে দেখিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গ্রাণ্ট সাহেব আসিয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন কিন্তু সহসা তীব্রবেগে, ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত একটী গুলি আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল; তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। * স্বল্পস্থায়ী জয়োল্লাস-মত্ত সিপাহীগণ এইরূপে কয়েক মিনিটের মধ্যে ১০।১২ খানি সুসজ্জিত বাঙ্গলা অগ্নি দেবকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিল।

---

* গ্রাণ্ট সাহেব ভূপতিত হইবার পর তাঁহার মৃত্যু অতি শোচনীয়। তাঁহার দলের একজন সুবাদার দয়া পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে এক চৌপায়ার নিম্নে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্রোহী দল আসিয়া "গ্রাণ্ট সাহেব কোথায়" অনুসন্ধান করিল। সুবাদার বলিল "সাহেব পলাইয়াছেন"। সিপাহীরা চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু সেই দলের এক হাবিলদার চৌপায়ার কথা বলিয়া দিল। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে চৌপায়ার নিম্ন হইতে টানিয়া লইয়া নৃশংসরূপে সঙ্গিনবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। পরে বিচারে এই হাবিলদারের ফাঁসি হয়।

স্যর হেনরি ভাবিলেন শত্রুরা যদি ক্যাণ্টনমেণ্ট পার হইয়া কোন সুযোগে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাদের সেই পথ রুদ্ধ করা বিশেষ আবশ্যক। ক্যাণ্টনমেণ্টের সীমা মধ্যে থাকিয়া না হয় তাহারা বাঙ্গলা জ্বালাইয়া সামান্য ক্ষতি করিবে কিন্তু গোমতীর সেতু পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে তথাকার বিদ্রোহ-প্রকৃতি পরায়ণ মুসলমান দলের সহিত মিশিয়া রেসিডেন্সী ও নগরের অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকিবে। সুতরাং তিনি তুইটি কামান ও একদল ইউরোপীয় পদাতি সৈন্য লইয়া, গোমতী-বক্ষস্থ সেতু মুখের এক মাত্র পথ রুদ্ধ করিতে ধাবিত হইলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য বিদ্রোহীদিগের দমনার্থে পাঠাইলেন। সিপাহীদের আক্রমণ করিতে এই সৈন্যদলকে ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। ভাঙোন্মত্ত জয়োল্লাসী সিপাহীগণ স্বেচ্ছায় স্যর হেনরিকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্যর হেনরি প্রস্তুত হইয়া তাহাদের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবেন। এই ভাবিয়া তাহারা বিশ্বস্ত মনে অগ্রসর হইতেছিল — কিন্তু ইংরাজের কামান যখন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল — তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে ফিরিল। কিন্তু ক্যাণ্টনমেণ্টে তখনও তাহাদের কীর্ত্তি চিহ্ন লোপ হয় নাই। চিতাগ্নির ন্যায় নৈশ গগনের মেঘাচ্ছন্ন ভাব বিদূরিত করিয়া তখনও তথায় তুই একখানি বাঙ্গলা জ্বলন্ত অঙ্গাররূপে জ্বলিতেছিল। এবারে যে কয়েকখানি বাকি ছিল তাহারা সেই কয়েকখানিতে অগ্নিক্ষেপ করিল। কিন্তু অফিসারেরা তখন পলাইয়াছে — কোথায়ও বা তুই একটি আহত ইংরাজ কর্ম্মচারী বা সামান্য সৈনিক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যাতনাব্যঞ্জক চীৎকার করিতেছে — তাহারা উন্মত্ত বেশে তাহাদের পদদলিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বজ্রনাদী কামানের মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সৈন্যদল ছাউনীর দিকে ফিরিয়া নানা উৎপাৎ আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল অনুসরণকারী ইংরাজ সেনারা কামান লইয়া দ্রুতবেগে আরও অগ্রসর হইতেছে, তখন পলায়ন আরম্ভ করিল। সকল সিপাহী কিছু বিদ্রোহীদের দলে মিশে নাই — তখনও অনেকে কোম্পানীর নিমকের মর্য্যাদা রাখিতে প্রস্তুত ছিল। সমস্ত দল সেই রাত্রে বিদ্রোহে মাতিলে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত, তাহা বলা যায় না।

হেনরি লরেন্স সিপাহীগণকে পলাইতে দেখিয়া তাহাদের ধরিবার জন্য অশ্বারোহী দল প্রেরণ করিলেন। মুদকীপুর পর্য্যন্ত অনুসরণের পর অনেকে ধরা পড়িল এবং অবশিষ্টাংশ সীতাপুরে পলায়ন করিল।

অশ্বারোহীগণ ফিরিয়া আসিয়া এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে কমিশনার সাহেব অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে ভূগর্ভস্থ ধাতু স্রোতের ন্যায় নাগরিকদিগের মধ্যেও তখন ভয়ানক উত্তেজনা স্রোত বহিয়াছে।

হেন্‌রি লরেন্স বেগতিক বুঝিয়া সামরিক আইন (Martial Law) জারি করিলেন, নগরের চারি দিকে পাহারা দিবার জন্য এক দল বিলাতী গোরা, ও তুইটী কামান পাঠাইয়া নিজে সেই রাত্রে অসমসাহসিকতার সহিত নগর মধ্যে অতিবাহিত করিলেন।

সামরিক বিচার ও অপরাধীদের শোচনীয় পরিণাম—বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌএ ও মুদকীপুরে কয়েকটী হত্যাকাণ্ড * সমাধা করিয়া পলায়ন করিলে বন্দী সিপাহীদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌ সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সেই সময়ে সহরে সামরিক নিয়ম জারি হইয়াছে—সুতরাং যে সমস্ত নাগরিকদের উপর তিলমাত্র সন্দেহ হইতেছিল, তাহাদের ধরিয়া আনিয়া ফাটকে পোরা হইল। এই সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন বেনিয়াও কারানিক্ষিপ্ত হইল—তাহাদের অপরাধ এই বারাণসী হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়া তাহারা বিদ্রোহ উত্তেজনা কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল।

বন্দী সিপাহী ও নাগরিকদিগের প্রথম বিচার, ক্যাণ্টনমেণ্টে হইল—দ্বিতীয় বিচার লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে; স্বয়ং হেনরি লরেন্স এই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান-বিচারক। স্যর হেনরির সঙ্গে আরও কয়েক জন উচ্চ পদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী এই বিচার কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। হেন্‌রি লরেন্সের স্বাভাবিক উদারতা এই সময়ে একটু পূর্ণ তেজে প্রদীপ্ত হইল। সামরিক নিয়মানুসারে বিদ্রোহাপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ফাঁসিকাষ্ঠে আত্ম সমর্পণ। এত ভীত অপরাধীকে একত্রে প্রাণ দণ্ডিত করিতে স্যর হেন্‌রির ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় এইবারে আন্দোলিত হইল। যিনি পূর্ব্ব রাত্রে আত্মরক্ষা করিতে, রেসিডেন্সি শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে, নগরবাসীদিগকে বিদ্রোহীদের লুণ্ঠন ব্যাপার হইতে নিরাপদ রাখিতে শত সহস্র বিদ্রোহীর উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই সময়ে তাঁহার মনঃক্ষেত্রকে ঈষৎ আন্দোলিত করিল। তিনি স্বল্পাপরাধীদিগকে ক্ষমা করিতে চান—প্রকৃত অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য কোন কঠোর দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার প্রধান ভয় পাছে সন্দেহ ক্রমে কোন নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু যখন তাঁহার সহযোগীগণ সেই ভয়ানক সময়ে

* মুদকীপুরের ছাউনীতে সিপাহীরা আর তুইটী উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ভয়ানক নৃশংসতার সহিত হত্যা করে। ব্যালে নামক একজন যুবক ইহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সময়ে বিলাত হইতে নূতন আসিয়া ব্যালে সাহেব একটী রেজিমেণ্টের ভার পাইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ সময়ে তিনি জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া রুগ্ন শয্যায় শয়ান—সিপাহীরা গিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া সঙ্গিন বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করে। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা পরে গিয়া দেখিলেন—ব্যালের যে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা ছিন্ন—অস্ত্রাঘাতে সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত বহিতেছে এবং হতভাগ্যের দক্ষিণ হস্তে তাহার ভাবী প্রণয়িণীর স্মৃতি চিহ্ন সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

কঠোর নীতির বিশেষ আবশ্যকতা নির্ব্বন্ধতার সহিত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—তখন তিনি অগত্যা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত প্রত্যেক প্রাণদণ্ড-পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন।

ষড়ত্রিংশত জন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। ইহাদের মধ্যে সকলেই বন্দী সিপাহী; ইহাদের সঙ্গে উপরোক্ত কয়েক জন বেনিয়াও ছিল। যে সামান্য সৈনিককে স্যর হেন্‌রি সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার সচ্চরিত্রতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য সুবাদারের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন—যাহাকে তিনি সেই মহাদরবারে সর্ব্ব সমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া সহস্র মুদ্রা ও অন্যান্য খেলোয়াৎ দ্বারা প্রসাদিত করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই আজ বধার্হদিগের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইল।

মচ্ছিভবনের সম্মুখে বধ্য ভূমির স্থান নির্ণীত হইল। এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে সহর ভাঙ্গিয়া পড়িল—জনস্রোতের মধ্যে অন্যান্য সিপাহীগণও আসিয়া মিশিল। পাছে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়—পাছে নাগরিকেরা বা বধার্হ ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনেরা অপরাধীদিগকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লয় বা অন্য কোন প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গাম উপস্থিত করে, ইহার প্রতিবিধানার্থে ইংরাজ গোলন্দাজ বধ্য ভূমির ও জনস্রোতের দিকে কামানের মুখ ফিরাইয়া তাহার কাছে দণ্ডায়মান হইল। এই প্রকারে আট ঘাট বাঁধিয়া সতর্ক হইয়া অপরাধীদিগের শোচনীয় পরিণাম কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সাধারণের গোচর করিলেন।

লক্ষ্ণৌএর আভ্যন্তরীন অবস্থা।

লক্ষ্ণৌ নগরী ইতি পূর্ব্বেই ঝটিকাসংক্ষুব্ধ বারিধিবৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই ঘটনার পর যেন কয়েক দিবসের জন্য তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। নগরের দোকানদারেরা বলিল ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য না পাইলেও তাহারা প্রাণপণে আপনাদের দ্রব্যজাত বিদ্রোহীর লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা এই সময়ে নিজ ব্যয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দল পালন করিয়া স্বস্ব সম্পত্তি রক্ষা করিবেন—একথা প্রকাশ করিলেন—সহর কোতোয়াল কর্ণেল কর্ণজী তাঁহার অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলকে নিতান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিয়া অধিক পরিমাণে গোলাগুলি দিয়া বলশালী করিলেন। একজন শিখ কোতোয়াল—৩০এ মের রাত্রিতে নগর রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া সেও যথা সম্ভব পুরস্কার ও শিরোপা পাইল। সাহেবেরা ইতি পূর্ব্বে সাহস করিয়া সহরের জনপূর্ণ স্থানে বাহির হইতেন না, এই ঘটনার পর তাঁহারাও ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন—কোন দেশীয়ই তাঁহাদের উপর কিছু মাত্র অত্যাচার করিল না।

কিন্তু শরদাকাশের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনীয় অবস্থার ন্যায় লক্ষ্ণৌএর এই শান্তিময় ভাবের

সহসা পরিবর্ত্তন হইল। কানপুরের অবরোধ-ব্যাপার ও তথায় ইংরাজের শোচনীয় পরিণাম সকল লোকেই জানিতে পারিল। ৫ই জুনের পর হইতে ডাকে সংবাদ আসার পন্থাও বন্ধ হইল। কানপুরের অধিনায়ক হুইলার সাহেব দুই তিনবার স্যর হেন্‌রির নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমুখ এড়াইতে না পারিয়া সেই সকল প্রণিধি গঙ্গা পার পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। কানপুরের যে দুই একখানি পত্র স্যর হেন্‌রির হস্তগোচর হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাপূর্ণ। * স্যর হেনরি এ পর্য্যন্ত কানপুর সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কেবল মাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন জেনারেল হুইলার সদলে অবরুদ্ধ হইয়া অসংখ্য বিদ্রোহীর আক্রমণ সহ্য করিতেছেন।

এই সকল ঘটনাবশে বাজারের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কোম্পানীর কাগজের দর শতকরা ৩০ টাকার উপর ডিস্কাউণ্ট হইল। সাহেবদের সহিত কোন দোকানদারই ধারে কারবার করিতে চায় না। যাহাদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইবার জন্য একমাস পূর্ব্বে তাহারা হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, এক্ষণে তাহাদেরই সহিত অগ্রে কারবার বন্ধ করিল। গদীয়ানের রোকড়ওয়ালারা একেবারে সাহেবদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিল। তাহারা ভাবিল ইংরাজের প্রভুত্ব চিরকালের জন্য ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে।

স্যর হেন্‌রি এই সমস্ত প্রত্যক্ষ কারণে বিশেষরূপে বুঝিলেন ইংরাজদিগের সহরের মধ্যে বাস করা আর কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। সহরের আশে পাশে যেখানে যত ইংরাজ ছিল, সকলেই রেসিডেন্সির মধ্যে আশ্রয় লইতে আদিষ্ট হইল। লামার্টিনিয়ার কালেজের বালকেরা অধ্যাপকদিগের সহিত নগর পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সিতে ঢুকিল। স্যর হেন্‌রি এই সময়ে চারিদিক হইতে প্রচুর পরিমাণে, চাউল, গম, ঘৃত চিনি, ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য রেসিডেন্সিগত করিলেন। ইহার পর রেসিডেন্সির সংস্করণ ও দৃঢ়ীকরণ আরম্ভ হইল।

রেসিডেন্সির সংস্কারের সহিত চারিদিকেই হুলস্থূল পড়িয়া গেল—প্রতিদিন শত সহস্র কুলী নিয়োজিত হইয়া ব্যাটারি, পরিখা, প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। রেসিডেন্সির চারিধারে সুগভীর পরিখা খনিত হইল, পরিখার আশে পাশে স্থান বুঝিয়া

---

* জেনারেল হুইলারের একজন বিশ্বস্ত দেশীয় ভৃত্য অনেক কৌশলে গঙ্গা পার হইয়াছিল বটে কিন্তু এপারে আসিবামাত্রই সিপাহীর অলক্ষ্য গুলি তাহার বাম হস্তের উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই আহত দূত তিন দিন বনে বনে ঘুরিয়া পরিশেষে লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হয়। সে স্যর হেন্‌রির হস্তে পত্র দিয়াই মূর্চ্ছিত হইল। এই পত্রে দিল্লীর

মাটীর ও ইষ্টকের প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। গোরা, সিপাহী, মুটে, মজুর, উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী,বড় বড় ইংরাজ স্থপতি সকলেরই মুখে মহা ব্যস্ত ভাব—সকলেই কোন না কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। রেসিডেন্সির সীমা মধ্যস্থ যে যে স্থান বিপদসঙ্কুল ও শত্রুর আক্রমণের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, সেই সেই স্থানেই সর্ব্বাগ্রে কামান শ্রেণী সজ্জিত হইল। অনেক বড় বড় দ্বিতল অট্টালিকা একতালা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া, কতক গুলি বা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া মাঝে মাঝে তাঁবু পড়িতে লাগিল। ভূমি খনন করিয়া মুদ্রারাশি, ও বারুদ স্তূপ লুক্কায়িত রাখা হইল। এই সময়ে এই প্রকারে রেসিডেন্সি সীমানা সুরক্ষিত না করিয়া রাখিলে রণোন্মত্ত সিপাহী স্রোতের মুখে ভবিষ্যতে অন্যান্য ইংরাজ নর নারী অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাইত এবং স্যর হেনরি যদি এই সময়ে লক্ষ্ণৌএর কর্ত্তৃত্বভার না পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমেই অযোধ্যা ইংরাজ হস্ত বহির্ভূত হইয়া পড়িত।

যাঁহার আজ্ঞায়, যাঁহার উপদেশে, যাঁহার দূরদর্শিতায়, যাঁহার শিক্ষায় এই সমস্ত আত্ম-রক্ষার আয়োজন হইতেছিল, যিনি মহা ঝটিকার প্রথম লক্ষণ দেখিয়া অসীম রণসাগরের সর্ব্ব গ্রাসী উত্তাল তরঙ্গ মালা হইতে স্বীয় দলবলকে রক্ষা করিবার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তিনি যে এক স্থানে বসিয়া আজ্ঞা প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এমত নহে। কোনখানে কোন কামানটী কি রূপে রাখিলে শত্রুর অগ্নি বর্ষণের ক্ষমতা লোপ হয়, কোনখানে কি প্রকারে সৈন্য সমাবেশ করিলে শত্রুর নৈশ আক্র-মণ হইতে দুর্গরক্ষা করা যায়, কি প্রকার স্থানে প্রহরী নিয়োগ করিলে দূরস্থ শত্রুর কার্য্য পরিদর্শন অনায়াসসাধ্য হয়; কি প্রকার ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারা যায়, কোন স্থানে ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকাগণকে লুকাইলে জ্বলন্ত গোলা গুলির গ্রাস হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায়, দুর্গের কোন কোন স্থানে কামান শ্রেণী সংরক্ষিত হইলে ইহাকে চারিদিক হইতে সুদৃঢ় করা যায়, কি প্রকার অবস্থায় কোন স্থানে আহত সেনাদিগের পরিচর্য্যা-নিবাস স্থাপন করিলে তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারে—এই সকল চিন্তা তাঁহাকে দিবা রাত্র উত্তেজিত করিত। গভীর রাত্রিতে যখন সকলেই বিশ্রাম সুখান্বেষণে তৎপর হইয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, দিবসের ভয়ানক উত্তেজনা, অসীম কোলাহল তামসীর ক্রোড়ে মগ্ন হইয়া গিয়াছে—সামান্য ইংরাজ সৈনিকও ক্ষণকালের জন্য সকল জ্বালা যন্ত্রণা, সমর তৃষ্ণা ও শত্রুর প্রতি প্রতি-হিংসা ভুলিয়া রাজ্যেশ্বরের ন্যায় সুখ সম্ভোগ করিতেছে—তখনও হয়ত স্যর হেন্‌রি গোপনে স্বীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া দুগ্ধফেণনিভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আলোক হস্তে প্রত্যেক ব্যাটারির সন্নিকটস্থ হইয়া স্থিরভাবে তাহার সমাবেশ-প্রণালী পরীক্ষা করিতেছেন—অথবা নৈশ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীকে যথোপযুক্ত

উপদেশ দিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখাইতেছেন, চারি প্রান্ত হইয়া বেলিগার্ড গেটের নিকটে কোন কামানের গাড়ির পার্শ্বে কঠোর ভূমির উপর সামান্য উপাদানে শয্যা-রচনা করিয়া ক্ষণিক বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার নির্ভীকতা এতদূর প্রশংসনীয় যে অনেক সময় তিনি ছদ্মবেশে একাকী নগরীর জনাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করিয়া সাধারণ লোকের সহিত মুক্তভাবে মিশিয়া নানা প্রকারে তাহাদের মনোভাব জানিয়া লইতেন, কিন্তু তাহারা আদবেই জানিতে পারিত না যে, অযোধ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা কমিশনর সাহেব তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

রেসিডেন্সির ত এইরূপ সংস্কার আরম্ভ হইল কিন্তু মফঃস্বল হইতে প্রতিদিন যে সমস্ত অশুভ সমাচার আসিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া কমিশনার সাহেবের চিন্তাস্রোত আরও বাড়িয়া উঠিল—অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফৈজাবাদ, হুতোমপুর, দরিয়াবাদ, সেলোন, প্রসাদপুর প্রভৃতি ইংরাজের হস্তবহির্ভূত হইল। উন্মত্ত সিপাহীগণের হস্তে ঐ সকল স্থানে অনেক ইংরাজ নর নারী অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাইলেন; পরিশেষে সেই বিদ্রোহ স্রোত লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়া পৌঁছিল। মফঃস্বলের বিদ্রোহ ব্যাপারের সমগ্র বিবরণ প্রদান করিলে প্রস্তাব বাহুল্য হইবে বলিয়া তাহা আপাততঃ ত্যাগ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

বিদ্রোহ।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা বলেন—"কামিনী কোমল প্রাণে সহেনা যাতনা" তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ঠিক বিপরীত। যে যত কোমল তাহার সহিবার শক্তি তত অধিক। অল্প আঘাতে যে নুইয়া পড়ে, বেশী আঘাতে সে অটুট থাকে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ছোট ছোট নরম গাছগুলির কিছুই হয় না। তাহারা মৃদুস্পর্শে প্রাণে ব্যথা পায়, বসন্তহিল্লোলে নুইয়া পড়ে, তাই তাহাদের এমন কঠিন প্রাণ।

রাণী দেখিলেন, সত্যই রাজা তাঁহাকে ভাল বাসেন না, কেবল তাহাই নহে, রাজা—তাঁহার দেবতা—বিশ্বাস ঘাতক, প্রতারক, এতদিন তাঁহাকে ছলনা করিয়া আসি-য়াছেন, অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই অসহ্য যন্ত্রণাও তাঁহার প্রাণে সহিল,

করিতেও আগে রাণীর বুক ফাটিয়া যাইত, তিনি আপনার মৃত্যু আপনি চক্ষের উপর দেখিতেন, সেই কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত ঘটনাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, দেখিলেন, বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী আর তাঁহার নহেন, আর একজনের, কিন্তু মরিলেন কই? যাহার প্রাণে একটু অনাদর সহিত না, তাহার প্রাণে এতখানিও সহিল, যে প্রাণে কাঁটা সহিত না, সে প্রাণে বজ্রাঘাতও সহিল!

এমনি হইয়া থাকে, ইহা নূতন কথা নহে। যখন সহিবার কিছু না থাকে, তখন ফুলের আঘাতও প্রাণে সয় না, কিন্তু সহিবার সময় হইলে সেই প্রাণেই আবার সব সয়। তবে রাণী ইহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণ বলিয়াই এতদূর সহিল, তাঁহারই লোহার প্রাণ; বজ্র পীড়নেও তাহা ভাঙ্গে না, বিধাতা তাঁহাকে অমর করিয়া জন্ম দিয়াছেন।

যে রাত্রে রাণী সুহারকে রাজার ক্রোড়ে দর্শন করিলেন, সেই রাত্র হইতে রাজা রাণীর কথাবার্ত্তা এক রকম বন্ধ হইয়াছে। দিনের বেলা ত রাজা আর আসেনই না, রাত্রে রাজা গৃহে আসিয়াই প্রায় শুইয়া পড়েন, রাণীর মৌন ভাব ভাঙ্গাইতে আর প্রয়াসই করেন না। একে ত রাণীর অভিমান, কষ্ট, রাজার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না, তাহার পর আবার রাজা নিজের ভাবেই সর্ব্বদা ভোর, আপনার কাছেই অন্যমন, সুতরাং অন্যের মানাভিমান ভাঙ্গিতে তাঁহার অবসরও নাই, সে কষ্ট তাঁহার বড় একটা চোখেও পড়ে না। রাজার যত অনাদর বাড়িতেছে, রাণীর কষ্টে রাজার ঔদাস্যভাব যত সুস্পষ্ট হইতেছে, রাণীরও কষ্ট সহিবার শক্তি তত বাড়িতেছে, তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় তত সবল হইয়া উঠিতেছে, স্বামীর কোলের কাছে শুইয়া তিনি ততই অবাধে নীরবে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হইতেছেন।

দিন যাইতেছে, রাজা রাণীর বিষাদভাব দিন দিন প্রাসাদময় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। রাজসভায় আর আগেকার হাসি তামাসা নাই, রাজার বিষাদ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বিদূষকের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আর সাহস হয় না। অন্তঃপুরে সখীদিগের নৃত্য গীত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলের প্রাণেই কেমন অসুখ। প্রকাশ্যে রাজা রাণীর মনান্তরের কথা কেহ কহে না, কিন্তু গোপনে গোপনে সকলেই এই কথা লইয়া নাড়া চাড়া করে। পুরোহিত হরিতাচার্য্য এ সমস্ত নীরবে দেখিতেছেন, মহাদেবের নিকট তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা উঠিতেছে। প্রার্থনায় সবল হইয়া কখনো তিনি আশ্বস্ত হইতেছেন, কখনো নিরাশ হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছেন।

গণগৌরী উৎসবের দিন আগত প্রায়। অন্য বৎসরে এ সময়ে রাজবাটীতে কত আমোদ কত উল্লাস। এ বৎসর তাহার কিছুই নাই। উৎসবের উদ্যোগ হইতেছে,

উল্লাস আমোদের একটা চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সকলের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ বহমান।

পূজার আগে অনুষ্ঠান আয়োজনের বন্দবস্তের কথা কহিতে যে দিন হরিতাচার্য্য রাণীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সেই শুষ্ক বিবর্ণ যাতনা পীড়িত মুখ দেখিয়া সে দিন তিনি চমকিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন—রাজা কি ইহাঁকে দেখিতে পান না! এমন নিষ্ঠুর কে আছে, ইহাঁর এই কষ্টের মুখ দেখিয়া দ্রব না হইবে?

হরিতাচার্য্য তুমি অসংসারী, মনুষ্য-হৃদয় বুঝনা তাই এরূপ ভাবিতেছ। মহারাজ—নিষ্ঠুর! অন্যের কষ্ট দেখিলে, কি তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগে না? তিনি যদি দেখিতেন আর এক স্বামী তাহার স্ত্রীর উপর তাঁহারই মত ব্যবহার করিতেছে, তাঁহার হৃদয় কি মমতার আর্দ্র হইত না? তিনি নিষ্ঠুর! আর একজনের সামান্য কষ্ট দূর করিতেও কি তিনি হৃদয় পাতিয়া দিতে পারেন না? তখন কি এই নিষ্ঠুরই সহৃদয়তার, আত্ম বিসর্জনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না!

হায়! কে জানে সংসারে কে নিষ্ঠুর আর কে করুণাশীল! একই মানুষ যে জগতের পক্ষে করুণার আধার—অন্যের সম্পর্কে যাহার দিব্য চক্ষু, কিন্তু এক জনের সম্পর্কে সে এতই ঘোরান্ধ, যে তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্টেও সে হৃদয়ের একটি কণাও আর্দ্র হয় না। এমনি প্রকৃতি দিয়া মনুষ্য গঠিত, যে এই অস্বাভাবিকতাই মানুষের স্বাভাবিক, মানুষ নিষ্ঠুর নহে, মানুষ বহুরূপী-তারের একটি যন্ত্র। তাহার যে রূপের তারে যখন ঘা পড়ে—সেই ভাবটি বাজিয়া উঠে। যে বাজায় তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করে, যে বাজাইবে তাহার বাজাইতে জানা চাই।

হরিতাচার্য্য রাণীকে যে সকল কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া আর কোন কথাই মুখ-নির্গত হইল না।

রাণী বলিলেন—"দেব, আপনাকে একটি কথা বলিতে ডাকিব ভাবিয়াছিলাম, না ডাকিতে নিজেই আসিয়াছেন,"

পুরোহিত বলিলেন—"কি কথা?"

রাণী। "আমি একবার সেই ভীল কন্যার সহিত দেখা করিতে চাই"।

হরিতাচার্য্যের মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল, কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া ইহার কারণ শুনিবার প্রত্যাশায় মহারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাণী বলিলেন "আপনি বলিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বুঝিয়াছি তাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে আমি চেষ্টা করিব"—

পুরোহিত কি একটা কথা বলিতে গেলেন—কিন্তু তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, তিনি থামিয়া পড়িলেন, রাণী বুঝিলেন, পুরোহিত বলিতেছিলেন, "রাজাকে সাবধান করাই

ইহার প্রধান উপায়”—উত্তর স্বরূপ বলিলেন—“না রাজা মোহান্ধ, তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না, সেই বালিকার উপরই এখন সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আমার সঙ্গে একবার তাহার দেখা করাইয়া দিবার উপায় স্থির করুন’।

পুরোহিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, নিরাশা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, রাজার মতি যদি না ফেরে তবে আর ভরষা কোথা ? কিছু পরে বলিলেন—“আচ্ছা কাল ভোরে একাকী তুমি আমার মন্দিরে যাইও তাহার দেখা পাইবে।” ইহার পর পুরোহিত আর কোন কথা বলিলেন না—ভগ্নান্তঃকরণে আশীষ করিয়া মন্দিরে ফিরিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোর না হইতে হইতে, ঘোর ঘোর থাকিতে থাকিতে রাণী মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার আগেই হরিতাচার্য্য স্নানে গিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্দিরে আর কেহই নাই, দীপালোক প্রজ্জলিত গৃহে এক লিঙ্গ দেব একাকী কেবল অধিষ্ঠান। মহিষীর দগ্ধ হৃদয়ের বেদনা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, পিতার চরণে প্রণত হইয়া মহিষী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন—“দেব দেখ দেখ, পিতা হইয়া কন্যাকে যে কষ্ট দিতেছ চাহিয়া দেখ। যদি কষ্ট দিয়াই, তোমার সুখ হয়, দাও পিতা তাহাই দাও, তুমি সুখ দিয়াছিলে, এখন দুঃখই দাও, তোমার অভাগী সন্তানের এই মাত্র কেবল প্রার্থনা যদি দুঃখ দিবে ত দুঃখ সহিবার বলও দাও, এ যন্ত্রণা বুঝি আর সহিতে পারি না প্রভু”।

কিছু পরে মন্দিরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহিষী মন্দিরের দ্বার ভিড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভৃত্য ফুলের সাজি হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিল। রাণী শব্দ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাণীকে দেখিয়া সে অভিবাদন করিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল—তাহার পর নীরবে ফুল রাশি মহাদেবের নিকটে রাখিয়া পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল, মহিষী বুঝিলেন, হরিদাচার্য্যের আসিবার সময় হইয়াছে। মনে হইল, পুরোহিতের সঙ্গে এখনি ভীলকন্যাও আসিবে, তাঁহার নেত্রজল শুকাইয়া গেল। কেমন একটা ঔৎসুক্যময় আন্দোলনে তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি আস্তে আস্তে মন্দিরের পার্শ্বের গৃহে গিয়া বসিলেন। ভীল কন্যাকে না জানি কিরূপ দেখিবেন, তাঁহার সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিবেন। এই সকল মনে আসিতে লাগিল।

তাহার মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহাকে তিনি দূর হইতে সেই রাত্রে রাজার ক্রোড়ে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দেখা আসলে দেখাই নহে, তাহার মূর্ত্তি স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পান নাই। সম্ভবতঃ খুবই সুন্দরী! সম্ভবতঃ কেন—নিশ্চয়ই

সুন্দরী! সকলেই তাহার রূপের কথা বলে,—অবশ্যই রূপবতী, নহিলে রাজা মুগ্ধ হই-লেন? কিন্তু রূপ থাকিলেই কি সকলে মুগ্ধ করিতে পারে? আর কি কাহারো রূপ নাই—এমন ত রূপবতী আরো আছে—কিন্তু কেন তবে—? মায়াবিনী সে মায়াবিনী?

রাজার কি দোষ? এত ভালবাসা—এত আদর—এত সব কি অমনি দুদিনে ভুলা যায়? এ সব কি মায়ার কর্ম্ম নহে, মায়াবিনী সে মায়াবিনী? তাহাকে তবে রাণী কি বুঝাইবেন? সে বুঝিবে কেন? রাণীর দুটা কড়া কথা—কি মিষ্ট কথা—কি উপদেশের কথা শুনিলে সে কি রাজাকে ছাড়িয়া যাইবে? রাজার ভালবাসা সে ছাড়িবে? তাহাতে উপকার কাহার? লাভ কাহার? তাহার না রাণীর?

রাণী আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন—রাজার মঙ্গলের জন্যই—সুহারের মঙ্গলের জন্যই তিনি সুহারকে বুঝাইতে আসিতেছেন, কিন্তু এখন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহাদের স্বার্থ দেখিতে গিয়া তিনি নিজের স্বার্থই খুঁজিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের বল যেন তিনি হারাইতে লাগিলেন। আশায় নিরাশায় উত্তেজিত, পীড়িত হইয়া রাণী বসিয়া রহিলেন, সহসা আবার মন্দির দ্বার খুলিয়া গেল, রাণী পার্শ্বের ঘর হইতে সৌৎসুকে দৃষ্টিপাত করিলেন, হরিতাচার্য্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাহাকে বলিলেন—"মা এস" শুভ্র শতদলের মত বিকশিত মুখখানি লইয়া সেই উষা-লোক আলোকিত করিয়া সুহার মন্দিরে প্রবেশ করিল, রাণী অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবার।

জন্ম তিথি উপলক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মুক্তাদিতে তৌলিত হওয়াই মোগল বাদসাহ-দিগের কৌলিক প্রথা ছিল। সুনাম খ্যাত আক্‌বর সাহ এই প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আকবরের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি সৌর ও চান্দ্র বৎসরে দুইবার করিয়া তুলা হইত। প্রতি সৌরোৎসবে স্বর্ণ, পারদ, রেশম, গন্ধ দ্রব্য, *

---

* নিম্ন লিখিত গন্ধদ্রব্য গুলির বিশেষ আদর ছিল—

(১)	অম্বর-ই-আস্‌হাব—প্রতি তোলা এক হইতে তিন মোহর।			
(২)	জোবাদ্	...	„ „	এক মোহর
(৩)	মৃগনাভি	...	„ „	এক হইতে ৪½ টাকা
(৪)	অগুরু	...	„	সের দুই টাকা হইতে ১ মোহর
(৫)	চুয়া	...	„	তোলা আট আনা হইতে এক টাকা
(৬)	ভিমসিমী কর্পূর	„	„	৩ টাকা ,, ২ মোহর

এতদ্ভিন্ন সেউতী, ভলেশ্বরী, চামেলী, রায়বেল, তসিব-ই-গুলাল প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পজাত কয়েক জাতীয় গন্ধদ্রব্য ছিল।

তাম্র, তুতিয়া, ঔষধ, ঘৃত, লৌহ, ধান্যের দুগ্ধ (?) সপ্তবিধ শস্য, লবণ, প্রভৃতিতে আকবর সাহ তৌলিত হইতেন। যে যে দ্রব্যের মূল্য যত কম হইত, তাহা তত অল্প পরিমাণে থাকিত। এতদ্ভিন্ন যত বৎসর বাদসাহের বয়স হইত, ততগুলি মেষ, ছাগ, মোরগ প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু চারিদিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। *

বৎসরের মধ্যে দুইবার তুলার কার্য্য হইত, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "আবানে" অর্থাৎ ইংরাজী অক্টোবর মাসে আক্‌বরের সৌর জন্মোৎসব, এবং ৫ই রজবে চান্দ্র জন্মোৎসব হইত। সৌর উৎসবে বাদসাহ যে যে দ্রব্যাদির দ্বারা উত্তোলিত হইতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চান্দ্রোৎসবে রৌপ্য, টিন, নানাবিধ বস্ত্র, সীসা, বিবিধপ্রকার ফল, সর্ষপ তৈল ও নানা জাতীয় শাক্ সবজির দ্বারা তৌলন কার্য্য সমাধা হইত। "ওজন্-ই-সমশী" বা সৌর জন্মোৎসব এবং "ওজন-ই-কমারী বা চান্দ্র জন্মোৎসব কেবল বাদসাহের কেন রাজধানীর ধনী দরিদ্র আমীর ওমরাহ সকলেরই পক্ষে আনন্দের দিন। এই দিনে দুঃখী প্রচুর ধন লাভ করিত, অপরাধী কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত। আমীর ওমরাহেরা বাদসাহের সম্মান ও অনুগ্রহ ভাজন হইয়া মনসবদারের পদে উন্নীত হইতেন। এই সময়ে চারিদিকে কেবল "ভোজ্যতাং দেয়তাং" ভিন্ন অন্য কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইত না। জন্মদিনের উৎসবের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়—পূর্ব্বে তাহা অন্তঃপুর হইতেই সরবরাহ হইত। বাদসা-বেগম, অর্থাৎ সম্রাটের মাতারা এই সমস্ত দ্রব্য পুত্রের মঙ্গলার্থে অন্তঃপুর হইতে প্রেরণ করিতেন—একথা "পাদশা নামায়" স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর অন্তঃপুরে একটী রেশমী রজ্জু থাকিত, বাদসাহের জীবনে যত জন্মোৎসব হইত, বাদসা বেগম প্রতি বৎসরে এই রজ্জুতে এক একটি গিরা দিয়া রাখিতেন।

আকবর উদার নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া হিন্দু রাজন্যবর্গের মত এই সমস্ত উত্তোলিত দ্রব্যের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিতেন। অবশিষ্টাংশ দরিদ্র ও আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। আক্‌বরের জন্মোৎসব প্রতি বৎসরের জোয়ানপুর সরকারের নিজামাবাদ নামক স্থানে সম্পন্ন হইত। রাজ কবিরা এই দিনে মনোহর গাথা প্রস্তুত করিয়া বাদসাহকে উপহার দিতেন; ইহাঁদের মধ্যে অনেক রাজপুত কবিও থাকিতেন।

আকবরের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী জাহাঙ্গীর সাহ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাহ জাহানের সময়ে তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটে। †

---

* অনেক হিন্দু আজও জন্মতিথির দিন মৎস্য ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

† বাদসাহেরা সময়ে সময়ে সখের উপর, স্ব স্ব প্রসাদভাজন ব্যক্তিদিগকে এই তৌলিত করিতেন। কুমারগণ নিয়মিতরূপে প্রতিবৎসর তৌলিত হইতেন।

নওরোজ ও খোস্‌রোজ—চির উৎসবময়ী দিল্লী নগরীর অন্য দুইটী প্রধান মহোৎসব। "নওরোজ-ই-জলালী" নামক মহোৎসব, পারসীদিগের প্রাচীন প্রথার অনুকরণে প্রচলিত। আক্‌বর সাহ সূর্য্যোপাসক ছিলেন, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র মনুষ্য শরীরের উপর শক্তি চালনা করিতে সক্ষম—এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আকবরের প্রিয় সেনানী হিন্দুপ্রধান বীরবল, বাদসাহকে সূর্য্যের অভূতপূর্ব্ব শক্তির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনান। তাঁহার মতে সূর্য্যদেব কেবল যে শস্যোৎপাদন, উদ্ভিদ পরিপোষণ, বিশ্ব আলোকিত করণ, মনুষ্যকে বুদ্ধি শক্তিশালী করণ প্রভৃতি কার্য্যে স্বীয় শক্তি চালনা করেন, এমত নহে—রাজার ও রাজ ক্ষমতার উপরও তাঁহার বিশেষ প্রভুত্ব আছে। যে রাজা এই জোতির্ম্ময়, সকলদিকপ্রকাশক, সৃষ্টিরক্ষক, তেজের মূলীভূত কারণ সূর্য্যের উপাসনা না করে—তাহার ক্ষমতা, প্রভুত্ব, রাজশক্তি শীঘ্রই অকার্য্যকর হইয়া পড়ে।

বীরবলের প্ররোচনায় হউক, বা তাঁহার স্বেচ্ছাবশেই হউক, আকবর সাহ সূর্য্য দেবকে পূজা করিতেন। রাত্রিকালে অমরাবতী বিনিন্দিত রাজপ্রাসাদ, যে সহস্র সহস্র দীপ্তিমান আলোক-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া চারিদিকে অদ্ভুত শোভা সঞ্চার করিত, তাহার মূল উপাদান আকবরের স্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে "স্বর্গীয় আলোক" হইতে সংগৃহিত। পার্থিব আলোক প্রাসাদের সংস্পর্শে আনিবার হুকুম ছিল না। স্বর্গীয় আলোকটা কি এবং সেই সময়ে সর্ব্ব আলোকের মূল-উপাদান-অগ্নি কি প্রকার উপায়ে সংগৃহীত হইত—তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে যে সময়ে মার্ত্তণ্ড দেব পূর্ণ প্রভাবে মধ্য গগণে বিরাজ করিতেন—সেই সময়ে এক খণ্ড "সূর্য্যকান্ত মণি" লইয়া কোন উপযুক্ত স্থানে সূর্য্য কিরণে রক্ষিত হইত। সূর্য্যকান্ত মণির নিম্নে অতি শুভ্র, সূক্ষ্ম সুপরিষ্কৃত তুলামুষ্টি সংলগ্ন থাকিত। সূর্য্য কিরণ, এই মণিতে প্রতিফলিত হইয়া ইহাকে উত্তপ্ত করিয়া সেই তেজ শুভ্র তুলা খণ্ডের উপর বিকীর্ণ করিত। মার্ত্তণ্ড কিরণ জাত অগ্নি এই প্রকারে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত লোকের হস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত। যে পবিত্র পাত্রে এই স্বর্গীয় অগ্নি যত্নপূর্ব্বক রাখা হইত, তাহাকে "অগ্নিগিরি" বলে। সম্বৎসর নিরাপদে কাটিয়া গেলে পর-বৎসরে পুনরায় এই প্রকারে নূতন অগ্নি সঞ্চয় করা হইত। এতদ্ভিন্ন রাত্রিকালে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় রক্ষিত "চন্দ্রকান্ত মণি" চন্দ্রকরলেখা স্পর্শে দ্রবময়ী হইয়া স্বর্গীয় সলিল ধারা উৎপাদিত করিত, এবং পবিত্র সলিল রাজ-ভাণ্ডার জাত হইয়া থাকিত।

রুহুউল্লা নামক একজন বাদসাহী হাকিম, তাঁহার চিকিৎসা-পারদর্শিতার জন্য কেবল মাত্র রৌপ্যে তৌলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজপ্রসাদ স্বরূপ তিনি অনেক জায়গীর প্রাপ্ত হন।

আকবর সাহ কি প্রকার অগ্ন্যপাসক ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইবে। যদি বাদসাহ অশ্বারোহণে বাহিরে ভ্রমণার্থে যাইতেন, তাহা হইলে সূর্য্যাস্তের ঠিক্ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি স্কন্ধাবারে, অথবা রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার এ প্রকার আদেশ ছিল—অসুস্থ ও নিদ্রিত থাকিলেও এই সময়ে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া দিতে হইবে। জাগরিত হইয়া তিনি হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর, স্বীয় রাজবেশ মণিময় রাজমুকুট প্রভৃতি সমস্ত খুলিয়া রাখিতেন। মনকে প্রশমিত করিয়া যতদূর একাগ্র থাকিতে পারা যায় এরূপ চেষ্টা করিতেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠিক্ সন্ধ্যার ছায়া জগতের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক জন ভৃত্য উল্লিখিত স্বর্গীয় অগ্নি দ্বারা দ্বাদশটী অত্যুজ্জ্বল শুভ্র দীপমালা ও কয়েকটী বাতির ঝাড় জ্বালিয়া আনিয়া বাদসাহের সম্মুখে রাখিত। ইহার পরেই একজন সঙ্গীত বিশারদ আসিয়া একটী জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে পূর্ণতানে প্রাণভরিয়া নানাবিধ রাগ রাগিণী সংযোগে পরমেশ্বরের গুণপ্রকাশক গীতাবলী গান করিয়া, পরিশেষে "বাদসাহের রাজ্য চিরস্থায়ী হউক" এই প্রার্থনা করিতে করিতে চলিয়া যাইত। *

আকবর সাহ তাঁহার গৌরবময় রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতি বৎসর হইতেই প্রতি নওরোজের প্রথম দিন প্রকাশ্যরূপে ভূমি প্রণাম দ্বারা হিন্দু ও পারসীকের ন্যায় সূর্য্যোপাসনা করিতেন। মহোৎসবের অষ্টম দিবসে বাদসাহ ললাটে চন্দনাদির ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিয়া দেওয়ানখানায় আসিতেন। এইখানে ব্রাহ্মণমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার হস্তে মণিময় রাখী বন্ধন করিয়া দিত, এবং আমীর ওমরাহেরা তাহাদের অবস্থানুসারে এই সময়ে মণিমুক্তাদি উপহার দিত।

এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা জাহাঙ্গীরের সময়ের নওরোজের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। নূতন বৎসরকে অভিবাদন করিয়া মঙ্গলোৎসব করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে এই উৎসব পারসীকদিগের প্রথানুযায়ী নয় দিবস থাকিত; পরে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া সময়কে দ্বিগুণ করা হয়। রো সাহেব নওরোজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

"জমী হইতে চারি ফুট উর্দ্ধে দরবার গৃহের মধ্যে একটী সিংহাসন,—সিংহাসনের অতি সান্নিধ্যেই একটি জরির শামিয়ানা চারিটি রোপ্যময় দণ্ডের উপর অবস্থান

---

* আকবর সাহ শাপভ্রষ্ট হিন্দু এইরূপ প্রবাদ। যাই-হউক না কেন—পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন—তিনি হিন্দু প্রথানুসারে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে হোম কার্য্যে ব্রতী হন। ইহাই তাঁহার অগ্নি উপাসনার চরম দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ বলেন—তিনি হিন্দু বেগমদিগের সন্তোষ সাধনার্থে তাঁহাদের অনুরোধে এই-প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। আকবরের প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস কি এ সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

করে। এই সামিয়ানার নিম্নেই মখমল মণ্ডিতস্থানে আমীর ওমরাহ ও সম্রান্ত-দিগের বসিবার স্থান। ইহার পশ্চিম দিকে দেখিলাম—মৎ কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত ছবিগুলির মধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্ঞী এলিজাবেথের, কাউণ্টেস্ সমারসেটের (ইনি ইংলণ্ডের মধ্যে তৎকালে পরমা রূপসী বলিয়া খ্যাত ছিলেন) ও টমাস স্মিথ সাহেবের (ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট) প্রতিমূর্ত্তিগুলি সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে। বাদসাহের বসিবার আসন শুক্তি মণ্ডিত ও স্বর্ণময় দণ্ড বিশিষ্ট, তাহার পার্শ্বেই কুমার খরমের (সাহজাহান) বসিবার স্থান। বাদসাহ আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে আমীর ওমরাহেরা তাঁহাকে নব বৎসরের প্রীতিময় উপহার প্রদান করিল।”

“রো”র লিখিত কাহিনী হইতে নওরোজের সম্বন্ধে বিশেষ বিস্ময়কর বা নূতন-বিধ কোন তথ্য জানিতে পারা যায় না। মোগল রাজার মণিমুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্যেই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে বর্ণনাটা কিছু অধিক করিয়া কহিয়াছেন। সম্রাটের প্রাসাদ চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরমালা দ্বারা বিশেষরূপ পরিবেষ্টিত ছিল। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাভবনে প্রবিষ্ট হইলে তাহার দক্ষিণ দিকে আর একটী দ্বার। এই দ্বার দিয়া গোসলখানা যাইবার পথ। গোসলখানা ঠিক সভা গৃহের পার্শ্বেই স্থাপিত। এই স্থানে একটী বহুমূল্য প্রস্তর রচিত সুন্দর স্নানাগার। গোসলখানা যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইত, এমত নহে—প্রতি দিবস রাত্রে রাজকার্য্যাবসানের পর সম্রাট সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ ও সভাসদগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন। একটি নিয়মিত সময়ে তাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইলে মদ্য পানারম্ভ হইত। জাহাঙ্গীর বিশেষরূপ মদ্যপ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার সময়েই গোসল-খানার সমারোহ এইরূপ বাড়িয়া উঠে। আক্‌বরের জীবিতাবস্থায় কেহ এই গোসল-খানায় মদ্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না—কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর স্বেচ্ছাচারি-তার বশবর্ত্তী হইয়া জাহাঙ্গীর পিতৃকৃত পবিত্র নিয়মের ক্রমশঃ অবমাননা করিতে লাগিলেন। তবে জাহাঙ্গীরের একটা বিশেষ নিয়ম ছিল—তাঁহার অনুপস্থিতিতে, বা অজ্ঞাতসারে বা অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আমীর ওমরাহ বা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এই স্থানে বসিয়া মদ্যপান করিতে পারিবেন না। রো সাহেব বলিয়াছেন এক দিন সমস্ত আমীর ওমরাহ এই গোসলখানায় সমবেত হইয়াছেন—এমন সময়ে বাদসাহ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন “মদ্য পান আরম্ভ হউক” সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া সুরেশ্বরীর উপাসনা আরম্ভ করিলেন—পূর্ণতেজে পূর্ণোৎসাহে আহুতি ঢালিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খুব আমোদ প্রমোদ চলিল ; তার পর সকলে বিদায় হইলেন।

পরদিন প্রভাতে হুলস্থূল ব্যাপার। এক জন আসিয়া বাদসাহের কাণে তুলিল কল্য গোসলখানায় মদিরোৎসব হইয়াছিল। বাদসাহ নিজেই হুকুম দিয়াছিলেন—কিন্তু মদিরাতেজ তখনও তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে অপসারিত হয় নাই—সুতরাং

সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইলেন। যাহারা গত রজনীতে আমোদ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই ডাক পড়িল। তাহারা উপস্থিত হইলে—বাদসাহ স্বীয় বক্সীর নিকট হইতে তাঁহাদের তালিকা চাহিলেন—বক্সী উচ্চৈঃস্বরে নামগুলি বলিয়া গেল—তৎপরে বাদসাহ অপরাধীদিগকে কাহারও দুই সহস্র, কাহারও এক সহস্র, কাহারও বা কেবল তিরস্কার ও কাহারও বা কশাঘাত দণ্ডবিধান করিলেন।"

রো সাহেব প্রায় প্রতি রজনীতেই এই গোসলখানায় উপস্থিত হইতেন। এই স্থলে সম্রাটের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে কথোপকথন হইত। প্রকাশ্য রাজসভায় যে সকল প্রসঙ্গে কথোপকথন করা নিতান্ত অসম্ভব—সম্রাট সেই সকল বিষয়ে টমাস রো'কে এই স্থানে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থে রো সাহেব মোগল রাজের এত উপাসনা করিতেছিলেন, সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ কিন্তু এই গুপ্ত-দরবারে উত্থাপিত হইত না। এক দিন কথাক্রমে বিলাতী ঘোটকের কথা মনে হওয়াতে—সম্রাট রো'কে ইংলণ্ড জাত কয়েকটি ঘোটক আনাইতে অনুরোধ করেন। রো তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন "জল পথে ঘোটকানয়ন কার্য্য অতীব দুরূহ, কারণ ইউরোপে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। স্থল পথ মুক্ত বটে, কিন্তু স্থল পথে ঘোড়া আনিতে এত হেঙ্গাম ও বিলম্ব হইবে—যে তাহা আনাও এক রূপ দুঃসাধ্য।" সম্রাট নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন—তিনি বলিলেন "পাঁচ ছয়টী ঘোড়া একেবারে পাঠাইলেই হইবে, তাহাদের মধ্যে একটি যদি জীবিত থাকে ত আমি তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইব।" এবার আর রো সাহেব আপত্তি কাটাইতে পারিলেন না।

মোগল বাদসাহের দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে রো সাহেব লিখিয়াছেন—"সম্রাট প্রাতে উঠিয়া বাতায়নে বসিতেন। বাতায়নের অদূরে নিম্নে প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রজাবর্গ উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে আবেদন ও অভিযোগ পত্র দিত এবং সময়ে সময়ে আমীর ওমরাহগণ উপহার দ্রব্য-ভার লইয়া সম্রাট দর্শন করিতেন।

সাধারণের পক্ষে রাজ সন্দর্শনের এই প্রধান সময়। ধনী, দরিদ্র, অন্ধ, আতুর, রুগ্ন, শোকার্ত্ত, উৎপীড়িত প্রভৃতি যে কেহ ইচ্ছা করিত, এই স্থানে আসিয়া ভারতেশ্বরের দর্শন পাইত। সুবর্ণ শৃঙ্খলসংলগ্ন ঘণ্টা বাদন দ্বারা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা অপেক্ষা এইস্থানে আসিয়া তাহারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া চলিয়া যাইত। প্রজাগণের সহিত সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে বাদসাহ সৈন্যদিগের ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সমাবেশ শিক্ষা দেখিতেন। নয়টা বা দশটার সময় বেগম মহলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া একটু সুষুপ্তি সুখ সম্ভোগ করিতেন। একদিন রো সাহেব বাতায়নে দুইটী অন্তঃপুরিকাকে দেখিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার

একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—"এপ্রকার রূপ মাধুরী আমি কখনও নিরীক্ষণ করি নাই। একদিন আমি বাতায়ন পথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ মানসে গিয়াছিলাম। দুইটী অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রূপসী বাতায়ন-বিন্যস্ত যবনিকা ভেদ করিয়া আমাকে কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বাতাসে সেই পরদা ঈষৎ দোদুল্যমান হওয়ায় আমি তাঁহাদের সেই কমনীয় মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের বর্ণ সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—এক কথায় তাঁহারা দেখিতে অতীব সুন্দরী। সেই সুন্দর মস্তকের উপর—সেই ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাশির উপর—অনেকগুলি হীরকখণ্ড দীপ্তি পাইতেছে—কর্ণে নানাবিধ দ্যুতিময় দুল দুলিতেছে—বহু মূল্য বসনে তাঁহাদের মস্তকের অর্দ্ধভাগ আবরিত রহিয়াছে। বোধ হয় ইঁহারা আমাকে দেখিবার জন্য বাদসাহের অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাদসাহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই একটি রমণী তড়িৎগতিতে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলেন। আমি অনুভবে বুঝিলাম ইনিই নূরমহল।"

ইহার পর মধ্যাহ্নে বাদসাহ সিংহ ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়া দেখিতেন; এবং বেলা তিন চারি ঘটিকার সময় রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। বাদসাহ বিলাতী লোহিত মদ্য (ব্র্যাণ্ডি ?) বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া রো সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী আর এক দফা উপহার বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিল। এবারকার উপহার মধ্যে কয়েকখানি চিত্র ছিল। সেই চিত্র গুলির মধ্যে একখানি দেখিবামাত্রই সম্রাট অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি-রো'র প্রতি ঘন ঘন রোষপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন—রো সাহেব কোন অজ্ঞাত কারণে বাদসাহ তাহার উপর এতদূর রুষ্ট হইলেন—স্থির করিতে না পারিয়া ভীত, স্তম্ভিত, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই চিত্রে একটী সুন্দরী রমণী মূর্ত্তিকে একটী বিকটাকার দৈত্য ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি গ্রীসীয় দেবী। রো জানিতেন না এই সামান্য চিত্র হইতে এতদূর বিভ্রাট ঘটিবে। সম্রাট রোষপূর্ণ কটাক্ষে রোকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এই চিত্রে আমাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ মূর্ত্তি আমার, ও ঐ সুন্দরী মূর্ত্তি রাজ্ঞী নুরজাহান। আমি নুর জাহানকে অত্যন্ত ভাল বাসি, ও তাহার বাধ্য বলিয়া আমার প্রতি এইরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে। রো, সম্রাটকে এই যুক্তির অমূলকতা বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তিনি সে দিনকার মত দরবার হইতে মৌনাবলম্বনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পরদিন অন্যান্য সভাসদগণের সাহায্যে বাদসাহকে প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন।

যে উদ্দেশ্যে, রো সাহেব এত দিন ধরিয়া মোগলরাজের ষোড়শোপচারে উপাসনা

বিধাতা তাহা সিদ্ধির উপায় করিয়া দিলেন। সম্রাট এক দিন রো সাহেবকে ফারমানের প্রার্থিত স্বত্বগুলির একটী খসড়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন; রো সাহেব সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর দিকে টানিয়া এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে ইংরাজ দ্বেষী, আসফ্ খাঁ, কুমার সাহাজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়াতে রো, সেইবার অকৃতকার্য্য হয়েন। তৎপরে আসফ্‌খাঁকে এক বহুমূল্য হীরক উপহার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ও পাকেপ্রকারে কুমার সাহজাহানকে বশে আনিয়া রো সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। সুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীলমোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগকে নিরাপদে, বাঙ্গালায় ও মোগলরাজ্যের সুবিধাজনক স্থানে বাণিজ্যাদি করিতে দেওয়া হইবে—(২) তাঁহাদের প্রতি কোন শাসনকর্ত্তা অযথা পীড়ন করিতে পারিবেন না—(৩) তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিবার শুল্ক দিতে হইবে না—(৪) যে সকল শাসনকর্ত্তা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন, তাঁহারা সম্রাট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন—ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকারে অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া স্বায় চতুরতা ও কার্য্যকুশলতা গুণে টমাস্ রো কোম্পানির কার্য্য সিদ্ধি করত রাজা জেম্‌সের পত্রের উত্তর লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। স্বদেশে সম্মানের সহিত চিরকাল তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর রাজা জেমসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,তাহার কিয়দংশের সার মর্ম্ম পাঠক মহাশয়দিগের জন্য তুলিয়া দিতেছি। "যখন মহারাজ এই পত্র পাঠার্থ প্রথম খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া নিতান্ত প্রফুল্লিত হইবে। আপনার সম্মান ও ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি হউক,শত শত বিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার দ্বারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বহুলপ্রচার হউক, ও সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগী রাজন্য বিপদে সম্পদে আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র হউন। আপনি টমাস রোকে উপযুক্ত প্রতিনিধিই নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার অমায়িকতা, সৌজন্য, কার্য্যদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রীতি লাভ করিয়াছি।" ....

বস্তুতঃ স্যর টমাস রো যদি এই সময়ে ইংরাজ দূত হইয়া মোগল দরবারে না আসিতেন—তাহা হইলে ভারতে ইংরেজাধিকার সুদূরপরাহত হইত।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত বহুরূপী।

১

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
কি বিচিত্র যাদুকর, বরিষার জলধর;
পলকে সহস্ররূপ ধরে কামরূপ!
কভু বা বিদ্যুৎগর্ভ, মণিশির যেন সর্প;
রক্তাম্বর কভু যেন শিমুলের স্তূপ;
নৌকা, হ্রদ, তরঙ্গিণী, অশ্ব, গজ, বৃক্ষশ্রেণী;
কভু পদ্মবন—যাহে ভ্রমর লোলুপ;
আমরি কি জলদের বহুরূপী রূপ!

২

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
নিথর বিজন দেশে, কত রঙ্গে, কত বেশে
বহুরূপী প্রতিধ্বনি সাজে অপরূপ!
ঝঙ্কারিয়া কত সুর, কভু গায় ভরপূর;
কভু করতালি দিয়া করে গো বিদ্রূপ;
আছাড়িয়া শিলাপরে, কভু নিজ মাথা খোঁড়ে;
আকাশ গম্বুজে কভু আরোহে অরূপ;
আমরি কি বহুরূপী প্রতিধ্বনিরূপ!

৩

ভালবাসি, বাসিভাল, বড়ই গো ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
তাই কি বহুরূপিণী, সুযোগ পাইয়ে তুমি,
চিত্তরত্নাগারে পশি ভাঙিলে কুলুপ?
দুকর আমারি ধরি, আমারি সম্মুখে চুরি?
ও হাসি ত হাসি নয় যাদু অপরূপ!
শূন্যমনা বালা কভু, মনস্বিনী যোষা কভু;
নিত্য নববেশ, একি জলধর রূপ!
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধচিত্তকূপ।

৪

ভালবাসি, ভালবাসি, বড়ই গো ভালবাসি
বহুরূপীরূপ।
সোহাগ ললিত সুরে, বীণার সঙ্গীত ঝরে,
শ্রোতার মুখর প্রাণ হয়ে যায় চুপ!
সহসা সে রাগ মাঝে, কটির কিঙ্কিণী বাজে;
মানের ঝঙ্কার ধ্বনি মরি অপরূপ!
ভ্রমরের গুঞ্জরণ, জলদের গরজন,
জনম কাটিল—একি প্রতিধ্বনিরূপ।

অদ্ভুত পাগল।

১

দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল,
চাহে দুষ্ট আমারেও করিতে পাগল।
মায়েরে,দিদিরে ছাড়ি,মোরে হেরি তাড়াতাড়ি
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত দুঃখ অবসাদে, আমার পরাণ কাঁদে,
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল ছল;
ওর কিন্তু তায় হায়, কিবা বল এসে যায়?
ও সুধু আমারে হেরি হাসে খল খল!
দেখদেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি গোঁফ
বুকের উপরে বসি একি রসাতল!
শাখার দোলায় দুলি, ক্ষুদ্র শুভ্র বেলাগুলি,
সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে টল টল,
পাগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল।

২

দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল,
চাহে বধূ আমারেও করিতে পাগল।

গৃহকার্য্য সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
বেণী পড়ে কটিতটে, মাটীতে অঞ্চল লোটে,
এক নেত্রে হাসি, আর আন নেত্রে জল!
পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি?
সে হাসি দেখিয়া বধূ হাসে খল খল!
আমার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় দিয়ে,
হাসিয়ে ঢলিয়ে পড়ে অদ্ভুত পাগল!
গলে মুক্তাহার গাঁথা, উষার কমল যথা,
তরুণ অরুণে হেরি করে ঢল ঢল;
দেখ, দেখ পাগলিনী হাসিছে কেবল!

৩

দেখ, দেখ, ওই বুড়ী আপনি পাগল,
চাহে বুড়ী আমারেও করিতে পাগল।
আমি বসি নির্জ্জনেতে, কহি কথা বধূ সাথে;
বুড়ী কিন্তু হেসে সারা, বদনে অঞ্চল!
আছে বধূ দাঁড়াইয়া—সহসা ঠেলিয়া দিয়া
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল!
কক্ষমাঝে দুইজনে, আছি মিষ্ট আলাপনে;
দেখ, দেখ, দিল বুড়ি বাহিরে শিকল।
পিঠেতে মারিয়ে কিল, হাসে দেখ খিল খিল;
শাঁকা-পরা হাতে যেন অশনির বল!
ভাদ্রমাসে কাঁটাকোলে, কেয়াগুলি কুতূহলে,
হাসির তরঙ্গে যথা করে ঢল ঢল;
হের দেখ বুড়-দিদি হাসিছে কেবল!

৪

দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল,
আমারেও চাহে বুঝি করিতে পাগল।
দূরে গেল বাঁধাহুঁকা, আমারে বানায়ে বোকা,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত রঙ্গ জানে বুড়া! যেন শর্করের গুড়া;
এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল?
বদন রদনহীন; তবু দেখ নিশিদিন,
সকল হাসির ধ্বনি ছোটে অনর্গল।
চিত্তগৃহে দিয়ে চাবি, রেখেছিল মৃগনাভি,
ভুর্ ভুর্ গন্ধ তাই ছোটে অবিরল।
হায় কিন্তু ওর নাতি, জাগিয়া সারাটি রাতি,
যৌবনেই নিঃসম্বল—হায়রে পাগল,
আমার দোসর এবে আমিই কেবল!

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি।

(Indian Political Agency)

১ম প্রস্তাব।

বিগত বর্ষে আড়বালিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভা হইতে মান্দ্রাজে জাতীয়-সমিতির আলোচ্য কতিপয় প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি (Indian agency) সংগঠন বিষয়ক একটি প্রস্তাব ছিল। সভা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে বৃটিশ পার্লেমেণ্টে দুই একজন প্রতিনিধি নিয়োগ অপেক্ষা ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ

(Presidency) ও প্রদেশ (Province) হইতে দুই একজন সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ লোক লইয়া একটি প্রতিনিধি-সমিতি সংস্থাপন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি জ্ঞান বিকাশিনী সভার উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। অল্প দিন হইল ভারতের প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম্ ডিগ্‌বি এবং ভারতের প্রিয় সন্তান দাদাভাই নউরোজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির যত্নে তথায় একটি রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশনে মাননীয় ডিগ্‌বি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার উদার-হৃদয় ও গভীর প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবেন যে তাঁহার নেতৃত্বে উল্লিখিত সমিতির স্থায়ী সুফল জন্মিবে। অল্পকাল হইল তিনি "India for the Indians and for England." নামক গভীর চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ একখানি সুপাঠ্য পুস্তক এবং "ইংলণ্ডের নিকট ভারতের ন্যায্য দাবী" বিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠে কোন্ স্বদেশানুরাগী ভারত-বাসীর হৃদয় তাঁহার প্রতি সমুচিত অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারে? স্বনাম প্রসিদ্ধ দাদাভাই এবং বঙ্গীয় ব্যারিষ্টার-অগ্রগণ্য প্রতিভাশালী উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির ক্ষমতার নূতন পরিচয় দানের আবশ্যকতা নাই—সংপ্রতি ইহাঁদের সুনাম শিক্ষিত-ভারতের অযুত নরনারীর রসনায় প্রতিদিন ধ্বনিত হইতেছে। আশা করা যাইতে পারে যে ইহাঁদের প্রাণগত যত্ন ও উদ্যমে উল্লিখিত সমিতি দীর্ঘজীবন লাভ ও সুফল প্রদান করিবে।

উল্লিখিত রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পরিগঠিত, এবং উহার কার্য্য প্রণালী যাহাতে বিস্তৃত এবং বিশদ রূপে নিরূপিত হয়, জাতীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে আমরা পুনরায় তদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিতে সাধ্যমত যত্ন পাইব। গতবৎসর আড়বালিয়া জ্ঞান বিকাশিনী সভা যে সকল অকাট্য যুক্তি সহকারে মান্দ্রাজ জাতীয়-সমিতির কার্য্যসাধক সভার নিকট ইংলণ্ডে উক্ত সমিতি সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভারতীর পাঠক সমাজে আজি তাহারই বিস্তৃত রূপ পর্য্যালোচনা হেতু বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। ভারতীর কোন চিন্তাশীল পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক এতৎসম্বন্ধে যদি কোন নূতন প্রস্তাবের উল্লেখ অথবা আমাদের কোন ভ্রম সংশোধন করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিব।

আজি কয় বৎসর হইতে কতিপয় সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও স্বদেশানুরাগী ভারতবাসীর বৃটিশ পার্লেমেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অর্থব্যয় এবং ইংলণ্ডে যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহার ফল

শ্রদ্ধাস্পদ লালমোহন ঘোষ, নন্দলাল ঘোষ ও দাদাভাই নউরোজী প্রভৃতি, ইংলণ্ডের উদার নৈতিক (Liberal) দলের সহায়তায় হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে লালমোহন ঘোষ মহাশয় উক্ত সভার সভ্য হইবার জন্য দুইবার বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে তাঁহার জয়ের আশা অত্যন্ত প্রবল থাকিলেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাঁর পরাজয় সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি এই—পূর্ব্বে যাঁহারা ইহাঁর পক্ষে মত দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন নির্ব্বাচন কালে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর একজন সুপরিচিত স্বদেশবাসীকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী যতই সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ, সুবক্তা ও সুদক্ষ হউন এবং উদার নৈতিকদল তাঁহার প্রতি যতই সহানুভূতি ও সহায়তা প্রদর্শন করুন, বৃটিশ পার্লেমেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ কখনই তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে লালমোহন বাবু যদি ভারতবাসী না হইয়া ইয়ুরোপীয় কোন দেশ অথবা উপনিবেশ বাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পার্লেমেণ্টে প্রবেশের পথ এরূপ কণ্টকময় হইত না। ভারতবাসীর নাম ও কৃষ্ণচর্ম্ম তাঁহার এই গৌরবময় পদলাভের পথে প্রধান অন্তরায়। ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ চিরকালই জাতীয় সমাজে স্ব স্ব জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর, এবং ইহার জন্য তাঁহারা একজন উপযুক্ত স্বদেশীয় লোককেই তাঁহাদের যথার্থ প্রতিনিধি জ্ঞান করিবেন। পার্শ্বদেশে ইয়ুরোপীয়-রাজনীতি বিশারদ একজন সুবক্তা ও সুযোগ্য ভারতবাসী দণ্ডায়মান থাকিলেও অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার ঘরের লোককে মনোনীত করিবে। ইহাকে জাতিগত অস্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; এক দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এক জলবায়ুতে পরিপুষ্ট, এক সমাজে পরিবর্দ্ধিত, এক সংস্কার ও এক আচার ব্যবহারে পরিচালিত এবং এক ধর্ম্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইয়া নিকটে স্বজাতীয় শত শত উপযুক্ত লোক থাকিতে কে কোথায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন দূর দেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার সম্পন্ন, অজ্ঞাত-প্রকৃতি লোককে স্বইচ্ছায় সহজে অভিনেতৃ পদে বরণ করিয়া থাকে? আপনার ঘরের লোকের প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবতঃ যেরূপ অনুরাগ ও আস্থা একজন অপরিচিত বিদেশীয় লোকের প্রতি তাহার সেরূপ অনুরাগ ও আস্থা থাকা কখনই সম্ভব নহে। *

---

* সত্য বটে, যদি ইংলণ্ডবাসীগণ বিদেশীয়ের পরিবর্ত্তে সুযোগ্য স্বজাতীয়কে তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করেন তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ জাতি ইহা অপেক্ষাও উদার। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ নিজে বলেন, তিনি

বৃটিশ পার্লেমেণ্টে এদেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার ও জয় লাভের পথে আরও অনেক বাধা আছে, তাহা আমরা যথা সময়ে প্রদর্শন করিব। আমাদের বক্তব্য পাঠে কোন পাঠকের মনে যেন এরূপ সংস্কার না জন্মে যে আমরা এদেশীয় লোকের ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্যপদ লাভের বিরোধী। আমরা কোন বিদ্বেষ ভাব-প্রণোদিত হইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। মহাসভার সভ্য-পদলাভ এদেশীয় সুশিক্ষিত লোকের পক্ষে একান্ত গৌরবের বিষয়; এবং উহা হইতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ভাবুকতা, স্বজাতিপ্রেম, বাক্‌পটুতা ও অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণ রাজির পরিচয় দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, একথা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি; কিন্তু স্বদেশের হিত-সাধনরূপ যে মহান্ উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত, মহাসভায় প্রবেশলাভ করিয়া তিনি যে তাহা সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ। এই জন্যই আমরা তাঁহার উক্ত পদলাভ প্রয়াসের পক্ষপাতী নহি। মনে করুন এদেশীয় দুইজন অথবা দশজন লোক এককালে অবাধে মহাসভার সাধারণ বিভাগে (House of Commons ?) সভ্য নিয়োজিত হইলেন। তত্রত্য চিরন্তন প্রথানুসারে তাঁহাদিগকে শত শত বৃটিশ সভ্যের সহিত মিলিত হইয়া ইয়ুরোপীয় রাজনীতির আলোচনা ও আন্দোলনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যদি কখনও মহাসভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিতে অবসর ও সুবিধা পাইলেও কখনই অভিলষিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইবেন না। শত শত বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সভ্য তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিবে। প্রথমতঃ এই সকল মহাত্মাদের মধ্যে অনেকেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—অনেকে হয়ত ইহার শুদ্ধ ভৌগলিক বিবরণ ও বর্ত্তমান শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় সামান্য সামান্য দুই একটি বিষয় ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়তঃ অনেক সভ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন যে কদাচিৎ ইহার কোন কথা উত্থাপিত হইলে তৎকালে তাঁহারা সুখে তন্দ্রা উপভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ তথায় "ভারত কার্য্যালয়"-("India office") ভুক্ত এমন একটি প্রবল দল আছে যে দলের প্রভুত্ব মহাসভায় সর্ব্বক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। এই দলের অধিকাংশ লোক অল্প বয়সে

কৃষ্ণবর্ণ বা ভারতবাসী বলিয়া যে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন নাই—তাহা নহে। তিনি ইহার কারণ অন্যরূপ দিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের এই জাতিগত উদারতা আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই উদারতার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা

সিভিল্ সার্ভিসে প্রবিষ্ট হইয়া এ দেশের চারিদিকে ছোট বড় শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। এদেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সংস্কার এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে চিরকাল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন থাকিয়া স্থল বিশেষে সময় সময় যথেচ্ছাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় দেশের প্রকৃত অবস্থা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের প্রতি একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সুনীতি ও সুব্যবস্থা পদদলিত করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রৌঢ়াবস্থায়—যৎকালে তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কিঞ্চিৎ প্রগাঢ় হইয়া আইসে, দেশের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মে, যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আইসে, সুতরাং যে সময় এদেশে থাকিলে তাঁহাদের নিকট হইতে অধিকতর সুশাসন ও সুবিচার লাভের আশা করা যাইতে পারে—সেই সুসময়ে তাঁহারা পেন্সন্ গ্রহণে এদেশের কোটি কোটি অধিবাসীর বিপক্ষে রাশি রাশি লজ্জাজনক কুসংস্কার লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে যাইয়াই ইহাঁরা ইণ্ডিয়া অফিশের বড় বড় পদগুলি অধিকার করিয়া থাকেন, মহাসভায় ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি; কারণ, ভারত সাম্রাজ্য বিষয়ে ইহাঁদের বাক্য ও বিধান ধর্ম্মগ্রন্থের আদেশ-বাণীর ন্যায় ধ্রুব ও অলঙ্ঘনীয়। ইহাঁদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ভারতবর্ষে অতিবাহিত—ভারত সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় সমলঙ্কৃত!! এই জন্যই ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ইহাঁদের মত মহাসভায় সর্ব্বদা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অল্প সংখ্যক প্রবাসী ভারতবাসীর সাধ্য কি যে সভাস্থলে এই প্রবল দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিবেন? এই বিপক্ষ দলের সমবেত শক্তির নিকট তাঁহাদিগকে প্রতিক্ষণ ম্লান মুখে ঘোর পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

এদেশীয় কতিপয় সুদক্ষ লোক মহাসভায় সভ্য নিয়োজিত হইলে কোন স্থায়ী সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই—এদেশের শাসন প্রণালীর মূলে সহস্র দোষ থাকিলেও তাঁহারা তথা হইতে তাহার প্রতিবিধানে সমর্থ হইবেন না। প্রচুর অর্থব্যয় প্রভূত পরিশ্রম ও বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিয়া পরিশেষে গভীর হতাশ্বাস ও গভীরতর মনোবেদনায় তাঁহাদের সমস্ত যত্ন ও উদ্যম পর্য্যবসিত হইবে। আমরা দিব্য জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি যে উহা হইতে আরও একটি বিশেষ অশুভ ফল জন্মিবে। আজি কালি যে সকল স্বদেশানুরাগী মহাশয়গণ এদেশে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা (Representative government) সংস্থাপনের জন্য অবিশ্রান্ত যত্ন পাইতেছেন, তাঁহাদের সমস্ত যত্নের মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত প্রদত্ত হইবে। তখন গভর্ণমেণ্ট সুযোগ পাইয়া বলিবেন, এদেশে প্রতিনিধি-ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ দেশের সুযোগ্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা দেশীয় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ইংলণ্ডের মহাসভায় আন্দোলিত, আলোচিত ও মীমাংসিত হইতেছে। প্রতিনিধিগণের

সমস্ত কথাই মহাসভা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

আয়র্লণ্ডের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা ক্ষণকালের জন্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের উক্ত আশঙ্কা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। শত শত বর্ষ হইতে আয়র্লণ্ডের শুভাশুভ ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। আয়র্লণ্ড বাসীর কোন মত উহাতে গৃহীত হইত না। জমীদার ও মধ্য-বিত্তশ্রেণীর অনন্ত-লীলাময়ী প্রভুশক্তি ও অত্যাচারের নিকট আয়র্লণ্ডের প্রজাসাধারণের অভ্যুদয়ের আশা পরিম্লান হইয়াছিল—দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা উক্ত প্রবল দলের অত্যাচার অবনতমস্তকে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তাঁহারা আপন আপন বিষয় আপনারা দেখিয়া শুনিয়া তাহার কোনরূপ বিধান ও ব্যবস্থা করেন। অশেষ যন্ত্রণা ও অনন্ত লাঞ্ছনা ভোগ ও বিস্তর আন্দোলনের পর আয়র্লণ্ড জাতীয়শক্তির পরিচয় দিবার সুযোগ পান। জাতীয় শক্তির পরিপোষক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের যত্নে ১৮০০ খৃঃঅব্দে সেণ্টষ্টিফেন নগরে আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড একশাসন-প্রণালী ভুক্ত হন। উভয় দেশের সামাজিক, ও রাজনৈতিক সমস্তবিষয় এক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া মীমাংসিত হইবার জন্য বৃটিশ পার্লেমেণ্টের কথঞ্চিৎ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইল। আয়র্লণ্ড পার্লেমেণ্টে আপনার প্রতিনিধিগণকে নিয়োজিত করিবার অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সদুপায় হইল না। অর্দ্ধেকের অধিক সভ্য প্রবলপরাক্রান্ত ভূস্বামীবর্গ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত সুতরাং তাহারা সভাস্থলে সর্ব্বদা ভূস্বামীগণের স্বত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। সভায় এমন দশ জন নিঃস্বার্থ ও ন্যায়বান লোকছিলেন না যাঁহাদের দ্বারা আয়র্লণ্ডের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা আন্দোলিত ও আলোচিত হয়। জমীদারগণের অত্যাচার হইতে আই-রিস্ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং মহাসভায় উদার বিধান প্রবর্ত্তন উদ্দেশে ও'ডনেল্, ও'কনেল এবং রবার্ট এমেট প্রভৃতি স্বজাতিবৎসল মহাত্মাগণ প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের জীবন জলন্ত স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত পরিচয়! ইহাঁদের প্রাণগত যত্নে মহাসভায় অধিক পরিমাণে আইরিস্ সভ্য নিযুক্ত হইলেও তাঁহারা বহুসংখ্যক বৃটিশ সভ্যের প্রতিদ্বন্দিতায় সমর্থ হইলেন না। আয়র্লণ্ডের দুর্গতি নাশের জন্য মহাত্মা ও'কনেল্ সভ্য জগতের নিকট যে সাম্যনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার মন্ত্রে-দীক্ষিত সুদক্ষ পার্ণেল পুনরায় তাহা পরিঘোষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। দিন দিন তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তাঁহার দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আয়র্লণ্ডের শাসন প্রণালী সংস্কার তাঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইল। তিনি তথায় নববিধান প্রবর্ত্তনের জন্য কত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু

কেহই তাঁহাদের কথায় আস্তা প্রদর্শন করিল না। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে শত শত বিপক্ষ সভ্যের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের কোন প্রস্তাব মহাসভায় সহজে গৃহীত হইবে না এবং বর্ত্তমান মহাসভার শক্তি ও বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, তখন তাঁহারা স্বদেশে আত্মশাসন প্রণালী (Home rule) প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য মহাসভার অনুগ্রহ ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। মহাসভার শিরঃস্থানীয় মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের আন্তরিক সমর্থন ও যত্নে বিগত ১৮৮৫ খৃঃঅব্দে তাঁহারা আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী বিস্তারের জন্য মহাসভায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। শত শত স্বার্থপর সভ্য তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী হইয়া এই আন্দোলন দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই আন্দোলনের আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত সুসভ্য, গৌরবশালী বৃটিশ পার্লেমেণ্টে যে সকল কুৎসিৎ ঘৃণাজনক ও লোমহর্ষণ বিষয় আন্দোলিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মনে হইলেও লজ্জা ও ক্ষোভে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, এবং যে সহৃদয় ক্ষমতাশালী সুসভ্য জাতি সভ্যজগৎ হইতে ঘৃণিত দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধন জন্য এক সময় প্রাণপণে পরিশ্রম ও অকাতরে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় প্রধান প্রধান লোকের নীচ স্বার্থপরতা ও ঘৃণিত পর-পীড়ন-প্রিয়তা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় ও বিদ্যা বুদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে! সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই মহা আন্দোলনে মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোনের পরাজয় হইয়াছে—তাঁহার স্বদল-দ্রোহী চেম্বারলেন-প্রমুখ অনেক উদার নৈতিক সভ্য (Liberal) স্থিতিশীল দলে (Conservative) যোগদানে সভ্য জগতের সমক্ষে আপন আপন যথার্থ স্বভাবের বিশেষ পরিচয় দান করিয়াছেন। এই আন্দোলন হইতেই স্বজাতি প্রেমিক ও'ব্রায়েন্, ও'ডিলন্ ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; মেণ্ডেভিল্ কারাগারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং এই আন্দোলনের বিলোপ সাধনার্থ আইরিস্ সেক্রেটারি হৃদয়হীন, অদূরদর্শী বেল্‌ফুর ভীষণ লৌহ দণ্ড হস্তে আয়র্লণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে দিবা রজনী সন্ত্রাসিত রাখিয়াছেন! এখনও আয়র্লণ্ডের ৮০ জন প্রতিনিধি মহাসভার সভ্য পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু হায়, কয়জন ইংরেজ সভ্য তাঁহাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিয়া থাকেন? যদি বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও প্রবল বিপক্ষদলের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াও কর্ত্তব্যানুরোধে স্বদেশের হিত কল্পে কোন প্রস্তাব করেন, অমনই সেই মুহূর্ত্তে বিপক্ষ দল হইতে বিকট ঘৃণার হাসি ও রোষ-কষায়িত ভীষণ ভ্রূকুটি নির্গত হইয়া তাঁহার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম বিকল করিয়া দেয়। অহো বিড়ম্বনা! আজি আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান নেতা ক্ষণ-জন্মা পার্ণেল বিপক্ষ দলের কুৎসিৎ মন্ত্রণায় কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন—তাঁহার ক্ষমতা চূর্ণ ও তাঁহার সুনাম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রতি কতই অলীক দোষ ও অপরাধ আরোপিত হইতেছে।

আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান দুর্গতি ও পার্ণেলের অদৃষ্টের পরিণাম যে কোথায় কি রূপে পর্য্যবসিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

সার্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ব্বে আমেরিকার উপনিবেশ গুলির সম্মুখেও আয়র্লণ্ডের ন্যায় প্রলোভন-জাল বিস্তারিত হইয়াছিল। উপনিবেশ গুলির রাজনৈতিক বিষয় বৃটিশ পার্লেমেণ্টে আন্দোলন ও পর্য্যালোচনার জন্য ইংলণ্ড আমেরিকাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা সুবিজ্ঞ সুদূরদর্শী বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ও জেফারসন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সুমন্ত্রণা-পরিচালিত হইয়া উক্ত প্রস্তাবে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; সুতরাং আয়র্লণ্ডের ন্যায় জাল-বদ্ধ হইতে নিরাপদ হইলেন। তাঁহারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়াছিলেন যে আমেরিকা হইতে সুদূর ইংলণ্ডের মহা সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ফল একান্ত অন্তঃসার-শূন্য হইবে, এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের ব্যবহারে গভীর মনোবেদনা ও তীব্র লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা করিয়া উপনিবেশবাসীগণ মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের পরিবর্ত্তে দেশের প্রকৃত বিষয় ও অভাব রাশি ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের ও সহৃদয় মন্ত্রীগণের গোচর করিবার জন্য লণ্ডনে কতিপয় সুদক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ফ্রাঙ্কলিন্ স্বয়ং দীর্ঘকাল প্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার (Pennsylvania) প্রতিনিধি স্বরূপে লণ্ডনে অবস্থিতি করিয়া আমেরিকার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় আরও অনেকে প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বাগ্মী প্রধান মহাত্মা বার্ক্ কিছু কালের জন্য নিউইয়র্কের প্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিনিধিগণ পরস্পরের সহানুভূতি ও পরামর্শ অবলম্বনে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা উপনিবেশবাসীগণ কর্ত্তৃক রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশ্বাসী-প্রতিনিধি নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা স্ব স্ব কার্য্যদক্ষতাগুণে অল্পকালের মধ্যে তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং মহাসভার প্রধান প্রধান সভ্য ও মন্ত্রীগণের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আমেরিকার ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে ইহাঁদেরই বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রভাবে আমেরিকার উপনিবেশ নিচয়ে অচিরে মঙ্গলময় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলস্বরূপ আমেরিকা ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে অদ্ভুত শৌর্য্য ও পরাক্রম সহকারে জাতীয় সমাজে স্বাধীনতা অধিকার করিয়াছিলেন। আজি সভ্য জগতে আমেরিকা, সভ্যতা ও মহত্বের আদর্শস্থল। আজি স্বাধীন আমেরিকার গৌরবময় ইতিহাসে ফ্রাঙ্কলিন্ ও জেফারসন্ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা মহাত্মাগণের কীর্ত্তি-কলাপ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

আমেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশগুলি বৃটিশ পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণে নিবৃত্ত হইয়া দেশে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী বিস্তারে যত্ন-

বান হন। সেই যত্নের পুরস্কার স্বরূপ দীর্ঘকাল হইতে তাঁহাদের স্ব স্ব জাতীয় সমাজে তাঁহাদের আপন আপন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়মিত হইতেছে। স্বদেশের শাসন প্রণালী সংশোধন ও নববিধান প্রবর্ত্তন জন্য তাঁহাদিগকে একটি দিনের জন্যও পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় নাই।

এতক্ষণ আমরা বৃটিশ পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের বিফলতা প্রদর্শন করিলাম, অতঃপর লণ্ডনে "ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি" স্থাপনের সার্থকতা প্রদর্শনে যথা সাধ্য যত্ন পাইব। বুদ্ধিমান ভারতবাসী আমেরিকার নব অভ্যুদয়ের কারণগুলি স্মরণ করিয়া যদি তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে যথা সময়ে এই ধন-রত্ন-অপহৃত, ন্যায় বিচার বঞ্চিত, পর পদ-বিলুণ্ঠিত হতভাগ্য ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী বিস্তৃত হইবে। মহাসভায় প্রবেশ লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ পুরঃসর উল্লিখিত প্রতিনিধি-সমিতির সহায়তায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাবর্গ ও মহাসভার প্রধান প্রধান সদস্যগণের দৃষ্টি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত হিত সাধিত হইবে। দেশের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর দোষগুণ, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অভাবগুলি সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিলে তাঁহাদের উদ্যম কখনই বিফল হইবে না। যেদেশ এক সময় সভ্যতা, সুশিক্ষা, শৌর্য্য ও বীরত্বে সমগ্র অবনীর ললাট-মণি ছিল, নিয়তির অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে আজি তাহার অবস্থার শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হস্তাবলম্বন দানে তাহার পুনরুত্থান সাধন প্রকৃত মহত্বের কার্য্য। আমাদের ভরসা আছে সুসভ্য ইংলণ্ড এই মহত্বের পরিচয় দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে গঠিত হয় তৎপক্ষে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষ যেমন নানা-বর্ণপ্লাবিত, নানা ধর্ম্মাক্রান্ত ও বিবিধ সম্প্রদায়-ভুক্ত বৃহৎ দেশ তেমনই উহার কোটি কোটি অধিবাসীর হিতের জন্য উহার প্রত্যেক বিভাগ ও প্রদেশ হইতে এক এক জন সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ, সুদূরদর্শী, সুবক্তা ও সর্ব্বজন-প্রিয় লোক লইয়া উক্ত সমিতি পরিগঠিত করিতে হইবে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি হইতে ঐরূপ একজন অথবা দুইজন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে একজন কিম্বা দুই জন; উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে একজন, রাজপুতানা হইতে একজন, পঞ্জাব বিভাগ হইতে একজন—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া উক্ত সমিতিতে প্রেরণ করিতে হইবে। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অথবা অন্য কোন সুবিধা জনক স্থানে তাঁহাদের একটি প্রকাশ্য কার্য্যালয় স্থাপিত হউক। উহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিষয়ের কাগজ পত্র ও পুস্তক আদি থাকিবে। প্রতিনিধিগণ পৃথকভাবে অথচ পরস্পরের সহানুভূতি ও পরামর্শ অবলম্বনে আপন আপন বিভাগের হিতকর কার্য্য অবধারণ করিবেন। ভারতবর্ষের

প্রত্যেকস্থানে যে সকল প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা বা সমিতি আছে, তাহাদের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদা স্বদেশ-হিতকর বিষয়ের সংবাদাদি আদান প্রদান করিতে হইবে। ঐ সকল সভা দেশের প্রধান প্রধান বিষয় ও ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব প্রতিনিধি-গণের নিকট প্রেরণ করিবেন। দেশীয় রাজাগণের রাজ্যের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীও তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা ঐ সমস্ত প্রকৃত বিষয় অবলম্বনে ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাবর্গ, শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ অধিবাসীগণ এবং মন্ত্রী সমাজ তখন সহজেই জানিতে পাইবেন বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর দোষে দেশে কিরূপ অর্থাভাব ও অন্নকষ্ট দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে,—কোটি কোটি লোক কিরূপে অনশন অথবা অর্দ্ধাশনে অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে। তাঁহারা জানিতে পাইবেন বিদেশীয় বণিকগণের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তাঁহাদেরই অনুরোধে ভিন্ন দেশীয় রাজগণের সহিত সমরানল প্রজ্বালিত হইয়া তাহার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য এদেশের ধনাগার দিন দিন কিরূপে শূন্য হইয়া পড়িতেছে এবং আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক নিবন্ধন এদেশের কোটি কোটি দরিদ্র অধিবাসী কিরূপে বিবিধ কর-ভারে প্রপীড়িত হইতেছে। তাঁহারা জানিতে পাইবেন দেশের সুশিক্ষিত ও প্রকৃত রাজভক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায্য দাবী কিরূপে ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত এবং দেশ মধ্যে জাতি-গত বিদ্বেষ ভাব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা জানিতে পারিবেন অনেক সময়ে অবিচার অথবা বিচার বিভ্রাটে দেশের শত শত লোক কিরূপে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। চা-কর দলের দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের পাশব-অত্যাচারে শত শত নিরাশ্রয় কুলি কিরূপে পশুবৎ ব্যবহৃত হইতেছে—শত শত রমণীর জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্ব-রত্ন কিরূপে কলঙ্কিত ও বিনষ্ট হইতেছে এবং সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কত অসহায়া রমণী অত্যাচারীর রক্ত মাখা হস্তে কেমনে স্ব স্ব জীবন-বলি-স্বরূপ উৎসর্গ দান করিতেছে। এই সকল গুরুতর বিষয়ের আন্দোলনে সময়ে বিশেষ শুভ ফল জন্মিবে।

শ্রদ্ধাস্পদ দাদাভাই নউরোজী বোম্বাই নগরীর পার্সি সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধির কার্য্য করিতে সক্ষম। মাননীয় ডিগ্‌বি দীর্ঘকাল বোম্বাই বিভাগে ছিলেন—তিনি তত্রত্য অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার ও অভাব সমস্তই সবিশেষ জানেন—তিনিও তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিনিধির কার্য্য করিতে সমর্থ। মাননীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশের সুদক্ষ ও সুযোগ্য প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিতে সক্ষম। কার্য্যানুরোধে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার স্থানে অপর কোন সুযোগ্য বঙ্গবাসী নিয়োজিত হইতে পারেন। আর্ড্‌লে নর্টন্ যোগ্য পিতার যোগ্য-পুত্র—তাঁহার পরলোক গত পিতা এদেশের হিতের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন—তিনিও শুভক্ষণে পিতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

এক্ষণে তিনি ইংলণ্ডে আছেন, তিনিও কিছুকালের জন্য মান্দ্রাজের প্রকৃত প্রতিনিধির কার্য্য করিতে সমর্থ। মাননীয় চন্দ্র সরকার, বদিরুদ্দীন তাএব জী, রামস্বামী মুদালিয়র, রাজা রামপাল সিংহ প্রভৃতি মহাশয়গণ ক্রমান্বয়ে এক একটি বিভাগের প্রতিনিধি নিয়োজিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। এই শেষোক্ত মহাশয় সহজেই দেশীয় রাজাগণের প্রতিনিধির কার্য্য করিতে সক্ষম। দেশীয় রাজাগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু মেজর বেল্‌কে হারাইয়াছেন। তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে তাঁহাদের রাজ্যগুলির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। তাঁহার স্থানে কর্ণেল্ অসবরণ এবং রাজা রামপাল সিংহ দুই জনে প্রতিনিধি মনোনীত হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত। এই সকল প্রতিনিধিগণের অর্থের সচ্ছলতা না থাকিলে তাঁহাদিগকে মাসিক উপযুক্ত পরিমাণে বেতন দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই গুরুতর বিষয়ের কার্য্যভার সম্পাদন করিবার জন্য একটি জাতীয়-ধনাগার স্থাপন একান্ত প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগে ও প্রদেশে এই শুভ উদ্দেশ্যে এক একটি ধনাগার স্থাপিত হউক। আমাদের মতে আমাদের "ন্যাসন্যাল্ ফণ্ড" এই শুভ কার্য্যের জন্য বিনা আপত্তিতে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। আত্ম-ত্যাগের পরিবর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলে এই শুভ কার্য্য আমাদের পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত অনেক সৎকার্য্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও বিফল হইবে। এক্ষণে সুনাম ও সুযশ লাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিলে ভবিষ্যতে অমর ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠায় তাঁহাদের সুনাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে—তাঁহাদের ভবিষ্য বংশীয়গণ প্রাণগত ভক্তিভরে তাঁহাদের সুনাম উচ্চারণে তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি স্বদেশানুরাগী সুশিক্ষিত ও ধনশালী মহাশয়গণের যত্নে প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সমিতি কিছুকাল স্থায়ী হইলে আমরা প্রতিক্ষণে উহার সুফল ভোগ করিতে পারিব। আমরা আয়র্লণ্ড-বাসীগণের ন্যায় এদেশে Home-rule (আত্ম-শাসন ?) প্রবর্ত্তনের জন্য লালায়িত নহি—আমরা বিলক্ষণ জানি এদেশ এখনও দীর্ঘকালের জন্য ইংলণ্ডের বিধান ও শাসন উপভোগ করিবে, কারণ উহাতে এদেশেরই মঙ্গল। কিন্তু ভারতের প্রিয়বন্ধু লর্ড রিপণ এদেশের হিতের জন্য শুভক্ষণে "Local self Government" এর যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সমিতির যত্নে কালে উহা সুন্দর বৃক্ষে পরিণত, শত শাখায় বিস্তৃত ও শত শত ফুল ফলে পরিশোভিত হইয়া পড়িবে। এদেশের কোন শাসনকর্ত্তা আমাদিগকে এরূপ মহান্ অধিকার দান করেন নাই—আমাদের বিদ্বেষী কত লোক আমাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কত কৌশল বিস্তার করিতেছেন, আমরা যদি যত্ন পূর্ব্বক এই স্বত্ব রক্ষা করিতে না পারি তাহা হইলে কলঙ্কের

সীমা থাকিবে না। রাজনৈতিক কার্য্য-সমিতির যত্নে আরও অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারিবে; সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এদেশে ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি সভা (Representative Government) স্থাপিত হইলে তাহার প্রভাবে প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচারিতা বা বিচার-বিভ্রাট নিবারণ, বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সুসংস্কার, জাতিগত বৈলক্ষণ্য ও প্রভেদ এবং জাতি বিশেষে রাজপুরুষগণের অনুকূলবর্ত্তিতা এবং দেশের ধনাভাব অনেক পরিমাণে মোচন হইবে। পক্ষান্তরে উহার প্রভাবে ক্ষান্ত, গুকুরমণি, মঙ্গলা ও বুধিয়ার ন্যায় শত শত অবলা-রমণী পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে; ভূপালের বেগম, টিকারীর রাণী, ও বর্দ্ধমানের হতভাগিনী রাজমাতার ন্যায় শত শত উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তীব্র লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য নিস্কৃতি পাইবেন; দেশীয় প্রধান প্রধান রাজাগণের রাজ্যে হয়দ্রাবাদের ন্যায় ত্র্যহস্পর্শ সংযোগে তাঁহাদের চির সঞ্চিত প্রভূত ধন-রত্ন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন, তাঁহাদের ক্ষমতা নাশ ও তাঁহারা ক্রীড়া পুত্তলের ন্যায় ব্যবহৃত হইবার পথে চিরকালের জন্য প্রবল অর্গল পতিত হইবে। টাইম্‌স্‌, পায়োনিয়র্‌ ও ইংলিশ্‌ম্যান্‌ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তিগণ ও আমেদ, লতিফ ও আলির সদৃশ স্বজাতি-প্রেমান্ধ মহাত্মাগণ এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় জাতিগত প্রভেদ প্রদর্শনে ঘৃণিত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বালনে সাহসী হইবেন না। সহজ কথায় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সমিতির প্রভাবে দেশে ন্যায়, সুবিচার ও সুশাসন বিস্তৃত হইবে, প্রজাগণের সুখ-শান্তি বর্দ্ধিত হইবে, অত্যাচারী ভীত ও কম্পিত হইবে, দুষ্ট বুদ্ধি শুভমতি প্রাপ্ত হইবে, এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ভালবাসা ও অনুরাগের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরস্পরে চিরবদ্ধ হইবে—ইংলণ্ডের শত্রুগণ ভারতের প্রতি লোভ-তৃষিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে কখনই সাহস করিবে না। এই সমিতি যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তৎপক্ষে এদেশের রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। আমরা উপসংহারে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা করিতেছি যে উল্লিখিত সমিতি দীর্ঘজীবন লাভে এদেশের অশেষ দুর্গতি নিবারণ ও অনন্ত অভাব মোচনে সমর্থ হউন। *

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

---

* ভারতের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে সম্প্রতি যে একটি ভারতীয় কার্য্যালয় হইয়াছে যাহাকে প্রবন্ধ লেখক রাজনৈতিক কার্য্য সমিতি বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কোন সমিতি নহে, কেবল একটি এজেন্সি আফিস মাত্র। ইংলণ্ডে যখন ভারতীয় কোন কার্য্য করার আবশ্যক হইবে তাহা সুপ্রণালীরূপে নির্ব্বাহ করাই উক্ত আফিসের প্রধান কার্য্য। ডিগবি সাহেব ঐ এজেন্সির প্রধান কর্ম্মকারক। উহা কোন

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

সত্য নিরূপণ করাই জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মনোগত সত্য এবং (২) বস্তুগত সত্য। যাহার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার নিকটে তাহাই সত্য—এইরূপ যত কিছু সত্য, অর্থাৎ যাহার সত্যতা ব্যক্তি বিশেষের মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাই মনোগত (Subjective) সত্য; আর, যে সত্য মনের অবস্থা-পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না সুতরাং সর্ববাদিসম্মত, তাহাই বস্তুগত (objective) সত্য। বস্তুগত সত্যের আর এক নাম বাস্তবিক সত্য; মনোগত সত্যের আর এক নাম প্রাতিভাসিক সত্য; প্রাতিভাসিক সত্য—অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রতিভাসিত হয়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস।

একজন অনভিজ্ঞ কৃষকের নিকটে সকলই বাস্তবিক সত্য। তাহার নিকটে চন্দ্র একখানি থালা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপে না; পৃথিবী পর্ব্বতের ন্যায় অচল; সূর্য্য সাগর-গর্ত্ত হইতে গাত্রোত্থান করে এবং সাগর-গর্ত্তে বিলীন হয়। সমস্তই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি ধ্রুব সত্য। দৈবাৎ যদি কখন ভূমি-কম্প হইল—তখন পৃথিবীর স্থায়িত্বের উপরে তাহার বিশ্বাস কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত হয়, তাহার পরেই তাহার মনোমধ্যে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, পৃথিবী বাসুকীর মাথার উপরে ভর করিয়া আছে—বাসুকী মাথা নাড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; এই কথাটি শুনিবা-মাত্রই কৃষকের সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। "পৃথিবী অটল" ইহা যেমন—"তাহা বাসুকীর মস্তকের উপর ভর করিয়া আছে" ইহাও তেমনি—দুইই তাহার নিকটে বাস্তবিক সত্য—ধ্রুব সত্য। পৃথিবীকে সে অষ্ট প্রহর দর্শন করিতেছে স্পর্শ করিতেছে, বাসুকীকে কেহই দেখে নাই—স্পর্শ করে নাই,

---

সভা নহে। সেই জন্য কখনো উহার অধিবেশন হয় নাই—এবং তিনি উহার সভা-পতিও হয়েন নাই।

উক্ত এজেন্সি দ্বারা এদেশের যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহা স্থায়ী করিতে হইলে সত্যই প্রতি বৎসর বহু অর্থের আবশ্যক। লেখক এই জন্য একটি জাতীয় ধন ভাণ্ডার স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত। তাহার দিকে দেশের লোকের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকগণকে আর একটি কথা জানাইতে ইচ্ছা করি—ইংলণ্ডে উক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপনের জন্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী। যদিও দাদাভাই নওরোজি এবং নরটন সাহেব এই এজেন্সি সংস্থাপনের অনেক সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার যত্নেই উহা স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে—এমন কি উক্ত এজেন্সির প্রথম তিন মাসের সমুদায় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াই তিনি প্রথমে ইহা সংস্থাপন করেন। ভাঃ সং।

কৃষকের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ সত্যও যেমন বাস্তবিক—আনুমানিক সত্যও তেমনি বাস্তবিক;—চক্ষে দেখা সত্যও যেমন—কর্ণে শুনা সত্যও তেমনি—উভয়ই ধ্রুব সত্য। তাড়কা রাক্ষসীর মুখব্যাদানের ন্যায় তাহার বিশ্বাসের পরিধি আকাশ-পাতাল ব্যাপী, তাহার অভ্যন্তরে সংশয়ের একবিন্দুও অবকাশ নাই। তুমি আজিকের কালের একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—কৃষকের মনের এইরূপ সংশয়-শূন্য নির্ভীক অবস্থা দেখিয়া তুমি মনে মনে হাস্য করিতেছ, কিন্তু হাস্যে ক্ষান্ত হও! কৃষকের নিকট সকলই বাস্তবিক সত্য—এ যেন খুবই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই বাস্তবিক সত্য নহে অথচ তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহাই বাস্তবিক সত্য,—ইহা কি উহা অপেক্ষা কম হাস্যাস্পদ? তুমিও বাস্তবিক সত্য জান না, কৃষকও বাস্তবিক সত্য জানে না; তুমিও বলিতেছ যে, "আমি যাহা বুঝি তাহাই বাস্তবিক সত্য, কৃষক ও তাহাই বলিতেছে; কিন্তু কৃষকের মন সংশয়শূন্য প্রশান্ত—তোমার মন সংশয়ের বিষ-দংশনে অস্থির; এ বিষয়ে তোমা-অপেক্ষা কৃষক পরম ভাগ্যবান্—তাহাতে আর ভুল নাই। কৃষক সত্য না জানিয়াও যেমন সত্যে নিঃসংশয়, তুমি সত্য জানিয়া যদি সত্যে তেমনি নিঃসংশয় হইতে পার, তবেই বলিব যে, তুমি কৃষক অপেক্ষা জ্ঞানে বড়, কেননা তুমি বাস্তবিক সত্য জান—, কৃষক তাহা জানে না; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ তুমিও যা, কৃষকও তা সমানই; বরং কৃষক তোমা অপেক্ষা ভাল, কেননা তাহার মনে শান্তি বিরাজ করিতেছে—তোমার মনে শান্তি নাই। এই স্থলে কৃতবিদ্য ব্যক্তি উষ্ণ হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন সন্দেহ নাই যে, "বিজ্ঞান বলিয়া যে, একটা সামগ্রী আছে, তাহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গেলে? তোমার মস্তকের উপরে মধ্যাহ্ন দিবাকর দেদীপ্যমান—তাহাও কি তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক সত্যের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞান নহে তো আর কে?" ইহার উত্তরে আমরা বলি,—থামো! তোমাদের পরম গুরু এবং নেতা কম্‌টি বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিক সত্য ভিন্ন বাস্তবিক সত্যে হস্ত প্রসারণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। কম্‌টি বলেন "বিজ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যকেই বাস্তবিক সত্য বলিয়া মানিয়া লও—তাহাতেই জনসমাজের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তাহার সাক্ষী—সূর্য্যের আকর্ষণ; সূর্য্যকে কেহ পৃথিবী আকর্ষণ করিতে দেখেও নাই দেখিবেও না; কে তবে বলিল যে, সূর্য্য পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে? ভেক যেমন জিহ্বা প্রসারণ করিয়া কীট আকর্ষণ করে, সূর্য্য কি সেইরূপে কোন সূক্ষ্ম বস্তু প্রসারণ করিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? না দৈবজ্ঞ যেমন মন্ত্র দ্বারা বাটি চালনা করে, সূর্য্য সেইরূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য-ব্যতিরেকেও শূন্যের মধ্য দিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? বিজ্ঞান নিরুত্তর! সুতরাং এখানে আকর্ষণ কথাটাই অপ্রা-

মাণ্য; অতএব আকর্ষণ বিকর্ষণ এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া "পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে" এইটুকু জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাক—বেশী বাড়াবাড়ি করিও না!" এই তো দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে বাস্তবিক সত্য বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত—ব্যাবহারিক সত্যই বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কম্‌টির এ কথার বিরুদ্ধে আমরা বলি যে, পৃথিবী যে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি কোন কারণ আছে—না কারণ নাই? কিয়ৎ মাস ধরিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে ক্রমশই দূরে প্রস্থান করে, তাহার পরে সেরূপ না করিয়া ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করে কেন?' অবশ্যই তাহার কোন না কোন কারণ আছে। অতএব পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ইহা যেমন সত্য—তাহার একটা না একটা কারণ আছে ইহা তেমনিই সত্য; পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কার্য্য এবং তাহার কারণ—দুয়ে মিলিয়া তবে একটা সমগ্র সত্য দাঁড়ায়! কম্‌টি ঐ সমগ্র সত্যটির প্রতি হাত বাড়াইতে মানা করেন; তিনি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কার্য্য মাত্রটিতেই—আধখানা সত্যেই—সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন। এটা তিনি দেখিতেছেন না যে, বিজ্ঞানকে অর্দ্ধ সত্যে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, আর, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আধ-পেটা অন্নে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, দুইই সমান। ধরিতে গেলে—বিজ্ঞান অর্দ্ধ সত্যও বোঝে না—সিকি সত্যও বোঝে না—বাস্তবিক সত্যই তাহার একমাত্র অন্বেষণের বিষয়; তবে কি না—অপার্য্যমানে সে অর্দ্ধ সত্যেই আপাততঃ সন্তোষ অবলম্বন করে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে, নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। কিন্তু তাহা বলিয়া অর্দ্ধ সত্য কি বাস্তবিক সত্য? সত্য বটে যে, আমার নিকটে চন্দ্রের এক পিট মাত্র প্রকাশ পায়—কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই কি চন্দ্রের সেই দৃশ্যমান পৃষ্ঠই তাহার সর্ব্বস্ব? সমগ্র সত্যই বাস্তবিক সত্য। অর্দ্ধ সত্যে বিজ্ঞানের এবং সংসারের কার্য্য খুবই চলিতে পারে; এমন কি প্রতি বৎসর সূর্য্য স্বয়ং উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাতায়াত করে—ইহার উপরে ভর করিয়াই কৃষকের কৃষি-কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে; অথচ বিজ্ঞান শেষোক্ত সত্যকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কম্‌টি যদি বলিতে পারিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কেন করে কি বৃত্তান্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না; কৃষক তবে এ কথা না বলিতে পারিবে কেন যে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হইতেছে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—কেন তাহা হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না? পণ্ডিতের জ্যোতির্বিদ্যাই শুধু যে, বিজ্ঞান, কৃষকের জ্যোতির্বিদ্যা যে, আদবেই বিজ্ঞান নহে, এরূপ কথা নিতান্তই অত্যুক্তি। এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের কৃষি-বিদ্যা অতীব স্থূল রকমের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বেত্তার কৃষি-বিজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম রকমের বিজ্ঞান, কিন্তু দুইই বিজ্ঞান তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কেননা প্রণালী-পদ্ধতি দুয়েরই সমান। পণ্ডি-

তেরাও যে প্রণালীতে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন—কৃষকেরাও সেই প্রণালীতে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে; সে প্রণালী কি? না ভুয়োদর্শন এবং বহুদর্শন। কম্‌টির অর্দ্ধ সত্য নয় ষোলো আনা বৈজ্ঞানিক, কৃষকের সিকি সত্য নয় আট আনা বৈজ্ঞানিক—কিন্তু তাহাতে কি? অর্দ্ধ হউক—সিকি হউক্—বৈজ্ঞানিক তো বটে! উপকারিতা দুয়েরই সমান—বরং কৃষকের কৃষি-বিদ্যা জন-সমাজের বেশী উপকারী; মূল পদ্ধতিও দুয়েরই সমান—ভুয়োদর্শন এবং বহু দর্শন। বিদ্যার তবে কিসে এত মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর এই যে, বিদ্যার মাহাত্ম্য তাহার পদ্ধতি-নিবন্ধনও নহে—উপকারিতা-নিবন্ধনও নহে; বাহিরের নিয়ম সকলকে মনের ভাবের ন্যায় অন্তরে পাওয়া—ইহাই বিজ্ঞানের চমৎকারিতা; আর, মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করা ইহাই শিল্প বিদ্যার চমৎকারিতা। যাহাই হউক্—কৃষকেরাও কতক পরিমাণে বাহিরের নিয়ম সকলকে মনোমধ্যে আয়ত্ত করে—এ জন্য কৃষকের কৃষি-বিদ্যাও মোটামুটি বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

উপরে দেখানো হইল যে, সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) বাস্তবিক (যথা পৃথিবী নিয়ত ঘুর্ণমান); (২) প্রাতিভাসিক (যথা পৃথিবী অটল); এখন বক্তব্য এই যে, প্রাতিভাসিক সত্য এবং বাস্তবিক সত্য উভয়ই মিশ্র এবং অমিশ্র (বা বিশুদ্ধ) এই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের ভিতরেও বাস্তবিক সত্য আছে, আর, "পৃথিবী নিয়ত ঘুর্ণমান" এই বাস্তবিক সত্যের মধ্যেও প্রাতিভাসিক সত্য আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন পৃথিবী প্রকাশমান, পশুদিগেরও সেইরূপ; কিন্তু "পৃথিবী সচল কি অচল" এ ভাবনার দায়ে কোন পশুরই একদিনের জন্যও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। পশুদিগের ইন্দ্রিয়ে রূপরসাদি প্রকাশ পায়—এই মাত্র; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিতে সত্য প্রকাশ পায় না। পশুরা ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে নিকটে অগ্রসর হয়, এইরূপ অনেক কার্য্য জ্ঞাত-সারে করে বটে; কিন্তু কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া অবধারণও করে না এবং মনো মধ্যে যত্ন পুর্ব্বক পোষণও করে না। পশু-দিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে পৃথিব্যাদি যেরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু "পৃথিবী অটল" এ যে প্রাতিভাসিক সত্য, ইহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য রহিয়াছে; "পৃথিবী অটল" ইহা বলিবা-মাত্রই প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ। অতএব, "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের মূলে, "পৃথিবী বস্তু-বিশেষ" এই বাস্তবিক সত্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পশুরা সত্যাসত্যের কোন ধারই ধারে না—মানসিক সংস্কারই তাহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু কি কৃষক, কি পণ্ডিত, সকল মনুষ্যই (অন্ততঃ কার্য্যের সুবিধার জন্য) সত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষকের এই যে একটি কথা যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ, এটি তো বাস্তবিক সত্য? তবেই হইতেছে যে, "পৃথিবী অচল"

বলিতে যে অংশে বুঝায় যে, পৃথিবী বস্তু বিশেষ, সেই অংশে উহা বাস্তবিক সত্য, আর, যে অংশে বুঝায় যে, "পৃথিবী আমাদের চক্ষে অটল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে" সেই অংশে উহা প্রাতিভাসিক সত্য। কৃষকের অল্প দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী অচল; পণ্ডিতের বহু দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী ঘূর্ণমান; কিন্তু "পৃথিবী কেন ঘুরিতেছে" তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহা মহা পণ্ডিতেরাও তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদানে পরাভব মানেন; অগাধ সমুদ্রে কেহ বা হাঁটু-জল পর্য্যন্ত—কেহ বা কোমর-জল পর্য্যন্ত—অগ্রসর হ'ন, তাহার পরে কোথাও আর থই পা'ন না। পণ্ডিত ব্যক্তি মনশ্চক্ষে—কল্পনাতে—দেখিতেছেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে; অতএব, পৃথিবী শুধু কেবল ঘুরিতেছে—আপনা আপনি ঘুরিতেছে, এটিও কল্পনার প্রাতিভাসিক সত্য; তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য যাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে তাহা এই যে, পৃথিবী কারণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে। অতএব, কি চাসার মোটামুটি সিদ্ধান্ত, কি পণ্ডিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত, উভয়েরই মূলে বাস্তবিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর উভয় সিদ্ধান্তই বাস্তবিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এই দুইরূপ সত্যের সম্মিশ্র। এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য যদিচ পূর্ণ-মাত্রায় বাস্তবিক নহে, তথাপি তাহাতেই লোক-সমাজের কার্য্য কোন-না-কোন প্রকারে চলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের এ যেমন—নৈতিক সত্যেরও তেমনি—কোনটিরই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি জন-সমাজের কার্য্য-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায় না; স্বার্থের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে—ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে—এক প্রকার মিশ্র নৈতিক সত্য লোক-সমাজের প্রবর্ত্তক।

এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া, তাহা ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া উক্ত হয়। ব্যাবহারিক সত্যের মধ্য হইতে তাহার প্রাতিভাসিক অংশটি টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অমিশ্র বাস্তবিক সত্য; ঐকান্তিক অমিশ্র বাস্তবিক সত্য বেদান্ত দর্শনে পারমার্থিক সত্য বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি আবার, ব্যবহারিক সত্যের মধ্য হইতে বাস্তবিক সত্য টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য—তাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা সত্য নামেরই অযোগ্য; এইরূপ অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য বেদান্ত-দর্শনে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই নামে অভিহিত হয়। মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং অবিদ্যা জীবের বন্ধন। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র বাস্তবিক সত্য, এক কথায়—পারমার্থিক সত্য এবং (২) মিশ্র বাস্তবিক সত্য—এক কথায় ব্যাবহারিক সত্য; তেমনি আবার, প্রাতিভাসিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস, (২) মিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ব্যাবহারিক সত্য। অতএব ব্যাবহারিক সত্যের একদিকে পারমার্থিক সত্য আর একদিকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—উহা দুয়ের সম্মিশ্র।

এখন, কথা-হ'চ্চে এই যে, বাস্তবিক সত্য—দর্শন এবং বিজ্ঞান দুয়েরই অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু উপরে দেখা গেল যে, বাস্তবিক সত্য—অমিশ্র কিনা পারমার্থিক এবং মিশ্র কিনা ব্যাবহারিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহার মধ্যে পারমার্থিক সত্য দর্শনের মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়, ব্যাবহারিক সত্য বিজ্ঞানের (বস্তু-বিজ্ঞানেরও বটে নীতি-বিজ্ঞানেরও বটে) মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়। ব্যাবহারিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বস্তু-ঘটিত এবং কর্ত্তব্য-ঘটিত, এক কথায় বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক। পারমার্থিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধি দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেবতা সম্বন্ধীয় এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয়; আধিদৈবিক কি? না ব্রহ্ম; আধ্যাত্মিক কি? না জীবের মুক্তি। ঐন্দ্রিয়ক প্রাতিভাসিক সত্যও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধিদৈবিক (অর্থাৎ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়) তাহা মায়া বলিয়া উক্ত হয়; মায়া কি? না প্রকৃতি (অর্থাৎ ঐশী শক্তি); আর, ঐন্দ্রিয়ক অব-ভাসের মধ্যে যাহা আধ্যাত্মিক (অর্থাৎ মনুষ্য-সম্বন্ধীয়) তাহা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়; অবিদ্যা অর্থাৎ জীবের মোহ-বন্ধন। মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের বিপরীত পৃষ্ঠ; আর, অবিদ্যা বা মোহ-বন্ধন মুক্তির বিপরীত পৃষ্ঠ। অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগ সর্ব্ব সমেত এইরূপ:—

সত্য

বাস্তবিক   প্রাতিভাসিক

পারমার্থিক   ব্যাবহারিক   ঐন্দ্রিয়ক

ব্রহ্ম   মুক্তি   বৈজ্ঞানিক   নৈতিক   মায়া   অবিদ্যা

এতক্ষণ ধরিয়া এই যাহা ভূমিকা করা হইল, ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল—কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন এ দুয়ের প্রবেশ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া। কাহাকে বলে পারমার্থিক সত্য তাহা আমরা জানিলাম—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বাস্তবিক সত্যই পারমার্থিক সত্য। কাহাকে বলে ব্যাবহারিক সত্য তাহাও আমরা জানি-লাম—যাহাতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এইরূপ মিশ্র সত্যই ব্যবহারিক সত্য, যেমন—নৈতিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাতিভাসিক সত্য কাহাকে বলে তাহাও আমরা জানিলাম—যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রকাশ পায় তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য। দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহাও আমরা জানিলাম—পারমার্থিক সত্য নিরূপণ করাই দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মভূমি ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখলাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান ভুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্কহৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না। হিমাচল-নিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চির-দুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে পদদলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া, আমরা মনে করি, মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদগদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শতবার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ঘুচে না। সেখানে স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আবদার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই একবার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জ্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূলভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতিদিন শীর্ণ হইবে বৈ উন্নতি করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না, বাক্য স্তব্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না; ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে। এ ভারতভূমিতে তাহা হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারিদিকে শ্মশান শবদাহ, শৃগাল কুকুরের যুদ্ধ, শকুনি গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণদেহ ম্লান মুখ দেখিয়া

সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার প্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিতে থাকে, পরের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুইবেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য পৃষ্ঠ থাবড়ানিতে সমস্ত অপমান জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চাহে না। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছল্য করিতে সাহস করিবে না। সে দিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একসুরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলেই এক। সেদিন কলহ বিবাদ থাকিবেনা, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকটে সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। সে শুভ্র উষার মত কান্তি ম্লান, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তি বিষণ্ণ। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি? সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবি ভারতি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেখানে মহত্ত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হৌক্। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎ-পদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্মদ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহ' প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। বর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক হ' লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নতশির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সে দিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

ফুলজানি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে মহাধূম—ছেলের বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। পনর বৎসর ধরিয়া ঘোষ মহাশয় এক কলমে জমীদারের নায়েবি করিতেছেন। মাথার উপরে টাক এখনও জাঁকিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার স্তর বিন্যস্ত বিশ্বোদর উদরটীর পানে তাকাইলে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে মা লক্ষ্মী বাস্তবিক পনর বছর যাবৎ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাহা হইলে কি হয়? কিছুতে সে উদর পূরিবার নহে। মনিব জমীদার মহাশয় দয়া করিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, নায়েব পুত্রের বিবাহের বাবৎ পরগণার টাকা-প্রতি দুই আনা উসুল করিয়া লয়। নায়েব মহাশয় তাহার উপর আর চারি আনার ফিকিরে ছিলেন, কিন্তু রাইয়তদের সঙ্গে অনেক কিচি কিচি কোলাহলের পর অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই আনায় রফা করেন। এ ছাড়া দধি দুগ্ধ তরকারী ও কদলী পত্র এবং মৎস্যের ভার মাতব্বর প্রজাদের ঘাড়ে চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তথাপি শান্তি নাই। প্রাতে উঠিয়া রোজ রোজ আজ্ কাল গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন—উদ্দেশ্য কার কিসে ছোঁ মারিবেন। বিষয়ী লোক যারে বলে, ঘোষজা তাহার সাড়ে ষোল আনা। কোন কোন কবি এক নায়িকাকে নানা মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে বহুরূপীত্ব যত সুলভ খাঁটি বিষয়ীলোকে, তত আর কিছুতে নহে। বহুরূপী যখন যার কাছে, তখন তাহার সেই রং; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আহার্য্যান্বেষণ, তাহাতে তাহাঁর কখন ভুল চুক হয় না। ঘোষ মহাশয় মতলব হাসিলের জন্য সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই শৃগাল, সমকক্ষের কাছে যখন যেমন তখন তেমন এবং প্রজার কাছে প্রায়ই সিংহ। এ সকলই তাঁর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সেই এক মাত্র রজত চক্রের জন্য। সে লক্ষ্য কখন ব্যর্থ হইবার নহে।

গোল পাতার ছাতি স্কন্ধে মাথায় চাদর বাঁধিয়া যষ্টি হস্তে নায়েব মহাশয় ওরফে মহেশ্বর ঘোষ হরিশপুর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের —তাঁহার জন্ম ভূমিত্বের মাত্র সম্বন্ধ—নায়েবিত্বের নহে, তথাপি এই প্রভাতে গরিব—তর সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে। ঘোষজার ইচ্ছা একটু দ্রুত চলেন, —র সম্মুখব্যাপী উদরটী সে সাধে বাদ সাধিতেছিল। মানুষের ইচ্ছা যে স্বাধীন নহে এর চেয়ে তাহার আর কি গুরুতর প্রমাণ চাই? ঘোষ মহাশয়ের মনে সে দার্শনিক তত্ত্ব উঠিতেছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি যে একটা কিছু ভাবিতেছিলেন, তাহা তাহার মন্থর পদ বিন্যাস এবং ভ্রুকুটি ভীষণ বদন মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছিল। নিন্দুকেরা বলিত, শীকারের পূর্ব্বে চীল মহাশয় ঐরূপ চিন্তাযুক্ত হন এবং

তাঁহার দৃষ্টিও ঘোষজার বক্র দৃষ্টির অনুসরণ করে। সে যেমনই হউক, ক্রমে ঘোষ মহাশয় ফলু সেখের বাটীর সম্মুখে পৌছিলেন—ফলু কিন্তু ফুলি দিদির ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে তেমন হৃষ্টচিত্তে সেলামটা করিতে পারিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার গৃহ প্রাঙ্গনস্থ কাঁঠাল গাছটী যে ফলে ফলে ভরিয়া রহিয়াছে, রাস্তা হইতে তাহা দেখা যাইতেছিল। নায়েব মহাশয় মাথায় চাদর খানি ভাল করিয়া বাঁধিয়া সেই দিকে পূর্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "ফলো রে, বিয়ের তরকারির জন্যে ইঁচড় গোটা তিনেক তোকে দিতে হবে।"

ফলু দাড়ি চুমরাইয়া কষ্টে ঈষৎ হাসিয়া যোড় করে জবাব করিল,

"সে এজ্ঞে করবেন না নায়েব মোশাই, ওই কেঁটাল কটি মোর গুজরাণ, না পাক্‌লে কথ্‌থন বেঁচিনে।"

"মর্ ব্যাটা" বলিয়া ঘোষজা যষ্টি আন্দোলিত করিলেন, ফলু দুই হাত পিছাইয়া আপনার দরওয়াজার দিকে গেল। "ব্যাটা তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। বেহাইন ঠাক্‌রুণের জমীগুলো ফাঁকী দিয়ে খাসিস্—রোস্ একবার বিয়ে হোক্। কাঁঠাল পাকিয়ে খাওয়াচ্ছি একবার। ব্যাটা তোর পেঁয়াজ পয়জার হবে, তবে আমার নায়েবি সার্থক।"

এইরূপে ঘোষজা গরিবের পক্ষে সেই প্রাতঃকালে রুদ্র রসের অবতারণা করিতে করিতে ক্রমে বজরুল করীমের "দৌলতখানার" নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেখ বজরুল করীম নবাব সরকারে খালাসীর কর্ম্ম করেন, অতএব হরিশপুর গ্রামে তিনি একজন মুৎসুদ্দির মধ্যে। বাস্তবিক ও সেখজীর আদব কায়দার ঘটা, ভ্রূ আবশ্যক অনাবশ্যক কুঞ্চন এবং প্রসারণ, সর্ব্বোপরি তাঁহার অজাধিক শ্মশ্রুকুঞ্জের কেয়ারি দেখিয়া লোকের মনে হইতে পারে বটে যে নসীব ভাল হইলে একটা পেয়াদাগিরি তাঁহার প্রাপ্য। সে আপশোষের কথাটা স্বয়ং সেখজী আলবোলায় তামাকু চড়াইয়া অনেকবার তাঁহার গ্রামস্থ মিলিত এবং তাঁহার উন্নত পদগৌরবে বিস্মিত সেখ মণ্ডলীতে প্রচার করিয়াছিলেন। এ হেন সেখজী যে নায়েব মহাশয়ের কদর বুঝিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ঘোষ মহাশয় দূরদর্শী—নবাব সরকারের লোকটাকে তিনি হাতে রাখা অতি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন এবং কাজেই তিনি তাঁহার পারসী ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ রত্ন সকল খালাসীজীউর প্রতি প্রয়োগ করিতেন। সাক্ষাৎ হইলেই তাহাকে সম্বোধন করিতেন—"হুজুরকা দৌলত খানা" ইত্যাদি এবং নিজের "গরিবখানার" দিকে "তসরিফ্ ফরমাইতে" নিমন্ত্রণ করিয়াও আসিতেন। আজ্ সেই জন্যই এদিকে আগমন। খালাসী মহাশয় তখন জীর্ণ গালিচা ও ছেঁড়া তাকিয়ার মসনদে প্রতিবেশী-মণ্ডলে বসিয়া নূতন মাটীর ফরসীতে সহরের সদ্যঃ আমদানী অম্বুরী তামাকুর সেবা করিতেছিলেন। নায়েব মহাশয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে আদব কায়দার

ঘটা পড়িয়া গেল। এ কথা সে কথার পর কোন কথা না পাইয়া ঘোষজা সুধাইলেন— "আচ্ছা খালাসীজী, সরকারের সব খবরই ত তোমার মালুম আছে, লড়াইএর কথাটা কি সত্যি ?"

খা। (বিজ্ঞতা-সহকারে) গুজবটা সাঁচ বলে এ তাঁবেদারেরও মালুম হয়। নইলে নয়া পানসীর ফরমায়েস কেন হবে ?

"খয়ের !" বলিয়া নায়েব মহাশয় চিন্তামগ্নের ভাব দেখাইলেন। কিছু পরে বলিলেন—"খালাসীজী, তোমার একবালছে কিছু জমী জারাৎ করেছি, লড়াই হলে পাছে সিপাহী লুটে পুটে ন্যায় !" খালাসীজী ভ্রুর যুগপৎ আকুঞ্চন প্রসারণ করিয়া নায়েব মহাশয়কে অভয় দিলেন।—"হজুর মানীর ইজ্জৎ রাখ, তোমার কুছ পরওয়া নেই !"

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলে সেখজী তাঁহার মোসাহেবদের কাছে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে এর চেয়ে আর ইজ্জৎ কি হইতে পারে ? এবং তিনি ভরসাও দিয়াছিলেন যে দরবারের "কোসিস্ করিয়া নায়েব সাহেবের একটা জনকাল চাকরীও তিনি করিয়া দিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বেড়াইয়া আসিতে ঘোষ মহাশয়ের বেলা প্রায় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী ৪।৫ বার বাহিরে লোক পাঠাইয়া কর্ত্তার দেখা পান নাই, অতএব রাগে অভিমানে তিনি গর্ গর্ করিতেছিলেন। স্বর্ণকার করার মত আজ্ প্রাতে অলঙ্কার দিয়া যায় নাই, কাজেই সেই সূত্র হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণীর ক্রোধাবেশ। দয়া স্নেহাদি যেমন ক্ষুদ্র একটী সংসার হইতে বিশ্ব সংসারময় ছড়াইয়া পড়ে, গৃহিণী-কুলের রাগ অভিমানাদি তেমনি বিশ্ব সংসার হইতে উঠিয়া ক্ষুদ্র-প্রাণী স্বামী বেচারীর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। স্বর্ণকার আসিল না দেখিয়া কর্ত্তৃ ঠাকুরাণীর প্রথম রাগ হইল ভৃত্যের ওরফে দুঃখীরাম হাজরার উপর ; সে পলাইলে ধাক্কা গিয়া পড়িল পরিচারিকা ওরফে বিন্দী পোড়ারমুখীর উপর ; এবং ক্রমে সেই রাগ ছড়াইয়া পড়িল তৃতীয় নম্বর কন্যা চতুর্থ পুত্র এবং শেষ ও পঞ্চমে স্বামী খোদ নায়েব মহাশয়ের উপর। কাজেই ঘোষ মহাশয় যখন বাড়ী পৌছিলেন, তখন একটা বিষম হুলুস্থূল পড়িয়া গেছে। আমরা ঘোষ মহাশয়ের শ্ববৃত্তি ও সিংহবৃত্তির পরিচয় দিয়াছি—উভয়ই শক্তি পক্ষে। কিন্তু আত্ম-শক্তি পক্ষে তাঁহার যে বৈষ্ণব ভাব অর্থাৎ মেষবৃত্তি, সে পরিচয়টা এতক্ষণে দিব।

কর্ত্তা মহাশয় বাহিরে পৌছিয়াছেন শুনিয়া পুরণের মা প্রথমে ভাবিলেন শয্যার আশ্রয় লইবেন কিন্তু এ বয়সে বিশেষ এত বেলায় তাহাতে কেমন লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল। অতএব জগদ্ধাত্রী আর দেরি মাত্র না করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিলেন, হুঁকা হস্তে "দেহি পদ পল্লব মুদারং" ভাবে কর্ত্তা মহাশয় যখন অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তখন

ওকাইয়া গেল এবং

রভীষিকার বেশে জাগিয়া উঠিল।

কণ্ঠে ডাকিলেন "গিন্নি!" গৃহিণী মুখ বাঁ

মর্দ্দনে মন দিলেন। কর্ত্তার আর গৃহিণী সম্ভাষণে

দেখিয়া তাঁহার হুঁকাও ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘ বিরামের

তে লাগিল। দণ্ডেক এই ভাবে গেলে ঘোষ মহাশয়

াকিলেন—"গিন্নি!"

র। "নাইতে চলেচি, মিছে মিছে পিছু ডাকা কেন?"

হলো? ছেলের বিয়ে, তুমি ঘরের গিন্নি, কথায় কথায় ছেলে মানুষের ম . . . কি চলে?

গৃ। যখন ছেলে মানুষ ছিলাম, ভারি তখন কিনা আদর কর্ত্তে। যাও, যাও সব আমার মনে আছে। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ!

কথাটা বাস্তবিক সত্য। কর্ত্তার মধুর ভাবোন্মাদটা বয়সের ফল—নহিলে প্রথম বয়সে গৃহিণী ছিলেন ভার্য্যা মাত্র। নায়েবির মূল শ্বশুর এবং সেই অবধি লক্ষ্মী শ্রী। অতএব শ্বশুর কন্যার আদরও সেই হইতে। জগদ্ধাত্রীর কথায় সব কথাগুলো ঘোষ-জার মনে পড়িয়া গেল। খোঁটা খাইবার ভয়ে তিনি কথার স্রোত ফিরাইতে ব্যস্ত হইলেন।

"সত্যি গিন্নি, কেন রাগ হলো? শুন্‌লাম নাকি সেকরা গয়না নিয়ে এসেনি! তা রাগ কিসের, এখুনি মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেব!"

গৃ। মেরে ধরে আর কাজ নেই—আমি তোমার আপদ বালাই, আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। বাবা তোমার নায়েবি করে দিয়েছিলেন, আর আমার দোসরা জায়গায় একটা বিয়ে দিতে পারতেন না? তা তিনি নেই, ভাই ত আছে, বাপের বিষয় ত আছে! বাপের বাড়ী গেলে দুটি খেতে পাব, দুখানা পরতে নেই পেলাম!

গর্জ্জন হইলেই তার বর্ষণ আছে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী চোকের জলে গৃহিণীর বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সক্রেটিসের মত মহেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই সে বিচার করিয়া রাখিয়াছিলেন, অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। "সবুরে মেওয়া ফলে" অনেক দিনের কথা, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্পেনসার নূতন ভাবে কথাটা বলিতেছেন বটে

কিন্তু সবুরে ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্যে মেওয়া ফলিবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা গেল না। বেশী সবুর করিবার যে অবসর তাহাও তাঁহার ছিল না। অতএব রোদনের তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ও হা হুতাশের লাঘব হইতে না হইতে তিনি মানভঞ্জন কার্য্যে ইতি করিবার মনস্থ করিলেন।

...,—ছি, তুমি আর

...ক হলো? বেয়ানকে জিজ্ঞেস্ কর্...

শেষ কথাটায় সদ্য সংস্কৃত বাঁধ আবার ভাঙি

জগদ্ধাত্রী স্বামীর পানে লোহিত লোচনের বঙ্কিম দৃষ্টি

"তোমার যেমন ছোট নজর—অমন বাপের বেটী ...

বেয়ান করে নাল পড়্চে! অমন মন্তরি তন্তরি পু...

কর্বো! ভাল গেয়ো জুটিয়ে দিচ্চো যা হোক্! ঐ বেয়...

বউমাকে কি কি গয়না দেবে বেয়ান? মরণ আর কি!

টাকা করে থেপেচেন, খোসামুদে, কিপ্পণ মিন্সে!—

এ নূতন বিপদে নায়েব মহাশয় পার দেখিতে পাইতেছিলেন না। তা... মনে হইতে ছিল, এর চেয়ে মনিব জমীদার হিসাব নিকাশের তলব করেন সে ভাল! কিন্তু ছেলে পুরন্দর অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিল। বাপ যে ঘরের ভিতর, তা সে জানিত না। অতএব সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে মার আর্দ্রচক্ষু দেখিয়াই বলিয়া উঠিল;—"কেঁদে মর্চো কেন আবার সকাল বেলায়? পাঠশাল থেকে এসে ক্ষিধেয় মর্‌চি,—দিদিকে জিজ্ঞেস্ কর্লাম যে মা কোথা তা হতভাগী হেঁসেই কুটি কুটি!—বলিতে বলিতে পিতার ধূম পানের রব তার কানে গেল। অমনি পুত্র রত্ন এক লাফে আঙ্গিনায় ফিরিলেন এবং ছুটিয়া পলাইলেন। বাপের "পুরোরে ও পুরো" প্রভৃতি ডাক সে ক্ষিপ্রগতির নাগাল পাইল না। তখন গৃহিণী তৈলবাটীকা ও কলসী ছাড়িয়া উঠিলেন। কর্ত্তাও ধড়ে প্রাণ পাইলেন।

শুকতারা।

সারাটী রজনী জাগি, অলস মদির আঁখি!
সবে ঘুমাল আনন ঢাকি, আকাশের বুকে,—
মৃণালি কিরণ মাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা অনিমেষ চোখে?
প্রতি নিশি জাগি জাগি, তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি, বিরহীর পারা!
তবে সই কহ হেন, সমুজ্বল শোভা কেন,
বাসরে বধুটী যেন, অতি মনোহরা।

তুমি কি প্রেমিক কবি, রজনী রহস্য ছবি
আঁকিছ নিরালা বসি গগন প্রাঙ্গণে!
অথবা উষার সনে মুগ্ধ প্রেম আলাপনে
ভুলে আছ অরুণের অসহ কিরণে!
কিবা, স্বপ্নের সীমন্ত হ'তে, খসিয়া পড়েছ পথে,
জগত মুগ্ধকারী মোহময় মণি!
সারারাতি ছলা কলা—দিয়া সুখ দিয়া জ্বালা,
তাড়াতাড়ি পলায়েছে ছুটে কুহকিণী!
কোন ভাবে কার আশে, একাকিনী থাক বসে
ভাবিয়া না পাই শুধু মুগ্ধ হয় আঁখি,
চেয়ে দেখি বাতায়নে, চেয়ে আছ সুলোচনে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলে হাস, হাসি সখি

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সূর্য্য।

সূর্য্যের বাষ্পাবরণ।

পৃথিবীর যেমন বাষ্পাবরণ আছে, সূর্য্যের আলোকমণ্ডলও তেমনি বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় পরীক্ষা দ্বারা অল্পদিন মাত্র এই বাষ্পাবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যখন সূর্য্যকে পূর্ণ গ্রাস করিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ চন্দ্রমূর্ত্তি রজত-প্রভ একটি মৃদু আলোক-চ্ছটায় পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সেই রজত-প্রভ চ্ছটা-মুকুট ব্যতীত, চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাপ-কুসুম-বর্ণাভ অগ্নিশিখাসমূহের স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে। এই দুইটির মধ্যে চ্ছটা-মুকুট বহুকাল হইতে এমন কি কেপলারের সময় অবধি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। এই চ্ছটামুকুট চন্দ্রের বাষ্পাবরণ কিম্বা সূর্য্যের তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই, পরে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুমিত হইল, চ্ছটা-মুকুট সূর্য্যের বাষ্পাবরণ, এবং উপ-রোক্ত স্ফুলিঙ্গরাশি এই চ্ছটা মুকুটে ভাসমান সূর্য্য-লোকের লোহিতবর্ণ মেঘমালা। কিন্তু চ্ছটা-মুকুট প্রকৃত বাষ্পাবরণ না হউক ইহা যে সূর্য্য-লোক-অন্তর্ভূত কোন পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশ্য, পূর্ব্বোক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্য-গ্রহণের সময়, স্পেনদেশের পরীক্ষা হইতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সূর্য্যালোকভুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। এই সময় রশ্মিনির্ব্বাচক (Spectroscope) * একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা পরবর্ত্তী পূর্ণ গ্রহণের সময় অনেক গুলি সৌর রহস্য ভেদ হইল। এই গ্রহণ উত্তম রূপে দেখিবার নিমিত্ত জ্যানসেন নামক এক জন ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। গ্রহণের দিনে যথন চন্দ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যের শেষ রশ্মি গ্রাস করিয়া ফেলিল, তথন সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত একটি অগ্নিশিথা নেত্রগোচর হইল। জ্যানসেন তদভিমুখে রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্রসংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন ইহা জ্বলন্ত জলজান বাষ্প, ইহা প্রতিফলিত আলোকে আলোকময় নহে, জ্বলন্ত উত্তাপেই ইহা প্রজ্বলিত। কিছু দিন পরে নর্ম্মাণ লকিয়ার এই পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা যায়, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল একটি জ্বলন্ত বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণ নর্ম্মাণ [illegible] মণ্ডল (Chromosphere) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণমণ্ডল।

বর্ণমণ্ডলের সর্ব্বোপরিস্তর প্রধানতঃ জলজান বাষ্প, কিন্তু ইহার নিম্নস্তর সকল, লৌহ ম্যাগনেশিয়ম প্রভৃতি ধাতব বাষ্পময়। বর্ণমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই লোহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। বর্ণমণ্ডলই সূর্য্যের যথার্থ বাষ্পাবরণ। এই ভীষণ জ্বলন্ত বাষ্প-সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহুঃ শতাধিক মাইল বেগে যে পদার্থরাশি চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সে প্রবল ঝটিকা কে বর্ণনা করিবে? এই-রূপ ভীষণ-পরাক্রম ঝটিকা-দানব আপন দোর্দণ্ড-বলে সমস্ত ভারতবর্ষ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টায় ইংলণ্ডে উপনীত হইতে পারে। মনুষ্যের ভাষায় ইহার প্রতাপ প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ঝটিকাতাড়নে বর্ণমণ্ডলের প্রান্তদেশ সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত। বর্ণমণ্ডল হইতেও আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে উত্তাপ পাই।

বাষ্পাবরণ না থাকিলে সূর্য্য আমাদের নিকট এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত হইত, এবং তাহা হইলে সূর্য্যের বর্ণ গাঢ়-নীলাভময় হইত। বর্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় অনেক সূর্য্যরশ্মি ইহাতে লীন হইয়া যায়; সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত রশ্মির মধ্যে অল্পই বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে পায়। বাষ্পাবরণ না থাকিলে যে সূর্য্যের কতগুণ প্রভাব বাড়িত তাহা এথনো নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় নাই। লাপ্লাস বলেন সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত রশ্মির ১২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত

---

* এই যন্ত্রের দ্বারা জ্বলন্ত পদার্থের মৌলিক অংশ নির্গত আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ হইতে ঐ জ্বলন্ত পদার্থের নির্ম্মাণোপকরণ নির্দ্ধারিত করা যায়।

হয়, এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ ইহাতে লীন হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অর্দ্ধেকের অধিক রশ্মি বাষ্পাবরণে মিশিয়া যাইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য জন্মি- বার পূর্ব্বে যে বহুকালব্যাপী একটি ভীষণ শীতকালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ল্যাংলি বলেন তাহা উপরোক্ত কারণে সংঘটিত। সে সময়ে সূর্য্যরশ্মি এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্পাবরণে লীন হইত বলিয়াই সেই ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয়।

বিশেষ যত্নের সহিত সূর্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সূর্য্য-গোলকের মধ্যস্থান যেরূপ উজ্জ্বল, প্রান্তবর্ত্তী স্থানের উজ্জ্বলতা সেরূপ নহে। সূর্য্য-গোলকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রশ্মি-বিকিরণ-পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে কিরণ পাই। কি উত্তাপ জনক কি আলোক-জনক, কি রাসায়নিক-শক্তি-উৎপাদক সকল প্রকার রশ্মিই সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আইসে। ইহার কারণ অবিসম্বাদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ঠিক লম্ব ভাবে (Vertically) নিক্ষিপ্ত কিরণমালা অপেক্ষা চাক্রবালিক রূপে নিক্ষিপ্ত কিরণমালার অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। এবং যে কিরণমালা যত অধিক-দূর ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করে তাহা তত অধিক পরিমাণে বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। সূর্য্য-গোলকের মধ্যভাগস্থ কিরণমালা ঠিক লম্বভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সূর্য্যের প্রান্ত ভাগস্থ কিরণ চাক্রবালিক রূপে বাষ্পাবরণ ভেদ করে, সেই জন্য আমরা এই দুই স্থানের রশ্মিবিকিরণের এত বিভিন্ন পরিমাণ দেখিতে পাই।

চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল।

বর্ণ-মণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পের অতিলঘু যে সকল অংশ তাহার বহির্ভাগে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণরূপে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই গ্রহণের সময় চন্দ্রের মুকুটরূপে শোভিত হয়, তাহাকে সেইজন্য চ্ছটা মুকুট-মণ্ডল কহে।

সচরাচর বাষ্পাবরণ অর্থে আপনার স্থিতি স্থাপকতা-বলে অবস্থিত ক্রম-বিন্যস্ত-স্তর-সমষ্টি-সঙ্কুল যে বাষ্পরাশি বুঝায়, চ্ছটা-মুকুট মণ্ডল সে অর্থে বাষ্পাবরণ নামে অভি-হিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বলবৎ যুক্তি দেখা যায়—

প্রথম, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবী অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক, সুতরাং পৃথিবীতে যে বস্তু যত ভারী সূর্য্যলোকে সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক ভার বলিয়া পৃথিবীর সকল বাষ্পই সূর্য্যলোকে ২৭ গুণ অধিক ভার যুক্ত হইবে।

কোন বাষ্পাবরণের উপর দিক হইতে নিম্নাভিমুখে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরিস্থ বাষ্পস্তরের চাপে নিম্নস্থ বাষ্প-স্তরের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন সহকারে তাহার ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধি হয়। জলজান বাষ্প হইতে লঘু কোন বাষ্প এখনো

আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই লঘুতম বাষ্পের সূর্য্য হইতে লক্ষ মাইল দূরে থাকিতে হইলে যেরূপ উষ্ণ অবস্থায় থাকা আবশ্যক, এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার যেরূপ লঘু হইবার সম্ভাবনা, চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল সেইরূপ অতি লঘু জল-জান বাষ্পের হইলেও সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে তাহার প্রত্যেক ৫ কিম্বা ১০ মাইল নিম্নে দ্বিগুণ ঘনত্ব হইত। কিন্তু চ্ছটামুকুট হইতে নিম্নে গমন-কালে এই পরিমাণ অনুসারে তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। এই নিয়মে ঘনত্ব বৃদ্ধি হইলে সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইত; এখন সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৪ ভাগের এক ভাগও নহে। সুতরাং কল্পনাতীত-লঘু-বাষ্প-পূর্ণ চ্ছটামণ্ডলকে আমরা বাষ্পাবরণ অর্থে বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয়—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০ মাইল গতিতে এই মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ইহার তিন লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে এই ধূমকেতু বাষ্পীভূত হওয়া দূরে থাক, ইহার গতির পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা যে সকল উল্কাপিণ্ডকে তারার মত খসিয়া পড়িতে দেখি, তাহাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ হইতে ৪০ মাইলের অধিক নহে। এই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি, ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ড, পৃথিবীর বাষ্পাবরণের সর্ব্বোপরি স্থিত অতি সূক্ষ্মতম বাষ্পস্তরের ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত মাইল নীচে আসিতেই ঘর্ষণে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে তিন শত পঞ্চাশ মাইল গতিতে ধাবিত কোন বস্তু, যে বাষ্পাবরণ মধ্য দিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতে পারে তাহার বাষ্প যে কত লঘু তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এই চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল যদি বাষ্পাবরণ নহে, তবে ইহা কি? সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্যালোক-প্রজ্বলিত অতি লঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন বাষ্পাণুরাশি। কিন্তু বাষ্পাণুনির্ম্মিত চ্ছটামণ্ডলের অণুরাশি কি প্রকারে চ্ছটামণ্ডলে রক্ষিত হইতে পারে, এই দুরূহ সমস্যার অদ্যাবধি স্থির উত্তর পাওয়া যায় না। এই অণুসকল যে একই স্থানে অবস্থিত নহে তাহা চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডলের ঘন ঘন আকৃতি-পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিশেষরূপ প্রমাণ হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণের সময় ডাক্তার গুল্ড তিন মিনিটের মধ্যেই ইহার আকারের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন। চ্ছটামুকুট সম্বন্ধে প্রচলিত মতের তিনটি এস্থানে সন্নিবেশ-যোগ্য।

প্রথম—সূর্য্যের অতি-নিকট সঞ্চারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড বাষ্পীভূত হইয়া লঘু মেঘ রূপে পরিণত হয় এবং সেই অতি লঘু মেঘই চ্ছটামুকুট।

দ্বিতীয়—সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল বৈদ্যুতিক তাড়ন-কার্য্য দ্বারা দূরে রক্ষিত হইতেছে।

তৃতীয়—সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল মাধ্যাকর্ষণ-বলে একবার সূর্য্যে ফিরিয়া

আসিতেছে, আবার ঝটিকা-বলে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবং বারম্বার এইরূপ উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ দ্বারাই ছটামুকুটের আকার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই তিনটিই কেবল অনুমান, ইহাদের সমর্থনকারী তেমন সারগর্ভ যুক্তি নাই।

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমনকালে সর্ব্বাগ্রে ছটামুকুটে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে বর্ণমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল হইতে আলোক-মণ্ডল এবং আলোক-মণ্ডল দিয়া অভ্যন্তরে উপনীত হইতে হয়।

সূর্য্যের নির্ম্মাণোপকরণ।

সূর্য্য যে সকল মৌলিক পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার সমস্ত আমাদের বিদিত পদার্থ নহে। রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যে জলজান, ম্যাগ্‌নেশিয়ম, ক্যালসিয়ম, সোডিয়ম, ম্যাংগানিস্, নিক্‌ল, ব্যারিয়ম, ষ্ট্রন্‌সিয়ম্, লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব বাষ্প ছাড়া অপর যে সকল বাষ্প দেখা যায় তাহা পৃথিবীতে নাই।

উপসংহার।

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার অগ্রে আর একটি কথা বলা উচিত। যে সূর্য্য সৌর জগতের প্রাণ-স্বরূপ যাহার সহিত মুহূর্ত্ত মাত্র সম্বন্ধ শূন্য হইলেও তৎক্ষণাৎ গ্রহ উপগ্রহদিগের প্রলয় নিশ্চিত, সেই অসীম বিক্রমশালী সূর্য্যের প্রভাব অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে কি না এই কথাটি বিজ্ঞান জগতের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে সঙ্কোচন নিয়মকে সূর্য্যের সম-পরিমাণ উত্তাপ রক্ষার কারণ মনে করেন, তাহা সত্য হইলে সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমরা সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ পাই সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকিরণ করে। এই উত্তাপ সমপরিমাণে বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফুট বা প্রত্যেক শতাব্দীতে ২ ক্রোশ করিয়া সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া এইরূপ উত্তাপ বিকিরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পরিমিতায়তন সূর্য্য কি কালে শীতল হইয়া যাইবে না!

উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল বা কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা এখনো অপরিজ্ঞাত, সেই জন্য কত দিন সূর্য্যের উত্তাপ এইরূপ সমভাবে থাকিবে তাহা নিশ্চয় গণনা করা যায় না। তবে উত্তাপরক্ষার জন্য সূর্য্যের যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক সেই সঙ্কোচন-পরিমাণের গণনা

কার অর্দ্ধেক হইয়া পড়িবে, এবং যদি সূর্য্যের অভ্যন্তর-দেশ এখনো কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ তখন কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে থাকিবে। এই নিয়মের বশে চলিলে সর্ব্বশুদ্ধ আর ১০০ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্তও সূর্য্য জীবন রক্ষার উপযোগী উত্তাপ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঈশ্বরের এই সৃষ্টি-রহস্যের তথ্য নির্ণয় করা আমাদের জ্ঞানের সাধ্য নহে। বিজ্ঞানালোকে প্রতিদিন আমাদের অজ্ঞান-অন্ধতা আরো সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এককালে যাহা অকাট্য স্থির করিয়াছেন, তাহার ভুল আবার পরবর্ত্তী জ্ঞানালোকে দূর হইয়াছে। এই মহান সৃষ্টি আমাদের নিকট কি গম্ভীর প্রহেলিকাময়। এ বিষয়ে আমরা

"Like an infant crying in the night,
Like an infant crying for the light,
With no other voice than a cry.

শিশুর ন্যায় অন্ধকারে রোদন করিতেছি—শিশুর ন্যায় আলোকের জন্য রোদন করিতেছি—রোদন ব্যতীত অন্য স্বর আমাদের নাই।

মহা পণ্ডিতগণ এবং নিতান্ত অজ্ঞ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এই সৃষ্টির জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল। একজন পাদরি একজন অসভ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই সকল বিশ্ব সংসার কে সৃষ্ট করিয়াছে" অসভ্য বলিল "আমার পিতা" পাদরি বলিলেন "তোমার যখন পিতা ছিলেন না তখন কি সৃষ্টি ছিল না ?"—তখন অসভ্য বলিল "তাহা আমি জানি না।"

আর এক জন বৃদ্ধ অসভ্য এই কথায় বলিল যে "হাঁ তাহার পূর্ব্বেও এই সৃষ্টি ছিল এবং স্রষ্টার নাম "জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য" (Interrogation and Admiration)

সেই অসভ্যের উত্তর কি সুন্দর! এই সমগ্র সৃষ্টি বাস্তবিক একটি জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য ছাড়া আমাদের নিকট আর কি ? তবে আমরা এই মাত্র নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হইবে।

সঙ্কোচন নিয়মানুসারে সূর্য্যের অতীত ব্যাস গণনা দ্বারা জানা যায়, ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য এখনকার অপেক্ষা দুই ক্রোশ ও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চার ক্রোশ বড় ছিল, এইরূপে এক সময় সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌর জগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

কাণ্ট ও লাপ্লাস সৌর জগতের গতির আশ্চর্য্য রূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া অবরোহী নিয়মানুসারে এই জগতের উৎপত্তির যে প্রণালী কল্পনা করিয়াছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আরোহী নিয়মানুসারেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দুই দিক হইতেই আমরা দেখিতে পাই আমাদের সূর্য্য এক সময়ে ঘূর্ণমান বিশাল গোলাকার জ্বলন্ত বাষ্পরাশিরূপে সমস্ত সৌর জগতে

ব্যাপ্ত ছিল। পরে সেই বাষ্পরাশির বিষুব-রেখাস্থ-অংশ কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্র এক একটি বাষ্পচক্ররূপে ক্রমে মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, পরিত্যক্ত চক্রগুলি আবার মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে এক একটি গ্রহরূপে ধার মধ্যের বৃহত্তর গোলকের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মধ্যের বৃহত্তর গোলকই দের সূর্য্য। সেই অতি বিস্তৃত সৌরজগৎব্যাপী বাষ্প যদি আদিম কাল হ নিয়মিতরূপে প্রতি শতাব্দিতে ২ ক্রোশ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং কোন অ জ্ঞাত নূতন শক্তি দ্বারাও সূর্য্যের উত্তাপ না রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূ বয়ঃক্রম এখন ১৮০০০০০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। তবে যদি সূর্য্য আ অবস্থায় এখনকার অপেক্ষা অল্পপরিমাণে উত্তাপ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা হ অল্পপরিমাণ সঙ্কোচনের আবশ্যকতা হেতু সূর্য্যের বয়ঃক্রম ১৮০০০০০০ বৎস কিছু অধিক হইবে এবং পূর্ব্বে যদি এখনকার অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ দিয়া থ তাহা হইলে সূর্য্য ১৮০০০০০০ বৎসর হইতেও ন্যূন বয়স্ক। অনেক দিন হইতে সম্বন্ধীয় আর একটি কথার আন্দোলন চলিতেছে। সূর্য্যের গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চ র্দ্দিকে ধাবমান সূর্য্য তেমনি আর কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে কি না? ক স্থির করিয়াছিলেন যে সূর্য্য সিরিয়স নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভ্রাম্য কিন্তু এই মত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক-অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ক্র এইরূপ প্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য পরিবারবর্গকে লইয়া হারকিউলিস রাশির ধাবিত।

গাজীপুরের পবহারী বাবা।

গাজীপুরে তিনটী প্রসিদ্ধ সার বস্তু আছে। মাদকের সার অহিফেন, সুগন্ধের আতর গোলাপ, আর মানুষের সার ভূগর্ভবাসী পরম প্রেমিক যোগী পবহারী বাব

আফিঙ্গের কুটীতে লক্ষ লক্ষ মন আফিং বর্ষে বর্ষে একত্রিত হয় এবং প্র সহস্র সহস্র লোক তাহা পদ দ্বারা দলন করিয়া কামানের গোলার মত বড় বড় পাকাইয়া চীন আসাম ব্রহ্ম বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এবং ভারতের সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে পরিবেশন করে। ইহাতে ব্রিটিশ রাজের বাৎসরিক প্রায় তিন কোটী আয়। এমন কোন্ নীতি উপদেশ আছে যাহা শুনাইলে রাজপুরুষদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া এই প্রচুর অর্থ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইবে? ঈশার নীতি, নীতি হার মানিয়াছে।

নের তিক্ত তীব্র গন্ধের পার্শ্বে গোলাপ আতরের মধুর আঘ্রাণ প্রবা- গাজিপুরের বাতাসকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। বসন্তকালে নির্ম্মল ীরণ সেবিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর যখন লক্ষ লক্ষ গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া শিশির লেবরে নব রবির অরুণে হাস্য করিতে থাকে কখন স্বর্গের দেব দেবীগণও া দেখিতে বাঞ্ছা করেন। শত মুদ্রায় বিক্রীত এক ভরি ঘনীভূত আতর যেমন গন্ধ ্যর সার, পবহারী বাবার যোগানন্দ রসে মগ্ন পবিত্র আত্মা তেমনি মনুষ্যত্বের সুবা- সুমিষ্ট সার পদার্থ। তাঁহারি কথা কিছু বিবৃত করা যাইতেছে।

বাবাজীর আশ্রম ভাগীরথী তটে, নগরের প্রান্ত ভাগে, এক ক্ষুদ্র পল্লীর অদূরে, মল শস্য পূর্ণ বিস্তৃত এবং উচ্চ ভূভাগের মধ্যে। তাহার চারিদিকে প্রমুক্ত ক্ষেত্র, রে প্রশস্ত আকাশ! এই আশ্রমবেষ্টিত চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু মণ্ডলে গুহাবাসী যোগীর দীর্ঘ ধি-সম্ভূত শান্তির পরিমল নিরন্তর যেন হিল্লোলিত হইতেছে। এখানে শ্বাস প্রশ্বাস করিলে যোগের সুঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার সন্ধ্যাকালীন নিস্তব্ধ কার অতীব নয়নস্নিগ্ধ সুশীতল এবং শান্তিপ্রদ, বিহঙ্গ কূজিত তরুকুঞ্জ বড় রমণীয়, কটস্থ পল্লীবাসী গ্রাম্যলোকদিগের ব্যবহার অতি সরল, এবং এস্থানের সিকতাময় গালিনী ভাগীরথীর দৃশ্য অতি মনোহর। যোগগন্ধামোদে এই তপোবনাশ্রমে কুটীর ন্তরস্থ এক গহ্বরে পবহারী বাবা বাস করেন।

পবন আহার করিয়া যাহার জীবিত থাকে তাহাদিগকে পবহারী বলে। ইনি সমা- ত সময়ে সময়ে মাসাধিক কাল বাহ্যক্রিয়া শূন্য হইয়া অচেতনবৎ অবস্থিতি ন; অন্য সময় জাগিয়া থাকেন, পানাহার করেন, মধ্যে মধ্যে দর্শকলোকদিগের কথা বার্ত্তা কহেন, কুটীর মধ্যে কতিপয় দেব মূর্ত্তি আছে বালকের ন্যায় তাহা- ক লইয়া খেলা করেন। সম্প্রতি প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কাহারও সঙ্গে দেখা না য়া একাকী গুহার মধ্যে ছিলেন, গত শ্রাবণ মাস হইতে আবার দেখা দিতে ম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, চির প্রসন্ন বদন দেখিলে, এবং গভীর ক্ত আধ্যাত্মিক মধুর বচনাবলী শুনিলে মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, মায়ার বন্ধন ছুটিয়া বাসনানল-দগ্ধ চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করে।

ই বর্ত্তমান যুগে একদিকে গভীরাত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যোগে সঞ্জীবিত মহৎ , আর এই বাবাজীর সমাহিত প্রেমিক-আত্মা সংসারসর্ব্বস্ব পার্থিব-ভোগ- ক্ত নর শরীরে অনন্ত সুখময় স্বর্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। বাস্ত- শরীর ধ্বংস হইলেও, ইন্দ্রিয় ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিলেও যে মনুষ্য ভগবান্‌কে কেমন নির্ভয়ে চিরশান্তিতে অবস্থান করিতে পারে, ইহাঁরা তাহার দৃষ্টান্ত।

বহারী বাবা যেন অগাধ জলের মীন। গুহাভ্যন্তরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া ই তাঁহার স্বভাব। মৎস্য যেমন এক একবার গভীর জল হইতে তটের নিকটে

আসিয়া খেলা করে, পৃথিবীর জীবজন্তু, সূর্য্যের আলোক দেখে, ইনিও তেমনি ভাবুক প্রেমিক ধর্ম্মপিপাসু লোকের সমাগম বার্ত্তা শুনিলে কুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক চৌকাঠের ভিতর এক একবার বসেন। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ, বর্ণ সুন্দর, মাথার কেশে এবং শ্মশ্রুতে ঝুঁটিবাঁধা, পরিধান কৌপীন এবং গাত্রাবরণ একখানি স্থূল ধোসা বা কম্বল। তাঁহার চক্ষু একটী মাত্র, কিন্তু তাহা নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়। কথা এবং ব্যবহারে সর্ব্বদা বিনয় শান্তি প্রেম বিরাজ করে। তিনি অন্যকে স্বামী, অপনাকে দাস বলিয়া সম্বোধন করেন। সংস্কৃত মিশ্র গ্রাম্য সুরের হিন্দি ভাষা এমনি মিষ্ট ভাবে বলেন, শুনিলে প্রাণ শীতল হয়, কর্ণে যেন তাহা শান্তিরস বর্ষণ করে। তিনি কঠোর তপস্বী নীরস গম্ভীর মূর্ত্তি সন্ন্যাসী নহেন, তিনি ভাবুক এবং প্রেমিক যোগী। রূপক চ্ছলে আধ্যাত্মিক যোগ ভক্তির এমন ব্যাখ্যা করেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত বড় আমোদিত হয়। সরল মধুর ভাবের সঙ্গে যোগ সমাধি, ভক্তি প্রীতির অভিজ্ঞতা মিশিয়া অতি সুন্দররূপে তাঁহার চরিত্রকে গঠন করিয়াছে। এখানকার শত টাকা মূল্যের এক ভরি গোলাবি আতরের যেমন গভীর সুগন্ধ, কাপড় ধোপারবাড়ী হইতে ধৌত হইয়া আসিলেও সে গন্ধ থাকে, পবহারী বাবার দেব চরিত্রের পবিত্র পরিমল তেমনি পিপাসু হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানুষ কত ভাল হইতে পারে, মানুষ অমৃত পানে কেমন সুখী হয় তাহার বিষয়ে ইনি একটী জীবন্ত নিদর্শন। কাহাকেও উপদেশ দেন না, কেবল উপদেশ শুনিতে চাহেন, কিন্তু সারবান প্রশ্নের আঘাত লাগিলে তাঁহার হৃদয় হইতে তত্ত্বসুধা আপনা হইতে বাহির হইয়া আইসে। সে তত্ত্বের মধ্যে সরল বালকের হাস্য কৌতুক, আমোদ রসিকতা যথেষ্ট থাকে। শাস্ত্র জ্ঞানও তাঁহার বেশ আছে, কিন্তু পঠিত বা মুখস্থ কথা বলিয়া গুরুর ব্যবসায় তিনি রক্ষা করেন না, জীবনের যোগ সম্ভোগের সহজ অথচ সারগর্ভ কথা বলেন।

বাবাজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে। তিনি গত ১৫।১৬ বৎসর হইতে ঐ আশ্রমে গুহার মধ্যে ধ্যান সমাধি সাধন করিয়া আসিতেছেন। স্পষ্ট করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে নিজের কোন কথা বলেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে বেশ বুঝিতে পারা যায়, দশ পনর দিন,মাসাধিক কাল ক্রমাগত অনাহারে তিনি সমাধিস্থ থাকেন। শারীরিক রোগ যন্ত্রণাও উপরোক্ত যোগপ্রথায় তিনি হ্যাপ্য করিয়াছেন। তিনি যোগানন্দ এবং রোগানন্দ উভয়ই ভোগ করেন। রোগ জন্মিলে তাহাকে কুটুম্ব সেবা বলিয়া উল্লেখ করেন। যে রোগের জ্বালায় আমাদের প্রাণ অস্থির হয়, একটু মাথা ধরিলে আমরা চক্ষে সরিষার ফুল দেখি, তাহা এই বাবাজীর প্রীতি আনন্দকে বর্দ্ধিত করে, ইহা বড় সহজ কথা নয়। তাহাতে বুঝা যায়, তিনি সিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

লোকসঙ্গ তিনি প্রায়ই করেন না, এই জন্য সাধারণ লোকের তাঁর প্রতি অতিশয়

ভক্তি, এবং এই কারণেই পণ্ডিত ভদ্র লোকদিগের আবার কিছু বিরক্তিও আছে। নির্জ্জনে নিরাপদে একাকী যোগ সম্ভোগ করা অবশ্য বর্ত্তমান কালের শিক্ষা বিরোধী, ইহা মানব স্বভাবের অননুমোদিতও বটে। কিন্তু ইহাঁর উপার্জ্জিত যোগমূলক শান্তি, তজ্জনিত নিবৃত্তি এবং তৃপ্তি, এবং তাহার ফলস্বরূপ বিনয় নিরহঙ্কার বড়ই প্রার্থনীয়। কর্ম্মযোগের সহিত যদি বর্ত্তমান কালের জ্ঞানী ও কর্ম্মীগণ ইহা মিলাইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ঘোর ব্যস্ততাময় সংসার-চঞ্চল-চিত্ত জীবের পক্ষে সময়ে সময়ে যোগ সমাধির শান্তি না থাকিলে জীবনভার বহন বড় কষ্টকর। গাজিপুরের অহিফেন মরফিয়া খাইয়া, ফুলেল তেল গায়ে মাখিয়া, মাথায় গোলাপ জল এবং বস্ত্রে আতর লাগাইয়া অনেকে আমোদিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা বাবাজীর যোগ সমাধি, বৈরাগ্য ভক্তি, প্রেম শান্তির মাধুর্য্য-রস কিছু পান করিয়া স্বর্গসুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হউন, মনুষ্যত্বের সার গ্রহণ করুন।

পথিক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গ্লিন ডাউয়ার। "আমি বলিতেছি—গভীর সমুদ্রের ভূত আমি ডাকিতে পারি"

হটস্পার। "কে না পারে? আমিও পারি, প্রত্যেক মানুষেই পারে। কিন্তু তুমি ডাকিলে তাহারা কি আসিবে"?

গ্লিন ডাউয়ার। 'আমি বলিতেছি—ভূতকে কি করিয়া আজ্ঞা করিতে হয় আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি"।

হটস্পার। "আর সত্য কথা বলিয়া কিরূপে ভূত তাড়াইতে হয় আমিও তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি। সত্য কথা বলিলেই ভূত লজ্জায় পলাইবে। যদি ভূতকে জাগাইতে তোমার ক্ষমতা থাকে—তাহাকে এখানে আন—আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি তাহাকে লজ্জা দিয়া এখান হইতে তাড়াইব। যতদিন বাঁচিয়া থাক সত্য কথা বল, আর ভূতকে লজ্জা দাও"?

আমরাও গ্লিন ডাওয়ারের মত অবিরত বৃথা গর্ব্ব দ্বারা ভূত ডাকিতেছি, কিন্তু তফাৎ এই, কেহ সত্য কথা বলিলে আমরা ভূত ছাড়া হই না। আমাদের ভূতের লজ্জা নাই।

যেখানে কম কাজ সেই খানেই বৃথা গর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেখিতেছি উল্টা। আমাদের যেমন লম্বা চৌড়া গর্ব্ব—তেমনি লম্বা চৌড়া কাজ। ছোট কাজের ভার আমরা বহিতে পারি না, বড় কাজের বেলুনের মধ্যে চড়িয়া সর্ব্বদা আপনাকে উড়াইয়া লইয়া চলি। আমরা নিজের কুসংস্কার দূর করিতে চাহি না, পরের কুসংস্কারের প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখি, নিজের ঘরের অজ্ঞানতা দূর করিতে আমাদের আদপে প্রয়াস নাই, পরের ঘরের অজ্ঞান তিমির দূর করিতে আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত! তাই কাজের ভিড় আমাদের বড় বেশী। একটি গল্প আছে একজনের বাগানের একটি গাছে অত্যন্ত মুকুল ধরিত, কিন্তু ফল কিছুই হইত না, ইহা দেখিয়া তাহার বন্ধু পরামর্শ দিলেন "গাছটির কতকগুলি শাখা কাটিয়া ফেল, মুকুল কম ধরিবে—কিন্তু সেই মুকুলে ফল ফলিবে। তাহাই হইল। আমাদেরও সেই দশা। আমাদের কাজ বড় বেশী রকম ফলাও হইয়া পড়িয়াছে—কিছু কমান আবশ্যক।

একজন ধোবার একটি গাধা ছিল। গাধা এক দিন তাহার গলার আলগা বাঁধা দড়ি খুলিয়া নদীর ধারে গিয়া পড়িল। নদীর কিনারায় একখানি জেলে-নৌকা ছিল, গাধা নদীতে জল খাইবার জন্য নৌকাখানিতে যেমন লাফাইয়া পড়িল—নৌকাখানি অমনি ভাসিয়া গেল। এইরূপে নৌকা ও গাধা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ত গঙ্গাযাত্রা করিলেন আর এদিকে ধোবা ও জেলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ করিল। ধোবা বলিল, "তোর দোষে আমার গাধা গেল, তুই কেন নৌকা অমন আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিলি" ?

জেলে বলিল—"তোর দোষে আমার নৌকা গেল, তোর গাধা আমার নৌকায় না চড়িলে ত আর আমার নৌকা যাইত না"।

এখন দোষ কার ? দোষ যাহারই হৌক—প্রত্যেকেই যদি আপনার দোষ বুঝিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করে—তাহা হইলে কাজ অনেক সোজা হইয়া আসে, কাজের বোঝাও হালকা হইয়া পড়ে। কিন্তু উল্লিখিত ধোবা ও গাধার মত আমরা কেহ নিজের দোষ দেখি না, কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করি মাত্র, তাই আমাদের কাজের কিছু অভাব নাই, কিন্তু কাজও কিছু হয় না।

সবাই বলে প্রাণের মত মূল্যবান বস্তু আর কিছু নাই। অথচ প্রাণটা লোকে যেমন কথায় কথায় দিয়া ফেলে—এমন অন্য কিছু ত দিতে দেখি না।

আমার একজন বন্ধু গল্প করিতেছিলেন তিনি একদিন একজনের কাছে চাঁদা চাহিতে গিয়াছিলেন; চাহিতেই সে ব্যক্তি উত্তর করিল "টাকা ত আর প্রাণ নয় যে চাহিলেই দিব।"

ঠিক কথা, মৃত্যুটা লোকে যেমন কঠিন ভাবে—আসলে তাহা নয়। আমরা যে বাঁচিয়া থাকি তাহা কেবল মরিবার আশায়।

সেণ্ট ফিলিপ নেরি রোমের রাস্তায় একজন যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বিনয়ী যুবক, আমাকে বল তুমি কেন রোমে আসিয়াছ?

যুবক। মহাশয়, আমি পণ্ডিত হইতে আসিয়াছি।

ফিলিপ। যখন তুমি পণ্ডিত হইবে তখন কি করিবে?

যুবক। আমি একজন পাদরি হইতে ইচ্ছা করি।

ফিলিপ। মনে কর তুমি হইলে—তাহার পর?

যুবক। তার পর আমি উচ্চ ক্যানন হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা তাহাই যেন হইলে? তারপর?

যুবক। তারপর? আমি একজন বিসপও হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা তাহাই হউক, তারপর?

যুবক। কার্ডিনেল তাহার অপেক্ষাও উচ্চ পদ—ওরূপ সৌভাগ্যও আমার হইতে পারে।

ফিলিপ। অনুমান কর তাহাই হইল, তারপর?

যুবক। কে বলিতে পারে—আমি একজন পোপই বা কেন না হইব?

ফিলিপ। বেশ—পোপের দণ্ড, লাল টুপি, আর ত্রিকোণ মুকুট ধারণ যেন করিলে, তারপর?

যু। এই পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বাসনা আর কিছু দেখিতেছি না। ঈশ্বর যতদিন এই পদমর্য্যাদা উপভোগ করিতে দিবেন তাহা করিয়া তাহার পর আমাকে মরিতে হইবে।"

তখন সেণ্ট নেরি বলিলেন—

What! must you die? fond
Youth! and at the best
But wish and hope and may be all the rest!
Take my advice—whatever may betide,
For that which must be, first of all provide,
Then think of that which may be, and indeed,
When well prepared who knows what may succeed?
But you may be as you are pleased to hope
Priest canon bishop, cardinal and pope.

সবাই বলে ধার করিও না। কিন্তু ধার না লইলে চলে কই; ধারে ধারেই ত সংসার চলিতেছে। ধার না লইয়া জগতে আসিবারই যো নাই। পিতা মাতার ধার লইয়া তবে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

এই ধার শোধের নিয়ম কিন্তু বড় চমৎকার, যাহার কাছ হইতে [illegible] ধার করে—তাহাকে আর সে ধার ফিরাইয়া দিতে হয় না, তাহাকে সুদের যদি কিছু অংশ দাও তবেই যথেষ্ট, তাহা না দিলেও চলে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যে ফাঁকি দিবে, তোমার যে ধার শুধিতে হইবে না তাহা নহে। ধার নিলেই অবশ্য শোধ দিতে হইবে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণরূপে তোমাকে শোধ দিতে হইবে—তবে যাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছ তাহাকে না দিয়া আর এক জনকে দিবে এইমাত্র। তোমার পিতার তুমি ঋণী—কিন্তু তুমি সুদে আসলে তোমার পুত্রকে তাহা ফিরাইয়া দিলে। তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন সেই প্রেমের উত্তেজনায় জগতের কাজ করিয়া তুমি তাঁহার ধার শোধ দিলে। যে রাজা এক রাজার নিকট জেতেন—তিনি অন্য রাজার নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার শোধ দেন। এক দেশের ঐশ্বর্য্য লইয়া অন্য দেশ আর এক দেশকে বড় করে। এইরূপে আমরা ধার দিয়া শোধ দিই, শোধ দিয়া ধার দিই। কিন্তু লইবার সময় মনে করি না, ধার লইলাম, ফিরাইবার সময় ভাবি—ধার দিলাম। সেই জন্যই পৃথিবীতে এত নিরাশা! সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া দেখিলে নিরাশ হইতে হয় না, সংসারের নিয়মই এই যে, যে ধার দেয় সে শোধ পায় না, পায় আর একজন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়াই ধার দেওয়া ভাল। তাহা হইলে নিরাশ হইতে হয় না।

সমালোচনা। ×

বিজ্ঞান প্রবেশ—অধ্যাপক হক্‌স্‌লি প্রণীত ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

এই পুস্তক খানিতে পদার্থ বিদ্যার সহজ বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে; ও তৎসঙ্গে রসায়ন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাদিরও কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা কতক উপকারে আসিতে পারে। আর উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পড়িলে ইহা হইতে স্কুলের বালকদিগেরও উপকার দর্শিতে পারে। অধ্যাপক হক্‌স্‌লি ইংলণ্ডীয় লোকদিগের জন্য পুস্তকখানি লেখেন—সেখানে উহা পড়াইবার লোক ও উহাতে বিবৃত বিষয়গুলি বোধগম্য করিবার যন্ত্রাদি সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদক মহাশয়েরই মত এই যে "অস্মদ্দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নাই বলিলেই

হয়”—সুতরাং ‘অস্মদ্দেশীয় দরিদ্র বঙ্গ-বিদ্যালয়ে’ উহা হইতে কতটা উপকার দর্শিবে তাহা বলা সুকঠিন। পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় আল্বুমেন, জিলাটিন, সেলুলোজ, সিলিকা, ফাইব্রিণ, সিন্টোনিন, ষ্টার্চ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে। জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল জিনিষ চক্ষুগোচর না হইলে—এমন কি ষ্টার্চ প্রভৃতির ছবিটী পর্য্যন্ত না দেখিলে—পাঠকের কতখানি জ্ঞানলাভ হইবে ?

কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ভাষাও সকল স্থানে বিশুদ্ধ হয় নাই। ২৩ পৃষ্ঠায় ‘তুই আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে’ ... ... এই স্থলে তুইটী পরস্পর আকর্ষণকারী বস্তু বলিলে বোধ হয় ঠিক হইত। একস্থলে তিনি ‘পরাক্রমশালী কলে’র উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ‘The Omnipotent dollar’ এই কথাটী স্মরণ হইল।

“জলের তুলনায় লৌহ, সীসা, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুর আপেক্ষিক গাঢ়তা বা গুরুত্ব নিরূপিত হওয়াতে বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে নানাবিধ ধাতুনির্ম্মিত ওজন নির্ম্মিত হইয়াছে, আধারের আয়তন-বৃদ্ধি করিয়া জল অপেক্ষা গুরুভার বস্তু অক্লেশে সমুদ্রের উপর দিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইবার উপায় বাহির হইয়াছে” ... ... বিজ্ঞানের এইরূপ সংক্ষিপ্ততার পাঠ করিয়া পল্লীগ্রামের অনেক গুরু মহাশয়ের চক্ষু নিঃস্পন্দ হইয়া আসিবে বলিয়া আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে। কথাগুলি আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলিলে ভাল হইত।

“৩৯° তাপাংশ অপেক্ষা শীতলতর জল ৩৯° তাপাংশের জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে উঠিয়া ক্রমশঃ বরফ হইয়া কঠিন হয়, কিন্তু নিম্নের জল জমিতে পারে না।” হ্রদাদির পক্ষে কথাটী নিম্নলিখিত প্রকারে বলিলে ঠিক হইত—

‘৩৯° তাপাংশ অপেক্ষা শীতলতর জল ৩৯° তাপাংশের জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া নিম্নে নামিতে পারে না, উপরে থাকিয়া ক্রমশঃ বরফ হইয়া কঠিন হয় ; আর নিম্নের ৩৯° তাপাংশে থাকে বলিয়া জমিতে পারে না’।

বিজ্ঞানের উপর নীতির ভিত্তি কিরূপ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইতে পারে গ্রন্থের পরিশিষ্টে অনুবাদক তাহা দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তুঃখের বিষয় শারীর বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান বড় অধিক বলিয়া বোধ হয় না ; তাঁহার জানা উচিত যে প্রাণীর পক্ষে অণ্ড যাহা, উদ্ভিদের পক্ষে বীজ তাহা নহে। উদ্ভিদেও অণ্ড জন্মিয়া থাকে আর তাহা হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়। যাহা হউক পুস্তকখানি পাঠ করিলে—বিশেষতঃ উপযুক্ত কোন শিক্ষকের সাহায্যে পাঠ করিলে—লোকের যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক পরিমাণ জ্ঞানলাভ হইবে সে বিষয়ে আমাদিগের দ্বিবাক্য নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও বিশুদ্ধ করিবেন এবং সুবিধা মত স্থলে স্থলে চিত্র সংযোজিত করিয়া দিবেন।

শ্রী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্রোহ।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহার বিকালে আর জলাশয়ের দিকে যাইত না বটে, কিন্তু প্রত্যূষে প্রায়ই নদীতে স্নান করিতে যাইত। রাজাকে দেখিবার এই তাহার সময় ও সুবিধা। অত ভোরে ক্ষেতিয়া প্রায়ই আসে না, কোন কোন দিন আসিলেও তাহাকে ভয়ের কারণ নাই, কেননা সুহার ত মন্দির-ঘাটে স্নান করে না। সে যে আঘাটার নামে, মন্দির ঘাট হইতে তাহা অনেকটা তফাতে। ইহার উপর আবার রাজাকে দূর হইতে মন্দিরঘাটে নামিতে দেখিলেই সুহার অমনি নদী হইতে উঠিয়া পড়ে। এমন কি সুহার এ বিষয়ে এতই সাবধান যে রাজা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না সুহার প্রতি দিন তাঁহার এত নিকটে আসে। এ অবস্থায় লোককে তাহার কি ভয়? লোকে কি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুঝিবে রাজাকে মুহূর্ত্তের দর্শনের জন্যই সে রোজ নদীতে স্নান করিতে আসে, লোকে বরঞ্চ ভাবিবে রাজাকে সে দেখিতে চাহে না নহিলে তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই কেন সে ঘাট হইতে উঠিয়া পড়ে।

বালিকার 'লোক' আর কেহই নাই, এক ক্ষেতিয়া। সে জানে একমাত্র ক্ষেতিয়ার লক্ষ্যের উপরেই সে রহিয়াছে, তাহার লক্ষ্য এড়াইলেই সে সংসারের লক্ষ্য এড়াইল, সুতরাং ক্ষেতিয়াকে ভুল বুঝানই তাহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য তাহার সফলও হইয়াছিল; সত্যই বালিকার এই সতর্কতায় ক্ষেতিয়া ফাঁকিতে পড়িয়াছিল। রাজাকে দেখিলে সুহার যতই পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, ক্ষেতিয়া মনে মনে ততই আহ্লাদিত হইত, সে ভাবিত নিশ্চয়ই ঔষধের গুণ ধরিয়াছে। সুহার ইহাতে জিতিয়াছিল, কিন্তু একটি সে বড় ভুল করিয়াছিল—সে যে মনে করিত সংসারে একমাত্র ক্ষেতিয়া ছাড়া তাহাকে আর কেহ লক্ষ্য করে না তাহা ঠিক নহে, আরও এক জন প্রতিদিন তাহার নদীতীরে আগমন লক্ষ্য করিতেন, ইনি হরিদাচার্য্য। সেই জন্যই তিনি রাণীকে প্রাতঃকালে তাঁহার মন্দিরে আসিতে বলিয়াছিলেন।

পুরোহিত সে দিন অন্য দিন অপেক্ষাও প্রত্যূষে স্নানে গমন করিলেন, কিন্তু মন্দিরঘাটের পরিবর্ত্তে সুহার যে আঘাটায় নামিত সেইখানে নামিলেন। সুহার যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার স্নান পূজা শেষ হইয়াছে, তিনি কেবল সুহারের জন্যই তখনো নদী হইতে উঠেন নাই। তাহাকে দেখিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন "মা তুমি মন্দিরের এত নিকট স্নান করিতে এস, কই একদিনও ত দেব দর্শনে যাওনা"?

বালিকা একটু জড় সড় হইয়া পড়িল, কোন উত্তর করিল না, কিন্তু হরিতাচার্য্যের

সেই প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই করুণ স্নেহের স্বর তাহার হৃদয়ে একটা ভক্তির ভাব সঞ্চারিত করিল। হরিদাচার্য্যও তাহাকে এত নিকটে পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহার সেই সরল সুন্দর বালিকা মূর্ত্তি দেখিয়া একটি অতি সুকোমল স্নেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি আবার বলিলেন "আজ একবার মন্দিরে তোমাকে যাইতেই হইবে। সেখানে দেব প্রণাম করিবে, আর দেবী দর্শনও পাইবে। এস মা আমার সঙ্গে"।

বালিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"স্নান না করিয়া দেব প্রণাম করিব ?

হরিদাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন "তাহাতে ক্ষতি নাই, দেবতাগণ সকল সময়েই প্রণম্য"।

বালিকা তখন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ভীল পালিত বলিয়া হিন্দুর দেব ভক্তি হইতে তাহার হৃদয় বঞ্চিত হয় নাই। কেন না ক্ষত্রিয়দিগের সংসর্গে আসিয়া ভীলগণ নিজেই ক্ষত্রিয়দিগের দেবতাকে মাননা করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মাননা ও সুহারের ভক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব হইতে উত্থিত হইত। নদীতীরে আসিয়া মহাদেবের স্তব শুনিলে ক্ষেতিয়া বলিত—"সুহার—ঐ মন্দিরের দেবতা বড় মস্ত দেবতা, শাল গাছেরই মতন, কিন্তু পাঁটা বলি নেয় না, এইটিতেই কেমন লাগে, তা নাই নিক—প্রণাম হই—আজ যেন মোর শীকার মেলে।"

কিন্তু সুহারের কর্ণে যখন দেববন্দনা আরতিধ্বনি প্রবেশ করিত, তাহার হৃদয় রোমাঞ্চিত ভক্তিদ্রব হইয়া উঠিত, তখন কোন প্রার্থনা কোন ভিক্ষা তাহার মনে উদিত হইত না, এক প্রেমময় দেবতার স্পর্শ সে শুধু অনুভব করিত, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দমাত্র তাহার হৃদয় অধিকার করিত। পরে অনেক সময় সে সেই দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত, তাঁহাকে পূজা করিত, তাঁহাকে মনের কথা কহিত, কিন্তু দূর হইতে মন্দিরের উথলিত বন্দনা গীতি শুনিলে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পরিপূর্ণ হইত, তাহার দেবতার সহিত তাহার নিজের সহিত কোন স্বাতন্ত্র্য যেন আর বুঝিতে পারিত না, সমস্তই একটা গভীর আনন্দে মাত্র একাকার হইয়া যাইত। সে যখন পুরোহিতের অনুগামী হইল, তখন তাহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, দূর হইতে যাঁহার বন্দনা গীত শুনিয়া হৃদয় সার্থক করে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবে, তাঁহার মন্দিরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার বন্দনা শুনিয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিবে, এরূপ সৌভাগ্য সে কখনো কল্পনাও করে নাই। সে ভক্তি-উথলিত হৃদয়ে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল, পুরোহিত পূজার আরতি আরম্ভ করিলেন—ধূপ ধুনার গন্ধ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে স্তোত্র ধ্বনি উঠিতে লাগিল, মন্দির সুগন্ধে, সুরবে, সুমঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সুহার সেই প্রস্তর মহাদেবের মধ্যে অনন্ত জগতের অনন্ত মঙ্গল আত্মা প্রত্যক্ষ করিল, কতক্ষণ আরতি হইল সুহার জানে না, সে যখন প্রণাম করিয়া উঠিল, দেখিল মন্দির নিস্তব্ধ। সে উঠিয়া মন্দিরের দ্বারের

দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহার পর হঠাৎ দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, বলিয়াছিলেন যে দেবী দর্শনও পাইব ?"

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"হাঁ বৎসে, এইবার পাইবে" ?

মহিষী পাশের ঘরে বসিয়াই আরতির সময় দেব প্রণাম করিয়াছিলেন; তিনি আর এ ঘরে আসেন নাই, সুহারকে সঙ্গে লইয়া হরিতাচার্য্য সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালিকা বিস্ময় দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল এক জীবন্ত সৌন্দর্য্য প্রতিমা ! ইনি কোন্ দেবী ! বালিকা ত্রস্তে তাঁহার নিকট প্রণত হইল। হরিতাচার্য্য বলিলেন—"বৎসে ইনি ইদরের রাণী মহারাজ গ্রহাদিত্যের মহিষী "তোমরা দুজনে কথাবার্ত্তা কও," আমি অন্য গৃহে যাই"।

বলিয়া হরিতাচার্য্য চলিয়া গেলেন। বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বালিকা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহারকে ভীত দেখিয়া রাণী কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"ব'স ভদ্রে ব'স, রাণী শুনিয়া ভয় পাইও না, আমাকে বোন বলিয়া মনে জানিও"।

রাণী বিস্মিত সুহারের হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কিন্তু রাণীর সেই সাদর ব্যবহারে সাদর বাক্যে সুহার আরো যেন ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার সুন্দর মুখখানি সভয়ে বিস্ময়ে বড় সুন্দর হইয়া উঠিল, তাহার সুগঠিত তনুদেহে, মধুর সুশ্রী মুখে লজ্জাবতী লতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। রাণী তাহার দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেলেন সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী, ভুলিয়া গেলেন সেই তাঁহার কষ্ট দুঃখের কারণ। তাহার সেই ভয়-সঙ্কুচিত মুখে তাহার বালিকা হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রেম রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত দেখিলেন, রাগ দ্বেষের পরিবর্ত্তে একটা কোমল কৌতূহলে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ইহারি মত বয়সে, এইরূপ প্রথম যৌবনে তিনি যে ইহারি মত প্রেমের সর্ব্বাঙ্গ বিকশিত ছবির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন,এই বালিকাতে সেই ছবিই তিনি দেখিতে লাগিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগিনি, তোমার নাম কি ?"

সুহারের নাম যে তিনি জানিতেন না তাহা নহে—তবে এ জিজ্ঞাসা কেবল কথা আরম্ভ করিবার একটা উপায় মাত্র। সুহার আস্তে আস্তে বলিল—"সুহার"

রাণী বলিলেন—"সুহার ? কিসের ? অবশ্য ফুলেরি হইবে—নহিলে নামটি খাটে না। হারটি হৃদয়ে রাখিবারই যোগ্য। তবে কি জান ভাই, ফুল যে তাহার হার না হইয়া ফুল থাকাই ভাল। ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটিয়া গন্ধ বিকীর্ণ করে ততক্ষণই তাহার সুখ—ততক্ষণই তাহার আদর। হার হইয়া যদি একবার মানুষের গলায় পড়িল—ত অমনি ম্লান হইয়া গেল। মানুষ কি ভাই ফুলের মর্য্যাদা বোঝে" ?

বালিকা লাল হইয়া উঠিল। রাণী আবার হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষতঃ রাজা রাজড়াদের কাছে ফুলের আদর নেহাৎ কম। ফুল পাইলে ছিঁড়িয়াই তাঁদের আমোদ। সোনার হার কি পাথরের হার হইলেই তাঁদের কাছে টেঁকে। তোমাকে যখন বোন বলিয়াছি—তখন আর লুকাইব কেন—এই যে আমাকে দেখিতেছ—একদিন কত যত্ন করিয়া রাজা গলায় পরিয়াছিলেন, আজ টানিয়া দূরে ফেলিয়াছেন"—

বালিকা কাঁপিয়া উঠিল—ভাবিল এত কথা সমস্ত তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। রাণী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তবে কি না আমি সোণার হার—স্বর্ণে কলঙ্ক নাই—স্বর্ণ ম্লান হয় না—তাই ফেলিয়া দিলেও আমি নিজের গৌরবে নিজে আছি—কিন্তু তুমি যেরূপ ফুলটি তোমার উপর যদি রাজার হাত পড়িত—ত এক-বারেই মলিন হইয়া যাইতে।"

বালিকার গোলমুখ নত হইল—ঠোঁট সুস্পষ্ট কাঁপিতে লাগিল। রাণী বলিলেন—"বুঝিয়াছি—তুমি বলিতেছ—গলায় থাকিয়া শুকাইতেও কি সুখ নাই? আছে, যদি গলায় থাকা যায়। কিন্তু কণ্ঠে উঠিয়া আবার যদি সেখান হইতে মাটীতে পড়িতে হয় ত তাহার চেয়ে কি আর দুঃখ আছে? তুমি ভাবিতেছ তা কি কেউ ফেলিতে পারে? পারে না? আমি ত একদিন গলায় ছিলাম—তবে আমার এ দশা কেন"?

বালিকার নত চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, কিন্তু পড়িল না,—তাই রাণী দেখিতে পাইলেন না—তিনি বলিলেন—"তবে আমি ত বলিয়াছি—আমি সোনার হার অর্থাৎ আমি বিবাহিত। কিন্তু মনে কর তোমাকে যদি কেহ ভাল বাসিয়া গলার হার করিতে চায় অথচ বিবাহ না—

বালিকা আর পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাণী দেখিলেন তাহার মনে আঘাত দিয়াছেন, ওরূপ করিয়া বলিয়া ভাল করেন নাই, রাণী ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—

"আমার কথায় কি তোমাকে কষ্ট দিতেছি বোন! যদি আমার হৃদয় দেখিতে ত বুঝিতে কষ্ট দিবার ইচ্ছায় আমি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি না। তোমাকে কষ্টের পথ হইতে দূরে রাখাই আমার ইচ্ছা। তোমার অন্ধ নয়ন মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার সঙ্কল্প। ভগিনি, আমি জানি তুমি কাহাকে ভালবাস, কিন্তু তুমি যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিবে না তাহা হয়ত তুমি জান না, তাঁহার সংস্রবে কেবল তোমাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব যে নাম সেই নাম কলঙ্কিত হইতেছে"—

বালিকা কাঁদিয়া রাণীর হাত ধরিল। হাত ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল—"দেবি—সত্যই কি তবে আমি কলঙ্কের পথে যাইতেছি? তাঁহার—তাঁহার ভালবাসা কি সত্যই অপমান? ক্ষেতিয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু আপনিও যে উহা বলিতেছেন!"

রাণী আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহারও নেত্র জল-পূর্ণ হইল। বালিকা আবার বলিল "দেবি—সত্যই আমি ভালবাসি। নিজের অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমার গৌরবকে আমার ধর্ম্মকে তাঁহা হইতেও অধিক ভালবাসি, এ গৌরব বিনষ্ট হইলে আমার পিতা মাতার অপমান হইবে—আমার অন্তর-দেবতার অপমান হইবে—আরো আরো আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব—যাঁহাকে আমি ভালবাসি তাঁহারও অপমান হইবে, এ গৌরব নষ্ট হইলে আমি তাঁহাকে ভালবাসিতেও অধিকারী নহি। আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিব না"।

রাণী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—দুই জনে দুই জনের হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় হরিতাচার্য্য আসিয়া বলিলেন, "বৎসেরা মহারাজের স্নানে আসিবার সময় হইয়াছে।"

গানের স্বর-লিপি।

ইতিপূর্ব্বে "বালকে" যে স্বর লিপি প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে আমরা পুনর্ব্বার ভারতীতে গানের স্বর-লিপি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

স্বর।

১। আমাদিগের সঙ্গীতে তিন সপ্তকের অধিক স্বর ব্যবহার হয় না। মন্দ্র, মধ্য, তার,—এই তিন সপ্তক। মন্দ্র অর্থাৎ খাদ সপ্তক বুঝাইবার জন্য স্বরের নীচে ছোট কশি এবং তার অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক বুঝাইবার জন্য স্বরের মাথায় ছোট কশি চিহ্ন দেওয়া যাইবে। মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন নাই। যথা :—

স̲ র̲ গ̲ ম̲ প̲ ধ̲ ন̲ স র গ ম প ধ ন স̅ র̅ গ̅ ম̅ প̅ ধ̅ ন̅

২। সা, রি, গা, মা, পা ধা নি এই শুদ্ধ স্বর গুলি লিখিবার সময় উহাদের আ-কার, ই-কার বাদ দিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু উহাদের কোমল স্বর বুঝাইতে হইলে অক্ষর গুলিতে ও-কার যোগ করিতে হইবে এবং উহাদের তীব্র অর্থাৎ কড়ি বুঝাইতে হইলে ই-কার যোগ করিতে হইবে। যথা :—শুদ্ধ রিখাব=র ; কোমল রিখাব=রো ; শুদ্ধ মধ্যম=ম, কড়ি মধ্যম=মি।

তাল।

১। গান মাত্রেই কতকগুলি তালের ঝোঁক্ আছে—এই প্রত্যেক তাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক তালের অধিকার মধ্যে যে কএকটি করিয়া মাত্রা থাকে তাহা সুরের পাশে পাশে বসাইয়া এক একটা দাঁড়ি দেওয়া যাইবে। মাত্রার পরিমাণ সংখ্যা-দ্বারা নিরূপিত হইবে। এইরূপে তাল-বিভাগ কিম্বা পদ-বিভাগ করা হয় যথা :—

১	+	৩	০	১	+	৩	০
র১ গ১	স১—র১	স১ ম১	গ ২	গ১ গ১	ম ২	প১ প১	প ২ ‖
ক ত	কা-	ল প	রে-	ব ল	ভা-	র ত	রে- ‖

"কত কাল্ পরে বল ভারত রে" এই পদটি তালের ঝোঁক অনুসারে দাঁড়ির দ্বারা আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ উহাতে ৮টি তালের ঝোঁক আছে—এবং উক্ত প্রত্যেক বিভাগ বা তাল দুইটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া আছে।

২। সুরের মাত্রা সংখ্যা অনুসারে সুরের স্থায়িত্ব-কাল নিরূপিত হয়। যথা :
স১ ;—ইহাতে শুদ্ধ সা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত সুরটি স্থায়ী।

স২ ;—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর এক আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে যথা সা—আ।

স৩ ;—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর দুই আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা—সা—আ—আ। ইত্যাদি।

আবার এক মাত্রার মধ্যে যদি দুইবার সা উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে প্রত্যেক সা অর্দ্ধ মাত্রিক হয় ; যথা স স১। এক মাত্রার মধ্যে যদি চারিবার সা উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে ঐ প্রত্যেক সা সিকি-মাত্রিক হয়। যথা স স স স১। ইত্যাদি।

৩। কোন মাত্রা চিহ্নিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুরে কিম্বা সুর গুলিতে যদি মাত্রা চিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মাত্রা চিহ্নিত সুরের মাত্রা-কাল মধ্যেই ঐ সুর গুলি উচ্চারিত হইবে। যথা, স র গ ম প১—অর্থাৎ এক মাত্রা কাল মধ্যেই স র গ ম প উচ্চারিত হইবে।

৪। আরও বিশেষ করিয়া তাল দেখাইতে হইলে সম, ফাঁক, প্রথম তাল দ্বিতীয় তাল ইত্যাদি চিহ্নিত করা আবশ্যক।

সমের চিহ্ন +, ফাঁকের চিহ্ন ০, এবং ১ তাল ২ তাল প্রভৃতির সংখ্যা সুরের মাথার উপরে যেরূপে দিতে হইবে তাহা "কত কাল পরে" এই সুরের স্বর-লিপিতে উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। দ্রুত, অতিদ্রুত, বিলম্বিত, মধ্য প্রভৃতি লয় সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে হইলে মাত্রামান যন্ত্রের কালাঙ্ক প্রত্যেক গানের শিরোভাগে লিখিতে হইবে।

৬। অস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ প্রভৃতি গানের প্রত্যেক কলি শেষ হইলে দুইটি ছেদ দিতে হইবে এবং একেবারে গান শেষ হইলে তিনটি ছেদ দেওয়া যাইবে।

অলঙ্কার ও ভাব-প্রকাশ।

১। যখন দুই কিম্বা ততোধিক স্বর সংলগ্ন ভাবে অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় তখন তাহাদিগের মধ্যে হাইফেন-চিহ্ন দিতে হইবে। যথা স^{১}–র^{২}–গ^{৩}–ম^{৪}।

২। যখন দুই কিম্বা ততোধিক স্বরের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম অংশ সকল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হয় (যাহাকে মীড় বলে) তখন তাহাদিগের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটি কশি দিতে হইবে। যথা স^{১} = র^{২} = গ^{৩}।

৩। গমক কিম্বা কম্পন প্রকাশ করিতে হইলে স্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বিন্দু চিহ্ন দিবে যথা স: র: গ:।

৪। প্রধান স্বরের সহিত আনুসঙ্গিক ক্রমে যখন একটি কিম্বা ততোধিক অত্যল্পকাল স্থায়ী স্বরকে স্পর্শ মাত্র করা হয় তখন সেই স্বর কিম্বা স্বরগুলিকে প্রধান স্বরের গায়ে ছোট অক্ষরে লেখা হয়। এই স্বরগুলিকে ভূষিকা বলে; ভূষিকাতে কোন মাত্রা থাকে না, এত অল্পকাল স্থায়ী যে তাহার মাত্রার পরিমাণ হয় না। যথা:—

স র গা^{১} $^{গ ম}$ পা^{১} ।

পুনরাবৃত্তি।

১। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন [ ] ব্রাকেট্।

২। এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিবার সময় গানের কোন দুই অংশ পরিবর্ত্ত ক্রমে একটার পর আর একটা প্রকাশ করিতে হইলে ( ) বন্ধনী চিহ্ন প্রয়োগ করিতে হইবে।

মোটা মুটি চিহ্ন গুলির উল্লেখ করা গেল—এক্ষণে গানের দৃষ্টান্ত সহযোগে আবশ্যক মতে অন্যান্য চিহ্নের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাণ্টের মতে পারমার্থিক সত্য তিনটি—(১) ঈশ্বর, (২) মুক্তি (Freedom), (৩) আত্মার অমরত্ব। কাণ্ট তাঁহার প্রথম গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের জ্ঞানের অতীত। সে গ্রন্থের নাম বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অবলম্বনীয়। এ গ্রন্থের নাম ব্যাবহারিক জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কাণ্ট একবার এককথা না বলিয়া দুইবার দুই কথা বলিলেন কেন—এই প্রহেলিকাটির ভিতর তলাইতে হইলে তাঁহার মূলগত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টি অতীব সহজ; আর, সহজ বলিয়াই তাহা পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সহজ সত্য তো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়—তাহার জন্য আবার দর্শনের প্রয়োজন কি? দর্শনের কাজই এই যে, দর্শন আমাদিগকে জটিল সত্য বুঝাইয়া দিবে। ইহাঁদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রথম পঁইটা গুলি অতীব সহজ; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ যদি এক লম্ফে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে যা'ন, তবে তিনি তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না;—ইতর ভাষায় যাহাকে বলে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি" তাঁহার আশার দশা সেইরূপ হয়। অতএব কাণ্টের দর্শন রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; অভিপ্রায়টি অতীব সরল এবং পরিষ্কার—তাহার মধ্যে কূট-কচালিয়া কিছুই নাই, তাহা এই;—বাস্তবিক সত্যই অন্বেষ্য বিষয়। মনে কর যেন বাস্তবিক সত্য আমি মুষ্টি মধ্যে পাইয়াছি,—তবে তাহা কি সত্য-সত্যই বাস্তবিক, না কেবল আমার নিকটেই বাস্তবিক বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্যের, এক কথায় পারমার্থিক সত্যের, প্রমাণাভাব; তাই বলি যে, পারমার্থিক সত্যের সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথার উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বাস্তবিক সত্য কতদূর প্রামাণিক তাহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যা'ক্। বিজ্ঞান তো বাস্তবিক সত্য অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছে—বিজ্ঞান তো দিন দিনই বাস্তবিক সত্যের পথে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে; বিজ্ঞান সত্যের যতখানি প্রদেশ জয় করিয়াছে, তাহা তো বিলক্ষণই সুনিশ্চিত—তাহা তো বাস্তবিকই সত্য। আর এক দিকে দেখা যায় যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মূলে এমনি কতকগুলি প্রবল সত্য আছে যে, সেগুলি যদি অবাস্তবিক হয় তবে মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই বৃথা পণ্ডশ্রম

হইয়া যায়। বাস্তবিক সত্যকে যে, কোন্ পথে অন্বেষণ করিতে হইবে—সমগ্র সভ্য-সমাজ তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। সভ্য সমাজকে জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এবং নৈতিক মূলতত্ত্ব এ দুইটি বিষয় যদি বাস্তবিক না হয়, তবে বিজ্ঞান মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—সভ্যতা মিথ্যা। বিজ্ঞানের সত্য এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সত্য—এ দুয়ের বাস্তবিকতার উপরে সভ্য-সমাজের ভরপুর বিশ্বাস; মুখের বিশ্বাস নহে কিন্তু কাজের বিশ্বাস। সভ্যসমাজ ওদুয়ের বাস্তবিকতার উপরে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি কার্য্য-কালে তাহার উপরে একান্তঃকরণে নির্ভর করে। মুখে যদিও কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞান কিছুই নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুই নহে; কিন্তু কাজের সময়ে তাঁহাকে অগত্যা বিজ্ঞানের উপরেও নির্ভর করিতে হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপরেও নির্ভর করিতে হয়; কেননা, তাহা না করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়; দেখিয়া না শিখিলে তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। বিজ্ঞানকে অমান্য করিয়া যিনি জাহাজ চালাইতে যা'ন তিনি গম্যস্থান হইতে বিচ্যুত হ'ন; কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া যিনি সংসার নির্ব্বাহ করিতে যা'ন তিনি পুরুষার্থ হইতে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হইতে—বিচ্যুত হ'ন। সভ্য সমাজে তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারৎপক্ষে কেহই বিজ্ঞানকেও অবহেলা করে না, কর্ত্তব্য-জ্ঞানকেও অবহেলা করে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য পারৎপক্ষে সকলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে—কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সৎলোকের পরামর্শ গ্রহণ করে! কাণ্টের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে তজ্জন্য শূন্যে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন করে না; মনুষ্য-সমাজের বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ-কার্য্যের গোড়াপত্তন করা বিধেয়। কেননা, সত্য সত্যই লোকে যাহাকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করে, ও তাহার উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট পথে সত্য সত্যই অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কতটুকু আছে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য অন্বেষণ করিতে যাওয়া না যাওয়া পরের কথা; প্রথম উদ্যমেই তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করা শোভা পায় না; কেন না তাহা করিলে উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা করা হয়।

এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই ইন্দ্রিয়ের অবভাস এবং জ্ঞানের সত্য এই দুয়ের মধ্যে—(বৈদান্তিক ভাষায়) অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে—প্রভেদ নিরূপণ করিলেন। পশুদিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন শব্দ স্পর্শাদি দেশকালে প্রতিভাত হয়—মনুষ্যেরও সেইরূপ; কিন্তু মনুষ্য দেশকালের আবির্ভাব-মাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহার মধ্য হইতে সত্য বাহির করিবার চেষ্টা

ন্যায় অবিদ্যার সাগর-গর্ভ্ত হইতে বিদ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিদ্যার সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই যে যেমন তেমন সত্য হইলে চলিবে না, তাহা সুনিশ্চিত হওয়া চাই—তবেই তাহাকে বাস্তবিক সত্য বলিব। একটা জন্তু যদি তোমার বুদ্ধিতে সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার বুদ্ধিতে মৎস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর এক জনের বুদ্ধিতে কীট বলিয়া প্রতীনমান হয়, তবে বাস্তবিক তাহা যে কি—তাহা বলিতে পারা সুকঠিন; কিন্তু যাহা সকলের বুদ্ধিতেই সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তাহা বাস্তবিকই সর্প। তেমনি আবার, মাঠের মধ্যে যদি আমি জলের মতো একটা আবির্ভাব দেখিয়া বলি যে, উহা জল হইলেও হইতে পারে, মরীচিকা হইলেও হইতে পারে; তবে কি যে বাস্তবিক—তাহার ঠিকানা হয় না; কিন্তু যদি আমি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, উহা জল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তবে তাহা যে বাস্তবিকই জল, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ লৌকিক ব্যবহার কালেও—তাহাকেই আমরা বলি বাস্তবিক সত্য যাহা সকলের নিকটেই সত্য, এক কথায়—সর্ব্ববাদিসম্মত বা সার্ব্বভৌমিক; ও যাহা না হইলেই নয়, এক কথায়—অবশ্যম্ভাবী বা নির্ব্বিকল্প। কিন্তু এটা একটা মোটামুটি রকমের সত্য-নিরূপণ। বাস্তবিক সত্য নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা।

প্রথম দৃষ্টিতে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে—অবিদ্যার মধ্যে—সত্যাসত্য স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু তাহার মধ্য হইতেও কাণ্ট দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—কি? না দেশকালে অবস্থিতি। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে হইতে রূপ রসাদি সমস্তকেই ভাবনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু দেশ এবং কাল—এই যে দুইটি ব্যাপার—যাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-মাত্রেরই সঙ্গে নিরন্তর লাগিয়া থাকে—এ দুটা'কে ভাবনা হইতে কিছুতেই বহিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের পক্ষে দেশকালে অবস্থিতি নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। দেশ-কাল রূপী অবিদ্যাক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্ঞানকে খাটাইয়া সেখান হইতেও আমরা গণিতের ধ্রুব সত্য সকল উপার্জ্জন করি; আর, এই দুইটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হই যে, ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকেই জ্ঞানে আয়ত্ত করা যাইতে পারে না; যে কোন ঐন্দ্রিয়ক অভাসকে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহারই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী, যথা;—গীত-ধ্বনি কতক-পরিমাণ কাল ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ উচ্চ নীচ স্বর-মাত্রা পূরণ করিয়া তবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়; আলোক কতক পরিমাণ দেশ ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা পূরণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের ব্যাপ্তি-নিরূপণ এবং মাত্রা-নিরূপণ অন্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য

ইহ্নত তাহা হইলে পশুরাও তাহা করিত—ও সেই সূত্রে গণিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। গণিত বিদ্যার সত্য-সকল যদিও আপাততঃ দেশকালরূপী অবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, কিন্তু বহির্ব্বস্তুর অবলম্বন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। গণিতের মনঃকল্পিত চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে কিছু আর বীজ বপন করা যাইতে পারে না,—বাস্তবিক ক্ষেত্রই গণিতের শূন্য ক্ষেত্রের চরম পর্য্যাপ্তি-স্থান। আমাদের মনোমধ্য-স্থিত গণিতের সত্যকে যদি বহির্জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইত তবে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। শুধু কেবল মনোরাজ্যে নহে কিন্তু তা ছাড়া—বস্তু-রাজ্যে সংলগ্ন হয় বলিয়াই, গণিতের সত্য বাস্তবিক সত্য নামের যোগ্য। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্য দিয়া—মনোরাজ্যের মধ্যদিয়া—বস্তু-রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে, গণিত-বিদ্যা তাহারই দ্বার স্বরূপ। ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নিরূপণ দ্বারা যখন আমরা কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি তখন সেই সঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটি ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসটি গুণ-মাত্র—তাহা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; এই স্থানটিতে এই একটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুণ পরিবর্ত্তনশীল—বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার পরে আমরা লক্ষ্য বস্তুটির গুণ-পরিবর্ত্তনে অন্যান্য বস্তুর কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; এবং সর্ব্ব-শেষে আমরা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া পরস্পরাধীনতার প্রকাণ্ড একটা বাণিজ্য ব্যাপার জ্ঞানে উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া। সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, গণিত বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-মাত্রেরই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী; ভৌতিক বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের আধার বস্তু. এবং সেই আধার-বস্তুর উপরে আর আর বিভিন্ন বস্তুর বল-ক্রিয়া ও অন্যের বল-ক্রিয়ার উপরে সেই আধার-বস্তুর নিজের প্রতিক্রিয়া, এই তিনটি ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ করিয়া কাণ্ট পাইলেন যে, বিজ্ঞানের অভ্যন্তরেই এরূপ কতকগুলি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—যাহা একান্ত-পক্ষেই বাস্তবিক; আর ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তিও তাহার বাস্তবিকতার বিপক্ষে একটি কথারও দ্বিরুক্তি করে না—সকলেই তাহা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—বাস্তবিক বলি কাহাকে? যাহা বস্তু-গত তাহাই বাস্তবিক; কিন্তু কাণ্টের ঐ মূল-তত্ত্ব গুলি—জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব সুতরাং তাহা জ্ঞান-গত। এই কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়-ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপরি-উক্ত মূলতত্ত্ব-গুলি (যেমন কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব) যদি আমরা বহির্বিষয়ের ভূয়োদর্শন হইতে সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তবে ভূয়োদর্শনের ব্যাপ্তির সহিত ঐ তত্ত্বটির নিশ্চয়তার মাত্রা অবিকল সমতুল্য হইত; অর্থাৎ যত অধিকবার আমরা কার্য্য-

কারণের ভাব বাহিরে দেখিতাম, ততই আমাদের অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্বটি অধিকতর নিশ্চয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তা ছাড়া—তাহার নিশ্চয়তা একেবারেই অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। কাক কালো ইহা আমরা ভূয়োভূয় দেখিয়াছি বলিয়া তাহার নিশ্চয়তা-বিষয়ে আমরা খুবই নিঃসংশয়, কিন্তু তবুও আমরা এ কথা বলি না যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই সাদা কাক থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এইরূপ দেখা যায় যে, সকলেই এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারে যে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন একটি স্থানেও বিনাকারণে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যদি আগন্তুক বস্তু-সকলের ভূয়ো-দর্শন হইতে আমরা ঐ মূলতত্ত্বটি সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তাহা হইলে ঐ মূল-তত্ত্বটিও আগন্তুক-মাত্র হইত (যেমন কাক কালো এই তত্ত্বটি)—অবশ্যম্ভাবী হইত-না; তাহা আমাদের জ্ঞানের একটি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই—তাহা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই—তাহা অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-গুলি যদি এইরূপ জ্ঞানগত ব্যাপার মাত্র হইল, তবে সে-গুলিকে আমরা বস্তু-গত বলি কেন—বাস্তবিক বলি কেন? ইহার প্রতি কাণ্টের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা যে-কোন বস্তু জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহাতেই আমরা ঐ তত্ত্ব-গুলির প্রয়োগ দেখিতে পাই; তা শুধু নয়—ঐ তত্ত্বগুলিই বস্তু-সকলের বাস্তবিকতার মূল উপাদান। ঐ তত্ত্ব-গুলি যদি কোন বস্তুতেই প্রয়োগ করিতে পারা না যাইত—তাহারা যদি আমাদের মনোমধ্যেই চাবি দেওয়া থাকিত—তাহা হইলেই তাহাদের বাস্তবিকতা সংশয়-গর্ত্তে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তাহারা বস্তু-গত না হইয়া আমাদের স্ব স্ব মনোগত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিত। বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কার্য্যই এই যে, তাহারা বস্তু-সকলেতে অভিসর্পিত হয়—তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য নাই। বস্তু-সকলেতে সংক্রামিত হওয়াই যখন তাহাদের একমাত্র কার্য্য, আর সে কার্য্য যখন তাহারা আবহমান কাল অভ্রান্ত-রূপে নিষ্পাদন করিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা বাস্তবিক (বস্তু-গত) নহে তো আর কি? তাহারা আমাদের মনোমধ্যে একদণ্ডও চাবি দেওয়া থাকে না—তাহারা সর্ব্ব-বস্তুতে মুক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহারা যদি বাস্তবিক নহে তবে—আর কে?

এই স্থানটিতে—কাণ্ট মনে করিলেই পারমার্থিক সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিয়া বসিলেন। কাণ্ট প্রথমে এই বলিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—বিশুদ্ধ জ্ঞানে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য। আমরা বলি যে, তাঁহার এই কথাই ঠিক্। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে, যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহা জ্ঞানগত-সত্য মাত্র;—তাহা বস্তুগত সত্য

দার্শনিক নৌকা একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইল—নৌকার মাস্তুল নীচে চলিয়া গেল ও নৌকার তলদেশ উপরে উঠিল। কাণ্ট বলেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মূলে বস্তু যাহা অবধারণ করে তাহা মোটামুটি সত্য মাত্র, তা ভিন্ন তাহা পারমার্থিক সত্য নহে;—অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে বস্তু নহে; তবে কি না—তাহাকে বস্তু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এমন কি—বিজ্ঞান একপদও চলিতে পারে না; এই জন্য তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার না করিলেই নয়। কাণ্টের এই কথার বিরুদ্ধে বেদান্ত দর্শন বলেন—তুমি আপনিই তো বলিয়াছ যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—অবিদ্যা—আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে না, বিশুদ্ধ জ্ঞানই কেবল আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে; আবার তবে তুমি বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া এ কথা বল কিরূপে—যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-গত সত্য, তা ভিন্ন তাহা বস্তু-গত নহে—বাস্তবিক নহে? কাণ্ট ইহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দে'ন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য (যেমন বিশুদ্ধ বস্তু-তত্ত্ব) ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত জড়িত ভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, কাজেই—সে যাহা প্রতিভাত হয় তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ঐন্দ্রিয়ক অবভাস দুয়েরই কার্য্য-কারিতা সমান মাত্রায় বিদ্যমান; তাই বলি যে, তাহা মিশ্র সত্য—বিশুদ্ধ সত্য নহে; ব্যবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শন এইরূপ বলেন যে, সেই মিশ্র সত্যের মধ্যে হইতে যদি ঐন্দ্রিয়ক অংশটি (অবিদ্যাত্মক অংশটি) বর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট অংশটি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক অংশটি গ্রহণ করা যায়—তবে তাহাই তো অমিশ্র বাস্তবিক সত্য—পারমার্থিক সত্য; তাহা কি তাহাই তুমি আমাকে বল—বাজে কথা ছাড়িয়া দেও; কেননা অমিশ্র-সত্য পাইলে কেহ আর তাহাকে ছাড়িয়া মিশ্র সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয় না;—এক ভরি খাঁটি সুবর্ণের বিনিময়ে একভরি তাম্র-মিশ্রিত সুবর্ণ ক্রয় করিতে যায়—এমন নির্ব্বোধ কে আছে? ইহার উত্তরে কাণ্ট বলেন যে, খাঁটি সত্য আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না—যদি বা ধরা দেয় তাহা হইলেও তাহা আমাদের কোন ব্যবহারে আসে না। বেদান্ত বলেন, ব্যবহারে আসা না আসা পরের কথা—আপাততঃ তাহা জ্ঞানে ধরা দেয় কি না, তাহাই স্থির করা হউক্। খনি হইতে যে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাম্র-মিশ্রিত নহে; খাঁটি সুবর্ণকে তাম্র-মিশ্রিত করিলেই তাম্র-মিশ্রিত হয়; তাহা না করিলে তাহা—যেমন বিশুদ্ধ তেমনি বিশুদ্ধ থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করিলেই তাহা মিশ্র সত্য হইয়া দাঁড়ায়,—তাহা না করিলেই তাহা যেমন তেমনি অবিকৃতভাবে জ্ঞানে প্রতীয়মান হয়। আমরা আপনারাই খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করি, আবার, আপনারাই বলি যে, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না; গোয়ালারা আপনারাই দুগ্ধের সহিত জল মিশায়; আবার—আপনারাই বলে যে, নির্জ্জলা দুগ্ধ পৃথিবীর ...

না—তুমিও যে দেখিতেছি সেইরূপ কথা বলিতেছ! আসল কথা এই যে, কাণ্ট্ পারমার্থিক-সত্যকে প্রাতিভাসিক রাজ্যে প্রাতিভাসিক সত্যের মতো করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—তাই তিনি প্রকৃত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে এমনি একটা অপদার্থ-রকমের সত্য পাইয়াছেন যাহা অসত্যেরই সামিল; তাহা এমনি একটি তমসাচ্ছন্ন ব্যাপার যে, জ্ঞান-জ্যোতির সঙ্গে তাহার কস্মিন্ কালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, দেখা সাক্ষাৎ হইবেও না—হইতে পারেও না; কি? না "বস্তু স্বরূপ" Thing-in-itself। কাণ্ট্ বহু কষ্টে কূলের কাছাকাছি আসিয়া "কূল দেখিতে পাওয়া যায় কি না—দেখা যা'ক্" এই অভিপ্রায়ে দূর-বীক্ষণ যোগে কূলাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য তিনি ভুলিয়া গেলেন;—দূর-বীক্ষণের রন্ধ্র-দ্বারের কপাট উত্তোলন করিতে ভুলিয়া গেলেন! এই জন্য তিনি পারমার্থিক সত্যের কূল প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পারমার্থিক সত্যকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত জীবন্ত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে কাণ্ট্ কি দেখিলেন? না একটা অন্ধ অনির্দ্দেশ্য মৃত বস্তু—তাহা কি যে তাহার ঠিকানা নাই, আর, তাহার তিনি নাম দিলেন "The thing in itself" "বস্তু-স্বরূপ" অথবা "তৎ স্বরূপ"। বেদান্ত-দর্শনের পারমার্থিক সত্য যেমন সত্য-স্বরূপ—তেমনি জ্ঞান স্বরূপ,—সেখানে সত্য এবং জ্ঞান একাধারে বর্ত্তমান। কিন্তু কাণ্টের সেই যে "বস্তু-স্বরূপ" সেখানে জ্ঞানের একেবারেই যাইতে বারণ; সেখানে জ্ঞান প্রবেশ করিলে পাছে বস্তুগত সত্য জ্ঞানগত হইয়া উঠে এই ভয়েই কাণ্ট্ সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কিন্তু কাণ্টের এ ভয় নিতান্তই নিষ্কারণ—একটা রোগ-বিশেষ। কাণ্টের নিজের দর্শন-শাস্ত্রই আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—অতএব যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় না তাহার মধ্যেই বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য, অতএব যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় না—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা বৃথা পণ্ডশ্রম। কাণ্টের নিজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া আমাদের বাহিরে নির্দ্দেশ করি তাহাও আমাদের একটি জ্ঞানগত ব্যাপার—ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপার নহে; অতএব কাণ্টের নিজের মতানুসারেই দাঁড়াইতেছে এই যে, তিনি যাহাকে "বস্তুস্বরূপ" বলিতেছেন, তাহা জ্ঞানাত্মক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, কেননা জ্ঞানই তাহার মূল—জ্ঞানই তাহার সর্ব্বস্ব—জ্ঞান-ব্যতিরেকে তাহা কিছুই নহে। এখানে যে জ্ঞানের কথা হইতেছে তাহা তোমার জ্ঞান বা আমার জ্ঞান বা আর কোন জীবের জ্ঞান—নহে; প্রাতিভাসিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত আকাশ যেমন তোমার

সর্ব্বজগতের কাল, তেমনি পারমার্থিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত জ্ঞান সর্ব্বজগতের জ্ঞান,—জ্ঞান-স্বরূপ; অথচ, আকাশ এবং কাল তোমার জ্ঞানে প্রকাশমান, আমারও জ্ঞানে প্রকাশমান, সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান; জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্ম তোমার আমার এবং সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের বলিয়াই তিনি সূর্য্যের ন্যায় তোমারও—আমারও এবং সকলেরই। চক্ষের পরম বিষয় কি?—অন্ধকার নহে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য; তেমনি জ্ঞানের পরম বিষয়—পরম অর্থ কি? পারমার্থিক সত্য কি? অন্ধ সত্তা নহে কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞানময়-সত্তা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কাণ্ট্ তাঁহার নিজের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যাবহারিক রাজ্যকে, সুপরীক্ষিত বিজ্ঞান-রাজ্যকে, পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন নিতান্তই অন্ধকার দেখিল। তিনি দেখিলেন যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে—অবিদ্যাকে যদি সমূলে পরিত্যাগ করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না;—কেননা, মানিলাম কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে বীজভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু কার্য্য দেখিলে তবে তো তাহার কারণ অবধারণ করিব? শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক রাজ্যেই কার্য্য উপস্থিত হয়—প্রাতিভাসিক রাজ্য বিলুপ্ত হইলে কার্য্যের নাম গন্ধও থাকে না; কাজেই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধেরও কোন অর্থ থাকে না। কাণ্ট্ তাই বলেন যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকল প্রাতিভাসিক সত্যকে বাস্তবিক করিয়া দাঁড় করায়—এইটিই তাহার বাস্তবিকতা; এক কথায়—তাহার বাস্তবিকতা ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে; এ নহে যে, প্রাতিভাসিক রাজ্য ছাড়িয়া উহা স্বয়ং বাস্তবিক। কাণ্টের মতানুসারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব সকলের কোন মূল্য নাই—বহির্জগতে তাহাদিগকে খাটানো যায় বলিয়াই তাহাদের যত কিছু মূল্য;—হীরকের নিজের কোন মূল্য নাই—তাহা দ্বারা কাচ কাটা যায় বলিয়াই তাহার যত কিছু মূল্য; কেননা বিজ্ঞানের চক্ষে হীরক অঙ্গার-বিশেষ—বিশুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র-বিশেষ!

এইরূপ যান্ত্রিক নাগপাশ হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কাণ্ট্ মনুষ্যের ধর্ম্মভাবকে সহায় ডাকিলেন; বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রের ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, ধর্ম্ম-নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রীর ভাব দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাতিভাসিক ব্যাপার-সকলকে (বেদান্ত-দর্শনের অবিদ্যাকে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কি—তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন মনুষ্যের বন্ধনের ভিত্তি মূল, ধর্ম্মের নিয়ম সেইরূপ মনুষ্যের

মুক্তির (Freedom) ভিত্তি-মূল। মনুষ্য যে, অবিদ্যার প্রতিকূলে মুক্তির পথে চলিবার অধিকারী—ধর্ম্মের নিয়মই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ধর্ম্মের নিয়ম শুধু যে, আমার নিয়ম বা তোমার নিয়ম তাহা নহে—উহা ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের ঘরগড়া নিয়ম নহে—যে-কোন জীবের বিবেচনা-শক্তি আছে সেই জীবই বুঝিতে পারে যে, মুক্তিতেই আত্মার পুরুষার্থ হয়—সুখ দুঃখের বন্ধনে পুরুষার্থ হয় না। কেননা সুখ দুঃখ প্রাতিভাসিক মাত্র—পারমার্থিক নহে। সুখ দুঃখ নিয়তই আসিতেছে যাইতেছে—তাহা কাহারো নির্ভর-স্থল হইতে পারে না—তাহা বালির বাঁধ। সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনের মুখেই নিয়ত দণ্ডায়মান। ছায়ার সুখ উপভোগ করিতে হইলে রৌদ্রের তাপ উপভোগ করা আবশ্যক; আরোগ্যের সুখ উপভোগ করিতে হইলে, পীড়ার দুঃখ উপভোগ করা আবশ্যক; অন্ন ভোজনের সুখ উপভোগ করিতে হইলে ক্ষুধার জ্বালা উপভোগ করা আবশ্যক;—সুখ অন্তর্হিত না হইলে তাহা উদিত হইতে পারে না। পরিবর্ত্তনের মুখেই সুখ-দুঃখের বুদ্‌বুদ্ উত্থিত এবং বিলীন হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা-সকল যেমন আগন্তুক অস্থায়ী এবং প্রাতিভাসিক—মনুষ্যের সুখ দুঃখও সেইরূপ। আর প্রকৃতির মূলতত্ত্ব সকল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অটল, বাস্তবিক এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত, ধর্ম্মের মূল নিয়মও সেইরূপ। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব সকল বস্তু-ঘটিত, ধর্ম্মের মূল নিয়ম কর্ত্তব্য-ঘটিত। সকল বস্তুই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চলে, সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলা কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেরই ধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য অন্ধ বস্তু হইতে চায় না—জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। অবিদ্যা মনুষ্যকে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া অন্ধ বস্তু করিয়া ফেলিতে চায়—মনুষ্য সেই বন্ধন পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। মনুষ্য যখন অন্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে ধর্ম্ম-পথে চলে—তখন কাজেই সে প্রকৃতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না; অন্ধ প্রকৃতি যে, আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়া মনুষ্যকে মুক্তি-পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—ইহা হইতেই পারে না; এই জন্য ধর্ম্ম-পথে চলিবার সময় মনুষ্য অন্ধ প্রকৃতির নিকট হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরই ধর্ম্মের সিদ্ধিদাতা বিধাতা। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বাহির হইতে—প্রকৃতি হইতে—যে ব্যক্তি যত সুখের প্রত্যাশা করে, প্রকৃতি তাহাকে ততই সুখে বঞ্চিত করে; আর, প্রকৃতির নিকট হইতে যে বড় একটা সুখের প্রত্যাশা রাখে না, প্রকৃতি তাহাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

মনুষ্য যখন কোমর বাঁধিয়া ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হয়, তখন দেখিতে পায়—বড়ই সে কঠিন স্থান—প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্র—শুধু কেবল মুখের কথা নহে। মনে কর একজন ধনী ব্যক্তি এবং এক জন দরিদ্র ব্যক্তি দুইজনেই মনে মনে সংকল্প করিল যে,

আমার মনকে আমি কিছুতেই বিচলিত হইতে দিব না—সর্ব্বদাই তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিব; আর, উভয়েই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত। হঠাৎ এক দিবস পথে দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ হইল; দরিদ্র ব্যক্তির মনে তদ্দণ্ডেই অর্থের প্রত্যাশা জাগিয়া উঠিল—ধনী ব্যক্তির মনে পলাইবার চেষ্টা জাগিয়া উঠিল;—ধর্ম্ম-পথ হইতে মন বিচলিত হইবার এই প্রথম সূত্র। দরিদ্র-ব্যক্তিটি ধনী ব্যক্তির গৃহে দুই চারি দিন যাতায়াত করাতে ধনী ব্যক্তি এক দিন বিরক্ত হইয়া দরোয়ান্‌কে দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। মনের স্থৈর্য্য কত না বিচলিত হইল! দরিদ্র ব্যক্তি যখন দেখিল যে, সহজে কিছুই হইল না, তখন সে প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কত না পদ-স্খলন! এইরূপ লাখো লাখো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম-পথে এইরূপ অল্প সূত্র হইতেই ক্রমে ক্রমে বিপর্য্যয় ফলাও কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যক্তি-দ্বয়ের পথে মিলন-কালে এক-জনের মনে অর্থ-কামনা এবং আর এক জনের মনে পলায়ন-কামনা—ইহার পরিবর্ত্তে যদি উভয়েরই মনে পরস্পরের মঙ্গল-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সেই অল্প সূত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্ম ফল ফলিতে পথ পাইত—সন্দেহ নাই। ধনী ব্যক্তি হয় তো প্রসন্ন চিত্তে দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করিত—দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির নানাবিধ কার্য্যের সহায়তা করিত; এবং দিন দিন উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রবর্দ্ধিত হইত। যে ব্যক্তি জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাতে আপনি স্বাধীন ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করেন—সাংখ্যদর্শনের উপদিষ্ট কৈবল্য লাভের প্রার্থী হ'ন—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার মনকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়;—একটি সামান্য কথা—একটি সামান্য দৃশ্য—একটি সামান্য ঘটনা—হয় তো চকিতের মধ্যে তাঁহার মনকে আকাশ হইতে পাতালে ফেলিয়া দিবে। অতএব শূন্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকা মনুষ্যের পক্ষে যেমন সুদুষ্কর, এমন আর কিছুই নহে। সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া যিনি স্বাধীন হইতে যা'ন, সমস্ত জগৎ তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়;—তিনি একা কত দিক্ সামলাইবেন! চারিদিকে শত্রু পক্ষ—তাহার মধ্যে স্বাধীনতাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার; এরূপ স্থলে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ মহা মহা ধর্ম্মবীর হাবু ডুবু খাইয়া যা'ন—যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে নূতন ব্রতী তাহার তো কথাই নাই। অতএব জগতের উপর চটিয়া এবং জগৎকে চটাইয়া চারিদিকের শত্রুতার মধ্যে স্বাধীন হইতে যাওয়া নিতান্তই পাগ্‌লামি, কেননা সেরূপ করিয়া কেহই এক মুহূর্ত্তও স্বাধীনতাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; শত্রুতা নহে—দ্বেষ হিংসা নহে—প্রেমই স্বাধীনতার উর্ব্বরা ভূমি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় জগতের মতে মত দিয়া চলিলে স্বাধীনতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এখন উপায় কি? উপায় আমাদের প্রতি জনের নিজের নিজের

হস্তে। সত্যসতই যদি আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি, তবে জগৎও ভিতরে ভিতরে আমার মঙ্গল কামনা করিবে; আমি যদি জগতের মঙ্গল কামনা করি—তবেই জগৎ আমার বন্ধু, আমি যদি জগতের অমঙ্গল কামনা করি তবেই জগৎ আমার শত্রু; এইরূপ, জগৎকে বন্ধু করা এবং শত্রু করা আমার আপনারই হস্তে; আমি যদি আমার শত্রুর মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করি, তবে আমার সে শত্রুরও ক্রমে চক্ষু ফুটিবে;—যদিও স্বার্থের অনুরোধে বাহিরে বাহিরে সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ভিতরে ভিতরে সে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে; তাহার মুখের বাক্য এবং হস্তের কার্য্য আমার শত্রু হইলেও তাহার অন্তরাত্মা আমার বন্ধু হইবে—তাহার কার্য্যের সহিত তাহার অন্তরাত্মার বিবাদ উপস্থিত হইবে। অতএব, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইলে জগতের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল-চেষ্টা দ্বারা সর্ব্ব জগতের সহিত এবং সর্ব্ব জগতের সাধারণ কেন্দ্রের সহিত মনকে একতান করিয়া মনের সুর বাঁধা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা হইলে ক্রমে আমাদের মঙ্গল-ভাবের তেজঃপ্রভাবে জগতের দ্বেষ হিংসা এবং শত্রুতা আমাদের নিকটে আসিবা-মাত্রই অমনি নতশির হইয়া পড়িবে। এইরূপ সাধারণ মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য; তা ছাড়া আবার—বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যেমন—তোমার স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ তোমার কর্ত্তব্য—আমার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের মূলে যেমন গার্হস্থ্য প্রেম, সাধারণ কর্ত্তব্যের মূলে তেমনি ঈশ্বর-প্রেম; কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে প্রেমের কোন অর্থই হয় না,—ক্রীত দাসের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রেম আদায় করা সম্ভবে না;—যে যাহাকে প্রীতি করে, সে তাহাকে স্বাধীনভাবেই প্রীতি করে—বলের বাধ্য হইয়া কেহ কাহাকেও প্রীতি করিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের সহিত প্রেমে মিলিতে হইলে—মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যে স্বাধীনতা জগতের মঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ যাহার অভ্যন্তরে প্রেম নাই—সেরূপ ফাঁকা স্বাধীনতা কোথাও হইতে পারে কি না—এক তো তাহাই সন্দেহ। তাহাতে আবার, যদি বা কাহারো দুরদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া থাকে—তবে সেরূপ প্রেম-শূন্য কঠিন-প্রাণ শুষ্ক কাষ্ঠ অপেক্ষা, একটি নব-বিকসিত সরস গোলাব ফুল যাহা আজ আছে কা'ল নাই—তাহা সহস্রগুণে ভাল। জগতের মঙ্গল-কামনা প্রেম-মূলক হইলে তবেই তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়;—এটি কাণ্টের কথা নহে—এটি সকল দেশেরই ভক্তজনের হৃদয়ের কথা। কাণ্ট কর্ত্তব্যকার্য্যকে—মঙ্গল ইচ্ছাকে—কঠোর আদেশ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন,—এবং সেই আদেশ-পালনের প্রবৃত্তিকে তিনি প্রেমের উপরে নহে, কিন্তু ভক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্টের কথা-টা এক হিসাবে সত্য; কিন্তু তথাপি

আমরা বলি এই যে, কর্ত্তব্য-সাধন প্রথম প্রথম যেমন নীরস দেখায়—চিরকাল কিছু আর সেরূপ থাকে না; অভ্যাসের গুণে কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন ক্রমে সহজ এবং মধুময় হইয়া দাঁড়ায়—আদিষ্ট কার্য্য জ্ঞানের কার্য্য এবং প্রাণের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়—শ্রদ্ধা (অর্থাৎ বিশ্বাস) জ্ঞানে পরিণত হয় এবং ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়। তবে কি—না কাণ্ট্ ভক্তি এবং প্রেমের মাঝখানে যেরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারি না। যাহাই হো'ক—এটা একটি ধ্রুব সত্য যে, আমরা জগতের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করিলে আমাদের কখনই অমঙ্গল হইবে না—অবশ্যই মঙ্গল হইবে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" কোন কল্যাণ-কারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না;—এইটিই ধর্ম্মের সর্ব্ববাদি-সম্মত মূলতত্ত্ব। যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতি-ক্রিয়া—ইহা যেমন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—ইহা তেমনি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব; উভয়ই ধ্রুব এবং অলঙ্ঘনীয়। তবে, প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের ঐ মূল তত্ত্বটি ভৌতিক নিয়ম, ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটি আধ্যাত্মিক নিয়ম; বিজ্ঞানের ঐ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা কেবল পাই যে, সমস্ত জগৎ একই মূল প্রকৃতির অধীন; ধর্ম্মের এ মূল-তত্ত্বটির বলে আমরা পাই যে, সমস্ত জগৎ একই পরমাত্মার অধীন। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ স্থির করিলেন যে ধর্ম্ম-জ্ঞানই পারমার্থিক সত্যের সোপান। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ ধর্ম্মের সংগ্রাম-ক্ষেত্র; ঈশ্বর ধর্ম্মের জয়দাতা বা সিদ্ধিদাতা; ধর্ম্মের সাহায্যে মনুষ্য অবিদ্যার কার্য্য কারণ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান-রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রসন্নতা রাজ্যে—ক্রমশই অগ্রসর হয়।

কাণ্টের মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিজ্ঞানের সহিত পারমার্থিক সত্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই; শুধু কেবল ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলেন যে পারমার্থিক সত্যের নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়াও বিজ্ঞান এ-যাবৎকাল স্বীয় অভীষ্ট পথে দিব্য নিরাপদে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের ভিতর পারমার্থিক সত্যকে প্রবেশ করাইলে তাহাতে তাহার লাভ কিছুই হয় না, বরং তাহাতে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় এইরূপ দেখা যায় যে, পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস-ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন হয়। কাণ্টের এ কথাটি মিথ্যা নহে; তাহার সাক্ষী—কম্‌টির নিরীশ্বর বিজ্ঞান-তন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী; কিন্তু তাঁহার নিরীশ্বর ধর্ম্ম তন্ত্র ধর্ম্মের পক্ষে এমনি অনুপযোগী যে, তাহা সহৃদয় বিজ্ঞ সমাজে ভক্তি রসের পরিবর্ত্তে শুধু কেবল হাস্য রসেরই উদ্দীপন করে।

প্রথম দৃষ্টিতেই সহৃদয় পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কাণ্ট দুই নৌকায় পা

দিয়াছেন; বিজ্ঞানের ভিতরে পারমার্থিক সত্যের দর্শন-লাভে পরাভব মানিয়া তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্যের প্রমাণাভাব; তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানের মধ্যে আমরা পারমার্থিক সত্যের অব্যর্থ পরিচয় পাই। এখানে কাণ্টের সপক্ষে এই একটি কথা বলিবার আছে যে, দুই নৌকা যদি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গায়ে গায়ে জোড় লাগানো থাকে, তবে তাহাকে ঝড়ে শীঘ্র কাবু করিতে পারে না; তাই সিংহল-বাসীরা সমুদ্রবিচরণের সময় ঐরূপ জোড়া নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে। দুই দিক্ যেখানে বিবেচ্য, সেখানে একদিকে ঝোঁক দেওয়া সময়-বিশেষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে নহে; সজোরে যখন পূবে বাতাস বহিতেছে, তখন নৌকার পূর্ব্ব পার্শ্ব ঘেঁসিয়া বসা যাত্রীদিগের কর্ত্তব্য তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু অন্য সময়ে নহে। ধর্ম্ম-সাধন-কালে প্রবৃত্তির বায়ু বহির্বিষয়ের অভিমুখে সজোরে বহিতে থাকে, এই জন্য তখন তাহার বিপরীত দিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ঝুঁকিয়া পড়া সাধকের কর্ত্তব্য; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে প্রবৃত্তির বায়ু প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, এজন্য তখন দুই দিকের কোন দিকে ঝোঁক না দিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কাণ্টের সপক্ষে এই যাহা বলা হইল—এস্থলে তাহা খাটে না; কারণ, কাণ্টের দুই নৌকার মধ্যে যোগবন্ধন এমনি শিথিল যে, এক নৌকা পশ্চিমে—আর এক নৌকা পূর্ব্বে—দুই নৌকা দুই দিকে ধাবমান। এক স্থানে যাহাকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর এক স্থানে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে; ধর্ম্ম-জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দুইকে পরস্পরের প্রতিকূলে দাঁড় করানো হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকলকে অন্ধ "বস্তু-স্বরূপের" উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জ্ঞান-স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার দুই নৌকা অতীব দৃঢ় বন্ধনে এক সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া যাইত। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, বিজ্ঞানের এই যে আধিভৌতিক মূলতত্ত্ব—যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া, এবং ধর্ম্মের এই যে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এ দুইটি মূলতত্ত্ব একই মূলতত্ত্বের এ-পিট-ও-পিট। জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা উভয়েরই ভিত্তি-মূল। সূর্য্য যেমন আলোকের এবং উত্তাপের উভয়েরই কেন্দ্রস্থল; পরমাত্মা সেইরূপ বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের—ভৌতিক জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের—উভয়েরই কেন্দ্র-স্থল। অতঃপর বেদান্ত-দর্শনের সহিত কাণ্টের দর্শনের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বেদান্ত দর্শন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময়ে বিজ্ঞানের এখনকার মতো এরূপ হাঁক ডাক ছিল না; গুটি দুই তিন বিজ্ঞান যাহা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্তই আবশ্যক—যেমন পর্ব্বাহ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, রোগপ্রতীকা-

রের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান (তাহাও আবার ঠিক্ বিজ্ঞান science নহে—বিদ্যা art মাত্র) গণনা কার্য্যের জন্য গণিত বিজ্ঞান, তান্ত্রিক মতের একরূপ রসায়ণ বিজ্ঞান, এইরূপ লোকসমাজের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি বিজ্ঞান তখন না ছিল এমন নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি না যে, প্রকৃত বিজ্ঞান তখন আলোক দর্শন করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দুইটি—জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান। এ দুইটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় নিঃসংশয়। বরং প্রত্যক্ষের মধ্যে ভ্রম থাকিতে পারে (যেমন মরীচিকা দর্শন), কিন্তু এ দুইটি বিজ্ঞানের কোন স্থানে এমন একটিও ছিদ্র নাই যাহার মধ্য দিয়া ভ্রম প্রবেশ পাইতে পারে—এমন একটিও ঝোপ নাই যাহার আড়ালে ভ্রম লুকাইয়া থাকিতে পারে। এ দুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহোদরতুল্য;—জ্যামিতির যেমন ঋজুরেখা, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি শলাকা বা ধারা; জ্যামিতির যেমন বিন্দু, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি রেণু বা অণু; জ্যামিতির যেমন বৃত্ত, যন্ত্রবিজ্ঞানের তেমনি চক্র; উভয়ের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ;—প্রভেদ কেবল এই যে, জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়—শূন্য আকাশ-খণ্ড, যন্ত্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়—ভৌতিক বস্তু এবং বল। নব্য অঙ্কের বিজ্ঞান কিছু আর আকাশ হইতে পড়ে নাই—অবশ্য তাহা পুরাতন অঙ্ক হইতেই আসিয়াছে; কিন্তু সেই সকল পুরাতন সামগ্রীকে নব্য অঙ্ক জ্যামিতি এবং যন্ত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে কালোচিত নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া প্রামাণিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিয়াছে। কাণ্ট্ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের অভ্রান্তির উপরেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব সকল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্ট্ যদি শঙ্করাচার্য্যের কালে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ওরূপ একটা কাণ্ড তাঁহার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারিত না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থের কোন স্থানেই প্রামাণিক বিজ্ঞানের একটি কথারও সাড়া-শব্দ নাই। এরূপ সত্ত্বেও ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহার দর্শনের সত্য-নিরূপণ-পদ্ধতি আগাগোড়াই প্রামাণিক পদ্ধতি—সেকেলে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি নহে যে, কেহ তাহাকে এক তুড়ি'তে উড়াইয়া দিবেন। তিনি উপনিষদাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র;—তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন নাই,—যেখানে শাস্ত্রীয় কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অথবা যুক্তির এরূপ একটা আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই আলোকেই গম্য-পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক রাজ সভায়—শাস্ত্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরের ন্যায় (সোজা কথায়—সাক্ষী গোপালের ন্যায়) সিংহাসনে উপবিষ্ট; বিচারাদি কার্য্য যাহা নির্ব্বাহ করিবার তাহা দুই মন্ত্রী মিলিয়া নির্ব্বাহ করে; প্রধান মন্ত্রী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয় মন্ত্রী যুক্তি। ইংলণ্ড-বাসীরা যেমন লোকরক্ষার্থে রাজার মান রক্ষা

করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ শাস্ত্রের মান রক্ষা করিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধান্যার্থী যেমন ধান্যের সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসার পলাল-অংশ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানার্থী সেইরূপ শাস্ত্র-সকলের মধ্য হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমশঃ।

বান্দেলের গির্জ্জা।

রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতি অনেকটা আমাদের মত শুনিয়া অনেক দিন হইতে তাহা একবার দেখিবার সাধ ছিল। কাল সেই জন্য বান্দেলের গির্জ্জায় একটী উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। বান্দেলের গির্জ্জা কুমারী মেরীর নামে উৎসর্গীকৃত। তাঁহার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে এই উৎসব হইয়া থাকে। বোধ হয় শুনিয়াছ বান্দেলের গির্জ্জা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জা। প্রায় ৩০০ বৎসর হইল রাণী এলিজেবেথের সময় চুঁচড়ায় এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমরা যখন গির্জ্জায় পৌছিলাম তখন ৬টা বাজে। পৌছিবার পূর্ব্বে দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম উচ্চ চূড়াযুক্ত সুবৃহৎ প্রাসাদ আলোকমালায় জ্বল জ্বল করিতেছে। আলোক-সজ্জিত সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর শিশু ক্রোড়ে মেরীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। মূর্ত্তির পদতলে আলোক অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ঈশ্বর মাতা তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

কতকগুলি দেবদারু পত্র মণ্ডিত দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া আমরা উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলাম। মার্ব্বল মণ্ডিত গৃহতলের উপর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম লেখা। পূর্ব্বে এইখানে মৃত দেহ প্রোথিত করা হইত। দেয়ালের গায়ে ধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি সুচিত্রিত ছবি। গৃহটী কয়েকটী স্তম্ভের দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখস্থ অপর প্রান্তে তিনভাগে তিনটী বেদী। গৃহের মধ্যস্থলে উপাসকদিগের জন্য কতকগুলি বেঞ্চ। তাহাতে অনেক লোক। এত রোমানকাথলিক এখানে আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। শুনিলাম দূর হইতেও কতক লোক আসিয়াছে। প্রবেশ দ্বারের উপরে একটী গ্যালারী। এইখানে বাদ্যযন্ত্রাদি ও গায়ক বাদকেরা আছেন। গৃহের দেয়ালে ও কড়িতে অনেকগুলি ঝাড় বাতী জ্বলিতেছে। পার্শ্বস্থ দুইটী বেদীর উপর দুইটী মঞ্চ। একটীতে যীশু ক্রোড়ে মেরী দণ্ডায়মান। অপরটীতে যীশুর ক্রুস-বিদ্ধ মূর্ত্তি। মাঝের মঞ্চটীতে সচরাচর মেরীর মূর্ত্তি থাকে আজ তাহার পরিবর্ত্তে একটী শিশুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয় বুঝিয়াছ শিশু যীশু দোলনায় শুইয়া আছেন।

তিনটী বেদীই নানা প্রকার বহু মূল্য বস্ত্রে সজ্জিত। শুনিলাম ইহার কতকগুলি পোপ উপহার দিয়াছেন। বেদীর নিকট জরীর কাজ করা কাপড় ও রৌপ্য দণ্ডের কতকগুলি নিশান। বেদীর উপর দীর্ঘ কতকগুলি মোমবাতী ও কৃত্রিম ফুলের রাশি। প্রথম আসিয়াই একটা কথা শুনিয়া একটু নিরাশ হইলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম আজই রোমানকাথলিকদের সমুদয় ক্রিয়া পদ্ধতি দেখিতে পাইব কিন্তু আসিয়া শুনিলাম আজ প্রধানতঃ confession day অর্থাৎ লোকদিগের পুরোহিতের নিকট দোষ স্বীকারের দিন। রোমানক্যাথলিকদিগের বিশ্বাস পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিলে পুরোহিতের কৃপায় তাহারা পাপের দণ্ড হইতে মুক্তি পাইতে পারে। শুনিলাম অন্যান্য ক্রিয়া পরে হইবে, উৎসব ৩।৪ দিনে সম্পূর্ণ হয়। দোষ স্বীকার করার কথা শুনিয়া কোথায় হইতেছে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম গৃহ মধ্যস্থ একটী আলমারির নিকট একজন লোক নতমুখে জানু পাতিয়া বসিয়া আছে, বুঝিতে পারিলাম না পুরোহিত কোথায়। একটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন ঐ আলমারির ভিতর। তখন আশ্চর্য্য মনে হইল। দোষ স্বীকারকারীদের তিনি দণ্ড-বিধান করেন বটে কিন্তু নিজের দণ্ডও বড় কম নহে! যাহাতে গুরু শিষ্যে না দেখা হয় সেইজন্য এই আলমারির বন্দোবস্ত। ইহাতে দোষীর লজ্জা হইবে না এবং গুরুও অপক্ষপাতী থাকিবেন।

আমরা আলমারির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। আলমারির নিম্নভাগ কাষ্ঠের, উর্দ্ধভাগ সূক্ষ্ম লৌহজাল নির্ম্মিত। আলমারির মধ্যে একজন লোক বসিতে পারে। আলমারির বাহিরে অনুতপ্ত ব্যক্তি অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে। সে স্বর কেবল পুরোহিতের কর্ণে গিয়া পৌছিতেছে, পুরোহিতও অতি মৃদু স্বরে কথা কহিতেছেন। তাহাদের সেই অতি অস্পষ্ট স্বর আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, না জানি কোন রমণী কি শোক কি পাপ তাপে ব্যথিত হইয়া গুরুর আশ্বাস বাণীতে শান্তি লাভ করিতে এখানে আসিয়াছে? আর তুমি পুরোহিত কে? তুমি কি এই হৃদয় গুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতেছ, তাহাদের প্রাণের কথা গুলি শুনিয়া মনে মনে উপহাস করিতেছ, তোমার আশ্বাসে মুগ্ধ হইতেছে বলিয়া নির্ব্বোধ ভাবিতেছ, না ব্যথিতের সঙ্গে অদৃশ্যে তুমিও অশ্রুজল মিশাইতেছ? হৃদয়ের সহিত তাহাদের শুভ কামনায় আশীর্ব্বাদ করিতেছ? ব্যথিত হৃদয় গুলিতে সান্ত্বনা বারি সেচন করিয়া তাহাদের নবজীবন দিয়া সংসারে ফিরাইতেছ? কে তুমি পুণ্যবান, তোমার কি সত্যই এত ধর্ম্ম বল আছে, তুমি যে পাপীদিগকে পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিতে পার?

রমণীর দোষ স্বীকার হইয়া গেল। রমণী উঠিয়া মেরীর প্রতিমার নিকট জানু পাতিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে কপালে ও উভয় স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করিয়া ক্রুস চিহ্ন করিয়া উঠিলেন। বেদীর উপর একটী ছোট ক্রুস ছিল সেইটী

চুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। এই একটী চুম্বনে দেবীর নিকট কত কথা বলা হইল। এ চুম্বনের ভাব—

"আঁখিজল মুছাইলে জননী,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো, ধন্য ধন্য তব করুণা!
দেখেছি আজি তব প্রেম মুখ-হাসি, পেয়েছি চরণ ছায়া,
চাহিনা আর কিছু, পূরেছে কামনা, ঘুচেছে হৃদয় বেদনা।"

একে একে সকলে আসিয়া দোষ স্বীকার করিয়া গেল। শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে সকলে নিজ স্থানে আসিয়া বসিল, অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। ব্যাণ্ডের সুর আনন্দময় ব্যাণ্ডে যে অত ভাব অত আনন্দ অত আশ্বাস আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। সে আনন্দের স্বরে সকলের প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ব্যাণ্ডের সুরে আমি শুনিতে লাগিলাম,

"তাঁহার আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
সে আনন্দ রস পানে চির প্রেম হৃদে জাগে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে রয়ে।"

আনন্দের সুরে আনন্দের স্মৃতি মনে জাগে। আমার ছেলেবেলার আনন্দময় উৎসবের একটি দিন বড় মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন ১১রই মাঘে প্রত্যূষে উৎসবের বাঁশি বাজিয়া উঠিলে আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কিরূপ আহ্লাদ ভরা প্রাণ লইয়া পাল্লাপাল্লি করিয়া বাহিরে ছুটিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। সে রাগিণীটি আজ ঠিক মনে নাই—ছুটিবার সময় আমি যে ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার মুখখানিও আজ ঠিক মনে নাই—সমস্তটা লইয়া প্রাণে কেবল একটা স্বপ্নঘোর আছে। আজ ব্যাণ্ডের সঙ্গে সেই স্বপ্ন একবার জাগিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল ব্যাণ্ডের কাজ শেষ হইল ব্যাণ্ড থামিয়া গেল।

সময় বুঝিয়া পুরোহিতেরা বেদীতে উঠিলেন। ইঁহাদের গায়ে সারপ্লিস বলিয়া সাদা এক প্রকার লম্বা কাপড়।* কাপড়ের হাত নাই। অন্যান্য কাপড়ের উপর এটী পরিয়াছেন। দোনলার সম্মুখস্থ বেদীতে উঠিয়া পুরোহিতেরা স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাদের বেদ পাঠ ইঁহারা কোথা হইতে শিখিলেন। কি কথা বলিতেছিলেন জানিনা উপাসকেরা বই খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পরে শুনিলাম লাটিন ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতিগান হইতেছিল। আমি কিন্তু লাটিন আরবী ফার্সী কিছুই শুনিতে পাইলাম না, কেবল সেই মধুর গম্ভীর স্বর অর্গানের মৃদুসুরের সহিত

মিলিত হইয়া গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে ভক্তি উঠাইতেছে ইহাই অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি আজীবন যে স্তব শুনিতেছি আমার কর্ণে তাহাই যেন স্পষ্ট বাজিতেছিল। শুনিতেছিলাম, শ্রোতস্য শ্রোত্রং মনসো মনোযদ্বাচোহ বাচংসউ প্রাণস্য প্রাণ চক্ষুষ শ্চক্ষুঃ, ইত্যাদি।

একটু পরে স্তব থামিয়া গেল, সকলে নীরবে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। সহসা এ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আবার অর্গান বাজিয়া উঠিল। সুর ক্রমে উচ্চে উঠিল—দিকে দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল, যেন স্তুতিগানে তাহারও হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে, যেন এ গৃহে তাহার আনন্দ প্রকাশের স্থান কুলাইতেছে না, সে যেন বাহিরে গিয়া জগৎ সংসারকে তাহার আনন্দ বিতরণ করিতে চায়। আবার সে উচ্চধ্বনি মিলাইয়া গিয়া অতি কোমল স্বর উঠিল। এ তাঁহার করুণা গান। কখন কখন শুধু বাজনা কখন শুধু স্তব কখন উভয়ে মিলিয়া স্তব হইতে হইতে ক্রমে স্তব শেষ হইয়া গেল। তখন প্রধান পুরোহিত আরতি আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য পুরোহিতদের মধ্য হইতে দুই জন দুইখানি রূপার রেকাবী হাতে লইয়া লোকদিগের নিকট দান সংগ্রহ করিতে আসিলেন। যাহার যাহা ইচ্ছা রেকাবীতে রাখিয়া দিল। আরতিতে প্রধানতঃ ধূপ ধূনা ও ঘণ্টা বাজান দেখিতে পাইলাম। ধূনার পাত্র হাতে লইয়া পুরোহিত যীশুকে বরণ করিলেন তাহাও দেখিলাম, কিন্তু এই পাত্রগুলি কি রকম ও তৎসঙ্গে আর কি অনুষ্ঠান হইতেছিল তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমরা এই স্থান হইতে একটু দূরে ছিলাম,লোকের আড়ালে তাহা চোখে পড়িল না। পুরোহিত এক-বার বরণ করিয়া জানু পাতিয়া একটু বসিলেন, বোধ হয় ইহা আমাদের প্রণামের বদল। তার পর আবার বরণ করিলেন, আবার জানু পাতিয়া বসিলেন। এইরূপে তিনচারিবার যীশুকে বরণ হইয়া গেলে সেই বেদী হইতে মেরীর বেদীতে গিয়া মেরীকে বরণ করি-লেন। তাহার পর পুনরায় যীশুর বেদীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এ প্রার্থনা স্তুতিগীত নহে। আরতির পর উপহার দানের পূর্ব্ব আয়োজন। ঈশ্বরের নিকট পুরোহিত উপহার আনিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পুরোহিত পাপী তাপাদের আশ্বাস দিয়াছেন, তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এ মুক্তি দিলেন? এই মুক্তির পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নিকট কি উৎসর্গ আনিয়াছেন? দেবীর সম্মুখে শ্বেত সাটিন মণ্ডিত একটী কি দ্রব্য ছিল। পুরোহিত গিয়া সেটী খুলিয়া দিলেন। খ্রীষ্টানেরা ইহাকে host বলেন। ইহা একটী ক্রুস আর তাহার উপর একটী রৌপ্য চক্রের মধ্যে এক টুকরা পবিত্র রুটী। মনে করিয়া লইতে হইবে ইহা যীশুর দেহ। ক্রুসবিদ্ধ যীশুদেহ ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়া সকলে পাপ তাপ হইতে মুক্তি পাইলেন। একটী কোমল রমণীকণ্ঠ যীশুর মৃত্যু কাহিনী গাহিতে লাগিলেন। সঙ্গীত সপ্তসুরে ছুঁইয়া ছুঁইয়া সুর হইতে

হিমরজনীর ম্লান জ্যোৎস্নার ন্যায়—শুষ্ক ফুলের আকুল সুবাসের ন্যায় সে মধুর শোক-গীত হৃদয়ে হৃদয়ে কি এক আকুলতা ঢালিয়া দিল। গ্রামে গ্রামে উঠিয়া পড়িয়া হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম ঢালিয়া দিল। জগৎ সংসার অতীত হইয়া গেল। কেবল যীশুর ক্রুসবিদ্ধ মূর্ত্তি সেই জ্যোতির্ম্ময় স্থানের চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। উপাসকেরা অবনত জানুতে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যীশুকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সঙ্গীতটী এমন সুমধুর এমন হৃদয়স্পর্শী যে মনে হইতেছিল যেন এ মায়াপুরী। সঙ্গীতের সঙ্গে যে বাজনা ছিল তাহা দ্বারা সঙ্গীতটী আরও মধুর হইয়াছিল। বাজনা একরকম নহে, কখন বেহালা কখন অর্গান কখন বাঁশীর স্বরে সুর মিলিতেছিল। এমন করিয়া মিশিতেছিল যে কোথায় কোনটীর শেষ কোথায় কোনটী আরম্ভ তাহা বুঝিব'র যো ছিল না। মিলিয়া মিশিয়া সকলে একটি সুমধুর রাগিণী সৃজন করিতে ছিল। এ শোক সঙ্গীতের নাম mass।

আমার পার্শ্বস্থ বন্ধুটী এই সময় আমাকে বলিলেন "শীঘ্র বাহিরে এস নহিলে বসিবার জায়গা পাইবে না। কোথায় যাইব বুঝিলাম না অথচ-তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতিতে বাহিরে আসিলাম। তিনি বলিলেন এবার বাজী পোড়ান হইবে। বাহিরে গিয়া আর একটী ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটী জনতাপূর্ণ। ঘরের বারান্দার সম্মুখেই মাঠ, মাঠের পরে গঙ্গা। মাঠে বাজী পোড়ান হইবে, বারান্দায় বসিয়া দেখিবার স্থান।

উপাসনার সময় খৃীষ্টান ভিন্ন কেহ গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু বাজী দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক আসে। অখ্রীষ্টানের মধ্যে উপাসনার সময়ে কেবল আমরা উপস্থিত ছিলাম। সেটা বন্ধুত্বের অনুরোধ। ইহা লইয়া একটা মজা হইয়াছিল। আমাদের পরিচিত কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোকের গির্জার মধ্যে যাইতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খৃীষ্টান নহেন বলিয়া যাইতে পারেন নাই। বাহিরে বাজী দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমাদের বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। একজন আসিয়া আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি খৃীষ্টান? তিনি বলিলেন 'না'। তাহাতে মুসলমানটি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "Oh thank you"। খৃীষ্টান না শুনিয়া তাঁহার বোধ হয় মনে হইল আমাদের এখনও আশা ভরসা আছে এবং সে জন্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র!

বাজীর বর্ণনা আর কি করিব। ভাল ভাল অনেক বাজী ত অনেকেই দেখিয়াছেন। অন্যান্য প্রকার ভাল ভাল অগ্নিময় দৃশ্যের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটী দৃশ্য নূতন ছিল। বাজীর পর মন্দিরের পুরোহিত আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া মদ চা ও মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। মদটা আমরা বাদ দিয়া অপর দুইটী লইলাম। যত রোমান কাথলিক উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরও আর একটী গৃহে খাবার দেওয়া হইল। এটী উৎসবের

সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক একটী ক্রিয়া কি না ঠিক বুঝিলাম না। একবার বোধ হইল 'লর্ড্‌স্‌ সাপার' নামক রুটী ও মদ খাইবার যে ধর্ম্ম প্রথা আছে ইহা তাহার একটী অঙ্গ।

পুরোহিতগণের মধ্যে কেহ কেহ গোয়া হইতে আসিয়াছিলেন। গির্জ্জার পুরোহিত আমাদের বিশেষ রকম যত্ন ও আদর দেখাইয়াছিলেন। অন্যান্য পুরোহিতগণও আমাদের সহিত আলাপাদি করিলেন ও নানা প্রকারে শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশ করিলেন।

তাহার পর আমরা যখন বাড়ী আসিলাম তখন রাত ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল। নীরব রজনীতে জোৎস্নাময়ী নদীর খেলা দেখিতে দেখিতে গৃহে পৌঁছিলাম।

উৎসবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গান আমার ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা ভিন্ন

বান্দেলের এ উৎসবময়ী সাজ সজ্জা অপেক্ষা আর একদিন বিকালে আমরা ইহার যে সাদাসিদে দীন হীন ছবি দেখিয়াছিলাম তাহা এ জ্যোতির আড়ম্বর অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। তখন সন্ধ্যার আকাশে চিত্র বিচিত্র মেঘ খেলা করিতেছে। আধ আলো আধ ছায়ায় মাতা শিশু কোলে লইয়া আকাশ মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে আপন মনে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রেম জগতে ভাসিয়া যাইতেছে। গঙ্গা তাঁহার প্রেমের গান গাহিয়া গাহিয়া উপকূল গুলি প্রেমের স্রোতে শ্যামল করিয়া সকলকে ডাকিতেছে, আয় কে তোরা ব্যথিত, কোথায় আছিস আয়। ওই দেখ মা ডাকিতেছেন আয়। গৃহের মধ্যে বেদীর উপর দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। দেয়ালে দেয়ালে তাঁহার প্রেমের শত দৃশ্য শোভা পাইতেছে, দেবীর সম্মুখে চির প্রদীপ জ্বলিতেছে। এ প্রদীপ একটী শিশুর প্রাণ। অভাগা পিতা তাহার প্রাণের ধন হারাইয়া তাহার স্মরণার্থে দেবীর নিকট এই প্রদীপ রাখিয়া দিয়াছেন। পদতলে শত শত মৃত। তাহারা বলিতেছে এই দেখ পরিণাম। দেয়ালের দৃশ্যগুলি বলিতেছে না ভয় নাই ঐ দেখ দেবী। পাপী তাপী হৃদয়ে আশ্বাস পাইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। দেবী দেখাইতেছেন এই দেখ আলো, এই শিশুর প্রাণের ন্যায় তোমাদের প্রাণেও জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে, চিরজ্যোতির্ম্ময় প্রাণ পাইবে, এই দেখ আমার ক্রোড়ে সন্তান, তোমরাও এ মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইবে। সে আশ্বাস বাণী শুনিয়া মৃত ব্যক্তিও প্রাণ পাইতেছে। তবে এ আড়ম্বর কেন?

শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের প্রতিপক্ষ মহাশয়ের অনুভবাতীত অজ্ঞেয় সত্তা বুঝিয়া ওঠা লোকের অসাধ্য বলিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে পদার্পণ করিলে পরিশেষে অজ্ঞানান্ধকারের রসাতল-গর্ত্তে দিক্ বিদিক্ হারাইয়া হতজ্ঞান হইতে হয়। তাহার উত্তরে প্রতিপক্ষ মহাশয় বলিতেছেন "না বুঝিলেই বাঁকা।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অনুভবাতীত অজ্ঞেয় সত্তা আমরা তো বুঝিতে পারিই না,—বিপিন বাবু নিজে তাহা বুঝিতে পারেন কি না—সন্দেহ। কেননা তিনি যদি তাহা বুঝিতে পারিতেন তবে আর তাহাকে অজ্ঞেয় বলিতেন না; যদি তাহা স্বীয় অন্তরে অনুভব করিতেন, তবে আর তাহাকে অনুভবাতীত বলিতেন না। বিপিন বাবুকে আমরা তাই বিনীত ভাবে বলি যে, তিনি তাঁহার আপনার ধ্যানের বিষয়টি আপনি তদ্গত চিত্তে অনুভব করিয়া দেখুন্; যখন তিনি তাহা স্বীয় অন্তঃকরণে অনুভব করিবেন, তখন আর তাহাকে তিনি অনুভবাতীত বলিবেন না; কিন্তু যতক্ষণ না তিনি তাহা আপনার অন্তরে আপনি অনুভব করেন, ততক্ষণ তিনি অন্যকে তাহা অনুভব করাইতে চেষ্টা করিবেন না; কেননা, আপনি না বুঝিয়া অন্যকে বুঝানো—আপনি না মাতিয়া অন্যকে মাতানো—দেবতারও অসাধ্য। এই তো গেল অনুভব; তাহার পরে আসিতেছে—শাস্ত্র।

বিপিন বাবু হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান্; কিন্তু শাস্ত্র-বচনের তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে আমরা সায় দিই না বলিয়া তিনি এরূপ মনে করিবেন না যে, হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন। আমাদের দেশের কোন পুরাতন সত্য যদি এখনকার কালের কোন সুবিখ্যাত বিদেশীয় পণ্ডিতের লেখনী হইতে নূতন বেশে বাহির হয়—তবে সে তো আরো আমাদের দেশের গৌরবেরই বিষয়। সত্য নিজে হিন্দুও নহে, ম্লেচ্ছও নহে, যবনও নহে; ম্লেচ্ছ যবনের সহিত হিন্দুর আড়াআড়ি থাকিতে পারে—কিন্তু যাবনিক সত্যের সহিত হিন্দু সত্যের সেরূপ আড়াআড়ি থাকিতে পারে না;—উল্টা আরো এইরূপ দেখা যায় যে, সকল সত্যেরই সঙ্গে সকল সত্য অকাট্য সৌহার্দ্দ-সূত্রে গাঁথা। প্রকৃত হিন্দু-শাস্ত্র কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিতে বলে না; এমন কি সামান্য হিতোপদেশেও আছে যে, উদার-চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং। শাস্ত্র-চর্চ্চার ভিতরে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি প্রবেশ করিলে গোয়াল-ঘরে ব্যাঘ্র প্রবেশ করে—তাহা হইলে গরু-গুলা যেমন দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া পলায়ন করে—সত্য তেমনি বুদ্ধির শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া অতিষ্ঠ হইয়া পলায়ন করে। বিপিন বাবুর অভিপ্রায় যদি শুধু কেবল এই-মাত্র হয় যে, ধর্ম্ম-

বিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রে এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, তজ্জন্য আমাদিগকে আর কোন দেশের দ্বারস্থ হইবার আবশ্যকতা নাই, তবে তাহা তো আমারদেরই কথা—সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অণুমাত্রও মত-ভেদ নাই। কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া অধিকন্তু তিনি যদি বলেন যে, বিদেশীয় শাস্ত্র-সমূহ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বে একেবারেই বঞ্চিত, অথবা বিদেশীয় কোন দার্শনিক সত্যের সঙ্গে এদেশীয় কোন দার্শনিক সত্যের কোন অংশেই ঐক্য থাকিতে পারে না—তবে সেরূপ বিপর্য্যয় গোঁড়ামিতে আমরা নাই! স্বদেশ বিদেশ সকল দেশেরই সাধু লোক আমাদের পূজ্য ও সকল দেশেরই সাধু বাক্য আমাদের শিরোধার্য্য। অনৈক্য কেবল উপরে উপরে বাহিরে বাহিরে; ভিতরে ভিতরে সকলেরই সঙ্গে সকলের ঐক্য রহিয়াছে। যাঁহারা বিবাদ-প্রিয় তাঁহারা অনৈক্যের প্রতিই সবিশেষ ঝোঁক দে'ন—যাঁহারা শান্তি-প্রিয় তাঁহারা ঐক্যের প্রতিই সবিশেষ ঝোঁক দে'ন; পুষ্পের মধ্য হইতে কোন ভৃঙ্গ মধু চয়ন করে—কোন ভৃঙ্গ রেণু চয়ন করে—ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। এমন কি, বিপিন বাবুর সহিত আমাদের এত যে মতভেদ তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের উভয়ের মধ্যেই ঐক্য রহিয়াছে, সেইটি বুঝিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যায়। সেটি এই;—

জীবাত্মা তো আর পরমাত্মা হইতে সমূলে বিচ্ছিন্ন নহে,—প্রকৃতির দিক্ দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ রহিয়াছে—আত্মার দিক্ দিয়া জ্ঞান-প্রেমের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে আমরা পরমাত্মার অসীম সত্তা এবং অসীম জ্ঞান-প্রেম অন্তঃকরণে অনুভব করি, তাই আমরা বলি যে পরমাত্মা আমাদের অনুভব-গম্য। বিপিন বাবু মুখে যাহাই বলুন্ না কেন—অন্তঃকরণে তিনি যদি চৈতন্য-স্বরূপকে অনুভব করিয়া তাঁহার রসাস্বাদন না করিতেন, তবে সে সম্বন্ধে কোন কথারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না; কেননা যাহা একান্ত পক্ষেই অজ্ঞেয় তাহার আলোচনা-পর্য্যন্ত সম্ভবে না; মাথা না থাকিলে মাথাব্যথা সম্ভবে না। এই গেল শাস্ত্র-সমূহের বাহ্য অনৈক্যের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য। তাহার পরে আসিতেছে—দ্বৈতাদ্বৈতের মতভেদ।

ব্যাসের বেদান্ত-সূত্র—গ্রন্থ একটি বই নয়; কিন্তু তাহা হইতে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা-শাস্ত্র বহির্গত হইয়াছে;—সকল শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া যদি আসল কথাটির প্রতি প্রণিধান করা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, পরব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতং; অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক হিসাবে দ্বৈত নহেন—অদ্বৈত; আর এক হিসাবে অদ্বৈত নহেন—দ্বৈত; যথা;—পরমাত্মা দ্বৈত নহেন; কেননা তাঁহাকে ছাড়িয়া জগৎ কিছুই নহে; সূর্য্যকে ছাড়িয়া সূর্য্য-রশ্মি কিছুই নহে; অদ্বৈতও নহেন—কেননা তিনি এবং তাঁহার ঐশী শক্তি দুয়ের মধ্যে যেমন অভেদও আছে তেমনি প্রভেদও আছে—সূর্য্য রশ্মি

কিছু আর স্বয়ং সূর্য্য নহে। এমন কি, বেদান্ত মতে, মুক্ত জীব যদিচ আর আর অংশে ঈশ্বরের সহিত সমধর্ম্মী কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব—এক কথায় ঐশী-শক্তি—মুক্ত জীবেও বর্ত্তিতে পারে না, যথা;—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের উপসংহার ভাগে বলিতেছেন—"জগদুৎপত্তি-ব্যাপারং বর্জয়িত্বা অন্যদ্ অনিমাদ্যাত্মকম্ ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতু মর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য।" ইহার অর্থ; জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অণিমা-আদি আর যত প্রকার ঐশ্বর্য্য আছে—সমস্তই মুক্ত পুরুষের অধিকারায়ত্ত; জগদ্ব্যাপার কিন্তু শুদ্ধ কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই অধিকারায়ত্ত। মুক্ত জীবই যখন ঈশ্বর হইতে ভিন্নধর্ম্মী, তখন বদ্ধ জীবের তো কথাই নাই। তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ নিছক অদ্বৈত-বাদ—তাহাতে দ্বৈতবাদের নাম গন্ধও নাই! অতএব সকল শাস্ত্রেরই সার সিদ্ধান্ত এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে এক হিসাবে যেমন প্রভেদ আছে, আর এক হিসাবে তেমনি অভেদ আছে; অভেদের মধ্যে প্রভেদ আছে—প্রভেদের মধ্যে অভেদ আছে। সামান্য একটি বৃক্ষের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায় যে, বৃক্ষ এবং তাহার শাখা-পত্র দুয়ের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তবুও দুয়ের মধ্যে প্রাণে প্রাণে অভেদ রহিয়াছে; কেননা, শাখা পত্র ফল ফুল বাহির-হইতে বৃক্ষের গাত্রে জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই—সমস্তই বৃক্ষের প্রাণের ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত। যদি বল যে, জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে অভেদই বা কোথায়—প্রভেদই বা কোথায়? তবে তাহার উত্তর এই যে, পরমাত্মার যতটুকু জ্ঞান প্রেম জীবাত্মা আত্মসাৎ করিয়াছে সেইটুকু জ্ঞান প্রেম পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি;—এইখানেই অভেদ; কিন্তু তদতিরিক্ত জ্ঞান-প্রেম জীবাত্মার নহে কিন্তু পরমাত্মারই, এইখানে প্রভেদ। ইহার একটি মোটামুটি দৃষ্টান্ত;—একটি খণ্ড আকাশ এবং অসীম মহাকাশ দুয়ের মধ্যে কি অভেদ নাই? অবশ্যই আছে; খণ্ড-আকাশটির পরিধি-পর্য্যন্ত যতখানি প্রদেশ তাহা খণ্ড আকাশটিরও অন্তর্ভূত, মহাকাশেরও অন্তর্ভূত—তাহা উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি; এইখানেই উভয়ের অভেদ। তেমনি আবার, খণ্ড আকাশটির পরিধির বাহিরে যে অসীম প্রদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা খণ্ড আকাশটির অন্তর্ভূত নহে—তাহা মহাকাশেরই অন্তর্ভূত; এইখানে উভয়ের প্রভেদ। আমরা তাই বলি যে, "দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতং" অর্থাৎ কেবল যে, অদ্বৈত তাহাও নহে—কেবল যে দ্বৈত তাহাও নহে। সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্রে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের এই কথায় সায় দিবেন। তাহার সাক্ষী কুলার্ণব তন্ত্র বলেন—

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতং॥"

বিপিন বাবুর পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু-শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে আমরা কেন যে এত কাতর তাহা নিম্নে প্রকাশ পাইবে।

বিজ্ঞান ভিক্ষু একস্থলে বলিয়াছেন যে, মরণাদিতে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হয়; এই কথাটির শাস্ত্রসঙ্গত অর্থ এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না যে, মৃত্যুকালে বুদ্ধি-বৃত্তি দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করে—দেহ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে; এ নহে যে, মৃত্যু-কালে বুদ্ধি-বৃত্তি আত্মাকেও ছাড়িয়া পালায়। আমরা যদি বলিতাম যে, তৎকালে দেহ শুধু নয় কিন্তু স্বয়ং আত্মা—চৈতন্য রূপী আত্মা স্বয়ং—অচৈতন্য হয়, লক্ষ্মী নিজে লক্ষ্মী ছাড়া হ'ন, তবে বিপিন-বাবুর শাস্ত্র অনুসারে তাহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রসারিত ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারিত! অথচ বিপিন বাবু আপনিই বলিয়াছেন যে, "হিন্দু-শাস্ত্র বুঝিতে হইলে সমন্বয়-দৃষ্টিতে মর্ম্ম গ্রহণ আবশ্যক!" সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র যখন একবাক্যে বলে যে,মৃত্যুকালে বুদ্ধি মন এবং অহঙ্কার সম্বলিত সূক্ষ্মশরীর লইয়া আত্মা পরলোকে গমন করে, তখন বিজ্ঞান ভিক্ষুর উপরি-উক্ত ঐ কথাটির এরূপ অশাস্ত্রীয় অর্থ ব্যাখ্যা করা কি ভাল যে,মৃত্যু-কালে বুদ্ধিবৃত্তি আত্মাকেও ছাড়িয়া পালায়? "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" গঙ্গাতে ঘোষ পল্লী—এ কথা বলিলে কি এই বুঝায় যে, গঙ্গার অভ্যন্তরে ঘোষ-পল্লী? না এই কেবল বুঝায় যে, গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী। তেমনি "মৃত্যুকালে বুদ্ধি-লোপ হয়" বলিলে শাস্ত্রানুসারে ইহাই কেবল বুঝায় যে, দেহ হইতে বুদ্ধি-বৃত্তি পলায়ন করে—এরূপ বুঝায় না যে আত্মা হইতেও বুদ্ধি বৃত্তি পলায়ন করে। "মৃত্যু-কালে বুদ্ধি-বৃত্তি আত্মাকে ছাড়িয়া পালায়" এইরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথায় আমরা ঘাড় পাতিতে অক্ষম বলিয়া বিপিন বাবু হাহুতাশ করিয়া বলিয়াছেন—"শাস্ত্রগুলা কি এতই কাদার ডেলা যে, তাহা হইতে যাহা ইচ্ছা গড়িলেই হইল?" তাঁহার মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কেননা আমাদের অপরাধ শুদ্ধ কেবল এই যে, আমরা বলিয়াছি "পুরুষে অনুমানাপেক্ষা নাস্তি" বিজ্ঞান-ভিক্ষুর এই যে একটি বচন, ইহার অর্থ—আত্মা অনুমান-সাপেক্ষ নহে; বিপিন বাবুর শাস্ত্র অনুসারে "অনুমানাপেক্ষা নাস্তি" ইহার ভাবার্থ—তাৎপর্য্যার্থ—ঠিক্ তাহার বিপরীত; কি? না অনুমান-সাপেক্ষ। বিজ্ঞান-ভিক্ষু যে স্থানে আত্মাকে অনুমান-নিরপেক্ষ বলিয়াছেন ও প্রকৃতি-বিবেককে অনুমান-সাপেক্ষ বলিয়াছেন—বিপিন বাবু সেইখানে তাহার অর্থ এইরূপ ঘটাইতেছেন যে, আত্মা অনুমান সাপেক্ষ। তাহার পরে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া টানাটানি। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে পঞ্চকোষে অহংবৃত্তি নিয়োগ করিলে অর্থাৎ দেহোহং প্রাণোহং মনোহং বুদ্ধিরহং আনন্দোহং বলিলে, তাহাকেই বলে অভিমান; কিন্তু বিপিন বাবুর কথার ভাবে দাঁড়াইতেছে এই যে, পঞ্চকোষের সাক্ষীরূপী আত্মাতে অহংবৃত্তি নিয়োগ করিলে, আত্মাহং বা চৈতন্যোহং বলিলে—তাহাও অভিমান; কেননা বিপিন বাবুর মতে

"নায়ং একান্তেনাহ্ বিষয়ঃ অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" ইহার অর্থ আমরা তো এই বুঝি যে, "আত্মা একান্ত পক্ষেই যে, অবিষয়, তাহা নহে, যেহেতু আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের-বিষয়; বিপিন বাবু বলেন যে, আত্মা একান্ত পক্ষেই অবিষয়, আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়েরও বিষয় নহে; এইরূপে বিপিন বাবু হয়'কে নয় করিতেছেন—নয়'কে হয় করিতেছেন, অথচ কথায় কথায় হিন্দু-শাস্ত্রের দোহাই দিতে ছাড়িতেছেন না। বিপিন বাবু যদি পাঠক-বর্গকে তাঁহার এই, নূতন শাস্ত্রটি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, "অনুমানাপেক্ষা নাস্তি" ইহার অর্থ অনুমান-সাপেক্ষ, আর, "নায়ং একান্তেনঅবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ" ইহার অর্থ আত্মা একান্ত-পক্ষেই অবিষয়—আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়েরও বিষয় নহে; তাহা হইলে পাঠকবর্গ আমাদিগকে যে দণ্ড দিবেন তাহাই আমরা ঘাড় পাতিয়া লইব। নচেৎ, তিনি যদি কোন একজন অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে শব্দাড়ম্বরের ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে এইরূপ বুঝা'ন্ যে, হিন্দু-শাস্ত্রের মতানুসারে সাক্ষী চৈতন্য স্বয়ং অচৈতন্য—সূর্য্য স্বয়ং হতজ্যোতি, তবে তিনি যে কি বুঝাইলেন, আর, পাঠক যে কি বুঝিলেন, উভয়ই আমাদের বুদ্ধির অতীত। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তো সোজা সুজি এই বুঝি যে, আলোক দ্বারা যাহা কিছু দেখা যায় তাহারই নাম দৃশ্য, জ্ঞান দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি করা যায় তাহারই নাম জ্ঞেয়। যাহা অদৃশ্য (যেমন বায়ু বা আকাশ) তাহা যিনি চক্ষে দেখিতে পা'ন,আর, যাহা অজ্ঞেয় (যেমন কেন্দ্র-বিহীন চক্র—অহং-বিহীন জ্ঞান—গোড়া-বিহীন আগা) তাহা যিনি জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তিনি খুবই একজন অসাধারণ মহাপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু আর কেহ যে তাঁহার কথার অর্থ বা মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নেই নাস্তি। এ তো সকলেরই জানা কথা যে, চক্ষু দুটিকে উন্মীলন না করিয়া—উন্মূলন করিলে, মধ্যাহ্ন দিবালোকেও অদৃশ্য হইয়া যায়; জ্ঞানকে উন্মূলন করিলে সকলই অজ্ঞেয় হইয়া যায়। যিনি স্বীয় জ্ঞা-নের মূলোচ্ছেদন করিয়া তাহার পরিত্যক্ত সিংহাসনে অজ্ঞানকে অভ্যর্থনা করিয়া বসান'—তাঁহার নিকটে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকও অজ্ঞেয় হইয়া যায়; কিন্তু সাধ করিয়া কে আপ-নার চক্ষে আপনি ঠুলি দিয়া সূর্য্যালোককে অন্ধকারে নিমগ্ন করিবে? তাহা যদি কেহ করেন—জ্ঞান-জ্যোতি দিয়া যদি অজ্ঞান-তিমির ক্রয় করেন—মণিরত্ন দিয়া যদি ধূলি-রাশি ক্রয় করেন, আর, বলিলে বলেন "শাস্ত্র যাহা করিতে বলে তাহাই আমি করিয়াছি—শাস্ত্রের তুমি কি ধার ধারো! বেস্ করিয়াছি—খুব করিয়াছি!" এ যদি বলেন, তবে সে রোগের ঔষধ নাই;—অতএব মিছামিছি আর তর্ক বিতর্কে প্রয়োজন করে না—এই খানেই শান্তিঃ শান্তিঃ হউক্!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূত কথা।

প্রাচীন কাল হইতে লোকে ভূত সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানব জাতির অদৃষ্টে ভূত-দর্শন কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশভেদে কালভেদে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভূত সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে তাহাতে বুঝা যায় যে, মোটামুটী ভূতের কল্পনা অনেক দেশেই এক। শ্মশানে এবং গোরস্থানেই অধিকাংশ ভূতের বাস। তবে শুভাদৃষ্টের বলে আমাদের দেশের অনেক ভূত বৃক্ষশাখায় আধিপত্য লাভ দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে। যাহাদের অদৃষ্টে বৃক্ষশাখা জুটে নাই তাহারা এখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকে। কিন্তু শাখাবলম্বীদিগের ন্যায় তাহারা বিখ্যাত হইতে পারে না।

বিলাতী ভূতেরা মোরগের ডাক শুনিলে যেমন অন্তর্হিত হয় আমাদের দেশের ভূতেরা সেরূপ কোন পাখীর ডাকে পলাইয়া যায় না। তাহারা ওঝার মন্ত্র ও রাম-নামের বশ। দেশের গুণে তাহাদের সাহস কিছু কম—লৌহের ত্রিসীমায় তাহারা আসিতে চাহে না। কিন্তু সাহসের অভাব আনুনাসিক স্বরের দ্বারা একরকম পুষা-ইয়া গিয়াছে। নাকি স্বরে বক্তৃতা করিতে দেশীয় ভূত যত পারদর্শী বিদেশের ভূত গোষ্ঠী তাহার সিকিও নহে। এই জন্য আশা করা যাইতে পারে যে, ভূতেরা যদি কোন কালে সভা করিতে শিখে তাহা হইলে বাঙ্গলার ভূতই সভাপতি এবং বক্তার আসন গ্রহণ করিবে।

সে কথা যাক্, আর ভবিষ্যদ্বাণীতে কাজ নাই। বাঙ্গলাদেশের ভূতেদের মধ্যে অনেক প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মদৈত্য, কেহ শুধু ভূত, কেহ পেত্নী, ইত্যাদি। মাম্‌দো ভূত নামক আর এক জাতীয় অত্যাচারী ভূতেরও এদেশে নাম শুনা যায়। কিন্তু এই জাতীয় ভূত হিন্দু নহে—মুসলমান। প্রাচীন কালে এদেশে ইঁহাদের প্রাদুর্ভাব ছিল না। মুসলমান অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে এই অত্যা-চারী ভূতদলের নাম প্রচার হয়। কিন্তু কালের গতিক দেখিয়া মনে হয়, গৌরাঙ্গ ভূতের নামে মাম্‌দোর ভয় ডুবিয়া যাইবে।

ব্রহ্মদৈত্যেরা ভূত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব—হাজার হউক্ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম কিনা। ইহাদের মনে তেমন নীচ ভাব নাই। পূজা আহ্নিকের দিকেই ইহাদের মতি। তবে অনিষ্ট করিলে ইহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। শুনা গিয়াছে, বাস বৃক্ষে থুঁথু ফেলার জন্য অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মদৈত্যকে শান্তিপ্রিয় বলিতে হইবে। ইহাদের বেশভূষা ব্রাহ্মণের মত। গলায় উপবীত, কাঁধে

চাদর, পায়ে খড়ম। শুনা যায়, আকৃতি নাকি অমানুষিক। এমন কিছু নয়—হস্তদ্বয় তালগাছ অপেক্ষা দুই হাত লম্বা, পদযুগল যোজন-লম্বিত।

সামান্য ভূতেরা ব্রহ্মদৈত্যের মত প্রভাবশালী নহে। কিন্তু তাহারাই লোকের অনিষ্ট করিবার জন্য লালায়িত। কোন প্রকারে মনুষ্যের স্কন্ধে চাপিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। পায়ের গঠন দেখিয়াই তাহাদিগকে সহজে চেনা যায়। আমাদের শ্রীচরণের সম্মুখ ভাগ তাহাদের পশ্চাৎ, আমাদের পশ্চাৎ তাহাদের সম্মুখ। আমরা এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। তবে আষাঢ়ের গল্পে এইরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

আষাঢ়ে গল্পে অনেক ভূতের নামোল্লেখ আছে। মৃত্যুর গন্ধ থাকিলেই ভূত মহাশয় হাজির। মরিলে যেন ভূত হইতেই হইবে—একেবারে গভর্মেণ্টের আইন। ভূত না হইয়া আষাঢ়ে গল্পে যাহার মৃত্যু হয় তাহার কথা মন দিয়া কেহ শুনিতে চাহে না। প্রধান চরিত্রের মধ্যে তাহার ত গণ্য হইবার অধিকারই নাই। আষাঢ়ে ভূতের বড় প্রাদুর্ভাব। গল্প শুনিয়া ছেলেরা ভয়ে বাহির হইতে পারে না। বৃদ্ধারা গল্প বলিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠেন—রাত্রিতে স্বপ্নে কতবার রাম নাম জপা হইয়া যায়।

পেত্নীজাতি স্ত্রী ভূত। তাহারা স্ত্রীলোকের মত সাজগোজ করে—স্ত্রীলোকের মত ধরণধারণ। মায়া বিদ্যায় সকল ভূত অপেক্ষা ইহারা পটু। কিন্তু পেত্নীরা বড় মাছের কাঙ্গাল। গল্প আছে, বিরক্ত হইয়া একজন গৃহস্থের বউ একবার মাছের পরিবর্ত্তে পেত্নীর হস্তে তপ্ত ফেন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য লোভী পেত্নী চূড়ান্ত নাকাল হইয়াছিল।

পেত্নীরা সাধারণতঃ পুকুরপাড়ে ঝোপঝাপের মধ্যে বাস করে। কেহ মাছ ধুইতে গেলে তাহার নিকট চাহিতে থাকে। কিন্তু সাবধানী লোকেরা কখনও ইহাদিগকে দান করিতে চাহেন না। ভয়, পাছে প্রশ্রয় পাইয়া ইহারা মাথায় উঠে। নোংরামির জন্য পেত্নীরা বিখ্যাত। প্রমাণ অধিক দূরে নয়। নোংরাকে কথায় কথায় লোকে পেত্নী নামে অভিহিত করে। যাঁহারা কখন পেত্নীর পাল্লায় পড়েন নাই তাঁহাদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি, নোংরা মাছের কাঙ্গালকে কখনও বিশ্বাস না করেন।

অন্য দেশে আমাদের পেত্নীর মত ভূত-কল্পনা আছে কি না জানি না। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এদেশে ছাড়া এ প্রকার ভূত নাই। বিলাতী ভূতের কল্পনায় কেমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে। সে গম্ভীর মূর্ত্তি, গম্ভীর ভাব দেখিলে লোকে স্তম্ভিত হইয়া থাকে। আমাদের ভূতেরা কিছু বাজে বকিতে ভাল বাসে। তাহাদের কথা বার্ত্তা শুনিলে এক এক সময় হাসি পায়। গাম্ভীর্য্য তাহাদের প্রায় নাই—ছিবলামীর ভাব কিছু বেশী। তবে ব্রহ্মদৈত্যেরা তেমন ছিব্‌লা নহে। তাহাদের একটু গম্ভীর

বিলাতী অনেক ভূতের কথা শুনা যায়, যাহারা রুদ্ধ দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হয়। তাহারা কাগজের মত স্থূল—সুতরাং সহজেই ফাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। বিলাতী মহিলারা অনেকেই রাত্রিতে গির্জাপ্রাঙ্গন হইতে ইহাদিগকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় নিতান্ত অবিশ্বাস না করিলে আমাদিগকেও ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বিলাতে ভূতের অভাব না হইলেও সেখানে ভূতেদের এত জাতিভেদ নাই। আমাদের ভূতেদের মধ্যে আগাগোড়া জাতিভেদ। স্ত্রীভূতের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। পেত্নী ছাড়া শাঁকচুনী নামক আর এক জাতি স্ত্রীভূত আছে। ইহারা অপ-রিষ্কার স্থানে বাস করে। ইহাদের স্বভাব বড় ভাল নয়। সুবিধা পাইলে মানবের ঘাড় মট্‌কাইতে ইহারা কথনও ভুলে না। পেত্নী জাতি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয়।

শুধু মানুষ ভূতেই ক্ষান্ত নয়। আষাঢ়েরা গোভূত পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। গোভূতের বর্ণনায় একটু নূতনত্বও আছে। ইহাদের আকৃতি গোবৎসের মত। কিন্তু ইহারা মজার উপায়ে লোকের প্রাণবধ করে। পায়ের নীচে দিয়া কোন প্রকারে একবার যাইতে পারিলেই হইল। এই জন্য গোভূতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়, জোড়-পায়ে চলা।

গোভূতের মত বানরভূত, কুকুরভূত, সর্পভূত প্রভৃতি আরও পাঁচরকম অবশ্য আছে। এদেশে ইহাদের নাম বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আরবদেশে ইহা-দের কিছু নাম আছে। শুনা যায়, আরবীয়েরা জানিতে পারিয়াছে যে, সর্পেরা 'জিনি'র অবতার। জিনিরা অন্যান্য পশুর বেশ ধরিয়া ছলনা করিয়া থাকে। আর-বীয় মরুভূমিতে যে ঘূর্ণবায়ু উঠে তাহাই বাস্তবিক জিনির আকৃতি।

আরবীয় ভূতের সহিত আমাদের ভূতের একবিষয়ে বড় সাদৃশ্য আছে। উভয়ই লৌহের নিকটে ঘেঁষিতে চাহে না। আরবীয়েরা ভূতের ভয় পাইলে লৌহের নাম করে। ভূত তাহা হইলে ভয়ে পলায়ন করে।

স্বদেশীয় বিদেশীয় ভূত সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। সমালোচনা পড়িয়া ভূতেরা হয়ত লাঠি ঠিক করিয়া রাখিবে। অদৃষ্ট-দোষে ভূতদর্শন কপালে জুটে নাই। ভরসা, সমালোচনার জোরে সে কার্য্য সমাধা হইবে। না হইলে লেখাই সার। হা কপাল!

হেঁয়ালি নাট্য।

আকবরের প্রমোদ সভায়, তানসেন স্থরদাস রচিত গান গাহিলেন,

"যশোদা বার বার ইহ ভাবৈ,হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ"।

সম্রাট বলিলেন—"বা কি তারিফ্? কিন্তু ইহার অর্থ কি ওস্তাদ জি?

তানসেন। "যশোদা ঘড়ি ঘড়ি ইহাই বলিতেছেন ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি আমার চলন্ত গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?"

আকবর বলিলেন,"যেমন গান তেমনি অর্থ; বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি"।

রাজার প্রশংসায় প্রসন্ন হইয়া তানসেন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রী বীরবল এইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তঁহাকে বলিলেন—

"মন্ত্রিবর—যশোদা বার বার ইহভাবৈ,হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ। গানে তানসেন মন উদাস করিয়া দিয়া গিয়াছেন"।

বীরবল হাসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি গানে উদাস হইয়াছেন, গানের অর্থে আমার উদাসীন হইতে ইচ্ছা হইতেছে। বার অর্থাৎ পৌর (পাড়া)—যশোদা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ইহাই বলিতেছেন ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যিনি গোপালকে আটকিয়া রাখিবেন। আহা!"

(টোডর মল্লের প্রবেশ)

টোডর মল্ল। মন্ত্রী মহাশয়, অর্থটা আমার সঙ্গত মনে হইতেছে না। বার অর্থে জল ও দ্বার, জলের দ্বার কি—না ঘাট, সুতরাং গানটির অর্থ দাঁড়াইতেছে—যশোদা ঘাটে বাটে গিয়া ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কোন মিত্র আছেন যিনি গোপালকে যাইতে না দিবেন"।

কবি ফৈজি এতক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন—তিনি বলিলেন—"মহাশয়গণ, আপনারা চিরকাল মন্ত্রণা প্রদান করুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা আর গানের অর্থ ব্যাখা করিবেন না।

জাঁহাপনা, বার অর্থে জল এবং দ্বার সত্য,কিন্তু এখানে ইহা নদীর জলও নহে, জলের ঘাটও নাই। এখানে জল অর্থে অশ্রুজল এবং দ্বার অর্থে অশ্রুজলের দ্বার অর্থাৎ আঁখি, সুতরাং গানের অর্থ এই—যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন"।

নবাব খান খানানের প্রবেশ।

আকবর। নবাব সাহা, বিষম সমস্যা! তানসেন গান গাহিয়া গেলেন 'যশোদা

বার বার ইহ ভাবৈ হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপাল রাখৈ'—ইহার অর্থ লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, আপনাকে ভাঙ্গিতে হইতেছে"

বীরবল। একবার আমার কথাটা আগে শুনুন, যশোদা বার বার অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায়—গিয়া—

টডর মল্ল। তাহা হইতেই পারে না—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া—

কবি ফৈজি। ইহারা কি বলে মশায়! যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

আকবর। কিন্তু তানসেন যিনি গানটি গাহিয়াছেন—তিনি বলেন—'ঘড়ি ঘড়ি যশোদা ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যে গোপালকে ধরিয়া রাখে'। এখন আপনি মীমাংসা করুন ইহার কোনটি ঠিক?

নবাব খানান। মহারাজ এ কোনটাই এই বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা নয়, সকলেই আপন আপন মনের অনুভাব বলিয়াছেন মাত্র।

বাদশাহ। সে কিরূপ।"

নবাব। ঐ যে কলাবন্ত তানসেন যিনি ঘড়ি ঘড়ি নোম তোম করেন তাঁহার মনে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে যশোদা ঘড়ি ঘড়ি বলিতেছেন। আর বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইঁহার মনে হইয়াছে যশোদা পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া কহিতেছেন—ইত্যাদি। আর টোডরমল্ল তুমি মুৎসদ্দি—তুমি ঘাটে ঘাটে নৌকা বাহ আর মাশুল আদায় কর—তোমার মনে ঘাটের কথাই আসিয়াছে, আর ফৈজি কবি—ইনি জগৎসুদ্ধ লোককে কাঁদিতেই দেখেন"।

বাদশাহ। "ইহা ত ঠিক কথা! তবে তুমি বল নবাব সাহা ইহার অর্থ কি?

নবাব। "বার অর্থে কেশ। যশোদার প্রতি-কেশ ইহাই বলিতেছে 'ব্রজধামে আমার এমন কে মিত্র আছে—যে গোপালকে ধরিয়া রাখে"।

বলিয়া নবাব সাহা আপনার শ্মশ্রুতে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন।

আকবর বলিলেন—"বাহবা! বাহবা!"

কারাগার।

কি উপকরণ দিয়া না জানি গঠিত হিয়া,
　সদা তাই ভাবি মনে মন,
অস্থি কারাগার মাঝে,কে উহারে স্থাপিয়াছে
　অসীমে সসীম সম্বেষ্টন।

কদা, অচল অটল, কভু সিন্ধু সচঞ্চল,
　কখন কঠিন শিলা খানি,
কভু বা মোহিত ছলে, সামান্য উত্তাপে গলে,
　সুকোমল সদৃশ নবনী।

স্নেহ ভক্তি, ভালবাসা, অনন্ত অতৃপ্ত আশা
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
পূর্ণজ্ঞান উচ্চশিক্ষা অনন্ত কালের দীক্ষা,
ক্ষুদ্র পঞ্জরেতে গাহমান।
তুমি হৃদি-হীন ধাতা, একি এ নিয়ম পাতা,
নিরদয় তোমার বিচার।
বিপুল প্রেমের হৃদি কোন দোষে তার বিধি,
অস্থিময় ক্ষুদ্র কারাগার।

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

উত্তর।

দেহ নহে কারাগার, নহে অস্থি চর্ম্ম সার
নহে হেয় তুচ্ছ এ শরীর—
পবিত্র অক্ষয় বট, মাটীর মঙ্গল ঘট
হৃদিরূপা দেবতা মন্দির।
উজলি সহস্রাধার প্রকৃতির অবতার
বিরাজেন কুল কুণ্ডলিনী,
মায়া মোহ সখী দুটী আজ্ঞে ধায় ছুটোছুটী
মত্ত ক্ষেত্রে নিত্য বিহারিনী।
শরীরের তন্ত্রে তন্ত্রে নাচিছে দেবীর মন্ত্রে
তাল লয়ে নহে কভু ভুল,
হাসাতেছে হাসিতেছি কাঁদাতেছে কাঁদিতেছি
ভাবাতেছে ভাবিয়ে আকুল।
তবে তুচ্ছ নহ তুমি, প্রকৃতির রঙ্গভূমি
মহা শূন্য নহে তাঁর বাস।
অধীনে স্বাধীন প্রথা লাঠী বদ্ধ ঘুড়ী যথা
উড়ে যায় সুদূর আকাশ।

মহাযজ্ঞ।

প্রথম প্রস্তাব—উদ্বোধন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে—প্রাচীন ভারতের অপূর্ব্ব রত্ন-ভাণ্ডার রূপ রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে তৎসমুদায়ের সুন্দর বিবরণ পাঠে কাহার হৃদয় বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারে? বিদেশীয় রাজগণের অধিকার কালেও এদেশে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। অতি অল্পকাল হইল আমাদের বাহ্যাড়ম্বর প্রিয় গভর্ণর জেনারল লর্ড লিটনের শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমান ভূপতিগণের রাজধানী দিল্লী নগরে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রাজসূয় যজ্ঞের অনুকরণে যে বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আমরা ধীর মনে তাহারও বিবরণ পাঠ করিয়াছি। সে দিন লর্ড ডফরিণের রাজত্বের প্রথম সময়ে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে কাবুলের বর্ত্তমান আমির আবদার রহমানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, ভারতীয় নৃপতি বর্গের অনুরাগ ও রাজভক্তি আকর্ষণ এবং সাম-

রিক কৌশল প্রদর্শনে সাধারণ্যে ইংলণ্ডের বলবিক্রমের পরিচয় দান উপলক্ষে দিল্লীর প্রান্তভাগে রাউল পিণ্ডি নগরে যে রাজ দরবারের আয়োজন হইয়াছিল, আমরা তাহারও বিবরণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু, আজি আমরা প্রিয় পাঠক সমাজে যে মহাযজ্ঞের পরিচয় দিতে যাইতেছি তাহার তুলনা কোথাও মিলে না—সমস্ত হৃদয় ভরিয়া অনুভব ভিন্ন তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! যাঁহারা স্বচক্ষে সেই মহাযজ্ঞের আয়োজন, অনুষ্ঠান, উদ্বোধন ও আহুতি দেখিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষু সার্থক! যাঁহারা তাহা দর্শন করেন নাই তাঁহাদিগকে কিরূপে তাহার অনুপম শোভার যথাযথ বিবরণ দান করিব? উক্ত মহাযজ্ঞের উদ্বোধন কালে উদ্বেলিত হৃদয়ের অপ্রতিহত উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া কতবার ভাবিয়াছিলাম, সদা-গতি সমীরণকে বার্ত্তাবহ নিযুক্ত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও সহৃদয় নরনারীর নিকট এই মঙ্গল আহ্বান পরিঘোষণ করি—

"এস, ছুটে এস, কে আছ কোথায়,
আঁখি ভ'রে দেখ কি শোভা হেথায়;—
দেখ, পুণ্য ভূমে মায়ের পূজায়
কিবা মাতোয়ারা অযুত সন্তান!"—

আবাল বৃদ্ধ বনিতা দলে দলে দেশ দেশান্তর হইতে বায়ুবেগে ছুটিয়া আসিয়া সেই মহাযজ্ঞের অপ্রতিম শোভা ও সুচারু পদ্ধতি পরিদর্শনে চরিতার্থ হউন!

এই মহাযজ্ঞের আরাধ্য দেবতা ২৫ কোটি সন্তানের জননী ভারত-ভূমি; এই মহাযজ্ঞের নেতা কোটি কোটি ভারত-সন্তানের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ। ২৭শে ডিসেম্বর নবভারতের স্মরণীয় দিন,—আজি প্রায় চারি বৎসর হইল ঐ পবিত্র দিনে বোম্বাই নগরে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় কতিপয় সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য প্রতিনিধি একত্র সম্মিলিত হইয়া "স্বর্গাদপি গরিয়সী" জননীর পূজার প্রথম অনুষ্ঠান করেন—ইতি পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত সন্তানগণ আর কখনও একত্র সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের হিত চিন্তা করেন নাই। তৎপর বৎসর ঐ শুভদিনে কলিকাতা নগরে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর শত শত প্রতিনিধির একত্র সম্মিলনে জননীর পূজার মঙ্গলময় অনুষ্ঠান ও উদ্বোধন হইয়াছিল। তৎপর বৎসর পুনরায় ঐ শুভদিনে মান্দ্রাজ নগরে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ মহাসমারোহে উক্ত মহা পূজার আয়োজন ও উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি আবার ঐ শুভ দিনে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মহাতীর্থ, পুণ্যতোয়া ভাগিরথী, প্রসন্ন সলিলা যমুনা ও সুরনদী সরস্বতীর—ত্রিবেণী-সঙ্গম-স্থল—পুণ্য ভূমি প্রয়াগে ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর প্রতিনিধি স্থানীয় প্রায় সার্দ্ধ সহস্র সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও সম্মানিত সন্তান, প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও উদ্বোধন করিয়াছিলেন। যে পুণ্যময় প্রদেশে

গঙ্গা-যমুনা বিপুল শোভায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বিমুক্ত হৃদয়ে অযুত তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক গভীর প্রেমভরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনদানে অনন্তকালের জন্য সম্মিলিত ও একস্রোতে লীন হইয়াছেন সেই মহাতীর্থে নানা-বর্ণ-প্লাবিত, বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ভারতের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, জৈন, পার্সি, ব্রহ্মবাদী, সাম্যবাদী ও দেবধর্ম্মী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় ভুক্ত কোটি কোটি নরনারীর প্রতিনিধি স্থানীয় অযুত সুসন্তান আপন আপন সম্প্রদায় গত পার্থক্য এবং ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার-গত বিভিন্নতা ভুলিয়া অনুপম প্রেমভরে পরস্পরে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া জননীর মঙ্গলোদ্দেশে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন ও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা লিখিতে দুর্ব্বল লেখনী অপার বিস্ময় ও অতুল আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে!

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পঞ্জাব ও রাজপূতানা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমস্ত বিভাগ ও প্রদেশের রত্ন স্বরূপ সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য সন্তান বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া যখন যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের প্রতিভা-উদ্দীপ্ত ললাট, হর্ষোজ্জ্বল কম-কান্তি প্রফুল্ল আনন-ভাতি এবং উৎসাহ ও তেজ-গর্ব্ববিস্ফারিত প্রশস্ত বক্ষস্থল দৃষ্টে মনে হইল দুঃখিনী জন্মভূমির দুঃখের দিন অবসান হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। শিখ-গুরু মহাত্মা নানক ও গুরু গোবিন্দের মন্ত্র-শিষ্যগণের নম্রতা-ভূষিত মুখশ্রী ও বীরত্বব্যঞ্জক নেত্র-দ্যুতি, প্রাতঃ স্মরণীয় শিবজীর বংশ সম্ভূত সুদক্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের কঠোর সঙ্কল্প ও তেজোদীপ্ত আনন-ভাতি, অধ্যবসায়শীল মান্দ্রাজবাসীগণের প্রশান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য প্রদেশের রাজবংশীয় ও বীর-বংশীয় মুসলমান ও হিন্দুগণের গভীর অনুরাগপূর্ণ একাগ্রতা ও নির্ভীকতা, বেহার-বাসীগণের নম্রতা ও শিষ্টাচার, বঙ্গসন্তানগণের বিদ্যানুরাগ পূর্ণ চিন্তাশীল-কার্য্য দক্ষতা এবং সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য সভ্যতার শিরোমণি, স্বাধীনতার জননী ও বীরত্বের বিলাস-ভূমি বৃটেনিয়ার সুসন্তানগণের দেবভাব পূর্ণ কার্য্য-নৈপুণ্য দৃষ্টে বোধ হইল সকলেই জননীর পূজার জন্য মহা সাধনায় দীক্ষিত হইয়া এই অনুপম যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। তখন মনে হইল, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন সুবর্ণময় ফল প্রসব করিয়াছে—ইংলণ্ডের অনুগ্রহ ও সহায়তায় কোটি কোটি ভারতবাসী আপন আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া জন্মভূমির চরণে স্বস্ব জীবনোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন—ইংলণ্ডের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণে কোটি কোটি সন্তান স্বদেশের দুরবস্থা নিবারণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপায় চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। তখন বোধ হইল, দুঃখিনী জননী শত শত বর্ষের কঠোর অধীনতার মলিন বেশ পরিহার পূর্ব্বক চারু বেশ-ভূষায়

জন্মভূমির পূজার জন্য গত তিন বৎসর যে তিনটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল—তাহাদের একটিরও সহিত এই মহাযজ্ঞের তুলনা হইতে পারে না। জ্বলন্ত অনুরাগ, জীবন্ত উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, কঠোর আত্ম-নিগ্রহ এবং মহা সাধনানুপ্রাণিত আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলি যদি কোন মহাযজ্ঞের প্রাণস্বরূপে পরিগণিত হয়, তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এই মহাযজ্ঞ উপলক্ষে তৎ সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। গত তিন বৎসরের যজ্ঞে কোন রূপ বিঘ্ন উৎপাদিত হয় নাই—উহাদের প্রত্যেকটি অবাধে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রভূত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষিত ভারতের চতুর্থ মহা যজ্ঞ মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। শত শত প্রতিকূল ঘটনার প্রতিযোগিতা নিবন্ধন বোধ হয়, উহা এরূপ মহাভাব-পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। অনেকেই উহার বিঘ্ন বাধার বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন, যাঁহারা উহা ভাল রূপ জানেন না তাঁহাদের নিমিত্ত উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রথমতঃ মহা পণ্ডিত বেক্ সাহেবের মন্ত্র-শিষ্য স্বনাম প্রসিদ্ধ আলিগড়ভূষণ সার সৈয়দ আমেদ, হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য শিবপ্রসাদ-মন্ত্রণা-মুগ্ধ বৃদ্ধ কাশি-রাজ এবং অদূরদর্শী স্বার্থান্ধ ভিঙ্গরাজ প্রভৃতি কতিপয় ক্ষমতাশালী লোকের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণে কতকগুলি অবিবেচক স্বদেশ-দ্রোহী সন্তান এই মহা যজ্ঞে ঘোরতর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন। যে সকল সুসন্তান জন্মভূমির পবিত্র ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালন পূর্ব্বক জগতের সুসভ্য সমাজে তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য গত চারি বৎসর হইতে প্রাণপণে যত্ন পাইতেছেন, কুপথে পরিচালিত এই সকল ভ্রান্ত সন্তানগণ তাঁহাদের শুভকার্য্যে ঘোর বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ সময়ে সময়ে এই সকল স্বদেশানুরাগী সুসন্তানগণের উদ্দেশ্যপথে যার পর নাই বিঘ্ন জন্মাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, অল্প দিন হইল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষমতাশালী লেফট্‌নেণ্ট গবর্ণর সার অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ ভারতের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিনিধিগণের একতা বা একপ্রাণতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাঁহাদের কার্য্যের অর্থ না বুঝিয়া তাব্র লেখনী সঞ্চালনে তাঁহাদের কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ এবং তাঁহাদের প্রধান নেতা বৃটন-গৌরব মহাত্মা হিউম্ সাহেবের অযথা নিন্দাবাদে তাঁহাদের অন্তরের বাসনা দলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ, ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল কূট রাজনীতি-বিশারদ লর্ড ডফ্‌রিণ এ দেশ হইতে বিদায় লইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডবাসীর আরাধ্য দেবতা মহাত্মা

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুর পবিত্র স্মৃতি-ভোজ উপলক্ষে যে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ঘোর শ্লেষ পূর্ণ বাক্য প্রয়োগে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সুতীব্র নিন্দাবাদে তাঁহাদের প্রাণের আশা ঘোর নৈরাশ্য-অন্ধকারে পর্য্যবসিত করিতে বিশেষ রূপে যত্নবান হইয়াছিলেন। এ দেশের প্রকৃত কল্যাণের বিপক্ষে আর যিনি যাহা বলুন বা করুন তদ্বিষয়ের আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু, এ দেশের কোটি কোটি লোকের শুভাশুভ যাঁহাদের প্রগাঢ় বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কর্ত্তব্যানুরাগের উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কোনরূপ ভ্রম বা বিবেচনার ক্রটি হইলে তদ্দ্বারা এদেশের বিশেষ অমঙ্গল হইতে পারে সুতরাং তাহা সর্ব্বথা আলোচ্য। অতএব আমরা এস্থলে মাননীয় রাজপ্রতিনিধি সার্ অক্ল্যাণ্ড কল্ভিন্ ও ভারতের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বেসর্ব্বা লর্ড ডফ্রিণের সংস্কার ও কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ অসঙ্গত মনে করি না।

সার্ অক্ল্যাণ্ড কল্ভিন্ আপনাকে উদার-নৈতিক (Liberal) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা উদার-নৈতিকের যথার্থ ধর্ম্ম এই বুঝি যে প্রজাবর্গের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও তাহাদের প্রত্যেক সৎকার্য্যে প্রাণগত সহানুভূতি; পক্ষান্তরে আমরা স্থিতি শীল (conservative) দলের ধর্ম্ম ইহাই জানি যে প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোন বিশেষ অনিষ্ট আশঙ্কা নিবন্ধন সতত তাহাদের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস ও তাহাদের কার্য্যে নিতান্ত অনাস্থা ও ঘৃণা। এতদুভয়ের মধ্যে তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে সহজে বুঝা যায় না। এ দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যে সকল শাসন কর্ত্তা স্বদেশে উদার নীতির (Liberalism) প্রিয় উপাসক বলিয়া পরিগণিত হন এখানে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কার্য্যতঃ উহার বিপরীত ভাবের পরিচয় দান করিয়া থাকেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমরা সার অকল্যাণ্ডের উদার নৈতিকতার তথার্থ পরিচয় লাভে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও সম্মান করিয়াছিলাম। দেবভাবাপন্ন লর্ড রিপণের রাজত্বের অবসানকালে তিনি এদেশের স্তিমিত জাতীয়-জীবন সহসা পূর্ণ-মাত্রায় বিকশিত ও উচ্ছসিত—সহস্র সহস্র মৃতদেহ নবজীবনে সঞ্জীবিত—সহস্র সহস্র প্রাণহীন বিশুষ্ক কঙ্কাল নবপ্রাণে বিস্ফূরিত—দৃষ্টে বিস্ময়-বিহ্বল হৃদয়ে প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছিলেন, "If it is real, what does it mean ?" সেই দিন তাঁহার গভীর চিন্তা ও সুন্দর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আমরা ভাবিয়াছিলাম শত শত বর্ষের কঠোর অধীনতার নিদারুণ কশাঘাতে যে হতভাগ্য দেশের অস্থি-পঞ্জর বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার জীবনীগতি ও উত্থানের প্রতি তাঁহার প্রাণগত সহানুভূতি আছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার তেজস্বিনী লেখনী হইতে এমন সুন্দর প্রবন্ধ প্রসূত হইয়াছিল, তাঁহার পদোন্নতিকালে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর হৃদয়ে কত অভিনব আশার সঞ্চার হইয়াছিল! বলিতে হৃদয়

পরিণত হইয়াছে। ভারত-বন্ধু হিউমের পত্রে তিনি অনেক অসার কথার অবতারণায় নবভারতের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আশা সম্বন্ধে স্বীয় ভ্রমের পরিচয় দানে শিক্ষিত ভারতবাসীগণের প্রাণে যেরূপ ব্যথা দিয়াছেন তাহা মনে হইলে উল্লিখিত দুইখানি বিপরীত ভাবাপন্ন পত্র যে তাঁহারই লেখনী প্রসূত তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। হায় হায়! গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্তের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

লর্ড ডফরিণ এদেশে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই নগরে এদেশের হিতসাধন সম্বন্ধে যে মধুর আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে এদেশের কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়ে কতই আনন্দের লহরী উত্থিত হইয়াছিল—তাহাদের অন্তরে কত অভিনব আশার সঞ্চার হইয়াছিল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহাদের একটি আশাও পূর্ণ হইল না। তিনি রাজপ্রতিনিধির গৌরবময় আসনে উপবিষ্ট হইতে না হইতেই কলঙ্কিত ব্রহ্ম যুদ্ধের আয়োজন ও অনুষ্ঠান করিলেন—ভারতের ধনাগার হইতে কোটি কোটি মুদ্রাব্যয়ে ব্রহ্মদেশ পরাজিত, দলিত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। অনন্তর ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত ও কাবুলের আমিরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন উপলক্ষে তাঁহার রাজত্বের অনেক সময় অতিবাহিত হইল। দিন দিন দেশের ধনাভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল—আয় অপেক্ষা ব্যয় সমধিক বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবাসীর উপরে নূতন নূতন যুদ্ধের আয়োজন—কৃষ্ণ পর্ব্বতের যুদ্ধ (Black mountain expedition) ও সিকিম সমরে অনর্থক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল—ভারতবাসীগণ তথাপি ধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার শাসনকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই তিনি তাহাদের হিতের জন্য কোন মহৎ অনুষ্ঠান করিবেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় যজ্ঞকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় শত শত প্রতিনিধিগণকে স্বীয় বাসভবনে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণের বাসনা ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এই সহৃদয়তার পরিচয় দানেই তিনি সাধারণের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। উহার অল্পদিন পরেই মহামান্যা ইংলণ্ডেশ্বরীর জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতায় যে মহাদরবার হইয়াছিল তথায় লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া যে মহাঘোষণা করিয়াছিলেন শিক্ষিত ভারতবাসীগণ এতদিন এক মনে তাহারই ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"Glad and happy should I be, if during my sojourn among them (the people of India) circumstances permitted me to extend, and place upon a a wider and more logical footing, the political status which was so wisely

confidence they inspired in their fellow country-men were marked out as useful adjuncts to our Legislative councils."

শিক্ষিত ভারতবাসীগণ তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল পর্য্যন্ত নিতান্ত উৎসুক হৃদয়ে দিন গণনা করিতেছিলেন যে, কতদিনে উল্লিখিত মহৎ আশ্বাস-বাণী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হইবে। এই চারি বৎসর মধ্যে সময়ে সময়ে দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহে তাঁহার রাজত্বের ত্রুটি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চিন্তাশীল ভারতবাসীগণ একদিনের জন্যও তাঁহাকে অমান্য করেন নাই—তাঁহারা তাঁহার কতিপয় প্রধান ত্রুটির জন্য দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন উক্ত অনিবার্য্য ত্রুটি সত্বেও তিনি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কোন প্রকৃত হিতানুষ্ঠান করিয়া যাইবেন। লর্ড ডফ্‌রিণ এতদিন তাঁহার প্রকৃত মনোভাব যত্ন পূর্ব্বক গোপন রাখিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি এদেশ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে স্কট্‌-গুরু সেণ্ট্‌য়্যাণ্ড্রুর স্মৃতি-ভোজ উপলক্ষে তাঁহার হৃদয় নিহিত কথা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত ভোজের প্রধান ঘটনা তাঁহার বক্তৃতা পাঠ। বক্তৃতা মধ্যে ভারতবাসীগণের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য ও আশা ভরসার সমালোচনা স্থলে তিনি তাহাদের প্রতি যেরূপ মর্ম্মভেদী শ্লেষপূর্ণ বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—শিক্ষিত ভারতবাসীগণ বিগত চারি বৎসর কাল যে আশা যত্নপূর্ব্বক স্বস্ব হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন তাঁহার সেদিনের তীব্র বক্তৃতায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি যখন মহানন্দে শ্রোতৃ-বর্গের ঘন করতালি-ধ্বনির মধ্যে উৎসাহে বলিতে লাগিলেন—

And now gentlemen, some intelligent, loyal, patriotic and wellmeaning men are disirous of asking, I will not say a further step in advance, but a *very big jump in to the unknown*—by the application to India *a democratic method of Government* and the adoption of a *parliamentary system* which England herself has only reached by slow degrees and through the discipline of many centuries of preparation...... Who and what are the persons who seek to assume such great powers—to tempt the fate of Pheaton and to sit in the chariot of the Sun ? (applause) ..... I would ask then how would any reasonable man imagine that the British Government would be content to allow this *microscopic minority* to control their administration of that majestic and multiform Empire for whose safety and welfare they are responsible in the eyes of God and before the face of civilisation. (cheers)......... ...

"তখন তাঁহার মনে রাজভক্ত, শিক্ষিত ভারতবাসীগণের প্রতি যে কি নিদারুণ অবজ্ঞার ভাব প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা তিনিই বলিতে পারেন। মহামান্য রাজপ্রতিনিধি নিজে ভারতবাসীর কোন প্রকৃত হিতসাধন করিয়া যাইতে পারিলেন না, অথচ তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইতে সাধ্যমত যত্ন পাইলেন। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ কথায় ভারতবাসীগণ যাহা ভাবে নাই, যাহা পাইতে আশা করে নাই এবং যাহা তাহাদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বহির্ভূত তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের অদৃষ্ট-বিধাতাগণের অন্তরে ভ্রান্ত সংস্কারের বীজ বপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া না শুনিয়া তিনি উহার প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তৎপাঠে ও শ্রবণে কোটি কোটি ভারত সন্তানের প্রাণে যে কি গভীর বেদনা জন্মিয়াছে তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। পথশ্রান্ত তৃষ্ণাতুর পথিককে সুশীতল পানীয় জল দানের আশা দিয়া প্রতপ্ত বালুকাময় ঘোর মরুভূমি মাঝে বিকট হাস্যের সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রাণে যেমন অনির্ব্বচনীয় আঘাত লাগে, অথবা ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমানিশায় কোন পথ ভ্রান্ত মনুষ্যকে আসন্ন ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়া তাহাকে কোন জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় দান পূর্ব্বক যখন প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিতে থাকে, মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করিয়া ফেলে, ঘন ঘন বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে মেদিনী বিকম্পিত হয়, তখন তাহাকে সেই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে তিরস্কার পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিলে তাহার হৃদয় যেমন জ্বলন্ত দুঃখ, ক্ষোভ ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পড়ে, লর্ড ডফরিণের মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ ও অমূলক নিন্দাবাদে আশ্বাস বিমুগ্ধ ভারতবাসীগণের মনে ঠিক তদ্রূপ শোচনীয় ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। রাজভক্ত ভারত সন্তানগণের দীর্ঘকালের আশা যে এই রূপ নৈরাশ্য পর্য্যবসিত হইবে তাহা তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। ভারতেশ্বরীর প্রধান প্রতিনিধি দুইবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোটি কোটি প্রজার মঙ্গলের জন্য যে উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার যে এরূপ নিদারুণ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা একদিনের জন্যও ভারতবাসীগণের অন্তরে স্থান পায় নাই।

রাজপ্রতিনিধিগণের নির্দ্দয় ব্যবহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা আমাদের অবলম্বিত বিষয় ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; অতঃপর আমরা চতুর্থ মহাযজ্ঞের প্রকৃত বিঘ্ন সম্বন্ধে আর দুই একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিব। স্বদেশদ্রোহী সন্তানগণের বিরুদ্ধাচরণ এবং উচ্চ পদস্থ শাসনকর্ত্তাগণের তীব্র প্রতিবাদ ভিন্ন মহাযজ্ঞের প্রধান নেতাগণ যজ্ঞের স্থানের জন্য বিস্তর অসুবিধা ও বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহা যজ্ঞের অনুরূপ উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিবার জন্য প্রায় ৮ মাসকাল বিশেষ চেষ্টা করিয়াও স্থানীয় সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের কর্ম্ম-

চারীগণের বিপক্ষতায় সফল যত্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রথমতঃ স্থির করিয়াছিলেন যে তত্রত্য মনোহর খস্রুবাগে মহাযজ্ঞের আয়োজন হইবে কিন্তু গত মার্চ্চমাসে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনন্তর তাঁহারা অনেক চেষ্টার পর এলাহাবাদ দুর্গের নিকট একখণ্ড ভূমি মনোনীত করিয়া তাহা ভাড়া করিলেন এবং ভাড়ার অগ্রিম কর যথা স্থানে জমা দিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ভবিষ্যতে উক্তভূমি সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি জন্মিবে না। কিন্তু উহার প্রায় ছয়মাস পরে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে তাঁহারা উক্ত জমি পাইবেন না—তাঁহারা উহার খাজনা হিসাবে যে টাকা জমা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল। তৎপরে তাঁহারা নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে পুনরায় নূতন স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে সুবিধা জনক ভূমি মনোনীত করিতে অসমর্থ হইয়া পায়োনিয়র সংবাদ পত্রের কার্য্যালয়ের নিকট অভ্যর্থনা সমিতির কোন কোন সভ্যের যে কতকগুলি বাড়ী আছে তাহাতেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ উহাদের মধ্যে দুই একটি বাড়ী সৈনিক বিভাগের সামান্তর্গত বলিয়া উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তথায় উহার আয়োজন করিতে নিষেধ করিলেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহারা নিজগৃহেও স্বদেশের মঙ্গলানুষ্ঠান করিবার অধিকার পাইলেন না। অবশেষে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টার পর নবেম্বর মাসে সুপ্রসিদ্ধ আল্‌ফ্রেড্ পার্কের পূর্ব্ববর্ত্তী লোথার ক্যাস্‌ল নামক বাটী ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ভাড়া লইয়া তথায় জাতীয় মহাযজ্ঞের আয়োজনের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ শত শত বিঘ্নবাধা অসুবিধা পরাজয় করিয়া মঙ্গলময় বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদে ভারতীয় জাতীয় ৪র্থ মহাযজ্ঞ সুবিখ্যাত লোথার ক্যাসলে মহা সমরোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রিয় পাঠক অতঃপর আপনার নিকট এই ইতিহাস-বিখ্যাত যজ্ঞভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিব। যৎকালে এলাহাবাদে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন উক্ত ক্যাস্‌লই রাজপ্রতিনিধির আবাসের জন্য মনোনীত হইয়াছিল। এই স্থানে কত রাজা মহারাজা অবনত মস্তকে রাজ প্রতিনিধির সম্মান ও স্তুতিগান করিয়াছেন। দীর্ঘকালের জন্য এই স্থান কত উচ্চপদস্থ ইংরেজ পুরুষ ও রমণীর বিলাস ভূমি ছিল। ১৮৫৮ খৃঃঅব্দে সিপাহি বিদ্রোহের অবসানে ভারতে শান্তি সংস্থাপিত হইলে এই স্থান হইতে লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডেশ্বরীর মহাঘোষণা পত্র পাঠ করেন। উহার দক্ষিণ প্রান্তে রাজপ্রতিনিধির বাসের উপযুক্ত নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে উক্ত গৃহে কিছু কালের জন্য খৃষ্ট ধর্ম্মানুরাগিণী ইয়ুরোপীয় রমণীগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন—তাঁহারা সংসারের গভীর কোলাহল হইতে বিযুক্ত হইয়া এই গৃহে [illegible]

বহুকালের জন্য উহা নির্জ্জন অবস্থায় পতিত ছিল, তখন সময়ে সময়ে দিবাভাগেও গভীর নিশিতে পেচক ও বাদুড়ের বিকট রব উহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং বন্য পক্ষীর আবাস ভূমি ছিল এক্ষণে তাহা কি পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্যাস্‌ল্ অর্থে যাহা বুঝায় এই বাটীর আকার ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব দৃষ্টে তাহার কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না—ইহা প্রায় সার্দ্ধ-শত বিঘা ভূমির মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাটী। এই বিস্তৃত ভূমির চারিদিক মৃণ্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং উহার চতুর্দ্দিকে এক একটি করিয়া চারিটি ফটক। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দারাগঞ্জের রাস্তার প্রান্তভাগে বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ। ক্যাসলের পশ্চিম দিকে মহাযজ্ঞের উপযোগী বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত প্রাণমুগ্ধকর বিশাল মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত সহস্র সহস্র প্রতিনিধিগণের অবস্থিতির জন্য সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটমণ্ডপ সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্যাসলের পশ্চিম দিকস্থিত সিংহদ্বার অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে; উহার উপরিভাগে সুদীর্ঘ লোহিত বর্ণ বস্ত্রে সুবর্ণ রঞ্জিত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 'চতুর্থ জাতীয় সমিতি'। ফটকের উভয় পার্শ্বে নানা বর্ণের বিস্তর পতাকা মস্তক উন্নত করিয়া বায়ু ভরে ক্রীড়া করিতেছে।

যজ্ঞ-গৃহের প্রাণমুগ্ধকর বর্ণনা যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে সুদক্ষ চিত্রকরের স্বপ্নময়ী কল্পনাও পরাজিত হয়। ইহা ক্যাসলের পশ্চিম প্রান্তে উত্তর হইতে দক্ষিণাভি-মুখে প্রসারিত। দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট এবং প্রস্থে ১০০ ফুট। এই সুবিশাল মণ্ডপ সুদৃশ্য কারুকার্য্য-শোভিত বিবিধ স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ছাদ তৃণ-কাষ্ঠ আচ্ছাদিত—ছাদের উপরিভাগ সুদৃশ্য শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত এবং নিম্ন দেশ বিচিত্র শিল্প কার্য্যময় দুগ্ধফেননিভ সুরঞ্জিত বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত। উহার নানা স্থানে নানা বর্ণের বস্ত্র নির্ম্মিত বিবিধ পুষ্প স্তবকে স্তবকে শোভা পাইতেছে। মণ্ডপ মধ্যস্থিত প্রশস্ত দালান—যাহার মধ্যে বেদি সংস্থাপিত হইয়াছে—চারিটি বৃহদাকার উচ্চ খিলা-নের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই সুবৃহৎ মণ্ডপের উভয় পার্শ্বে বৃটিশ গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ দুইটি বৃহৎ নিশান উন্নত মস্তকে আকাশে উড্ডীন হইয়া ইংলণ্ডের গৌরব প্রচার করিতেছে, এবং উহার চতুঃপার্শ্বস্থ লাল, নীল, পীত ও হরিৎ বর্ণের শত শত পতাকা সুগ্রোথিত ভারতের কোটি কোটি সুসন্তানের একপ্রাণতার পরিচয় দিতেছে। মণ্ডপের মস্তকোপরি লোহিত ও সবুজবর্ণের দীর্ঘবস্ত্রে সুবর্ণাক্ষরে "ভারতীয় জাতীয় সমিতির চতুর্থ অধি-বেশন" লিখিত রহিয়াছে। মণ্ডপের চারিদিকে চারিটি প্রশস্তদ্বার—প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখ প্রদেশ নানাবিধ পত্র, পুষ্প, লতিকা ও পতাকায় সুশোভিত। গৃহভিত্তির সম্মুখ

সজ্জিত হইয়া বহির্দ্দেশের পরম রমণীয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। গৃহের মধ্যস্থিত অত্যুচ্চ বেদিতে যজ্ঞের প্রধান নেতাগণের বসিবার স্থান সজ্জিত রহিয়াছে; উহার সম্মুখবর্ত্তী নিম্ন ভূমিতে মান্দ্রাজবাসী শত শত প্রতিনিধিগণের বসিবার আসন শ্রেণী-বদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদের পশ্চাৎভাগে লৌহ-নির্ম্মিত রেল দ্বারা বিভিন্ন মঞ্চে উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের উপবেশনার্থে স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদির দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব্বভাগে বাঙ্গালা ও আসাম, পশ্চিমভাগে বেহার ও উড়িষ্যা, এবং উহার উত্তর প্রান্তের পূর্ব্বাংশে বোম্বাই সিন্ধু ও মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম ভাগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা পঞ্জাব ও আজমিরের প্রতিনিধিগণের বসিবার জন্য দেড় সহস্র সুদৃশ্য আসন শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সজ্জিত রহিয়াছে। বেদির মধ্যস্থলে যজ্ঞের প্রধান আচার্য্য (সভাপতি) ও তাঁহার কতিপয় সুযোগ্য সহযোগীর উপবেশন জন্য কতিপয় রত্ন সিংহাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিনিধিবর্গের আসনের পশ্চাৎ প্রদেশ মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া রেল দ্বারা বিভিন্ন পৃথক পৃথক মঞ্চের উপর সহস্র সহস্র দর্শকের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মণ্ডপ মধ্যে নানা স্থানে ভারতেশ্বরী ও ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং নানা বর্ণের বৃহৎ বৃহৎ ঝাড়, দেওয়ালগিরি প্রভৃতি শত শত আলোকাধার যথাস্থানে সংযোজিত হইয়া গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মধ্য-বেদির এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে বিস্ময়ে ও পুলকে স্তম্ভিত হইতে হয়, ২৫ কোটি নরনারীর আরাধ্যা জননীর পূজার উপযুক্ত এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিরাট মণ্ডপ কিরূপে ছয় সপ্তাহে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইল এই ভাবিয়া জ্ঞানহারা হইতে হয়। এলাহাবাদের প্রধান ধনী লালা রামচরণ ও সুপ্রসিদ্ধ বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের সুদক্ষ পুত্র বাবু চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অপূর্ব্ব কার্য্য-দক্ষতা, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় প্রভাবে এই মহৎ কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহাদের এবং অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় কার্য্যক্ষম সভ্যের প্রাণগত যত্ন ও আন্তরিক তত্ত্বাবধানে সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকগণের নিরাপদে অবস্থান ও আহারাদিরও সুন্দর ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা আমরা আর কখনও চক্ষে দেখি নাই, কর্ণে শুনি নাই। অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠানই মহা যজ্ঞের অনুরূপ মহাভাব পূর্ণ প্রতীয়মান হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ২টার সময় মহা যজ্ঞের অধিবাসের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজি প্রাতঃকালে ৮টার সময় বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ সহৃদয় দ্বারভাঙ্গার মহারাজ-প্রদত্ত সুবিস্তৃত সামিয়ানাতলে দলে দলে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। সকলে সমবেত

সুবক্তা সুরেন্দ্রনাথের সহায়তায় মহাযজ্ঞে কোন কোন বিষয় আলোচিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসাম হইতে আগত কতিপয় প্রতিনিধিকে প্রস্তাব-কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন করিলেন। বাঙ্গালার প্রতিনিধিবর্গের কার্য্য শেষ হইলে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-ভারত, বেহার, সিন্ধু, পঞ্জাব ও আজ-মির প্রভৃতি নানা স্থানের প্রতিনিধিগণ এই স্থানে দলে দলে সমবেত হইয়া প্রস্তাব-কমিটির সভ্য মনোনীত হইলেন। মহাযজ্ঞের আলোচ্য বিষয় অবধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫ জন প্রতিনিধি নিয়োজিত হইলেন।

অধিবাসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে সহস্র সহস্র লোক যজ্ঞ ভূমির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেড়টার সময় গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অমনি সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকগণ দলে দলে দ্বাররক্ষকগণকে টিকিট দেখাইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বিশাল মণ্ডপ জনতায় পরিপূর্ণ হইল। বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত সহস্র সহস্র সন্তানের প্রফুল্ল ও গম্ভীর মুখশ্রী এবং উৎসাহপূর্ণ নেত্র-চ্ছটায় যজ্ঞ ভূমি যে কি অপরূপ শোভা ধারণ করিল তাহা বর্ণনা করিতে দুর্ব্বল লেখনী একান্ত অসমর্থ। যদি ভারতের মহা কবি বাল্মীকি ও ক্ষণজন্মা কালিদাসের অনুপম প্রতিভা ও অতুল কবিত্ব-শক্তির কণামাত্র লাভ করিতে পারিতাম তাহা হইলে হৃদয় নিহিত অনন্ত ভাবরাশি অপূর্ব্ব কবিতা-হারে সুসজ্জিত করিয়া প্রিয় পাঠক সমাজে উপহার দিতাম। বেদির নিম্নপ্রদেশে ভারতের নানাস্থানীয় নানা-ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ সবুজবর্ণ-মণ্ডিত সুদীর্ঘ টেবিল সম্মুখে লইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চারিদিকের শোভা একমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুসজ্জিত বেদির অধিকাংশ স্থান ইতিপূর্ব্বেই ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় রাজবংশোদ্ভব ও বীরবংশ-সম্ভূত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের পার্শ্বদেশে প্রস্তাব-কমিটির সভ্যগণ উপবিষ্ট হইয়াছেন। বেদির সম্মুখবর্ত্তী উচ্চ মঞ্চে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চপদস্থ ভারতবাসী ও কতিপয় উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ পৃথক পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সকলেই নীরব, সকলেই গম্ভীর—যেন কোন কঠোর সাধনায় সকলেই স্বস্ব প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছেন। শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত স্থানীয় ভদ্রবংশ-জাত শিক্ষিত যুবকগণ বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া দীর্ঘ যষ্টি হস্তে গৃহমধ্যে ধীরপদ নিক্ষেপে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব কৌশলে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। এমন সময় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞস্থানের অপূর্ব্বশোভা সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় অপার আনন্দ ও গভীর বিস্ময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অনন্ত তুফান-সন্তাড়িত বিশাল সাগর-গর্ভস্থিত তরণী ভীষণ ঝটিকার আক্রমণে বিমজ্জিত প্রায় হইয়া নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইলে কোন বিচক্ষণ নাবিকের

হৃদয় আনন্দে অভিভূত না হয়? তাঁহাকে দর্শন মাত্র সহস্র সহস্র মনুষ্য আনন্দে করতালি ধ্বনি করিলেন। অনন্তর জাতীয় মহাযজ্ঞের প্রাণস্বরূপ বৃটন গৌরব মহাত্মা হিউম—যিনি কোটি কোটি ভারত সন্তানের দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহাদের কল্যাণের জন্য রাজপ্রতিনিধির গৌরবময় পদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে স্বীয় প্রিয়তম বিজ্ঞান চর্চ্চা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের শেষভাগের সমস্ত সুখ শান্তির বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন—যিনি নানাস্থান হইতে অশেষ বিদ্রূপ ও তীব্র ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় অটল ও গম্ভীর ভাবে ভারতবাসীর কল্যাণার্থ দিবারজনী পরিশ্রম করিতেছেন—সেই প্রাতঃস্মরণীয় সহৃদয় ভারতবন্ধু সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র সহস্র সহস্র লোক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার জয়গানে প্রবৃত্ত হইলেন—যাঁহার হৃদয়ে যত বল আছে তিনি তৎসমস্তই কণ্ঠে প্রয়োগ করিয়া মহোল্লাসে তাঁহার জয় নাদে নিমগ্ন হইলেন। সেই উল্লাসধ্বনি গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া দশদিকে ছুটিতে লাগিল। কতকগুলি কামান একবারে ধ্বনিত হইলে দূর হইতে যেমন উহার গভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত হয় আজি সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে সেইরূপ উল্লাস গম্ভীর রব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতি কতিপয় সম্মানিত সভ্যের সহিত সহৃদয় জর্জ্জ ইয়ুল যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে পুনরায় সহস্র সহস্র লোক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে তাঁহার জয়নাদে প্রবৃত্ত হইলেন—আবার সেইরূপ মহাধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন কোন নিকটস্থ আগ্নেয় গিরি হইতে মহাবেগে জ্বলন্ত ধাতুনিস্রব নির্গত হইতেছে। ইয়ুল্ সাহেব উপবিষ্ট হইলে তাঁহার দক্ষিণে শিখসর্দ্দার দয়াল সিংহ ও বামে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ স্বুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিশালদেহ মহাবলশালী বীরসিংহ সর্দ্দার দয়াল সিংহ রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল—তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল, তেজোজ্জ্বল ও গভীরভাব পূর্ণ নয়ন দ্বয় ও বৃহৎ শুভ্র উষ্ণীষ দৃষ্টে অনেকের মনে হইল যেন কোন মহাসমরের আয়োজনের জন্য তিনি গম্ভীর ভাবে মন্ত্র গ্রহণে নিমগ্ন হইয়াছেন। মহাযজ্ঞের প্রধান নেতাগণ বেদির উপরিভাগে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে সেই জনপূর্ণ মণ্ডপ ক্ষণকালের জন্য গভীর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল—প্রতিনিধিগণ ও দর্শকমণ্ডলী নিস্পন্দ ভাবে মহাযজ্ঞের উদ্বোধনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি সহস্র সহস্র করতালি ধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি অপার আনন্দে বিহ্বল হইয়া মহোৎসাহে তেজস্বী বক্তৃতায় দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে প্রাণ খুলিয়া অভ্যর্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি যেরূপ লালায়িত হইয়াছিলেন এবং দিন থাকিতে

উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া যেরূপ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তৎসমুদায়ের পরিচয় দান করিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী-গণের সহানুভূতি অভাবে ও কোন কোন লোকের বিপক্ষতায় অভ্যর্থনা-সমিতি প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য আশানুরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই এই বিষয়ের পরিচয় দিতে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন—সহস্র সহস্র হৃদয় তাঁহার হৃদয় নিহিত দুঃখের পরিচয় পাইয়া দুঃখে ক্ষোভে ও ঘৃণায় অভিভূত হইলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের জ্বলন্ত বক্তৃতা শেষ হইলে বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ পারসিস্ বণিক ও সুদক্ষ ব্যারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় মহাযজ্ঞের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিত্রয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ও সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ইয়ুল্ সাহেবকে বর্ত্তমান মহাযজ্ঞের সভাপতি পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জর্জ্জ ইয়ুলের নামোচ্চারিত হইবামাত্র সহস্র সহস্র লোক মহা আনন্দে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সহস্র সহস্র কণ্ঠ নীরব হইলে শিখ সর্দ্দার দুয়াল সিংহ ধীরভাবে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তাব কর্ত্তার অনুমোদন করিলেন। অনন্তর মান্দ্রাজ-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সভাপতি মুদ্‌লিয়ার ও অযোধ্যার নবাব বিখ্যাত রেজা-হোসেন উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শক আনন্দের সহিত উক্ত প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন। সকলের সাদর আহ্বানে জর্জ্জ ইয়ুল্ সর্দ্দার দয়াল সিংহ ও পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মধ্যস্থিত সমুচ্চ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই বক্তৃতা দানের জন্য পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; আবার গভীর আনন্দ কোলাহলে গগন মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে যজ্ঞভূমি গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। সভাপতি মহাশয় তেজস্বী ও বহুবিধ সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় ভারতের হিত ও ইংলণ্ডের গৌরব সাধন বিষয়ক কত কথার পরিচয় দান করিলেন—সিপাহীবিদ্রোহের পর ভারতে সুশান্তি ও সুশিক্ষা বিস্তারে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে কত উন্নতি হইয়াছে, একাল মধ্যে ভারতের শাসন প্রণালীর উন্নতিসাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় বিধান ও ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিয়াছেন, এখনও ভারত-বর্ষের যে সকল অভাব রহিয়াছে, এবং কিরূপ ব্যবস্থাপক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতের সেই সকল অভাব বিমোচিত ও ভারতবাসীর উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তৎসমস্ত সুস্পষ্টরূপে তন্নতন্ন করিয়া দর্শন করিলেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত ব্যক্তিগণ একান্ত মুগ্ধ ও যারপর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। আমরা প্রস্তাবান্তরে তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার উত্তম উত্তম স্থানের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মপ্রকাশ করিতে যত্ন পাইব।

ক্রমশঃ

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী।

(১)

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
নাগিনী, সাপিনী কেহ, কেহবা যক্ষিনী !
একদা অশুভ দিনে, সুস্থকায়ে, সুস্থমনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারিদিক হ'তে তারা, শ্লেষ বিদ্রূপের ধারা
মোর অসহায় মাথে বর্ষিল অমনি।
প্রদোষে বিহীন বাক্ তীরে ঘোরে চক্রবাক,
তাহারে আক্রমে যথা বিংশতি হংসিনী ;
নিকুঞ্জে পশিলে ভুলে, সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া হুলে
মৃগেরে আক্রমে যথা মধুকর শ্রেণী ;
একি হাসি !—একি রঙ্গ ! রণে আমি দিয়ে ভঙ্গ
কুরুক্ষেত্র হ'তে ভয়ে পলানু তখনি।

(২)

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
সাক্ষাৎ দেবতা তারা কারুণ্য-রূপিণী।
এক দিন, শুভ দিনে, রুগ্ন কায়ে, ভগ্ন মনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারি দিক হ'তে তারা, বাক্য-অমৃতের ধারা
আমার তাপিত প্রাণে বর্ষিল অমনি ;
দিবাতপ্ত পুষ্প দেহে, সারা রাত্রি ঢালে স্নেহে
প্রাণময়ী সুধা যথা নিশা-বিনোদিনী ;
কি মধুর ভালবাসা, কি যতন, কি শুশ্রূষা !
সহসা আঁধারে যেন এল গৃহমণি !
রোগ নয় ক্ষেম উহা, শিখাইয়া দিল যাহা
সাক্ষাৎ দেবতা তারা কারুণ্য-রূপিণী,
আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মহিলা শিল্পমেলা।

ভারতীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে যত্নবতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল—কলিকাতায় সখিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদের সহিত এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাইতেছি সম্প্রতি লেডি ল্যান্সডাউন সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহার পেট্রনেশ হইয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সমিতিকে ১০২৫ টাকা দান করিয়া ইহার যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মহারাণী কুচ-বেহার, লেডি বেলি এবং অন্যান্য যে সকল মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই মেলায় চাঁদা ও শিল্প প্রদানে এবং অন্যান্য প্রকারে ইহার সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি।

সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্যাদি যদিও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি আর একবার আমরা এখানে বলিতেছি, অসহায় বঙ্গ বিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন বা কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাঁহার কেহ নাই, বা যাঁহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন, তাঁহাদের অভিভাবকদিগের সম্মতি-ক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা-বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখি-সমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইঁহাদিগকে বেতন দান করিবে। * ইহা দ্বারা দুইটি কাজ

---

* এইখানে একটী কথা—যে সকল বালিকা এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা পাইতে চাহেন, শিক্ষা পাইবার পর তাঁহারা যে আজীবন সখিসমিতির কার্য্যে বাঁধা থাকিবেন, এমন নহে। শিক্ষা শেষ হইবার পর চারি বৎসর মাত্র তাঁহাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতে হইবে। তাহার পর এই কার্য্য করা না করা তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু চারি বৎসরের আগেই যদি কেহ এই কার্য্য হইতে অবসর লইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে সমিতির যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সেই ব্যয়ে আর একজনের শিক্ষা সম্পন্ন হইবে।

একসঙ্গে সাধিত হইবে। অনাথা ও বিধবা বঙ্গকন্যাগণ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত পরোপকার কার্য্যে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থীগণ কেহ কেহ মাসিক কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু সে চাঁদা হইতে এ কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে না। সেই জন্য সমিতির অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে সম্প্রতি মহিলা শিল্পমেলা নামে একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। অর্থ বৃদ্ধি ভিন্ন মহিলাগণের শিল্পোন্নতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল।

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেথুনস্কুল বাটীতে লেডী বেলী কর্ত্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী লাণ্ড্‌সডাউন আগমন করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৫টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এ মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথুনস্কুলের বাড়ীটী লতাপাতা ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটী লতা পাতা রচিত কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারি পার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োপযোগী নানা রূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল। এবং এক এক জন মহিলার উপর বা দুই তিন জনের উপর দ্রব্য বিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট গহনা, কাহারও নিকট নানা প্রকার রেশমী কাপড়, কাহারও নিকট ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলেনা কাহারো নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি। কোন কোন সংবাদ পত্র বলিয়াছেন মেলায় মহিলা-শিল্প বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু ঠিক বিপরীত। এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই শিল্পের এখনো কতক উদ্বর্ত্ত আছে যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখান যাইতে পারে। উক্ত শিল্প সকল অধিকাংশ এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে সম্ভবতঃ সেই জন্যই দর্শক মহিলাগণ উহা মহিলা-নির্ম্মিত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমরা বরং মহিলাশিল্প কি কি ছিল তাহার এইখানে একটু বর্ণনা করি।

প্রথমতঃ স্ত্রীলোক নির্ম্মিত মাছ কচ্ছপ লাউ কুমড়া প্রভৃতি কতকগুলি এমন সুন্দর শিল্প ছিল যে তাহা দেখিবামাত্র স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়।

একজন একখানি ক্ষীরের ফুলশয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষীর নির্ম্মিত আসনে ক্ষীর নির্ম্মিত বর কন্যা, ক্ষীর নির্ম্মিত সখীগণ, ক্ষীর নির্ম্মিত থালায় ফুল শয্যার নানা উপকরণ—ক্ষীরের কোন থালায় আম, কোন থালায় নেবু কোন থালায় সন্দেশ ইত্যাদি।

একজন রমণী একখানি মাটীর গ্রাম্য ছবি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন। দুখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গনে রমণী ধান শুখাই-তেছেন। গোয়ালে গরুটা মুখ বাড়াইয়া আছে, অদূরে একজন মাথায় কাঠ লইয়া আসিতেছে। খাঁচায় একটা পাখী, দাওয়ায় একটা বেড়াল, পাশে দোলনায় ছেলে শুইয়া আছে।

একজন রমণী পুঁথির খাট, চতুর্দ্দোলা, পালকী, কোচ, চৌকী, পাখা ইত্যাদি দিয়া-ছিলেন। একজন কানির ফলের ডাগা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ সব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রমণী নির্ম্মিত বড়ির ও ধান চালের সুন্দর চিক বাজু বালা হার কণ্ঠি ইত্যাদি নানারূপ গহনা ও দড়ির শিকা, রেশম, পশম, জরী ও সুতার নানা রূপ দ্রব্য—কাপড়, সাল, মোজা, গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কাঁথা, চৌকী-ঢাকা, ফুল, ফল, পাখী, ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিস ছিল। পিঁড়ার সূক্ষ্ম আলপানার কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আঁকা সুন্দর ছবি প্রভৃতি মহিলা রচিত শিল্পেরও অভাব ছিল না। শিল্পী মহিলাদিগের মধ্যে ৭ জন মহিলার শিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা প্রত্যেকেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দান প্রাপ্ত শিল্পের জন্যই সখী সমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, সুতরাং ৫ জন মাত্র এই কারণে সখীসমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা ব্যতীত আগরা, কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদা-বাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে নানারূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল।

মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতি নাট্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইখানে একটি কথা,কেহ কেহ সখীসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু হিন্দু সখীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই—দেশের সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন। সখী সমিতি যে ব্রাহ্ম সমিতি নহে, তাহার প্রধান প্রমাণ বোধ করি এই যে, কোন ব্রাহ্মপত্রিকা ইহার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছেন।

সকলেই অবগত আছেন—সখীসমিতি একটি বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনী নহে একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ সম্মিলনী। ইহার উদ্দেশ্যই মেলা মেশা, গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করা।

বাস্তবিক নির্দ্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের এত প্রবল যে উপযুক্ত উপায়ে

যদি সেই আমোদ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয় হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং যেখানে মনের উদ্দেশ্য থাকে গল্প করিয়া শিক্ষা করিব—এবং শিক্ষা দিব—সেখানে গল্পেই এই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে। সুতরাং কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে অনাথাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে—এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত সখীসমিতিতে গান, গল্পস্বল্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অবিশুদ্ধ আমোদের ঘৃণাক্ষর এখানে নাই। একথা যিনি বলেন—সভবতঃ তিনি নিজেই ভ্রমে পড়িয়াছেন, কেননা ভদ্রলোকের পক্ষে এরূপ মিথ্যা বলা অসম্ভব।

তবে যাঁহারা বলেন হিন্দু রমণী ও ব্রাহ্ম রমণীগণের পরস্পর সম্মিলনে সুফল ফলিবে না, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। পরস্পর মেলামেশায় উভর পক্ষেরি হৃদয়ের যে প্রশস্ততা লাভ হয়—হয় তাঁহারা তাহা বুঝেন না—না হয় তাঁহাদের নিকট সঙ্কীর্ণ ভাবেরই আদর। স্ত্রীলোকে মিলিয়া স্ত্রীলোকের উপকার করিতে ইচ্ছা করিলে—হয় তাঁহারা বিবেচনা করেন সে ইচ্ছা সফল হইবে না—নয় সে ইচ্ছাকে তাঁহারা কুইচ্ছা মনে করেন, সুতরাং এরূপ গোঁড়া লোকের কথায় কথা না কহাই ভাল।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, অনভিজ্ঞতা বশত এইবার মেলায় আমাদের যে সকল ত্রুটি হইয়াছে আমরা সে জন্য আমাদের নিমন্ত্রিতাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভবিষ্যতে যাহাতে কোন রূপ ত্রুটি না হয় তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকিবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। +

ক্রীড়া ও কৌতুক। তাহিরপুর তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র সাময়িক পত্র, মূল্য এক আনা মাত্র।

ক্রীড়া কৌতুক পড়িয়া আমার বড়ই প্রীত হইলাম, এই পত্রখানি বহুদিন স্থায়ী হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করুক ইহাই আমাদের বাসনা।

ক্রীড়া কৌতুক কিরূপ কৌতুক প্রদানে সমর্থ পাঠক নিম্ন উদ্ধৃত প্রবন্ধটি হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

X

বীরেশ্বরের পারিবারিক আত্মশাসন।

(১)

বীরেশ্বর বিদ্যায় বুদ্ধিতে ধনে জনে মানে সম্ভ্রমে মানসিক বলে পাশব বলে সকল

বীরেশ্বর খবরের কাগজ পড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়া গ্রন্থ পড়িয়া বিদ্বান হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত অতি উদার এবং হৃদয় অতি বিস্তার। তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। তিনি বৈষম্য ভাবের বড়ই বিরোধী।

বীরেশ্বর অনেক দিন যাবৎ অনেক চিন্তা করিয়া একটি বিষয় স্থির করিলেন। পরে এক দিন বাটির দাস দাসী পুত্র কন্যা স্ত্রী পরিজন আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে একস্থানে আহ্বান করিলেন এবং সকলকে একত্র করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই যে তিনি প্রাচীন নীতিতে অসভ্যরীতিতে তাঁহার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন না—তিনি উদারনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে ভাল বাসেন। তিনি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার উচিত প্রাপ্য স্বাধীনতা সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার পরিবার মধ্যে আত্মশাসন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এই অভিপ্রায়ে একখানি "প্রচার লিপি" অর্থাৎ Proclamation ছাপাইয়াছেন তাহা এক্ষণে প্রচার করিয়া দিতেছেন——

"প্রচার লিপি।

১। আমি শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর এই পরিবারের স্বামী ও অধিপতি এবং মালীক, পরিবারস্থ জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কিম্বা হিতার্থে অথবা উপকারার্থে এবং কার্য্য সৌষ্ঠবার্থে এই ঘোষণা লিপি প্রচার করিতেছি যে এক্ষণ হইতে পক্ষপাত শূন্য বিজ্ঞ-নীতি অনুমোদিত আত্মশাসন প্রণালী দ্বারা আমার পরিবারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে।

২। প্রতিমাসের প্রথম দিনে আমার দাস দাসী ভৃত্যবর্গ একটি মহা নির্ব্বাচন সভা আহ্বান করিয়া আমার পুত্র কন্যা এবং প্রিয় কর্ম্মচারীগণকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ আমার "রন্ধন শালার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নামে" অভিহিত হইবেন এবং তাঁহারা উক্ত রন্ধন শালা সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচকগণ কেবল মাত্র আমার বেতন ভোগী পরিচারক ব্রাহ্মণ বা পাকের বামন ঠাকুর ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। আপাততঃ শিক্ষার জন্য কেবল রন্ধন শালা বিভাগের কার্য্যই আত্মশাসন প্রণালী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। কয়েক বৎসর এই প্রণালীতে কার্য্য চলিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আত্মশাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে পরে সভ্যগণ একত্রিত হইয়া সংসারের অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য নির্ব্বাচন প্রণালীতে একটি মহাসভা গঠন করিবেন। সভার নাম হইবে পারিবারিক-প্রজা-সাধারণ সভা বা "ডোমেষ্টিক রিপাবলিক"। এই সভার সভাগণের বক্তৃতা করা ভিন্ন অন্য কোন ক্ষমতা থাকিবে না। সভাপতি সমস্ত কার্য্য করিবেন। এই সভার সভাপতির নাম

হইবে—সংসারের-সর্ব্ব বিষয়ক-অধিস্বামী বা প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্ড মাষ্টার কমেণ্ডার অব্দি সিবিল মিলেটারি ফাইনান্সিয়াল ইকনমিকেল সিলেস্চুয়াল এণ্ড মিসলেনিয়াস ডিপার্ট-মেণ্ট। ডোমেষ্টিক রিপাবলিক সভা যে কোন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই পদে মনোনীত করিতে পারিবেন কিন্তু প্রকাশ থাকে যে এই গুরুতর দায়িত্ব-সংযুক্ত পদে আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও মনোনীত করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। আত্ম-শাসনের এত দূর গুরুতর এবং প্রশস্ত ক্ষমতা ব্রিটিস গবরমেণ্ট ভারতবাসীগণকে দিতে সাহস করেন নাই। এই সকল ক্ষমতার অপব্যবহার বা অযথা ব্যবহার না হইতে পারে এই জন্য সমস্ত প্রকার নির্ব্বাচনেই আমার "মঞ্জুরি" গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইবে এবং আবশ্যকানুসারে যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন ব্যক্তির যে কোন কার্য্য স্থগিত করিতে কি বন্দ করিতে কি রহিত করিতে কি না করিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। ইতি তারিখ * * * শক।

স্বাক্ষর শ্রীবীরেশ্বর।"

বীরেশ্বর এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া এই মহৎ কার্য্যের জন্য আপনাকে যথা-রীতিতে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

(২)

উপরিউক্ত ঘোষণা পত্র প্রচারের এক সপ্তাহ পর বীরেশ্বর আর তাঁহার স্ত্রীতে কলহ উপস্থিত। বীরেশ্বরের স্ত্রী বলিতেছেন "তুমি সমস্ত ক্ষমতা আমার হাত হইতে লইয়া সভার হাতে দিয়াছ তরকারিতে লবণ কম হইয়াছে তাহার আমি কি করিব?

বীরেশ্বর। কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছ কিনা?

স্ত্রী। তোমার মাথামুণ্ডু কৈফিয়ৎ! উহারা আর কি আমার অধীন যে আমার হুকুমে কায করিবে?

বীরেশ্বর। এক্সপ্লেনেসন তলব কর।

বামন ঠাকুর কৈফিয়ৎ দিলেন রন্ধন শালার কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় বেসরকারি সভ্যগণের সংখ্যা অধিক, সভ্যগণ ব্যয়ের বজেট এষ্টিমেটে জল অধিক ধরিয়া লবণ কমাইয়া দিয়াছেন; এই হেতুতে তরকারিতে লবণ কম হইয়াছে।

সভ্যগণের পক্ষ হইতে আর এক কৈফিয়ৎ দাখিল হইল সভাপতি রন্ধন করিবার সময় ঘুমাইয়া থাকেন কাযেই তরকারিতে লবণ দিতে ভুলিয়া যাইয়া তাহাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন।

বীরেশ্বর মন্তব্য লিখিলেন "কৈফিয়ৎ সন্তোষ জনক নহে"

বীরেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন "ইহাতে আর কি হইবে? তোমার সন্তোষজনক অসন্তোষ-

বীরেশ্বর। ক্ষতি বৃদ্ধি বিলক্ষণ আছে। আমি ভবিষ্যতে বিবেচনা করিয়া সমস্ত বিষয়েই হাত রাখিয়াছি। আমি এক বৎসর জন্য রন্ধন শালার আত্ম-শাসন কার্য্য স্থগিত রাখিতেছি।

(৩)

বেলা তৃতীয় প্রহর। বীরেশ্বর তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছেন —"আরে আজ্ যে এখনও রান্নাঘরে কথাবার্ত্তা শুনি না? বামন ঠাকুর আজ্ তোমাদের হয়েছে কি?"

বামন ঠাকুর। আজ্ঞে আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে এক বৎসরের জন্য আপনি কর্ম্মে স্থগিত করিয়াছেন।"

বীরেশ্বর গৃহিণীকে আহ্বান করিলেন। গৃহিণী উপস্থিত হইলে বলিলেন "আজ কি আমাদের আহারাদি নাই? রান্নাঘর অপরিষ্কার উঠান অপরিষ্কার এ সকল কি চক্ষু দিয়া একবার দেখিতেও নাই?

গৃহিণী ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—"আমি একা তোমার বাড়ীর সীমা রক্ষা করিব ফরেণ ডিপার্টমেন্টের কার্য্য চালাইব ইকনমিকেল ডিপার্টমেন্টের কার্য্য দেখিব আবার ইহার উপর ডোমেষ্টিক বিভাগের কার্য্য দেখিব—আমার এত সময় নাই।"

বীরেশ্বর। হরি হরি! অনাহারে আর এই দুর্গন্ধে এখন মরিব নাকি?

এমন সময় প্রতিবেশী রামধন চক্রবর্ত্তী তাঁহার বাটির জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলেন —

"কিহে ভায়া বীরেশ্বর! তোমাদের বাড়িতে এত গোলযোগ কেন?

বীরেশ্বর। আর কি বলবো ভাই! আমার অদৃষ্ট। বেলা তিনটা তবু এখনও আমাদের রান্নাঘর পরিষ্কার হইল না।

প্রতিবেশী। এতে আর ভায়া আক্ষেপ কি? এত তোমারই লীলা খেলা। তোমারই নিজের কার্য্যের ফল। রাগ করিও না ভাই! যদি করিতে হয় তবে ভাল করিয়াই করিতে হয়। হয় সরল ভাবে কায কর্ম্মের ভার তোমার লোকদের হাতেই দাও, না হয় গৃহিণীর হাতেই রাখ। মাঝামাঝি রাস্তায় আসিয়া—"নামে দাতা কাযে কৃপণ। নামে আত্ম শাসন কাযে কাঁজি ভক্ষণ!!"—একবার এটা একবার সেটা করিয়া কেন এরূপ গোলযোগ কর, আর আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত কর?

বীরেশ্বর। দেখ রামধন! তোমাদের এ সকল তামাসা কৌতুক আমার ভাল লাগে না। তোমাদের কথায় আমার গা জ্বলিয়া যায়। আমার অপরাধটা কি? যে আদর্শে আমি কাজ করি তাহার দোষ তোমরা কেহ দিতে পার না—অপরাধ যত বীরেশ্বরের!

নিম্ন লিখিত মহিলাগণ তাঁহাদের শিল্পের নিমিত্ত পুরস্কার পাইয়াছেন।

মিশ মামুক, রঞ্জিতের বেত্রসেতুর ছবির জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী, ক্ষীরের ফুলশয্যা এবং খোদিত প্রস্তর-ছাপের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ইনিই মাটীর গ্রাম্য ছবি এবং কার্পেটের দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইনি তৃতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

মিশ সরকার। সুতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের জন্য ইনি চতুর্থ পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস, জরীর কাজের জন্য পঞ্চম পুরস্কার পাইয়াছেন।

মহিলা শিল্পমেলা সম্বন্ধীয় আয় ও ব্যয়।

নাং ৯ মাঘ ১২৯৫ সাল।

আয়।

নগদ দান খাতে	...	...	২৪৬২
মেলার আয় (দানের দ্রব্যাদি, মেলার ক্রীত দ্রব্যাদি ও টিকিট বিক্রয়ের মূল্য এবং কমিশন প্রভৃতি সমস্ত লইয়া)	...	...	১৪৭৪৸৹১৫
			৩৯৩৬৸৹১৫
মেলার মোট ব্যয়	...	...	১০৪০৸৹
মজুত	...	...	২৮৯৬৲১৫

বিদ্রোহ।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহারকে জল হইতে উঠাইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার রাজা সেই তরুকুঞ্জে আগমন করিলেন।

আজও তেমনি চাঁদ উঠিয়াছে; বন প্রদেশে, জলাশয়ে তেমনি স্তব্ধ জ্যোৎস্নার তরঙ্গ বহিতেছে, মহারাজ একাকী ঘাটে আসিয়া বসিয়াছেন, চারিদিক উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন, কেমন চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন—সব আছে, তবু যেন কিছু নাই! কেবল পূর্ব্বদিনের সেই স্মৃতি সেই মূর্ত্তি, সেই স্পর্শ তাঁহার বাসনারুদ্ধ হৃদয় আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ থাকিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন, মনের সহস্র কথা প্রাণের নৈরাশ্য ব্যথা প্রাণেই রহিয়া গেল। পর দিন আবার সেই সময়ে আশায় নিরাশায় বিকম্পিত হইয়া নিকুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজও চারিদিক শূন্য মহাশূন্য—আজও কোথাও কেহ নাই, মহারাজ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তরুলতার ঝর ঝর শব্দ, জলাশয়ের মৃদু হিল্লোল, বন ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, চাঁদের মধুর হাসি শুধু কেবল তাঁহার প্রাণে অভাব জাগাইতে লাগিল—একটা আকুলতাময় অভাব—একটা বেদনাময় তীব্র অতৃপ্তির মধ্যে তিনি আত্মহারা হইলেন। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল, গভীর রাত্রে সুগভীর নৈরাশ্য বেদনা লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

শয্যাতে শুইয়াও তাহার কথা মনে পড়িতে লাগিল—পরদিন দেখা পাইবেন কি না সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল—তাহার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলেন, পাশে সেমন্তী যে কি অনাম জ্বালায় মুমূর্ষু তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না।

এইরূপে প্রতিদিন কাজে কর্ম্মে, বিশ্রামে অবসরে কেবল একজনেরি কথা তাঁহার মনে জাগিতে থাকে—প্রতি সন্ধ্যায় তিনি হৃদয়পূর্ণ সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিকুঞ্জে আগমন করেন, আবার সেই আকুল নিরাশা লইয়া গভীর রাত্রে প্রাসাদে ফিরিয়া যান। প্রতি দিন এইরূপ অভিনয় চলিতে লাগিল। রাজার আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই—তাঁহার উন্মত্ত হৃদয় সুহারের চরণে উপহার দিবার জন্য রাজা উন্মত্ত। রাজা কেবল ভাবিয়া আকুল, কিরূপে তাহার একবার দেখা পাইবেন।

রাজা নিকুঞ্জে সেই গাছের তলে যেখানে সুহারকে নামাইয়াছিলেন—সেইখানে দাঁড়াইয়া কেবল উহাই ভাবিতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন—এইরূপেই কি দিন যাইবে—

প্রতিদিন এই পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া কি কেবল শূন্যকে উপহার দিতে আসিব—আবার নিরাশভাব বহন করিয়া একাকী ফিরিয়া যাইব? দিনের পর দিন যাইবে, আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কি কখনো পূর্ণ হইবে না, এই আকুল উন্মত্ততা সত্যই কি উন্মাদের কল্পনাতেই বিলীন হইবে? ইহার কি প্রতিকার নাই? কেন এ সঙ্কোচ? যাহাকে হৃদয় দিয়াছি--সর্ব্বস্ব দিয়াছি—হৃদয়ের রাণী করিয়াছি তাহাকে সিংহাসনের রাণী করিতে সঙ্কোচ? এই জন্য সমস্ত জীবনের সুখ শান্তি কি লোপ করিব?"

এই সময় কাহার পদ শব্দ শোনা গেল—রাজা চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন—হরিদাচার্য্য আসিতেছেন। হরিদাচার্য্য নিকটে আসিলে তিনি মৌণে অভিবাদন করিলেন। হরিদাচার্য্য আশীষ করিয়া বলিলেন—"বৎস তোমাকে গোপনে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি—সভায় লোকজনের সাক্ষাতে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে না। শুনিতেছি গণপতিকে তুমি আমার পরিবর্ত্তে পুরোহিত করিবে, প্রাসাদের পশ্চাতে ঐ জন্য নূতন মন্দির হইতেছে?"—

গ্রহাদিত্য মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক হইলেন—হরিদাচার্য্যের প্রতি তিনি যতই বিরক্ত হউন না কেন এখনো তাঁহাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন—মহৎ লোকের যে একটি গম্ভীর আকর্ষণী ভাব তাহার হাত হইতে সহজে লোকে আপনাকে সরাইয়া লইতে পারে না। একটু পরে বলিলেন—"ঠাকুর গণপতিকে নূতন মন্দিরের পুরোহিত করিতেছি সত্য কিন্তু আপনার পরিবর্ত্তে নহে, আপনি যেমন আছেন তেমনিই থাকিবেন। আপনার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেই বা আমার অধিকার কি"?

হরিদাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন—"অধিকার নাই থাকুক, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমি তোমাকে অধিকার দিয়া নিজেই বিদায় গ্রহণ করিব, কেবল কিছুদিন মাত্র তোমারি মঙ্গলের ইচ্ছায় আমার পৌরহিত্য রাখিতে ইচ্ছা করি। ভগবান করুন, তাহার পর যেন তুমি নিজে আমার এই অধিকার অন্যকে দান করিতে পার। কিন্তু যতদিন সে দিন না আসে আমার পদ আমি ত্যাগ না করি, ততদিন বৎস আমার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় যেন ভোগ করিতে পাই, তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু আমার কর্ত্তব্য—তাহা পালনে আমাকে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়, তোমার বিরক্তির ভয়ে তোমাকে মঙ্গল উপদেশ দিতে যেন পরাঙ্মুখ না হই।"

রাজা বুঝিলেন—কোন একটা উপদেশের ইহা পূর্ব্ব সূচনা, বড়ই বিরক্তি বোধ হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। পুরোহিত বলিলেন—"বৎস কোন কারণে আমি কিছুদিন ইদরে থাকিব না, গণগৌরী পূজা হইয়া গেলে তখন ফিরিয়া আসিব। যাইবার আগে আর একবার বলিয়া যাই, বৎস সম্মুখে নিতান্তই অমঙ্গল, তুমি জাগ্রত না হইলে উপায় নাই।"

রাজা বলিলেন—"আপনি ত ক্রমাগতই অমঙ্গল কল্পনা করিতেছেন, ইহাতে যতক্ষণ

না জাগ্রত হই ততক্ষণই কি মঙ্গল নহে ?—অমঙ্গল সত্যই যদি ঘটে তখন তাহার ভোগ ত আছেই—এখন হইতে তাহার কল্পনায় জীবনকে কেন বিভীষিকাময় করা ?"

পুরোহিত। মহারাজ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, আমিও তাহা বুঝি, কিন্তু আগে হইতে সতর্ক হইলে এই অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়'।

রাজা। কিন্তু কি অমঙ্গল তাহা যদি জানি তবে ত রক্ষা পাইব ? আপনি অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলেরই উল্লেখ করিয়া আমাকে ব্যস্ত করিতে চান। কি অমঙ্গল হইতে আমাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহা কি বলিয়াছেন" ?

পুরোহিত। "প্রজাবিপ্লবের একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে"।

রাজা। ও কথা যদি বলেন ত সে লক্ষণ আর কেহ দেখিতেছে না, অন্ততঃ আমি ত দেখিতেছি না ?"

পুরোহিত। তোষামোদ পূর্ণ রাজসভায় বসিয়া তুমি তাহা কিরূপে দেখিবে ? কিন্তু আমি দেখিতেছি ভীলগণ দিন দিন অশান্ত, অসন্তুষ্ট হইতেছে।"

রাজা। তা যদি হয়—ত বিনা কারণে হইতেছে, আমি এমন কিছুই কাজ করি নাই যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে—সুতরাং যাহার কারণ নাই—তাহার কারণ দূর করা অসম্ভব। লোকে যখন নিজের দোষে কষ্ট পায় তখন দেবতাকে ঈশ্বরকে গালি দেয়, কিন্তু সে গালি কি তাঁহাতে স্পর্শে ? আমি যদি নির্দ্দোষী হই ত তাহাদের অসন্তোষে কিছু মনে করি না।"

পু। "মহারাজ সত্য কথা, দুঃখ কষ্ট আমাদের মনের দোষ। কিন্তু সে জন্য বিধাতাকে দোষী করা পিতার উপর পুত্রের অভিমান, এই অভিমানের অর্থ দুঃখ দূরের প্রার্থনা। সে অভিমান সে প্রার্থনা বিধাতা না শুনিলে কে শোনে। বুঝিলাম প্রজারা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছে—কিন্তু তাহাদের দুঃখ তুমি না শুনিলে কে শোনে"?

রাজা। যদি সত্যই তাহাদের কোন দুঃখ থাকে আমি শুনিতে অনিচ্ছুক নহি—কি বলিতে চান আপনি বলুন।

হরিদাচার্য্য একটু নীরব হইলেন—তাহার পর বলিলেন—"মহারাজ ভীলকন্যাকে ভালবাসা"—

সেই পুরাতন কথা! রাজা বুঝিলেন হরিতাচার্য্য নিজের মন হইতে কথাটাকে নিতান্ত ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। সত্য সত্যই এ কথার মধ্যে যে একটা কিছু বিপদ আছে তাহা ভাবিলেন না। পুরোহিত কথা শেষ না করিতেই তিনি বলিলেন—"দেব আমার সব সহে—কিন্তু আমি কাহাকে ভালবাসি না বাসি আমার মনের কথা লইয়া টানা হেঁচড়া করা আমার সহে না। আমার নিজের মনের কথা—সে রাজার কথা নহে, তাহার সহিত প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই—আছে কি ?

পু। "একটু আছে! ভীলকন্যা প্রজার কন্যা—এটা ভুলিও না। তুমি রাজা

তুমি রক্ষক—কেহ বিপথে পড়িলে তাহাকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম, কিন্তু ভীলেরা ভাবিতেছে তুমি তাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপথে লইয়া যাইতেছ।" ক্ষেতিয়ার কথা হইতে হরিতাচার্য্যের এইরূপ মনে হইয়াছিল।

পুরোহিতের কথা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, একটা সত্য-দ্বার তাঁহার কাছে খুলিয়া গেল—লোকে এরূপও ভাবিতে পারে। তথাপি তিনি রাগিয়া বলিলেন "রাজার রাণী হওয়া একজন ভীলকন্যার কলঙ্কের কথা" ?

পু। "কিন্তু তাহা হইবে না। সে ভীল তুমি ক্ষত্রিয়।"

রাজা। "সে সঙ্কোচ আমার পক্ষে—ভীলের পক্ষে নহে—আমি যদি তবু ও—"

পু। "তাহা তুমি পার না—সে বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না—তাহাতে তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না।"

রাজা। যদি কলঙ্ক হয় সে কলঙ্ক আমার, ভীলদিগের তাহাতে কলঙ্ক নাই।"

ক্ষুদ্র প্রজারো আত্মসম্মান রাজার সম্মান হইতে যে ন্যূন নহে তাহা রাজা ভুলিয়া গেলেন, তিনি বড় লোক তাঁহার সম্মানে সকলে সম্মানিত এই মাত্র তখন তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ তাহা নহে তুমি রাজা, তুমি বড় লোক, তোমার কলঙ্ক লোকে দেখিবে না। কিন্তু ভীলগণ সামান্য হইলেও ইহাতে আপনাদিগকে কলঙ্কিত বিবেচনা করিবে। মহারাজ আপনাকে আপনি ভুলিও না—প্রবৃত্তিকে দমন কর।"

মহা। "আমার ভাবনা আমি নিজে ভাবিব,আপনার সেজন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।"

মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ পাগল হইয়াছ—একটু বুঝিয়া দেখ কি ভয়ানক কার্য্য করিতেছ, কেবল প্রজাদের ক্ষতি নহে,—আপনার রাজ্য জীবন সমস্ত খোয়াইতে বসিয়াছ।"

মহা। "আমি কি চিরকাল মুখোষের ভয় পাইব, এখন আমি বালক নাই ইহা হয়ত আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।" মহারাজ ত্রস্তে বিদায় অভিবাদন-করিয়া বাড়ীর দিকে পদক্ষেপ করিলেন—পুরোহিত কাতর হইয়া বলিলেন "গ্রহাদিত্য, গ্রহাদিত্য, তোমার মৃত্যু তুমি নিজে আহ্বান করিয়া আনিতেছ" !

বলিতে বলিতে দেখিলেন মহারাজ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন—হরিতাচার্য্য থামিলেন। কাতর নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভগবান তোমার লীলা বুঝা ভার অদৃষ্টের চক্র তোমার হাতে—তাহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করা মানুষের বৃথা পরিশ্রম, তবু আমরা না বুঝিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া মরি ! কাহার দোষে কাহাকে তুমি শাস্তি দাও তুমিই জান—পিতার দোষে পুত্রের শাস্তি ! একের পাপে অন্যের প্রতিফল ! মন্দালিকের বধের শাস্তি বুঝি আজ নাগাদিত্যকে বহন করিতে হয়" ।

হরিদাচার্য্য ব্যথিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস নাগাদিত্যের আগত বিপদ খণ্ডন-কামনায় নির্জ্জনে ধ্যান স্বস্ত্যয়নে অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া সেই দিনই মন্দরপুর ত্যাগ করিলেন। তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় দেখিলেন না।

ঊনচত্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাণী পূর্ব্বে আর কখনো রাজাকে লুকাইয়া কোন কাজ করেন নাই, সুহারকে রাজার সহিত দেখা করিতে নিরস্ত করা তাঁহার এই প্রথম এইরূপ কাজ, সুতরাং যতই কর্ত্তব্য জ্ঞানে নীত হইয়া এই কার্য্যে উত্তেজিত হউন না কেন—কার্য্য শেষ হইবার পর হইতেই তাঁহার মনে কেমন একটা অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠিল—সত্য সত্য কাজটা ভাল করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে তখন তাঁহার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল, রাজার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই যদিও এরূপ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন—পাছে রাজা মোহান্ধ হইয়া একজন অজ্ঞান বালিকাকে বিপথে লইয়া যান—তাঁহাকে অন্যায় পথ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই যদিও অনন্যোপায় হইয়া প্রথমে তাঁহার এই সঙ্কল্প মনে উদিত হয় কিন্তু এখন তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল নিজের স্বার্থের জন্যই কি তিনি এ সমস্ত করেন নাই? বাস্তবিক কি রাজা এইরূপ অন্যায় কাজ করিতেন? তাঁহাকে এতদূর অবিশ্বাস করা—তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি এতদূর সন্দেহ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? রাজা হয়ত বিবাহের আশা করিয়াই সুহারকে ভালবাসেন, সুহার যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না—ইহা হয়ত তিনি জানেন না; এ কথা হয়ত তাঁহার মনেই আসে নাই, কেহ তাঁহাকে ইহা বলিতেও হয়ত ভরসা করে নাই। এরূপ জানিলে রাজা নিজেই হয়ত সাবধান হইতেন, রাজাকে সাবধান না করিয়া তিনি কি না সুহারকে সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন—স্বামীর কল্পিত সুখের পথে লুকাইয়া লুকাইয়া কণ্টক অর্পণ করিতেছেন"। এ সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন—ততই রাণীর হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল—তিনি ভাবিলেন—"রাজা যদি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারেন তিনি না জানি কি মনে করিবেন? তিনি কি ভাবিতে পারেন না ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিজের সুখের জন্যই আমি সুহারকে আমার পথ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিয়াছি! প্রকৃত পক্ষে ইহাই কি ঠিক নহে? নিজের সুখের জন্যই কি আমি লালায়িত নহি"?

রাণীর মনে হইতে লাগিল, তিনি নিজের স্বার্থের জন্যই সমস্ত করিয়াছেন,—রাজার জন্য যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন, সে কথা একেবারে অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহার মঙ্গল করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে শেষে মনে যে স্বার্থের কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সেই স্বার্থই তাঁহার কার্য্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহার অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, রাজার নিকট নিজের অন্যায় প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেবল কি রূপ করিয়া বলিবেন—এই

সঙ্কোচে নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন। বলিবার আজ কাল তেমন সুবিধাও ঘটে না, রাজা অধিক রাত্রে আসেন, ভোরে উঠিয়া যান--নিজে হইতে প্রায় কথাবার্ত্তা কহেন না,—এরূপ অবস্থায় কি করিয়া এ সব কথাই বা তোলেন! এই নূতন কষ্টে অন্য গুরুতর কষ্টও তাহার মনে লঘু আকার ধারণ করিল।

এ দিকে গণগৌরী পূজার উৎসব আগত প্রায়, চৈত্র মাস পড়িয়াছে ১০ই চৈত্র সমরাত্র-দিবার দিনে কৃষকদিগের নূতন-শষ্য বপন আরম্ভ হইল—চারিদিকে বসন্তের হিল্লোল, শষ্য বপনের ধুম। এই দিনে প্রতি সামান্য কৃষক ঘরণীও স্বহস্তে একটি ক্ষুদ্র স্থান খুড়িয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে লাগিল, এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত হইলে প্রিয়তমকে তাহা উপহার দিয়া সম্বৎসর তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অগ্নির উত্তাপে তাহা শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

রাণীও সহচরীদের সহিত শষ্য বপন করিলেন, গান বাদ্যের মধ্যে বীজ বপিত হইল, সেই আমোদের মধ্যে রাণীর মূর্ত্তি একটি শোকের ছায়া বোধ হইতে লাগিল।

দু চারদিনে বীজ অঙ্কুরিত হইল, রাণী তাহা রাজাকে উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—অনেক রাত্র হইয়া গেল, দেখিলেন মহারাজ তখনো অন্তঃপুরে আসিতেছেন না—রাণী আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই তাঁহার বিরাম গৃহে গমন করিলেন। রাজা সবে মাত্র নিকুঞ্জ হইতে আসিয়া পালঙ্কে শুইয়াছিলেন, রাণী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝি রাজার চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়িল তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের বাতায়ন মুক্ত, সুতরাং বাহিরের জ্যোৎস্না অল্প অল্প গৃহে আসিয়া পড়িয়াছিল, দীপও জ্বলিতেছিল, সেই মিশ্রিত আলোকে দুজনের বিষণ্ণ মলিন মুখ দুজনের চোখে পড়িল, দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন;—দুদিনে কি পরিবর্ত্তন! আজ কেহ কাহাকে দেখিয়া কথা খুঁজিয়া পায় না, হৃদয়ের কথা হৃদয়ে থাকে, মনের ব্যথা মনে মিলায়! মহিষী আস্তে আস্তে বলিলেন "মহারাজ তোমাকে অঙ্কুর পরাইতে আসিয়াছি"—

রাজা বলিলেন—"ওঃ আজ অঙ্কুর পরিবার দিন, ভুলিয়া গিয়াছি। রাজা মাথা বাড়াইয়া দিলেন, রাণী আজ অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া তাঁহার উষ্ণীষে অঙ্কুর বাঁধিয়াদিলেন, তাহার পর রাজা না বলিতেই পালঙ্কের এক পাশে বসিলেন। রাজা একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন, রাজার মনে হইল কোন একটা কথা কহা দরকার, কিন্তু কোন কথা যেন তাঁহার জোগাইতেছিল না—তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া একবার গোঁপে তা দিয়া অবশেষে বলিলেন—

"আঃ দিনটা কি গরম!" মহিষীর গাল বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, এখনকার এই সম্ভাষণ! এখন আর রাজা কথা খুঁজিয়া পান না! কিন্তু রাজার এই ব্যবহারে তাঁহার হাসিও আসিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ মহারাজ,

এখন ঠাণ্ডা হইবারও বিশেষ সুযোগ দেখিতেছি না—আমি জ্বালাইতে আসিয়াছি”—

এই কষ্টের মধ্যেও ঠাট্টা করিবার ভাব রাণী অতিক্রম করিতে পারিলেন না—বোধ করি ইহা রমণীস্বভাব। হয়ত নিতান্ত নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার ভাব যেখানে থাকে সেইখানে এ বিদ্রূপ স্বাভাবিক, বুঝি ইহার পরিবর্ত্তে একটা আদরের কথা একটা ভালবাসার আশ্বাসের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

কথাটার সত্যতা রাণীর কথাতেই রাজা অনুভব করিলেন, কিছু উত্তর করিলেন না।

রাণী আবার বলিলেন—“ইচ্ছা করে জ্যোৎস্নাখানা আনিয়া প্রাণটা তোমার ঠাণ্ডা করিয়া দিই।”

রাজা ইহাতে রাগ করিলেন না—একটু শুধু উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন—তাঁহার সেই জ্যোৎস্না মনে পড়িল, জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না মনে পড়িল, তিনি যেন সহসা আর সব ভুলিয়া গেলেন। দৃষ্টি সহসা যেন থমকিয়া গেল—একটা অলস উদাস ভাব ছাড়া সে দৃষ্টিতে আর কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। ধীরে ধীরে রাণীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, বুঝিলেন—কিছুতেই আর তাঁহার ধন তাঁহার হইবার নহে, নিতান্ত আপনার লোক একবার পর হইলে বুঝি আর আপনার হইবার আশা থাকে না। তাঁহার বিদ্রূপের ভাব দূর হইল, একটা মর্ম্মভেদী কষ্ট মাত্র তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন—“মহারাজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব—বলিবে কি?

রাজা বলিলেন—“কি কথা!”

রাণী অনেকক্ষণ থামিয়া অনেক কষ্টে বলিলেন—“তুমি ভীলকন্যাকে বিবাহ করিবে”?

যদি কোন কথা রাজা রাণীর সহিত কহিতে না চান—ত সে ভীল কন্যার কথা। রাজা স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন—“এ আবার কে বলিল—?”

রাণী বলিলেন—“কেহ বলে নাই, কিন্তু আমার মনে হয় লোকে এইরূপ ভাবে,”—

রাজা বলিলেন—“লোকে কি ভাবে তাহার উত্তর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? তাহারা ত আমার সহিত পরামর্শ করিয়া ভাবিতে যায় না—তাহাদেরি ত জিজ্ঞাসা করিতে পার”—

রাণী বলিলেন—“না তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তোমাকেও কেন জিজ্ঞাসা করিলাম জানি না—আমি শুধু বলিতে আসিয়াছি—শুনিতেছিলাম ভীল কন্যা নাকি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না”—

রাজা। "সে কথাটা কি আমার শুনা এতই আবশ্যক" ?

রাণী। "আমি ত মনে করি। কিন্তু যখন তাহাকে বিবাহ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে ভালবাসা দেখাইলে মহারাজ তোমার নামে কলঙ্ক উঠিবে"

আবার সেই কথা! মহারাজ রাগিয়া গেলেন—বলিলেন—"পুরুষের কলঙ্ক হয়

রাণী বলিলেন—"পুরুষের কলঙ্ক হয় কি না জানি না, কিন্তু স্ত্রীলোকের হয়। তুমি রাজা, স্ত্রীলোকের কলঙ্ক মোচন করা তোমার কর্ত্তব্য—তুমি যদি"—

সমস্তই পুরোহিতের মন্ত্রণা, রাণীর মুখে তাঁহার প্রতি কথা!

রাজা বলিলেন—"মহিষি, আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি, অন্য যদি কিছু তোমার বলিবার থাকে বল—উহা আমার ভাবনার বিষয়, আর কাহারো নহে"

রাজার এইরূপ অশান্ত অন্যায় ব্যবহারে রাণীও অপ্রকৃতিস্থ হইলেন, বলিলেন—"তুমি এ বিষয়ে ভাব না বলিয়াই ত আমার ভাবিতে হয়। তুমি যে একজন স্ত্রীলোককে কলঙ্কিত করিতেছ তাহা যদি ভাবিতে তাহা হইলে কি তোমার এইরূপ মতি থাকিত? তোমার মঙ্গল তুমি না দেখিলে আমি অবশ্যই দেখিব, আমার সাধ্যমত আমার কর্ত্তব্য পালন করিব, তোমাকে ও সেই অবোধ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব—"

রাজা। "স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিতে পার,—আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই"

রাণী। "তোমার অনুমতির আগেই আমি তাহা করিয়াছি—সে আমাকে কথা দিয়াছে তোমাকে আর দেখা দিবে না—"

রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, সেই জন্যই তবে সুহারকে দেখিতে পান না! রাণীরই সমস্ত কারখানা! রাজা আগুণ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"মহিষি, স্বামীই স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা—স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব, স্বামীর সুখের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া যে নিজের ঈর্ষা চরিতৃপ্তি করিতে পারে—সে স্ত্রীলোক নহে, আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্যা হইলে।"

বজ্রের মত এই কঠোর বাক্য মহিষীর হৃদয়ে গিয়া বাজিল—রাণী মুর্চ্ছিত হইয়া পালঙ্ক হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন।

বসন্ত নিশীথে।

জোছনা হসিত নিশা
বসন্ত পূরিত দিশা
প্রকৃতি নয়ানে ঘুমঘোর!
কুসুম সুবাস হিয়া
উঠিতেছে উছলিয়া
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর!
উদাস মলয় বায়
আনমনে বহে যায়
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস!
সে মধু পরশ লাগে
তটিনী চমকি জাগে
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস!
উপকূলে তরুগণ
নেহারিয়ে কি স্বপন
কেজানে, হরষে মাতোয়ারা?
সুনীল অম্বর পাশে
তারাটি মুচকি হাসে
কোথা হতে বহে গীত ধারা!
মধুর স্বপন বেশ
মধুর স্বপন দেশ
সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস!
বিহ্বল চাঁদিনী নিশি
বিহ্বল বাসন্তি দিশি
প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস!

পদার্থ জগতের প্রকৃতি।

যখন আমার সম্মুখে কোন একটী পদার্থ উপস্থিত থাকে, তখন আমি বলি যে আমি সেই পদার্থটী দেখিতেছি। এস্থলে 'সেই পদার্থটী দেখিতেছি' ইহার অর্থ কি? সাধারণ পাঠক বলিবেন যে ইহা ত একটী সহজ কথা ইহার আবার অর্থ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য কি? কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে যাহা আমরা নিতান্ত সহজ মনে করি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত কঠিন। আমরা যাহা কিছু দিন দিন দেখিতে পাই, তাহা অবশেষে নিতান্ত সামান্য বলিয়া জ্ঞান করি। জন্মান্ধ ব্যক্তি যখন কোন অস্ত্রাবৎ চিকিৎসকের সাহায্যে দৃষ্টিলাভ করে, তাহার নিকট তখন চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতির উদয় যার পর নাই আশ্চর্য্য ও প্রীতিদায়ক হইবে; কিন্তু কিছু দিন পরে আবার সেই ব্যক্তিই উক্ত ঘটনা সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিবে! সেইরূপ আবার কোন ঘটনা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধির অগম্য হইলেও, বারম্বার তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর হইলে আমরা তাহাকে সামান্য বলিয়া জ্ঞান করি। 'দেখিতেছি' এই ঘটনাটী ও বাস্তবিক পক্ষে এক প্রকার বুদ্ধির অগম্য; ইহা সাধারণ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত এই প্রস্তাবটী রচিত হইতেছে। যদি তিনি বর্ত্তমান প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া এই প্রকারের অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হয়েন, তবে আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল মনে করিব।

মনে কর আমি একটী নক্ষত্র দেখিতেছি—এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে আমি এক প্রকার আলোক অনুভব করিতেছি মাত্র। যখন আমি বলি আমি নক্ষত্রটী দেখিতেছি, তখন আমার মনে ঐ আলোকের অনুভূতি ব্যতীত আর কোন ঘটনা বিদ্যমান নাই। সত্য বটে আমি ঐ অনুভূতির সাহায্যে ইহাও অনুমান করি যে আমার বাহিরে নক্ষত্র নামে একটী গোলাকার বস্তু আছে। কিন্তু হে পাঠক! তুমি অবশ্য অনুমান আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই দুয়ের প্রভেদ অবগত আছ। যাহা আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞাত হই তাহাই কেবল বিশ্বাস যোগ্য আর যাহা আমরা অনুমান করি তাহা সত্য ও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। যেমন আমি দূরে একটী শব্দ শুনিলাম, যদি আমার শ্রবণেন্দ্রিয় স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় থাকে, তবে শব্দটীর বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না শব্দটী যে শুনিয়াছি তাহা নিশ্চয়। এক্ষণে আমি অনুমান করিতে পারি যে দূরে হস্তী গর্জন করিতেছে আর শব্দটী তাহা হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শব্দের উৎপত্তি অন্যরূপ হইতে পারে—উহা মেঘগর্জ্জন হইতে পারে কিম্বা নদীস্রোতের গর্জ্জন হইতে পারে ইত্যাদি। অনুমান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে যখন এতই প্রভেদ তখন আমি এক প্রকার আলোক প্রত্যক্ষ করিবা মাত্রই কেন বলি যে আমি একটী নক্ষত্র দেখিতেছি। এই প্রশ্নের উত্তর আর

একটী উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া যাইতেছে; মনে কর আমি বলিলাম যে আমি একটী আম্রফল দেখিতেছি। এস্থলে আম্রফল শব্দে সাধারণ ভাষায় আম্রের আস্বাদন গন্ধ আকৃতি ইত্যাদি কতকগুলি অনুভূতি বুঝায়। যখন আমি আম্রফল দেখি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমি চক্ষু দ্বারা এক প্রকার আলোক অনুভব করি এবং তাহা হইতে ইহা অনুমান করি যে ইচ্ছা করিলে আমি আস্বাদন, গন্ধ, আকৃতি ইত্যাদি ও অনুভব করিতে পারি। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা আলোক, রসনা দ্বারা স্বাদ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, স্পর্শ দ্বারা আকৃতি এই কয়টী বিষয় অনুভব করা যায়; পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে আম্র ভক্ষণ কালে আম্র হইতে এক প্রকার আলোক অনুভব হওয়ার সময় একপ্রকার স্বাদ গন্ধও আকৃতি ও অনুভূত হইয়াছে। এইরূপ আলোকানুভূতির সহিত স্বাদ, গন্ধ ও আকৃতির অনুভূতি বারম্বার ঘটিয়াছে—সুতরাং আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে বরাবরই ঐরূপ হইবে। অতএব এক্ষণে যখন (আম্রের) একপ্রকার আলোক অনুভব করিতেছি, তখন আমি অমনি ইহা অনুমান করিতেছি যে উল্লিখিত অপর অনুভূতি গুলি ও আমার ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে। 'আম্র দেখিতেছি' কথাটীর সাধারণ অর্থ ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। সেইরূপ যখন আমি বলি আমি একটী বর্ত্তুল দেখিতেছি, তখন তাহার অর্থ এই যে আমি এক প্রকার আলোক অনুভব করিতেছি আর তাহা হইতে এই অনুমান করিতেছি যে ইচ্ছা করিলে স্পর্শ দ্বারা বর্ত্তুলের গোলাকৃতিও অনুভব করিতে পারি; নক্ষত্র দেখিতেছি এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে আমি এক প্রকার আলোক অনুভব করিতেছি আর তাহা হইতে এই অনুমান করিতেছি যে যদি ঐ নক্ষত্র স্পর্শ করিতে পারিতাম তবে উহার আকৃতিও অনুভব করিতে পারিতাম। দর্শন, দৃষ্টি, দেখা, এই সকল কথায় এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে এক প্রকার আলোক জ্ঞান আমাদিগের মনে এক প্রকার আকৃতি জ্ঞান জন্মায়। দৃষ্টি অর্থে স্পর্শ, অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় মনে উদিত হয়। এরূপ হওয়ার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল ব্যুৎপত্তি মাত্র। আমরা বারম্বার দেখি যে দৃষ্টি দ্বারা আলোক জ্ঞান আর স্পর্শ দ্বারা আকৃতি জ্ঞান এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে; বিশেষ বিশেষ প্রকার আকৃতির সহিত বিশেষ বিশেষ প্রকারের আলোক জ্ঞান ঘটিয়া থাকে; গোল বস্তু, চতুষ্কোণ বস্তু, বৃহৎ বস্তু, ক্ষুদ্রবস্তু ইহাদিগের আকৃতি ও আয়তন যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, ইহাদিগের হইতে উৎপন্ন আলোক জ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এই সকল বিষয়ে শৈশবকালে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে আমরা পরে কোন বস্তু দেখিবা মাত্র (অর্থাৎ উহা হইতে আলোক পাইবামাত্র) আমরা উহা স্পর্শ না করিয়াও উহার আকৃতি কি তাহা সহজেই বলিতে পারি। পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে দেখিতেছি শব্দে স্পর্শ করিতেছি অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়াও স্পর্শ জ্ঞান লাভ করিতেছি বুঝায়। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদি কেবল মানসিক

অবস্থা মাত্র। কিন্তু যখন বলি নক্ষত্র দেখিতেছি তখন কেবল আমরা ইহা বলি না যে আমাদিগের মনে কতকগুলি অবস্থা জন্মিতেছে; আমরা সে সঙ্গে ইহাও বলি যে বাহিরে একটী পদার্থ আছে আর তাহা হইতেই ঐ সকল অবস্থা জন্মিতেছে। দর্শন, স্পর্শ আমার মানসিক অবস্থা, আমি না থাকিলে আমার ঐ অবস্থাগুলিও থাকিবে না; অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি না থাকিলে নক্ষত্রটী থাকিবে, আমার সহিত লয় পাইবে না। সুতরাং নক্ষত্রের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব এক নহে; নক্ষত্র একবস্তু আর আমি তাহা হইতে পৃথক্ আর একটী বস্তু। প্রথমতঃ দেখা যাউক এরূপ বিশ্বাসের কারণ কি। আমি আমার, ইত্যাদি শব্দের অর্থ ক্ষমতা। আমার চিন্তা, আমার বাসনা আমার সুখ দুঃখ, আমার কার্য্য এ সব আমার; কারণ আমি দেখিতে পাই যে এক প্রকার অজ্ঞেয় শক্তি দ্বারা আমি ঐ সকল বিষয় আমার শাসনে রাখিতে পারি—আমি এক্ষণে কোন এক ব্যাপারের চিন্তা করিতেছি, ইচ্ছা করিলে সেই ব্যাপারই লইয়া চিন্তা করিতে থাকিতে পারি আবার ইচ্ছা করিলে তাহা মন হইতে দূর করিয়া দিতে পারি। সেইরূপ আমার বাসনা ও সুখ দুঃখও আমার শাসনাধীন, আমি কোন বিষয়ের বাসনা করিতেছি, কিম্বা কোন বিষয় হইতে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিষয় আমি মনে স্থান দিতে পারি, ইচ্ছা করিলে দূর করিয়া দিতে পারি। সেইরূপ আবার আমার কার্য্য; ইচ্ছা করিলে আমি আমার হস্ত পদাদি চালনা করিতে পারি ইচ্ছা করিলে আবার তাহা বন্ধ করিতে পারি। আমি বলিতে একটী বিশেষ ক্ষমতা, একটী বিশেষ শক্তি বুঝায়। সংসারে দেখা যায় কতকগুলি কার্য্য আমার শক্তি দ্বারা সাধিত হইতেছে, আমার ইচ্ছার অধীন; আর অধিকাংশ কার্য্যগুলি আমার শক্তি দ্বারা সাধিত হইতেছে না আমার ইচ্ছার অধীন নহে। যেমন নক্ষত্রের উদয়, অস্ত ও গতি আমার ইচ্ছায় সাধিত হইতেছে না—সুতরাং ঐ ঘটনাগুলি আমার শক্তি হইতে উৎপন্ন নহে; অতএব যে সকল ঘটনার সমষ্টিকে আমি নক্ষত্র বলি তাহা আমার হইতে স্বতন্ত্র এবং আর একটী শক্তির পরিচারক অর্থাৎ নক্ষত্র আর একটী বস্তু। এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে নক্ষত্র একটী স্বতন্ত্র বস্তু। অতঃপর দেখা যাউক নক্ষত্রের বস্তুত্ব বিষয়ে আমি কি অবগত আছি; নক্ষত্রের কতকগুলি গুণ আমি অবগত আছি বটে সত্য, যেমন উহা উজ্জ্বল, উহা দেখিতে ক্ষুদ্র, উহা আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করে অর্থাৎ উহার উদয় অস্ত আছে ইত্যাদি। এই গুণগুলি কি নক্ষত্রের বাস্তবিক গুণ, অর্থাৎ উজ্জ্বলতা ক্ষুদ্রতাদি গুণ নক্ষত্র নামক বস্তুতে বিদ্যমান আছে; না উহা কেবল আমার মানসিক অবস্থা মাত্র। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে এ সকল আমার মানসিক অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; নক্ষত্রের আকৃতি উজ্জ্বলতা প্রভৃতি আমার দৃষ্টি স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি মাত্র ইহা

নহে, উহা আমার মনের মধ্যে অবস্থিত ভাব বিশেষ। কেহ এমন বলিতে পারেন যে ঐ সকল গুণ এক পক্ষে আমার মানসিক অবস্থা, আর একপক্ষে বস্তুনিহিত অবস্থা; অর্থাৎ বস্তুতে যে সকল অবস্থা গুণ ভাবে বিরাজমান, আমার মনে সেই সকল অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুভূতিরূপ ধারণ করিতেছে। অনুভূতি গুণের প্রতিবিম্ব, এইরূপ মত কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ যে কোন গুণই লওনা কেন, দেখিবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইবে। যেমন এক খণ্ড কাষ্ঠ আমার নিকট লঘু বোধ হইতেছে কিন্তু একজন শিশুর নিকট কিম্বা আমারই নিকট অসুস্থ অবস্থায় উহা গুরু বোধ হইতে পারে। কাষ্ঠ খণ্ডের ভার যদি উহার বস্তু নিহিত গুণ ধরা যায়, তবে উহা কোন কোন পক্ষে অধিক আর কোন কোন পক্ষে অল্প হইতে পারে না, কারণ কাষ্ঠ খানি একই রহিয়াছে। সুতরাং যাহাকে আমরা ভার বলি তাহা আমাদিগের মানসিক অবস্থা মাত্র, অতএব মনের উপর উহার মাত্রা নির্ভর করে। কেহ কেহ এমন বলিতে পারেন যে পদার্থের গুণগুলি যদিচ অনুভূতির সহিত এক নহে, যদিচ অনুভূতি গুণের প্রতিবিম্ব নহে—তথাপি এমন বলা যাইতে পারে যে আমি, তুমি, ও সে যেমন এক একটী বস্তু, প্রত্যেক পদার্থও তেমনি একটী বস্তু—আমাদিগের প্রত্যেকের শক্তিতে যেমন কতকগুলি কার্য্য সাধিত হয়, পদার্থদিগের প্রত্যেকের শক্তিতেও সেইরূপ কতকগুলি কার্য্যসাধিত হয় আর ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হইতেছে অনুভূতি। অর্থাৎ পদার্থের শক্তিতে আমার মনে অনুভূতি জন্মে। ইহা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে আমার শক্তি আর পদার্থের শক্তি, আমার মধ্যে যে বস্তু আছে আর পদার্থের মধ্যে যে বস্তু আছে—এ দুইটী এক প্রকৃতির কি না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে আমার অনুভূতি শক্তি আছে, পদার্থের নাই—যেমন আমার গাত্রে কণ্টকবিদ্ধ হইলে আমি কষ্ট অনুভব করি ও নানা প্রকার চিহ্ন দ্বারা সেই কষ্ট প্রকাশ করি, তুমিও ঐরূপ অবস্থায় ঐরূপ প্রকাশ কর অতএব তোমারও অনুভূতি শক্তি আছে, কিন্তু পদার্থে তাহা করে না অতএব পদার্থের অনুভূতি শক্তি নাই। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলেন যে আমি তুমি একপ্রকারের বস্তু অর্থাৎ আমাদিগের আত্মা আছে আর পদার্থ আর প্রকারের বস্তু, তাহার আত্মা নাই; তাঁহাদিগের মতে আত্মা ও পদার্থ দুইটী ভিন্ন বস্তু। ইহা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই বিষয়টীর বিশেষ মীমাংসা করা আবশ্যক। বিষয়টী এই—আমার শরীর পদার্থ, আমার মন আত্মা—দুইটী ভিন্ন বস্তু; অথচ দেখি এ দুই আমাতে একপ্রকার অভিন্ন ভাবে বিদ্যমান আছে, আমার শরীরে যাহা ঘটে আত্মায় তাহা প্রতিফলিত হইয়া অনুভূত হয় আর আত্মায় যাহা ঘটে তাহা শরীরে প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায় … ইহা

ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে কি প্রকারে এইরূপ অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য সম্ভবে? ইহার সদুত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। যদি আবার বল যে আত্মা পদার্থেরই প্রকার ভেদ মাত্র, তাহা হইলে এই সমস্যা উপস্থিত হয়; আত্মা পদার্থজাত হইলে আত্মার অনুভূতি শক্তি কি প্রকারে জন্মে। পদার্থের অনুভূতি না থাকিলে পদার্থজাত আত্মায় অনুভূতি কি করিয়া সম্ভব পর হয়? আবার তৃতীয় পক্ষে যদি বল যে পদার্থ আত্মার প্রকারভেদ মাত্র; এক একটী পদার্থ এক একটী সুষুপ্ত আত্মা। সুষুপ্তিকালে যেমন তোমার আমার একরূপ চেতনার অভাব হয়, পদার্থেও আত্মার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, পদার্থ এক প্রকার আত্মা তবে উহার চেতনা শক্তি এক-প্রকার রহিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলেও অনেকগুলি জটীল প্রশ্ন দেখা দেয়। একটী এই—কেনই বা তোমাতে আমাতে আত্মা জাগ্রত, আর কেনই বা পদার্থে সুষুপ্ত? আবার এই মত অনুসারে দেহ আত্মার বিকাশ ধরিতে হইবে, যাহা এক পক্ষে আত্মা তাহা অপর পক্ষে দেহ—এরূপ হইলে মৃত্যুর পর তোমার আত্মা তোমার দেহে অচেতন অবস্থায় থাকে স্বীকার করিতে হয়। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নহে, উহা ঈশ্বরের চিন্তামাত্র আর সেই চিন্তা যখন আমাদিগের মনে প্রতিফলিত হয় তখন আমরা মনে করি যে আমরা বাহিরে পদার্থ দেখিতেছি। এইরূপ মতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে—প্রথম এই যে ইহা বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বরের চিন্তাগুলি কি করিয়া আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইতে পারে? দ্বিতীয় এই যে আমি তুমি যদি চিন্তামাত্র না হই, প্রকৃত বস্তু হই—তবে পদার্থেরই বা এত কি অপরাধ যে সে চিন্তামাত্র, প্রকৃত বস্তু নহে। ফলতঃ আমি তুমি গো অশ্ব মেষ ইহারা যদি সকলেই প্রকৃত বস্তু হয়, ইহাদিগের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে—তবে তরু লতা গুল্ম পর্ব্বতাদিরও বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে—বলিতে হইবে; ইহা অস্বীকার করা ন্যায় যুক্ত নহে।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে পদার্থ বাস্তবিক কি তাহা বলা কঠিন, কোন কালে যে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইবে তাহাও আশা করা একরূপ দুরাশা মাত্র। যাহা হউক পদার্থ কি তাহা জানিতে না পারিলে আমাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি নাই; পদার্থের গুণ কি কি অর্থাৎ পদার্থ দ্বারা আমাদিগের মনে কি কি অনুভূতি জন্মে আর কোন্ কোন্ নিয়মানুসারে ঐ সকল অনুভূতি সংঘটিত হয় তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। যেমন আমরা জানি যে যাহাকে আমরা বৃক্ষ বলি তাহার কতক-গুলি বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, তাহার পত্র পুষ্প ফল আছে আর কি কি নিয়ম অনুসারে বৃক্ষের জন্ম, বৃদ্ধি, ও ক্ষয় সাধিত হয় ইহাও আমরা অনেকাংশে জ্ঞাত আছি এবং শ্রমস্বীকার করিলে আরও জ্ঞাত হইতে পারিব। ফলতঃ যাহাকে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলি তাহা পদার্থদিগের গুণাগুণের বিচার ভিন্ন অন্য

কিছুই নহে। পদার্থের প্রকৃত অস্তিত্ব অবগত হইতে না পারিলেও বিজ্ঞান সম্ভবপর, কারণ বিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে পদার্থজাত অনুভূতি সমূহ লইয়াই ব্যাপৃত। এই সকল অনুভূতি কোনরূপ অশৃঙ্খল ভাবে দেখা দেয় না, পরন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে যেমন কিছু দূরে কেহ বন্দুক ছুড়িলে আমি এখানে বসিয়া প্রথমে বন্দুক হইতে নির্গত অগ্নির শিখা এবং পরে উহা হইতে নির্গত শব্দ অনুভব করিব। প্রথমে শিখা, পরে শব্দ এই নিয়মের সকল সময়ই রক্ষা হয়, কখনও উহার বিপরীত দেখি না—এই নিমিত্ত আমি এই নিয়ম অনুমান করি যে দূরত্ব একই হইলে আলোক অপেক্ষাকৃত অল্প আর শব্দ অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ে তাহা অতিক্রম করিবে অর্থাৎ আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুত। এইরূপে দেখা যায় যে যাহাকে আমরা একপক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনা বলি আর যাহা অপর পক্ষে অনুভূতি মাত্র তাহা নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়মের বশবর্ত্তী এইরূপ বিশ্বাসের অন্য কোন কারণ নাই—কেবল এই একমাত্র কারণ যে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা বরাবর ঐরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী দেখিয়া আসিয়াছি, আর আমরা সেই নিমিত্ত ইহা মনে করি যে ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবে। অতঃপর আমরা ইহা বলিতে পারি যে আমাদিগের নিকট বিশ্ব সংসার কতকগুলি অনুভূতির রাশি মাত্র; এই অনুভূতি রাশির মধ্যে এক একটী অনুভূতি সমষ্টিকে আমরা এক একটী পদার্থ বলি; অনুভূতিগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে ঘটে না অপিচ একের সহিত এক, কিম্বা একের পর এক এইরূপ কোন বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। এই সকল নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে আমাদিগের কার্য্যাবলী চালিত করিতে পারিলে আমাদিগের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে আর তাহা না পারিলেই সংসারে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই সংসারে জ্ঞানী সেই যে প্রকৃতির গতিবিধি সম্যক্ প্রকারে অবগত আছে; আর এ সংসারে সুখী সেই যে এই জ্ঞানের আলোকে স্বকীয় গন্তব্যপথ নির্দ্ধারিত করিয়া লয়। অতএব বর্ত্তমান কালে আমাদিগের দেশে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি সাধারণের যে অবহেলা দেখা যায় তাহা নিতান্ত দোষাবহ বলিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ এই দুইটী শাস্ত্র উপযুক্ত রূপে আলোচনা করিতে না শিখে তত দিন পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয় না, ততদিন পর্য্যন্ত সে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য নামের অধিকারী হয় না। মানুষ যখন প্রকৃতির গুণ সমূহ অবগত হয়, তখনই কেবল সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে পারে—নচেৎ প্রকৃতি তাহার উপর আধিপত্য করিবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এতক্ষণের পর তবে আমরা বেদান্তদর্শনের স্বক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু যিনিই যাহা বলুন—এখনো আমরা কাণ্টকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না; আমরা দেখিতেছি যে, কাণ্টের দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-পথের যেমন স্পষ্ট ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এমন আর কোথাও নহে; কাণ্টের দর্শনের মধ্য-হইতে সংশয়ের ইতস্তত-গুলা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার মন্থন করিয়া লইলে তাহাই বেদান্ত হইয়া দাঁড়ায়। কাণ্ট্ একজন কলম্বস্-বিশেষ; তিনি বেদান্তের আমেরিকায় ঠিকঠাক উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে, তিনি প্রাণান্তেও ডাঙায় নাবিলেন না; তিনি ডাঙায় নাবিলেই কে যেন তাঁহার জাহাজ কাড়িয়া লইবে! আমরা তাঁহারই জাহাজের কয়েকজন যাত্রী—কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার স্থায় জাহাজের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া দম আটকিয়া মারা যাইতে সম্মত নহি; আমরা কূলে অবতরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। কাণ্ট বলিতেছেন "খবরদার কূলে নাবিও না—মারা যাইবে।" আমরা দেখিতেছি যে, মারা যদি যাইতেই হয়—তবে জাহাজের বন্ধ বায়ুতে মারা যাওয়া অপেক্ষা কূলের মুক্ত বায়ুতে মারা যাওয়া পরম শ্রেয়।

যাহাই হৌক্—বেদান্ত পথের অব্যর্থ সন্ধান কাণ্ট যেমন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। কাণ্ট প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মূলে এই তিনটি অকাট্য মূলতত্ত্ব ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হয়—(১) সমস্ত গুণ-পরিবর্ত্তনের মধ্যে বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়, (২) পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ অবশ্যম্ভাবী, (৩) যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া; তাহার পরে কাণ্ট ঐ তিনটি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরেই পারমার্থিক সত্যের তিনটি সুড়ঙ্গ পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিরূপে পাইলেন—তাঁহার অন্বেষণ পদ্ধতি কি রূপ? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তিনটি মূল-তত্ত্বের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিজ্ঞান-রাজ্যে এক রূপ—পরমার্থ-রাজ্যে আর-একরূপ, যথা;—বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূলতত্ত্বকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত—অবিদ্যার সহিত—মিশ্রিত করা, খাঁটি সুবর্ণকে তাম্রের সহিত মিশ্রিত করা, ইহাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম অন্বয়-পদ্ধতি (অর্থাৎ সংযোগ-পদ্ধতি)—ইউরোপীয় ভাষায় method of synthesis; আর, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা-অংশ বর্জ্জিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশটি ছাঁকিয়া লওয়া, সোণার মোহর হইতে তাঁবা বাদ দিয়া খাঁটি সোণা বাহির করিয়া লওয়া, ইহাই পারমার্থিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি বা বিবেক-পদ্ধতি—ইউরোপীয় ভাষায় method of analysis। কাণ্ট অন্বয়-পদ্ধতিটিরই—সবি-

শেষ রসজ্ঞ ; বিবেক-পদ্ধতিটি বড় একটা তাঁহার মনঃপূত নহে। কাণ্টের মনোগত ভাব এই যে, খাঁটি সুবর্ণ তো আছেই—বাড়া'র ভাগ তাহার সঙ্গে যদি তাম্র মিশ্রিত থাকে, তবে সে তো একটা উপরিলাভ—তাহা ছাড়ি কেন ? এই ভাবিয়া তিনি পারমার্থিক রাজ্যেও অন্বয়-পদ্ধতি খাটাইতে নিতান্তই ইচ্ছুক,—যখন দেখিলেন যে, তাহা কোন ক্রমেই হইবার নহে—তখন তিনি পারমার্থিক সত্যের অনুশীলনে বিশেষ কোন লভ্য দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞানের উপদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন—ও সেইখানেই রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। আমাদের দেশের দর্শন-কারদিগের মনের ভাব আর একরূপ ; তাহা এই যে, চিনির সঙ্গে বালি মিশাইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যা মিশাইলে—তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লভ্য কিছুই নাই ; কেননা, এক তো বালির নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে আবার তাহা চিনির মূল্য কমাইয়া দেয় ; অতএব চিনিকে বালি হইতে পৃথক্ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণের সময় আমাদের দেশের দর্শনকারেরা আহ্লাদের সহিত বিবেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন ; কাণ্ট অগত্যা তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; এই জন্যই পারমার্থিক সত্যের প্রতি কাণ্টের এত অনাস্থা। কিন্তু আপাতত আমরা কাণ্টের অনাস্থা দ্বৈধ এবং সংশয়—এ সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিব না—তাঁহার মূল কথাটিতেই কেবল আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

আমরা দেখিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুশীলন কালেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক এই দুইটি পদ্ধতি দুইটি বিভিন্ন স্থলে—একটি একরূপ স্থলে এবং আর-একটি আর এক রূপ স্থলে—অবলম্বনীয় ; যথা ;—যখন আমি অশ্বের সাধারণ তত্ত্ব-গুলির পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি বিশেষ বিশেষ জাতীয় অশ্বের (যেমন আরব অশ্বের, বর্মা অশ্বের, তাতার অশ্বের) বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-গুলি বর্জ্জন করিয়া, অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণ-গুলিই গ্রহণ করি ; ইহারই নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমি আরব অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরব-অশ্বের বিশেষ লক্ষণ-গুলি সংযুক্ত করিয়া আরব অশ্বের বিশেষত্ব অবধারণ করি ; ইহারই নাম অন্বয় পদ্ধতি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একরূপ স্থলে আমরা ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করি—আর-একরূপ স্থলে অন্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করি। বৈজ্ঞানিক সত্যের বেলায় তো এইরূপ—কিন্তু পারমার্থিক সত্যের বেলায় উভয়-পদ্ধতিই যুগপৎ (অর্থাৎ এক সঙ্গে) অবলম্বনীয়, যথা ;—ব্যতিরেক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান হইতে অজ্ঞানকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া যখনই আমরা ধ্যানে পাই যে, পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ; তখনই অন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে সেই জ্ঞানকে সমস্ত জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রাপ্ত হই যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ করিয়াই আমরা পাই যে, পরমাত্মা অণু হইতেও অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ ; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণে গুণী ; তিনি

নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বাধ্যক্ষ, ইত্যাদি। পদ্ধতি ও-দুটি এমনি একাত্মা যে, পারমার্থিক সত্যের অনুসন্ধান-কালে কাণ্ট্ অন্বয় পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেক-পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে অন্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন;—কেননা, পারমার্থিক রাজ্যে ও-দুইটি পদ্ধতি যমক সহোদর—এ পিট ওপিট। পারমার্থিক অনুসন্ধান পদ্ধতির আর-একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, এখানে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়েরই ঐকান্তিক পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অল্প কিছুতেই চলিতে পারে না;—ব্যতিরেক-পদ্ধতিরও যেমন পরাকাষ্ঠা, অন্বয় পদ্ধতিরও তেমনি পরাকাষ্ঠা; অণুর বেলায় অণু হইতে অণুতম—মহতের বেলায় মহৎ হইতে মহত্তম। এইরূপ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক বিশুদ্ধ জ্ঞানের একটি স্বহস্তের কার্য্য, এজন্য তাহার উপরে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। কেননা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রমাণ বিশুদ্ধ জ্ঞান নিজেই—তা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রমাণ সম্ভবে না; তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে যা'ন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা করেন আর কিছু নয়—যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যা'ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্বাসঃপ্রশ্বাস বলিলেই হয়। কাণ্ট্ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বস্তু গুণের মূলতত্ত্ব শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, আত্মা নির্গুণ বস্তু-স্বরূপ অথচ সমস্ত মানসিক গুণের আধার; কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, ঈশ্বর কালাতীত স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ অথচ সমস্ত জগতের আদি-কারণ; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে পরমাত্মা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ময় সর্ব্বজগতেরই মূলাধার অথচ প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই অনুপ্রবিষ্ট।

এই তো গেল পথের বৃত্তান্ত—তা ছাড়া, পথের কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া কোন স্থানে পৌঁছিতে হইবে, কাণ্ট্ তাহারও একটি ধারাবাহিক ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা,—

"There is in the progression from our knowledge of ourselves (the soul) to a knowledge of the world and through it to a knowledge of the supreme being, something so natural that it looks like the logical progression of reason from premisses to a conclusion. ইহার অর্থ;—আত্মজ্ঞান হইতে বিশ্বজ্ঞানে এবং বিশ্ব-জ্ঞান হইতে পরমাত্ম জ্ঞানে উপসংক্রমণের যে একটি পদ্ধতি, তাহা এ মনি

স্বাভাবিক যে, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন—ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি-পদ্ধতিটি অধিকরণ (Major Premise) হইতে সাধনের (Minor Premise) ধাপে এবং সাধন হইতে সিদ্ধির ধাপে ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইতেছে।

কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্ট্ সংশয়ের ধূলি উড়াইয়া তাঁহার ঐ পথের আদ্যোপান্ত সমস্তই তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—সেই ধূলি-রাশি অপসারিত করিয়া অনেক কষ্টে তবে আমরা পথটির অন্ধি-সন্ধি পাইয়াছি,—যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা যত পারি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কাণ্টের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে বস্তু-গুণ, তাহার পরে কার্য্য-কারণ, তাহার পরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—এই তিনটি তত্ত্ব উত্তরোত্তর ক্রমে অবলম্বন করিয়া আমরা আত্ম-তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্বে এবং প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হই, যথা;—মনে কর প্রথমে আমরা পৃথিবীকে একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করিলাম; ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে, পৃথিবী আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা সূর্য্য হইতে উদ্ভূত এবং সূর্য্যের আকর্ষণে বিধৃত; অতএব গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য সমস্ত ধরিয়া তবেই তাহা একটি সমগ্র বস্তু; পৃথিবী কেবল তাহার একটি অঙ্গ—এই পর্য্যন্ত; তা' ভিন্ন—সমগ্র বস্তুর ভাব পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সমগ্র বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে—তাহার মতো একটি সর্ব্বাঙ্গীন বস্তু আমরা প্রকৃতিরাজ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাই না; যাহাকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরি—তাহারই নিকটে শুনি যে, "আমার বস্তু আমাতে নাই—আমি আমাতে নাই;" পৃথিবী বলে যে, আমার বস্তু সূর্য্যে রহিয়াছে, সূর্য্য আবার আর এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়;—পেয়াদার নিকটে যাই—সে পেস্কারকে দেখাইয়া দেয়; পেস্কারের নিকটে যাই সে নায়েবকে দেখাইয়া দেয়,—নায়েবের নিকটে যাই সে জমিদারকে দেখাইয়া দেয়—ক্রমাগতই এইরূপ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে জিজ্ঞাসার চালান হইতে থাকে, কোথাও আর কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ইহাতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে সমগ্র বস্তুর একটি ভাব আমাদের আত্মাতে আছে বটে কিন্তু তাহা ভাবমাত্র—সে ভাবের অনুরূপ একটিও বস্তু প্রকৃতি-রাজ্যের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে, তাহা অবশ্য বস্তুর সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা করে; এই জন্য প্রকৃত বস্তুকে কোথাও দেখিতে না পাইলেও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। বেদান্ত দর্শনের মতে এটা এক প্রকার পুত্তলিকার বিবাহ দেওয়া; পুত্তলিকার বিবাহ যেমন মিথ্যা বিবাহ—যাহাকে আমরা সচরাচর বস্তু বলিয়া অবধারণ করি তাহাও সেইরূপ মিথ্যা বস্তু। সত্য বস্তু তবে কি? আপাততঃ পৃথিবীকেই সমগ্র একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করা যা'ক্; এখন, এই পৃথিবীর সঙ্গে

একটি রেণু-কণা বিকম্পিত হয়—তবে সেই সূত্রে সমস্ত জগৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকম্পিত হইবেই হইবে। সমস্ত জগতের সহিত পৃথিবীর এই যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইহা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই চলিতেছে; এই জন্য এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিকে যদি জ্ঞানের মুষ্টি-মধ্যে ধরিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সমস্ত জগৎকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ও সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে একই পরম বস্তুর উপলব্ধি হয়; তাহা হইলে যে বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই বস্তু আমাদের হস্তগত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অন্তরে বস্তুর ভাব যাহা বিদ্যমান আছে—সমস্ত জগতের মূলাধারকে প্রাপ্ত হইলে তবেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে; আর, তাহা হইলেই পাওয়া যায় যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার—পরব্রহ্ম, তিনিই জগতের মূল-কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই আত্মার অন্তরাত্মা—পরমাত্মা। এখানকার প্রকৃত মর্ম্ম-কথাটি এই;—প্রথমে বস্তু-জিজ্ঞাসা; কাণ্ট্ বলেন যে, বস্তুর ভাব-একটি আমাদের আছে বটে কিন্তু তাহা বস্তুর জ্ঞান নহে; "বস্তুর ভাব" না বলিয়া যদি "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলা যায়, তাহা হইলে কাণ্টের ঐ কথাটি সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; কেননা, "বস্তু জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে বস্তুর ভাব একটি আছে কিন্তু বস্তু জ্ঞান এখনো হয় নাই; কেননা এক দিকে যেমন বস্তুর ভাব না থাকিলে বস্তু-জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না, আর-এক দিকে তেমনি বস্তু জ্ঞানের অভাব না থাকিলেও বস্তু-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ হইতে পারে না; অতএব কাণ্টের এই যে একটি কথা—যে, বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব, ইহার ল্যাজা মুড়া একত্র করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা আর কিছু নয়—বস্তু-জিজ্ঞাসা। "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলিবামাত্রই জিজ্ঞাসুর অস্তিত্ব—জীবাত্মার অস্তিত্ব—প্রতিপন্ন হয়; অতএব বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব যাহা আমাদের আছে, তাহাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পরে বস্তু-ভ্রম; যেমন, প্রথমে পৃথিবীকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—পৃথিবী সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়;—সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়; ইত্যাদি;—এইরূপ বিফল পরিভ্রমণকেই ভ্রম বলে—ভ্রান্তি বলে; ইহাতেই কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ, তস্য কারণ, এইরূপ কার্য্য-কারণময় প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরে বস্তু-জ্ঞান; ইহাতে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সেই সূত্রে সমস্ত জগতের ঐক্য-বন্ধন প্রতীয়মান হয়; আর, তাহাতেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সর্ব্বজগতের মূলাধারকে পাইয়া আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু ভাবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। এইরূপে, এক-দিকে আমরা বস্তুর ভাব হইতে কার্য্যকারণময় নানা বস্তুতে এবং নানা বস্তু হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সমস্ত জগতে এবং সেই সূত্রে সর্ব্ব-মূলাধার পরম পুরুষে উপনীত হই; আর-এক দিকে বস্তু-জিজ্ঞাসা হইতে বস্তু-ভ্রমে এবং বস্তু-ভ্রম হইতে বস্তু জ্ঞানে

উপনীত হই; জীবাত্মা হইতে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি হইতে পরমাত্মাতে উপনীত হই।

কাণ্টের পথ অনুসরণ করিয়া চরমে আমরা এইরূপ পাইতেছি যে, সত্য জিজ্ঞাসা—জীবাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক; এবং সত্যজ্ঞান পরমাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক। আরো এই যে, সত্য জিজ্ঞাসার আড়ালে সত্যজ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে এবং লুকাইয়া থাকিয়া সত্য জিজ্ঞাসাকে উস্কাইয়া দিতেছে। সত্য-জিজ্ঞাসা একটি হরিণ; তাহার নাভিতেই কস্তূরি (সত্য-জ্ঞান) রহিয়াছে; হরিণটি সেই কস্তূরির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বনময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ভ্রমারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যখন কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে—তখন সত্যজ্ঞান তাহার তৃষিত নয়নে আবির্ভূত হয়; মেদিনী গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হইলে, তবেই বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহার সমস্ত তাপ দূর করিয়া দেয়। কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থ ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—কাণ্টের দর্শনের গোড়ার কথাটিতেই বেদান্তের এই তত্ত্বটি বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, সর্ব্ব-মূলাধার পরমাত্মাই পরাকাষ্ঠা পারমার্থিক সত্য, অথচ—কাণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই; এই জন্য তাঁহার গ্রন্থের শেষ-ভাগে যখন তিনি ঐ তত্ত্বটিকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তাহার মূল খুঁজিয়া না পাইয়া বিষম এক ধন্দচক্রে নিপতিত হইলেন,—তাঁহার নাভিতেই যে কস্তূরি রহিয়াছে ইহা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তামিল নীতি।

সচরাচর আমরা মানিয়া লই যে ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পূর্ব্বে আর্য্যজাতির অন্য কোন শাখার ভারতবর্ষে অভ্যুদয় হয় নাই। সাধারণতঃ আর্য্যাবর্ত্ত ও বঙ্গ বাসীরা দ্রাবীড়ীয় তামিল উপজাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পুরাবৃত্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এমন কি এ বিষয়ক অনভিজ্ঞতাও তাঁহাদের কখনো মনে আসে কি না সন্দেহ। কিন্তু য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞদিগের অনুসন্ধান দ্বারা দেখা যায় যে তামিল উপজাতি বন্য ও পাহাড়িয়া অনার্য্য বংশ সম্ভূত নহে, পক্ষান্তরে বৈদিক আর্য্যদিগের সহিতও উহা-
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না। যদিও তামিল ভাষায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ দেখা

যায়, তথাপি তামিল ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ হইতে এতদূর ভিন্ন যে সংস্কৃত ভাষা তামিলের মাতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে পারে না। অথচ অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনায় তামিলের সংস্কৃত নৈকট্য পরিস্ফুট হয়। এইরূপ নানা কারণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে তামিল উপজাতি আর্য্যবংশোৎপন্ন। ভাষা সমন্বয় দ্বারা আরো দেখা যায় যে চীনসাগরের বক্ষে ভাসমান দ্বীপ পুঞ্জে ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে তামিল-দিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এদিকে ইহাও নিশ্চিৎ যে প্রাচীন বৈদিক আর্য্যগণ বিন্ধ্য-গিরির উত্তর দেশে বহুকাল অবস্থিতির পর দক্ষিণাভিমুখে বিস্তার লাভ করেন। স্মৃতরাং ইহা এক প্রকার স্থির যে আর্য্যজাতির তামিল শাখা বৈদিক আর্য্য জাতির পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হয়।

তামিলদিগের কিম্বদন্তী হইতে প্রকাশ পায় যে অগস্ত্য ঋষি তামিল ভাষার প্রণেতা। প্রবাদ আছে যে তামিল ভাষা পরম সুন্দরী কুমারী বেশে ব্রহ্মার যজ্ঞ কুণ্ড হইতে উৎপন্ন। অগস্ত্য ঋষি সম্বন্ধীয় পুরাণ কথা অনুসন্ধান করিলে তামিলদিগের আদি তত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইবে। অগস্ত্য ঋগ্বেদের কএকটি মন্ত্রের ঋষি এবং কথিত আছে যে অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, জনক, মিত্র বরুণের অযোনিসম্ভব পুত্র। সায়ণাচার্য্য বলেন যে অগস্ত্য কলসী হইতে উৎপন্ন এবং অতি তেজস্বী মৎস্য বেশে তাঁহার জন্ম হয়। কুম্ভ ও মীন রাশির সন্ধিস্থলে কুম্ভরাশ পালিত দেশে অগস্ত্যের জন্ম প্রভৃতি যে সকল রহস্য কথা এস্থলে আবৃত রহিয়াছে, তাহার আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা বক্তব্য যে অগস্ত্য বশিষ্টের ভ্রাতা হইয়াও যখন প্রজাপতির মধ্যে গণ্য হন নাই তখন উহাঁর বশিষ্টের সহিত সমকালিকত্ব স্বীকার করা যায় না। অপরন্তু ঋগ্বেদের সংগ্রহ দ্বাপর যুগে বেদব্যাসকৃত, সুতরাং অগস্ত্য ঋগ্বেদোক্ত ঋষি বলিয়াই যে বৈদিক আর্য্য বংশোদ্ভব তাহার কোন কারণ নাই। পুরাণ মতে অগস্ত্য পুলস্ত ঋষির সন্তান। পুলস্ত রাক্ষস বংশের আদি পুরুষ। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে তামিলগণ বৈদিক আর্য্যদিগের সহিত একতরুর শাখা মাত্র; বৈদিক শাখার প্রশাখা নহে। মালাবার প্রদেশে প্রচলিত আচারের মূল অনুসন্ধান করিলে এবিষয়ক অনেক তত্ত্ব পাওয়া যাইবেক। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রের মধ্যে কেবল একখানি পুরাণ অগস্ত্যের নাম বহন করে। উহা ব্রহ্ম পুরাণ। এই আরোপের মূল কথা বোধ হয় এই যে অগস্ত্য রচিত তামিল শাস্ত্র সমূহের অন্যতমকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পুরাণ রচিত। সে যাহা হউক তামিল সাহিত্য অনুসন্ধানে জানা যায় যে অগস্ত্য প্রণীত বহুসংখ্যক শাস্ত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এমন কোন বিদ্যাই নাই যে বিষয়ে অগস্ত্যকৃত গ্রন্থের অভাব। এই সকল গ্রন্থের এক প্রধান অঙ্গ কল্প শাস্ত্র। ইহাতে যাবতীয় উদ্ভিদের গুণ ব্যাখাত আছে। অন্য পক্ষে সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে অগস্ত্য রচিত বৈদ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থও দেখা যায়। ইহাতে তামিল গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার অনুমান দৃঢ়ীকৃত হয়।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় প্রচলিত ভাষার মধ্যে তামিল ভাষাতেই স্বাধীন সাহিত্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এমন কি তামিল ভিন্ন অন্য ভাষার সাহিত্য হইতে সংস্কৃত ও ইং-রাজি পারসী আশ্রিত গ্রন্থ সকল বাছিয়া লইলে সাহিত্য বলিয়া একটা কিছু দাঁড়ায় কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষাও পার পায় না। যাহা হউক সমগ্র তামিল সাহিত্য সমালোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বঙ্গীয়দিগের তামিল শিক্ষা যে পণ্ডশ্রম নহে, ইহা বলিলেই এস্থানে যথেষ্ট হইবে। তামিল ভাষায় যে সুনীতি উৎ-পাদক গ্রন্থ দেখা যায়, এরূপ ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় নাই। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। সংস্কৃত নীতি গ্রন্থ যাহা সাধারণতঃ প্রচারিত তাহা দুইটি দোষে দুষ্ট। প্রথমতঃ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অতিবিস্তৃত ও ভগবদ্গীতাদি অতি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ বুদ্ধির অনুপযোগী। তিরু বল্লুবর প্রণীত কুরল ও ঔবৈয়ার প্রণীত নীতিসার এতদুভয় দোষ বর্জ্জিত। * ইহাদিগের সম্বন্ধীয় প্রবাদাদি বর্ণনার পূর্ব্বে পাঠকের প্রতি নিবেদন এই যে উপরি উক্ত নাম দ্বয়ে বর্ত্তমান ব অক্ষর অন্তস্থ্য ব, বর্গীয় ব নহে। এবং তিরু শব্দের অর্থ নামের পূর্ব্বস্থ শ্রী।

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও বঙ্গবাসীর নিকট তিরু বল্লুবর ও ঔবৈয়র উভয়েই অপরিজ্ঞাত. য়ুরোপীয় গ্রন্থে ইহাদিগের প্রশংসার সহিত উল্লেখ দেখা যায়। The *kural* of tiru vallavar ··· ··· ··· ··· the songs of his sister Auvaiyar, those gerins of ancient Tamil literature বার্থ প্রণীত হিন্দুধর্ম্ম পৃঃ ১৯২। The *kural* of tiru vallavar, that admirable collection of stanzas in the tamil language, which is instinct with the purest and the most elevated religious emotion, and the authority of which the Brahmons accept without reservation is the work of a Pareiya—উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫৭। Caldwell (A comparative Grammar of the Dravidian Language Introduc. p 131. 2nd ed). বলেন যে পারিয়া-দিগের পূজারিগণের সাধারণ নাম বল্লুবর। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, যদিও বল্লুবর শব্দের অর্থ জীবন্মুক্ত—বন্ধু প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ব্যাস উপাধি প্রচলিত আছে। ডোম জাতীয় ধর্ম্মের পূজারি পণ্ডিত নামে আখ্যাত। আসল কথাটা এই যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের মন্দিরস্থ দেব পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং পূজারিগণ পদমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের সম্মানিত উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। এ স্থানে বলা যাইতে পারে যে বল্লু-বরের কুরল ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদ-গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

C. Graul, Bibliotheca Tamulica, Vol iii. Der Kural des Tiru Valluver eiu gromisches gedicht uber dei drei strebeziele des Mensehen, 1856. G. da Du Mast. Maximes des courals de tirout vallouvar, or the moral doctrines of the Pariar. 1854.

তামিল পুরাণ কথা অনুসারে একদা পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "নাথ, পৃথিবীতে কি এমন কেহ আছেন যিনি গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া পরাগতি মুক্তি পাইয়াছেন ?" মহাদেব উত্তর করেন, "প্রিয়ে দেবলোকে উক্তরূপ ব্যক্তি পঞ্চজন— বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অজ, ভুজঙ্গ ও সম্ভুব, কিন্তু ধরাতলে কেবল একমাত্র বল্লুবর। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বল্লুবর কে ?" তাহাতে শিব নিম্ন লিখিত পুরাণ কথা প্রকাশ করিলেন।

বহু মন্বন্তর পূর্ব্বে একদা প্রলয় কাল উপস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মা এক বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুষ্মাণ্ড প্রলয় জলে ভাসিতে লাগিল। অজ্ঞতা ভান করিয়া আমি (শিব) জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে ?" কুষ্মাণ্ড উত্তর করিল "আমি বল্লুবর, আমি ভবিষ্যৎ বিষয় সকল জানি এবং সেই অনুসারে সকল কার্য্য করি।" আমাকে চিনিতে পারিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "প্রভো, প্রলয়ের শেষ করুন।" তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে প্রলয়-নাশের ক্ষমতা দিলাম। প্রলয় অন্তে বহু যুগ যুগান্তর গত হইলে পর দেখিলাম যে মাতুরার পাণ্ড্য রাজার কবি সঙ্গ* অহংকারে মত্ত হইয়া দেশে ধর্ম্ম লোপ করিতেছে। তাহাদের দর্পচূর্ণ করিয়া সুনীতি স্থাপনের নিমিত্ত আমার আজ্ঞায় ব্রহ্মা সরস্বতী ও বিষ্ণু, বল্লুবর, ঔবৈয়ার ও ইদক্কতার এই তিনরূপে পারিয়া বংশে অবতীর্ণ হন। এখন বল্লুবরের বংশাবলী কহিতেছি শ্রবণ কর।

"ব্রহ্মার নয় পুত্রের মধ্যে কশ্যপ একজন। কশ্যপ উর্ব্বশীকে বিবাহ করেন। তাহার পুত্র বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ অরুন্ধতিকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র সত্য। সত্য পুঙ্গানুর গ্রামে নীচ কুলজাত এক কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র পরাশর। পরাশরের ঔরষে মৎস্যগন্ধার গর্ব্ভে ব্যাসের উদয় হয়। এই চারি জন বেদ পুরুষ।

"উত্তর দেশে সংস্কৃত ও দক্ষিণে তামিল এই দুই ভাষা সৃষ্টি কামনায় ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের কুম্ভ হইতে সরস্বতী বাহির হইলেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। তাহার পর সেই কুম্ভ হইতে অতি ক্ষুদ্রকায় অগস্ত্যের জন্ম হয়। সমুদ্রবালা সমুদ্র কন্যিকা অগস্ত্যের পত্নী। তাহার গর্ভে সাগরের জন্ম হয়। সাগর অত্যন্ত নীচ জাতি সম্ভূত পত্নীর পাণি গ্রহণ করিয়া ভগবান নামে এক পুত্র লাভ করেন। ভগবান অল্প বয়সেই বেদাদি অধ্যয়নে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

"তৎকালে তপোমণি নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে আদি নামে একটি কন্যা জন্মে।

---

* য়ুরোপীয়দিগের মতে খৃষ্টের কএক শতাব্দি পূর্ব্বে পাণ্ড্যরাজ্য স্থাপিত হয় এবং কএক শতাব্দি পর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে। কাইজর অগষ্টসের সভায় একজন পাণ্ড্য রাজা দূত প্রেরণ করেন। রোমকদিগের নিকট ইহাঁরা Pandion নামে খ্যাত। কবি সঙ্গ একরূপ Academie Francaise। ইহার বিবরণ পরে প্রকাশ্য।

তপোমণি ও তাঁহার বনিতা কৃপাকনিয়্কা শিশু আদিকে ঘরে রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত নিজ গ্রাম হইতে বিরালি † পাহাড়ে প্রস্থান করেন। পিতৃ মাতৃহীন শিশু আদির রোদনে আকৃষ্ট হইয়া একজন পারাইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া প্রতিপালন করে। কাল ক্রমে আদি সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান বিদ্যায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

এক দিন আদি ভগবানকে পথি মধ্যে দেখিয়া তাহার সহিত পরিণয় প্রার্থনা করিল। ভগবান ধার্ম্মিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিরূপে পারাইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন? অথচ ভক্তি ভাবে সমাগত রমণীকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন না। সুতরাং আদিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন যে "যদি তুমি এক সত্য করিতে পার তাহা হইলেই আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" "আদি উত্তর করিল, "প্রভু আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" ভগবান বলিলেন "তুমি অঙ্গীকার কর যে তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইবে।" ভগবান ভাবিলেন যে এই উপলক্ষ করিয়া তিনি পারাইয়া কন্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, কিন্তু আদি তথাস্তু বলিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

'ভগবান বিবাহের পর পত্নীকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে বন মধ্যে আদি এক কন্যা প্রসব করিল। এই কন্যা ঔবৈয়ার নামে খ্যাত। আদির হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক দিকে স্বামীর নিকট কৃত অঙ্গীকার—অন্য দিকে অপত্য স্নেহ। আদি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মায়ের হৃদয় ব্যথা দেখিয়া সদ্যোজাত শিশু বলিল—

"হ'ক ইহা এইরূপ' অব্যর্থ বচন—
বলিয়া বিধান যিনি করেন ভুবন॥
মরণ কি সেই শিবে করিয়াছে জয়।
রে অবোধ মন ছাড় তোর মিছে ভয়॥
যদিও নিরন্নময় চারি দিক ঘোর।
তথাপি লবেন তিনি রক্ষা ভার মোর॥

কিছুকাল পরে অপর এক কন্যার জন্ম হয়। ইহার নাম উপ্পই। শোকান্বিত মাতার হৃদয়ে সত্য পালনোপযোগী বল সঞ্চার করিয়া উপ্পই বলিল—

---

† এ প্রস্তাব রচনায় লেখকের যে তামিল বন্ধু সাহায্য করিয়াছেন, তিনি এস্থান নির্দ্ধারিত করিতে অক্ষম। তিনি বলেন যে মাদুরার সন্নিকটস্থ বিরালি নামক এক বিখ্যাত পাহাড়ী শিবমন্দির আছে, কিন্তু উপরিউক্ত বিরালি পাহাড় তাহা হইতে স্বতন্ত্র কি না বলা দুঃসাধ্য।

অখিল জগৎ সর্ব্ব সৃজিলেন যিনি।
নহেন কি বিশ্ব মাঝে জগন্নাথ ‡ তিনি॥
পালন করেন যিনি স্থাবর জঙ্গম।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা উচ্চ তরু মেঘ সম॥
রক্ষিতে আমায় তাঁর ধর্ম্ম কি না, নয়।
সেই জনে ভাব অজ্ঞ দুর্ব্বল হৃদয়॥

যথাকালে আদির অধিকমান নামে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল! মাতার সান্ত্বনার জন্য শিশু বলিল।

মা আমার, হৃদে ধর আনন্দ এখন।
ত্যজ শোক ত্যজ দুঃখ, বৃথায় রোদন।
ভ্রূণ মুখে সুধা দেয় যে সত্যের পতি।
শিলাগর্ভে পালে যেই ভেকের সন্ততি॥
কর্ম্মবল থাকে যদি আমার জননি।
আনিয়া দিবেন তিনি আহার আপনি॥

তদনন্তর প্রসূত উরুবই নামক কন্যা আদিকে কহিল :—

বিচরণ কর মাতঃ বহুদিন বনে।
সত্য পদ কর চিন্তা ধৈর্য্য ধর মনে॥
মায়ের জঠরে অণ্ড প্রাণ পায় যবে।
জন্মিয়া বাঁচিবে সেই কি আশ্চর্য্য তবে॥

ক্রমে আদির কপিল ও বল্লী নামে পুত্র ও কন্যা জন্মিল। তাহারাও অগ্রজদিগের ন্যায় মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। বল্লুবর আদির সপ্তম সন্তান। ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি মাতাকে বলিলেন :—

---

‡ মূলে ব্যবহৃত শব্দ দেশিক। উহার ধাতুগত অর্থ গুরু উপদেষ্টা। বৈদান্তিক গ্রন্থাবলিতে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি এই বাক্য অনুসরণে গুরু ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং দেশিক শব্দ জগন্নাথের পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এসিদ্ধান্তের দুইটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরং
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহং॥ ইতি বিবেক চূড়ামণিঃ।
যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকং সৎকল্পার্থভঙ্গা সতে
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসি বচসাং যো বোধয়ত্যা শ্রিতাম।
যৎসাক্ষাৎ করণাৎ ভবেন্নপুণরাবৃত্তি ভবাম্ভোধিনিধৌ
তস্মৈঃ শ্রীগুরুমূর্ত্ত নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

সকল ভূতের পাতা জগত মাঝারে।
আছে কি না আছে বল জননি আমারে॥
কি কাজ রোদনে আর শোক করি তবে।
সত্যের পালন কর যা হবার হবে॥ (১)

এই স্থান হইতে অন্যান্য প্রবাদ অবলম্বন করিয়া আখ্যানের ধারা-বাহিত্য রক্ষা করিতে হইবে। উপরি উক্ত সাত জনের মধ্যে অধিকমান চিদাম্বরম নগরে প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন ও বহু সংখ্যক লোককে শিক্ষা দেন। দ্বিতীয় কন্যা উপ্পই ভৃগু পত্নী নাগবল্লীর অবতার বলিয়া পুরাণ কথা আছে। উরুবই ভদ্রকালীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে উরুবই অঘোর বীর ভদ্রকে বিবাহ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করেন। এ সকল পুরাণ কথার এ স্থানে উল্লেখ করিবার প্রধান কারণ বল্লুবর ও ঔবৈয়ারের সময় নিরূপণ। পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনাবলি হইতে দেখা যায় যে ইহাঁরা পাণ্ড্য রাজাদিগের অধিকার কালে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পাণ্ড্য আধিপত্যের কোন অংশে ইহাদের আবির্ভাব হয়, স্থির করা দুঃসাধ্য। ইহা হইতে আরো দেখা যায় যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বল্লুবরের জন্ম শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। (২) শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলি হইতে ইহা পরিস্ফুট যে তাঁহার জীবনকালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন ছিল। তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত মহীসুরদেশের অন্তর্গত শৃঙ্গেরী মঠ সংস্কৃত ও বৈদিক চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। কাল ক্রমে শঙ্করাচার্য্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও পূর্ণ প্রজ্ঞের দ্বৈতবাদ উদিত হয়। অন্য দিকে সায়নাচার্য্য বিজয় নগরাধিপতির আনুকূল্যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় স্থাপন করেন। তদবধি অদ্বৈতবাদ হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি হইয়াছে ও অন্যান্য দর্শন অবজ্ঞাত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম চরমে অদ্বৈতবাদী। এই ঘটনা সমূহ হইতে এরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃত চর্চ্চার তীব্র রশ্মির সম্মুখে প্রচলিত পুরাণ বিরোধী ভৃগু ও অগস্ত্যের উপাখ্যান কখনও সংকলিত হওয়া সম্ভব পর নহে। অপরন্তু, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে তামিলদেশে শৈব দর্শনের অতিশয় প্রাদুর্ভাব এবং শঙ্করাচার্য্যও শিব পার্ব্বতী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে শৈব ধর্ম্মাবলম্বী কেহ এরূপ কল্পনা করিতে সক্ষম যে ভদ্রকালী কর্ত্তৃক তারকাসুর বিনষ্ট হয় বা অঘোর বীরভদ্র মনুষ্য কন্যার পাণিগ্রহণ

---

১ নব প্রসূত শিশুদিগের বাক্যে ব্রহ্ম স্বরূপ কিরূপে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা সুচিন্তনীয়।

২ বার্থ প্রণীত হিন্দুধর্ম্মের ১৯২ পৃঃ দেখ।

করেন। শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে প্রকাশ পায় যে ৬৪ তন্ত্র তিনি অবগত ছিলেন (আনন্দলহরী, ৩১ শ্লোক দেখ)। সুতরাং এরূপ ব্যভিচারী প্রবাদ পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া বড় সম্ভাব্য নহে। বল্লুবর অশিক্ষিতদিগের মধ্যেই যে সম্মানিত, তাহা নহে; ব্রাহ্মণেরাও যে বল্লুবর ও ঔবৈয়ারকে সম্মান করেন তাহা বার্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে প্রস্ফুট হইবে। যাহা হউক, ইহাঁরা দুই জন যে পাণ্ড্য আধিপত্যকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাস্য। ইহাদিগকে খৃষ্টীয় মধ্য যুগে আনিয়া ফেলিবার কোন কারণ দেখা যায় না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যকেও যথেষ্ট আধুনিক করিয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু সে বিষয় বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিচার্য্য নহে।

মাতা পরিত্যাগ করিলে পর বল্লুবরের জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কপালেশ্বর (৩) গ্রামে ইলুপ্প (৪) বনে তাহাকে ফেলিয়া পিতা মাতা প্রস্থান করিল। ইলুপ্প বৃক্ষের ফুল মধুবর্ষী। ঐ মধু বিন্দু বিন্দু বল্লুবরের মুখে পড়িতে লাগিল এবং তাহাতেই শিশুর প্রাণরক্ষা হইল। অদূরে এক ঘর বেলালের বসতি ছিল (৫)। গৃহস্বামী গঙ্গাবংশীয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। একদা নিঃসন্তান গৃহস্বামিনী নিকটস্থ শিব মন্দিরে পুত্র কামনায় ভক্তিভাবে পূজা করিতেছিল। কথিত আছে যে পার্ব্বতী তাহার পূজায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ইলুপ্প বনে গমন করিয়া বল্লুবরকে কুড়াইয়া আনিতে আদেশ দেন। বেলালপত্নী আদিষ্ট স্থানে শিখা উপবীতধারী বেদাধ্যায়ী এক সুন্দর শিশু দেখিতে পাইল। তাহাকে গৃহে আনিয়া বেলাল দম্পতি যত্ন ও স্নেহের সহিত পালন করিতে লাগিল এবং শিশু উমা-প্রদত্ত বলিয়া তাহার প্রতি পিতা মাতার স্নেহের ন্যায় ভক্তিও জন্মিল। অল্প কাল মধ্যে উক্ত বেলাল দম্পতির আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি স্বজাতীয়েরা জাতিহীন শিশুকে পোষ্যপুত্র করা হেতু তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এই উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বেলাল দম্পতি শিশুকে তাহাদের রাখালকে প্রতিপালন জন্য দেয়। শিশু রাখালের সহিত গোশালায় রহিল। পঞ্চ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বল্লুবর প্রতিপালকদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাদের বিপদ সময়ে উপস্থিত হইবেন এই অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া রৌদ্রক্লান্ত বল্লুবর এক তালবৃক্ষের নীচে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে যে তালবৃক্ষ তাঁহাকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য সূর্য্যের গতির সহ নিজ ছায়ার

---

৩ বর্ত্তমান মান্দ্রাজের অন্তর্গত মাইলাপুর।

৪ ইলুপ্প বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল দক্ষিণ ভারতে বহু প্রচলিত।

৫ বেলাল জাতি এখন পিল্লে উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। বেলাল শব্দের অর্থ চাষা।

গতি রোধ করিয়াছিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে সেইস্থান শীঘ্রই জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাদের হস্ত এড়াইবার জন্য বল্লুবর তথা হইতে নীলগিরি অঞ্চলে তিরুমূল নামক দুই জন বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় সিদ্ধ পুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কালক্রমে মহা জ্ঞানী হইলেন।

কথিত আছে যে এই সময় তোণ্ড মণ্ডল (৬. প্রদেশে দেবযোনির উপদ্রব হয়। দুর্ভিক্ষ ও মারিভয়ে উক্তপ্রদেশস্থ লোক বিব্রত হইয়া পড়ে। তোণ্ড মণ্ডলে কাবেরী পাক্কম্ (৭) নামক গ্রামে মার্গসহায় নামক তৎপ্রদেশস্থ প্রধান বেলালের বসতি ছিল। এক-সহস্র লাঙ্গল সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে পরিমাণ ভূমি চাষ করিতে পারে, তাহা মার্গসহায়ের অধিকার গত। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া মার্গসহায় ঘোষণা করিল যে উক্ত উপদ্রবনিবারীকে তিনি বহু অর্থ ও ভূমি দান করিবেন। কিন্তু কেহই তৎকার্য্য সাধনে সক্ষম হইল না। অনন্যোপায় হইয়া মার্গসহায় নীলগিরির সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইল। সিদ্ধপুরুষদিগের অনুজ্ঞায় বল্লুবর পঞ্চাক্ষর বিভূতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপদ্রবশান্তি করিলেন। মার্গসহায় কৃতজ্ঞতার সহ অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বল্লুবর তাহা গ্রহণ করিলেন না। মার্গ সহায় তখন বল্লুবরকে কন্যা দানের প্রস্তাব করিলেন। গৃহস্থাশ্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বল্লুবর বিবাহে সম্মত হইলেন কিন্তু বলিলেন যে বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীকে তৎপ্রদত্ত এক মুষ্টি বালুকা রন্ধন করিতে হইবে। এই পরীক্ষার মর্ম্মানুসন্ধান করা বড় দুরূহ নহে। যাহার যে ধর্ম্ম তাহাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবেই হইবে। এ বিষয়ে অন্যের কি ধর্ম্ম বা কি অধর্ম্ম তাহার সহিত ধার্ম্মিকের কোন সম্পর্ক নাই। আদান প্রদানমূলক যে নীতি বর্ত্তমান সভ্য জগতে প্রচলিত, তাহা হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী। নিজের পালনীয় ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও শ্রেয়স্কর ; অপর ব্যক্তির যাহা ধর্ম্ম, তাহা গ্রহণকরা ভয়াবহ (৮)। বল্লুবরের কি ধর্ম্ম বা কি অধর্ম্ম তাহা মার্গসহায় কন্যা বাসুকির বিচার্য্য নহে। পত্নীর ধর্ম্ম স্বামীর জন্য রন্ধন করা। যদি স্বামী অধর্ম্ম করেন, তাহাতে পত্নীর অধর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মায় না। (৯) বাসুকি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বিবাহের পর কিছুকাল বল্লুবর শ্বশুর গৃহে বাস করিলেন। তদনন্তর বল্লুবর সস্ত্রীক নিকটস্থ পাহাড়ে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পরে এলেল সিংহ

৬ বর্ত্তমান চিঙ্গল পট্।

৭ কাবেরী পাক্কম্। পক্কম-উদ্যান।

৮ স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মভয়াবহঃ। ইতি ভগবদ্গীতা ৩য় অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

৯ মোহিনীর শাপে ব্রহ্মা অপূজ্য হইবার যে পুরাণ কথা আছে তাহারও প্রতিপাদ্য এই ধর্ম্ম।

নামক একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর অধীনে তন্তুবায় বৃত্তি অবলম্বন করেন। বাসুকি ও বল্লুবর নিজকুটীরে বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে এবং বল্লুবর পত্নীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এরূপ নীচ বৃত্তি অবলম্বন সত্ত্বেও বল্লুবরের জ্ঞানের খ্যাতি লঘু হয় নাই। প্রতি দিন তাঁহার নিকট শিষ্য আসিতে লাগিল; এলেল সিংহও তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। বল্লুবর তাহাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া বিদায় করিতেন। এলেল সিংহ অধিক উপদেশের আশায় এক দিন বল্লুবরের নিকট বলিল, "প্রভু, আমি সংসার হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিব? সংসার আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" বল্লুবর তখন তাঁহাকে বৃহৎ এক বৃক্ষে চড়িতে আদেশ করিলেন। এলেল আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। বল্লুবর তাহাকে পা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। এলেল দুইহাতে ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। পরে দক্ষিণ হস্ত ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। এলেল বাম হাতে ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। পরে বাম হাত ছাড়িবার অনুমতি শুনিয়া এলেল বলিল, "প্রভু, এখান হইতে পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়। বল্লুবর হাসিয়া বলিলেন, "এখন দেখিতেছ ত সংসার তোমাকে ধরিয়া আছে কি তুমি সংসারকে ধরিয়া আছ।" এলেল অপ্রতিভ হইয়া নামিয়া আসিল। সে যাহা হউক ক্রমে এলেল সিংহ বল্লুবরের প্রধান শিষ্য হইল। ইহারই বিশেষ অনুরোধে বল্লুবর কুরল রচনা করেন। গ্রন্থ সমাপন করিয়া বল্লুবর দেখিলেন যে মাদুরার সঙ্গের অভিনন্দন ব্যতীত কুরল কখনই নিজ উপচিকীর্ষা শমিত করিতে পারিবে না। কিন্তু মহা মহোপাধ্যায় বৈদিক স্মার্ত্ত পৌরাণিক পণ্ডিতের নিকট একজন সামান্য দরিদ্র তন্তুবায়ের আসন লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সে যাহা হউক একদিন বল্লুবর মাদুরার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঔবৈয়ার ও অন্যান্য সঙ্গ-বহির্ভূত কবিগণ বল্লুবরের পক্ষ সমর্থন করেন। সঙ্গ বল্লুবরের গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারে স্বীকৃত হইলেন। পাণ্ড্যবংশীয় রাজা উগ্রপেরু বলিদি নির্দ্দিষ্ট দিনে সভাসদবর্গে মাদুরার বিখ্যাত শিব মন্দিরের পার্শ্বস্থ কনক কমল দীর্ঘিকার কূলে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে সঙ্গের অধিবেশন হইল। বল্লুবর উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিজ কুরল পাঠ করিলেন। সঙ্গের পণ্ডিতগণ ভিন্ন অপর সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তদনন্তর বল্লুবর সঙ্গ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বহুসংখ্যক দুরূহ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। সঙ্গের পণ্ডিতগণ এইরূপে বিফলযত্ন হইয়া কহিল যে যদি তাহাদের বসিবার আসন আপনা হইতে কুরলকে অভিনন্দন করে, তবেই উহা আদৃত হইবে। কথিত আছে যে কুরল আসনোপরি স্থাপিত হইলে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া কেবল মাত্র কুরলকে ধারণ করিল। পণ্ডিতবর্গ অপ্রতিভ হইয়া পুষ্করিণীর জল মধ্যে নিপতিত হইল ও কুরল সঙ্গ মান্য হইয়া দাঁড়াইল। একজন পণ্ডিত কহিলেন যে "বিষ্ণু তিন পদে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, কুরল দুই পদে সে কার্য্য সাধন করিয়াছে।" (কুরলের

প্রত্যেক শ্লোক দুই পদ বিশিষ্ট।) "অপর শাস্ত্র সম্প্রদায়-গত, কুরল নিঃসম্প্রদায়"—এই বলিয়া সুধীবৃন্দ কুরলের প্রশংসা করিল।

ঔবৈয়ার গাহিয়াছেন যে "বল্লুবর শর্ষপ মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাকে সপ্তসিন্ধুর দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই শর্ষপের নাম কুরল।" বল্লুবরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কপিল বলেন, "কুরল তৃণগ্রস্ত শিশির বিন্দুর ন্যায়। উহাতে উচ্চশির তালবৃক্ষ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।"

মাদুরা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বল্লুবর মৈলমগ্রামে সস্ত্রিক বাস করিতে লাগিলেন। মৈলম্ এখন চিঙ্গলপট্ অন্তর্গত একটী রেলওয়ে ষ্টেশন। কিছুকাল পরে বাসুকির মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বল্লুবর সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বল্লুবর সন্ন্যাসী হইয়া অনেক বৎসর লোক হিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধির উপর শিষ্যগণ এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপিও সেই স্থানে বল্লুবরের পূজা প্রচলিত আছে।

সরস্বতী বন্দনা।

এই যে ভারতী শোভিতা ভারতে,
তুলিয়া বীণায় ললিত গান।
শ্বেত শতদল চরণ কমলে
অলি মাতোয়ারা ধরেছে গান।
মৃদুল মৃদুল পরশিত সুর,
মিলন রাগিণী বাজে সুমধুর,
সুতালে সুলয়ে পৃথ্বী ভরপূর,
উচ্ছ্বাসিত চিত মোহিত প্রাণ!

দাও দাও দাও সুরেতে ঝঙ্কার,
গাও গাও দেবী গাও আরবার,
জাগাও মাতাও ভারত প্রাণ,
তুমি না পুরালে মনের বাসনা,
কে পুরাবে আর সরোজ আসনা,
জাগিছে আনন্দ জাগিছে কামনা
হেরিয়া মিলিত অযুত প্রাণ,
তোমার চরণ প্রসাদে-বিমলে,
দ্বেষ হিংসা চলে গেছে রসাতলে,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাব জাতি ভেদ ভুলে
কোটী কণ্ঠে উঠে মহান্ গান।

কোথা কালিদাস, কোথা ভবভূতি!
কোথায় বাল্মীকি, হর্ষ বিদ্যাপতি,—
ভারতে আজিকে পূজিতা ভারতী
তোল সে বীণায় ললিত তান।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বেলিগার্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্যর হেন্‌রির অসুস্থতা। ৩০শে ও ৩১শে মের বিদ্রোহ দমনের পর স্যর হেন্‌রির নিজের শরীরে বিপ্লব উপস্থিত হইল। ক্রমাগত দৃঢ় পরিশ্রম, অনিয়মিত পানাহার, অনিদ্রা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, প্রভৃতি শীঘ্রই এই বর্ষীয়ান বীরপুরুষের শরীরের উপর বিষময় ফল উৎপাদন করিল। লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বময় কর্তৃত্বভার লইবার পূর্ব্বেই তিনি অবসর লইয়া বিলাত যাইতেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিংএর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অগত্যা নিজ শারীরিক অবস্থা উপেক্ষা করিয়া কমিশনরের পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত মানসিক চিন্তা ও পরিশ্রমে তাঁহার শারীরিক তেজ ক্ষয় হইতে লাগিল, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে একেবারে এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে অবসর লইতে বলিলেন।

অন্য সময় হইলে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর লইতেন—কিন্তু এই ভয়ানক সময়ে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলে—তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও ইংরাজ সম্প্রদায়ে কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা তাঁহার মনশ্চক্ষে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইল। কোম্পানির নিমক খাইয়া তিনি পক্ককেশ হইয়াছেন, অনেক গুরুতর কার্য্যে সাহস ও উদ্যমের সহায়তায় তিনি জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, সরকারের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন—এ প্রকার অবস্থায় কর্ম্মে ইস্তফা দিলে সেই বিশ্বাসের অপচয় করা হয় ভাবিয়া অগত্যা তিনি স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সাগরে ভীষণ তরঙ্গ উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত নাবিকের হস্তে তরণী চালন-ভার সংন্যস্ত না করিলে তাহা যে মুহূর্ত্ত মধ্যে অতল জল নিমজ্জিত হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দূরদর্শী রাজপুরুষ স্যর হেন্‌রি ভাবিলেন, শত্রুর গোলাগুলিতেই হউক বা রোগবশেই হউক যদি তাঁহার সহসা মৃত্যু হয়—তাহা হইলে অধিনায়কতার ভার কোন উপযুক্ত হস্তে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক। এইজন্য তিনি মেজর ব্যাঙ্কস্ ও কর্ণেল ইংলিস্ নামক দুইজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়া লর্ড ক্যানিংকে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। বলা বাহুল্য মহামতি ক্যানিং তাহাতে আহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন।

সামরিক মন্ত্রী সভা। চিকিৎসকের উপদেশের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করায় ৯ই জুন তারিখে স্যর হেনরি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারেরা বলিলেন ইহার উপর সামান্য পরিশ্রম করিলেই

তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তিনি অগত্যা কার্য্য হইতে বিরত হইলেন বটে, কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা একটী মন্ত্রণা সভা সংগঠিত করিলেন। এই মন্ত্রণা সভার দ্বারা সকল কার্য্যেই বিশৃঙ্খল ঘটিতে লাগিল। তৎকালীন সিবিলিয়ান কুলতিলক মার্টিন গোবিনস্ এই সকল অনর্থের মূল।

এই ভয়ানক সময়েও অনেক সিপাহী ইংরাজের অধীনে বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিতেছিল। গোবিন্স সাহেব অতিশয় সন্দিগ্ধমনা ও উৎশৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমস্ত মন্ত্রী সভার কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার উপর, তিনিই সেই সামরিক মন্ত্রীসভার একমাত্র সভাপতি, সেই বিপদ সঙ্কুল সমর সাগরে রাজ্যতরণীর একমাত্র কর্ণধার, সুতরাং তিনি সমস্ত দেশীয় সিপাহিদের একবারে বিদায় করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অন্যান্য সদস্যদিগের যুক্তি মূলক আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া তিনি গায়ের জোরে স্বীয় পদোচিত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন।

কথাটা স্যর হেন্‌রির কর্ণে পৌঁছিল। এপ্রকার যথেচ্ছাচারিতায় যে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে পারে—তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিলেন, তাঁহার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গোবিন্সের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকের হস্তার্পিত ক্ষমতা পুনঃগ্রহণ করিলেন।

৩০ শে মের বিদ্রোহের পরও অনেক সিপাহী ইংরাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কমিশনার সাহেব ভাবিলেন—এই বিপদের সময়ে দেশীয় সৈন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ায় ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক—সুতরাং বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের বিশ্বাসানুসারে দেশীয় সৈন্য লইয়া নূতনবিধ উপায়ে নূতন দল সংগঠন করিলেন। যে সকল সিপাহী কোম্পানীর কার্য্যে অক্ষত যশ ও পককেশ হইয়া গৃহে বসিয়া পেন্সন সুখভোগ করিতেছিল, তিনি তাহাদের এই সময়ে নূতন কর্ত্তব্যে ব্রতী করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার আহ্বানে তাহারা সকলেই সেই বৃদ্ধাবস্থায় অবসর সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সঙ্গীন ধরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এই সকল পেন্সন ভোগী হিন্দু মুসলমান সিপাহী লইয়া স্যর হেন্‌রি একটী নূতন দল সংগঠন করিলেন। এতদ্ব্যতীত কেবল মাত্র শিখ্ লইয়া আর একটী নূতন রেজিমেণ্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। বলা বাহুল্য ইহারা শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির কার্য্য করিয়াছিল।

পুলিশ সৈন্যদলের বিদ্রোহ। ১১ই জুনের রাত্রে আবার এক নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। নগরের শান্তি রক্ষার্থে সেই সময়ে দুই দল দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল, ইহাদের মধ্যে এক দল অশ্বারোহী ও অপর দল পদাতি। অশ্বারোহী দল "দিলারাম কুঠী"তে ছাউনী করিয়াছিল। নগরস্থ অশ্বারোহী দল বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ পাইবামাত্রই দলের কর্ত্তা ওয়েষ্টন সাহেব গোমতীতীরে দিলারামে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার নির্ভীকতা বিশেষ

প্রশংসনীয়, শত সহস্র বিদ্রোহীর সম্মুখে দুই জন মাত্র নিরস্ত্র আরদালী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদের ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কেহই শুনিল না—নদীর খরতর স্রোতে তখন বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে সে ভাঙ্গনের গতিরোধ করা একমাত্র ওয়েষ্টনের কার্য্য নহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই ওয়েষ্টন সাহেব নিরাপদে অক্ষত শরীরে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পাইলেন। এই ঘটনার পর দিন প্রাতে মতিমহলস্থ পদাতি-মিলিটারি পুলিশ বিদ্রোহী হইল। অর সাহেব এই দলের কর্ত্তা ছিলেন। বিপদের পূর্ব্ব সূচনা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বীয় পরিবার-বর্গকে রেসিডেন্সি মধ্যে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সহসা বিদ্রোহ উপস্থিত দেখিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বিদ্রোহীরা উল্লাসিত চিত্তে কোলাহল করিতে করিতে দিলখুসীর রাস্তা ধরিয়া কাণপুরের দিকে চলিল।

এই সকল সংবাদ রেসিডেন্সিতে পৌঁছিবামাত্র, স্যর হেন্‌রি কর্ণেল ইংলিশকে এক দল সৈন্য সমেত বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। সিপাহীরা একটী গ্রামের মধ্যে ছাউনী গাড়িয়াছিল—এই স্থানে তাহাদের সহিত কর্ণেল ইংলিশের সৈন্য দলের একটী ক্ষুদ্র সংগ্রাম হইল। সেই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই একটা বিশেষরূপ জয় পরাজয় হইল না। কর্ণেল ইংলিশ নানা কারণে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া লক্ষ্ণৌএ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাণপুরের পরিণামের উপর লক্ষ্ণৌএর অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল। কাণ-পুরের পতন হইলে লক্ষ্ণৌএর পতন একরূপ অনিবার্য্য; হুইলার সাহেব এতদিন ধরিয়া নানা সাহেবের সহিত যুঝিয়া পরিশেষে তাঁহার কপটতাময় সন্ধি প্রস্তাবে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পরিণাম কাণপুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের পর হইতেই কাণপুরের প্রকৃত পতন আরম্ভ হইল।

২৮ শে জুনের হত্যাকাণ্ড ও কাণপুরের পতন সংবাদ স্যর হেনরীর শ্রুতিগোচর হইল। এই শোচনীয় সংবাদে তিনি অতিশয় বিচলিত চিত্ত হইয়া উঠিলেন। অযোধ্যার বিদ্রোহী সৈন্যেরা কানপুরের পতনাপেক্ষা করিতেছিল। কাণপুর ইংরাজ হস্ত বহির্ভূত হইতে দেখিয়া তাহারা ভবিষ্যৎ জয়োল্লাসে আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। লক্ষ্ণৌ ইংরাজ হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার বক্ষে জয়পতাকা প্রোথিত করিবার দুরাশা তাহাদের মনে উদিত হইল। কাণপুরের সিপাহিরা যাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা যে তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, এ ধারণা তাহাদের মনোভূমি হইতে তিরোহিত হইল। এই বাসনা সুসিদ্ধ করিবার জন্য বিদ্রোহী অধিনায়কেরা স্বস্ব অধীনস্থ সৈন্যদিগকে নবাবগঞ্জে একত্রিত করিতে লাগিলেন।

চিনটের-মহাযুদ্ধ ও তাহার শোচনীয় পরিণাম। কমিশনার সাহেব সং-বাদ পাইলেন বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী—লক্ষ্ণৌ হইতে দশক্রোশ দূরে নবাবগঞ্জে

সমবেত হইয়া ছাউনি পাড়িয়াছে। তাহারা এতদিন ধরিয়া কাণপুরের পরিণাম অপেক্ষা করিতেছিল—এক্ষণে তাহার পতন সংবাদে উল্লাসিত হইয়া সদর্পে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। 'এই সংবাদে তিনি অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শত্রুরা বিনা বাধায় নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিবে, এবং লক্ষ্ণৌএ কাণপুর হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় শোচনীয় অভিনয় আরম্ভ হইবে—ইহাই তাঁহার ধারণা জন্মিল। আহত হইয়া আঘাত করা অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়া আঘাত করা যে অধিক ফলজনক হইবে এই আশায় তিনি কয়েক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চিনটের দিকে পাঠাইলেন।

কিন্তু ভবিতব্যের লিপি অখণ্ডনীয়—সেই সময়ে ইংরাজের পড়তা খারাপ হইয়াছিল বলিয়াই স্যর হেন্‌রির ন্যায় বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর এই প্রকার মতিভ্রম ঘটিল। সামান্য মন্ত্রৌষধি দ্বারা তিনি উন্নত ফণা বিষধরের শক্তিহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কয়েক খণ্ড বিতংস সংগ্রহ করিয়া মত্ত কেশরীর পদ বন্ধনে অগ্রসর হইলেন, সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ভাবিয়া দুই একবিন্দু বারি প্রদানে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু হায় ভবিতব্য! তুমিই এতাদৃশ পক্ককেশ, স্থির বুদ্ধি, অমিতযশা রাজ পুরুষের চক্ষে ধূলি নিক্ষপ করিলে! সেই দিনের ঘটনায় এক শোণিত-মেদময় আহুতি পূর্ণ মহাযজ্ঞের পূর্ব্বসূচনা করিয়া দিলে!! শত্রুর বিরুদ্ধে এই সৈন্য প্রেরণ যদি মাসের ত্রিংশ দিবসে না করিয়া তাহার পূর্ব্ব দিবসে ঘটিত—তাহা হইলে বোধ হয় রেসিডেন্সি অবরোধ আদতে হইত না। যে সমস্ত প্রণিধি প্রতিদিন শত্রু স্কন্ধাবারের গুপ্তসংবাদ আনিয়া দিত—তাহারা হয় বিশ্বাসঘাতক—না হয় সম্পূর্ণরূপে শত্রুপক্ষের প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা যে সংবাদ আনিয়া কমিশনারের কাণে তুলিল—তাহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন সিপাহী সংখ্যা অতি সামান্য। ইংরাদের দুর্দ্ধর্ষ কামান মুখে এই স্বল্প সংখ্যক সিপাহী কয়েক ঘণ্টার ক্রীড়ার বস্তু মাত্র।

কিন্তু যেখানেই দর্প, সেইখানেই পতন—যেখানে শত্রু সম্বন্ধে উপেক্ষা—সেইখানেই পরাজয়। সুতরাং স্যর হেনরি স্বয়ং সপ্তশত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া গিয়াও শত্রুর নিকট সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইলেন। এই পরাজয়ের পরে হইতেই লক্ষ্ণৌএর স্মরণীয় অবরোধ আরম্ভ হইল।

২৯এ জুনের বিমলসূর্য্যরশ্মিময় প্রভাত যে সৈন্যদলকে জয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া প্রফুল্ল মুখে "রূল ব্রিটানিয়া" গাহিতে গাহিতে চিনটের স্বল্লায়ত ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়াছিল, সেই দিনের সন্ধ্যাই আবার তাহাদিগকে বিষণ্ণমুখে—শোণিতাক্ত ও স্বেদ প্লুত কলেবরে নিরাশার কালিমায় মুখরঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া প্রফুল্লতার সহিত শেষালিঙ্গন করিয়া আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকার লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিল। সেই দিন তাহারা যে প্রফুল্লতাকে অতলস্পর্শ রত্নাগরে নিক্ষিপ্ত

করিয়াছিল তাহার ছয়মাস পরে হাভলক ও আউটরাম ব্যতীত আর কেহই তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

চিন্হুট যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা অপেক্ষা এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে এই যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে সিপাহী শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া অতিশোচনীয় অবস্থায় লক্ষ্ণৌয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে * এবং ইংরাজ পক্ষের অনেকগুলি কামান শত্রু পক্ষের হস্তগত হয়।

বিদ্রোহীদিগের নগর প্রবেশ। প্রভঞ্জন আসিয়া বিভাবসুর সহিত মিলিত হইলে তাহার প্রভাব যেরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ভয়ানক ভাব ধারণ করে, বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত জয়শ্রী আসিয়া মিলিত হওয়ায় তাহারাও সেইরূপ ভীষণভাব ধারণ করিল। জয়োৎসাহে ফুল্লচিত্ত হইয়া তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিল—কেহই তাহাদিগকে বাধা দিবার নাই, ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার ভবিষ্যৎ উপায়স্বরূপ রেসিডেন্সিতে আসিয়া তাহার চারি দিক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে দৃঢ় নিবিষ্ট। কিন্তু যখন নগর প্রবৃষ্ট দুরন্ত সিপাহী সেনার জয় নিনাদ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল, তখন তাহাদের অন্তঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

সিপাহীরা আসিয়া নগরের উপযুক্ত স্থানে আপনাদের শিবির সন্নিবেশ করিল। নগরের সমস্ত ইংরাজ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়াছে, সহরের ও আশেপাশের সমস্ত ইংরাজ সৈনিক রেসিডেন্সিকে দুর্গস্থল ভুক্ত করিয়া সিপাহীর বিরুদ্ধে যুঝিবার আয়োজন করিতেছে। সিপাহীরা ভাবিল রেসিডেন্সি অবরোধ করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি। কাণপুরে যেরূপ নানা সাহেব স্বীয় বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন—লক্ষ্ণৌ এ তাহারাও সেইরূপ করিবে।

নগরের শোচনীয় অবস্থা। সিপাহিরা আসিয়া নগর প্রবেশ করায় অধিবাসীরা ভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল; দোকানদার বিপনি মধ্যস্থ দ্রব্যজাত সরাইয়া ফেলিয়া নিজে সরিয়া পড়িল; রোকড়ওয়ালা টাকা কড়ি লইয়া সর্ব্বাগ্রে সরিয়া পড়িল। এক দিনের মধ্যেই নগর জনশূন্য, রাজপথ লোকশূন্য, নাগরিকদিগের আবাস বাটী কোলাহল শূন্য। যাহারা পলাইয়াছে, তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। যাহারা পলাইতে পারিল না তাহারা কিয়দ্দিনের জন্য একবারে দ্বার বন্ধ করিল; সমস্ত লক্ষ্ণৌ নগরী শ্মশানের ন্যায় কোলাহল শূন্য ও নিস্তব্ধ—কেবল মধ্যে মধ্যে সিপাহীর বজ্রনাদী কামান গর্জ্জন, সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ ঝন্‌ঝনা, আর্ত্তের ও আহতের যাতনাব্যঞ্জক ক্ষীণ স্বর—

---

* কোব্রাইল পুলের নিকটে নদীপার হইবার সময়ে—প্রত্যাবর্ত্তনকারী ইংরাজ সৈনিকদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্যর হেনরী লরেন্স অনুশোচনা দগ্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"Ah! my God! my God! and I brought them to this!!

এবং সিপাহীগণের উন্মত্ত জয় কোলাহল, ও "মার" "ধর" এই সকল সেই শ্মশানবৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

রেসিডেন্সি অবরোধ ও নগর লুণ্ঠন। জয়োল্লাসে বিদ্রোহীগণ এতদূর উন্মত্ত যে যে দিন তাহারা নগর প্রবেশ করিল সেই দিনই রেসিডেন্সি ও মচ্ছীভবনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। রেসিডেন্সি যদিও ইংরাজের প্রধান আশ্রয়স্থল—তথাচ মচ্ছীভবনেও তাহাদের অনেক সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সিপাহীরা একেবারে ইংরাজের দুইটী আড্ডাই আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল; এবং একটী ছয় পাউণ্ডার কামান ঘুরাইয়া সর্ব্ব প্রথমেই Residency Anderson Post এর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। *

অবরোধের প্রথম দিনের রাত্রে শত্রুরা শ্রমক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। রেসিডেন্সিও ক্ষণকাল জ্বলন্ত গোলার আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্তু হায়! কালের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! যে কমিশনার সাহেব লক্ষ্ণৌএর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন এই সময়ে তিনি বহু সংখ্যক শত্রুর ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া রেসিডেন্সির মধ্যে আবদ্ধ হইলেন। পরদিবস প্রভাতের আরম্ভে আবার বিদ্রোহীদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। "মচ্ছীভবন" ও "রেসিডেন্সির" উপর তাহারা প্রভাতের প্রাক্কাল হইতেই অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শত সহস্র বন্দুক মহাশব্দে জ্বলন্ত অনল রাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া চারিদিকে শীকার অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে দিনটাও এইরূপ গোলাবর্ষণে ভয়ানক ভাবে কাটিয়া গেল।

মচ্ছিভবন দুর্গের পরিণাম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্যার লরেন্স এই সময়ে অগণিত শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া মহাকৌশলে আর একটী আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন এই ঘোরতর বিপদের সময় পৃথক পৃথক স্থলে আড্ডা না করিয়া একজায়গায় সমস্ত সৈন্য সংযত করা বড়ই ফলপ্রদ। কিন্তু একথা আগে ভাবিলে হইতে পারিত বটে—এক্ষণে শত্রুর সম্মুখ দিয়া মচ্ছিভবন হইতে সৈন্য সরাইতে গেলে সকলেই তাহাদের কামানের মুখে প্রাণ হারাইবে। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়ি-

---

* এই স্থানে ক্যাপার নামক একজন সিবিলিয়ান এই সময়ে এক ক্ষুদ্র সৈন্য দল লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বারান্দার নিম্নে থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহাদের গোলার আঘাতে সমস্ত বারান্দা ভাঙ্গিয়া সাহেবের বুকের উপর পড়িল। সেই ভগ্ন স্তূপে তিনি আবক্ষ প্রোথিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে, কয়েকজন সাহসী ইংরাজ শত্রুর গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বব জীবনে উপেক্ষা করিয়া—কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী পরিশ্রমের পর অর্দ্ধ প্রোথিত ক্যাপারকে যমের মুখ হইতে টানিয়া লয়।

বার পাত্র নহেন। প্রণিধি মুখে পরিশেষে সংবাদ পাইলেন যে শত্রুগণ অদ্য রাত্রে নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত থাকিবে সুতরাং মচ্ছিভবনের অধিনায়ক কর্ণেল ফ্রান্সিসের নিকট সংবাদ গেল—"তুমি গভীর নিশীথে মচ্ছীভবনের বারুদ স্তূপে অগ্নিসেক করিয়া—তাহা পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সিতে আসিবে।"

নিশা যেন প্রলয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন। নগরের দূরস্থ রাজ পথে মধ্যে মধ্যে কেবল লুণ্ঠনকারী ইতস্ততঃ ধাবমান সৈন্যগণের দূর-শ্রুত কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছিল—মধ্যে মধ্যে শব লোলুপ সারমেয়ের ভীম চীৎকার—আর গোমতীর ক্ষীণ প্রবাহের অস্ফুট ধ্বনি কাণে বাজিতেছিল। এই গভীর নিশীথে অতি ধীরে ধীরে ফ্রান্সিস্ সাহেব ঈশ্বরের নাম লইয়া মচ্ছীভবনের দুর্গদ্বার ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটী ক্ষীণ প্রজ্বলিত মশাল হস্তে উন্মুক্ত কোষ ইংরাজ সৈনিক রমণী ও বালক বালিকাগণকে বেড়িয়া চলিল। তাঁহারাও নিরাপদে রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে পৌঁছিলেন অমনি তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিপৃষ্ঠ বারুদ রাশি মহাশব্দে জ্বলিয়া উঠিয়া সেই ঘোর তমসাবৃত নৈশ গগণের কোল আলোকিত করিল। শত্রুর কাণে সে আওয়াজ পৌঁছিল—ঘটনা কি তাহা তাহাদের বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না—তাহারা ভাবিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে—শীকার পলাইয়াছে!!

ফুলজানি।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরন্দরের গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে—এখন বাকী বিবাহ। গায় হলুদের দিনের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা দিদির সঙ্গে পুরনের ঝকড়া, কেননা দিদির কৌশলে বাপ সম্মুখে উপস্থিত থাকায় দুই দণ্ড ধরিয়া তৈল হরিদ্রার মর্দ্দন-যন্ত্রণা পুরনকে সহিতে হইয়াছিল। নহিলে কার সাধ্য অতক্ষণ এক জায়গায় তাহাকে বসাইয়া রাখে। অভিমানে পুরন্দর ভাল করিয়া কাহাকেও চাহিয়া দেখিতেছিল না;—অপাঙ্গে চাহিতে একবার দিদির ঈষন্মুক্ত দন্তপংক্তিতে কষ্ট-সম্বৃত হাস্য লহরী দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গিয়াছিল। কাজেই ঠাকুরাণী দিদি যখন জোরে কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিলেন এবং বোসেদের বড়বউ যখন ঘোমটার ভিতর হইতে কানে কানে বলিলেন—"ছোট্ ঠাকুর ভাই মাগুর মাছ সাঁতলালে কে?" তখন উত্তর পাওয়া দূরে থাক, ভাল করিয়া সে তাঁহাদের ভ্যাঙ্গাইতেও পারিল না। অতএব গায় হলুদ শেষ ও পিতা চক্ষুর অন্তরাল

হইলেই পুরন্দর নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল! তাহার ফলে দিদি প্রভৃতি সুন্দরীগণের তৈল হরিদ্রাময় দেহে পুষ্করিণীর পঙ্ক ও দ্রবীভূত গোময় শোভা পাইতে লাগিল। দিদির নাকাল কিছু বেশী রকমের হইয়াছিল, অতএব তিনি "লক্ষণের দিনে"ও রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাইয়ের প্রাপ্য গালি মোক্ষদা কাজেই "লক্ষণের দিনে" মার প্রতি বাক্যবাণরূপে প্রয়োগ করিলেন এবং তখন মায়ে ঝিয়ে ঝুটোপুটি বাধিয়া গেল।

বরের গায় হলুদ এইরূপ বীর রসে শেষ হইয়া গেল। হিন্দুর মেয়ের বিবাহ চিরকালই করুণ রসাত্মক—কাল ভেদে আরও রূপভেদ হইয়াছে—কাজেই কনের গায় হলুদে তার ব্যতিক্রম হয় নাই। বেশী রকমের আমোদ প্রমোদ নিস্তারিণীর স্বভাব বিরুদ্ধ, সুতরাং ভদ্র প্রতিবেশিনীরা অনেকক্ষণ ধরিয়া জটলা করিতে পান নাই। "ছোট লোকের" মেয়ে ছেলেরা কিন্তু তাঁহাকে অল্পে ছাড়িল না—কেননা তাঁর করুণার মিষ্ট হাসিটুকু দেবতার বৃষ্টিবিন্দুর মত ছোট বড় ভেদ করিতে জানিত না। এ কারণে গ্রামের গরিব দুঃখীরা বরের বাড়ীর দিকে বড় একটা না ঘেঁসিয়া কনের বাড়ী নির্ব্বিবাদে অক্রমণ করিল। নিস্তারিণী সেটা আন্দাজ করিয়া আগে হইতেই তৈল হরিদ্রার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন. রুক্ষ শিরে কাহাকেও ফিরিতে হইল না।

বাগদী বুড়ার বড় আনন্দ। সে পুত্রবধূ, পৌত্র ও পৌত্রীগুলিকে যথাসাধ্য তৈল হরিদ্রা নিষিক্ত করিয়া হাসিমুখে বউমার দিকে চাহিল। গদ গদ কণ্ঠে বলিল "ষোল সতের গোণ্ডা বয়েস হোল বউমা, কি বিশ গোণ্ডাই হয়, হরিশপুরে এমন পুণ্যির কাজ কাউরে করতে দেখিনি। বড় লোকে ঘটা করে বিয়ে দ্যায়, গরিবের মাতায় একটু ত্যাল কেউ দ্যায় না বাছা! ফট্‌কের বাপ যে বল্‌তো যেন আজা আম চন্দরের আজ্যি! আহা গরিব দুক্ষীর কত আশীব্বাদই কোড়লে মা!—ফুলি যেন তোমার মাছে ভাতে থাকে আর সুবচুনী করে এমনি দান ধম্মে যেন মতি হয়।"

শুনিয়া বউমা একটু একটু লজ্জিত হইলেন—চোক ছল ছল করিয়া আসিল। তৈল হরিদ্রা, হাস্য অশ্রুতে যুগপৎ মাখামাখি হইয়া গরিব দুঃখীরা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া গেল।

আসল আমোদ ফুলকুমারীর সখীদের মধ্যে। সুশীলাদের সঙ্গে কালীর ভাব হইয়া গিয়াছিল, অতএব সইয়ের গায় হলুদে তাহাকে আঠার আনা কর্ত্তৃত্ব করিতে সকলেই সহায়তা করিয়াছিল। ফুল মধ্যবর্ত্তিনী কুমারীগণের স্নানের ঘাটে আবির্ভাব হইলে সেখানে আর কাহারও ঠাঁই হইল না—ফুলের অনুনয় বিনয় ও মানা সত্বেও কালী প্রমুখ সখীগণ অল্প বিস্তর সাঁতার দিয়া পুষ্করিণীর আশ্রিত জলচরদিগকে ভীতি বিহ্বল করিয়া তুলিল।

মাতামাতি শেষ করিয়া পুরন্দর এতক্ষণে স্নানে যাইতেছিল, ছুটিতেছিল বলিলেই

বোধ করি ঐতিহাসিক সত্যের পূর্ণ গৌরব রক্ষা হয়। দূর হইতে ফুলকুমারীর দলকে দেখিয়া, বিশেষতঃ তিনি লজ্জায় মাঠের দিক্ দিয়া অপথে যখন ধাবিত হইলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। পলায়ণপর বরের হাতে একটা কিছু ছিল, তাহা লইয়া কুমারী সভায় বিষম তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল।

কেহ বলিল দর্পণ, কেহ বলিল জাঁতি। কাজল-লতা হাতে ক'নে লজ্জায় নিরপেক্ষ রহিলেন—কেবল সই ছুটিয়া পুরোদাদার হাতে জিনিসটা কি দেখিয়া আসিয়া তর্ক মীমাংসার সহায়তা করিতে চাহিলে তিনি অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে চিমটী কাটিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। অতএব কালীর আর নড়িবার সাধ্য রহিল না।

এপক্ষ লেখকের নিবেদন—বাস্তবিক এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিনে এই কাজল-লতা এবং দর্পণ জাঁতি রহস্যের একটা মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছে। আমার এক হাঁচি টিক্‌টিকি সম্প্রদায় ভুক্ত বন্ধু বলেন যে ঐ যে দেখ কাজল লতা, উহা মাতৃত্ব বোধক। জাঁতি রহস্য তিনি আজিও ভেদ করিবার অবসর পান নাই, কিন্তু দর্পণ সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয় যে উহা রূপজ, বর মুহুর্মুহু দেখিবেন তাঁহার রূপ যেন কন্যার মনোহরণ করিতে পারে। এই সম্প্রদায়ের পালটা গাওয়া যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের একজন বলেন যে জাঁতি ধারণ একটা ঐতিহাসিক চিহ্ন, বিবাহ যে শক্তিমূলক—তাহারই প্রমাণ, পুরাকালে তরবারি সহায়ে কন্যাহরণ চলিত, সেই অর্থ ব্যঞ্জক। কিন্তু জাঁতির স্থলে ছুরীর কেন ব্যবহার হয় না, তাহার তিনি সন্তোষকর কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না। আমার এক সদ্য বিবাহিত এবং তাম্বুল ও তাম্রকূট-প্রিয়বন্ধুর কথাটাই এ পক্ষে লাগে ভাল—তিনি বলেন বিবাহের কটা দিন তাম্বুলের যথোচিত সেবাই বোধ করি সুবুদ্ধি শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত। এখন মহাশয়দের যেরূপ অভিরুচি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তারপর বিবাহ। বৈশাখী প্রভাতে কিসলয় কুঞ্জে একদিকে কোকিল পাপিয়া বউকথাকওয়ের গান—আর এক দিকে ললিত রাগে রসনচৌকীর বৈবাহিক গীতি, দুই মধুরে লয় হইতেছিল। নব বৈশাখে বাস্তবিক একটা কেমন মিলনের ভাব আছে—হরিৎ ধরিত্রী যেমন নীল অনন্ত বিস্তৃত আকাশের মিলন জন্য উন্মুখ, নীচে সেই চির প্রহেলিকাময় গগন-রূপী মনুষ্য-হৃদয়, সেও বাঞ্ছিতের মিলন অভিলাষী।

নায়েব মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের বিবাহ, অতএব বর পক্ষে ধুমধামের কিছু বাকী রহিল না। প্রভাত হইতে না হইতে গ্রাম গ্রামান্তরের লোক হরিশপুরের দিকে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে মনিব জমীদারের প্রেরিত "আসবাবে" নায়েব মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গন ছাইয়া গেল। একটা হাতী এবং চারিটা ঘোড়া মায় তাহাদের ভৃত্যাদি জন্মম আসবাব গ্রামের বাহিরে দীঘির ধারের বটতলায় আসিয়া

আশ্রয় লইল। রাইয়ৎদের মধ্যে যাহারা মাতব্বর তাহাদের কেহ কেহ উপঢৌকন লইয়া আসিল—আর আসিল আহুত অনাহুত বাদ্যকরের দল। ঢাকের মহা শব্দে ঢোলের কড় কড়ানি ডুবিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে কোনরূপ ইতর বিশেষ বুঝা গেল না। যাহা হউক হরিশপুর গ্রামে একটা অভূত পূর্ব্ব জয়োল্লাস পড়িয়া গেল। অনেক লোকে স্নানাহার ভুলিয়া হস্তী এবং ঘোটক শিবির ঘেরিয়া রহিল। ছেলেরা হাতীকে পায়ে কুল আঁটির ভয় দেখাইয়া, কেহ বা গোদা পায়ের অবমাননা পূর্ব্বক অবিরল শ্লোক পড়িতেছিল। গজবর "চারার" প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, শ্লোক তাঁহার স্থূলচর্ম্ম এবং শূপকর্ণ ভেদ করিতেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু "মাহুত" ও "মেঠ" বাবাজীদের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। তাহার ফলে ছেলেদের পিতৃ মাতৃ কুল উদ্ধার হইতেছিল।

এ সকলে জগদ্ধাত্রীর বড় আনন্দ, কিন্তু দুই একটা ত্রুটির জন্য তাঁহার ধনগৌরব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। প্রথম নম্বরে স্বামী পুত্রবধূর অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির তেমন ব্যবস্থা করেন নাই, দ্বিতীয় বেশী আতস বাজীর বন্দোবস্ত করিতে বলার অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নাই এবং তৃতীয় নম্বরে এবং সর্ব্বোপরি পুরনের বিয়েতে মোটে একটা হাতী, কিন্তু তাঁর ভাইয়ের বিবাহে চারিটা হাতী আসিয়াছিল। অতএব অনুযোগের উত্তরে ঘোষ মহাশয় নিরর্থক ব্যয়াধিক্যের করুণ আপত্তি দীনভাবে পেস্ করিলে তাহাতে হুতাশনে আহুতি পড়িল। প্রকৃতির আইনে ঘাতের ধর্ম্ম প্রতিঘাত। সুতরাং নায়েব মহাশয় হাতীর মাহুতকে ডাকাইয়া তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন যে সে কেন "দানা" সঙ্গে করিয়া আনে নাই। এবং কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হওয়ায় নায়েবির প্রধান সম্বল স্বরূপ যে সম্বন্ধ বিরুদ্ধ এবং অভিধান বহির্ভূত বাক্যাবলী, সেই বাণ তাহার দিকে হানিলেন। এই গুরুতর কার্য্য শেষ করিয়া নায়েব মহাশয় তাম্রকূট সেবনে রত হইবেন, এমন সময়ে বাগদী বউ সুগুনির মা তাঁহার সমুখ দিয়া যায়। পাপিয়া যেমন সপ্তম হইতে একেবারে নামিয়া খাদে স্বর লহরী আয়ত্ত করে, ঘোষ মহাশয় তেমনি একেবারে ক্ষণিক পূর্ব্ব কঠোরতা ভুলিয়া তাঁহার সাধ্য মিষ্টভাব সংগ্রহ করিলেন। 'বলি, বাগদী বেয়ান যে বড় এদিকে! তা আপনাদের কাজেই ভোর, এ বাড়ীতে কি একবার আস্তেও নেই! আমিও ত বেহাই, পর ত নই!"

এখন সুগুনির মা এক অভূত পূর্ব্ব সঙ্কটে পড়িল—কেননা নায়েব মোশাই এই সবে প্রথম আজ বেহাইন সম্বোধন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। কাজেই সে জিভ্ কাটিয়া মাথার কাপড় টানিয়া জড় সড় হইয়া একধারে দাঁড়াইল। মহেশ্বর মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন—

"বেহাইন ঠাকরুণ শুন্চি নাকি ছোট লোক গুলোকে খুব তেল হলুদ বিলিয়েচেন। তা বেশ বেশ, তাঁর আর কে আছে—ছেলে ছিল না, জামাই হোল। জামাইকে দান

সামগ্রী কি রকম দেবেন, বউমাকে অলঙ্কারই বা কি দেবেন, তা কিছু জান বাগদী বেয়ান ?”

সুশুনির মা তখনও সামলাইতে পারে নাই, কম্পিত কণ্ঠে জবাব যাহা দিল তাহার অর্থ এই যে ফুলের মার যা কিছু আছে, সবই কন্যা জামাতার। কিন্তু উত্তরটা বৈবাহিক মহাশয়ের মনের মত হইল না। তিনি পুনশ্চ বলিলেন,

“তাত বটেই। তা কি জান বেয়ান, তবু লোক লৌকিকতাটা আছে। সেই জন্যে আমি ভাবচি যে মনিব মশায়েরা যে হাতী ঘোড়া পাঠিয়েছেন, তাদের খোরাকী টোরাকী গুলো বেহাইন ঠাক্‌রুণ সরবরাহ করেন। সে বেশ দেখাবে ভাল—লোকেও বুজ্‌বে আমি সমানে সমানে কাজ কর্‌চি। তা এই কথা তুমি বেহাইনকে গিয়ে বলো বাগদী বেয়ান। তাঁর যদি স্যাৎ অমত না হয়, তা হলে লোকজন সব পাঠিয়ে দেব।”

বাগদী বেয়ানের কোন কথা ফুটিতে না ফুটিতে ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রিয় খান সামা দুঃখীরামকে হুকুম করিলেন যে যত লোকজন বাহির হইতে আসিয়াছে, তাহাদের কনের বাড়ী দেখাইয়া দেয়। সেইখানে তাহাদের সিধা মিলিবে।

মহা-যজ্ঞ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—আহুতি।

২৭ শে ডিসেম্বর।

জাতীয় মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্বোধন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। আজি শুভক্ষণে উহার আহুতি আরম্ভ হইবে। আজিকার জ্বলন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ মহা সমারোহ দর্শনে মৃতপ্রায় অসাড়প্রাণও নব তেজ ও নব পরাক্রমে অনুপ্রাণিত হইয়া কেমন এক অনির্ব্বচনীয় সহর্ষভাবে আকুল হইয়া উঠে। একদিন এই বিশাল ভারতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামিকা, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের জননী, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি ও মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং পূর্ণবিকসিত জাতীয় জীবনের অগ্রনায়িকা পরমারাধ্যা মহাশক্তির আরাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক ইতিহাস তাহার অকপট সাক্ষী। এখনও প্রতি বর্ষে শরৎকালে এই মহাশক্তির মহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তানের গৃহে যেরূপ জীবন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তুলনা জগতে অতি বিরল।

আমরা নির্ভয়ে, অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে নব ভারতের এক প্রাণভূত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত প্রতিনিধিগণের অনুষ্ঠিত এই অভিনব জাতীয় মহাযজ্ঞের উদ্বোধন ও আহুতি উক্ত শারদীয় মহোৎসবের উৎসাহ ও উদ্দীপনার তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। জাতীয় শক্তির বিকাশ ও জাতীয় বৈভব সাধন উভয় উৎসবেরই সারভূত উদ্দেশ্য। উভয়ের উদ্বোধন ও আরাধন-পদ্ধতি অবশ্যই সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং তদ্ভিন্ন শারদীয় মহোৎসবে আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ অন্যান্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে; তৎসমুদায়ের উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। রাজনৈতিক শোভা ও সম্পদের তুলনায় উভয় উৎসবের উদ্দেশ্য সমান ভাবে গভীর, ইহাই উল্লেখ করা আমাদের অভিপ্রেত। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যদি কোন বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আর কিছু দিন পরে, শিক্ষিত ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সকলেই ভারতের শারদীয় মহোৎসবের ন্যায় এই অভিনব জাতীয় শক্তির উৎসবে একান্ত উৎসাহের সহিত মন প্রাণে নিমগ্ন হইবেন।

শারদীয় মহোৎসবের উদ্বোধন অবসানে ভক্ত হিন্দু বিশ্ব-জননী মহাশক্তির আরাধনার্থে যেরূপ ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত সপ্তমী পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, জাতীয় মহাযজ্ঞের অধিবাস অন্তে আজি বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত সহস্র সহস্র স্বদেশ-প্রেমিক সুসন্তান সেইরূপ ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত জননী জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নাম হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক উহার প্রথম আহুতির অনুষ্ঠানে পরস্পরে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছেন। আজি প্রভাত হইতে লোথার্ ক্যাসলের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই পরম পবিত্র প্রাণারাম দৃশ্য—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুসন্তানগণ হাসি মাখা মুখে ও হৃদয় ভরা প্রেমে দলে দলে পরস্পরকে প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন দান করিতেছেন—বিবিধ সদালাপ ও মধুর সম্ভাষণে পরস্পরের অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব আকর্ষণে চরিতার্থ হইতেছেন! আজি পুণ্যময় ত্রিবেণীতীর্থে অতুল প্রেম, অনন্ত-প্রীতি ও অটল বন্ধুত্বের রাজ্য বিস্তৃত হইল! যে কুৎসিৎ দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও আত্ম-বিদ্রোহে পবিত্র জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, আজিকার শুভদিনে তাঁহার হৃত সর্ব্বস্ব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত উক্ত ঘৃণিত প্রবৃত্তি সকল পুণ্য ভূমি প্রয়াগে জাতীয় মহাতীর্থে সম্মিলিত স্বদেশ-ভক্ত-মণ্ডলী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—আজি তাঁহাদের হৃদয় সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ! আজি সকলের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত প্রফুল্ল মুখের অনুপম-সৌন্দর্য্য-ভাতি দর্শনে বিশ্বাস-বিহীন-বিশুষ্ক-হৃদয় মনুষ্যেরও মন-প্রাণ বিমোহিত হয়!

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় জননীর পূজা আরম্ভ হইবে, উহার একঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই যজ্ঞ-মন্দির অবিরাম জন-স্রোতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। প্রায় ১,৫০০ প্রতিনিধি ও ৫,০০০ দর্শক মন্দির মধ্যে পৃথক পৃথক বিভাগে আসন অধিকার করিলেন। তদ্ভিন্ন মন্দিরের বাহিরের চতুর্দ্দিকে অনেক লোক দণ্ডায়মান হইয়া উহার আভ্যন্তরীণ শোভা সন্দর্শনে নিযুক্ত রহিলেন।

জাতীয় মহাসমিতির বিদ্বেষীগণ হয় ত নানা অসার প্রলাপ বাক্যে এই মহা-যজ্ঞের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদ ও কতই অলীক দোষারোপ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যেন কেহ এই কথা বলিতে সাহসী না হন যে বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক উশৃঙ্খল ছাত্রগণ, দুরাকাঙ্ক্ষী অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ এবং ভিক্ষাবৃত্তি-সম্পন্ন, অপরিতৃপ্ত, ইংরেজবিদ্বেষী যুবকগণকে লইয়া এই মহা-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভারতবাসীগণের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত নহেন। মহা সমিতিতে যে অল্পবয়স্ক প্রতিনিধি কেহই ছিলেন না, একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পদমর্য্যাদায় বিখ্যাত—রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতির আলোচনায় যাঁহাদের জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশ ব্যয়িত হইয়াছে,—স্বদেশের হিত সাধন ও ইংলণ্ডের সহিত ভারতের চির বন্ধুতা স্থাপনের চিন্তায় যাঁহাদের মস্তকের কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে,—সংক্ষেপতঃ যাঁহারা স্ব স্ব গভীর জ্ঞান, উদার হৃদয়, বিমল চরিত্র, প্রবল বহুদর্শিতা, ও উচ্চ-পদ-গৌরব হেতু কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রাণ-গত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভের যোগ্যপাত্র, এরূপ শত শত নির্ব্বাচিত মনুষ্য ভারতের নানা স্থান হইতে এই মহাযজ্ঞে সর্ব্বান্তঃকরণে সংলিপ্ত হইয়াছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সুপ্রসিদ্ধ সভ্য সুরাবৈরী কেন্, সহৃদয় স্যামুয়েল সন্ ও ভারত বন্ধু উইলিয়ম্ ডিগ্‌বী প্রভৃতি নিমন্ত্রিত মহাশয়গণ ইহার সাক্ষী। ভারত বিদ্বেষী অথচ ভারতের অর্থে পরিপুষ্ট পায়োনিয়র পত্রিকার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত য়্যালেন্ সাহেব ও স্বনাম প্রসিদ্ধ শিবপ্রসাদ প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিবর্গও ইহার সাক্ষী। শ্রীযুক্ত য়্যালেন মহাযজ্ঞের গূঢ় রহস্য স্বচক্ষে দেখিতে উহাতে নিয়মিত রূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহার কতিপয় ভক্ত ও বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উহাতে যোগদান অথবা উহার কার্য্যে ঘোর বিঘ্ন উৎপাদন করিতে ক্ষণকালের জন্য উহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের সমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ মহাযজ্ঞের মহাভাব পূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, চির জীবনের জন্য তাহা তাঁহাদের হৃদয়-পটে মুদ্রিত রহিবে।

আজি সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের সংখ্যা পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রধান নেতাগণ একে একে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, অমনি সহস্র সহস্র হৃদয় হইতে গভীর আনন্দের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব নৃপতিগণের বংশধরগণ বিবিধ নয়ন রঞ্জন বসন ও বহুমূল্য রত্ন-হারে বিভূষিত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে পূজনীয় হিউম্ স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইলেন, অমনি সমবেত প্রতিনিধিবর্গ ও দর্শক মণ্ডলী সসম্ভ্রমে

দণ্ডায়মান হইয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন--চারিদিক-ক্ষণকালের জন্য সহর্ষ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলে স্বস্বস্থানে উপবিষ্ট হইলে আবার চারিদিক গভীর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। অনন্তর একটি বিশেষ আমোদ জনক ঘটনায় সমবেত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। বিষয়টি বিশেষ গুরুতর না হইলেও অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ, এজন্য আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনা করি না। সভাপতি মহাশয় উপবিষ্ট হইলে পুনা নিবাসী জগমোহন দাস একটি সুদৃশ্য মূল্যবান রৌপ্য-পেয়ালা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তন্মধ্যস্থ ১৫০ টাকা মহাযজ্ঞে এবং পাত্রটি সভাপতি মহাশয়কে উপহার স্বরূপ দান করিলেন। অনন্তর সভাপতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন বিষয়ের প্রস্তাবকর্ত্তাগণ ১০ মিনিট এবং তৎসমর্থকগণ ৫ মিনিটকাল পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে পারিবেন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইলে প্রথম ঘণ্টাধ্বনি হইবে, তখনও যদি কাহারও কোন অত্যাবশ্যক বিষয় উল্লেখ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হইবে; কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্রই তিনি নিরস্ত ও উপবিষ্ট হইবেন। তৎপরে মান্দ্রাজের সুদক্ষ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নর্টন্ সাহেব এবং অপর দুই একজন প্রতিনিধি মান্দ্রাজ ও বেরার প্রভৃতি প্রদেশের কনগ্রেস্ কমিটির কার্য্য-বিবরণ সভাপতির সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জননী জন্মভূমির কল্যাণার্থে মহা যজ্ঞে যে যে বিষয় আন্দোলিত ও আলোচিত হইবে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান বিষয় আজিকার জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধন ভারতে সুশাসন ও সুব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন জন্য দীর্ঘকাল-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির বর্ত্তমান আকার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ও সুসংস্কার বিধানে নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক উহাতে প্রজাবর্গের যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা প্রণয়ন।

২। পব্লিক্ সার্ভিশ বিভাগের সংস্কার বিধান—সিভিল সার্ভিশ পরীক্ষার পরিবর্ত্তন, পরীক্ষার্থীগণের বয়ঃক্রম উনিশ বর্ষের পরিবর্ত্তে তেইশ বর্ষে পরিবর্দ্ধন, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এক সময়ে একরূপ প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং কার্য্য বিভাগে কতিপয় উদার ও সর্ব্বহিতকর নিয়ম প্রবর্ত্তন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত অনারেবেল কাশীনাথ ত্রিম্বক্ টেলাং বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ১ম প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তিনি বিবিধ সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতায় উল্লেখ করিলেন যে এই মহৎ কল্যাণকর প্রস্তাবটি নূতন নহে—গত চারিবৎসর হইতে জাতীয় মহা সমিতি উহার বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা করিতেছেন, এবং উহার পূর্ব্বেও উক্তবিষয় নানা স্থানে সম্যকরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের সফলতার উপর দেশের প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। এই হিতকর প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে সার অক্ল্যাণ্ড কলভিন্ ও লর্ড ডফরিণ যে ভ্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার যথোপযুক্ত সমালোচনায় তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ খণ্ডন করিলেন। লর্ড ডফ্রিণ তাঁহার বক্তৃতায় এদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী অথবা বৃটিশ্ পার্লামেণ্টের ন্যায় ব্যবস্থাপক প্রণালী স্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহান্দোলিত হৃদয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যে একান্ত অমূলক,তাহা তিনি কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্রমাণ করিলেন। তিনি সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে জাতীয় সমিতি গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন এবং তাঁহাদের হস্তস্থিত রাজকীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার আশা একদিনের জন্যও মনে স্থান দান করেন নাই—গভর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থা ও সুবিধান প্রবর্ত্তনে বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সংস্কার সাধন পূর্ব্বক এদেশের কোটি কোটি লোকের প্রকৃত সুখ-শান্তি পরিবর্দ্ধন করেন,উক্ত সমিতির ইহাই প্রাণগত উদ্দেশ্য।

অনন্তর সুবক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইবামাত্র চারিদিক হইতে গভীর করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল। প্রতিনিধি-ব্যবস্থাপক-সভাসম্বন্ধীয় প্রস্তাব তিনি দীর্ঘকাল হইতে সংবাদপত্রে এবং শত শত সভাস্থলে বিশেষ দক্ষতার সহিত বিবিধ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তিনি তেজস্বিনী বক্তৃতায় পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার প্রস্তাবিত বিষয় সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন জন্য ১৮৮৫।৮৬।৮৭ তিন বৎসরের জাতীয় সমিতিতে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে, তৎবিষয়ের পুনরুল্লেখ এক্ষণে একান্ত অনাবশ্যক। তৎপরে তিনি উক্ত বিষয়ের বিঘ্নস্বরূপ দুই একটি কথার উল্লেখ পূর্ব্বক স্যর অক্ল্যাণ্ড কল্ভিন্ ও লর্ডডফ্রিণ সংপ্রতি জাতীয় সমিতির প্রতি যে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার উল্লেখ করিলেন এবং ধীরভাবে তাঁহাদের ভ্রান্ত ও অসার মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্যর অক্ল্যাণ্ডের প্রতিবাদের পুনরুল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে জাতীয় সমিতির প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল কিন্তু উহার তৃতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত ও সহানুভূতি বিলুপ্ত হইয়াছে। জাতীয় সমিতির প্রথম দুই বৎসরের কার্য্যে যদি তাঁহার কোন আপত্তি না থাকে, তবে ন্যায়ানুসারে উহার তৃতীয় বৎসরের কার্য্যেও তাঁহার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ তৃতীয় বৎসরেও প্রথম দুই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট মন্তব্যগুলি পুনরালোচিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন যে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার একটি অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক বিধান —প্রবল পরাক্রমশালী মহৎ ইংলণ্ডের অনুগ্রহ ও সহায়তার উপর একটি পতিত মহৎ জাতির উত্থান ও উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জাতীয় সমিতি ইংলণ্ডের প্রসাদেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—উহা তাঁহার শাসন হইতে বিমুক্ত হইবার আশা একদিনের জন্য স্বপ্নেও ভাবে নাই—উহা তাঁহার শাসনকার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মাইয়া এদেশের বর্ত্তমান

অন্তঃসার শূন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলির সুসংস্কার বিধানের জন্য একান্ত যত্নবান, ব্যবস্থাপক সভাগুলি নূতন ভিত্তির উপর পুনরায় গঠিত হউক—উহাদের অর্দ্ধেক পরিমাণ সভ্য দেশীয় সুযোগ্য লোকদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নিয়োজিত হউক, এবং এদেশের বার্ষিক আয় ব্যয়ের বজেট প্রকাশ্য সভায় বিশেষরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হউক, ইহাই জাতীয় সমিতির অন্তরের বাসনা।

তিনি উপবিষ্ট হইলে পাটনার সুদক্ষ ব্যারিষ্টার সৈয়দ সরিফ্ উদ্দীন্ সংক্ষেপে তেজস্বিনী বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই জাতীয় মহাসমিতি ভারতের সকল সমাজের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে—জাতীয় সমিতির বিপক্ষগণ প্রথম বর্ষের সমিতিকে গণনার মধ্যেই আনেন নাই, দ্বিতীয় সমিতিকে বাঙ্গালীর সমিতি বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তৃতীয় সমিতিকে হিন্দু সমিতি বিবেচনায় তাহার প্রতি অনেক বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান চতুর্থ সমিতি তাঁহাদের নিকট ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় সমিতি নামে নিশ্চয় অভিহিত হইবে, কারণ উহার প্রতিনিধিগণের মধ্যে অযোধ্যার রাজ বংশীয় একজন সুদক্ষ মুসলমান এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানীয় সুশিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ দেড় শত মুসলমান উপস্থিত আছেন। তিনি স্বয়ং যে স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তত্রত্য প্রত্যেক মুসলমানের এই মহাসমিতির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি আছে; একাল পর্য্যন্ত যে যে স্থানের মুসলমানগণ ইহাতে যোগদান করেন নাই, তাঁহারাও অতি সত্বর উহাতে সংযুক্ত হইবেন, কারণ এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য অতি গভীর, অতি মহৎ।

তৎপরে অযোধ্যার অন্তর্গত কাল কঙ্করের রাজা রামপাল সিংহ, লক্ষ্ণৌর ব্যারিষ্টার পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর, দিল্লীর প্রধান বণিক উমরাও মির্জ্জা এবং পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লাজপৎ রায় মহাশয়গণ ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সহকারে উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। লাজপৎরায় জাতীয় সমিতির মহাশত্রু সার সৈয়দ আমেদের পূর্ব্বের লিখিত এবং কথিত অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, এক সময়ে তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, "এমন দিন নিকটস্থ প্রায় যে দিনে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলি যথার্থই প্রতিনিধি সভারূপে পরিগণিত হইবে—এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া উহাতে নিয়োজিত হইবে।" ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মত তাঁহার "সিপাহী বিদ্রোহের কারণ" নামক প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ১৮৭৩সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর স্যর অক্ল্যাণ্ড কলভিন এবং লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল গ্রেহাম কর্ত্তৃক ইংরাজিতে অনুবাদিত হয়। ইহাতে ভারতের জন্য পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত লেখক প্রার্থনা করেন। কিন্তু এখন ইনিও সায়েদ আহম্মদের ন্যায় কনগ্রেসের ঘোর বিপক্ষ। অনন্তর তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন,

ছিলেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার জীবনের পরিণত অবস্থায় মহাপণ্ডিত বেকের কুমন্ত্রণা পরিচালিত হইয়া উহার সম্পূর্ণ বিপরীত অতিকুৎসিৎ মত পোষণ করিতেছেন!

তদনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি সালেম রাম স্বামী মুদ্‌লিয়ার উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদনার্থে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন ভারতবর্ষে ফ্রান্সের অধিকৃত রাজ্য সমূহে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা প্রচলিত আছে—তত্রত্য প্রজাবর্গ উক্ত সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক নিযুক্ত করিতে সমর্থ। তথায় রাজত্ব সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় ও বার্ষিক আয় ব্যয় স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচিত এবং বিস্তর বাদানুবাদের পর অনুমোদিত হয়। তিনি বলিলেন সংপ্রতি মান্দ্রাজের ইংরাজ-বণিকসমিতি (Chamber of Commerce) তথায় প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি আবেদন পত্র লিখিয়াছেন। অনন্তর উক্ত পত্রখানি পঠিত হইল। রামস্বামীর বক্তৃতা কালে স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা শিবপ্রসাদ রাজ-পারিষদের বেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতাগণের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি মঞ্চের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব সংশোধনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। ভারতের ছদ্মবেশী শত্রু কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড অথবা অন্য কোন ইয়ুরোপীয় দেশের কোন রাজনৈতিক সভাস্থলে শিবপ্রসাদ প্রকৃতির কোন লোক উপস্থিত হইলে উপহাস, ধিক্কার ও তিরস্কারের গভীর গর্জ্জনে ভীত ও অপমানিত হইয়া তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত। শিবপ্রসাদের পরম সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞা ভাব প্রদর্শিত হয় নাই; অথবা জাতীয় মহাযজ্ঞের নেতাগণ জননীর পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জননীর ভ্রান্ত ও অবোধ সন্তানের প্রতি কোনরূপ অনাস্থা প্রদর্শন সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না—দ্বেষ, হিংসা ক্রোধ ও ঘৃণা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয় তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে সাহস করিল না—তখন তাঁহারা জাতীয় মহা শক্তির আরাধনায় নিমগ্ন—তখন তাঁহাদের হৃদয় গভীর সাত্ত্বিকভাবে উদ্বেলিত। দু একবার কেবল ঘৃণাসূচক হিস্ হিস্ শব্দ শুনা গিয়াছিল। কিন্তু তাহাও কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসীদিগের মুখ হইতেই নির্গত হইয়াছিল। শিবপ্রসাদ কোন বাধা না পাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমরা সকলেই জাতীয় সমিতির নিকট ঋণী, কিন্তু কতকগুলি নির্ব্বোধ লোক সংবাদ পত্রে ও পুস্তকে রাজবিদ্রোহজনক প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে।" এই কথা বলিবামাত্র চারিদিক হইতে শত শত লোক গভীর গর্জ্জনে 'না' 'না' বলিয়া তাঁহার অসার বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন। শিবপ্রসাদ এই প্রতিবাদ বাক্যে বিচলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষ এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা সকল বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী

এবং পৃথিবীর অপর কোন দেশ ভারতবর্ষের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করে না। তিনি এই ভয় করেন যে উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তক প্রচারে মূর্খ প্রজাগণ রাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।" তখন চারি দিক হইতে প্রতিবাদের গভীর গর্জ্জন উত্থিত হইল। অনন্তর তিনি বক্ষস্থলের বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া কম্পিত কণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল। উহাতে দেশীয় সংবাদ পত্রের রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক বিষয়ক বক্তৃতাদি বন্ধ করিবার জন্য অনেক অসার কথা লিখিত ছিল। আবেদনপত্র পাঠকালে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর প্রতিবাদ সূচক বাক্যে যজ্ঞ-মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সভাপতি ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাকে অন্যান্য প্রস্তাবকারীর অপেক্ষা দ্বিগুণ সময় দান করিয়াছিলেন। যখন তিনি সমবেত সভ্যগণের বিশেষ অপ্রিয় ভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং পায়োনিয়ার পত্রিকার সংবাদ দাতা তথায় উপস্থিত আছেন কিনা তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন।

অনন্তর পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরন্‌ওয়ালার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মাধব আলি, বারাণসীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সাধুলাল এবং উকীল শ্রীযুক্ত নেওয়ালকিশোর বাজপাই ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। শ্রীযুক্ত নেওয়ালকিশোর বাজপাই শিবপ্রসাদ ও কাশীর মহারাজার পক্ষীয় একজন প্রধান উকীল। তিনি তেজস্বিনী বক্তৃতায় বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের অসার প্রলাপ বাক্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। মাধব-আলি নিতান্ত ক্ষোভ ও আক্ষেপ সহকারে বলিলেন যে একদিন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষগণ ইংলণ্ডের সম্মান রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য পলাসী ক্ষেত্রে এবং পঞ্চনদ-ভূমির ভীষণ সমরাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন আহুতি দান করিয়াছিলেন, আর আজি তাঁহাদেরই বংশধরগণ—যাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের জ্বলন্ত আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন—রাজবিদ্রোহী বিবেচনায় সন্দিগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার স্বাধীনতা প্রিয়তা, স্বদেশানুরাগ ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপরে পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোলকনাথের প্রস্তাবে ও বুলন্দ সহরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিহারী লালের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে মূল প্রস্তাবে পঞ্জাব বিভাগে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের প্রার্থনাও সন্নিবিষ্ট হউক। পরক্ষণেই উক্ত প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—সিভিল্ সার্ভিশ পরীক্ষার সংস্কার ও গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত উচ্চ রাজ কার্য্যে যোগ্যতা অনুসারে অধিক পরিমাণে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র, মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আর্ড্‌লে নর্টন্‌ বিবিধ সুযুক্তি পূর্ণ, সারগর্ভ, সুদীর্ঘ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। ইঁহার সুন্দর বাক্‌পটুতা ও ভারতবর্ষের প্রতি প্রাণগত ভক্তি ও জ্বলন্ত অনুরাগ দর্শনে সভা-মধ্যে আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় না বুঝিয়া স্যর অক্‌ল্যাণ্ড্‌ কল্‌ভিন্‌ ও লর্ড ডফ্‌রিণ উহার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহার যথোচিত প্রতিবাদ করিলেন। অনন্তর উল্লেখ করিলেন যে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে এদেশীয় লোকের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগের বিষয় পার্লামেণ্ট মহাসভায় আলোচিত হইয়াছিল; সুপ্রসিদ্ধ স্যার্‌ রবর্ট্‌ পিল্‌, লর্ড ল্যান্সডাউন্‌, (বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধির পিতামহ) এবং স্যর্‌ চার্লস্‌ গ্র্যাণ্ট্‌ প্রভৃতি রাজনীতি-বিশারদ মহাশয়গণ উহার অনুকূলে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি সৎকার্য্য প্রভাবে স্বীয় পিতামহের সুযোগ্য পৌত্র রূপে সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান অধিকারে সমর্থ হইবেন। তৎপরে তিনি গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত পব্‌লিক্‌ সার্ভিস কমিসনের রিপোর্ট ও উহার সভ্য শ্রীযুক্ত রাম স্বামী মুদ্‌লিয়ার ও জষ্টিস শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মন্তব্যের সমালোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

(ক) ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক।

(খ) এই এককালীন পরীক্ষায় মাননীয়া মহারাজ্ঞীর সকল শ্রেণীর প্রজার সমান প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(গ) এই উভয় দেশীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের যোগ্যতা অনুসারে একমাত্র তালিকা প্রস্তুত হইবে।

(ঘ) সিভিল সার্ভিস কমিসনরগণ পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয় সকলের মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীর প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করিবেন।

(ঙ) পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের বয়ঃক্রম উনিশ বৎসরের নিম্ন অথবা, স্যর চার্লস্‌ এচিসনের অনুমোদন অনুসারে তেইশ বৎসরের অধিক না হয়।

(চ) ইংলণ্ডে ও ভারতে এককালীন পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে প্রথম কর্ম্মের জন্য ষ্টাটুটরি সিবিল সার্ভিস প্রথার অবরোধ করা হয়।

(ছ) ষ্টাটুটরি বিভাগের কর্ম্মে যোগ্যতানুসারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, মুন্সিফ, (Uncovenanted Service) এবং উকিল ও ব্যারিষ্টার প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হয়।

(জ) যে সকল কার্য্যে কেবল বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দান আবশ্যক অথচ যাহাতে কভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিসের লোকের আবশ্যক নাই, প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা অনুসারে

তাহাতে লোক নিযুক্ত হউক। ঐ সকল পরীক্ষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা হউক; উক্ত প্রদেশবাসী প্রত্যেক সুজাত সন্তান উক্ত পরীক্ষা দানে অধিকার পাইবে। উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত না হইলে এদেশীয় লোকের পরিতৃপ্তি হইবে না।

উপসংহারে তিনি বিনীত ভাবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতিজ্ঞ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এদেশের হিতের জন্য যেরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে সহানুভূতি দান করিতেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণ পূর্ব্বক কার্য্য করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মহারাজ্ঞী ভারত শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক জগতের সম্মুখে পবিত্র ঈশ্বরের নাম লইয়া যে মহা ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মহৎ বাক্যগুলি স্মরণ ও অনুসরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে তাঁহারা এদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাণীর সেই মহা ঘোষণা এই—"তাহাদের (ভারতবাসীগণের) সুখ শান্তি ও উন্নতিতেই আমাদের বল, তাহাদের ভালবাসাতেই আমাদের নিরাপদ এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতাতেই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদের অধীনস্থ ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারীগণকে, আমাদের প্রজাবর্গের হিতার্থে আমাদের এই সকল ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত শক্তি দান করুন।"

তিনি উপবিষ্ট হইলে বোম্বাই নগরের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ফেরোজসা মেটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। অনন্তর মান্দ্রাজের পাইচাপা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অ্যাডামস্ সাহেব উহার সংশোধন প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে মূল প্রস্তাবের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সিভিল্ সার্ভিশ পরীক্ষা এক সময়ে ইংলণ্ডে ও ভারতে গৃহীত হয়, ইহাও তাঁহার আন্তরিক বাসনা, কিন্তু তাঁহার একান্ত ইচ্ছা এই যে, ভারতবর্ষে গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ইংলণ্ডীয় সামাজিক, নৈতিক এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং আবশ্যক হইলে আর একটি পরীক্ষা দান পূর্ব্বক যোগ্যতানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে তাঁহারা স্বদেশীয়গণের মধ্যে সুশাসন বিস্তার এবং সমকক্ষ ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণের সহিত সমান দক্ষতা ও ঐকমত্য সহকারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীযুক্ত শঙ্কর মনন্ এই নূতন প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। এতদুপলক্ষে সভাস্থলে ঘোর মতভেদ ও ঘোরতর প্রতিবাদের উপক্রম দৃষ্টে এবং সন্ধ্যা সমাগম বিধায় সভাপতি দ্বিতীয় প্রস্তাব তৎপর দিবস পুনরালোচনার জন্য স্থগিত রাখিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভার কার্য্য অবসানে সকলে মহোৎসাহে পরস্পরের সহিত বিবিধ তর্ক বিতর্কে রত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

জাগো।

বালিকার রচনা

শীত ঋতু গেল ওই দারুণ হিমানী-ভরা,
মধুরে আগত মধু, জাগো জাগো বসুন্ধরা!
মলয় অচল হতে সুরভি মাখিয়া গায়,
নমিছে চরণে তব মৃদুল দাখিণা বায়।
ঘুচেছে গো বিষাদিনি, বিরহ যাতনা তব,
মিলন বারতা লয়ে এসেছে এ বায়ু নব।
উদিছে বসন্ত রবি হের গো পূরবাচলে,
রক্ত কোকনদ যেন নিথর নীলিম জলে।
আরতি করিছে তোমা মধুর আলোক দিয়ে,
কুয়াসার ধূমরাশি দিতেছে গো সরাইয়ে।
নবীন পল্লব দিয়ে সাজায়ে নিকুঞ্জ বন,
রচিছে প্রকৃতি দেবী বসন্তের সুখাসন।
বকুল কাননে বসি, মধুর মিলন গান,
গাইছে মধুর সখা ছাপিয়া কানন প্রাণ।
শ্যাম বাসে ঢাকি তনু ফুল দাম লয়ে করে,
সমাগত ঋতুরাজ নেহার গো প্রেম ভরে।
চেয়ে দেখ চারি ধারে লতারে লতায়ে কিবা,
ললিত লতিকা রাজি বিকাশিছে শ্যাম বিভা।
হিম কণা বিরাজিত বিশুষ্ক প্রান্তর পরে,
বাসন্তি কুসুম কত ফুটিয়াছে থরে থরে।
হাসি হাসি মুখগুলি পাতায় আধেক ঢাকা,
সলাজ চাহনি চারু নবীন মাধুরী মাখা।
মাজিয়া চিকণ গলা সাধি সপ্ত স্বরগ্রাম,
তুলিছে পঞ্চমে তান পিককুল অবিরাম।
পাপিয়া লহরী তুলে চলেছে গগন গায়,
'জাগো জাগো ধরা রাণি' সবে বুঝি বলে যায়
মুকুলিত চূত তরু, মধুপ ঝঙ্কারে তায়,
জাগো গো বসুধা রাণি, শীত নিশি ওই যায়!

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

হেঁয়ালি নাট্য।*

তত্ত্বজ্ঞানী প্লুটার্ক ও তাঁহার শিষ্য

প্লুটার্ক। অহংকারের বিসর্জ্জনই সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে অহং বলিয়া বিশ্বসংসারে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, তুমি আমি সকলি সেই এক পরমাত্মাময়।

শিষ্য। কিন্তু কি করিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিব প্রভু? আমি যখনি মনে করি

---

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর—বাহবা। শ্রীমতী বসুমতী দেবী ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

এ বিশ্বসংসারে আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তখনি জগৎ সংসার হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে থাকি।

গুরু। বৎস জিতেন্দ্রিয় হও, মনঃসংযম অভ্যাস কর, তাহা হইলেই এই দ্বৈত ভাবাপন্ন সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব অনুভব করিবে।

শিষ্য। সর্ব্বক্ষণই ত ভাবি মনঃসংযম করি—কিন্তু কি করিয়া করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

গুরু। মনঃসংযম—অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমন। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি জয়ী হইলেই সত্যের আলোক দেখিতে পায়।

শিষ্য। ভগবান, যে মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে—আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন।

গুরু। ইহার অন্য কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই—নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা, একাগ্রতাই প্রবৃত্তি দমনের একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র উপায়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হও—প্রথমে ক্রোধ দমন কর। অহংকার হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। যদি আমি জানি সংসারে আমি তুমি নাই তাহা হইলে কেই বা ক্রোধ করে—ক্রোধের পাত্রই বা কোথায়? ক্রোধ অহংকারকে জাগাইয়া রাখে—সুতরাং ক্রোধ মহা অনর্থের মূল। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে অজ্ঞানতার উদয়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ক্রোধ দমনীয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—কিন্তু তথাপি ক্রোধের উদ্রেক তিরোহিত করিতে পারিতেছি না।

গুরু। অজ্ঞান! অজ্ঞান!

শিষ্য। প্রভু,যখন দুষ্ট দাস আপনার শিষ্টাচার ও সৌজন্যকে আক্রমণ করিয়া গালিবর্ষণ করিতেছিল—আমি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি নাই। এ অজ্ঞানতা"—

গুরু। আবার সে গালি পাড়িতেছিল?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

দাসের প্রবেশ।

গুরু। বৎস, দোষ সর্ব্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।"

শিষ্য। যে আজ্ঞে।

দাসকে বেত্রাঘাত।

দাস। (সক্রোধে) আমি কি দোষ করিয়াছি? বিনা দোষে আমাকে কেন মারিতেছেন?

(পুনশ্চ বেত্রাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সক্রোধে গুরুর প্রতি) ভণ্ড তপস্বি এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা? এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান? তুমি অন্যকে ক্রোধ দমন করিতে

উপদেশ দাও, সংযমী হইতে বল, আর নিজে অন্যের উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়া ক্রোধহীনতার দৃষ্টান্ত দেখাও।”

প্লুটার্ক। (স্থির গম্ভীর ভাবে) হতভাগ্য, পাষণ্ড, কি দেখিয়া তুই মনে করিলি আমি রাগিয়াছি? আমার মুখ, আমার স্বর, আমার বর্ণ, আমার বাক্য কিছুতে কি ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয় নাই, মুখ রক্তবর্ণ কিম্বা স্বর ভয়ঙ্কর হয় নাই, আমি বেত্র সঞ্চালন করিতেছি না—কিম্বা দাপা দাপি মাতামাতি করিয়া বেড়াতেছি না, আমার মুখে ফেন নির্গত হইতেছে না—এবং এমন কোন কথা বলি নাই যে জন্য পরে আমার অনুতাপ করিতে হয়। রে মূঢ় জানিয়া রাখ এই সকলই ক্রোধের লক্ষণ। (শিষ্যকে বেত্রাঘাত বন্ধ করিতে দেখিয়া) বৎস ইহাতে আমাতে যতক্ষণ এই বিষয় লইয়া বিচার চলিতেছে—ততক্ষণ তুমি তোমার কাজ করিতে থাক। থামিবার আবশ্যক নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আদর। (সন্তানের প্রতি) ঈশ্বরের বন্দনা সম্বলিত। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীমদনলাল বর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত। পুস্তকখানি সন্তানের অনুরাগে পূর্ণ, তবে দুঃখের বিষয় এই, ইহা পড়িয়া বইখানির প্রতি কাহারো অনুরাগ হয় না।

ওরে বাছা যাদু-ধন! উজলিলে এভুবন,
কোথা হ'তে জনমিয়ে মোহিতে আমায় রে?
এলে কি স্বরগ হ'তে? তাত! লয় হেন, চিতে,
স্বরগীয় ভাবে ভরা নেহারি তোমায় রে। (১)
কি লাগিয়ে বাছা-ধন! কর রে তবে রোদন?
খে'লে ত হাসির ছটা সুরলোক-মুখে রে;
ছাড়ি সেই সুরলোকে, পড়িয়াছ মর্ত্তলোকে,
ফেল কি আঁখির জল তাই মনোদুখে রে? (২)
না কি তোমা যাদু-ধন! স্বর্গে হ'তে কোন জন,
খেদায়ে দিয়াছে হেথা হইয়া বিবাদী রে?
মরমে পাইয়া ব্যথা, মুখে নাহি সরে কথা,
গুমরি গুমরি তাই উঠ কাঁদি কাঁদি রে? (৩)

ত-নয় তা-নয় মনে, ভাবিনু তা পরক্ষণে,
সুরপুর জনে তোমা কি দোষে খেদাবে রে ?
দেব-তুল্য ভাব তব, অসদ্ভাব অসম্ভব,
বিসম্বাদ সাধি কেন তোমায় কাঁদাবে রে ? (৪)
তবে বুঝি স্বর্গ হ'তে, উরিয়াছ এ নরতে,
সাধিতে মানব-হিত শিশু-রূপ ধরি রে ?
দেখি কি যাতনা রাশি, পীড়িছে মরত-বাসী
দয়া-রসে গ'লে কাঁদ গুমরি গুমরি রে ? (৫)

প্রেম ও ফুল। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত।

পুস্তকখানি আমাদের বড় ভাল লাগিল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই কবিত্ব পূর্ণ। আমরা আদরের কবিতার নমুনা পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছি, সেই একই রূপ ভাবের কবিতা প্রেম ও ফুল হইতে এইখানে একটি উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখুন দুটির মধ্যে কিরূপ প্রভেদ।

প্রমদা।

১

প্রমদা স্বর্গের শিশু বালিকা আমার!
শারদ পূর্ণিমা রেতে, আসিলি কি চাঁদ হ'তে
খসিয়া একটী ক্ষুদ্র কিরণ তাহার,
পথ ভুলে প্রমদারে পরাণে আমার ?
অথবা উষার আলো, ভুলে তোরে ফেলে গেলো,
আঁচলের গাঁট খুলে পড়েছিলি তার,
প্রাণময়ি প্রমদারে পরাণে আমার ?

২

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
প্রমদা, সোণার পরী শিশুটী আমার!
মলয়া পলা'য়ে যেতে, পড়েছিলি কোল হ'তে,
চুরি করা কুসুমের পরিমল তার ?
কমল লাবণ্য খুলে, তোরে থুয়েছিল ভুলে,
শারদ-সায়াহ্নকালে কোলে সারদার ?
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার ?

৩

দেখিছি যামিনী কালে, বেষ্টিত তারকা জালে,
অকূল অসীম নীল নভ কলেবর,
তা' হইতে পড়ে ছুটি, মাঝে মাঝে দুই একটী,
ক্ষুদ্র সে জ্যোতির বিন্দু কোমল সুন্দর!
তুই কি একটী তার, কোলে এসে সারদার,
পড়েছিলি না বুঝিয়া দিশাহারা হয়ে ?
কি ছিলি ?
চাঁদের অমিয়া ছিলি ? ফুলের সুবাস ছিলি ?
উষার আলোক ছিলি ? কমলের হাসি ছিলি?
কি ছিলি ?
আকাশের তারা গেলি আকাশে মিশা'য়ে ?

৪

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার ?
এখনো কাঁদে যে প্রাণ, জ্বলিতেছে মর্ম্মস্থান,
এখনো নয়নে বহে শত অশ্রুধার!
এখনো সারেনি ভুল, দেখিলে কমল ফুল,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
দেখিলে উষার কোলে, অরুণ শিশুটী খেলে,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
সায়াহ্নে তারকা সবে, দেখিলেই ভাবি তবে,
ইহারি একটী হবে প্রমদা আমার!
যদি ফুলবাস পাই, কোল বাড়াইয়া যাই,
মনে ভাবি আ'সে বুঝি প্রমদা আমার!

৫

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার!
শুনেছি শচীর গলে, পারিজাত হার দোলে,
তুই কিরে ছিলি তার মণির মন্দার ?
অথবা—
কা'র বুক খালি ছিল,তোরে দিয়া পূরাইল—
কোন্ সেই ভাগ্যবতী সুর-অঙ্গনার ?
এই কি বিধির বিধি—এই কি বিচার ?

৬

আহা হা!
সেই যে বৈশাখ,—পোড়া কপাল আমার!
এখনো স্মরিতে বহে শত অশ্রুধার!
এখনো এখনো হায়, দেখি যেন বিছানায়,
শিরীষ কুসুম সেই তনু সুকুমার,
অবশ পড়িয়া আছে, অভাগিনী ব'সে কাছে,
কাতর নয়নে তোরে চাহে বার বার!
বোঝেনি সে হতভাগী,যাস্ যে জন্মের লাগি,
জীবনের সুখ-শান্তি লইয়া তাহার!
বোঝেনি সে জ্ঞানহীনা, ফিরে আর আসিবি না,
ভুলিবি স্বর্গের সুখে পাপের সংসার!

৭

তখনি মুহূর্ত্তে পুনঃ—
দেখিতে দেখিতে কণ্ঠ অন্তিম হিক্কায়,
কাঁপিয়া উঠিল যে রে হায়! হায়! হায়!
ঘরের বাহির করি, কেহ বলে হরি হরি,
নয়ন ঢাকিয়া দিল তুলসী পাতায়!
স্খলিত তড়িত মেঘে, ছুটিয়া আসিয়া বেগে,
অভাগী সারদা পড়ে আছাড়ি ধরায়!
কাঁদে পরিবার যত, হাহাকারে অবিরত,
কে কা'রে প্রবোধে, সবে পাগলের প্রায়!
কেহ শিরে কর হানে,কেহবা ব্যথিত প্রাণে,
ডাকিছে আকুল কণ্ঠে "প্রমদা কোথায়!"
সে উচ্চ ক্রন্দন রোল, ঘন ঘন হরি বোল,
অভাগিনী সারদার "হায়! হায়! হায়!"
সব দেখিলাম চক্ষে, সব সহিলাম বক্ষে,
নিকটে দাঁড়া'য়ে আমি পাষাণের প্রায়!

৮

এ কি ?
আবার সে উচ্চ রোল,আবার সে হরিবোল,
প্রাণময়ী প্রমদারে কোথা নিয়ে যায় ?
"দিব না দিব না নিতে, দিব না সমাধি দিতে"
কাড়িয়া সে পাগলিনী কোলে নিতে চায়!
কি সে এলোমেলো বেশ, উগ্রচণ্ডী—মুক্তকেশ,

ছুটিল সে বৎসহারা বাঘিনীর প্রায়!
কি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ছাই ভস্ম হৌক বিশ্ব!
ভাবিতে পারি না, প্রাণ আতঙ্কে শুকায়!
সেই যে জন্মের শোধ দিয়েছি বিদায়!

৯

প্রমদা!
সেই যে, মুকুতা দন্ত—সহাস-আনন,
সেই অর্দ্ধ উচ্চারিত "বা ব্বা" সম্বোধন!
সেই দিবা অবসানে শ্যাম সন্ধ্যা বেলা,
জননীর সনে তোর ত্রিদিবের খেলা!
তারা ভরা চাঁদ ভরা নিরখি গগন,
সুধা ভরা মুখে তুই হাসিতি যখন,
দেখি তোরে হাস্যময়ী আনন্দের ডালি,
আদরে সারদা কত দিত করতালি!
গোপনে দাঁড়া'য়ে সেই একেলা একেলা,
দেখিতাম অভাগীর মেয়ে নিয়ে খেলা!
স্মরিতে এখনো উহা কেঁদে উঠে মন,
ভুলিবনা প্রমদারে জনমে কখন!

এই ভাব-প্রধান কবিতাটির মধ্যে ৭ চিহ্নিত ছত্রগুলি কেবল না থাকিলেই ভাল হইত।

প্রকৃতির শিক্ষা। পুস্তক খানিতে লেখকের নাম নাই। নানা সময়ে লেখকের মনে যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছে সেই ভাবগুলি সুন্দর ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্যে ভাবের বিন্যাস বড়ই সুললিত হইয়াছে। লেখক অন্ধকার সম্বন্ধে একস্থানে বলিতেছেন—

প্রকৃতির নিশীথ-শিক্ষা যে কি গম্ভীর, তাহা স্বয়ং না বুঝিলে কেহ বুঝাইতে পারে না। অন্ধকারের মাহাত্ম্য কত বিশ্বাসী সন্তানের প্রাণে বল বিধান করিয়াছে, নিশীথে নীরব নৈসর্গিক শোভারাশির মধ্যে আত্মহারা কত অবিশ্বাসীর হৃদয় অনন্ত বিস্ময়রূপ বিশ্বাসের বীজ গ্রহণ করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বিপ্লাবক লুথার, কোন কারণে সন্ত্রাসিত কয়েকটী বন্ধু কর্তৃক তাঁহার নির্ভীকতা বিষয়ে পৃষ্ট হইলে বলিয়াছিলেন—"আমি ভীত হইব কেন? আমি দুইটী রহস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া থাকি, তাহাতে আমি পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর শিক্ষা করি। দিবসে আকাশের পানে চাহিয়া দেখি, কত মেঘরাশি চলিয়াছে, তাহাদের অতিক্রম করিয়া দেখি, জগতের চক্ষুরূপী দিবাকর! ইহারা স্ব স্ব স্থানে রহিয়াছে, কিন্তু কোন শৃঙ্খলে ইহারা আকৃষ্ট ও আবদ্ধ নহে। তথাপি ইহারা স্থান-চ্যুত হয় না! রজনীতে আবার আকাশের দিকে তাকাই, দেখি অগণ্য নক্ষত্রমালা;—এই তারকাখচিত আকাশকে ধারণ করিতেছে কে? কোন স্তম্ভ নাই, তথাপি সকলই উচ্চে রক্ষিত হইতেছে।—তখন আমার মনে হয়, যাঁহার শক্তি এই সূর্য্য, এই নক্ষত্ররাজি, এই মেঘদল, সকলকে যথাস্থানে ধারণ করিয়া আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি কি না করিতে পারেন?—আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার এবং আমার কর্ত্তব্যের ভারও তিনি লইতে পারেন। কেন আমি তবে ভীত হইব? তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া

যাহা কর্ত্তব্য বুঝি, তাহাই করা ভিন্ন আমার অপর কিছুই ভাবিবার নাই!" *—প্রথিত-নামা দর্শনবিৎ ক্যাণ্ট বলিয়াছেনঃ—"ছুইটী বিষয় আমার প্রাণে গভীর রহস্য ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। প্রথম, নিশীথে আকাশব্যাপী অগণ্য তারকাবলী; দ্বিতীয়, মানব-অন্তরে কর্ত্তব্যের দায়িত্ববোধ!" ভক্ত বিশ্বাসী দায়ুদ নৃপতি নৈশ গগনের অনুপম মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ—"হে বিধাতঃ! যখন আমি তোমার অনন্ত আকাশে তোমার হস্তের কীর্ত্তি দেখিয়া আলোচনা করি,—তুমি যে সুন্দর সুধাকর এবং নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছ, তাহা যখন ভাবি তখন মনে হয়, মানুষ কি, কোথাকার কীটানুকীট যে, তুমি অনন্ত পুরুষ! তাহার তত্ত্ব লও, বা তাহার প্রাণে প্রকাশিত হও!" †

বিষাদ সিন্ধু। উদ্ধার পর্ব্ব। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত। বিষাদ সিন্ধু মহরম-পর্ব্বে এজিদ কর্ত্তৃক হাসেন হোসেন কিরূপে হত হইলেন তাহাই বিবৃত হইয়াছিল—উদ্ধার পর্ব্বে হাসেন হোসেনের দল কর্ত্তৃক এজিদের পরাজয় এবং উঁহাদের বংশধর জয়নালের উদ্ধার কথিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও উপন্যাসের মত লিখিত সুতরাং বড়ই সুখপাঠ্য। তবে প্রথম খণ্ডের ভাষা দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।

উদ্ধার পর্ব্বে বিষাদ সিন্ধুর আখ্যান ভাগ সমাপ্ত হয় নাই, ইহার তৃতীয় খণ্ডের জন্য আমরা প্রত্যাশিত হইয়া রহিলাম।

---

* Nature's wonders, by Dr. Newton.

† Eighth Psalm.

মানবীকরণ বটে।

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা "মানবীকরণ" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যে তিনটী প্রস্তাব লিখিয়াছি সেই সমুদয়েই দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত যুক্তির আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমরা যে বিষয় প্রতিপাদন করিব বলিয়া প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, সেই বিষয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই বলি নাই। আগামী প্রস্তাব হইতে আমাদের নিজের প্রতিপাদ্য প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু প্রতিপাদ্যটী যে ভাষায় প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। যদি দ্বিজেন্দ্র বাবুর সেই শব্দ-পরিবর্ত্তনে আপত্তি থাকে, তবে অগ্রেই তাহার মীমাংসা করার প্রয়োজন। এ জন্য আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম।

[প্রভাত বাবুর নিজের লেখনী তাঁহার নিজের ঘোটক; যখন যে দিকে তাঁহার প্রাণ চায় তখন সেই দিকেই তাহাকে তিনি দৌড় করাইতে পারেন। তবে যদি দেখি যে, অশ্বটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া চারিদিকে বেজায় পা ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করিয়াছে, তখন অবশ্য তাহাকে আমরা সীধা পথে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব। শ্রীদ্বি]

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম যে, "ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করা 'মানবীকরণই বটে' বলিয়া প্রতিপাদন করিব।" কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা অবিকল রাখিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করা আপত্তিজনক। লোকে ঈশ্বর শব্দে এক অসীম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই বুঝে; অথচ আমরা "মানবীকরণই বটে" আখ্যার প্রস্তাবে সকলকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, ঈশ্বর চেতন নহেন। আমাদের এই চেষ্টা কি অসংলগ্ন হইবে না? যদি কেহ বলে যে, রাম অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু সে সচেতন পুরুষ নহে, তাহা হইলে কি লোকে এই কথার প্রতি কর্ণপাত করিবে, না প্রয়োজিত যুক্তিই আলোচনা করিয়া দেখিবে? না, ইহার কিছুই করিবে না। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিবে যে, তুমি অসংলগ্ন কথা বলিতেছ। সুতরাং তোমার বাক্‌বিতণ্ডা পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না। বাস্তবিক যে কথা লোকের মনে বহুকাল যাবৎ বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে, শত সহস্র যুক্তি দেখাইলেও তাহা সহসা নিরাকৃত হইতে পারে না। এজন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা হইতে ঈশ্বর শব্দ উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। পরন্তু ঈশ্বর শব্দ পরিত্যাগ করিলেও তাহার স্থলে এমত একটী অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বুঝাইবে না, অথচ সমস্ত স্বীকৃত ঐশী শক্তিই নির্দ্দেশ করিবে। যদি কোন দার্শনিক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তবে ত্রিগুণই সেই অনুরূপ শব্দ। কিন্তু

আধুনিক ভাষায় ত্রিগুণকে ঈশ্বরের অনুরূপ শব্দ বলিয়া গণ্য করে না। ত্রিগুণে তিনটী গুণ প্রকাশ করে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। তন্মধ্যে সত্ত্ব এবং তমঃ ঈশ্বরের সর্ব্ববাদী সম্মত গুণ নহে। পক্ষান্তরে রজোগুণই প্রধান এবং ঐশী শক্তি পরিচায়ক। অতএব আমরা রজোগুণের অনুরূপ শব্দ "সৃষ্টি শক্তি" ব্যবহার করিব। তদনুসারে আমাদের পরিবর্ত্তিত প্রতিজ্ঞা এই ঃ—সৃষ্টি-শক্তিতে চৈতন্য আরোপ করা "মানবীকরণই বটে।"

[বিগত মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা ত্রিগুণের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছি। প্রভাত বাবু যদি একটু-খানি কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ পত্রিকাটির "কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন" এই প্রস্তাবটি পাঠ করেন, তবে ত্রিগুণ-সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বলিবার আছে সমস্তই তাঁহার নেত্র-সমক্ষে অনাবৃত হয়। ঐ পত্রিকা-খানি খুলিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তিনটি মৌলিক গুণ সসীম পদার্থ মাত্রেরই সঙ্গের সঙ্গী; কি সে তিনটি গুণ? না (১) সত্তা (সত্ত্ব), (২) অসত্তা বা অভাব (তমো), (৩) বিচেষ্টা অর্থাৎ ভাব হইতে অভাবে পতন এবং অভাব হইতে ভাবে উত্থান—এইরূপ এ-পাশ ও-পাশ (রজোগুণ)। দৃশ্য-বস্তু মাত্রে-তেই যেমন উজ্জ্বলতা মলিনতা এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য এই তিনটি গুণ কতক না কতক পরিমাণে লাগিয়া আছে, সসীম বস্তু মাত্রেতেই তেমনি সত্তা, অসত্তা এবং বিচেষ্টা, এই তিনটি গু ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া আছে। তাহার সাক্ষী—কোন একটি সসীম পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যেমন—পৃথিবী। পৃথিবী সৌর জগতের অন্তর্ভূত বিশেষ একটি বস্তু; সৌর জগতের অভ্যন্তরে যেখানে যত বস্তু আছে—সমস্তই সংক্ষেপে সৌর বস্তু বলিয়া সংজ্ঞিত হউক্। এমতে, পৃথিবী বুধ-গ্রহ শনি-গ্রহ চন্দ্র সূর্য্য, আর, তাহাদের যাহার অভ্যন্তরে যত গুলি স্থূল-বস্তু অথবা যত গুলি সূক্ষ্ম পরমাণু আছে সমস্তই সৌর বস্তু বলিয়া অবধারিতব্য। এখন, পৃথিবীতে এক দিকে যেমন সৌর বস্তুর সত্তা আছে, আর এক দিকে তেমনি সৌর বস্তুর অভাবও আছে; অভাব আছে—কেননা বুধ-গ্রহে যতগুলি সৌর বস্তু আছে তাহার একটিও পৃথিবীতে নাই; এই গেল সত্তা এবং অভাব—সত্ত্ব এবং তমো, এখন, রজো কিরূপ দেখা যা'ক্;—

সমস্ত সৌর জগতের ভার-কেন্দ্রটি সৌর কেন্দ্র বলিয়া সংজ্ঞিত হউক্। এখন, সমস্ত সৌর জগতের মধ্য হইতে বিকর্ষণ (repulsion) সমূলে উন্মূলিত হইয়া গিয়া সর্ব্বত্রই যদি কেবল আকর্ষণেরই একাধিপত্য হয়, তবে সৌর কেন্দ্রটি স্বীয় আকর্ষণ বলে সমস্ত সৌর পরমাণু-গুলি আত্মসাৎ করিয়া একাকী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়; এরূপ অবস্থায় কোন পরমাণু-দ্বয়ের মধ্যেই বিন্দু-মাত্রও ব্যবধান থাকে না; কারণ, ব্যবধান ঘটাইবার কর্ত্তা যে—সে নাই, বিকর্ষণ নাই। এরূপ যখন—অর্থাৎ সৌর কেন্দ্রটিতে যখন সমস্ত সৌর পরমাণু এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তন্ময়ী-ভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে—তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সেরূপ অবস্থায়

সৌর কেন্দ্রটিতে সৌর বস্তুর অভাব মূলেই স্থান পাইতে পারে না। এরূপ হইলে পৃথিবীর দশা কিরূপ হয়? এরূপ অবস্থায়, পৃথিবী সৌর কেন্দ্রে তন্ময়ীভূত—কাজেই সৌর কেন্দ্রের সহিত পৃথিবীর বিন্দু-মাত্রও প্রভেদ নাই, অর্থাৎ সৌর কেন্দ্রও যা—পৃথিবীও তা—একই; একই যখন—তখন "সৌর-কেন্দ্রে কোন সৌর বস্তুরই অভাব নাই" বলিলে—প্রকারান্তরে বলা হয় যে, পৃথিবীতেও কোন সৌর বস্তুরই অভাব নাই; যেহেতু এখনকার এ অবস্থায় সৌর কেন্দ্র এবং পৃথিবী একই অভিন্ন পদার্থ। সৌর বস্তুর অভাব যেন পৃথিবী হইতে সমূলে উন্মূলিত হইয়া গেল—কিন্তু সেই সঙ্গে পৃথিবীও যে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়—ইহার উপায় কি? এ রোগের ঔষধ নাই! সৌর কেন্দ্র একটি-মাত্র জ্যামিতিক বিন্দু বই নয়—পৃথিবী যদি সেই জ্যামিতিক বিন্দুটিতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়, তবে তাহারই নাম পৃথিবীর নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি। যেই পৃথিবীর সমস্ত ভৌতিক অভাব ঘুচিয়া গেল—অমনি পৃথিবী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল! অতএব পৃথিবীর ভৌতিক সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভৌতিক অভাবকেও বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক; যেখানে জ্বর ছাড়িয়া গেলেই নাড়ি ছাড়িয়া যায়, সেখানে—রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে রোগকেও বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে ভৌতিক সত্তা যেমন না থাকিলেই নয়—ভৌতিক অভাবও তেমনি না থাকিলেই নয়; পৃথিবীতে সত্তা এবং অভাব—সত্ত্ব এবং তমো দুইই এক সঙ্গে থাকা চাই। অতএব পৃথিবীর আত্মসমর্থন করিতে হইলে—এক দিকে তাহার অভাব সমর্থন করা চাই, আর একদিকে তাহার সত্তা সমর্থন করা চাই; সত্তা সমর্থন কিনা অভাব-পূরণ—কেননা সত্তা এবং অভাব উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। অভাব সমর্থন এবং অভাব পূরণ এই যে দুইটি ব্যাপার ইহাই রজোগুণ; তাহা এইরূপ;—ব্যষ্টি যাহা তাহা বিকর্ষণ দ্বারা সমষ্টি হইতে বিয়োজিত হইয়া অভাবে নিপতিত হয়, এইরূপে তাহার অভাব সমর্থিত হয়; তেমনি আবার, আকর্ষণ-দ্বারা তাহা সমষ্টির প্রভাব-পুঞ্জের নিকটস্থ হয়, এইরূপে তাহার অভাব পূরিত হয়। এইরূপ যে, প্রভাব হইতে অভাবে পতন এবং অভাব হইতে প্রভাবে উত্থান, ইহাই রজোগুণ।

এখন বক্তব্য এই যে, সসীম বস্তু মাত্রেরই এই যে তিনটি মৌলিক গুণ—কি না (১) পরিমিত সত্তা, (২) অভাব, (৩) বিচেষ্টা, ইহার কোনটিই পরমাত্মাতে স্থান পাইতে পারে না। প্রথমতঃ, সসীম বস্তু যেখানে যত আছে—সমস্তেরই সত্তা অভাব-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আর, যে সত্তা অভাব দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহাকেই শাস্ত্রে বলে—সত্ত্বগুণ। কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা—তাহা কোন অংশেই অভাব-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এই জন্য তাহা সত্ত্ব গুণ শব্দের বাচ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, সসীম বস্তু-সকলের প্রকৃতিই এইরূপ যে, এক বস্তুতে যাহার সত্তা—আর-এক বস্তুতে তাহার অভাব (যেমন, পৃথিবীতে

পার্থিব বস্তুর সত্তা—বুধ-গ্রহে পার্থিব বস্তুর অভাব); কিন্তু পরিপূর্ণ মূল-সত্যে কোন অভাবই স্থান পাইতে পারে না—তমোগুণ স্থান পাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সসীম বস্তু-সমূহের কেহই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—স্ব স্ব অভাব-পূরণের জন্য সকল-কেই অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়; কিন্তু মূল সত্যে কোন অভাবই নাই—তা ছাড়া মূল-সত্যের পরিধির বাহিরেও দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, অতএব অন্য বস্তুর সাহায্যে আপনার অভাব পূরণের চেষ্টা মূল সত্যে স্থান পাইতে পারে না—মূল সত্যে রজোগুণ স্থান পাইতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্ব রজ তমোগুণের কোনটিই মূল-সত্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না; কেমন করিয়াই বা হইবে? মূল সত্য পরিপূর্ণ সত্য, আর, পরি-চ্ছিন্ন সত্তা (সত্ত্বগুণ), অভাব (তমোগুণ), এবং বিচেষ্টা (রজোগুণ), তিনটিই আপেক্ষিক সত্য; আপেক্ষিক সত্য কিরূপে পরিপূর্ণ সত্যের স্থলাভিষিক্ত হইবে? প্রভাত বাবু দিব্য অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, তিনি যদি একটা আপেক্ষিক সত্যকে (যেমন রজো-গুণকে) পরিপূর্ণ সত্য বলেন—তবে আমাদের তাহাতে আপত্তি কি!—যেন প্রভাত বাবুর মতামত এবং আমাদের তাহাতে আপত্তি থাকা না থাকা—ইহার উপরেই আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত সত্যাসত্য নির্ভর করিতেছে! প্রভাত বাবু যদি আপেক্ষিক সত্যকে পরিপূর্ণ সত্য বলেন—খণ্ড আকাশকে মহাকাশ বলেন—শিশিরবিন্দুকে মহাসাগর বলেন, আর, তাঁহার সন্তোষার্থে আমরা যদি বলি "ঠিক্‌ই তো বটে—আপেক্ষিক সত্যই তো পরিপূর্ণ সত্য—খণ্ড আকাশই তো মহাকাশ—শিশির-বিন্দুই তো মহাসাগর" তবেই আর কি তাহা বেদবাক্য! আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এক অন্ধের হাত ধরিয়া আর এক অন্ধ গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারে না—এক সাঁতার না-জানা ব্যক্তি আর এক সাঁতার না-জানা ব্যক্তির কোমর ধরিয়া সাঁতারিয়া গঙ্গা পার হইতে পারে না,—একটা আপেক্ষিক সত্য আর একটা আপেক্ষিক সত্যের উপরে সম্যক্ নির্ভর করিতে পারে না; অতএব, পরিপূর্ণ মূল সত্যই আপেক্ষিক সত্য-সকলের নির্ভর-স্থল—এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; এখন দেখাইলাম যে, সত্ত্ব রজস্তমোগুণ তিনটিই আপেক্ষিক সত্য—কাজেই উহাদের কোনটিই সর্ব্ব জগতের মূলাধার হইতে পারে না;—কিন্তু হইলে হইবে কি? যত প্রকার অকাট্য যুক্তি আমরা যতবার প্রদর্শন করি-তেছি—সমস্তই প্রভাত বাবুর এক কাণ দিয়া ঢুকিয়া আর এক কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে! শ্রীদ্বি]

আমরা প্রতিপাদ্য বিষয়ের এই যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলাম তাহাতে যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর বিশেষ কোন আপত্তি হইতে পারে এমত সম্ভব করি না। ঈশ্বরের আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার গুণকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। তবে লোকে তাঁহাতে যতগুণ অর্পণ করে, সেই সমুদয়ের, অথবা কোন এক কি অধিকটীর আলোচনা আবশ্যক, ইহা

মাত্র বিচার্য্য। সৃষ্টি শক্তি যে ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান গুণ তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা এই জন্যই সৃষ্টি শক্তিকে আমাদের প্রতিজ্ঞার এক মাত্র লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিলাম। তবে যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন গুণের আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সেই গুণ প্রস্তাব করিতে পারেন। আমরা আগ্রহের সহিত তাহাও প্রতিজ্ঞাভুক্ত করিয়া লইব।

[এই কাগজের এ পিট আছে বলিলেই বুঝায় যে, ইহার পশ্চাতে ও-পিট আছে; তেমনি সৃষ্টি-শক্তি বলিলেই বুঝায় যে, তাহার পশ্চাতে জ্ঞানবান্ স্রষ্টা আছেন। জ্ঞানবান্ স্রষ্টাকে ছাড়িয়া সৃষ্টি-শক্তির কোন অর্থই হইতে পারে না। স্রষ্টা নাই অথচ সৃষ্টি-শক্তি, এপিট নাই অথচ ওপিট, গোড়া নাই অথচ আগা, চেতন নহে অথচ অচেতন নহে— এ সব কথার নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি বোঝেন তিনি বুঝুন—আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি না। শ্রীদ্বি]

আমরা একবিধ আস্তিকের মত সমর্থন করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত চেতন ও অচেতন সম্বন্ধে অনেক তর্ক করিয়াছি। সেই তর্ক হইতে এমত একটী বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আমাদের নিজেরই তর্ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা এই যে:—উষ্ণ ও শীতলের সহিত চেতন ও অচেতনের তুলনা হইতে পারে কি না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে যাহা উষ্ণ নহে তাহা অনুষ্ণ বটে। কিন্তু যাহা অনুষ্ণ বটে তাহা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শীতল এবং না শীতল না উষ্ণ। অর্থাৎ উষ্ণতা ও শীতলতা অনুসারে পদার্থ সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—উষ্ণ, শীতল এবং উষ্ণ ও শীতলের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু চৈতন্য বিষয়ে চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্ত্তী কোন তৃতীয় অবস্থা নাই। তাঁহার মতে এই জগতে যত পদার্থ আছে তাহা সমুদয়ই চেতন ও অচেতন এই দুই-এর সমষ্টি মাত্র। সুতরাং সমস্ত নিখিল হইতে চেতন পদার্থ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অচেতন ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

[আমরা বলিয়াছি এক—প্রভাত বাবু বুঝিয়াছেন আর; আমরা বলিয়াছি—সাদা, প্রভাত বাবু বুঝিয়াছেন—কালো! আমাদের মতে কোন্ কথাটি সম্ভব-পর আর কোন্ কথাটি অসঙ্গত, তাহা যতদূর স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে হয় তাহা আমরা পুনঃ পুন বলিয়াছি; তবুও, প্রভাত বাবুর সন্তোষার্থে (পাঠক বর্গের বিরক্তির দায় স্কন্ধে করিয়াও) আর একবার আমরা তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি;—

সম্ভব	অসম্ভব
(১) না উষ্ণ না শীতল (কলম)	(১) না উষ্ণ না অনুষ্ণ
(২) না রাম না শ্যাম (হরি)	(২) না রাম না অরাম
(৩) না চেতন না দৃশ্য বস্তু (বায়ু)	(৩) না চেতন না অচেতন

আমরা ক্রমাগতই বলিয়া আসিতেছি যে দক্ষিণ ধারের সৃষ্টি-ছাড়া কথা গুলি

নিতান্তই অর্থ-শূন্য ; আর, ইহাও আমরা ক্রমাগত দেখাইয়া আসিতেছি যে, বাম ধারের কথাগুলি কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রভাত বাবু এখন বলিতেছেন যে, "বাম ধারের কথা-গুলি তো সম্ভবপর বটে—তবেই হইল যে, দক্ষিণ ধারের কথা-গুলিও সম্ভব-পর !" ইহাকেই বলে "উধো'র ঘাড়ে বুধো'র বোঝা !" আমরা অতীব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি ও বলিতেছি যে, অনুষ্ণ শীতলও হইতে পারে (যেমন বরফ), অনুষ্ণ অশীতলও হইতে পারে (যেমন কলম), কিন্তু অনুষ্ণ উষ্ণ কোন রকমেই হইতে পারে না ; তেমনি, অচেতন দৃশ্য বস্তুও হইতে পারে (যেমন কাষ্ঠ), অচেতন অদৃশ্য বস্তুও হইতে পারে (যেমন বায়ু), কিন্তু অচেতন চেতন কোন রকমেই হইতে পারে না। আমরা কোন জন্মে বলি নাই যে, উষ্ণ এবং শীতলের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় কোন কিছু হইতে পারে না, অথবা চেতন এবং দৃশ্য বস্তুর মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় কোন কিছু হইতে পারে না ; উষ্ণ এবং শীতলের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় বস্তু অনেক আছে (যেমন কলম), কিন্তু উষ্ণ এবং অনুষ্ণের মধ্যে তৃতীয় বস্তু অসম্ভব ; তেমনি চেতন এবং দৃশ্য বস্তুর মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় বস্তু অনেক আছে (যেমন বায়ু), কিন্তু চেতন এবং অচেতনের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় বস্তু অসম্ভব। "আমাকে একটা অদৃশ্য দৃশ্য বস্তু আনিয়া দেও" "আমাকে একটা অনুষ্ণ উষ্ণ বস্তু আনিয়া দেও" এ সকল আব্‌দার কচি ছেলেকেই মানায়—তবুও যদি প্রভাত বাবু ঐ সকল অলীক অর্থ-শূন্য বাক্যকে আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ভ প্রবন্ধের মধ্যে স্থান দান করিয়া উহাদের প্রশ্রয় বাড়াইয়া দেন, তবে তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করা মিছে কেবল পণ্ডশ্রম ! অবশ্য, প্রভাত বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ; তিনি যুক্তিও বোঝেন—সবই বোঝেন ; কিন্তু হইলে হইবে কি—গোঁ বলিয়া যে একটা প্রবল জন্তু তাঁহার মনোমধ্যে অষ্ট প্রহর ঘাড় গুঁজিয়া রহিয়াছে, সেটা একেবারেই যুক্তি-প্রুফ ! শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বীজ গণিতের ভাষায় সমীকরণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, চেতন ও অচেতনের বাহিরে অন্য কোনও পদার্থই নাই। তদনুসারে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা গণিতের অকাট্য প্রণালী ক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে কোনও ব্যক্তির আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু কোন বিষয় বীজগণিতের সমীকরণ দ্বারা প্রতিপাদন করিলেই যদি তাহাতে অন্যের আপত্তি করিবার অধিকার না থাকে, তবে আমরা যে বিষয়টী নিম্নে সমীকরণ করিয়া প্রতিপাদন করিতেছি, তাহাতেও পাঠকবর্গের আপত্তি করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। আমরা ইহা স্বীকার করি যে, মানবীকরণের তর্কে বীজগণিতের সমীকরণ আনা প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গত নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন তাঁহার গণিতের অকাট্য প্রমাণকে মহামূল্য বলিয়া বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমরা বীজগণিতের সাহায্য না লইলে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইতেই পারিব না।

অতএব $ক^২ = ক খ$ (গুণন)

কিন্তু　$খ^২ = খ^২$

অতএব $ক^২ - খ^২ = ক খ - খ^২$ (বিয়োগ)

কিন্তু　$(ক + খ)(ক - খ) = খ (ক - খ)$

অতএব $ক + খ = খ$ (বিভাগ)

পরন্তু　$ক = খ$ (স্বীকার)

অতএব $২ খ = খ$

সুতরাং　$২ = ১$ (বিভাগ।)

অতএব আমরা বীজ গণিতের ভাষায় সমীকরণ করিয়া প্রমাণ করিলাম যে, দুই একের সমান। কিন্তু পাঠক কি ইহার সত্যতা স্বীকার করিবে? না, কখনই করিবে না। অবশ্যই বলিবে যে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে। তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত সমীকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার জন্যও আমারদিগকে অধিকার দিতে হইবে।

[প্রভাত বাবুর এই গণনা-প্রকরণটির বিস্‌মোল্লায় গলদ্‌। বীজগণিত—বলে শুধু এই যে, কোন-একটি অঙ্কাক্ষর (যেমন গ) যদি শূন্য-বাচক না হয়, অর্থাৎ যদি $গ = ০$ না হয়, তবেই $\frac{গ}{গ} = ১$; এ ভিন্ন, বীজ গণিত কোন-স্থানেই এমন কথা বলে না যে, যেখানে $গ = ০$ সেখানেও $\frac{গ}{গ} = ১$; বীজ-গণিত বলে এই যে, যেখানে $গ = ০$ সেখানে $\frac{গ}{গ} = ০$। প্রভাত বাবুর গোড়ার প্রতিজ্ঞা এই যে, $ক = খ$ সুতরাং $ক - খ = ০$; বীজ-গণিতের নিয়মানুসারে—ইহাতে দাঁড়ায়

$\frac{ক - খ}{ক - খ} = ০$ যেহেতু $ক - খ = ০$ কিন্তু প্রভাত বাবু ধরিয়া লইয়াছেন

$\frac{ক - খ}{ক - খ} = ১$, যেন $ক - খ$ শূন্য ছাড়া আর কোন অঙ্ক! গোড়াতেই যখন এইরূপ একটা মস্ত ভুল, তখন পরিণামে তাহা হইতে কি না বিচিত্র ফল ফলিতে পারে? ফলিয়াছেও তাই—কি? না $২ = ১$! প্রভাত বাবুর নিজের দোষে এটি হইয়াছে—সে দোষ তিনি বীজ-গণিতের স্কন্ধে চাপাইলে আমরা তাহা শুনিব কেন? ঐ দোষটি সংশোধন করিয়া আমরা পাইতেছি

$$(ক + খ)(ক - খ) = খ (ক - খ)$$

অতএব $(ক + খ)(ক - খ) = খ\ ০ = ০$

(যেহেতু প্রতিজ্ঞা অনুসারে ক—খ = ০)

এখন বক্তব্য এই যে, এ সমীকরণটি বর্গাত্মক (quadratic) সমীকরণ। যেমন দুই দিক্ দিয়া নাকে হাত দেওয়া যাইতে পারে—সম্মুখ দিয়া এবং পশ্চাৎ দিয়া পেঁচাইয়া, তেমনি বর্গাত্মক সমীকরণ-মাত্রই দুইরূপ প্রকরণ-দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে; এখানেও তাই, যথা;—

(ক—খ) (ক + খ) = ০

ইহার এক প্রকরণ এই যে,

ক — খ = ০ অতএব ক = খ

আর এক প্রকরণ এই যে,

ক + খ = ০ অতএব ক = —খ

ইহার অর্থ এই যে, হয় ক = খ,

নয় ক = —খ, দুয়ের এক;

এখন দেখিতে হইবে যে, কোন্‌টি ঠিক্, ক = খ এইটি, না ক = —খ এইটি? এস্থলে বিচার্য্য এই যে, গোড়া'র প্রতিজ্ঞাটি সহজ (simple) সমীকরণ সুতরাং তাহার বীজ (value) একের অধিক সম্ভবে না;—সেটি শুদ্ধ কেবল এই যে, ক—খ = ০; প্রভাত বাবু ঐ সহজ সমীকরণটির স্কন্ধে (ক + খ) এই গুণকটি চাপাইয়া উহাকে বর্গাত্মক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন; অতএব বর্ত্তমান স্থলে (ক + খ) এই গুণক অংশটি কৃত্রিম সুতরাং পরিত্যাজ্য; কাজেই, বর্ত্তমান স্থলে ক = খ এইটিই ঠিক্। যদি গোড়ার প্রতিজ্ঞা এই-রূপ হইত যে, ক = —খ সুতরাং ক + খ = ০; আর, তাহার স্কন্ধে যদি (ক—খ) এই গুণকটি চাপানো হইত, তাহা হইলেও দাঁড়াইত যে,

(ক + খ) (ক—খ) = ০

কিন্তু তাহা হইলে ফল হইত বিপরীত—তাহা হইলে উল্টা (ক—খ) এই গুণক অংশটি অগ্রাহ্যের কোটায়-পড়িত। তবে যদি গোড়া'র প্রতিজ্ঞা ক + খ = ০ অথবা ক—খ = ০ না হইয়া একেবারেই এইরূপ হইত যে,

(ক + খ) (ক—খ) = ০

তাহা হইলে দাঁড়াইত ক = খ এটাও ঠিক্, আর, ক = —খ এটাও ঠিক্। কিন্তু ইহার অর্থ এ নহে যে, একই সময়ে ক = খ এবং ক = —খ; তবে কি? না চাই ক = খ এইটি গ্রহণ কর, চাই ক = —খ এইটি গ্রহণ কর; কিন্তু যাহাকে যখন গ্রহণ করিবে—অন্য-টিকে তখন একেবারেই গণনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, কেননা খ এবং —খ এ দুইটি পরস্পরের সপত্নী-তুল্য। কোন একজন কুতার্কিক যদি এইরূপ একটি তর্ক তোলেন যে, দুই দিক্ দিয়া নাকে হাত দেওয়া যাইতে পারে—সম্মুখ দিয়া এবং পশ্চাৎ দিয়া; অতএব প্রমাণ হইল যে

সম্মুখ = পশ্চাৎ ;

অথবা, একটা ঘোড়াকে এক পাক চক্র দেওয়াইলেও সে তাহার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে—দুই পাক চক্র দেওয়াইলেও সে তাহার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে ; অতএব প্রমাণ হইল যে

এক পাক = দুই পাক ;

অথবা, (ক + খ) (ক—খ) = ০ এ সমীকরণটি ক = খ হইলেও সিদ্ধ হয় এবং ক = —খ হইলেও সিদ্ধ হয় অতএব প্রমাণ হইল যে

খ = —খ

২খ = ০

২ = ০

অথবা, $(ক)^২ = (—ক)^২$ অতএব প্রমাণ হইল যে,

ক = —ক

২ক = ০

২ = ০

তবে, কুতার্কিকের এই সমস্ত ভ্রম-সিদ্ধান্ত গুলি সত্য সত্যই কিছু আর বীজ-গণিতের সিদ্ধান্ত নহে। বীজ-গণিত শুদ্ধ কেবল বলে এই যে, $ক^২$ দুই রূপে সিদ্ধ হইতে পারে $(ক)^২$ এইরূপে এবং $(—ক)^২$ এইরূপে ; এই কথাটির মর্ম্ম না বুঝিয়া কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, তবেই হইল ক = —ক ; বোম্বাই পথ দিয়াও আমেরিকায় যাওয়া যায়, চীন-পথ দিয়াও আমেরিকায় যাওয়া যায়, তবেই হইল বোম্বাই = চীন ; এ সকল কথা যে ব্যক্তি বলে সেই ব্যক্তিই তাহার দোষ-গুণের ভাগী, বীজ-গণিতের তাহাতে একগাছি কুন্তলেরও ইতস্ততঃ হয় না। এ তো গেল বর্গাত্মক সমীকরণ—সহজ সমীকরণে তো ওরূপ কুতর্কের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না ; কেননা সহজ সমীকরণের বীজ একের অধিক সম্ভবে না, কাজেই সেখানে দ্বৈধের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। গণিতের যোগ-বিয়োগ প্রকরণ সর্ব্বত্রই খাটে ; কিন্তু তাহার বর্গাদি প্রকরণ কোথাও বা খাটে কোথাও বা খাটে না। বীজ-গণিতের মধ্যে এমনও কতকগুলি প্রকরণ আছে যাহা রেখা-গণিতেও খাটে না, যথা ;—

$২^২ = ৪$

$রেখা^২$ = চক (square figure) এ যেন হইল কিন্তু

$রেখা^৪$ = (?)—অর্থশূন্য।

তেমনি আবার, এমন কতক-গুলি প্রকরণ আছে যাহা অঙ্কগণিতেও খাটে রেখা-গণিতেও খাটে, কিন্তু আর কোথাও খাটে না, যথা ; —

২

বিয়োগ-প্রকরণ।

২—১=১

নেড়া মুণ্ড=মস্তক—কেশ

শব দেহ=মনুষ্য—প্রাণ

যোগ প্রকরণ।

২=১+১

চিনির পানা=জল+চিনি

২ হাতি=হাতি+হাতি

বর্গ প্রকরণ।

২^২=৪

রেখা^২=চক

হাতি^২=? এই খানেই গোলোযোগ!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বীজ-গণিতের বর্গ-প্রকরণ অঙ্ক-গণিতেও খাটে—রেখা-গণিতেও খাটে, কিন্তু আর আর অনেক বিষয়ে খাটে না। বর্গাদির প্রকরণ-পর্য্যন্তও যে-খানে খাটে না, সেখানে বর্গাত্মক সমীকরণ তো না খাটিবারই কথা। এত দেশ থাকিতে প্রভাত বাবু বাছিয়া বাছিয়া একটা বর্গাত্মক সমীকরণ আনিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন—বাতাসের গায়ে খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন! কই—আমরা তো বর্গাত্মক সমীকরণের দিক্ দিয়াও যাই নাই। আমাদের অপরাধ এই যে, যাহা সর্ব্বত্রই খাটে এইরূপ একটি সহজ সমীকরণ দ্বারা এই সোজা কথাটির প্রমাণ দর্শাইয়াছি কিনা—যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন; তা'ও যে আমরা করিয়াছি—নিতান্তই দায়ে পড়িয়া করিয়াছি; এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কেবল—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—এ বই আর কিছুই নহে। যে কথা বলিবা-মাত্রই আপামর-সাধারণ সকলেই তাহা বুঝিতে পারে—প্রভাত বাবু আমাদের নিকট হইতে তাহার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি চাহিলেন, আমরাও খুঁজিয়া পাতিয়া একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইলাম—মশা মারিতে কামান পাতিলাম। কিন্তু যে কামানটি আমরা পাতিলাম, তাহা মশা মারিবারই কামান—ক্ষুদ্র বালকেও তাহা ছুড়িতে পারে। প্রভাত বাবু একটা ওস্তাদি রকমের কামান আনিয়া আমাদিগকে শিখাইতেছেন যে, কামান ছোড়া ছেলে খেলা নহে—তাহাতে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে; তাঁহার এ কথা সাধারণতঃ আমাদের শিরোধার্য্য, তবে, আমাদের বাল্য-ক্রীড়া-সুলভ ক্ষুদ্র কামানটির সম্বন্ধে উহার কোন অর্থ নাই। হেঁয়ালি ছাড়িয়া সাদা কথায়—আমাদের প্রদর্শিত সহজ সমীকরণটি সর্ব্বত্রই খাটে; তাঁহার প্রদর্শিত বর্গাত্মক সমীকরণটির বিস্‌মোল্লায় গলদ্! তা ছাড়া—গণিতের বাহিরে বর্গ-প্রকরণের কোন অর্থই হয় না।

সহজ সমীকরণটির উপর প্রভাত বাবুর কেন যে এত নিদারুণ রোষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না—এ বেচারী তো কোনও অপরাধ করে নাই! প্রভাত বাবু আঁক কসিতে ভুল করিয়াছেন বলিয়া—তাহার জন্য কি বীজগণিত কোন অংশে দায়ী? না বর্গাত্মক সমীকরণের বীজ-বিশেষ স্থল-বিশেষে অগ্রাহ্য বলিয়া—তাহার জন্য সহজ সমীকরণ কোন অংশে দায়ী? চোর চুরি করিয়াছে বলিয়া পথের লোককে ধরিয়া জেলে দেওয়া—এ যে বড় সর্ব্বনেশে বিচার! শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে দ্রব্য সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—উষ্ণ, না উষ্ণ না শীতল, এবং শীতল। কিন্তু এই বিভাগ কি ঠিক হইয়াছে? দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাকে স্পর্শ করিয়া না উষ্ণ না শীতল অথবা শীতল মনে করেন, তাহা কি উষ্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না? মনে কর কোন ব্যক্তির ৯৯ ডিক্রী তাপের জ্বর হইয়াছে। সেই ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিয়া তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, তাহা না উষ্ণ না শীতল। কিন্তু প্রকৃতার্থে তাহা উষ্ণই বটে। তবে এত সামান্য উষ্ণ যে, তাহা দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্পর্শ জ্ঞানের গোচর হইতে পারে নাই। তদ্রূপ জ্বরের শীতল অবস্থাপন্ন মনুষ্যের শরীর স্পর্শ দ্বারা শীতল বোধ হইলেও তাপমান যন্ত্র দ্বারা অনেক সময়ে উষ্ণ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। আবার দ্বিজেন্দ্র বাবু একই পরিমাণ তাপের বস্তুকে এক সময়ে উষ্ণ এবং অন্য সময়ে শীতল বলিবেন। যদি তিনি শীতকালের প্রত্যূষে কোন জলাশয়ের জলে হস্ত প্রদান করেন, তবে তিনি অবশ্য বলিবেন যে, ঐ জল উষ্ণই বটে। ঐ জলের উষ্ণতা নিরূপণ করিয়া যদি বেলা হইলে সমান পরিমাণ তাপের জলে পুনরায় হস্ত প্রদান করেন, তবে আবার বলিবেন যে, তাহা শীতলই বটে। অতএব দ্বিজেন্দ্র বাবু একই পরিমাণ তাপের জলকে এক সময়ে বলিবেন উষ্ণ এবং অন্য সময়ে বলিবেন শীতল। তাহা হইলে উষ্ণতা ও শীতলতার মধ্যে নির্দ্ধারিত সীমা কোথায়? অতএব এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উষ্ণতা ও শীতলতার মধ্যে এমন কোনও সীমা নাই যাহার এক পার্শ্বে থাকিলেই দ্রব্য সকল উষ্ণ এবং অপর পার্শ্বে গেলেই শীতল বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। তবে যে, লোকে দ্রব্য সকলকে উষ্ণ ও শীতল বলিয়া প্রভেদ করে, ইহা কেবল প্রভেদকারী ব্যক্তিগণের আপন আপন স্পর্শ জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে করিয়া থাকে। যাহা স্পর্শকারী ব্যক্তির হস্তে উষ্ণ বোধ হয়, তাহাই উহার নিকট উষ্ণ এবং যাহা শীতল বোধ হয়, তাহাই উহার নিকট শীতল বলিয়া পরিগণিত।

[প্রভাত বাবুর এই কথাটিতে আমাদের "গরুর ঘণ্টা নাড়া" যুক্তির কথা স্মরণ হইতেছে। তর্কালঙ্কার খুড়ো কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার গরুর গলায় ঘণ্টা কেন?" কলু বলিল "ঘণ্টার শব্দ বন্ধ হ'লেই আমি টের পা'ব যে, গরু ঘানি টানিতে টানিতে থেমে দাঁড়িয়েছে" তর্কালঙ্কার খুড়ো তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে

"যদি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে ?" কলু যদি তেমন একজন টোলের অধ্যাপক হইত, তবে সে গোড়াতেই এইরূপ ভূমিকা করিত যে, গবাদি জন্তু-গুলা জাত্যংশে পশু এবং বুদ্ধি-অংশে গর্দ্দভেরই সহোদর, এবম্বিধার, স্তব্ধাবস্থায় ঘণ্টা-বিলোড়ন তৎকর্ত্তৃক ঘটিয়া ওঠা সম্ভব-পর নহে" . এইরূপে আটঘাট বাঁধিয়া তাহার যাহা বক্তব্য তাহা সে বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় নিবেদন করিত। আমরা সোজাসুজি বলিয়াছিলাম যে, যাহা উষ্ণ নহে তাহা অনুষ্ণ—যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন ; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তাহার আট-ঘাট বাঁধিয়া সব দিক্ সাম্‌লাইয়া না বলিলে, প্রভাত বাবুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন। কাজেই আমাদের সহজ বিষয়টিকে আমরা নিম্ন-লিখিত প্যাঁচাও রকমে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। যাহা উষ্ণ নহে তাহা অনুষ্ণ—অর্থাৎ যখন যাহার নিকটে যাহা উষ্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন তাহার নিকটে তাহা অনুষ্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না ; তেমনি যখন যাহার নিকটে যাহা চেতন বলিয়া প্রতীয়-মান হয়, তখন তাহার নিকটে তাহা অচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। যখন তুমি বলিতেছ যে, ঈশ্বর চেতন-পদার্থ, তখন তুমি বলিতে পার না যে তিনি অচেতন পদার্থ ; যখন তুমি জলে হাত-দিয়া বলিতেছ যে, জলটা উষ্ণ, তখন তুমি বলিতে পার না যে, তাহা অনুষ্ণ। সাধারণতঃ এইরূপ—কিন্তু ঈশ্বর-সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, ঈশ্বর অদ্য যাহা চিরকালই তাহা। জল অদ্য হয় তো শীতল, কল্য হয় তো উষ্ণ ; জল যদি অদ্য উষ্ণ-পদার্থ হয়, তবে কল্য তাহা শীতল-পদার্থ হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বর যদি চেতন-পদার্থ হ'ন, তবে চিরকালই তিনি চেতন-পদার্থ ; কেননা, ঈশ্বর নিত্য সত্য—তিনি কোন পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না। শ্রীদ্বি]

চেতন এবং অচেতনের সীমা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। লোকে সাধারণতঃ প্রাণিকেই চেতন পদার্থ বলে। কিন্তু উদ্ভিদ্ মধ্যেও এত অধিক চেতন-ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, তজ্জন্য উহাকে সর্ব্বতোভাবে অচেতন বলিতে পারা যায় না।

[চেতন-ধর্ম্ম কিছু আর চক্ষে দেখিবার বস্তু নহে—তাহা অন্তরে অনুভব করিবার বস্তু। উদ্ভিদের যদি ধী-শক্তি থাকে—অর্থাৎ আপনাকে এবং অন্যকে জানিবার শক্তি থাকে—তবে উদ্ভিদ্ মনুষ্যের ন্যায় বিশিষ্ট-রূপে চেতন-পদার্থ ; ধী-শক্তি না থাকিলেও অন্ততঃ তাহার যদি অনুভব-শক্তি থাকে, তবে তাহা জন্তুদিগের ন্যায় সামান্যরূপে চেতন পদার্থ। আমরা বলি যে, উদ্ভিদের অনুভব শক্তিও নাই—কাজেই এ কথা আমরা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না যে, উদ্ভিদ চেতন-পদার্থ। শ্রীদ্বি]

এই হেতু জগতের দ্রব্যজাত সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন এই দুইভাগে বিভক্ত না হইয়া চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ্ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তিন ভাগ স্বীকার করিতে চাহেন না।

[একা কেবল আমরা নহি—কোনও বিজ্ঞান-শাস্ত্রেই এরূপ কথা বলে না যে, জগতের

দ্রব্যজাত—চেতন অচেতন এবং উদ্ভিদ্ এই তিন অংশে বিভক্ত; বলিবার মধ্যে বলে কেবল এই যে, জগতের দ্রব্যজাত প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত—চেতন এবং অচেতন; অচেতন আবার দুই অংশে বিভক্ত—সপ্রাণ (organic) এবং অপ্রাণ; ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জগতের দ্রব্যজাত সচেতন, সপ্রাণ অচেতন, এবং অপ্রাণ অচেতন এই তিন অংশে বিভক্ত। আমিও বলি এবং সকল শাস্ত্রই বলে যে, জগতের পদার্থ সমূহ সচেতন, সপ্রাণ অচেতন, এবং অপ্রাণ এই তিন অংশে বিভক্ত; প্রভাত বাবুর নূতন শাস্ত্রে বলে—সপ্রাণ-অচেতন অচেতন নহে; প্রভাত বাবুর নূতন শাস্ত্র প্রভাত বাবুই বোঝেন; আমরাই বা তাহা কিরূপে বুঝিব, আর অন্যেই বা তাহা কিরূপে বুঝিবে? শ্রীদ্বি]

সম্ভবতঃ তাঁহার মতে কেবল প্রাণিই চেতন এবং উদ্ভিদ্ ও খনিজ অচেতন পদার্থ। পরন্তু এমত উদ্ভিদ্ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যাহাকে দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রাণী বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি না সংশয় স্থল। আমরা সম্প্রতি এতদ্রূপ উদ্ভিদের উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ তাহা করিবার পূর্ব্বে, দ্বিজেন্দ্র বাবু কি রূপ লক্ষণকে চৈতন্য জ্ঞাপক বলেন, তাহা আমাদের জানা আ শ্যক। ইহা হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে, কোন্ কোন্ স্থলে তাঁহার নিরূপিত সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে পারিব। অতএব আমরা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে চৈতন্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। এই অনুরোধ প্রথম প্রস্তাবেও করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন তিনি অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা রক্ষা করেন নাই। আমাদের মূল প্রতিজ্ঞা প্রমাণ জন্যও চৈতন্যের লক্ষণ জানা আবশ্যক হইবে। যদি আমরা নিজে যেই লক্ষণ প্রস্তুত করিয়া লই, তবে তাহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর আপত্তি থাকিতে পারে। বিশেষতঃ চেতন ও অচেতন পদার্থ মধ্যে যে, কোন নির্দ্দোষ সীমা নিরূপিত হইতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাসই করি না। সুতরাং আমরা চৈতন্যের যে সংজ্ঞা করিব তাহারই আবার দোষ ধরিতেও পারিব। অতএব দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিরূপিত সংজ্ঞা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

[আপনাকে এবং অন্যকে পরস্পর হইতে বিবিক্ত করিয়া উপলব্ধি করিবার শক্তি (এক কথায়—বিবেক-শক্তি) যাহার আছে, তাহাই বিশিষ্ট-রূপে চেতন-পদার্থ; যাহার বিবেক শক্তি নাই কিন্তু অনুভব-শক্তি (অর্থাৎ ক্ষুৎ পিপাসা সুখ দুঃখাদি অনুভব করিবার শক্তি) আছে, তাহা সামান্য-রূপে চেতন পদার্থ; যাহার অনুভব-শক্তিও নাই তাহা অচেতন-পদার্থ। এ ছাড়া চেতনাচেতনের সংজ্ঞা আর যে কি হইতে পারে তাহা আমরা জানি না। যদি কোন নূতন আবিষ্কর্ত্তা পৃথিবীর কোন স্থলে এমন একটা বৃক্ষ দেখিতে পান—যাহা কুঠারাঘাতে ব্যথা অনুভব করে, তবে আমরা অসঙ্কোচে বলিব যে, তাহা বৃক্ষ নহে—বৃক্ষাকৃতি একটা জন্তু। এরূপ বৃক্ষ তো স্পষ্টই সচেতন পদার্থ; "অথচ অচেতন"

তাহার কোন্ খানটায়—তাহা তো আমাদের সহজ বুদ্ধিতে আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রীদ্বি]

এস্থলে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, যখন চেতন পদার্থ দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তখন চৈতন্যের সংজ্ঞা করা আবশ্যক নহে। তদুত্তরে আমরা বলিতেছি যে, চৈতন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে। সুতরাং কোন চেতন পদার্থ দর্শন করিলেও সর্ব্বদা চৈতন্যের বিদ্যমানতা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। চৈতন্যের সহিত কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়ার সংস্রব আছে। সেই সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া প্রকাশিত না হইলে আর চৈতন্য আছে বলিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায় না। অতএব যে যে সকল বাহ্য ক্রিয়াতে চৈতন্য জ্ঞাপন করে আমরা সেই সমুদয়ই অবগত হইতে চাই। কারণ তৎসমুদয় উদ্ভিজ্জে এবং সৃষ্টি শক্তিতে আছে কি না এই কথার আলোচনা করাই আমাদের প্রস্তাব লিখার উদ্দেশ্য।

[এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমি আপনি যে চেতন পদার্থ, ইহা আমি আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; আর একজন মনুষ্য যে,চেতন-পদার্থ তাহা আমি তাহার কার্য্য-দৃষ্টে অনুমানে উপলব্ধি করি; ঈশ্বর যে, পরিপূর্ণ চেতন পদার্থ, ইহা—আমি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করি—সে জ্ঞান এই যে, অপূর্ণ জ্ঞান এবং অপূর্ণ সত্য মাত্রই পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ। শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

বিদ্রোহ।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাণী সচেতন হইয়া দেখিলেন রাজাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, তাঁহার মুখে আর পূর্ব্বের কঠোর ভাব নাই, বরঞ্চ যেন একটা উদ্বেগ পুর্ণ-কোমলতা তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত। ইহার উপর আবার যখন রাজা তাঁহার পুরাতন কোমল স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "মহিষি এখন ভাল বোধ হইতেছে ?" তখন অশ্রুজলে রাণীর নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুজলও যেন রাজার মমতা আকর্ষণ করিল; রাজার মুখে তাহাতে বেদনার ভাব প্রকাশিত হইল, রাণী আশ্চর্য্য হইলেন। কেবল তাহাই নহে রাণী একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে মহারাজ নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে গমন

করিলেন, এমন কি সে রাত্রে তাঁহার সহিত একত্র শয়ন করিয়া মাঝে মাঝে নীরবে তাঁহাকে একটু একটু আদরও করিলেন, কথনো কথনো বা ভাল আছেন কিনা জিজ্ঞাসাও করিতে লাগিলেন, রাণীর নিরাশ প্রাণেও আশা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে আশাটুক না জাগিলেই ছিল ভাল। রাণী মূর্চ্ছিত হইলে রাজার মনে সহসা যে বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল যখন তাহা দূর হইল, তিনি যখন দেখিলেন—রাণী বেশ আরোগ্য হইয়াছেন তখন ক্রমে তাঁহার ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। অল্পে অল্পে তাঁহার কোমল ভাব পূর্ব্বের কঠোরতায় বিলীন হইয়া পড়িল, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজার অন্তঃপুরে আসা শেষ হইল, রাণীর আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল।

রাণী বুঝিলেন, মিথ্যা আশা, মিথ্যা সব। রাজার ভালবাসা আর তিনি পাইবেন না; তাহারো অধিক,—রাজার মার্জ্জনাও তিনি আর পাইবেন না, রাজার চক্ষে তিনি দারুণ অপরাধী, সে অপরাধ তিনি ভুলিতে পারেন নাই, বুঝি কখনই পারিবেন না।

রাণী বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার ভালবাসা হারাইয়া ইতিপূর্ব্বে যে কষ্ট পাইতেন সে কষ্ট যেন ইহার নিকট স্পষ্ট সুখ। মানুষ ভালবাসার সহস্র অনাদর সহস্র উপেক্ষা অকাতরে সহিতে পারে যদি সে বুঝে, আমি যাহার জন্য এত সহিতেছি—তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান না পাই তাহাকে ভালবাসিয়া যে আমার এত কষ্ট অন্ততঃ তাহাও সে বুঝিতেছে। এই বুঝায় সহস্র কষ্টের সান্ত্বনা এই বুঝাতেই আত্মবিসর্জ্জন সুখময়। কিন্তু রাণী দেখিলেন—রাজা সেটুকও বুঝিতেছেন না, কেবল যে বুঝিতেছেন না তাহা নহে, বিপরীতই বুঝিতেছেন, তিনি ভাবিতেছেন তিনি রাণীর প্রতি অন্যায় করেন নাই, রাণীই তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, রাণীর নিকট তিনি ক্ষমার পাত্র নহেন, রাণীই তাঁহার নিকট দারুণ অপরাধী, রাণী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সুখে বাদ সাধিয়াছেন—তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। এ অবস্থায় রাণীর সুতীব্র জ্বালার উপশম কোথায়?

রাণীর জীবনে মৃত্যুর ছায়া দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। রাণী মুমূর্ষু ভাব লইয়া শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে বাপ্পা যদি কোলে আসিয়া বসে, গলা ধরিয়া আদর করে, তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়া একবার শুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখেন তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। মায়ের এরূপ অস্বাভাবিক ভাব বাপ্পার ভাল লাগে না; সে তাঁহার কোল ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার একবার চোখ ছলছল করে না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না।

সখীগণ অনেক সময় তাঁহার সম্মুখে রাজা ও সুহারের কথা লইয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গল্প করে, রুক্মিণী তাঁহাকে যখন তখন তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভর্ৎসনা করে, তাঁহার

শুনাইতে ছাড়ে না, কিন্তু রাণী সকলি চুপ করিয়া শুনিয়া যান, কিছুতেই কিছু কথা কহেন না; সখীরা তাঁহার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

সখীরা আজকাল তাঁহার কাছে নিয়মিত নৃত্যগীত করে, দিন কতক আগে তাহাতে তিনি যেরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন—এখন সে সব কিছুই নাই, তাহারা তাঁহার নিকট আমোদের কথা কহিলেও তিনি তাহাদের থামিতে বলেন না। তাহারা ভাবে দিন দিন রাণী তাঁহার দুঃখে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তাহারা আহ্লাদিত হয়, রুক্মা কেবল তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া কাঁদিয়া মরে। তাহাদের এই আমোদ ও কান্নায় রাণীর মনে কোন ভাবেরই ব্যত্যয় হয় না। কোন সুখ দুঃখ যেন আর তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার নির্জ্জীবতাকে জীবন দিতে পারে না, মৃত্যুর আলিঙ্গনেই বুঝি একমাত্র তাঁহার নবজীবন পাইবার আশা আছে।

কিন্তু এ কথা আমরা বলিতেছি; তাঁহার হৃদয়ে এরূপ কোন আশা নিরাশার কথাও যেন উদয় হয় না, তাঁহার এ জীবনের একটা পরিণাম যে শীঘ্র আসিতেছে তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে পরিণামে আশা কি নিরাশা, আঁধার কি আলোক, তাহা তিনি ভাবেন না, এ কথা মনে হইলে তাঁহার কেবল এই মনে হয়, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার একটি কাজ করিবার আছে।

আজ গৌরীপূজার শেষদিন। রাজবাড়ীতে আজ মহোৎসব। গৌরী আজ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরের রমণীগণ কর্ত্তৃক প্রাসাদ হইতে অবতরিত হইয়া মন্দির ঘাটে আনীত হইবেন। ইহা মহিলাদিগেরই বিশেষ পর্ব্ব। রাজবাটীর মহিলাগণ আজ সমস্ত নিরানন্দ ভুলিয়াছে। তাহারা গৌরীকে ঘাটে লইয়া গিয়া পূজা, আমোদ উৎসব করিবে।

পুরুষ যদিও মুখ্য ভাবে কেহ এ উৎসবের মধ্যে নাই তথাপি এ উৎসবে তাহাদেরও যে আনন্দ কিছু মাত্র কম তাহা নহে। তীরে উৎসব আসরে পুরুষের গতিবিধি নিষিদ্ধ, সুতরাং অসংখ্য নৌকা নদী-বক্ষ আন্দোলিত করিয়া শত শত উৎসুক-দৃষ্টি কৌতূহল-উত্তেজিত দর্শক পুরুষদিগকে ধারণ করিয়া আছে। রাজার নৌকা, সমস্ত নৌকা সমূহের অগ্রে।

সেতারা বীণ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ঝঙ্কার ও রমণী কণ্ঠের গীতিধ্বনি ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উথলিয়া উঠিতে লাগিল, দর্শকগণ প্রত্যেকের মস্তকের উপর প্রত্যেকে ঊর্দ্ধ-মস্তক হইবার চেষ্টায় নৌকা জলমগ্ন করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজোদ্যান নানাবর্ণের ফুলে যেন সজ্জিত হইয়া উঠিল। নানা বর্ণ বস্ত্রে, নানা রূপ সাজে সজ্জিত নদী-অভিমুখী রমণী মণ্ডলীর সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ যেন সহসা নদীবক্ষ পর্য্যন্ত অভিঘাত করিয়া তুলিল, দর্শক বৃন্দ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, দাঁড়ির হাতের দাঁড় আর নামিল না, মাঝি হাল চালাইতে ভুলিয়া গেল, অপরিমিত ঔৎসুক্য পূর্ণ

স্থির দৃষ্টিতে সকলে তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই জানিতে ব্যস্ত কে আজ গৌরীর অগ্রগামী হইয়া আসিতেছেন? কোন সৌভাগ্যবতী মৃগনয়নী, কোন নাগিনী-অলক-রমণী রাণীর শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া রূপসীশ্রেষ্ঠ রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আজ এই সম্মানের পদ লাভ করিয়াছেন? কত স্বামীর, কত পিতার, কত ভ্রাতার, কত আত্মীয়ের হৃদয়-স্পন্দন সহসা যেন বন্ধ হইয়া পড়িল।

সাধারণ কৌতূহলের মধ্যে রাজা এতক্ষণ কেবল নিরুৎসুক ভাবে বসিয়া ছিলেন, উৎসবের কথা এতক্ষণ তাঁহার যেন মনেই ছিল না, উথলিত গীতধ্বনি এতক্ষণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ, কেন না তীরের দিকে তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত একবার চাহিয়াও দেখেন নাই, নদীর গর্ভে যে দিকে দু একটি বড় বড় প্রস্তর খণ্ডকে আহত প্রতিহত করিয়া সুহারমতীর কৃষ্ণ জলরাশি সফেন শ্বেত তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতেছিল, রাজা সেই দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই জল রাশির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি কাল রাত্রে কি যেন একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার হৃদয় এইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নটি কি তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু মনে পড়িতেছিল না; অনেক করিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতে মনে পড়িল না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে উর্দ্ধ মুখ হইলেন; মুখ উঠাইবার সময় তাঁহার তীরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন রমণীমণ্ডলী নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই সৌন্দর্য্য-দৃ ্য আকৃষ্ট হইয়াই হৌক, কিম্বা অভ্যাস-বশতঃই হৌক সহসা তাঁহার স্তিমিত দৃষ্টিতেও ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইল।

রমণীগণ নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মন্দিরদালান রূপের আলোকে ভরিয়া গেল, নদীর সোপানে গৌরী অবতরিত হইলেন, সহস্র সহস্র কৌতূহল-উদ্দীপ্ত নয়ন দেবী-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে একটি মানবী-মূর্ত্তির উপর স্থাপিত হইল। সকলে দেখিল গৌরীর অগ্রগামী চামরধারী জীবন্ত লক্ষ্মী-স্বরূপা প্রতিমা কে? সুন্দরীর হস্তস্থিত চামর আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া তাহার মস্তকের ওড়না স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, জুঁই ফুলে সজ্জিত যত্ন বিন্যস্ত কেশভার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই শিথিল সাজ সজ্জা তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যকে দর্শকদিগের চক্ষে যেন মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজা কি দেখিতেছেন কাহাকে দেখিতেছেন তিনি বুঝিতে পারিলেন না, দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গৌরী প্রণাম করিল, তিনিও প্রণাম করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন না কাহাকে প্রণাম করিতেছেন—কে দেবী। তিনি যখন প্রণাম করিয়া আবার মুখ তুলিলেন—তখন সুহারের কেশরাশি একেবারে এলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সেই কৃষ্ণ কেশপাশের মধ্যে মহারাজের দৃষ্টি যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, মহারাজের মনে পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নটি সহসা জাগিয়া উঠিল—তিনি আবার সেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে

সুহারের কেশরাশির অন্ধকার যেন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মহারাজ আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এক দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি মগ্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেই অন্ধকারকে সবলে ছিন্ন করিয়া একটি আলোক কণা ধরিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোথায় আলোক কণা? আলোক ধরিতে ব্যগ্র হইয়া সেই অন্ধকারকেই সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। অমনি সেই অন্ধকারের মধ্যে দুইটি মুখ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল, একজনের মুখে হাসি, এক জনের বিষাদময়ী প্রতিমা। প্রথমটি গণগৌরী মহাদেবী, মহারাজের দুর্দ্দশায় তিনি হাসিতেছেন, কিন্তু বিষাদময়ী প্রতিমাখানি কার তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না, যেন তাহাকে চেনেন, খুবই চেনেন, যেন হঠাৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। রমণীর নেত্র হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, রাজা চমকিয়া উঠিলেন—দেখিলেন তাহা অশ্রু বিন্দু নহে রক্ত বিন্দু; তখন তিনি সেমন্তীকে চিনিতে পারিলেন। সহসা সেই রক্ত বিন্দু একটি রমণী মুর্ত্তিতে পরিণত হইল, রাজা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন তিনি ত অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া নাই—সেই রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। সে রমণী আর কেহ নহে, সুহার, তখন তিনি আবার আর সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার মনে হইল, জগতে আর কেহ নাই, বিশ্ব কেবল তিনি ও সুহার ময়। এই সময় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, স্বপ্নের শেষ অনুভাব মাত্র হৃদয়ে লইয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রমণীগণের নৃত্য গীত উৎসব শেষ হইয়াছে, তাঁহারা গৌরীকে ফিরাইয়া লইয়া গৃহে গমন করিতেছেন। মহারাজ সেই রমণীদিগের মধ্যে একজনকে আর একবার দেখিবার প্রত্যাশায় উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন, ততক্ষণ নৌকা বাচ খেলিয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া ফেলিল, তিনি তথাপি সতৃষ্ণ নয়নে উন্মুখ হইয়া রহিলেন। বুঝি বুঝিতেও পারিলেন না, সে ঘাট আর তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে নাই।

আর সকলকে গৌরীর সহিত গৃহে পাঠাইয়া সেমন্তী মন্দির ঘাটে অশ্রুহীন নেত্রে তখনো দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন রাজার নৌকা চলিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—"মহারাজ, এখনো কি তুমি মনে করিতেছ আমি ঈর্ষাবশতঃ সুহারকে তোমার দৃষ্টি পথ হইতে সরাইয়াছিলাম, এখনো কি তুমি মনে করিতেছ ইচ্ছা করিয়া আমি তোমার সুখে বাদ সাধিয়াছি?"

এক-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাই মহিমাময়, সর্ব্বত্র তাহার মাহাত্ম্য—তাহার সমাদর ইহা সত্য, কিন্তু এ সত্য অনন্তের পক্ষে যেমন অকাট্য সত্য—সংসারের পক্ষে তেমন নহে। কত সত্য সংসার ধারণা করিতে পারে না—কত সৌন্দর্য্য অনাদরে ম্লান হইয়া যায়! বেদের সত্য পুরাণে বিকৃত, বিজ্ঞানের সত্য অজ্ঞানে আবরিত। কত গুণ অমর্য্যাদায়

অনন্তের জ্যোতিতে আত্ম মিশাইতেছে—কত রূপ বিষাদের কারার মধ্যে ফুটিয়া অনাদরে ঝরিয়া পড়িতেছে। অনন্ত তাহাদের আদর করিয়া লইতেছে সত্য, তাহাদের মঙ্গল ভাব অনন্তের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে সত্য, কিন্তু সংসার কি তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে ? এই শত সহস্র মহিমাদিগের মধ্যে সহসা যে দু একটি সংসারের অনুগ্রহ নয়নে পড়ে—তাহারাই ক্ষণজন্মা,—ক্ষণের গুণেই তাহাদের আদর, তাহাদের মহিমা গুণে নহে। কেননা তাহাদের মত কিম্বা তাহাদের অপেক্ষা আরো ত এমন অনেক মহিমা সংসারে জন্ম লইয়াছে, কিন্তু তাহারা ত কই এই শুভাদৃষ্টদিগের ন্যায় আদর পায় নাই। কত শত সুকোমল সুগন্ধ ফুল রাশি কঠোর পদাঘাতে প্রতিদিন দলিত হইতেছে—কিন্তু ঐ যে দেখিতেছ গন্ধহীন শুষ্ক স্খলিতদল মালাগাছি অতি যত্নে এখনো রক্ষিত হইয়াছে—উহা কেবল এক শুভক্ষণের প্রণয়োপহার বলিয়া বইত নয় ?

সুহারও বোধ হইতেছে সেইরূপ একজন ক্ষণজন্মা, মহারাণীর নিকট সৌন্দর্য্য সম্মান পাইয়া তাহার রূপের প্রশংসায় সহর ধ্বনিত হইতেছে। রাজধানীতে কি আর তাহার মত কেহ সুন্দরী নাই, কেন মহারাণী নিজে কি কিছু কম রূপসী—কিন্তু ভীলকন্যার সৌন্দর্য্যের কথা ছাড়া আর কাহারো মুখে কোন কথা নাই। যাঁহারা আপনাদিগকেই এতদিন প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া জানিতেন—তাঁহারা কেবল এই প্রশংসায় ভ্রুকুঞ্চিত করিতেছেন ও মাঝে মাঝে নাসিকা তুলিয়া সুহারের কোথায় কোন খুঁৎটি আছে বাহির করিতে গিয়া আপনাদের ইচ্ছার বিপরীতেও তাহার রূপেরই ব্যাখান করিতেছেন।

মহারাণী স্বয়ং কাল ইচ্ছা করিয়া সুহারকে ডাকিয়া লইয়া এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন—জুমিয়ার হৃদয় একেই আহ্লাদে ভরিয়া গিয়াছে—তাহার উপর আজ আবার সকলেরি কাছে কন্যার এই সমাদরের কথা শুনিতেছে—জুমিয়া সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী ফিরিয়া গেল তখন তাহার যেন আর মাটিতে পা পড়ে না। বাহির হইতে আসিয়া প্রতিদিন যেমন সর্ব্বাগ্রে জঙ্গুকে দেখিতে যাইত, আজও আনন্দভরা হৃদয় লইয়া প্রথমেই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল—জঙ্গুর মুখ অতিশয় গম্ভীর, অতিশয় অন্ধকার,—বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি জুমিয়া জঙ্গুর এরূপ ভ্রুকুটিবদ্ধ অন্ধকার মুখ দেখে নাই। যে দিন জঙ্গু জুমিয়াকে নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন সেই দিন জুমিয়া তাঁহার এইরূপ মুখ দেখিয়াছিল। জুমিয়া চমকিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কেমন আছ ?"

জঙ্গু বলিলেন—"জুমিয়া এ সব কি শুনিতেছি—পাষণ্ড আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত !"

জুমিয়া কিছুই বুঝিল না—অবাক হইয়া রহিল।

হাকে তুই পরমবন্ধু বলিয়া ভাবিস—সে তোর কন্যাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছে, তোর বন্ধু, তোর প্রিয়তম, তোর পূজনীয়—

জুমিয়ার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, জুমিয়া বলিল—"বাবা, কি হইয়াছে ?"

জঙ্গু বলিলেন—

"সেই তোর প্রাণাপেক্ষা সুহৃৎ রাত্রে সুহারের সহিত লুকাইয়া দেখা করে—তাহার যাদু গুণে সুহার ধর্ম্ম ভুলিয়াছে জ্ঞান হারাইয়াছে, তাহাকে—সেই নরাধমকে সে ভাল-বাসে—তাহার জন্য সব করিতে পারে, তাহার জন্যই ক্ষেতিয়াকে বিবাহ করিতে অসম্মত—যাহার জন্য তুই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিস—তোর সেই প্রাণের বন্ধুর জন্য তোর মেয়েও ধর্ম্ম হারাইতেছে।"

বলা বাহুল্য জঙ্গুকে ক্ষেতিয়া সব কথা বলিয়াছে। সে যখন দেখিল গৌরীর অগ্র-গামী হইয়া আবার সুহার রাজার সহিত দেখা করিল তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না, সেই গণৎকারের পরামর্শ আর সে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না—পর দিনই সে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিল।

জঙ্গুর কথা শুনিয়া জুমিয়া পাগলের মত স্বরে বলিল—"মিথ্যা মিথ্যা! এ কি হইতে পারে ?"

জঙ্গু গৃহের অন্য দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"ক্ষেতিয়া এ কথার উত্তর দে। শুনিতেছিস তুই মিথ্যাবাদী।"

ক্ষেতিয়া সেই ঘরেই কিছু দূরে বসিয়াছিল জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, সে ক্রুদ্ধভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "মিথ্যা নহে, সব সত্য। আমার এই দুই চক্ষে দেখিয়াছি—রাত্রে সুহার রাজার সহিত একত্র বেড়াইতেছে, ইচ্ছা হয় সুহারকে জিজ্ঞাসা কর সেও এ কথা অস্বীকার করিবে না।"

জুমিয়ার রক্ত চন চন করিয়া উঠিল, সে দাঁড়াইয়া তাহার বজ্রমুষ্টি ক্ষেতিয়ার দিকে নিক্ষেপ করিল, এ কথা যে মুখে আনে সেই যেন শাস্তির যোগ্য। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, তাহার মুখের কঠোরতা অসহ্য কষ্টকর ভাবের বিকাশে প্রশমিত হইয়া পড়িল—জুমিয়া বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জঙ্গু বলিলেন—"প্রতিশোধ প্রতিশোধ, ইহা কাঁদিবার সময় নহে।"

জুমিয়া বলিল, "প্রতিশোধ! কি প্রতিশোধে ইহার প্রতিকার হইবে—কি প্রতি-শোধে সুহারের এ কলঙ্ক ঘুচিবে ?"

জঙ্গু সেই বজ্র স্বরে বলিলেন, "রক্ত, রক্ত সেই পাষণ্ডের রক্ত দিয়া এ কলঙ্ক ধৌত কর"

জুমিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখে আশার ভাব উদ্দীপ্ত হইল।

জঙ্গুর হৃদয় আশা পরিতৃপ্তির আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু জুমিয়া উত্তেজিত

স্বরে বলিয়া উঠিল "বাবা, বিবাহ, বিবাহ, রাজার সহিত সুহারের বিবাহ, নহিলে সহস্র প্রতিশোধে সহস্র রক্তপাতে এ কলঙ্কের অপনয়ন নাই"।

জঙ্গু তাহার কথায় অবাক হইলেন, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন—জুমিয়া কি বলিল! তীব্র বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "রাজা তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবে?"

জুমিয়া। "বাবা, আমার মেয়ে নাই—তুমি জান সুহার আমার মেয়ে নহে—ক্ষত্রিয় কন্যা। আমি রাজাকে তাহাই বলিব"—

একটু আগে জঙ্গুর দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল এবার জুমিয়া শোধ লইবে, নিরাশ হইয়া বলিলেন, "কাপুরুষ, যদি বিবাহ করে ত তোর কন্যা বলিয়া করিবে না—তাহাকে কন্যা দিবি? প্রতিশোধ প্রতিশোধ—এ অপমানের অন্য প্রতিকার নাই"—

জুমিয়া বলিল—"যদি বিবাহ না করে অঙ্গীকার করিলাম তাহার রক্তে এই অপমানের প্রতিশোধ লইব। জানিব সে সত্যই পাষণ্ড, আমার বন্ধু নহে ছদ্মবেশী শত্রু।"

বলিয়াই জুমিয়া জঙ্গুকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীর মহিলাগণ গৃহে ফিরিয়া গেলে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় রাজা ও সভাসদদিকের নৌকায় খানিকক্ষণ ধরিয়া বাচ চলিল। কিন্তু এবারকার বাচ বড় জমিল না, কেননা ইহাতে রাজার উৎসাহ প্রকাশ পাইল না,—সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই দাঁড়ি মাঝিগণ বাচ বন্ধ করিয়া অন্য অন্য ঘাটের ছোট ছোট সমারোহের নিকট দিয়া নৌকা আস্তে আস্তে কূলে কূলে চালাইয়া লইয়া চলিল। ঘাটে ঘাটে সুন্দরীগণ গান গাহিতে গাহিতে রাজার নৌকা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নত হইতে লাগিল, তাহাদের উৎসাহিত হৃদয়ের গীতি-উৎস রাজ দর্শনে দ্বিগুণ ভাবে উথলিত হইতে লাগিল। রাজার নৌকা সেই সকল দৃশ্যের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে সকল কিছুই আর রাজার নয়নে পড়িল না।

নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোট আবার মন্দির ঘাটে লাগিল, রাজা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তীরের দিকে চাহিলেন, তাহার পর কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন। তখনো তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় তীরের সেই রূপের দৃশ্য জাগিতেছিল, সেই পুষ্প সজ্জিত স্খলিত কেশা, সচকিত নয়না, মূর্ত্তিমতী শ্রীরূপিণী সলজ্জ গায়িকা প্রতিমা তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছিল, তাহার মনের মধ্যে তাহার চক্ষের সম্মুখে আকাশ পাতালে তাহা বিরাজ করিতেছিল, রাজার হৃদয় সেই অসংখ্য অনন্ত একই মূর্ত্তির মধ্যে তিল তিল করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার তাহা ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার হৃদয় বিশ্বের মত কেবলি শত তরঙ্গে উচ্ছ্বাসিত হইয়া সেই অনন্ত

মূর্ত্তির উপর যেন লীন হইতেছিল। রাজা নদী হইতে উঠিলেন—কিন্তু বাড়ী গেলেন না। সভাসদেরা সকলে অভিবাদন করিয়া গৃহে ফিরিল, তিনি সেই উন্মত্ত, ঘূর্ণ্যমান মদির-বিহ্বল আলোড়িত মস্তক লইয়া নদী তীরে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিছু পরে প্রহরীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"গণপতি ঠাকুরকে এই-খানে ডাকিয়া আন"।

গণপতি এখন আর মন্দিরে থাকেন না, যতদিন নূতন মন্দির শেষ না হয় ততদিন রাজপ্রাসাদেরই একটি কক্ষে গণপতির আবাস। গণপতি আসিয়া দেখিলেন, মহারাজের মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত অথচ অন্ধকার, শুষ্ক অধর, ওষ্ঠের উপর সজোরে রক্ষিত, কি যেন আবেগ ভরে বাম হস্ত নবীন শ্মশ্রু জালে ঘন ঘন অর্পিত হইতেছে, দক্ষিণ হস্ত কটীস্থ তরবারিতে মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আছে। গণপতিকে দেখিয়া মহারাজ সহসা যেন বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মন্দির সোপানে উপবিষ্ট হইতে কহিয়া নিজেও সেই সোপানে উপবিষ্ট হইলেন। খানিকক্ষণ তাঁহাদের মৌণভাবেই কাটিল। রাজা কি বলিবেন যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিছু পরে বলিলেন "ঠাকুর আপনার সহিত আমি একটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাই"।

রাজার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া গণপতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কম্পমান স্বরে—তাঁহার অসময়ের এই কথায় আরো ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "পরামর্শ! এখনি বলিতে আজ্ঞা হউক"

রাজা বলিলেন—একটু থামিয়া বলিলেন—'কথাটা এই, আমি জানিতে চাই, রাজার কাজ কি? আপনি কি বলেন?"

গণপতি অবাক হইলেন, কি ভাবিয়া রাজা ইহা বলিতেছেন বুঝিলেন না; বলিলেন রাজার কাজ? প্রতিপালন।"

রাজা। "প্রতিপালনের অর্থ কি? প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দ রক্ষা করা?"

গণপতি। "হ্যাঁ রক্ষা করা।"

রাজা। "তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দ রক্ষার জন্যই দণ্ডবিধির আবশ্যক?"

গণ। হাঁ। যথার্থ—

রাজা। "কেবল দণ্ডবিধি নহে—সমাজ বিধিরও আবশ্যক?"

গণপতি। "অবশ্য অবশ্য—"

রাজা। "যখন দেখা যায়—কোন প্রতিষ্ঠিত বিধি সাধারণ সুখ স্বচ্ছন্দের পক্ষে হানিকর তখন সে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করা রাজার অবশ্যই কর্ত্তব্য?"

গণপতি। "অবশ্য অবশ্য।"

রাজা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ঠাকুর আমি বিবাহ সম্বন্ধে একটি নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে চাই—"

গণপতি চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন "বিবাহ সম্বন্ধে ?"

রাজা বলিলেন—"হাঁ বিবাহ সম্বন্ধে। বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক বিধি বড়ই মন্দ—"

গণপতি। "কিন্তু বিবাহ কি সামাজিক বিধি ? ইহা স্বয়ং ভগবান মনু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অন্যে কি—"

রাজা বলিলেন—"মনু যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাহা আর এখন ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া চলিত নাই, আমি তাহাই পুনঃ প্রচলন করিতে চাই"—

গণ। "তাহাই পুনঃ প্রচলন করিতে চান ?"

রাজা। "হাঁ। মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—"

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ সা চ বিশঃ স্মৃতে
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চস্বা চাগ্রজন্মণঃ।

কিন্তু এখন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি নিজ বর্ণের কন্যা ব্যতীত অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন তবে তাহা ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ হইবে না,—কি ভয়ানক—"

গণপতি। "কলিযুগ—মহারাজ কলিযুগ—!"

রাজা। "কিন্তু কলিযুগে মানুষও জন্মিতেছে তাহাদের সুখ দুঃখও উপেক্ষনীয় নহে"

গণপতি। "তাহা সত্য।"

রাজা। "তাহা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনার আজ্ঞায় আমি মনুর বিধান পুনঃ প্রচলন করি"

গণ। "কিন্তু সে রূপ লোক কোথায় যাহারা সাহস করিয়া আমাদের বিধান পালন করিবে ?"

রাজা। "আর কেহ না করুক, আমি করিব, এই বিধান যে ধর্ম্মসঙ্গত বিধান, ইহা আমি দেখাইব—"

গণপতির সহসা বোধ জন্মিল, এতক্ষণ পরে রাজার হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিলেন, গণপতি সহসা বলিয়া ফেলিলেন—"মহারাজ ভীলকন্যাকে আপনি বিবাহ করিতে চান ?—"

রাজা চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

গণপতি বলিলেন—"কিন্তু তাহাতে ত নূতন বিধির আবশ্যক কিছু দেখি না,—কোন গর্ব্বিত ভীল পিতাও তাহার কন্যাকে আপনার দাসী করিতে সৌভাগ্য জ্ঞান না করিবে ? আপনার ইচ্ছা প্রকাশের মাত্র অপেক্ষা"।

রাজা কি বলিতে যাইতেছিলেন—আর বলা হইল না, দেখিলেন যেন তাঁহাদের দিকে কে অগ্রসর হইতেছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই জমিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জুমিয়ার দিকে মহারাজ বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিলেন, জুমিয়ার দৃঢ় মুষ্টিতে বর্ষা, মুখ যন্ত্রণা পীড়িত ভীষণ, জুমিয়া বিনা অভিবাদনে সোজা হইয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া, কম্পবান তীব্র কণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমি কেবল তোমাকে ভালবাসিয়াছি, প্রাণের মত বন্ধু ভাবিয়াছি, ভালবাসিয়া অনেক সহিয়াছি, মহারাজ এই অপরাধে কি তুই আমার বুকে ছুরির অধিক মারিলি? আমার মেয়েকে কলঙ্কিত করিলি?—

ভীল আর পারিল না—রাজার পদতলে বসিয়া পড়িল, আবার বালকের মত দুই চক্ষু তাহার জলে ভাসিতে লাগিল।

মহারাজ বলিলেন "মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!"

জুমিয়া চোখ মুছিয়া, শান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল "মিথ্যা তাহা আমি জানি। আমি তোকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার আর কেহ ত ইহা বিশ্বাস করিবে না।"

রাজা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "বিশ্বাস করিবে না, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না?"

জুমিয়া। "না তাহা করিবে না, মহারাজ তোমার ব্যবহারে আমাদের নামে যে কলঙ্ক উঠিয়াছে তোমার ব্যবহারেই সে কলঙ্ক দূর হইতে পারে, তোমার কথায় হইবে না।"

গণপতি বলিলেন—"জুমিয়া তোর কন্যাকে"—

জুমিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল—"মহারাজ এ কলঙ্ক মোচনের একমাত্র উপায় আছে।

মহা। 'কি'?

জুমিয়া। "সুহারকে তোমরা বিবাহ করিতে হইবে,"

রাজা এতক্ষণ বিবাহের জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু যখনি জুমিয়া দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে বলিল—তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে—তখনি রাজা বলিলেন—"অসম্ভব—তোমরা ভীল আমরা ক্ষত্রিয়।"

ভীল বলিল—"অসম্ভব নহে। আমরা ভীল, কিন্তু সুহার ভীল নহে, সে ক্ষত্রিয় কন্যা।"

"সে ক্ষত্রিয় কন্যা"! গণপতি ও রাজার মুখ হইতে এক সঙ্গে এই বিস্ময়-সূচক কথা উত্থিত হইল।

জুমিয়া বলিল "হাঁ সে ক্ষত্রিয় কন্যা। সুহারমতীর তীরে তাহাকে পাইয়াছিলাম, আমি এখনো শুনিতেছি তাহার মা আমাকে বলিতেছেন 'ক্ষত্রিয়ানীর শিশুকে লও'।"

সুহারের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত ভীল সবিশেষ বলিয়া গেল। ভীলের কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, সে যে ক্ষত্রিয় কন্যা তাহার মূর্ত্তিতেই তাহার প্রমাণ। রাজার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল।

ভীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এখন বল বিবাহ করিবে কি না? এ বিবাহে আপত্তির আর কিছুই নাই—এখনো যদি সম্মত না হও তবে ইহাই আমার ভরষা।" সে বর্ষা উত্তোলন করিল।

আবার জোরের কথা, ভয় প্রদর্শন! রাজার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, কিন্তু রাজার জীবনে এই প্রথমবার অন্য ভাবের উচ্ছাসে সে ভাব লীন হইয়া পড়িল,রাজা বলিলেন—"জুমিয়া, আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তোমার ভয়েও নহে, অস্ত্রের ভয়েও নহে। যদি অস্ত্র দেখাইয়া আমাকে বিবাহ করাইতে চাও, ত বিবাহ হইবার কোন আশা দেখিতেছি না, সুতরাং ও কথা না বলিলেই ভাল।"

ভীল বর্ষা কটিতে রাখিয়া বলিল—"যদি বিবাহই হইবে ত এখনিই বিবাহ হউক, আজি রাত্রে।"

গণপতি বলিলেন "আজই বিবাহ! জুমিয়া তুই পাগল হইয়াছিস?"

জুমিয়া বলিল—"হাঁ আমি পাগল হইয়াছি, যতক্ষণ রাজা আমার কন্যার কলঙ্ক দূর না করিতেছেন, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নাই, বিশ্বাস নাই, কাহাকেও নির্ভর নাই। আমি যখন বাড়ী যাইব, রাজার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে যাইব, নহিলে আমার দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।"

রাজা বলিলেন—"গণপতি, আমি আজই বিবাহ করিব, রাত্রে আজ লগ্ন কখন?"

গণপতি মুখে মুখে গণনা করিয়াই বলিলেন, "চতুর্থ প্রহরে লগ্ন আছে, সেই সময় বিবাহ হইতে পারে"

জুমিয়া। "মহারাজ আমার আর একটি প্রার্থনা। গোপনে বিবাহ হইবে না, রাজার মত সমারোহ করিয়া বিবাহ হউক, সৈন্য সামন্ত সভাসদ সকলেই এ বিবাহে বরযাত্র হউক, আমি সকলের সমক্ষে আমার নিজের বাটীতে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব এই প্রার্থনা।"

রাজা বলিলেন—"তাহাই হউক। ঠাকুর, সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিন।"

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার বিবাহ বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইল। গৌরী পূজার উৎসব না থামিতে থামিতে বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই শুনিল সুহার ক্ষত্রিয়ানী। সৈন্য সামন্তেরা সজ্জিত হইতে হইতে ভীলকন্যার ও মহারাজের জয়ধ্বনি তুলিল। অন্তঃপুরে রাণীও শুনিলেন, মহারাজের আজ বিবাহ। তিনি বলিলেন, মহারাজ

নিজে এখবরটা দিতে আসিলেন না—এই দুঃখ, না দিন আমি নিজে কন্যা সাজাইয়া বিবাহ সভায় তাঁহার উপহার লইয়া যাইব।" রাণী আপনার অলঙ্কার বসন ভূষণ লইয়া জুমিয়া ভবনে গোপনে গমন করিলেন। রুক্মা রাণীর ব্যবহারে অবাক হইয়া ঘরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল এবং সুহারের প্রতি অবিরত অযথা বাক্য বর্ষণ করিতেও ছাড়িল না।

তৃতীয় প্রহরে রাজা সসৈন্য সসামন্ত জুমিয়ার বাটীর মাঠে আগমন করিলেন। যেমন সহসা বিবাহ, বিবাহের বন্দবস্তও তদনুযায়ীক। জুমিয়ার ক্ষুদ্র বাটীতে এত বরযাত্রের স্থান নাই, এই মাঠই বিবাহের সম্প্রদান-সভা। এ সভায় সকলেই অশ্ব পৃষ্ঠে আসীন, কন্যা আগমন করিলে সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই কন্যা সম্প্রদানিত হইবে। সকলেই উৎসুক কখন কন্যা আনীত হইবে, কিন্তু তথাপি জয়ধ্বনি, হাস্য পরিহাসে, আমোদ উল্লাসে সকলের সময়ই দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিল, কেবল রাজা প্রতি মুহূর্ত্ত যুগের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন, বিবাহের এই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ই কেবল অজ্ঞাত বিষাদে পরিণত হইল, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আগত মিলন সম্মুখে অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, যেন সেই মিলনের মধ্যে একটা অনন্ত ব্যবধান পড়িয়া আছে,একটা বিভীষিকা আলেয়ারমত তাঁহার নিকট জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। যখন চতুর্থ প্রহর শেষ হইল, সৈন্যসামন্তদিগের হস্তের দীপমালা মলিন করিয়া মুক্ত মাঠে উষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে চাহিল, পুরোহিত যখন সুহারের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা পূর্ব্বক তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তাহাকে পুনঃ প্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রাজার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। এক সঙ্গে শত শত দীপ মালার রশ্মি সেই সালঙ্কৃতা সসজ্জা যুবতীর মুখে বিভাসিত হইল,তাহার দিকে চাহিয়া তাহার পশ্চাতের দীন হীনবেশা বিষাদিনীর প্রতি আর মহারাজের দৃষ্টি পড়িল না। ঠিক এই গাছতলায় বহুদিন আগে উষালোকে তিনি একটি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, উষার ন্যায় কল্যাণময়ী সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তি রাজার মনে পড়িল, সেই মূর্ত্তিই কি এখন এই প্রখর জ্যোতির্ম্ময়ী যুবতীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে?

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ অবতরণ করুন।" শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনির মধ্যে মহারাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বৃক্ষতলে আগমন করিলেন, জুমিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিবে বলিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু জুমিয়া আগুয়ান না হইতেই রাণী সুহারের হাত ধরিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"মহারাজ আমি ঈর্ষা বশতঃ তোমার সুখের পথে বাধা দিই নাই নিজ হস্তে আপনার সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি গ্রহণ কর।"

রাণীর শেষ কথা আর শোনা গেল না, সহসা একটা দারুণ কোলাহল উঠিল, রাণী চমকিয়া চাহিলেন, রাজা, পুরোহিত, জুমিয়া সকলেই চমকিয়া চাহিলেন, দেখিলেন,

সৈন্য সামন্ত ঠেলিয়া হরিদাচার্য্য উন্মত্তের মত দ্রুতবেগে এইদিকে আসিতেছেন, আর বলিলেছেন "সাবধান! সুহার ক্ষত্রিয়ানী নহে, ব্রাহ্মণ কন্যা। বিবাহ বন্ধ হউক, বিবাহ বন্ধ হউক।"

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কাণ্টের দর্শন যদি তেমন একজন পাকা বারিষ্টারের আড় প্রশ্নোত্তরের (Cross examination এর) পাল্লায় পড়ে, তবে তাহার বিপদ উপস্থিত হয়, যথা ;—

বারিষ্টারের প্রশ্ন। তুমি এ কথা বলিয়াছ—যে, ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কোন একটা বহির্বস্তুর গুণ-সঞ্চার হইলে ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সেই বহির্বস্তুকে আপনার আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে যায় ?

কাণ্টের উত্তর। হাঁ উহা আমারই কথা বটে।

প্রশ্ন। তুমি আর-এক স্থানে এ কথা বলিয়াছ যে, আমরা যাহাকে বহির্বস্তু বলি তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—জ্ঞান-ছাড়া তাহা কিছুই নহে ? এরূপ কথা বলিয়াছ কি না ?

উত্তর। আমি এই বলিয়াছি যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। বাহির হইতে গুণ-পরম্পরা একটি-একটি করিয়া ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া সেই-সমস্ত বিচ্ছিন্ন গুণ-পরম্পরার মোট বাঁধিয়া সমস্তটা এক যোগে গ্রহণ করে, আর, এইরূপ স্থির করে যে, সে-যাহা সে গ্রহণ করিল তাহা শুদ্ধ কেবল গুণ-সমষ্টি, কিন্তু তাহার মূলে বস্তু কোন না-কোন অবশ্যই আছে,—কিন্তু সেই যে, বস্তু, তাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত,—ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে গুণই কেবল উপস্থিত ; বস্তু ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত—অথচ আমাদের জ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব তত্ত্ব যে, তাহা আছেই আছে—তাহা না থাকিলেই নয়। তাই বলি যে, বস্তু-তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার, প্রত্যয়েরই ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে—বহির্ব্যাপার নহে। ইহার একটি উদাহরণ ;—মনে কর "ঈ" এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করিতে ঠিক্ দুই মুহূর্ত্ত সময় লাগে ; আর, মনে কর সেই ঈ ধ্বনিটি আমার কর্ণে উপস্থিত হইল। দুই মুহূর্ত্ত ধরিয়া ঈ ধ্বনিত হইল ; সুতরাং প্রথম

মুহূর্ত্তে সমস্ত ঈ-ধ্বনি নহে—তখন শুদ্ধ কেবল "ই" এইটুকু উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সেইরূপ আর একটি "ই" উপস্থিত হইল; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র ঈ-ধ্বনি (দীর্ঘঈ) উপস্থিত হয় নাই—দুই মুহূর্ত্তে দুইটি "ই" (হ্রস্বই) পরে পরে উপস্থিত হইল—এই পর্য্যন্ত। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে যখন দুই মুহূর্ত্তে দুইটি হ্রস্ব ই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইল—জ্ঞান তখন কি করিল? না সেই দুইটি হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া একটি দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিল; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং তথায় আর একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইল—এই মাত্র; সমগ্র দীর্ঘ ঈ কোন কালেই ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সমগ্র দীর্ঘ ঈ জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে। তা শুধু নয়—ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই দুইটি● জ্ঞানেরই গড়িয়া-তোলা জিনিস্। কেননা, দুই মুহূর্ত্তে যেমন দীর্ঘ ঈ বাহির হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তে তেমনি হ্রস্ব ই বাহির হইয়াছে; অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তে হ্রস্ব ই অপেক্ষাও হ্রস্বতর ই বাহির হইয়াছে—সন্দেহ নাই; অতএব, জ্ঞান যেমন দুই হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া এক দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিয়াছে—তেমনি দুই হ্রস্বতর ই জুড়িয়া এক হ্রস্ব ই গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমে, দীর্ঘ ঈ ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই আইসে—হ্রস্ব ই ধরিতে গেলে হ্রস্বতর ই আইসে—হ্রস্বতর ই ধরিতে গেলে আরো হ্রস্বতর ই আইসে—ঈ-ধ্বনির মূলান্বেষণ অবশেষে হ্রস্বতম ই'তে গিয়া ঠেকে; কিন্তু হ্রস্বতম ই ধরিতে ছুঁইতে পাইবার বস্তু নহে—জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। ব্যাপারটি ঠিক্—"ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল!" অতএব নিছক যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই না বলিলেই হয়; ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরাকে জ্ঞান যখন নিজ-গুণে—হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈ বা একটা কোন কিছু করিয়া গড়িয়া তোলে, তখনই তাহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিষয় (যেমন ঈধ্বনি) তাহা ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরারই সমষ্টি বন্ধন; ঐন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কেবল গুণই উপস্থিত হইয়াছে (যেমন ই ই) তাহা ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত হয় নাই; অতএব ইহা নিঃসংশয় যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের অভ্যন্তরে "বস্তু" যাহা আমরা অবধারন করি, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আদবেই কোন হস্ত নাই—তাহা নিছক জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেরূপ জ্ঞান-গত বস্তু ছাড়া জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না? ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহা আমি জানি না; কেন না, মনে কর যেন তাহা বাস্তবিকই আছে—কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাহার থাকা-না-থাকা বিষয়ে আমি হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহাই যেন তুমি জান না, কিন্তু জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে—এটা অবশ্য তুমি জান?

কাণ্ট। এ আবার কিরূপ প্রশ্ন! আছে কি নাই—তাহাই যখন আমি জানি না, তখন তাহা কার্য্য করে কি করে না তাহা আমি কিরূপে জানিব? তোমার সন্তোষের জন্যই হউক, বা আমার আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই হউক—আমি যেন বলিলাম যে, তাহা কার্য্য করে; কিন্তু তাহা আছে কি নাই তাহা আমি জানি না—সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে যে, তাহা মূলেই নাই, তাহা যদি হয় তবে আমার সে কথা কোথায় রহিল? যে—কার্য্য করিবে সে নাই অথচ আমি বলিতেছি যে, সে কার্য্য করিতেছে! ইহা অপেক্ষা হাস্য জনক ব্যাপার আর কি আছে? অতএব আমি যখন বলিলাম যে, আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, তখন তাহাতেই তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, কার্য্য করে কি করে না তাহাও আমি জানি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি নাই তাহাও তুমি জান না, কার্য্য করে কি করে না তাহাও তুমি জান না; কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, বহির্বস্তু কার্য্য করে; কেন না তুমি গোড়াতেই বলিয়াছ যে, বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে। জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে কি করে না এই-টিই তুমি জান না; কিন্তু বহির্বস্তু কার্য্য করে—এটা তুমি বিলক্ষণই জান;—তবেই হইতেছে যে, তুমি যাহাকে বহির্বস্তু বলিতেছ তাহা জ্ঞানাতীত বস্তু নহে। আবার ইহাও তুমি বলিয়াছ যে, সেই যে বহির্বস্তু, যাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে, তাহা তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাহা তেমার ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। কেননা তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছ যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত হয় না—গুণই উপস্থিত হয়। তা শুধু নয়—তোমার কথা অনুসারে আরো এইরূপ দাঁড়ায় যে, গুণের মোটবন্ধন কার্য্যেও জ্ঞানের বিলক্ষণ হস্ত রহিয়াছে, অতএব ধরিতে গেলে—গুণও জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; কিন্তু সে কথা এখন যাইতে দেও। এখন কেবল বস্তুর কথা হই-তেছে। তোমার চরম সিদ্ধান্ত তবে এই;—বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে; আর, সেই যে বহির্বস্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে, তাহা জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, বহির্বস্তু যাহা তোমার জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার তাহাই তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিয়া তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমার জ্ঞান যদি গোড়াগুড়িই জাগ্রত থাকে, তবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য আবশ্যক হয় না; আর, তোমার জ্ঞান যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে তাহার নিজেরই একটি ব্যাপার কিরূপে তাহাকে জাগাইবে? প্রসুপ্ত জ্ঞানের "ব্যাপার"

আবার কি? ব্যাপার বন্ধ থাকা'র নামই তো প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত জ্ঞান (ব্যাপার খরচ করিয়া) কিরূপেই বা আপনাকে আপনি জাগাইবে? তুমি যখন নিদ্রায় অভিভূত তখন কি তুমি আপনাকে আপনি জাগাইতে পার—না তুমি পড়িয়া গেলে আপনাকে আপনি স্কন্ধে করিয়া উঠাইতে পার? ইহা সুনিশ্চিত যে, প্রসুপ্ত ব্যক্তি নিজের কোন ব্যাপার দ্বারা আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, বহির্বস্তু—যাহা তোমার জ্ঞানের (প্রসুপ্ত জ্ঞানের) নিজেরই একটি ব্যাপার, তাহাই তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে! এটা কিরূপে সম্ভবে?

কাণ্ট যে ইহার কি উত্তর দিবেন—আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা বেদান্তের কূলে নিরাপদে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি যে, কাণ্ট এত কিনারায় আসিয়াছেন যে, ডাঙায় উঠিলেই হয়; তাহা না করিয়া তিনি শুধু শুধু অনর্থক—সাধ করিয়া—সংশয়ের তুমুল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। গোড়াতে কাণ্ট এই কথা বলিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইত যে, বস্তুতত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত—অতএব তাহা যে, শুধু কেবল তোমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার বা আমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার—তাহা নহে, তবে কি? না তাহা সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের একটি ব্যাপার, তাহা সর্ব্বজ্ঞানের ব্যাপার; প্রত্যেক জ্ঞানের অভ্যন্তরেই সর্ব্বজ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে; প্রসুপ্ত জ্ঞানের অভ্যন্তরেও সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জাগ্রত আছেন।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"—কঠোপনিষদ্।

ইহার অর্থ;—সুপ্তেতে সুপ্তেতে জাগ্রত থাকিয়া যিনি সকলেরই প্রয়োজনীয় বিষয় সকল নির্ম্মাণ করেন তিনিই শুক্র তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হ'ন; সর্ব্ব-জগৎই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞানেরই ব্যাপার; সর্ব্বজ্ঞানই প্রসুপ্ত ব্যষ্টি জ্ঞানকে (জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞানকে) জাগাইয়া তুলিবার মূলাধার। যদি বল যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞানকে কি রূপে জানিলে? তবে তাহার উত্তর এই যে, যেমন খণ্ড আকাশ দেখিবা-মাত্র আমি অসীম মহাকাশকে সেই সূত্রে উপলব্ধি করি,—সেইরূপ, ব্যষ্টি জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যষ্টি জ্ঞানের অভ্যন্তরেই যে, সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—ব্যক্তিগত জ্ঞানের (limited experienceএর) অভ্যন্তরেই যে, সার্ব্বভৌমিক নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ভিতরে ভিতরে জাগিতেছে,—কাণ্টের সমস্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত জুড়িয়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা, কাণ্টের সমস্ত মূলতত্ত্ব-গুলিই সার্ব্বভৌমিক এবং নির্ব্বিকল্প—একটিও ব্যক্তিগত নহে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অভ্যন্তরে সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম—জাগ্রত রহিয়াছেন। ইহাই

প্রথমে, সত্য-জিজ্ঞাসা। মূল-সত্য কি—ইহার অন্বেষণ। জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে। জিজ্ঞাসা হয় না কাহার? না প্রথমতঃ যাহার মূলেই জ্ঞান নাই তাহার; দ্বিতীয়তঃ যাহার জ্ঞানের অভাব-বোধ নাই তাহার। জিজ্ঞাসাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানও আছে—জ্ঞানের অভাব-বোধও আছে; জিজ্ঞাসাতে জ্ঞানাজ্ঞান প্রকাশ পায়—অল্প-জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্য-জিজ্ঞাসা অল্পজ্ঞ জীবের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য ভ্রম।—জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমে আমরা যাহাকে তাহাকে মূল সত্য বলিয়া অবধারণ করি; সদ্দারের উপরেও যে সদ্দার রহিয়াছে—এটা আমরা ভুলিয়া যাই। কেহ বলেন যে, যান্ত্রিক বলই মূল সত্য; কেহ বলেন তাড়িত পদার্থই মূল সত্য; কেহ বলেন প্রাণই মূল সত্য; ইত্যাদি। বৈদান্তিক ভাষায় ইহারই নাম রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, অসত্যে সত্য-ভ্রম—অবিদ্যা। অবিদ্যাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জগতের মধ্যস্থিত কোন বস্তুরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—সমস্তই আপেক্ষিক; বৈদান্তিক ভাষায়—জগতের সমস্ত বস্তুই সদসদাত্মক, কোন বস্তুই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্যভ্রম সদসদাত্মক প্রকৃতির অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য জ্ঞান। মূল সত্য কি—সর্ব্ব জগতের মূলাধার কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়েও এটা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মূল সত্য আছেই আছে—আপেক্ষিক সত্যের মূলে নিরবলম্ব স্বয়ম্ভু সত্য না থাকিলেই নয়। এইরূপ অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে কি প্রকাশ পায়? না জ্ঞানের নিজ মাহাত্ম্য। জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে; অভ্রান্ত নিশ্চয়তা ঠিক্ তাহার উল্টা দিক্ হইতে—জ্ঞানের প্রভাব-বোধ হইতে—উৎপন্ন হয়। অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, জীবের অল্প জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান জাগিতেছে—এবং সেই সর্ব্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের অল্প জ্ঞান এবং প্রকৃতির সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্তা উভয়ই প্রাণ ধারণ করিতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত সত্যজ্ঞান সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের অস্তিত্ব-সূচক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈদান্তিক সত্যের একটি অন্তঃশিলা সরস্বতী নদী তলে তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু হইলে হইবে কি—এক সর্ব্বগ্রাসী সংশয় আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পারমার্থিক সত্য ঐ যাহা দেখা গেল তাহা কি বাস্তবিক সত্য—বস্তুগত সত্য—না শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানগত সত্য, এইটির মীমাংসা করিতে গিয়া কাণ্ট অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যদি এমন হইত যে, আমাদের জ্ঞান একটা সৃষ্টিছাড়া বস্তু—আমাদের জ্ঞানের সহিত কোন বস্তুরই কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই—

ভিতরে সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং সমস্ত জ্ঞানের সহিত যোগ-সূত্রে আবদ্ধ—জ্ঞানই যখন সমস্ত জগতের সারাংশ এবং সমস্ত বাস্তবিকতার মূল, তখন জ্ঞান-গত পারমার্থিক সত্য কিসে যে অবাস্তবিক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উল্টা আরো দেখা যায় যে, যাঁহারা বাস্তবিক সত্যের প্রয়াসী তাঁহারা ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হ'ন ;—অবিদ্যার পথই অবাস্তবিক মৃগতৃষ্ণার পথ, জ্ঞানের পথই বাস্তবিক সত্যের পথ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য ঐন্দ্রিয়ক সত্য নহে বলিয়াই কি তাহাকে অবাস্তবিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ? তাহা যদি করিতে হয়, তবে শুধু তত্ত্বজ্ঞান কেন—বিজ্ঞানও এক-মুহূর্ত্ত-কাল টেঁকেন না। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীকে কেহ ঘুরিতে দেখে নাই—অতএব পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা সত্য নহে। এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের (মিশ্র জ্ঞানের) কথাতেই যখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা তাহা অপেক্ষা আরো কত না শ্রদ্ধেয়। কাণ্টের দর্শন হইতে সংশয়ের আবরণটি অপসারিত করিলেই আমরা অমূল্য সত্য-রত্নের দর্শন পাই—নচেৎ এমান এক বিষম পাকচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যাই যে, সেখান হইতে উদ্ধার পাওয়া দেবতারও অসাধ্য। বেদান্ত-দর্শনে ঠিক্ ইহার বিপরীত দেখা যায় ; বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সংশয় দূরে থাকুক—তাহার প্রতি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি-ভূমি। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিজ-মূর্ত্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তাহার ছায়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিলেন। একজন ছুতার মিস্ত্রী একটা হীরক অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে ; কিন্তু তাহা হীরক কি না তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, ইহাতে তো কাচ কাটিতে পারা যায়—আপাততঃ এই ঢের ! একজন জহরী সেই হীরকটি পাইয়া তাহাকে আপনার কণ্ঠাভরণ করিয়া রাখিল। কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কাণ্টের দর্শন ছুতার মিস্ত্রী, বেদান্ত-দর্শন জহরী ; আর, দুয়ের মধ্যে ঐক্য এই যে, উভয় দর্শনই হীরক (পারমার্থিক সত্য) হস্তে পাইয়াছে। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়া গাঁথাইলেন—বেদান্ত দর্শন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। এক যাত্রায় কত না পৃথক ফল ! বেদান্ত দর্শনের সকল কথা সবিস্তরে বলিতে গেলে বৃহৎ এক পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা না করিয়া আমরা যত সংক্ষেপে পারি তাহার সার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করিয়াই এবারকার মতো ক্ষান্ত হইব।

বেদান্তের পথ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই ;—এপারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ওপারে ব্রহ্ম-জ্ঞান, মাঝখানে ভ্রম-নদী। ভ্রম নদী একই নদী—ও-পার হইতে দেখিলে তাহা ঈশ্বরের ঐশী-শক্তি, এ-পার হইতে দেখিলে তাহাই জীবের অবিদ্যা। ভ্রম নদী পার হইয়া ও-পারে যাইতে হইবে—তাহার উপায় অবলম্বন করাই সাধন। ভ্রম-নদীর ও-পারে পৌঁছিলেই

বেদান্তের এই যে, পথ-বৃত্তান্ত—বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহা এক দিনের পথ-বৃত্তান্ত; অবশ্য ব্রহ্মার এক দিন। এ কেবল সঙ্গীতের নীচের সা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া এক সপ্তক পার হইয়া উপরের সা'য়ে যাওয়া; কিন্তু সপ্তকের উপর সপ্তক রহিয়াছে—জিজ্ঞাসা'র উপর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে—ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে—মুক্তির উপর মুক্তি রহিয়াছে; তবে কি না—এক সপ্তকের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল সপ্তকেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়—সৌর-জগতের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল জগতেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়। অতএব, বিজ্ঞানকে কম্‌টি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, সৌর-জগতের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই—সৌরজগতের বৃত্তান্তটিই ভাল করিয়া জান, এটি অতি সৎপরামর্শ তাহাতে আর ভুল নাই। আমরা তাই বলি যে, বেদান্ত এক সপ্তকের বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—ভালই করিয়াছেন, কেননা সাধনের পক্ষে সেইটুকুই কেবল প্রয়োজন,—তাহার অধিক আপাততঃ কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হইবে—এইটি বুঝিলেই মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে যত্নবান্ হইতে পারে; ইহার উপরে অধিকন্তু এইটুকু কেবল টীকা করা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমেই যে, সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হইবে ইহা অসম্ভব। প্রথম উদ্যমের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথম উদ্যমেরই ব্রহ্মজ্ঞান—প্রথম উদ্যমেরই মুক্তি—উপার্জ্জিত হইতে পারে। তাহার পরে দ্বিতীয় উদ্যমের জিজ্ঞাসার পর দ্বিতীয় উদ্যমের মুক্তি—এইরূপ তৃতীয়—চতুর্থ—ইত্যাদি অনন্ত ব্যাপার প্রসারিত রহিয়াছে। জীবাত্মা সাধন-দ্বারা অবিদ্যা হইতে প্রথম-ধাপের মুক্তি লাভ করিলে পরমাত্মা যে তাহাকে কতখানি কৃতার্থ-করিবেন, তাহা পরমাত্মারই হস্তে। সুতরাং তাহা বলিবার কহিবার কথা নহে—তাহা বলিবার কহিবার অধিকার কাহারো নাই—ক্ষমতাও কাহারো নাই। তাহা সাধনের ব্যাপার নহে যে, তাহার কেহ উপদেশ দিবেন! তাহা উচ্ছ্বাসেরই ব্যাপার—পরমাত্মার স্বহস্তের ব্যাপার—প্রসাদামৃত-বর্ষণ! তাহা উপদেশের কোন ধারই ধারে না। ব্যাকরণ শিখিবার সময় কালিদাস অবশ্য আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা লিখিবার সময় তিনি কাহারো উপদেশ গ্রহণ করেন নাই—তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহার শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করন-মাত্র হইত, তাহার অধিক আর কিছুই হইত না। উচ্ছ্বাসের ব্যাপার উপদেশের বিষয় নহে, তাই বেদান্ত দর্শন এই বলিয়াই এক কথায় সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি হইলেই—মুক্তি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া উচ্ছ্বাসের ব্যাপারটি কাহারো উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। মনে কর যেন জীবাত্মা অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে—তাহা হইলে সে কোথায় যাইবে? অবশ্য পরমাত্মার ক্রোড়ে। এ

করিবে—আর, তখনও কি পরমাত্মার অমৃত ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইতে পারে? জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতে প্রীতি সমর্পণ করিতেছে, তখন পরমাত্মার ভাণ্ডারে কি প্রীতি-ধনের এতই অনটন যে, জীবাত্মার প্রীতির তিনি প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থ হইবেন? কখনই না! পরমাত্মার প্রেম-ভাণ্ডার অপরিসীম; তিনি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই জীবাত্মাকে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিবেন—জীবাত্মা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে হয়! তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত ঢালিয়া দিবেন—অথচ তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার কোন কালেই ফুরাইবে না—"আর কিছুই দিবার নাই" এরূপ হইবে না, জীবাত্মারও "আর কিছুই গ্রহণ করিবার নাই" এরূপ হইবে না। তাই আমরা বলি যে, জীবাত্মার উত্তরোত্তর সাধনের পরিপাকাবস্থায় অবিদ্যার উত্তরোত্তর বন্ধনচ্ছেদ হয়; আর যখন যখন বন্ধন-চ্ছেদ হয় তখন তখনই জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রভাব বিকসিত হয় এবং প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এইরূপ—পরমাত্মার উত্তরোত্তর প্রসাদ-বর্ষণই জীবাত্মার উত্তরোত্তর মুক্তি।

সমস্ত বেদান্তের এবং কাণ্টের আদ্যোপান্ত সমন্বয় করিয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি যে,

প্রথমতঃ সত্য জিজ্ঞাসা জীবাত্মারই জিজ্ঞাসা—পরমাত্মার নহে; এইখানটিতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ।

দ্বিতীয়তঃ সত্যজ্ঞান জীবাত্মার এবং পরমাত্মার উভয়েরই—মূলে তাহা পরমাত্মার এবং তাঁহার প্রসাদে তাহা জীবাত্মার। এই খানটিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য।

তৃতীয়তঃ জীবের সত্য জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরে যেমন সত্য জ্ঞান বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তেমনি তাহার সত্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরেও উচ্চতর সত্যের জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরমাত্মার সত্য জ্ঞান পরিপূর্ণ, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান আংশিক; পরমাত্মার সত্য-জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান তাহার আভাস মাত্র; এইটি ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়েই বেদান্ত দর্শন বলেন যে, পরমাত্মা স্বরূপ-চৈতন্য—জীবাত্মা আভাস-চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব; এইটিই উভয়ের অভেদ; আর প্রতিবিম্ব অবশ্য মূল-জ্যোতি হইতে ভিন্ন—এইটিই উভয়ের প্রভেদ। অতঃপর, বেদান্তের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ এবং জীবাত্মার সাধন-পদ্ধতিই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

গোলাপ সুন্দরী।

আশৈশব, লীলাময়ী হে প্রকৃতি সতি,
আমার এ চর্ম্মচক্ষে কুজ্ঝটি কুহেলি,
সূচিভেদ্য আবরণ ছিল যা বিস্তার,
করিবারে অপসার সেই আবরণে,
কত না করেছি আমি আয়াস যতন!
কেন যত্ন? কার জন্য? জান না কি তুমি?
মোহ যবনিকা খসি পড়িল যখন,
কবিতা অঞ্জন, সখি, মাখি দুনয়নে,
দিবা রাত্রি নিদ্রা সহ বিসম্বাদ করি,
করিয়াছি সুগভীর যপ আরাধন,
হেরিবারে কার, সখি, ত্রিদিব-বাঞ্ছিত
অনিন্দ্য আনন কান্তি? কার মুখ হ'তে
সরাইতে অবগুণ্ঠ, করিয়াছি আমি
"শরীর পতন মন্ত্র সাধনার" পণ?
কতবার, মায়াময়ি, হায় কতবার,
(করিতে পরীক্ষা বুঝি নব তপস্বীরে?)
ঝটিতি দেখায়ে তনু, আবার তখনি,
ঘন জড়তার জালে বদন ঝাঁপিয়ে,
নদী বক্ষে, নারী কণ্ঠে, শূন্য নীলিমায়,
হইতে গো অন্তরিত না জানি কোথায়!
মিলন ও বিরহের সেই সন্ধিস্থলে
বসি ধীরে, শুষ্ক কণ্ঠে, তরুণ তাপস!
তোমার ছায়ার পানে রহিত তাকায়ে,
স্মৃতি লয়ে সুধাপূর্ণ কনক কলস
আকণ্ঠ ঢালিয়া দিত; তবুও যেতনা
প্রাণের মর্ম্মের মাঝে দারুণ পিয়াসা!
তুমি কি গো নহ সাক্ষী কত কষ্ট করি,
তোমার বিরহ ব্রত পালিতাম আমি?
মায়েরে না হেরি শিশু সম্মুখে আপন

সামালিতে নাহি পারি হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
আবেগে কাঁদিয়া উঠে, আছাড়ি ভূতলে,
মর্ম্মের চীৎকার-রোল তেমনি আমার,
পশে নি কি, হে প্রকৃতি তব মুগ্ধ প্রাণে?
অহো সে পবিত্র দৃশ্য! গতায়ু নায়িকা
পুষ্পরথে আরোহিয়া, যায় যবে চলি,
বিধুর নায়ক করে মধুর রোদন!
তেমতি গো, হে প্রকৃতি তোমার বিরহে,
কতবার করিয়াছি মধুর ক্রন্দন!
ধরিত্রী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র মণ্ডলী,
করি দেবি, তোলপাড় তোমার লাগিয়া,
তোমার মঙ্গল মুখ তপাসি তপাসি,
প্রমোদ কাননে কিম্বা বিজন বিপিনে,
মুকুলে, কুসুমে, ফলে, পল্লব শ্যামলে,
নদী হ্রদ সরোবর নির্ঝরের নীরে,
উষার সুন্দর আস্যে, বালার্ক ললাটে,
নক্ষত্রের ঝলমলে, সুধাংশু মণ্ডলে,
শ্যামাঙ্গিনী যামিনীর ধূষর আঁচলে,
বৈশাখের অগ্নিস্রাবী ঘূর্ণিত লোচনে,
শ্রাবণের অশ্রুখিন্ন নয়ন পল্লবে,
শরতের শুভ্র অঙ্কে, হেমন্ত মুকুটে,
বসন্তের সুধাভরা সুরভি নিশ্বাসে,
পাখীকণ্ঠে, মৃগচক্ষে, শিশুর হাস্যেতে,
যুবার আয়ত চক্ষে, প্রৌঢ়ের স্কন্ধেতে,
তুষার-ধবল, মরি, প্রবীনের কেশে,
বালিকার ভঙ্গিহীন সরল দৃষ্টিতে,
নবোঢ়ার ব্রীড়া-রক্ত বদন মণ্ডলে,
যুবতীর বুকপোরা গাঢ় আলিঙ্গনে,
প্রৌঢ়ার লালসা শূন্য সুপবিত্র প্রেমে

বিধবার চিরপাণ্ডু আনত বয়ানে,
অন্বেষিয়া চারিদিকে, হইলাম শেষে
তোমার বিরহে দেবি তোমাতে তন্ময়!
এইরূপে করি তপ; কৈশোরে, যৌবনে,
শেষে দেবি, এক দিন যৌবন সীমায়
না জানি কি পুণ্যফলে, কি মাহেন্দ্র ক্ষণে
কবির দ্বিজত্ব হ'লো? পাইনু হেরিতে
তোমার অপূর্ব্ব মুখ ত্রিলোক-সুন্দরি!
কেমনে কহিব আমি সে মধু কাহিনী?
না জানি কি শাপ গ্রস্ত মানব-রসনা!
ভাবের আবেশে যবে মানবের মন
হয় রে পুলকে ভরা, বিহ্বল হইয়া
মুরছি পড়িয়ে রয় জড়িত রসনা!
জীব রাজ্যে এক মাত্র মনুষ্য সক্ষম
অর্থের বিবাহ দিতে শব্দের সহিত;
ভাবাবেশে অভিভূত বিপন্ন পুরোধা
ভুলে যায় করিবারে মন্ত্র-উচ্চারণ!
হে প্রকৃতি উরি এই ক্ষীণ রসনায়
কর গো সজীব এরে; কণ্ঠে দাও ঢালি
নন্দন সুবাস ভরা অমর মদিরা।
আমরি কি জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী যামিনী!
আম্রের মুকুল গন্ধে পরাণ আকুল,
জাগাইছে দিগন্তেরে বসন্ত কোকিল!
গগন প্লাবন্ করি সঙ্গীত নির্ঝরে,
উড়িছে, উধাও হয়ে, চকোর চকোরী!
ফুলবালা, লতাবধূ মরি কি নীরবে
প্রাণ ভোরে, সুধারাশি করিতেছে পান!
কত পুষ্প-পরিবার মাতিয়াছে আজি
উৎসবে; মালির যত্নে, বসন্তে ফুটিয়া,
চামেলি মল্লিকা বেলা যুঁই কুন্দ জাতি,

মুখ চাওয়াচায়ি করি প্রাণের সৌরভ
করিতেছে বিনিময় কতই আহ্লাদে!
ঝুমুকা লতার ঝাড়ে উঠিছে কৌতুকে,
সুনীল অপরাজিতা, সহচরী তার!
আহা কি অযত্ন সিদ্ধ আরণ্য-কৌশলে,
মালতী লয়েছে খুঁজি মধু মালতীরে!
ফুল সমাজের মরি আদান প্রদানে
সকলে আজিকে ব্যস্ত; সকলেই মত্ত
উৎসবে; একাকী পাড়ি তুমি কেন তবে
নিরানন্দে? আজ তব যৌবন বসন্তে
ফুল-সখা ফুল-সখী মনের মতন,
নাহি কি মিলিল এক? শিখ নাই তুমি
আজুও কি ফুলভাষা? পশিয়াছে কীট
বুঝি তোর মরম মাঝারে? বল্ বল্
কেন তোর এই দশা গোলাপ সুন্দরী?
—কুহু কুহু কুহু শব্দে জড় জগতেরে
রসায়ে, বসন্ত দূত ডাকিল পঞ্চমে!
নীরব ঝর্ঝরে মরি অনন্ত বিমানে!
প্লাবিয়ে, বর্ষিল সুধা পূর্ণ শশধর!
তারাময় ছায়াপথ দিগঙ্গনা বালা
ছাইয়ে ফেলিল উষ্ণ নিশ্বাস সুন্দর!
আহা সে মাহেন্দ্র ক্ষণে কে দিলরে খুলি
তাপসের চিররুদ্ধ অন্তর নয়ন?
ফলিল তপস্যা ফল সরিল আমরি
অবগুণ্ঠ, প্রকৃতির বদন হইতে।
আহা কিবা দেখিলাম! মায়াময়ী দেবী,
অজড় অচল মূর্ত্তি ধরি অপরূপ,
তাপসের চারি চক্ষু চরিতার্থ করি,
গোলাপ সুন্দরীরূপে দিলা দরশন!
এ কি এ তরল রূপ! একি এ মাধুরী!

নিরখি তোমার ছায়া মানব বদনে,
বিহঙ্গ পালকে, কিম্বা তড়াগে, কান্তারে,
ভাবে মুগ্ধ একেবারে হইতাম আমি
বাক শূন্য; কিন্তু কহ আজিকে সহসা
খুলিয়ে ঘোমটা সখি, একি এ দেখালে
অতুল্য স্বরূপ রূপ? গোলাপি-বরণ
আহা ওই ঢল ঢল বদন মণ্ডল!
আহা ওই চারু গণ্ড গোলাপি বরণ!
সুগোল গোলাপি ভুজ আহা মরি মরি!
গোলাপি অলক্ত রাগে রঞ্জিত চরণ!
আহা কি মধুর হাসি! রাজিছে সুন্দর
শিশির মুকুতা রূপে অপূর্ব্ব দশন!
ও দুটি কি ভৃঙ্গ ভাসে শিশির আসারে?
আহা কি নিবিড় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়ন!
আগুল্ফ লম্বিত ওকি কেশের তরঙ্গ?
অজস্র অজস্র ভৃঙ্গ মকরন্দ পিয়ে,
মধুর অধর আঁখি চুমিয়া চুমিয়া।
বুঝি গো উঠিতে আর নহেক সক্ষম!
সুন্দর গোলাপি কান্তি হরিৎ বসনে
সুসজ্জিত কিন্তু ওই হরিত বসন
আমরি কি অপরূপ! বোধ হয় যেন
দেহেরই অঙ্গ এক; যেনরে শৈবাল
সলিলে আমরি মরি লাবণ্য লহরী!
হায় কিন্তু ওকি ওই মনোজ্ঞ উরসে?
ও কি কণ্টকের রাশি? অথবা উহারা
প্রাণবৃন্তে গাঁথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ? হাসি
ধরে না অধরে! সুখের উচ্ছ্বাস বুঝি
ধুইয়া ফেলেছে মুছি কণ্টকের গ্লানি?
কণ্টক কলঙ্ক আহা গোলাপি গৌরবে
আরো যেন সৌন্দর্য্যের করিছে বর্দ্ধিত
ঔজ্জ্বল্য; বিপুল বিশ্বে আছে যে চারুতা,
তার প্রসবিতা তুমি হে প্রকৃতি সতি;
তাই কি সৌন্দর্য্য সাথে থাকে বিজড়িত
মধুর বিষাদ এক; নিত্য ও নিয়ত?
অপূর্ণের করি পূর্ণ, মর্ত্ত্যলোকে আনে
স্বর্গ শোভা; —সুপবিত্র বিষাদ মাধুরী!
হে প্রকৃতি, তোমার ও মোহনীয় বেশ
নিরখি, আনন্দ উৎস উছালল মরি
মরুভূমে; মুঞ্জরিল শুষ্ক হৃদি-তরু!
মদনের ভস্মকালে, হিমাদ্রি-শিখরে
অকাল বসন্ত যেন! সে বরাঙ্গ রূপ
বর্ণের তুলিকা দিয়া চিত্রিব কেমনে?
কবির হৃদয় বাঞ্ছা তুমি গো সুন্দরী,
তোমার ও অপরূপ রূপ ও চরিতে
নহি কি গো আমি চিরমুগ্ধ? প্রেম কভু
হয় কি মুখর? যথার্থ প্রেমিক চিত্ত
ভীরু বড়; তাই সখি মূক এ রসনা।
কত রঙ্গ জান তুমি হে বর রঙ্গিণী;
তাই কি গো এত দিন লুকাচুরি খেলা
খেলিলে আমার সঙ্গে? মঙ্গল ময়ি
তুমি কি করিতে পার প্রেমের তাচ্ছিল্য?
আমার বিশ্বস্ত হিয়া হয় নাই কভু
মর্ম্মাহত;-কি মধুর তোমার বিরহ!
জানি আমি বেণু রন্ধ্রে নিশ্বাস পূরিয়া,
রাগিণীরে জাগাইয়া, তাহার সহিত
প্রাণভোরে প্রেমালাপ বড়ই মধুর!
সহসা থামিয়া কিন্তু মুহূর্ত্তেক লাগি
নিশ্বাস করিয়া রুদ্ধ, নীরব চুম্বন
রাগিণীর চারু ওষ্ঠে (বেণুর ছিদ্রেতে)
নহে কি মধুরতর? তাই রসময়ি
প্রেমের রহস্যলীলা তুমি যত জান
কে বা জানে? এতদিন হে প্রকৃতি সতি,

খেলিলে গো কত রঙ্গে লুকাচুরি খেলা,
মোর সঙ্গে ; কি মধুর তোমার বিরহ!
হায় সেই শুভক্ষণে হে প্রকৃতি সতি
গোলাপ সুন্দরীরূপ, হেরিয়া তোমার,
হইল গো অপসার প্রাণের জড়তা!
মোহ, যার অন্য নাম পাপ ও কলুষ,
হইল গো ভস্মীভূত তব রূপানলে!
সেই দিন হ'তে পরে, কত শতবার,
কখন দর্শন দিতে তরঙ্গিণী তটে,
সাজাইয়া কেশজাল কুমুদ কহ্লারে,
তরল হীরক জালে ভূষিয়া অলকে,
মরালের কলস্বরে মুখরিত করি
চারুকাঞ্চী অপরূপ নদী কন্যা সাজে!
বাজাইতে মরি মরি মৃণাল বাঁশরি
কখন বা দাঁড়াইয়া আকাশ প্রাচীরে
হস্তে শূল, অট্টহাসি ভৈরবীর মত,
দিতে দেখা উলঙ্গিনী ঝটিকার বেশে
মেঘ ঐরাবৎ শুণ্ড সাপটিয়া ভুজে,
দোলাইতে মুহুর্মুহু ; চৌদিকে ঘুরায়ে,
বিদ্যুৎ-অঙ্কুশাঘাতে করিতে অস্থির
মাতঙ্গেরে ; বিন্দু বিন্দু খসিত অজস্র
গজমুক্তা, প্রসারিত যামিনী অঞ্চলে!
এইরূপে নিত্য তুমি নব নব বেশে,
হে অপূর্ব্ব কুহকিনী, হে বহু রূপিণী,
কল্পনারে করি জয় সত্যের মন্দিরে
দেখাইতে ছায়াবাজী! কঙ্কাল হইতে
সৃজিতে অপ্সরী মূর্ত্তি ; দাবদগ্ধ বনে
সৃজিতে অলকা পুরী, আনন্দ নগরী!
পান করি হলাহল নীলকণ্ঠ যথা,
বাঁচাইলা বৃন্দারকে হায় গো তেমতি
মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসি হে করুণাময়ি,
নিরক্ত অধর ওষ্ঠে চুম্বিয়া সুধীরে,
শুষিতে বিষাক্ত ক্রুর ফেণ পুঞ্জরাশি
দুইধারে মরণের পঞ্জর হইতে,
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রকাশি,
জীবনের যুগ্ম পক্ষ নিকন্দিত মরি!
হে অপূর্ব্ব কুহকিণি, হে বহুরূপিণি,
তোমাতে আমাতে এই মধুর সম্ভাষ,
তোমাতে আমাতে এই মধুর মিলন,
কি নাম ইহার সখি? চাহিনা জানিতে।
চাহি মাত্র হে প্রকৃতি, অবাক নয়ানে
হেরিতে ও বরকান্তি ;—আহা মরি মরি
অনন্ত মাধুরী ময়ী অনন্ত যৌবনা!
তুমি ও এমনি নিত্য করিও গো দেবি,
তাপসের প্রাণমন করিয়ে বিহ্বল,
তাপসের চারি চক্ষু করিয়ে সফল,
পুষ্প বৃষ্টি! রূপ বৃষ্টি! প্রাণময়ী সুধা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বেলিগার্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রেসিডেন্সি-অবরোধ ও ইংরাজের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

অসদুপায়ে অযোধ্যা ইংরাজাধিকার ভুক্ত করিয়া লর্ড ডেলহৌসী যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন—এই সময় হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। যাঁহারা অযোধ্যার

রাজনৈতিক ইতিহাস আদ্যোপান্ত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা কখনই আমাদের সহিত এবিষয়ে বিভিন্নমত হইবেন না।

চিন্হটের যুদ্ধের পর ইংরাজের অদৃষ্ট প্রকৃতপক্ষে মন্দের দিকে ফিরিল। বলদর্পিত সিপাহী-সৈন্য ইংরাজের পরাজয়ে অধিকতর জয়োল্লাসিত চিত্তে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রেসিডেন্সির চারিধার বেষ্টন করিল। নগর অরাজক সুতরাং প্রজাকুলও অরক্ষিত। সমুদ্র স্রোতের ন্যায় মদোন্মত্ত সিপাহী সেনা দেখিয়া তাহারা গৃহের সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া রাখিয়া কেবল প্রাণটী লইয়া পলায়ন করিল। সিপাহীরা তাহাদের পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী দখল করিয়া লইয়া আপনাদের আশ্রয় স্থান ভুক্ত করিল। সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া কামান সাজাইয়া নানা প্রকার ব্যূহ রচনা করিয়া তাহারা রেসিডেন্সি মধ্যস্থ অবরুদ্ধ ইংরাজদিগের উপর অগ্নি বর্ষণের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিল। নগর নিস্তব্ধ ও জন শূন্য, পল্লী গৃহস্থ শূন্য, রাজ পথ সর্ব্বপ্রকারের কোলাহল শূন্য। ইহার মধ্যে কেবল অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি, আর্ত্তের চীৎকার, অনার্ত্তের জয়োল্লাস।

নগরের মধ্যে একটীও ইংরাজ নাই। যাহারা ছিল তাহারা অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে বা নিহত হইয়াছে কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায়ই রেসিডেন্সির কুক্ষিগত। এক রেসিডেন্সির ধ্বংশসাধন করিতে পারিলেই তাহাদের অভীষ্ট লাভ হইবে ভাবিয়া সিপাহীরা দিবারাত্রি রেসিডেন্সী সীমার উপর অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল।

অবরুদ্ধ সীমার মধ্যস্থ অন্যান্য বাটীগুলি অপেক্ষা রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাস ভবনটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উন্নত ছিল। এই প্রাসাদে একটী কক্ষে কমিশনার হেন্‌রি-লরেন্স এই সময়ে বাস করিতেছিলেন। প্রাসাদোপরিস্থ সিংহ চিহ্নিত, ব্রিটিশ পতাকা বায়ু ভরে ইতস্তত উড়িতেছিল। সিপাহী-সৈন্য বুঝিল দলপতিকে বিনাশ করিতে পারিলেই অতি অল্প আয়াসেই রেসিরেন্সি দখলে আসিবে।

এই জন্যই রেসিডেন্সি প্রাসাদের উপরে শত্রুর গোলাগুলি অধিক আসিয়া পড়িতেছিল। প্রাবৃট কালের শিলাপতনের ন্যায় মহাশব্দে শত সহস্র রক্তবর্ণ অগ্নিময় গোলক আসিয়া অলিন্দে বাতায়নে কক্ষমধ্যে ভিত্তিগাত্রে প্রাসাদ উপরে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিহত হইতেছিল। এই ভয়ানক অগ্নিবর্ষণে কোনস্থান বা মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল আবার কোথাও বা প্রাচীর-গাত্র স্বীয় প্রসারিত বক্ষে অগ্নিতেজ ধারণ করিয়া গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতেছিল, কোন স্থলে বা প্রাসাদের কোন অংশ বরাহ দন্তোৎক্ষিপ্ত ভূপৃষ্ঠবৎ শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল, কিম্বা কোন দারুময় স্থান অগ্নি সংস্পর্শে ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, অথবা কুত্রাপি প্রাসাদ-শীর্ষ মহাশব্দে পতিত হইয়া গৃহ মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ বিচূর্ণিত করিতেছিল।

জলন্ত গোলার আঘাতে সার হেন্‌রির শোচনীয় মৃত্যু।

এই ভয়ানক সময়ে সুদক্ষ সার হেন্‌রি দ্বিতলস্থ একটী কক্ষ মধ্যে অকুতোভয়ে বসিয়া শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যে ঘরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ঈষদুন্মুক্ত বাতায়ন রন্ধ্র দিয়া শত্রুর গতিবিধি অল্পায়াসেই পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আপদ-সঙ্কুল ছিল। বন্ধুদিগের অনুরোধে, আত্মীয় বর্গের প্ররোচনাতেও তিনি কোনমতেই এই সুবিধাজনক স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না—কিন্তু এইস্থানে থাকাতেই তাঁহার মূল্যবান জীবন শত্রুর অগ্নিমুখে আহুতিস্বরূপ পড়িল। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে সে সমুদায়ের পুণরাবৃত্তি না করিয়া কেবল মাত্র সেই ভয়ানক দিনের শোচনীয় চিত্রটী তাহার সহকারী কুপার সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিব।

হেনরি লরেন্স যে কক্ষে বাস করিতেছিলেন বিদ্রোহীগণ তাহা প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিল। বীরবর নেলসনের বক্ষ সংন্যস্ত তারকার ন্যায় রেসিডেন্সি প্রাসাদোপরি উড্ডীয়মান পতাকা তাঁহাকে শত্রুর নিকট বিশেষ পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং অবরোধের সূত্রপাত হইতেই সিপাহীরা তাঁহার কক্ষের উপর অরবরত লক্ষ্য করিতেছিল। ইহার ফলস্বরূপ ২রা জুলাইএ যে কাণ্ড ঘটিল পাঠক এই নিম্ন উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

২রা জুলাই স্যর হেনরী, মেজার কুপার ও আমি—আমরা তিন জনে গৃহ মধ্যে বসিয়া সামরিক মন্ত্রণা করিতেছি—এমন সময়ে একটী ৮ইঞ্চ জ্বলন্ত গোলা আসিয়া হর্ম্ম্যতলের উপরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। গোলা দেখিয়া আমরা বুঝিলাম চিহুটের যুদ্ধে শত্রুরা আমাদের নিকট হইতে যে কামান কাড়িয়া লইয়াছিল এ জলন্ত গোলা তাহারই উদর বিনির্গত। গোলা ভাঙ্গিয়া গেল বটে—কিন্তু তাহাতে কাহারও অনিষ্ট হইল না। শত্রুর লক্ষ্য স্যর হেনরির উপর সম্পূর্ণরূপে সংন্যস্ত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সহাস্যে বিদ্রূপ-পূর্ণ বাক্যে বলিলেন—"শত্রুর সৈন্যবৃন্দ মধ্যে এমন কোন সুদক্ষ গোলন্দাজ নাই—যে পুনরায় এককক্ষে গোলা মারিবে।" ইহার পরও সেই গৃহের আশেপাশে অসংখ্য গুলি বর্ষণ হইতেছে দেখিয়া আমার সেই দিন বিকালে তাঁহাকে আবার ধরিয়া বসিলাম। এমন কি তাঁহার গৃহ-মধ্যস্থ লিখিবার উপকরণ ও অন্যান্য সাজসজ্জাগুলি নামাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলাম—কিন্তু তিনি বলিলেন—"এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? কল্য প্রাতে আমি নিজেই স্থানান্তরিত হইব।"

কিন্তু হায়! তিনি জানিতেন না—এই গৃহই তাঁহার শেষ বিশ্রাম গৃহ হইবে!

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই তিনি নীচে আসিলেন। চারিদিকে

উচিত—এই সকল পরিদর্শন করিতে বেলা আটটা বাজিয়া গেল। নিদাঘের মার্ত্তণ্ড তেজে ও ভ্রমণ ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি উপরের ঘরে আসিলেন। বস্ত্র সমুদায় উন্মোচন না করিয়াই ক্লান্তিনাশের জন্য সুকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিলেন। আমায় বলিলেন—কোথায় কত পরিমাণে রসদ দিতে হইবে—আপনি তাহার একটী তালিকা করিয়া আসুন। আমি লিখিবার জন্য পাশের ঘরে উঠিয়া গেলাম—কিন্তু গমনকালে তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি কল্যকার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। অদ্য প্রাতেই আপনার স্থানান্তরিত হইবার কথা।" তিনি উত্তর করিলেন—"এখন আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। দুই এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিব।" অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমি রসদের তালিকা লইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সার হেন্‌রি শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহার পার্শ্বে ৫। ৬ ফিট ব্যবধানে সমান্তরালে আর একটী শয্যা—সেই শয্যায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ লরেন্স শুইয়া। আমি দুইটী বিছানার মধ্যস্থলে গিয়া বসিলাম। দ্বারদেশে একজন বেহারা পাখা টানিতেছিল। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পড়িতে লাগিলাম,—স্যর হেন্‌রি মধ্যে মধ্যে তাহার উপর মন্তব্য করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! কি লোমহর্ষণ কাণ্ড! হঠাৎ সহস্র বজ্র পতনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইল। তৎপর মুহূর্ত্তেই অন্ধকার ও অগ্নিরাশি সঙ্গে লইয়া একটী বৃহৎ জ্বলন্ত গোলা!! সমস্ত গৃহটী অভেদ্য অন্ধকার ময়,—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শ্মশানবৎ ভয়ানক নিস্তব্ধতা। আমি হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলাম—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। যখন সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতিস্থ হইলাম—তখন দেখি চারিদিকে কেবল প্রচুর ধূম ও ধূলারাশি। গৃহ মধ্যে সকলেই নীরব দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম—"স্যর হেন্‌রি আপনি কি আঘাত পাইয়াছেন?" দুইবার আমি এই রূপ প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু কোন উত্তর নাই। তৃতীয় বার প্রশ্নের পর ক্ষীণতাজড়িতস্বরে উত্তর পাইলাম—"I am killed!" পাখাখানা এই সময়ে উপর হইতে মহাশব্দে ছিঁড়িয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ইতস্তত-সঞ্চারিত ধূম ও ধূলি রাশি অতি ভয়ানক ভাব ধারণ করিল। কিয়ৎ ক্ষণের পর ধূমরাশি কমিয়া আসিলে সহসা আমার চক্ষু স্যর হেন্‌রির দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর পড়িল—কি শোচনীয় দৃশ্য!! স্যার হেনরির শ্বেত শয্যা শোণিতস্রাবে লোহিতবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখনও অজস্র ধারে শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে—কিন্তু আহত বীরপুরুষ তখন সম্পূর্ন নীরব। এই সময়ে কতকগুলি ইংরাজ সৈনিক সেই শব্দ শুনিয়া দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—তাহারা আসিয়া স্যার হেনরিকে ধরিয়া একখানি চৌকির উপর বসাইল। আমি দেখিলাম গোলার এক ক্ষুদ্র অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে আমার পৃষ্ঠের জামার কাপড়টা কোথায়

বুলি ছিন্নপদে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত। আমাদের কয়জনের মধ্যে কেবল মাত্র জর্জ লরেন্স অনাহত ছিলেন।”

এই আঘাতেই যে স্যর হেনরির জীবন বায়ুর অবসান হয় একথা আমার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে রেসিডেন্সির অবরুদ্ধ ইংরাজদিগেরই ক্ষতি হইয়াছিল এমন নহে। যদি এই মহাহবে তাঁহার জীবন কোন মতে রক্ষা পাইত—তাহা হইলে সম্ভবতঃ লর্ড ক্যানিংএর পর তিনি সমগ্র ভারতের শাসন কর্তৃত্ব ভার পাইতেন। * তাঁহার ন্যায় দেশীয়ভক্ত লোক ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে—পদ দলিত দেশীয় হতভাগ্য প্রজাবৃন্দের অনেক উপকার হইতে পারিত। যাহারা অনর্থক সামান্য ছল ধরিয়া দেশীয় রাজ্য ইংরাজাধিকারভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন যাঁহারা ইংরাজের ভারতীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ দেশীয় সৈন্যের প্রতি পক্ষপাত দূষিতাচারণ করিতে পরামর্শ দেন তাঁহাদের সকলেরই স্যর হেনরির তীক্ষ্ণ যুক্তি পুর্ণ উপদেশ গুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখা উচিত। দেশীয় প্রজার সহানুভূতি ও আসক্তি আকর্ষণ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় স্যর হেনরি তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অযোধ্যা ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিবার পূর্ব্বে তিনি যেমন সাধ্যমত ডেল-হৌসীর সর্ব্বগ্রাসী-শাসননীতির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—অযোধ্যা দখল হইবার পর নূতন কমিসনার জ্যাকসনের কঠোর শাসননীতি জর্জ্জরিত বিত্রস্ত আর্ত্ত প্রজাকুলকে সেইরূপ স্বীয় সুকোমল শাসননীতি প্রচলন দ্বারা শান্তি প্রদান করিয়া-ছিলেন। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যে দূরদর্শিতা, যে সদসৎ বিবেচনা, যে কোমল প্রকৃতি পঞ্চনদের ন্যায় উগ্রপ্রজাকূল দেশে সুফল প্রসব করিয়াছিল—অযোধ্যায় তাহা যে তদপেক্ষা সুফলোৎপাদক হইতে পারিত না—ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি নিজমুখেই

---

* দুঃখের বিষয় এই স্যর হেনরির মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই বিলাত হইতে এক সংবাদ আসে—“যদি লর্ড ক্যানিং কোন কারণে ভারতের শাসন কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে স্যর হেনরি মণ্টগোমরি লরেন্স সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।” পরে স্যর হেনরির ভ্রাতা—স্যর জন লরেন্স ভ্রাতৃগুণের পুরস্কারস্বরূপ ভারতের গবর্ণর জেনারেল হন। আড়ম্বর শূন্যতা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কর্ত্তব্য সাধন করা তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। যে যে গুণ থাকাতে বীর প্রবর নেলসন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন স্যর হেনরির প্রকৃতির মধ্যে তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান ছিল। নেলসন কর্ত্তব্যের জন্য জীবনকে তুচ্ছ ভাবিয়াছিলেন স্যর হেনরিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় নেলসনের প্রসন্ন মুখে শেষ কথা—“Thank God! I have served my king and country” স্যর হেনরিরও সেইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা। মরিবার পূর্ব্বে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন—“আমার স্মরণ-চিহ্নস্থাপনে অনেক আড়ম্বর হইবে—কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ, তাহাতে অন্য কোন কথা না লিখিয়া কেবল যেন লেখা থাকে —“Here lies sir H Lawrence who died to do

বলিয়াছিলেন, ইংরাজ অযোধ্যাকে ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন অযোধ্যার প্রজাকুলকে সুশাসনে সম্পূর্ণ সুখী করিয়া সেই পাপ সর্ব্বাগ্রে ক্ষালন করাই তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য। অযোধ্যায় আসিয়া যে কয়দিন তিনি শান্তির ক্রোড়ে বসিয়া শাসন দণ্ড চালনা করিয়াছিলেন সেই কয়দিনই এই উদারনীতির সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট! যে দেশীয় সৈন্যের দুর্দ্দশা তাঁহার হৃদয়কে মধ্যে মধ্যে আকুলিত করিত, যাহাদের দুঃখমোচনের জন্য—যাহাদের বিলাতী গোরার সহিত সকল বিষয়ে সমকক্ষ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—বিদ্রোহের পূর্ব্ব সূচনা দেখিয়াও যিনি তাহাদের অবিশ্বাস করিতে অগ্রসর হন নাই—পরিশেষে সেই সিপাহী গোলার অনলমুখেই তাঁহার বহুমূল্য জীবন আহুতিস্বরূপ অর্পিত হইল। ডালহৌসীর, শ্লিমানের পাপাগ্নি তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী শত শত ইংরাজ নর নারীর খরস্রোত শোণিতে নির্ব্বাপিত হইল। পাঠক! হেনরি লরেন্স সম্বন্ধে এই বলিলেই প্রচুর হইবে—যে তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় হেনরি লরেন্স ভারতে আইসেন নাই।

৪ঠা জুলাইয়ের রজনী ঘোরান্ধকার, মধ্যে মধ্যে ঐ শিবিরের অগ্নি শিখা সেই অন্ধকার আলোকিত করিতেছিল মাত্র। সৈনিকগণ সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। এমন সময়ে অতি ধীরভাবে চারিজন ইংরাজসৈনিক সার হেনরির পুষ্পাচ্ছাদিত বিরল-অশ্রুসিক্ত শবাধার লইয়া ধীরে ধীরে এক গোপনীয় স্থলে চলিল। অতি নির্জ্জনে অতি সন্তর্পণে বিনা কোলাহলে বিনা জনতায় সেই প্রধানসৈনিকের দেহ সমাধির ঘোর অন্ধকারের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল। শান্তির সময়ে হইলে শত সহস্র পদস্থ লোক এই শবের অনুসরণ করিত, কিন্তু পাছে অবরুদ্ধ ইংরাজগণ তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিলে হীনোৎসাহ হয় এই ভয়ে সকলের অজ্ঞাতে এই কার্য্য সম্পাদিত হইল। যে অযোধ্যার শান্তি প্রদান করিতে তিনি পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন—সেই অযোধ্যার শীতল ভূগর্ভই তাঁহাকে চিরশান্তি প্রদান করিল।

স্যর হেনরি ম্যাজার ব্যাংকস্‌কে তাঁহার পদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। * তাঁহার মৃত্যুর পর আরও ৩।৪ দিন বিনা গোলযোগে কাটিয়া গেল। অন্যান্য ইংরাজেরা জানিয়াছিল স্যর হেনরী আহত হইয়া শয্যাগত। মধ্যে জনরব উঠিল তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় অবরুদ্ধ ইংরাজ নরনারীগণের মনে মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল।

---

* মেজর ব্যাঙ্কস সিবিল-বিভাগে এবং কর্ণেল ইংলিষ মিলিটারি-বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে কার্য্য করিতে পান—এই অনুরোধে লর্ড ক্যানিংকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং এই নির্ব্বাচনে কোন রূপ আপত্তি করেন নাই।

ইংরাজের অনল পরীক্ষা। ব্যাধ যেরূপ চারিদিকে জাল বিস্তৃত করিয়া হরিণগণকে অবরুদ্ধ করিয়া বধ করে—প্রতিহিংসাজর্জ্জরিত সিপাহীসৈন্যও সেইরূপ ইংরাজ সৈন্যদিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। এতকাল ধরিয়া শ্বেত পুরুষদের যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকৃতির অত্যাচার ও অবমাননা তাহারা সহ্য করিয়াছিল, এই সময়ে স্বহস্তে তাহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। ১লা হইতে ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত সিপাহীরা একাদিক্রমে রেসিডেন্সির অবরুদ্ধ স্থানের উপর ক্রমাগত গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। দিন নাই রাত্রি নাই সহসা শত সহস্রমুখী অগ্নিশিখা আসিয়া রেসিডেন্সির সর্ব্বত্র পড়িতেছে—এবং সেই অগ্নি মুখে কত শত যোদ্ধা জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। রেসিডেন্সির বাহিরে—অবরুদ্ধ স্থানের অনতিদূরে যে সমস্ত নবাবী বাড়ী ও মসজিদ ছিল তাহার সমস্তই সিপাহীর দখলে, † তাহাদের আশ্রয় স্থান, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তাহারা নিরাপদ। সেই গৃহপ্রাচীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ভিত্তিপ্রান্তস্থ ছিদ্র মুখে বন্দুকের মুখ রাখিয়া অবলীলাক্রমে তাহারা শত্রুর উপর গুলি চালাইতে লাগিল। কামান-শ্রেণী সজ্জিত করিয়া তাহার নীচে খাদ খনন করিয়া আত্মগোপন পূর্ব্বক কামানে অগ্নিদান করিতে লাগিল। রেসিডেন্সির অধিকাংশ ব্যাপারই তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইত, কিন্তু ইংরাজেরা তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র বিনির্গত অগ্নিরাশি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইত না।

শত্রুর ক্রমিক অগ্নি বর্ষণের ফল বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিল। যুদ্ধ শিক্ষার কৌশলে সিপাহী সৈনিক ইংরাজ সৈনিক অপেক্ষা এক তিলও ন্যূন নহে বরং দুই এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর—সুতরাং তাহাদের অগ্নি মুখে প্রতিদিন অনেক ইংরাজ মরিতে লাগিল। অনেক বালক ও স্ত্রীলোক আহত হইল। এই সময়ে ইংরাজের অবস্থা বড় শোচনীয়! অবরুদ্ধ স্থানে সকলেরই সমান অবস্থা! প্রভু ভৃত্য ধনী দরিদ্র সুস্থ পীড়িত উচ্চ-পদস্থ সৈনিক ও সামান্য পদাতিক সকলেই সমানভাবাপন্ন। যেন শত্রুর অগ্নি মুখে সামাজিক বিভিন্নতা সকলই লোপ হইয়াছে। বড় বড় সিবিলিয়ানের ঘরণী এক্ষণে স্বহস্তে পরিচারিকার সমস্ত কার্য্য করিতে ব্যতিব্যস্ত। দুগ্ধ ফেন নিভশয্যায় যাঁহাদের নিদ্রা হইত না—এক্ষণে সামান্য তৃণ পর্ণময় আস্তরণের উপরই তাঁহাদের সুখ নিদ্রা,—কদন্নের দুর্গন্ধে যাহাদের বমনোদ্গার হইত এক্ষণে দগ্ধ আটার রুটি ও অর্দ্ধ সিদ্ধ দাল খাইয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত। প্রভু যেখানে কামান বসাইবার জন্য সামান্য মজুরের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছেন—ভৃত্য সেইখানে তাঁহার সহায়তা করিতেছে, রুগ্নের শুশ্রূষা

---

† বাহিরের মসজিদ্ ও বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য অনেকে পরামর্শ দেন

করিবার কেহ নাই আহতের ক্ষত ধৌত করিবার লোক নাই মৃতের কবর দিবার লোক নাই। সকলেই নিজের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত! ইহা অপেক্ষা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আর কি হইবে?

২০ জুলাই অবরুদ্ধ ইংরাজদিগের পক্ষে দ্বিতীয় স্মরণীয় দিন। চিহ্নটের যুদ্ধের ন্যায় আজও যদি তাহাদের পূর্ববৎ পরাজয় ঘটিত তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই রেসি-ডেন্সির সমস্ত ইংরাজই সিপাহীদিগের করায়ত্ত হইত। উন্মত্ত সিপাহী সৈন্য একবার দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই অবরুদ্ধ ইংরাজদিগের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপ-স্থিত হইত তাহা কল্পনার চক্ষেও দেখা অসম্ভব।

২০এ জুলাই ও তৎপূর্ব্ব দিবসে, সিপাহীগণ-দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে রেসিডেন্সির উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছিল—কিন্তু সেই দিন নিশীথ সময়ে সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। প্রভাতের বিমল রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইল তথাপি সিপাহীগণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। এ নিস্তব্ধতা মহা ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ—ইংরাজদিগের একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় বিলম্ব হইল না। তাহাদের ধ্বংশের অন্য কোন নূতন উপায় কল্পিত হই-তেছে এই সন্দেহে ইংরাজগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্ক হইল। বেলা এক প্রহরের পর তাহারা বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে—দূর প্রসারিত প্রলয়ের ধূম রেখা দেখিল। সহসা এক মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র বজ্র ধ্বনির ন্যায় মহাশব্দে ভূপৃষ্ঠ শতধা প্রসারিত করিয়া রেডান ব্যাটারির নিকটস্থ স্থান বিদীর্ণ হইয়া গেল। সিপাহীগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বারুদের হল্লা প্রস্তুত করিয়াছিল—এক্ষণে তাহাতেই অগ্নিসেক করিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূসরাশির অপসারিত হইলে অবরুদ্ধ ইংরাজগণ দেখিল সিপাহীদের এই ভয়ানক চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। বারুদ স্তূপে অগ্নি লাগাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পারিয়া ক্রোধোন্মত্ত সিপাহী পুনরায় আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ খুলিল। চারিদিকে ধূমরাশি, সুতরাং কতকটা অপ্রতিহতভাবে তাহার রেসিডেন্সির দিকে রেডানের মুখে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজগণ এই সময়ে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ করাতে সিপাহী সৈন্যের অগ্রসরের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। জ্বলন্ত গোলার মুখে অনর্থক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রকারান্তরে সেই দিন অবসন্ন ইংরাজগণ জয়লাভ করিলেন।

রেসিডেন্সির চারিধার সিপাহীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যাটারি বা কামান শ্রেণী প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। এই গুলির সহায়তাতেই ইংরাজেরা অনেকাংশে আত্ম রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন। অসংখ্য বলোন্মত্ত সিপাহীর সহিত মুষ্টিমিত ইংরাজের সম্মুখ যুদ্ধ হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র লক্ষ্ণৌ প্রদেশ বিদ্রোহী-দিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িত। কাণপুর ও দিল্লির ন্যায় লক্ষ্ণৌএর সম্পূর্ণ পতন হইলে উত্তর পশ্চিমে পুনরায় স্বাধিকার বিস্তৃত করা ইংরাজের ...

রেডানের উপর আক্রমণ করিয়া বিফল-মনোরথ হওয়াতে সিপাহী সৈনের অপরাংশ কাণপুর ব্যাট্যারি ও ইংলিশ সাহেবের আড্ডা আক্রমণ করিল। কিন্তু ইহারও পরিণাম সিপাহীর পক্ষে শুভপ্রদ হইল না। তাহারা পরাজিত ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে আপনাদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। উপযুক্ত অধিনায়ক না থাকাই যে অদ্য তাহাদের পরাজয়ের কারণ ইহার আর কোনও সন্দেহ নাই।

হরিষে বিষাদ। মেজর ব্যাঙ্কসের মৃত্যু। চিহুটের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিপাহীগণ যেরূপ উচ্ছাসিত হইয়াছিল—অদ্যকার যুদ্ধে সফলমনোরথ হইয়া অবরুদ্ধ ইংরাজদিগের মধ্যে সেইরূপ উল্লাসের স্রোত বহিল। ঘোর তমসাবৃত ভবিষ্যতের যবনিকার মধ্যে তাহারা অতিক্ষীণ আলোক ছায়া দেখিল। বিস্তর ভ্রুকুটি, শোক ও ক্লান্তি চিহ্ন যে সকল মুখ অধিকার করিয়াছিল আজ তাহাতে প্রফুল্লভাব আসিয়া প্রতিভাত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেনরি লরেন্সের মৃত্যুর পর মেজর ব্যাঙ্কস্ লক্ষ্ণৌ এর সিবিল বিভাগে কর্ত্তৃত্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কস্ সাহেব একজন বহুদর্শী রাজপুরুষ ও এতাদৃশ বিপদ সঙ্কুল সময়ের অধিনায়কতার বিশেষ উপযুক্ত। পূর্ব্বদিন জয়লাভ করিয়া ইংরাজগণ যে পরিমাণে উল্লাসিত হইয়াছিল—পরদিনে এমন এক ঘটনা ঘটিল যে তাহারা অধিকতর মর্ম্মাহত হইল। ব্যাঙ্কস্ সাহেব উল্লিখিত দিনে রেসিডেন্সি মধ্যস্থ একটী ব্যাটারি হইতে শত্রুর কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী গুলি আসিয়া তাহার মস্তিষ্কের উপর বিদ্ধ হইল। এবং সেই আঘাতেই তিনি মৃত্যু হইলেন।

ব্রিগেডিয়ার ইংলিস সাহেব স্যারহেনরির নিয়োগমতে লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে সমগ্র মিলিটারি বিভাগের পরিচালন ভার পাইয়াছিলেন। কিন্তু মেজর ব্যাঙ্কস্ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি স্বীয় হস্তে সিবিল ও মিলিটারির উভয় বিভাগের ক্ষমতা সংযত করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গবর্ণর জেনারলের মত ছিল।

রোগনিবাসের শোচনীয় দৃশ্য— ইংরাজের সৌভাগ্যের দিনে যে স্থান উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগের ভোজাগার বলিয়া কথিত হইত অবরোধের পর হইতে তাহা রোগ নিবাসে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রতিদিন সিপাহির অগ্নিমুখে যে সমস্ত লোক আহত হইত—ক্রমাগত অনিয়মিত পরিশ্রম ও স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে যাহারা পীড়িত হইত তাহাদের শুশ্রূষার জন্য এইস্থান নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। যেস্থান পূর্ব্বে সময় বিশেষে অসংখ্য-আলোকমালায় উজ্জলিত হইয়া তীব্র আলোক ছটা গবাক্ষ পথে বিকিরণ করিয়া চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিত সেইস্থান এক্ষণে দিবারাত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যেস্থান কেবল আনন্দ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইত এখন

রোগনিবাসের দৃশ্য কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়।

সুপ্রশস্ত ভোজাগারের সকল স্থানই আহত ও মুমূর্ষুদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। সকল স্থানেই আহত সৈনিকেরা রক্তাপ্লুত শয্যায় শয়ন করিয়া ছটপট করিতেছে। যে সকল স্ত্রীলোক রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে সকলের নিয়মিত শুশ্রূষা হইতেছিল না। এমন কি অনেকের ক্ষত স্থান শুশ্রূষার অভাবে কীটজর্জ্জরিত হইয়াছিল। রোগীর বস্ত্রাদি ধুইবার কার্য্যে এই সময়ে দুইজন দেশীয় ধোপা নিযুক্ত ছিল। তাহাদের দর আবার চতুর্গুণ। তাহাতেও তাহাদের এত কাজের ভিড় যে সকল সময়ে তাহাদের পাওয়া যাইত না। যাহাদের স্ত্রী কন্যা ছিল তাহাদের শুশ্রূষা এক প্রকারে চলিতেছিল বটে—কিন্তু যাহাদের কেহই দেখিবার নাই তাহাদের কি ভয়ানক অবস্থা! কেহ বা তৃষ্ণায় চীৎকার করিতেছে কেহ বা প্রলাপের ঘোরে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহবা রুগ্ন শয্যায়—রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শুশ্রূষার অভাবে মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে। কেহবা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সৈনিক ব্রতে ব্রতী আত্মীয় স্বজনের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, কাহারও অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য ক্ষতস্থান হইতে বহুল পরিমাণে রক্ত স্রাব হইয়া শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। কাহারও শয্যা নাই, হর্ম্ম্যতলে মাদুরের উপরে পড়িয়া ছটপট করিতেছে—আবার কখনও বা নূতন আহত হস্তপদ ছিন্ন-অর্দ্ধমৃত সৈনিককে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সেই বিস্তৃত কক্ষের চারি দিকেই ভয়ানক পূতিগন্ধ। ইহার সকল স্থানই সংক্রামক বায়ুতে পরিপূর্ণ। সিপাহীর গোলাগুলি সর্ব্বদাই বজ্রনাদী শব্দে সেই গৃহের প্রাচীর গাত্রে প্রতিহত হইতেছিল আবার কখন কখন বা গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া আহত সৈনিকদিগকে পুনর্ব্বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছিল।”

“শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—সেই বিস্তীর্ণ গৃহের সমস্ত গবাক্ষই দৃঢ়রূপ পরিবদ্ধ ছিল। মধ্যাহ্নেও তথায় অন্ধকার বিরাজ করিত। বিশুদ্ধ বায়ু কি পদার্থ তাহা রোগীদের মধ্যে কেহই জানিতে পারিত না। বায়ুর কথা দূরে থাক্—শুশ্রূষার কথা দূরে থাক—উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য অভাবে অনেকে প্রাণত্যাগ করিতেছিল। কয়েক বিন্দু দুগ্ধ, কয়েক খণ্ড বরফ, স্বল্পমাত্র মাংস যুস ও আবশ্যকীয় পানীয় অভাবে অনেকেই ইহলীলা সম্বরণ করিতেছিল। বস্তুত, পূতিগন্ধ, বিকট অন্ধকার, যাতনাব্যঞ্জক মুমূর্ষ কণ্ঠনাদ, কাতরা রমণীর ক্রন্দন ধ্বনি শত্রুর বজ্রনাদী কামান শব্দ এইস্থানকে বিশেষরূপে আক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।” * * * *

“শবপ্রোথিত করিবার নিয়ম আবার আরও শোচনীয়। ছোট বড় সকলকেই এক

২০এ জুলাইয়ের পরবর্ত্তী ঘটনা। যে কয়েক মাস ইংরাজেরা রেসিডেন্সি মধ্যে সিপাহী সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই সময়ের মধ্যে সিপাহীরা চারিবার রেসিডেন্সি দখল লইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরাজের পরমসৌভাগ্য যে তাহারা কোনবারেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সাহসে ও বলে ইংরাজ সৈন্য অপেক্ষা যে তাহারা ন্যূন ছিল—একথা বলিলে পক্ষপাতিতা করিয়া সত্যের অপলাপ করা হয়। নানাবিধ অনুকূল ঘটনার উপর যদি তাহাদের উপযুক্ত অধিনায়ক থাকিত তাহা হইলে অযোধ্যার ইংরাজ পতাকা উত্তোলন করা অতি সহজ কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইত।

এই চারিবারের ভয়ানক আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে প্রস্তাব অতিশয় বাহুল্য হইয়া পড়ে। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে শেষোক্ত চারিটী প্রধান আক্রমণেই সিপাহী সৈন্য ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। * ইহার পর যদি তাহারা পুনরায় রেসিডেন্সি আক্রমণের চেষ্টা করিত এবং তৎপূর্ব্বে বাহির হইতে হ্যাভলকের অসংখ্য কাহিনীরাজি লক্ষ্ণৌএর সীমান্তবর্ত্তী না হইত তাহা হইলে পঞ্চম বারে সিপাহীরা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিজয় শ্রী লাভ করিত। অবরুদ্ধ স্থান মধ্যগত ইংরাজদিগের এই সময়ে অপরিমিত বলক্ষয় হইয়া নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, পঞ্চম আক্রমণের তীব্রবেগ সহ্য করার কোন ক্ষমতাই তাহাদের দিল না। কিন্তু তাহাদের পরম সৌভাগ্য যে হ্যাভলক্ সাহেব এই সঙ্কটময় অবস্থায় তাহাদের সাহায্যার্থে কানপুর হইতে অসংখ্য সৈন্য লইয়া লক্ষ্ণৌ পৌছিলেন।

অঙ্গদের দৌত্য—ত্রেতাযুগে লঙ্কার মহাসমরে অঙ্গদের দৌত্যকার্য্যে শ্রীরামচন্দ্র দশাননের সম্বন্ধে অনেক গুহ্য বিষয় জানিতে পারিয়া বিশেষ সফলকাম হইয়াছিলেন। এই সিপাহী মহা সমরেও আর এক নরদেহধারী অঙ্গদের সহায়তায় আবদ্ধ ইংরাজেরা আশাতীত ফললাভ করেন। আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবোল্লিখিত অঙ্গদ একজন হিন্দুস্থানী যুবক। পূর্ব্বে এই ব্যক্তি ইংরাজ সরকারে সিপাহি সৈন্য ভুক্ত ছিল কিন্তু পেন্সন পাইবার পূর্ব্বে অল্পবয়সেই পদত্যাগ করে। এ ব্যক্তি অতিশয় চতুর, কার্য্যক্ষম ও সাহসী ছিল। যে সিপাহির সতর্ক চক্ষুতে কেহই ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই—অঙ্গদ তাহাদের বার বার তিনবার প্রবঞ্চনা করিয়া ইংরাজের কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিল।

---

* রেসিডেন্সির উপর সিপাহীগণ ২০এ জুলাই প্রথম আক্রমণ করে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আক্রমণ যথাক্রমে ২৫এ জুলাই ১২ আগষ্ট ও ২৫ আগষ্ট হইয়াছিল।

১৬ ই সেপ্টেম্বর সিপাহি-অঙ্গদের শেষ দৌত্যের দিন। একটী পেনকলমের অতি সূক্ষ্মস্থান মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র লিপি প্রবৃষ্ট করাইয়া ব্রিগেডিয়ার ইংলিস, অঙ্গদকে হ্যাভ্‌লকের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তিনবার নিরাপদে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া এবারও সে যাইতে অস্বীকৃত হইল না। যদিও এক পক্ষে তাহার এই গুপ্ত দৌত্য প্রকাশিত হইলে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা কিন্তু অপর পক্ষে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পঞ্চ সহস্র মুদ্রার অধিকারী হইবার সম্ভাবনা ছিল। বলা বাহুল্য অর্থ লোলুপ অঙ্গদ এবারেও কার্য্যসিদ্ধি করিয়া উক্ত ঘটনার ছয় দিন পরে নিরাপদে রেসিডেন্সিতে প্রত্যাগত হইল।

ইংরাজের নূতন আশা—হ্যাভ্‌লকের লক্ষ্ণৌ প্রবেশ।

২৩শে সেপ্টেম্বরের প্রভাতে অবরুদ্ধ ইংরাজগণ সহসা কাণপুরের দিকে সংশয়াকুলিত চিত্তে কামানের বজ্রনাদ শ্রবণ করিল। সমীরণ সেই দূরশ্রুত কঠোর শব্দের সহিত তাহাদিগকে সম্মোহিনী আশার সুকোমল স্বর বহন করিয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কঠোর কামান গর্জ্জন এবং তৎপরক্ষণেই শত সহস্র বন্দুকের যুগপৎ আওয়াজ!!! তাহারা ভাবিল অঙ্গদের দৌত্য কার্য্যের ফল ফলিয়াছে। হ্যাভ্‌লকের সৈন্য দল নিশ্চয়ই তাহাদের উদ্ধারের জন্য কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। কিন্তু সেই দিন দিবারাত্র এইরূপে আশায় নিরাশায়, হরিষে বিষাদে, উৎকণ্ঠায় আগ্রহে, উল্লাসে অনুল্লাসে কাটিয়া গেল। পর দিনের অবস্থাও সেইরূপ।

২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল—হ্যাভ্‌লক ও আউটরাম সৈন্য দল লইয়া নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। এ সংবাদে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ রহিল না—কেন না পরক্ষণেই নগর মধ্যে ভয়ানক রণকোলাহল শ্রুত হইল। বারিধি গর্জ্জনের ন্যায় সেই দূর-শ্রুত ভীষণ রণকল্লোল ক্রমশঃ বেলা বৃদ্ধির সহিত আরও বর্দ্ধিতায়মান হইয়া নিকটস্থ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ দিবাবসানের সহিত হ্যাভ্‌লকের উদ্ধারকারী সৈন্য দল লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির সীমা সন্নিহিত হইল। মরীচিকা ভ্রান্ত, পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক প্রশস্ত বালুকা স্তূপময় মরু ভূমি মধ্যে সুপরিস্কৃত তোয়পূর্ণ জলাশয় দেখিলে যেরূপ উৎফুল্ল চিত্ত হয়, প্রিয় বিরহ বিধুর ব্যক্তি বহুকাল পরে প্রিয় সমাগম লাভ করিলে যে রূপ উল্লাসিত হয়, দরিদ্র ব্যক্তি দ্রবিণ রাশি দেখিলে যেরূপ পরিতোষ লাভ করে, বধমঞ্চোপরিস্থ, প্রাণ দণ্ডার্হ অপরাধী মুক্তি লাভ করিলে যে রূপ নবজীবন লাভ করে, হ্যাভ্‌লকের ও আউটরামের নবাগত সৈন্য দল দেখিয়া অবরুদ্ধ ইংরাজগণেরও সেইরূপ প্রফুল্লতা জন্মিল। তাহারা ভাবিল বহু দিন পরে বিসাদ আসিয়া প্রফুল্লতার

সহিত হাত ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, নিরাশা আশাকে সঙ্গে করিয়া নিজে তাহাদের দেখিতে আসিয়াছে।

আলমবাগ—অনেকগুলি ইংরাজের শোণিতপাত করিয়া হ্যাভ্‌লক ও আউটরাম লক্ষ্ণৌ প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ এই কার্য্যটী তাঁহারা যতদূর অল্পায়াস সাধ্য মনে করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন—কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদিগকে এর জন্য যথেষ্ট ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। হ্যাভ্‌লক তাঁহার সৈন্য দলের কিয়দংশ, তাহাদের ব্যবহারের উপযুক্ত রসদাদি ও কয়েকটি কামান আলমবাগে * রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শত্রুরা নগর মধ্যে অনেকাংশে বিফল মনোরথ হইয়া পরিশেষে আলমবাগের উপর তাহাদের রুদ্ধ রোষ প্রকাশ করিল। এতন্মধ্যস্থ স্বল্প সংখ্যক সৈন্য অচিরাৎ তাহাদের হস্তে অবরুদ্ধ হইল—লাভের মধ্যে কেবল আর একটি অবরুদ্ধ স্থানের সংখ্যা বাড়িল মাত্র। ইংরাজের পরম সৌভাগ্য যে রেসিডেন্সির ন্যায় আবদ্ধ হইয়া এই স্থানে তাহাদের অনেক দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। অতি শীঘ্রই প্রধান সেনাপতি আসিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

রেসিডেন্সি মধ্যস্থ আবদ্ধ ইংরাজেরা হ্যাভ্‌লক ও আউটরামের সাহায্য পাইয়া অপেক্ষাকৃত বল সঞ্চয় করিল বটে কিন্তু যখন তাহারা দেখিল নগরের চারিপাশে তখনও অগণ্য বিদ্রোহী ছাউনী গাড়িয়া তাহাদের উপর কামান বর্ষণ করিতেছে—তখন তাহাদের মনে জয় বা উদ্ধারাশা একেবারে লোপ পাইল। সেই অগণিত সিপাহী সৈন্যের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে অক্ষত শরীরে স্ত্রী পুত্র লইয়া তাহারা যে নগর হইতে বাহির হইতে পারিবে, একথা তাহাদের আদৌ বিশ্বাস হইল না। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। তবে মন্দের ভাল এই হইল যে আর দুই এক মাস সাহায্য না আসিলে রেসিডেন্সি মধ্যস্থ সমস্ত ইংরাজ নর নারীই সিপাহীর রোষাগ্নিতে পড়িয়া কাণপুরের শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইত। ভগবতী গোমতীর পবিত্র সলিল শত সহস্র ইংরাজ নরনারী বালক বালিকার নির্দ্দোষ শোণিতে অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িত।

আউটরাম ও হ্যাভ্‌লক নগরে প্রবেশ করিয়া স্বদেশীয়দিগকে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। কৌশলাবলম্বনে শত্রুদিগের অধিকৃত কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রাসাদ তাঁহারা অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার প্রথম ফল এই হইল যে শত্রুরা রেসিডেন্সি হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িল।

---

* কাণপুরের পথে আলমবাগ অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব হতভাগা নির্ব্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলির নির্জ্জন বিশ্রাম ভবন। এই উদ্যানের চারিদিকে উন্নত প্রাচীর ও মধ্যে একটী বিশ্রাম নিবাস। আলমবাগে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল ইতিহাস না পড়িয়া কেবল মাত্র তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় ও বীভৎস আকৃতি দেখিলেই সে বিষয়ের যথেষ্ট

এবং ইংরাজেরাও তাহাদের করাল কবল হইতে অনেকটা দূরবর্ত্তী হইল। অবরোধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে যে সকল স্থান উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিবার সময় হয় নাই অথবা যে সকল স্থান অর্দ্ধ রক্ষিত হইয়া পড়িতেছিল—এই দুই সুবিখ্যাত সেনানী আসিয়া তৎসম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ প্রায় করিয়া তুলিলেন। অনেক স্থানে দুই চারিটি নূতন ব্যাটারিও প্রস্তুত হইল। ইহাতেই বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে—হ্যাভ্‌লকের ও আউটরামের এতদূর সেনাবল ছিল না—যে তাঁহারা নিরাপদ অবরুদ্ধদিগকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম। আউটরাম দেখিলেন গত বৎসর এই দিনে যে লক্ষ্ণৌ তাঁহার পদতলে দলিত হইয়াছিল, যাহার একমাত্র হতভাগ্য অধিপতি তাঁহার হস্তে স্বীয় বহুমূল্য উষ্ণীষ রাখিয়া বালকের ন্যায় অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি পথি মধ্যে অশ্বারোহণে বাহির হইলে সিপাহীগণ,নজীবগণ, ও অন্যান্য নাগরিক বর্গ তাঁহাকে বাদসাহের অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করিত—এই সময়ে সেই লক্ষ্ণৌএ—তাঁহার সেই চির প্রিয় রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে তাঁহাকে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় অবস্থান করিতে হইতেছে। যে কাল ওয়াজিদ আলিকে পথের ভিখারী করিয়াছে, তাহার কঠোর হস্তই আজ তাঁহাদিগের এই প্রকার শোচনীয় দশায় উপস্থিত করিয়াছে।

অযোধ্যার নূতন বাদসাহ—ব্রিজিশকদর্। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ইতিমধ্যে আর এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিদ্রোহীদিগের অধিকাংশই অযোধ্যার প্রজাশ্রেণী ভুক্ত—অর্থাৎ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যাহাদিগকে ওয়াজিদ আলির উচ্ছৃঙ্খল শাসনে অত্যাচার জর্জ্জরিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ইহারা তাহাদেরই আত্মীয় কুটুম্ব বা তাহাদেরই বংশাবলী। এমন কি ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতপূর্ব্ব নবাবের বিদায়ী সৈন্য দল ভুক্ত লোক। ডালহৌসীর জবরদস্ত-নীতি যখন অযোধ্যায় নবাবী আমলের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করিল, তখন এই সমস্ত লোক মনে মনে ইংরাজকে অতিশয় সম্পাত করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহারা পূর্ব্বমনস্তাপের প্রতিশোধ তুলিতে মনস্থ করিল। দিল্লীতে প্রাচীন বাদসাহ বংশধরের যে প্রকার অভিষেক হইয়াছে—তাহারা অযোধ্যায় ওয়াজিদ আলির বংশধরকেও সেইরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিল। ওয়াজিদ্ আলির অন্যতম ঔরসজাত পুত্র ব্রিজিশ্ কদর এই সময় লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান করিতেছিলেন—সিপাহিরা তাঁহাকেই সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজছত্র ধরিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে মনস্থ করিল।

ব্রিজিশ কদর সিপাহীদিগের সহায়তায় পুনরায় অযোধ্যার মস্‌নদে বসিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলিয়া

শোভাহীন রাজপ্রাসাদের পুরাতন শোভা কিয়ৎকালের জন্য আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল। পিতৃ পরিত্যক্ত, মর্ম্মর মণ্ডিত, সুপ্রশস্ত হর্ম্মতলে, পুনরায় কিয়দ্দিনের জন্য ব্রিজিশ কদরের নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। হতভাগ্য ওয়াজিদ্ যেখানে উত্তপ্ত অশ্রুজল ফেলিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর যেখানে তাঁহার বংশধরগণের পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না, আজ আবার সেইখানে কাল পরিবর্ত্তনে মৎস্য চিহ্নিত, রত্ন খচিত নূতন রাজ পতাকা দোদুল্যমান হইল। রণ দুন্দুভি গভীর নির্ঘোষে নূতন বাদসাহের অভিষেক ঘোষণা করিল। নবাব সরফউদ্দৌলা * নূতন বাদসাহের মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করিলেন। হিম্মত উদ্দৌলা (নবাবের শ্যালক) তাঁহার সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা হইলে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন—সিপাহিরা তাহার কোন অংশই অসম্পূর্ণ রাখিল না। ফল কথা ইংরাজের বক্ষের উপর তাহাদের ক্ষমতার উপেক্ষা করিয়া আর একটী স্বল্পকাল স্থায়ী নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

সরফ উদ্দৌলা ভাবিলেন যতই চেষ্টা করি না কেন—এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও তদধিপতির স্থায়িত্ব অনেকাংশে অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি আরও দেখিলেন অতি অল্প দিনেই তাঁহাদের দোদুল্যমান রাজ ক্ষমতা বায়ু মুখে তুলারাশির ন্যায় ইংরাজের প্রতিহিংসা মুখে ভাসিয়া যাইবে। তবে যে কয় দিন চলে ইংরাজের উপর একটু প্রভুত্ব করিয়া লওয়া যাক। এই ভাবিয়া তিনি আউট্রামের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধি গিয়া আউট্রামকে বলিল—"আপনি বোধ হয় জানেন আমাদের হস্তে অনেক ইংরাজ পরিবারবর্গ সমেত বন্দী ভাবে আছেন—আমরা যাহা বলিব তাহাতে মনোযোগ করিলে তাহাদের কোন অনিষ্ট করিব না—অন্যথায় তাহারা সকলেই প্রাণ দণ্ডিত হইবে। আমাদের প্রস্তাব এই বর্ত্তমান নবাভিষিক্ত নূতন বাদসাহ ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণের উপযুক্ত বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলে আমরা আর কোন গোলযোগ করিব না।" আউটরাম এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে জ্বলিয়া উঠিলেন—ইহাদের এই ঔদ্ধত্যময় প্রস্তাবে সন্ধিক্রয় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ইংরাজদিগকে ত রক্ষা করা চাই সুতরাং তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—যদি তোমাদের কর কবলিত ইংরাজগণের একটী সামান্য কেশও নষ্ট হয় তাহা হইলে আমরা তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদসাহ ওয়াজিদ্ আলিকে কলিকাতায় ফাঁসী দিব।" বলা বাহুল্য এই প্রকার ভয়প্রদর্শনে ইংরাজ বন্দীগণ আপাততঃ রক্ষা পাইয়া গেল।

শেষ কথা—ইহার পরের সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ ইংরাজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধারের

---

* ইনি ওয়াজিদ আলির সময়ে কয়েক মাস মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন।

আমূল বৃত্তান্ত বলিতে গেলে আমাদের স্থান সংকুলান হইবে না। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে ইহার কয়েক মাস পরে স্যর কলিন ক্যাম্বেল কাণপুর উদ্ধার করিয়া বহুল সৈন্য সমেত লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হন, এবং তাঁহারই শেষ উদ্যমে অবরুদ্ধ ইংরাজগণ মুক্তি লাভ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া রক্ষিত হয়। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের পরও অযোধ্যা প্রদেশে ইংরাজ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে গবর্ণমেণ্টের অজস্র শোণিত পাত, অনেক অর্থ ব্যয় ও নানাবিধ কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল।

বেলিগার্ড সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম—এতদ্ভিন্ন বলিবার কথা অনেক থাকিলেও আপাততঃ নানা কারণে সে উদ্দেশ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। লক্ষ্ণৌএর অবরোধ সিপাহী-মহাসমরের এক অত্যাবশ্যকীয় স্মরণীয় অংশ—ইহার স্মৃতি অতিশয় শোচনীয় ও দুঃখ কাহিনী পরিপূর্ণ। ইংরাজ লক্ষ্ণৌ নগরীতে আজও ইহার লোম হর্ষণকারী স্মৃতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সিপাহীর প্রতি হিংসাময় আগ্নেয়াস্ত্র ইহার অবয়ব সংগঠন করিয়াছে। তৎপরে ইংরাজই স্বহস্তে তাহার রীতিমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতে যতদিন ইংরাজের রাজ্য থাকিবে ততদিন গোমতী-তীরস্থ এই ভীষণ স্মৃতি চিহ্ন দর্শকের মনে ঘোর বিভীষিকা উৎপাদন করিবে।

সিপাহীর স্বহস্ত নির্ম্মিত ইংরাজের স্বপ্রতিষ্ঠাপিত এই মহাস্মরণ চিহ্নের নাম "বেলি-গার্ড"।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

এক ভয়ঙ্কর ঘটনা।

অনুবাদ।

আমি একবার ক্যালেব্রিয়া যাইতেছিলাম। স্থানটা যত দুষ্ট লোকের আড্ডা। আমার ত বিশ্বাস তাহারা দুনিয়ার কাহাকেও ভাল চক্ষে দেখে না, বিশেষতঃ ফরাসীদিগকে। ইহার কারণ এখন বলিবার সময় নহে, সে অনেক কথা, ইহা বলাই এখানে যথেষ্ট যে আমাদের প্রতি তাহাদের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ, আমাদের একজনকে যদি তাহাদের কাহারো হাতে পড়িতে হয়, তাহা হইলে আর নিস্তার পাইবার আশা নাই।

আমরা দুই জনে যাত্রা করিতেছিলাম। আমার সঙ্গী ব্যক্তিটি অল্প বয়স্ক একটি যুবক, দেখিতে অনেকটা কিনসির সেই ভদ্রলোকটির মত। তাহাকে মনে আছে ত?

তাহার চেয়েও ভাল দেখিতে। মনে করিও না আমি তোমার ঔৎসুক্য উৎপাদনের জন্য এ কথা বলিতেছি, বাস্তবিক যুবকটি বড়ই সুশ্রী।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশের রাস্তা গুলা সব খাড়াখাড়া, আমাদের ঘোড়া অনেক কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমার সঙ্গীটি আগে আগে যাইতেছিলেন, যে পথটি তাঁ-হার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম মনে হইল সেই পথটি ধরিয়া তিনি চলিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম, অবশেষে দেখিলাম এক বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি। আমারি দোষ! আমি যেমন একটি কুড়ি বৎসরের বালকের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে গিয়াছিলাম! যতক্ষণ দিনের আলো পাওয়া গেল ততক্ষণ ত আমরা এই বন হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু উদ্ধার পাওয়া দূরে থাক,—কেবল বনের মধ্যেই পাক খাইতে লাগিলাম। অবশেষে অনেক কষ্টে বন অতিক্রম করিয়া যখন আমরা একটি কদাকার বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে আমার ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু কি করিব—অন্য উপায় নাই, ভয়ে ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কতকগুলা ভূত মূর্ত্তি লোক সপরিবারে টেবিলে আহার করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহারা আমাদিগকে আহারে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিল। আমার যুবা বন্ধুটি দ্বিতীয়বার আহ্বানের অপেক্ষা করিলেন না।

সকলেই পানাহারে মত্ত, আমার সঙ্গীর ত কথাই নাই, আমি কিন্তু এই সময় গৃহ-কর্ত্তার চেহারা আর ঘর দ্বার সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

লোকগুলার সকলেরি ত ভূতুড়ে মূর্ত্তি, বাড়ীর চেহারাখানাও বড় ভয়ঙ্কর মনে হইল। বাড়ী ত নয় ঠিক যেন অস্ত্রাগার—বন্দুক, পিস্তল, তরবার, ছোরা ছুরি ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে লাগিলাম তাহাতেই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম, আর তাহারাও যে আমাকে বিশেষ সন্তুষ্ট-নয়নে দেখিতেছে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীটির সমস্তই অদ্ভুত ব্যাপার! তিনি যেন তাহা-দেরই একজন! তাহাদের সহিত তাঁহার প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহার ধূম দেখে কে? আমরা কি জাতি, কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব এ সমস্তই কি না সে স্বচ্ছন্দে বলিতে লাগিল! এমন নির্ব্বুদ্ধি কোথায় দেখিয়াছ? যদিও আগেই আমার ইহা বুঝা উচিত ছিল।

একবার কল্পনা করিয়া দেখ কি ভয়ানক অবস্থা, বন্ধুহীন, নিঃসহায় পথভ্রান্ত একাকী, শত্রুবেষ্টিত? আর সে অবোধটা কি না এমন কোন কথা কোন কাজ বাকী রাখিল না যাহাতে আমাদের বিপদ এড়াইবার কোন আশা থাকে। আমাদের পরিচয় দিয়াই কেবল তিনি ক্ষান্ত হইলেন না—এইরূপ ভাবে আবার কথা কহিতে লাগিলেন--যেন আমরা কতই ধনী! মহা বদান্যতা দেখাইয়া বলিলেন, তোমরা আমাদের আশ্রয় দিয়াছ তোমরা আমাদের পথ দেখাইয়া দিবে ইহার জন্য তোমরা যে পুরস্কার চাহিবে তাহাই দিব"। যেন আমাদের ধনের আর সীমা নাই!

এই কথা শেষ করিয়াই তাঁহার আর একটি কথা মনে পড়িল—তিনি বলিলেন— "দেখো আমার সঙ্গে যে পোর্টমেণ্টটি আছে—সেইটি একটু সাবধানে রাখিতে হইবে। আমি যেখানে শুইব সেইখানে তাহা রাখিতে ভুলিও না, আমার অন্য বালিসের আবশ্যক নাই, সেইটি মাথায় দিয়াই আমি শুইব।"

আমি শিহরিয়া ভাবিলাম এ নির্ব্বুদ্ধিতার ফল তোর ভোগ করিতেই হইবে? বলিব কি তাহার কথায় একজন মনে করিতে পারিত—অজস্র ধনরত্ন এই পোর্টমেণ্টে আমরা লইয়া চলিতেছি। কিন্তু আর কিছুই নয়—তাহার প্রণয়িণীর কয়েকখানা চিঠি পত্র ইহার মধ্যে ছিল বলিয়াই এই পোর্টমেণ্টের জন্য তাহার এত ব্যগ্রতা।

আহারাদির পর সেই ঘরেই আমাদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া গৃহকর্ত্তা নীচে শুইতে গেলেন, অন্য সকলে যে যাহার স্থানে গমন করিল। সেই গৃহতল হইতে সাত আট ফুট উচ্চে এক মঞ্চ, সম্বৎসরের যত খাদ্য সামগ্রীতে তাহা পূর্ণ, নিতান্ত পাখীর বাসা-গতিক স্থান, দড়ির সিঁড়ি দিয়া কষ্টেশ্রষ্টে উঠিয়া গুড়ি মারিয়া ত কোন রকমে তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়—ইহাই আমাদের বিশ্রাম শয্যা।

আমার অর্দ্ধ নিদ্রিত সঙ্গীটি ত তাড়াতাড়ি তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া পোর্টমেণ্টে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি জাগ্রত থাকিব সঙ্কল্প করিয়া ঘরে বেশ ভাল রকম আগুণ করিয়া লইলাম।

বিনা গোলযোগে রাত্র প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আমার মনের ভার লাঘব হইয়া আসিতে লাগিল, হঠাৎ এই সময় আমি শুনিতে পাইলাম নীচে গৃহকর্ত্তা ও তাঁর স্ত্রী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। আমি আগ্রহে চিমনির মধ্যে কান পাতিলাম, ঠিক চিমনির নীচের ঘরেই তাহারা কথা কহিতেছিল—সুতরাং আমি শুনিতে পাইলাম, স্বামী বলিতে-

ছেন "আচ্ছা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—দুটাকেই কি মারিব?" স্ত্রী উত্তর দিলেন "অবশ্য।"

আমি আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম, আমার শরীর মার্ব্বেলের মত শীতল হইয়া গেল। তখন যদি তুমি আমাকে দেখিতে আমি বাঁচিয়া কি মরিয়া বুঝিতে পারিতে না। উঃ সেকথা মনে করিতে এখনো গা কাঁপিয়া উঠে। দুইজন অসহায় নিরস্ত্র লোক, ১০—১৫ জন সশস্ত্র শত্রুর মধ্যে!

আমার শ্রান্ত, নিদ্রামগ্ন সঙ্গী ত আগে হইতেই মৃত, তাহাকে ডাকিয়া গোল করিতে আমার সাহস হইল না, একাকী পলায়ন করা তাহাও অসম্ভব, জানালা যদিও তেমন উচ্চ নয়—কিন্তু নীচে দুইটি কুকুর বাঘের মত চীৎকার করিতেছে। আমি কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম যদি পার কল্পনা করিয়া দেখ।

এই তীব্র যন্ত্রণাময় সুদীর্ঘ ১৫ মিনিটের পর অবশেষে আমি শুনিলাম একজন সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম—গৃহকর্ত্তা। তাহার এক হাতে ল্যাম্প অন্য হাতে এক লম্বা ছোরা, আর তাহার স্ত্রী তাহার পশ্চাতে। আমি ভয়ে ভয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়াইলাম—সে ঘরের দরজাটা খুলিল, খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল কিন্তু আসিবার আগে দীপের আলো প্রায় নিভাইয়া তাহার স্ত্রীর হাতে দিল। তাহার পর খালি পায়ে ঘরে ঢুকিল, বাহির হইতে তাহার স্ত্রী বলিল—দীপের আলো হাত-দিয়া আড়াল করিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আস্তে আস্তে যাও।" গৃহকর্ত্তা ধীরে ধীরে মাচার সিঁড়ির নিকট আসিয়া ছোরা খানা তাহার দাঁতের মধ্যে ধরিয়া দড়ি ধরিয়া উঠিতে লাগিল এবং মাচায় উঠিয়া, যে বিছানায় আমার সঙ্গী ঘুমাইতেছিল, সেই বিছা-নায় সেই ঘুমন্ত নগ্নকণ্ঠ ব্যক্তির নিকট বসিয়া এক হাতে তাহার ভীষণ ছোরা ধরিল—

আর এক হাতে—

উঃ কি করিয়া বলিব—কড়িতে ঝুলান শূকর মাংস হইতে খানিকটা মাংস কাটিয়া লইল। তাহার পর যেমন আস্তে আস্তে আসিয়াছিল তেমনি আস্তে আস্তে নামিয়া গেল। দরজা আবার বন্ধ হইল, দীপ অদৃশ্য হইল—আর আমি আমার চিন্তার মধ্যে একাকী পরিত্যক্ত হইলাম।

যখন দিনের আলো দেখা দিল [illegible]

দের কথামত আমাদের জাগাইতে আসিল। আমাদের জন্য তাহারা যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিল—আমরা উঠিয়া দেখিলাম—মহা ভোজের আয়োজন। এই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দুইটি বড় কুক্কুট ছিল। গৃহিনী বলিলেন—একটি আমাদের খাইতে হইবে আর একটি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

এই খাদ্য দুইটি দেখিয়া—সেই ভয়ঙ্কর কথা—'দুটাকেই কি মারিব' তাহার অর্থ আমার বোধগম্য হইল—আর ভগিনি, তোমার যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তুমিও হয়ত ইহা বুঝিয়া লইয়াছ।"

পাওনিয়ারে কনগ্রেসের কথা পড়িলে আমাদের এই গল্পটি মনে পড়ে!

কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীর দুঃখ যন্ত্রণায় যাহাদের হৃদয় গঠিত তাহারা সুখের তীব্র সূর্য্যালোক সহিতে পারে না। সূর্য্যালোকে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মুদিত নয়ন অবনত করিয়া জীবনের উপকূলে কম্পিতপদে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। সংসারের কটাক্ষকুঞ্চিত হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহাদের মৃদু নিশ্বাস-মলয় শিহরিয়া উঠে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হইতে কি যেন বিভীষিকা আসিয়া চারিদিকে অন্ধকার পক্ষপুট বিস্তার করিতে থাকে। অবশেষে সহসা তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙ্গিয়া যায়, পার্থিব কোলাহল মিলাইয়া যায়, জীবনের জ্বালামাধুরী অনুভব করিবার পূর্ব্বেই অতল সমুদ্রকল্লোলে তাহাদের সমাধি রচিত হয়। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় এইরূপ কাতর দুঃখের রচনা। নগেন্দ্রনাথের ভালবাসার তীক্ষ্ণ রশ্মিচ্ছটায় তাহার আঁখি মেলিতে সাহস হইত না। নিস্পন্দের মত সে জীবনের তীরে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার আশে পাশে ফুল ফুটিত, পাখী গান গাহিত, জ্যোৎস্না হিল্লোলে কোকিলের কুহুস্বর নিশীথের ফুল-সৌরভের প্রেমালিঙ্গন স্পর্শ অনুভব করিত—কুন্দ নগেন্দ্রের স্মৃতিতে বিলীন।

নিমীল-নয়নে সে জগতের কুঞ্চিত কটাক্ষের সম্মুখে জড়সড় হইয়া নগেন্দ্রের অধরপ্রান্তে বিলীন হৃদয়ের মৃদু উচ্ছ্বাস অনুভব করিত, সেই মৃদু উচ্ছ্বাসে ভোর হইয়া ধীরে ধীরে হৃদয় খুলিয়া দিত; সেখানে নগেন্দ্রের ভালবাসা প্রতিফলিত হইত—কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিত, সেই সলজ্জ স্নেহময়ী আঁখি দু'টী নীরবে নিঃশব্দে স্তরে স্তরে খুলিয়া যাইত, নগেন্দ্রের পানে চাহিয়াই আবার অবনত হইয়া পড়িত। কুন্দের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত, নিশ্বাসে জীবনের দীর্ঘ দুর্দ্দিনের ছায়া শিহরিয়া উঠিত।

সেই নিশ্বাস-সৌরভে নগেন্দ্র কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন—কূল নাই, কিনারা নাই, সংসার গৃহদ্বার বিষয়-সম্পত্তি মান সম্ভ্রম সকলেই শূন্যে। তাঁহার গৃহ শ্মশানে পরিণত—যে গৃহে লক্ষ্মী নাই, সেখানে শ্মশান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাঁহার বিষয় সম্পত্তি—বিপদে বন্ধু সম্পদে সখী সূর্য্যমুখী নাই—সে বিষয় সম্পত্তি ক'দিন টিঁকিবে? তাঁহার মান সম্ভ্রম--প্রাণ নাই, থাকিবে কোথায়? নগেন্দ্রনাথের বৃহৎ সংসারে কালের করাল মূর্ত্তি অন্ধকার অমাবস্যার মত সকল শান্তির অবসান জন্য অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে—সেখানে জ্যোৎস্না ফুটিবে না, মলয় বহিবে না, বসন্ত জাগিবে না। সেখানে সম্মুখে শান্তি অবসান।

কিন্তু এই অশান্তির কারণ কি অভাগিনী কুন্দনন্দিনী? স্বপ্নদৃষ্ট ছায়া মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনা কুন্দ ত নগেন্দ্রের দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারে নাই, নগেন্দ্রই ত তাহাকে আশা ভরসা দিয়া, সান্ত্বনা মন্ত্রণা দিয়া আপনার সুখ-শান্তির পথে কণ্টক করিবার জন্য লইয়া আসিলেন। দোষ কাহারও নাই—বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবে কে? নগেন্দ্র কুন্দকে দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলেন নাই, কুন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পদতলে হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া দেন নাই। দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন মাত্র—সূর্য্যমুখীই একার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়। তখন কমলমণি নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখী কেহই জানিতেন না যে, এই সরলতার প্রতিমা বালিকা কুন্দনন্দিনী একদিন দত্ত-গৃহে অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে, যে সূর্য্যমুখী তাহার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন, সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীর একমাত্র আশা ভরসা সম্বল স্বামীর স্নেহে কুন্দই ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইবে। সূর্য্যমুখী হাসিতে হাসিতে নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, কুন্দকে বিবাহ করিতে তাঁহার যদি অভিলাষ থাকে তাহা হইলে তাঁহার সূর্য্যমুখীই বরণডালা সাজাইতে বসেন। তামাসা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কে জানিত চারি পাঁচ বৎসর পরে তাহাই সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে? কিন্তু হইয়াছিল তাহাই। কুন্দনন্দিনী যাহা স্বপ্নেও জানিত না, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যাহা একদিনের জন্যও ঠাঁই পায় নাই, কালের অনিবার্য্য ঘটনায় তাঁহাদের কপালে তাহাই ঘটিয়াছিল। কুমারী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু বিধবা কুন্দ নগেন্দ্রময়ী হইয়া সূর্য্যমুখীকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

তাই বলিয়া কুন্দকে দোষ দেওয়া যায় না। সে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিত মাত্র—ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু সে কখনও সূর্য্যমুখীর হিংসা করে নাই। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাহার সুখ—সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। বাপীতটে একাকিনী দেখিয়া নগেন্দ্র যে দিন কুন্দকে সহস্র কাতর বচনে আপনার প্রেম জানাইয়া বিবাহের প্রস্তাব

করিলেন, ইচ্ছা করিলে কুন্দ সেই দিনই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু সরলা কুন্দত তেমন নহে, সূর্য্যমুখীর মুখ চাহিয়াই কুন্দ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার বল কুন্দ তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না? কুন্দ উত্তর দিল, না। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার শুধু বল আমায় ভাল বাসিবে কি না? হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে চাপিয়া কুন্দ উত্তর দিল, না। কুন্দের কথায় অভিনয় নাই, অভিমান নাই, ইহা সাধাইবার ফাঁদ পাতা নহে। প্রেমের পাক দেওয়া রোগ কুন্দের জ্ঞানের অতীত।

আর সূর্য্যমুখী—সূর্য্যমুখী আপনাতে আর নাই। নগেন্দ্রনাথ ধনে মানে জ্ঞানে কিছুতেই নীচ নহেন। তাঁহার স্বভাব কতলোকের আদর্শ হইবার মত। আজ কিনা এমন দেব স্বামী পতিব্রতার অকপট প্রেম তুচ্ছ করিয়া, সংসার বিষয় বিভব মানসম্ভ্রম পায়ে ঠেলিয়া লালসার মোহে অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছেন; ইহা দেখিয়া পতিহিত কারিণীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না ত লাগিবে কাহার? সূর্য্যমুখী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কুন্দকে গোবিন্দপুরে আনাইয়াছিলেন, তাহার সহিত তারাচরণের বিবাহ দিলেন, তারাচরণের মৃত্যুর পর অনাথিনীকে আপনার আলয়ে আশ্রয় দান করিলেন, কুন্দকে চিরদিনই তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। কুন্দের উপর তাঁহার কিছু মাত্র হিংসা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া উদারতার আত্যন্তিকতাবশতঃ স্বামীর স্নেহ হইতে কে বঞ্চিত হইতে চায়? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, অনিন্দ্যস্বভাব সংযমী নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতেছে, তাঁহার অবহেলায় সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায়, হৃদয়ের সুগভীর বেদনা তিনি আর চাপিতে পারিলেন না, ভগিনীসমা ননন্দা কমলমণিকে এক খানি পত্রে সকল কথা জানাইলেন। পত্রখানি যেন তাঁহার চোখের জলে লেখা—সেখানি পাঠ করিলেই সূর্য্যমুখীর মনের অবস্থা বুঝা যায়। যথা সময়ে কমলমণি পত্রের উত্তর দিলেন; পত্রের ছত্রে ছত্রে সূর্য্যমুখীকে বুঝাইয়াছেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইও না।

কমলের পত্র পাইয়া সূর্য্যমুখী মনকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। নগেন্দ্রের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নগেন্দ্র মদ্যপ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিলেন। সূর্য্যমুখীর কষ্টের আর অবসান নাই। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়াই তাঁহার দিন কাটে। নগেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে গেলে তিনি রাগিয়া যান, ফল না হইয়া হিতে বিপরীত হয়। সুতরাং সূর্য্যমুখীকে আপনার মনেই গুমরিয়া থাকিতে হইত।

এই সময়ে একদিন সূর্য্যমুখীর গৃহে আবার হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হইল। দুই একটী গানের পর কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী একথা সে কথা

লেন, হরিদাসী বৈষ্ণবী আর কেহ নহে—ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র দত্ত। হীরা আরও প্রতিপন্ন করিল যে, দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দের প্রণয়ী তাহার সহিত কুন্দের অনেক দিনের পরিচয়। এই কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেচ্ছা ভৎসনা করিলেন। তাঁহার ভৎসনায় সেই দিন রাত্রেই কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহ ছাড়িয়া গেল।

এতদিন যে প্রেম ধুঁয়াইতেছিল, কুন্দের বিরহে আজ তাহা জ্বলিয়া উঠিল। কুন্দকে পাইবার জন্য নগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—সূর্য্যমুখীর উপর তাঁহার আরও বিরক্তি জন্মিল। নগেন্দ্র একদিন কথায় কথায় সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্দনন্দিনীকে তিনি কি বলিয়াছিলেন। সতীলক্ষ্মী সূর্য্যমুখী প্রাণাধিক স্বামীর চরণে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সুস্থ হইলেন। অন্যা নগেন্দ্রনাথের হৃদয়-ভাগিনী জানিয়া তিনি আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর মুখ চাহিয়া তিনি মরিতেও পারেন না। নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে না বলিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। শেলসম হইলেও তিনি সূর্য্যমুখীকে বলিলেন যে, তিনি দেশত্যাগী হইয়া চলিলেন, যদি কুন্দকে ভুলিতে পারেন তবেই প্রত্যাগমন করিবেন, নহিলে ইহাই শেষ দেখা। স্বামীর পায়ে ধরিয়া সূর্য্যমুখী তাঁহাকে আর এক মাস মাত্র অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নগেন্দ্র মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

নিরপরাধিনী কুন্দকে ভৎসনা করিয়া অবধি সূর্য্যমুখীর অন্তরে শান্তি নাই। রাগের মাথায়ই তিনি কুন্দনন্দিনীকে যথেচ্ছা ভৎসনা করিয়াছিলেন; রাগ পড়িয়া গেল, ক্রমে অনুতাপ উপস্থিত হইল। নগেন্দ্রনাথ আবার কুন্দনন্দিনীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এক মাসের মধ্যে কুন্দকে না পাইলে তিনি দেশ ত্যাগ করিবেন। ভাবিয়া ভাবিয়া সূর্য্যমুখীর দেহ শুকাইয়া গেল। বিধাতা সূর্য্যমুখীর প্রতি সদয় হইলেন—নগেন্দ্র-বিরহ-কাতরা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের দর্শনকামনায় অন্তঃপুরের উদ্যানে আসিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট ধরা পড়িল। "এসো দিদি এসো" বলিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই নগেন্দ্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইল। এ বিবাহে ঘটক—সূর্য্যমুখী স্বয়ং। কিন্তু বিবাহের পরেই ঘটক নিরুদ্দেশ হইলেন। কমলমণিকে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, "জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি।" আরও কমলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, যে দিন স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবেন সেইদিনই যেন তাঁহার আয়ুঃ শেষ হয়। সূর্য্যমুখীকে এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।

নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সূর্য্যমুখী আদবেই দোষী নহেন। গৃহ ত্যাগেও সূর্য্যমুখীর লাবণ্যহানি হয় নাই—বাহিরেও সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রে। হৃদয়ে নৈরাশ্য

যায় নাই। হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল, সূর্য্যমুখী মরণাপন্না হইয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি নগেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। সূর্য্যমুখী দেখিলেন, নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সৌন্দর্য্যে হৃদয় বাঁধা দিয়াছেন, যেথানে তাঁহার ভিন্ন কাহারও কথনও আসন বিছাইতে সাহস হয় নাই সেই নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দ এখন অনুক্ষণ জাগিতেছে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভয়ের কারণ—ভালবাসার প্রতিবন্ধ মাত্র, সূর্য্যমুখী গৃহ ত্যাগ করিলেন—শ্বশুরের গৃহ, স্বামীর গৃহ, আপনার গৃহ ছাড়িয়া অসহায়া একাকিনী কুলবধূ সূর্য্যমুখী উন্মাদিনীর মত সংসারের ভীষণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। কুন্দ এবং নগেন্দ্রের মধ্যে তিনি ব্যবধান থাকিবেন কেন? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, স্বামী তাঁহার কথা শুনেন না, তাঁহার মঙ্গল পরামর্শ গ্রহণ করেন না, ভোগলালসাপরিচালিত নগেন্দ্রনাথের সংসার তরীবেগে উৎসন্নের পথে ছুটিয়াছে; সূর্য্যমুখী কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সংসারে যথাসাধ্য শান্তিস্থাপন চেষ্টা করিলেন। হৃদয়-বেদনায় অস্থির হইয়া আপনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—আত্মহারার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কুন্দনন্দিনীকে স্বর্গের শোভায় উঠাইবার জন্য বিজ্ঞ সমালোচকেরা সূর্য্যমুখীর এই কার্য্যকে যতই নিন্দনীয় বলুন না কেন, সূর্য্যমুখীর কুলবধূ সৌন্দর্য্যের ইহাতে যে কিছুমাত্র হানি হয় নাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কুন্দ স্বর্গের শোভা হইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যমুখী শোভামাত্র নহে, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। নগেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দুইজনকে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সংসারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—নগেন্দ্রনাথের "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" সূর্য্যমুখীতে গুণের অভাব নাই—তিনি গৃহ কার্য্যে দক্ষা, পড়াশুনায় নিপুণা, পতিভক্তিতে সীতাসমা। সূর্য্যমুখী মানবী—দেবী—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিয়াই এত কষ্টেও তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই—নগেন্দ্রনাথের জন্য হৃদয়ে জ্বালা বহন করিয়া জীবন্তে মৃত হইয়া ছিলেন।

কুন্দ যে নগেন্দ্রকে হৃদয় ঢালিয়া ভাল বাসিত, সে কথা কেহ অস্বীকার করিবে না; ভালবাসার জন্যই কুন্দের যাহা সৌন্দর্য্য। কিন্তু সূর্য্যমুখীর ভালবাসা ত কুন্দ অপেক্ষা হীন নহে। নগেন্দ্রে তিনি হৃদয় মিশাইয়াছিলেন—নগেন্দ্র হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারিতেন না। কুন্দ বিবেচনা-শক্তিতে গৃহকর্ম্মে তাদৃশ দক্ষা নহে—সূর্য্যমুখীর নিকট সারা জীবন শিক্ষা পাইলেও কুন্দের এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কুন্দের এই সংসারানভিজ্ঞতাতেই আমরা অনেকটা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহার কষ্টে আমরাও দুঃখ অনুভব করি, সেই সরলতার প্রতিমার পানে চাহিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকি। তাহার জীবনে আমরা একটা রহস্যচ্ছায়া দেখিতে পাই। আরম্ভ ও অবসানের মধ্যে কি যেন নীরব মাধুরী কুন্দের মুখে চোখে ফুটিয়া পড়িয়াছে—তাহার হৃদয়ের অন্তরতম আকুলতা হইতে কে বুঝি নীরবে সুধা ঢালিতেছে। কিন্তু তাহার

জন্য যতই সহানুভূতি প্রকাশ করি না কেন, স্বীকার করিতে হইবে, সূর্য্যমুখী স্বর্গেও দুষ্প্রাপ্য। কুন্দনন্দিনীর বেশ একটী ভাব আছে বটে, তাই বলিয়া কুন্দকে আদর্শ স্ত্রী বলা যায় না। সূর্য্যমুখী যথার্থ সহধর্ম্মিণী; কুন্দ ভার্য্যা মাত্র। তথাপি আবার বলি, কুন্দ নগেন্দ্রকে সমস্ত হৃদয় দিয়া যেরূপ ভাল বাসিত, সেরূপ ভাল বাসিতে অনেক ভার্য্যা অক্ষম। অন্যান্য অনেক গুণে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা হীন হইলেও কুন্দ এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কম নহে।

সূর্য্যমুখীকে আমরা যে সহধর্ম্মিণী বলিলাম, তাহা কথার কথা নহে। নগেন্দ্রনাথও তাঁহারে সহধর্ম্মিণী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। দুই দিনের জন্য মেঘ আসিয়া সূর্য্যমুখীকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে দূর হয়েন নাই। নগেন্দ্রনাথ দেখিতেন, সূর্য্যমুখী "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" সূর্য্যমুখী তাঁহার সর্ব্বস্ব। মোহের ছলনায় এমন প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীকেও তিনি ভুলিয়াছিলেন। এখন বিরহে সূর্য্যমুখী জাগিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যমুখীর জন্য নগেন্দ্র দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, একবার কোনও প্রকারে দর্শন পাইলে যেমন করিয়া হৌক্ লইয়া আসিবেন। এবারে তিনি সূর্য্যমুখীর অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর অভাব সহস্র কুন্দনন্দিনীতে পূরণ করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সহিত সূর্য্যমুখীর মুখশ্রীর কেমন একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—দুইজনের ভাবে যেন বিশেষ ঐক্য আছে। সন্ধ্যার যেমন পবিত্র মহান্ ভাব, দেখিলেই কেমন স্নেহময়ী গৃহিণী বলিয়া মনে হয়, সূর্য্যমুখীরও সেইরূপ বড় একটী সুন্দর ভাব দেখা যায়। সে মুখে পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি মাখান। সেখানে হৃদয় খুলিয়া আনন্দ আছে—প্রাণ বলি দিয়া প্রাণ পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনীকে আমরা সন্ধ্যা কি উষার সহিত তুলনায় আনিতে পারি না। উষা অপেক্ষা তাহার ধীর গতি—উষার মত সে ফুল তুলিয়া, পাতা কুড়াইয়া, লাফাইয়া বেড়ায় না। উষার মত বালিকা কুন্দ নহে। উষার ভালবাসায় যৌবন নাই—প্রণয়ে হতাশ হইয়া উষা মরিবে না। কুন্দের ভালবাসা যৌবনের প্রণয়—তাহাতে নৈরাশ্য, ভয়, শিহরণ সকলই আছে। সন্ধ্যার মত কুন্দ গৃহিণীও নহে—মাতৃভাব কুন্দে বড় পরিস্ফুট নয়। সূর্য্যমুখীর সন্তানাদি ছিল না বটে, কিন্তু মাতৃভাব তাঁহাতে সমধিক পরিস্ফুট। এই মাতৃভাব না থাকিলে তিনি নগেন্দ্রের অতবড় সংসারে লক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতে পারিতেন না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া যখন আর কোথাও পাইলেন না, জানিলেন,

ফিরিবেন স্থির করিলেন। গোবিন্দপুরে তাঁহার আর বাস করিতে ইচ্ছা নাই, চির-জীবনের মত একবার তাহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন—একবার সূর্য্যমুখীর শয়ন কক্ষে একফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবেন। গৃহধর্ম্ম তাঁহার আর ভাল লাগে না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় নগেন্দ্র দেখা করিলেন। বিষয় কর্ম্মের বিলি ব্যবস্থা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কলিকাতায় আবশ্যকীয় কার্য্য শেষ করিয়া নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দপুরে চলিলেন। শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে গোবিন্দপুরে গিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন। নগেন্দ্র গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর শোকে কাতর নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ বড় ব্যথিত হইল।

সেই দিন রাত্রিকালে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার চারিদিকে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে সূর্য্যমুখীর স্মৃতি। একস্থানে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,

"১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র এই লেখাটী অনেকবার পড়িলেন, তাঁহার আর আশ মিটে না—চোখের জল চোখে মুছিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া আসিল, আলোকের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। সেই অন্ধকারালোকে নগেন্দ্র একটী স্ত্রী রূপিণী ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি যেন কাহার কোলে শয়ন করিয়া আছেন। তখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নাই—কুন্দের নাম সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে। রমণী উত্তর করিলেন, "সেই পোড়ার মুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।" নগেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সূর্য্যমুখী। আর আনন্দের সীমা রহিল না—বাড়ীতে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল। চারিদিকেই আনন্দ উল্লাস—সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে সূর্য্যমুখী ও কমলমণি কুন্দকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে, কুন্দ বিষ-পান করিয়াছে। কমল গিয়া তাড়াতাড়ি নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, একে একে জবাব দিয়া চলিয়া গেল। কুন্দের আজ প্রথম মুখ ফুটিয়াছে। নগেন্দ্রকে বলিল, তোমাকে দেখিয়া মরিবার ইচ্ছা ছিল, সে সাধ পূর্ণ হইল, কিন্তু তোমাকে দেখিলে মরিতে আর ইচ্ছা হয় না। কুন্দের ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যমুখী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কমলও অতিশয় কাতর। নগেন্দ্রনাথও রোরুদ্যমান। অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নগেন্দ্র কুন্দের যথাবিহিত সংকার করিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের হৃদয়ে এই দুর্ঘটনা জাগিয়াছিল।

কুন্দের মৃত্যুতে সূর্য্যমুখীর সকল শান্তি অবসান হইল। কুন্দকে তিনি আপনার কনিষ্ঠার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কুন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। কুন্দও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাসিত। আজ দুই জনের ভালবাসার মধ্যে অশ্রুজল মাত্র অবশেষ, আনন্দ সুখশান্তি সকলই নির্ব্বাণ হইল। বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডিতে দাঁড়াইল।

দুইটি বকুল।

আঁধার নিবিড় বন ঘন তরুরাশি,
আগুলিয়া রহিয়াছে সবে দশদিশি।
সেথায় কুসুম নাই নাহি রবিকর,
কখন না সুধারাশি ঢালে সুধাকর।
সেথায় তরঙ্গ লয়ে জাহ্নবী না বহে যায়,
হু হু হু হু তীব্র স্বরে বায়ু সদা গান গায়।
বসন্ত সেথায় কভু হাসিয়া না দেয় দেখা,
নাহি পরে তরুচয় কচি কিশলয় রেখা।
বিজন গভীর রাতে রোগীর হাসির মত,
একটি চাঁদের কর খেলা করে অবিরত।
কেবল একটি গাছে দুইটি বকুল,
দুজনার প্রেমে দোঁহে রয়েছে বিভুল।
প্রবল বায়ুর বেগে কখন না খসে যায়,
দুজনার পানে দোঁহে কেবল অবশে চায়।

ভালবাসা।

থর থর করি কায় কাঁপিছে আবেশে,
ঢুল ঢুল আঁখি দুটি ধীরে মুদে আসে।
উপরে চাহিয়া আছে বিশাল আকাশ,
কাঁপিছে চাঁদের আলো কুসুম সুবাস।
বুকে বাঁধা আছে তবু কাছেতে না পায়,
এই ভয় জাগে মনে বুঝি গো হারায়।
সম্মুখে অনন্ত সুখ তবু কেন ভয়,
কেন গো প্রাণের জ্বালা শান্ত নাহি হয়!
অধরে ফুটিছে হাসি চখে কেন জল,
পরাণে মরিতে চায় পরাণ বিকল।
দুইটি উন্মত্ত সেই হৃদয়ের পরে,
সকল বাসনা যেন যাইতেছে ঝরে।
নীরব নিস্তব্ধ নিশি দুটি প্রাণ ধীরে মিশি,
তেয়াগি মরত বাস স্বরগে যেতেছে ভাসি।

শূন্যপ্রাণ।

১

মনে আছে মনে নাই,
কি ছিল কি যেন হায় গিয়াছে হারায়ে।
যখন যাতনা ভরে,
শুয়ে থাকি ধরাপরে
ফুলগুলি পড়ে খসে মোর পানে চেয়ে।
পাগল সমীর গায়,
মোরে চেয়ে 'হায় হায়'
পবিত্র জাহ্নবী ধারা কেঁদে চলে যায়।
আকাশে দুইটি তারা,
চাহিয়া আপনা হারা,
মোরে দেখে তারা যেন মেঘেতে মিশায়।

২

হা অভাগা কি লাগি রে
এসেছিস ধরাপরে,
তোর কি প্রাণের জ্বালা মিটিবে হেথায়।
শূন্য প্রাণে গান গাস,
যা বাসনা তাকি পাস— ?
কেন রে চোখের জল ফেলিস ধরায়।
এ যেরে সুখের ধরা,
তুই যে আপনাহারা
কেমনে হেথায় তোর মিলিবেক স্থান।
হেথায় সুখের মেলা,
শুধু হাসি শুধু খেলা,
তোর যে প্রাণেতে শুধু বিষাদের তান।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

প্রবাদ প্রশ্ন।*

বসন্তকাল—ফাল্গুন মাসের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আকাশ পরিষ্কার, প্রকৃতি শ্যামল পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হাসিতেছে, আকাশ এবং পৃথিবী পরস্পর মিলিত হইবার জন্য উভয়েই যেন অনন্তের অভিমুখে দৌড়িতেছে। আমি সহরের কথা বলিব না, এ সময় পল্লীগ্রামের দৃশ্য বড় মধুর, চারি দিকেই আমের গাছে মুকুল শোভা পাইতেছে, সেই মুকুলে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি গান ধরিয়াছে; মানুষের যে গুণ থাকিলেই সে হিংসা শূন্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, মৌমাছির এ ঝঙ্কার কোকিলের প্রাণে সহ্য হইল না, তাই তাহারা থাকিয়া থাকিয়া সিমুল গাছের রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলের মধ্য হইতে 'কুহু কুহু' রবে ডাকিয়া উঠিতেছে, তাহার সে মধুর স্বরতরঙ্গ দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে আকাশের কোলে নাচিয়া নাচিয়া অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে।

ময়দানের দিকে চাহিলে কত শোভাই দেখিতে পাওয়া যায়, ছোলা, গম, যব প্রভৃতি

---

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'স্বতন্ত্র'। শ্রীযুক্ত যোগেশনাথ সেন ও দীনেন্দ্র কুমার রায় ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

নানাবিধ রবি শস্যের ছোট ছোট গাছগুলি দক্ষিণ বায়ুতে কেমন নড়িতেছে, অরহর গাছের ঝোপে ছোট ছোট পাখীগুলি বসিতেছে, ডাকিতেছে উড়িতেছে। কোথাও বা বড় বড় খামারে পাকা লঙ্কামরিচ রাশিকৃত করা আছে, সেদিকে চাহিলেই চক্ষু ঝলসিয়া যায়, সুপক্ক লঙ্কা মরিচের লোহিত আভায় চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে, সেই লোহিত আভা শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া, নীলাকাশের অন্তর্গত সূর্য্যের লোহিত আভার অনুকরণ করিতেছে। বাস্তবিকই বসন্তকালে পল্লীগ্রামে প্রকৃতির রমণীয় শোভা দেখিলে শোক দুঃখ পূর্ণ হৃদয়ও ক্ষণ কালের জন্য শান্ত হয়, এই মধুর সৌন্দর্য্য ভোগে বিলাস দ্রব্য পূর্ণ নগরের বিলাসিতার আস্বাদন ভুলিয়া যাইতে হয়।

কিন্তু যাহার উদরে অন্ন নাই তাহার প্রাণে কিছুতেই স্ফূর্ত্তি জন্মে না। 'অন্ন চিন্তা গরীয়সী'। কৃষ্ণপুরের শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি বিচক্ষণ ও গ্রামের মধ্যে মান্য ব্যক্তি হইলেও আজ কয়েকমাস হইতে বড় বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন, বিশেষ আজ কাল সহর পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই "ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণের" বাজার বড় মন্দা। দেশের দোষেই হউক আর ম্লেচ্ছের রাজ্য শাসন দোষেই হউক—সে কালের ভূঁড়িদার চৈতনধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের আর বড় প্রতিপত্তি নাই—সুতরাং নিজে চেষ্টা দ্বারা দুপয়সা উপায় না করিলে ভূঁড়ির অস্তিত্ব দূরের কথা নিজের অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত দুরূহ। দেখিয়া শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর গৃহে বসিয়া থাকায় ভদ্রস্থতা নাই বুঝিয়া একবার শিষ্য-বাড়ী ঘুরিয়া আসিবার মৎলবটা মনে মনে আঁটিয়া ফেলিলেন। শিষ্যগণ গুরুর কল্প বৃক্ষ সদৃশ, গাছে ফল থাক আর নাই থাক গুরু আসিলেই তাঁহাকে দান করিতে হইবে, সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুভ গমনের জন্য একটি দিন স্থির করিলেন।

কিন্তু এ যাত্রা বিষয়েও একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল—শিষ্যবাড়ী যাইতে হইলে কাপড় গামছা ইত্যাদি বহনের জন্য একটা ভৃত্য সঙ্গে থাকা ত প্রয়োজন; কিন্তু ভৃত্য কোথা? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী কিছু চাকর বাকর থাকে না, সুতরাং একটি ঠিকালোকের চেষ্টায় বহু অনুসন্ধান করিলেন। পল্লীগ্রামে সকলেই কিছু না কিছু চাস বাস রাখে, এ সময় কেহই মাঠে শস্য ফেলিয়া বিদেশে যাইতে পারে না, ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রতিপত্তিশালী লোক হইলেও কাহাকেও সঙ্গে পাইলেন না—যাহাকেই সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন সেই ব্যক্তিই অতি দীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

বহু অনুসন্ধানের পর কৃষ্ণপুরের গোপাল ঘোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মুটে হইয়া যাইতে সম্মত হইল। একদিন বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপালকে ডাকাইয়া সমস্ত ঠিক করিলেন এবং তাহার পর দিন প্রভাতে শিষ্যবাড়ী গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি চলিয়া গেল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভাতে গোপালকে সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এক এক দিন এক স্থানে অবস্থান

পূর্ব্বক তত্রত্য শিষ্যমণ্ডলীকে অনুগৃহীত করিয়া তাহার পর দিন আবার ভিন্নগ্রামে গমন করিলেন। এইরূপে চারি দিন চলিয়া গেল, ইতি মধ্যেই তিনি ৫।৬ টাকা উপায় করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পঞ্চম দিন সন্ধ্যার সময় হরিষপুরের এক গৃহস্থ শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে সেইস্থানে সে রাত্রি থাকিলেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যকর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; গোপালও যথেষ্ট শ্রান্ত হইয়াছিল, কিছু আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাগটী মস্তকের নীচে রাখিয়া এক জীর্ণ মাদুরে শুইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই প্রবল নিদ্রায় অভিভূত হইল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহরের সময় ঝাঁ করিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখে মাথার নীচে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাগ ন্যাই, তাহার বিরহে তাহার ধূলি ধূসরিত মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে, দেখিয়াই সে অবাক, বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল, ভাবিতে লাগিল "এ মোট চুরি করা কার কাজ ?" বাগবাজারের যেরূপ সুনাম শ্রবণ করা আছে তাহাতে হরিষপুর যদি তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইত তবে গোপাল সহসাই মনে করিত "কোন গুলিখোর মহাশয় হয়ত এ বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু হরিষপুরের মত গ্রামে গুলির নাম তত শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক গোপাল আর অধিক সময় নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা উচিত মনে করিল না; উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিল, তখন চন্দ্র পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বৃক্ষ লতা পর্য্যন্তও যেন অচেতন ভাবে ঘুমাইতেছে, নৈশবায়ু যেন অতি সন্তর্পণে তাহাদের ব্যজন করিতেছে, চন্দ্রের কিরণ বৃক্ষপত্রে স্নিগ্ধতার ছটা মাখাইয়া দিয়াছে। গোপাল সে সকল দেখিতে ছিল না; সে একটী সরুরাস্তা বাহিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া গেল, কিছুদুর যাইয়াই একটী ভগ্নকুটীর দেখিতে পাইল, দেখিল কুটীরের দ্বার নাই, কুটীরের চালের একদিকে খড় পর্য্যন্ত নাই। দেখিয়াই একটু আহ্লাদে গোপালের মুখখানি বিকশিত হইল; বলিয়া উঠিল—চোরধরা না প'ড়ে আর যায় না, এই ঘর যে বেটার সেই বেটা যদি চুরি না ক'রে থাকে ত আমি গোয়ালা নই, এ যদি চোর না হবে ত এর চালে খড় নাই কেন ? আমি দেড় কুড়ি বছর ঐ ব্যবসা করেছি, চালে একগাছ খড় দিতে পারি নি, সাধে কি ব্যবসা ছেড়েছি, বেটা জানেনা যে কার জিনিষে হাত দিয়েছে।" তর্কশাস্ত্রের কোন ধারা অনুসারে যে সে "যার চালে খড় থাকিবে না সেই চোর হইবে" এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল, তাহার মীমাংসা আমরা করিতে পারি না, তবে আমরা বলি অধর্ম্মের পথ দুঃখের, একথার সহিত তার কথার কিছু মিল আছে। যাহা হউক, সে তাহার পর ধীরে ধীরে সেই কুটীরে প্রবেশ করিল—দেখিল কুটীর দ্বারেই একজন শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে—তাহার পা ছুঁইতেই বুঝিতে পারিল যে নিশ্চয়ই কিছু আগে এই পদযুগল জলে ভিজিয়াছে। গোপাল আর সেখানে বিলম্ব করিল না, এদিক ওদিক ঘুরিয়া অবশেষে একটি পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল; পরে ধীরে ধীরে পূর্ব্ব-

কোণে নামিয়া জল নাড়িতে লাগিল, দেখিল কতকগুলি ব্যাং ভীত হইয়া অল্পজল হইতে লাফাইয়া অধিক জলে পড়িল, দেখিয়া সে পূর্ব্ব হইতে উত্তর, উত্তর হইতে দক্ষিণ কোণের জল পূর্ব্ববৎ নাড়িতে লাগিল, কিন্তু সে দুই দিকেও আগেকার ন্যায় তীরস্থিত ব্যাংগুলি গভীর জলে লাফাইয়া পড়িল, তখন গোপাল—"বেটা এ তিন দিকের একদিকেও নামে নি" বলিয়া পশ্চিম কোণের জল ঘোলাইতে লাগিল, কিন্তু একটী ব্যাং ও নড়িল না, তখন সে জলে নামিয়া ইতস্ততঃ খুজিতে খুজিতে একটী চটে জড়ান ব্যাগ কাদার মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাইল, তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া কাদা ধুইয়া ফেলিল, তাহার পর বাড়ীর দিকে চলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি প্রভাতেই উঠিয়াছিলেন, গোপালের বাড়ী পৌছিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল, বাড়ী যাইতেই দেখিল ভট্টাচার্য্য মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন, গোপাল তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন সাধু! সাধু!!

পাঠক, আপনিও কি তাহাকে সাধু বলিবেন ? তবে পাকাচোর কে ? †

কাগচের বাক্‌স রচনা।

সূত্রে না গাঁথিয়া—আটায় না জুড়িয়া—শুদ্ধ কেবল কাগজ কাটিয়া মুড়িয়া এবং তাহার দুই এক স্থানে ছিদ্র কাটিয়া—ডালা এবং তালা সমেত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাক্‌স্ রচনার নূতন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া নিম্নে তাহা পদ্যে লিপিবদ্ধ করা হইল। কাজ চলা গোচের রীতিমত একটা বাক্‌স—ছেলে-খেলা গোচের নহে। সমস্তই যদিচ স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি তাহা রীতিমত বোধায়ত্ত করিতে হইলে রচনা প্রকরণটি—একবার অন্ততঃ—চক্ষে দেখা আবশ্যক। যিনি চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে ইচ্ছা করেন—প্রণেতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

দুপুরু কার্গজ-গুলা চারি-পৃষ্ঠা খাতা।
এক এক কাগজের দুই দুই পাতা॥
পাতা-সেগুলা'র, যেন, লম্বা-হেন দিক্
চওড়া-চেয়ে বড় হয় দেড়ার অধিক॥

সব কাগজেরি প্রায় এইরূপ মাপ।
নিরথ—শ্রীরামপুরী কিম্বা ফুলিস্কাপ॥
কাটিয়া লইতে হ'লে কারো কোনো ভাগ।
পাতা'র মুড়িয়া ধার কাটিবেক দাগ॥

---

† এই প্রবাদ প্রশ্নটির উত্তর লেখক বলেন চোরের উপর বাটপাড়ি ? কিন্তু এ উত্তরটি অপেক্ষা—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর এই প্রবাদটি এস্থলে অধিকতর প্রযুজ্য মনে হয়। কেন না চোরের জিনিষ চুরী করাকেই চোরের উপর বাটপাড়ি বলা যায় এই গল্পটিতে গোপাল ঘোষ নিজের অপহৃত দ্রব্য কৌশলে ফিরিয়া পাইয়াছে।

দাগটি কাটিও যেন লম্বা-দিক্ বাগে।
কাটিবে কাগজ-খানি সেই দাগে দাগে॥

কর্ত্তন।

তিনটি কাগজ লও সদৃশ আকার।
যেমন তেমনি থা'ক্ প্রথমটি তা'র॥
দ্বিতীয়ের ল'য়ে তবে প্রথম পাতাটি,
দু-আঙ্গুল পরিমাণ প্রস্থ ফেল ছাঁটি॥
মিলাইয়া দু পাতার লম্বা দুটি ধার,
দু-ভাঁজ করিয়া রাখো কাগজ আবার॥
তৃতীয়েরে দ্বিতীয়ের মতো কর ঠিক্।
একটু না হয় যেন এদিক্ ওদিক্॥
পুন' তা'র ছাঁটি ফেল পাতা আধখানা।
যেন সে, দ্বিতীয়টির, হয় বারো আনা॥
তৃতীয়টি মুড়ি আর ক'রো না দুভাঁজ।
খোলা প্রাণে কিছুকাল করুক্ বিরাজ॥

নাম-করণ এবং চক কর্ত্তন।

কাগজ ঐ যে তিন—তিনটিই কেজো।
পরে পরে নাম ধরে বড় মেজো সেজো॥
বড় মেজো দু-পুরু, সেজোটি এক পুরু।
বিলম্বে কি কাজ আর, কার্য্য কর সুরু॥
দীর্ঘ প্রস্থ মিলাইয়া চক কাটো আগে।
দুবার দু ভাঁজ কর দুই দিক্ বাগে॥
দুপুরু কাগজ লও আরেকটি পুন'।
লম্বা কত—চওড়া কত—বলি তাহা শুন॥
তাহার কি-দুটি পাতা লম্বে হইবেক
সেজোটির কোণাকুণি-রেখার অর্দ্ধেক॥
চওড়া হ'বে লম্বা-চেয়ে দেড় গুণ কম।
ছোটো নাম এইটির বয়সে অধম॥
বয়সে অধম বলি করিও না তুচ্ছ।

মণ্ডন।

ছোটোটি চুবড়ি-চাপা থাকুক্ এখন।
বড় তিনটিরে ল'য়ে কার্য্যে দেও মন॥
মধ্য-ভাগে চারি কোণ করি সমাধান,
পৃষ্ঠে মোড়ো বড়'দের চারি চারি কাণ॥
তা'র পরে তাহার উল্টা পিঠ বাগে,
চারি চারি পার্শ্ব মোড়ো সম-সম ভাগে॥
চারিপার্শ্ব মুড়িয়া কাটিবে চারি দাগ।
মুড়িবে বড় মেজো'র সিকি সিকি ভাগ॥
রেখা-মুখা ধার দুটি মুড়িবে প্রথমে।
অবশিষ্ট দুটি ধার পরে যথা-ক্রমে॥
সেজো'র দুইটি ধার, ছোটো-বড় ভাগে
কাটা আছে দেখিবে ত্যাড়চা এক দাগে॥
ছোটো অংশখানি তা'র তৃতীয়াংশ ঠিক্।
এক চুল নহে তা'র ইদিক্ উদিক্॥
হেন দুই তৃতীয়াংশ করি পিঠাপিঠি,
দুই পার্শ্ব মোড়ো, যেন, মুড়িতেছ চিঠি॥
কোণাকুণি-রেখার কর্ত্তন-বিন্দু পরে,
অবশিষ্ট পার্শ্ব দুটি মোড়ো অকাতরে॥

চঞ্চু।

যখনি মুড়িবে যা'র পার্শ্ব দুই দুটি,
কাণের ছুঁচালো মুখ বাহিরিবে ফুটি॥
পিঞ্জরের পাখী যেন সীমা ছাড়াইয়া,
খাঁচার বাহিরে দিল চঞ্চু বাড়াইয়া॥
কাণের বেরিয়ে থাকে আগা যতখানি,
চঞ্চু বলি তারে আমি এটা রাখ জানি॥
দুদিকের দুই চঞ্চু দুই রকমের।
ঠাহরিয়া দেখিলেই পা'বে তাহা টের॥
একটির মুখ খোলা, অন্যটির বোজা।

কর্ণ এবং পার্শ্বের নাম-করণ।

সবাকার রেখা-মুখা দুটা দুটা কাণ,
এলাইয়া রাখো এবে করিয়া সটান ॥
উড়ু'ক্ সে-দুটা কাণ যেমতি পতাকা।
অন্য দুটা চাপা থা'ক্ পগ্‌গে যেন ঢাকা ॥
এলো কর্ণ তা'রে বলি—এলোনো যে কাণ।
চাপা-কর্ণে চাপা বলা উচিত বিধান ॥
চক্ষু বোজা থাকিলেই কর্ণে বলি বোজা।
খোলা-থাকিলেই খোলা—মনে রাখা-সোজা॥
খোলা কর্ণ, বোজা কর্ণ, দুই পারে থাকে।
রাত্রে যথা চখাচখী বিধির বিপাকে ॥
কর্ণে পার্শ্বে নাম ভেদ নাহি অণুমাত্র।
যাহার যেমন কাণ তেমনি সে পাত্র ॥
কে চাপা কে এলো পার্শ্ব কে খোলা কে বোজা
দেখিলেই জানা যায়—পড়ি আছে সোজা ॥
চাপা-খোলা চাপা-বোজা হ'য়ে মুখামুখী,।
দোঁহা-পানে দোঁহে দেয় আড়ে আড়ে উঁকি॥
এলো-খোলা, এলো-বোজা, দুপারে দুজন।
আর বেশী বলিবার নাহি প্রয়োজন ॥
মৎস্যের যেমন আছে ল্যাজা মুড়া পেটী,
তেমতি—পার্শ্ব-গুলা'র; দেখি রাখ এটি ॥
বড় আর মেজো'র ঠাহরি দেখ দাগ;
ল্যাজা মুড়া সিকি সিকি, পেটী অর্দ্ধ ভাগ।
সেজো'র তিন ভাগের, একভাগ পেটী—
দুই ভাগ ল্যাজা মুড়া; দেখি রাখ এটি ॥
এ তোমায় কহিনু যতেক তুক্ তাক্।
এই বেলা জানি রাখো করি' ঠিক্ ঠাক্ ॥
এ'র পরে কর্ণে শুনি নামগুলি হেন,
হ'য়ো না—আকাশ থেকে পড়িলে কে যেন ॥

উল্টা মণ্ডন।

এলো কর্ণ সহিতে একত্রে দাগে দাগে,
মোড়ো চাপা-পার্শ্ব-গুলা মোড়ো উল্টাবাগে ॥
কিন্তু দাগ কাটো শুধু ল্যাজায় মুড়ায়,
ছুঁয়ো না মধ্যের ভাগ, বলিনু তোমায় ॥
তা'র পরে যে-বাগে যে মোড়া ছিল আগে,
তেমনি করিয়া রাখ মুড়ি সেই বাগে ॥
এই বার দাগ কাটো ল্যাজা মুড়া বাদে
মধ্য ভাগটিতে শুধু বিনা পরমাদে ॥

মেজো।

মেজোটির চাপা দুটা কর্ণের কুহরে,
চঞ্চু দুটা গুঁজি রাখ এই অবসরে ॥
চারি কোণে চারি ডানা করিয়া বিস্তার,
চারিটা পাঁচিল দিয়া ঘেরো চারিধার ॥
মুচড়িয়া এলো-কর্ণ, ডানা জোড়া জোড়া
বাঁধহ তাহার মূলে করি পিছমোড়া ॥
এলো কর্ণ দুমড়িয়া বাহিরের বাগে,
পাখা গুলা ঢাকা দেও যতনে সোহাগে ॥
দোমড়ানো এলো কর্ণে গজ-কর্ণ বলে।
না জানে এমন লোক নাই ভূমণ্ডলে ॥
শ্যামা'র জিহ্বার মতো নীচে লম্বমান,
জিহ্বা নাম ধরে তাই ঝোলা দুটা কাণ ॥

বড়।

বড়টির এলো-খোলা কাণের দু-ভাগ,
চাপা-পার্শ্ব সহিতে মোড়হ দাগেদাগ ॥
তা'র পরে বড়টির ডানা এক জোড়া,
এলো-বোজা পার্শ্বে বাঁধো, করি পিছ-মোড়া
এলো-খোলা পার্শ্বটিতে (কথাটি সমুঝি')
পিঠে না বাঁধিয়া ডানা পেটে রাখো গুঁজি ॥
জিহ্বা দুটা গলে পুরি করি দেও বোবা।
চালা ভুঁয়ে দ' পড়িয়া হ'য়ে যাবে ডোবা ॥

সেজো।

সেজোটির এলো কর্ণে কর মনোযোগ।
কাণ ল'য়ে টানাটানি বড় কর্ম্মভোগ ॥

এলো কর্ণ ছুটা করি মুচড়িয়া চীট্‌,
ডানা-জোড়া করি রাখো এপিট্‌ ওপিট ॥
এলাইয়া পক্ষগুলা দুমড়াও মাজা।
হাড় গোড় ভাঙি যা'বে মন্দ নহে সাজা ॥
গুটাইয়া পাখম না করি কালব্যাজ,
ঝুলাইয়া দেও ছুটা ময়ূরের ল্যাজ ॥
চাপাইয়া ল্যাজ-ছুটা এলো-খোলা কাণে
সেজো দিয়া মেজোটিরে ঢাকো সাবধানে ॥
বড়টি মেজো'র হ'বে বসিবার খোপ।
সেজোটি হইবে ডালা, যেন ঘেটাটোপ ॥
কাণ যদি ল্যাজ হ'য়ে নীচে গেল নামি,
কি ধরি তুলিবে ডালা ভাবি তাই আমি ॥
হ'য়েছে! মোহন চূড়া বাঁধি দেও ভালে।
যশোদা সাজা'ন যথা ব্রজের গোপালে ॥

চূড়াকরণ।

সব-চেয়ে ছোটো যেটি—কাগজ দু-পুরু।
সেইটি লইয়া কর চূড়া-কার্য্য সুরু ॥
যে ধারে দুভাঁজ করা এ কাগজ-খানি,
সেই ধার যুক্ত ধার এটা রাখ জানি ॥
মুক্ত-ধার খোলা ধার—বলি তবু খুলি—
পাতা উলটানো হয় যেই ধার তুলি ॥
যুক্ত ধার মুচড়িয়া, খাটো দুটি ধার
মুক্ত ধারে ভূমিসাৎ কর এই বার ॥
ত্রিকোণ হইয়া যাবে মিলি দুই দিক্‌।
আধা-খোলা আধা-মোড়া ছাতা যেন ঠিক্‌ ॥
"বিহঙ্গের চঞ্চু" হো'ক্‌ চূড়াটির নাম।
দুপাশের দুই কোণ পক্ষ ডানি বাম ॥
চঞ্চুর দু-পাশে দুটি নাশারন্ধ্র কাটি
তাহার ভিতরে গোঁজো কাগজের কাটি ॥
এই কাটি এ'র পরে খিল-কাটি হ'বে।
কিছুই বিচিত্র নয় এ বিচিত্র ভবে ॥

ডালা'র দুদিক্‌ দিয়া দুইটি পাঁজরে।
বিহঙ্গের ডানা দুটা পোরো তার পরে ॥
দু পাশের দুই খাপে পক্ষ র'বে ঢুকি।
ভালে বরাজিবে চূড়া দিব্য ছুঁচামুখী

শেষ কার্য্য।

চূড়া-বাঁধা সেজো দিয়া মেজোটিরে ঢাকি,
যত্নে কর সমাপন কার্য্য যাহা বাকি ॥
ল্যাজ-দুটা সেজো'র, মেজোর দুটা কাণ,
তলা-থেকে যতখানি নীচে লম্বমান,
উঁচা-বাগে মুড়ি' রাখ অংশ ততখানি।
ভুঁয়ে না লুটায় যেন কোঁচা বা উড়ানী ॥
সেজো'র গুটানো ল্যাজ মৃদুমন্দ ঠাঁসে
বসাইয়া বড়টি'র এলো-খোলা পাশে,
সাবধানে সযতনে বড়'র ভিতরে
সেজো-ঢাকা মেজোটিরে পোরো অকাতরে॥
সেজোটির ল্যাজ আর মেজোটির কাণ,
বড়টির ক্রোড়ে ঠাসি করিয়া সটান,
এক সঙ্গে সূচে বিঁধি ল্যাজ-কাণ-ক্রোড়,
দুবার দুঠাঁই কর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ॥
ওধারেও তেমনি মেজো'র গজ-কাণ,
বড়টির ক্রোড়ে করি যত্নে সমাধান,
কাণ-ক্রোড় বিঁধি ফেলি একো একোফোঁড়ে,
দুটা দুটা ফুটা কর কাণে আর ক্রোড়ে ॥
তা'র পরে বড়টির ভিতর হইতে,
তুলি লও মেজোটিরে সেজো'র সহিতে ॥
মাঠে হাওয়া খাইয়া বাড়িতে ফিরি আসি,
পোষাক্‌ খুলিয়া রাখে যেমতি বিলাসী,
বড়টির সেইরূপে তোড় জোড় খুলি,
ভিতরের পাতাখানি হস্তে লও তুলি ॥
ফুটা হৈতে ফুটাতক্‌ ছিদ্র দুই কাটো।
ছোটোদের ল্যাজ-কাণ ফুটাতক ছাঁটো ॥

পরে সেই পাশ-ছাঁটা ল্যাজ আর কাণ,
মুচড়িয়া কর ঠিক্ ছোরা'র সমান ॥
ছিদ্রে ছিদ্রে বসাইয়া আপাদ মস্তক,
ছোরা-গুলা করি দেও বাণের ফলক ॥
খুলিয়া যা'বার পথে লাগিবে কপাট।
বিধির বন্ধন সম বাঁধি যাবে আঁটে ॥
আঠা নাই, সুতা নাই, কাগজে কাগজে
জোড়া লাগি গেল দেখ কেমন সহজে ॥
বড়টির পাতা-দুটা রাখি থরে থরে,
চঞ্চু গোঁজো চাপা দুটা কর্ণের কুহরে ॥
সম্মুখের পক্ষ বাঁধো, করি পিছমোড়া।
পেটে গুঁজি এঁটে রাখো পিছনের জোড়া ॥
এলো কর্ণ দুটা তা'র টানিয়া সোহাগে,
দুই চঞ্চু মুড়ি রাখ দুই দিক্ বাগে ॥
মুড়িবে উলটা বাগে বোজা চঞ্চু আগে।
খোলা চঞ্চু তখন মুড়িবে সোজাবাগে ॥
গলে পোরো জিহ্বা দুটি যত্নে ঠাসি ঠুসি,
দিব্য এক বাক্স হ'বে, দেখি হবে খুসি ॥
চূড়ায় আছয়ে বাঁধা কাগজের কাটি।
নীচে দুমড়িয়া চূড়া খিল দেও আঁটি ॥
চূড়া ধরি টান দেও খুলি যাবে ডালা।
বন্ধ করি ডালা পুন আঁটি দেও তালা ॥
বলিবে আনন্দে মাতি "এ কি অপরূপ!
যেমন বাকস—তা'র— তেমনি কুলুপ!"
ভিতর বাহির আর চৌদিক্ পরখি,
বলিবে "ক্যাবাত! এ যে অপূর্ব্ব নিরখি!"
ভার হবে সে-তোমায় সামলিয়া রাখা।
বাক্স পেয়ে পে'লে যেন লাখ্‌শখানি টাকা॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাযজ্ঞ।

২৮ শে ডিসেম্বর—শুক্রবার।

আজি লোথার ক্যাসলে উৎসাহের সীমা নাই—রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই শত শত প্রতিনিধি নানাস্থানে মিলিত হইয়া পূর্ব্বদিনের অমীমাংসিত বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা করিতেছেন। নর্টন্ অথবা য়্যাডাম্‌স্ কোন পক্ষের প্রস্তাব সুসঙ্গত এবং কাহার পরাজয়ের সম্ভাবনা এই বিষয়ের বাদানুবাদে আজি শত শত লোক নিবিষ্টচিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন। আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অনেকে বিশেষ যত্নের সহিত স্বদল পরিপুষ্ট করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আজি প্রাতঃকালে ৮টার সময় সুবৃহৎ চন্দ্রাতাপের নিম্নে বিস্তৃত গালিচার উপরে সমাজ সংস্কার বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। পুনানগরীর সুবিখ্যাত রাণাডে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা, বেহার, বাঙ্গালা ও পঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ সমাজ ঘটিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় একমনে যোগ-

দান করিয়াছিলেন। ১১টার সময় মহাযজ্ঞের দ্বিতীয় আহুতি আরম্ভ হইবে—১০½টার পর হইতে যজ্ঞ-মন্দির জনতায় পূর্ণ হইতে লাগিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে উহার প্রত্যেক স্থান পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রায় দেড় সহস্র প্রতিনিধি ও ছয় সহস্র দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যথা সময়ে সভাপতি এবং অন্যান্য প্রধান নেতাগণ সমবেত হইলেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে জানাইলেন যে ভারতবন্ধু জন্ ব্রাইট রোগ-শয্যায় শায়িত; তাঁহার রোগ-যাতনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই মহা সমিতি হইতে তাঁহার পুত্রের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে তিনি সমবেত প্রতিনিধি বর্গের অভিপ্রায় জানিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, সভাস্থ সকলেই একান্ত আগ্রহ সহকারে উক্ত প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ জন ব্রাইটের পুত্রের নিকট সহানুভূতি প্রকাশক বৈদ্যুতিক বার্ত্তা প্রেরিত হইল।

তদনন্তর পূর্ব্বদিনের পরিত্যক্ত পব্লিক সার্ভিশ কমিসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের পুনরালোচনা আরম্ভ হইল। পবলিক সার্ভিশ কমিসনের সভ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুদ্‌লিয়ার এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন যে পবলিক সার্ভিশ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আজিও কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই—কমিসনরগণের রিপোর্ট এখনও পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারির বিবেচনাধীন রহিয়াছে, অতএব নর্টন সাহেবের প্রস্তাব এক বৎসরের জন্য স্থগিত হউক। শ্রীযুক্ত ত্রিম্বক্ টেলাং উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। এই সময় বঙ্গের সুদক্ষ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ দণ্ডায়মান হইয়া তৃতীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপক্রমণিকা করিলেন যে তিনি প্রস্তাবিত বিষয়—যাহা লইয়া এত বাদানুবাদ হইতেছে—পঁচিশ বৎসরকাল বিশেষ চিন্তার সহিত আলোচনা পূর্ব্বক কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে তদ্বিষয়ক কোন প্রস্তাব না করিয়া সর্ব্বসাধারণের অনুমোদন ও সন্তোষার্থে একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—উহা কোন পক্ষের অপ্রীতিকর হইবে না। তাঁহার বিবেচনায় প্রস্তাবিত বিষয় এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা উচিত-নহে—উহাতে অভিপ্রেত সিদ্ধির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। তৎপরে তিনি নিম্ন লিখিত সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"পবলিক সার্ভিশ কমিসন তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতবাসীগণের জন্য যে সকল অধিকার দানের প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসমস্ত সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক জাতীয় সমিতি ইহা সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করেন যে যতদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এক সময়ে সিভিল সার্ভিশ সম্বন্ধীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণের উদার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন এদেশীয় অধিবাসীগণের প্রতি পূর্ণমাত্রায় ন্যায়ানুরাগ প্রদর্শিত হইবে না।" বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নারায়ণ গণেশ চন্দ্রবরকার উক্ত প্রস্তাবের

অনুমোদন করিলেন। উক্ত প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত হইলে শ্রীযুক্ত নর্টন, য়্যাডাম্‌স্‌ ও মুদলিয়ার মহাশয়গণ স্বস্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। মনোমোহন বাবুর প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে সভাস্থ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।—বিচার বিভাগ হইতে শাসন-বিভাগ পৃথক করণ এবং উভয় বিভাগে পৃথক্‌ পৃথক কর্ম্মচারী নিয়োগ। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জে, ই, হাউয়ার্ড সাহেব তেজস্বিনী বক্তৃতায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তিনি বিবিধ ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বক প্রমাণ করিলেন যে বিচার ও শাসন-কার্য্য এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকাতে দেশের কি ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। ১৮৫৮ খৃঃঅব্দে যৎকালে এলাহাবাদ নগরে মহারাণীর ঘোষণা পত্র পঠিত হইয়াছিল, তৎকালে তিনি তাহা স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকাল হইতে ত্রিশবৎসর কাল এলাহাবাদে থাকিয়া তিনি তৎ-প্রদেশের বহুবিধ পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে উক্ত প্রথা প্রচলিত থাকাতে এদেশের ঘোরতর অপকার হইতেছে। উহা হইতে অনেক সময় যে কি কুৎসিৎ বিচার-বিভ্রাট ও ঘৃণিত শাসন-কলঙ্ক সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তিনি বিশদরূপে উল্লেখ করিলেন। উপসংহারে তিনি একান্ত উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন যে নৈতিক বলের জয় হইবেই হইবে। হতাশ্বাস হইবার প্রয়োজন নাই—ন্যায় পথ অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই অভিলষিত ফললাভ হইবে। শত্রুর দোষান্বেষণে আবশ্যকতা নাই, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশে কোন ফল নাই—ধীরভাবে, অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। উদ্ধতভাব ও গোলমালে জগতের কোন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না—স্থিরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নৈতিক বলের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলে জয়লাভ অবশ্যই অনিবার্য্য হইবে। যে নৈতিক বল জগতে ইংরাজজাতির এত গৌরব বিস্তার করিয়াছে—যাহার প্রভাবে ইংলণ্ড দেশ-দেশান্তরে সুদূর-বিস্তৃত রাজ্য ভোগে সমর্থ হইয়াছে—আজি ইংলণ্ডের গৌরবের তুলনা কোথায় ?—যথার্থই কথিত হইয়াছে যে ইংলণ্ডের রাজ্যে সূর্য্য কখনই অস্তগামী হয় না। যে নৈতিক বল হইতে ইংলণ্ডের এত ঐশ্বর্য্য আমরাও তৎপ্রতি আস্থা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিলে আমাদেরও নৈতিক স্বাধীনতা জয়যুক্ত হইবে। তাঁহার গভীর ভাব ও তেজপূর্ণ বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তৎ-পরে সিন্ধুর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ক্ষেমচাঁদ উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং তত্রত্য দেশরাও বিনায়ক, ভাগলপুরের প্রতিনিধি তারিণী প্রসাদ এবং লুধিয়ানার প্রতিনিধি মুন্সি সরিফ উদ্দীন ক্রমান্বয়ে উহার অনুমোদন করিলেন। অনন্তর উহা সর্ব্ববাদী সম্মত-রূপে পরিগৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব।—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জুরির বিচার প্রবর্ত্তন এবং ওয়ারেণ্ট আসা-

মীর মুকর্দ্দামা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সোপর্দ্দকরার পরিবর্ত্তে একবারেই সেশন্ আদালতে উপস্থিত করুণ।

বঙ্গের সুমধুর বক্তা, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। ফৌজদারী মকর্দ্দামা অতি কঠোর এবং জুরির বিচার প্রচলিত হইলে আসামীর পক্ষে কোন রূপ অবিচার প্রদর্শিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাঁহার অকাট্য যুক্তি সমর্থন পূর্ব্বক বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব চিফ্‌জষ্টিশ্ সার রিচার্ড গার্থ সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে জষ্টিশ্ গার্থ বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগ পৃথক করণের জন্য এদেশের আদালত সমূহে জুরির বিচার প্রথা প্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রবরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করিবার পর হুসিয়ারপুরের প্রতিনিধি সেখ ওমরবক্স মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শুভরাও এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি মৌলবী আবদুল জলিল্ ও রাজা রামপাল সিংহ এক একে উহার অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। ভারতবাসীগণের সাধারণতঃ এই বিশ্বাস যে এদেশের পুলিশ বিভাগের কার্য্য একান্ত অসন্তোষ জনক এবং অত্যাচার পূর্ণ; গভর্ণমেণ্টের নিকট সকলের বিনীত প্রার্থনা এই যে কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া একটি কমিশন নিয়োগ পূর্ব্বক উক্ত বিভাগের সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে তদন্ত করুন।

লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি মুন্সি সজ্জত হোসেন উর্দ্দু ভাষায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সুস্পষ্টরূপে পুলিশ বিভাগের বিবিধ অপকার্য্য ও অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করিলেন। জাতীয় সমিতির বিপক্ষ দলের দুর্গতির বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন, এবং যাহাতে সত্বর পুলিশ বিভাগ সংশোধিত হয়, তজ্জন্য বিনীত ভাবে গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি সেখ রেজাহোসেন উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলে বিরার নগরের মধলকার ও মজঃফর পুরের সুদক্ষ উকিল শ্রীযুক্ত প্রিঙ্গিল্ কেনিডি একে একে উহার অনুমোদন করিলেন। কেনিডি সাহেব বলিলেন, "পুলিশ কর্ম্মচারী সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত—পৃথিবীতে আর কাহারও তাহার ন্যায় স্থিতি স্থাপক মুখ নাই—সে ক্ষুদ্র ছুঁচ হইতে বৃহৎ নঙ্গর পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষ অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতে পারে—সে এক পয়সাও পরিত্যাগ করে না এবং এক সহস্র মুদ্রাতেও তাহার তৃপ্তি নাই। অনন্তর তিনি দূষিত পুলিশ বিভাগের বিস্তর অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক উক্ত বিভাগ সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন। তদনন্তর পঞ্জাবের প্রতিনিধি লালা যশিরাম উর্দ্দু ভাষায়, সিন্ধুর প্রতিনিধি হরচাঁদ রায় বিষ্ণুদাস ইংরাজীতে,

লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি হেদায়ৎ রসুল উর্দ্দুতে, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি পার্থ সারথি নেইডু তেলিগু এবং আলিপুরের উকিল বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ক্রমান্বয়ে এক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উক্ত বিভাগের বিস্তর দুষ্কার্য্য ও অত্যাচার-কাহিনী প্রচার পূর্ব্বক প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব ঃ—ভারতবাসীগণের সামরিক বিদ্যা শিক্ষা লাভের জন্য ভারতে সৈনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন, সুযোগ্য ভারতবাসীগণকে বিপদের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা ও গভর্ণমেণ্টের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ভলণ্টিয়ার সৈন্য রূপে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার অধিকার দান ও ব্যবস্থা প্রনয়ণ এবং বর্ত্তমান অস্ত্র আইনের কঠোরতা নিবারণ।

রোহিল খণ্ডের প্রতিনিধি মির ওয়াহেদ আলি উর্দ্দু ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিবার পর সুবিখ্যাত আলি মহম্মদ ভীমজী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন* করিলেন। তিনি ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সৈন্য সংখ্যা ও সেনা বিভাগীয় বার্ষিক ব্যয় তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইলেন যে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ৯,০০,০০০ সৈন্যের প্রত্যেকের জন্য মোট ১৮৫, জর্ম্মণির ১১,০০,০০০ সৈন্যের প্রত্যেকের জন্য মোট ১৪৫, ইংলণ্ডের ৫,০০,০০০ সৈন্যের প্রত্যেকের জন্য মোট ২৭৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু দরিদ্র ভারতের সৈন্য সমষ্টির প্রত্যেকের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭৫ টাকা ব্যয় হয়। অনন্তর তিনি ভারতবাসীগণের সেনা বিভাগে অধিকার লাভের উপযোগিতা ও শুভফলের বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিলেন। তিনি অস্ত্র আইনের কলঙ্ক ও কঠোরতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি যে হয় ত তাঁহার নিজের চাকর সেও অবাধে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে, আর তিনি যতই সম্ভ্রান্ত লোক হউন না কেন, দেশীয় লোক বলিয়া তিনি সেরূপ স্বাধীনতা লাভে বঞ্চিত। এই শোচনীয় বৈষম্য যাহাতে সত্বর দূরীকৃত হয় তজ্জন্য তিনি বিনীত-ভাবে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর যশোহরের উকিল বাবু যদুনাথ মজুমদার একটি সংশোধন প্রস্তাব করিতে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় এই ছিল যে অস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম থাকা উচিত, এবং যে কোন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি যেন উক্ত অধিকার নির্ভর না করে, কিন্তু বাগাড়ম্বর পূর্ণ গৌর চন্দ্রিকা করিতেই তাঁহার সময় কাটিয়া গেল। এদিকে সভাস্থ সকলেই তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় উল্লেখ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগি-লেন, তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া কথিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ পূর্ব্বক সকলের বিশেষ বিরক্তি ভাজন হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দানে সভাস্থ সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিবার লোকা-ভাবে উহা আর গৃহীত হইল না। এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজ দোষে সকলের

উপহাসাস্পদ হইলেন, এই ক্লেশকর দৃশ্য দর্শনে আমাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল।

পি, কেনিডি সাহেব অস্ত্র আইন সম্বন্ধীয় বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় যাহার তাহার হস্তে অস্ত্র ব্যবহারের স্বাধীনতা দান করিলে অনেক অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইবে। তাঁহার মতানুসারে অস্ত্র আইন সম্বন্ধে কোন জাতি-গত প্রভেদ থাকা উচিত নয়—ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় ভারত প্রবাসী সকলকেই এদেশীয় লোকদিগের ন্যায় বিনা অনুমতি পত্র গ্রহণে অস্ত্র ব্যবহার করিতে ক্ষমতা দান করা উচিত নহে। শ্রীযুক্ত ত্রিম্বক্ টেলাং কেনিডি সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, কিন্তু ফেরোজসা মেটা উহার প্রতিবাদ করিলেন— তাঁহার বিবেচনায় অস্ত্র আইন সমস্ত ভারতবাসীকে কাপুরুষ ও মনুষ্যত্ব বিহীন করিয়াছে—উহার কঠোরতা নিবারিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্যাপ্টেন্ হিয়ার্সে সাহেব কেনিডি সাহেবের মত সমর্থন করিলেন এবং কি ইয়ুরোপীয়, কি দেশীয় সকলকেই সমানভাবে অস্ত্র আইনের বশীভূত রাখিতে প্রস্তাব করিলেন। এইরূপ মতভেদ উপলক্ষে সভাস্থলে ঘোরতর বাদানুবাদ হইবার উপক্রম দৃষ্টে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র আইনের বর্ত্তমান কঠোরতা ও উহার প্রভাব নিবন্ধন দেশের বহুবিধ অমঙ্গলের বিষয় উল্লেখ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে ভারতের সর্ব্বত্রই গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছে—সুশিক্ষা ও সুনীতির প্রভাবে কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবল রাজ-ভক্তির তরঙ্গ উঠিতেছে। বর্ত্তমান শান্তির সময় ও সিপাহী বিদ্রোহ সময়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ——এখন এই শিক্ষিত, রাজভক্ত ভারতবাসীগণের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের প্রতি অস্ত্র আইনের ন্যায় কঠোর আইন সকল প্রচলিত রাখা সুসভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত অযশস্কর, অতএব উক্ত কুৎসিৎ আইন সত্বর সংশোধিত হওয়া উচিত।

তৎপরে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামবিজয় সিংহ বাহাদুর ও রাজা রামপাল সিংহ উক্ত প্রস্তাব-সম্বন্ধে কেনিডি সাহেবের মতের পোষকতা করিলেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও অধিক বাদানুবাদ চলিত, কিন্তু অনেকের ইচ্ছানুসারে সভাপতি মহাশয় সমবেত প্রতিনিধি বর্গের মত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিক সংখ্যক প্রতিনিধির মতানুসারে মূল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। যাঁহাদের জয়লাভ হইল তাঁহারা উল্লাসে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম প্রস্তাব ঃ—আবকারি ও এক্ সাইস্ বিভাগের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে, সুরামত্ততা নিবারণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সাধু ইচ্ছা থাকিলেও, মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান নিবন্ধন দিন দিন দেশের যে মহা দুর্গতি উপস্থিত হইতেছে তৎ নিবারণের উপায় বিধান।

বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ডি, ই, ওয়াচা বিশেষ দক্ষতার সহিত এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় এই প্রস্তাব সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় বিধ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ। মদ্যপান নিবারণে কোটি কোটি নর নারীর দুর্গতি দমন উদ্দেশে মহাত্মা স্যামুয়েল্ স্মিথ্, ধর্ম্মাত্মা ইভান্স এবং মহাসমিতির নিমন্ত্রিত বৃটিশ পার্লেমেণ্টের সভ্য, সহৃদয় কেন্—যিনি তৎকালে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যে কি মহা সমরের আয়োজন করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন। সদাশয় কেনের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র বিরাট মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে তিনবার তাঁহার জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। উপসংহারে প্রস্তাব কর্ত্তা বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ্য কমিসন্ নিয়োগ দ্বারা সুরাপানের প্রাদুর্ভাব দমনে কোটি কোটি নর নারীর অনন্ত দুর্গতি নিবারণে সত্বর সযত্ন হউন।

পঞ্জাবের দেবধর্ম্মী পণ্ডিত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী তেজস্বিনী বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সভাপতি মুদ্লিয়ার উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনি স্বয়ং দশ বৎসর কাল আবকারী কনট্র্যাক্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুরাপানে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা তিনি এই দশ বৎসরের বিবিধ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া ঘৃণার সহিত উক্ত লাভজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কলিকাতাস্থ ভারত সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর, ডি, মেটা উক্ত প্রস্তাব সংশোধনার্থে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মদ্যপান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা সম্পূর্ণ সত্য; উহা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই হিতকর, কিন্তু ভারতবাসীগণের স্বাস্থ্য পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে সুরাপানের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন একথা স্পষ্ট রূপে বলাই ভাল। এবিষয়ের জন্য আবার তদন্তের প্রয়োজন কি? তদারকের ফল এই হইবে যে এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির মীমাংসা শীঘ্র ঘটিবে না। অতএব বর্ত্তমান প্রস্তাবটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হউক,—"ভারতবর্ষে আবকারী ও এক্সাইস্ বিভাগের আধিপত্যে সুরাপান দিন দিন ভীষণরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে; এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে এই দুই বিভাগে অচিরে এরূপ সংশোধিত ও সমুন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হউক যদ্দ্বারা সুরা-মত্ততার হ্রাস হইবে।"

মূল প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত ওয়াচিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে শ্রীযুক্ত মেটার সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হউক। অনন্তর মর্ণিং পোষ্টের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এফ্, টি, য়্যাট্‌কিন্স সাহেব ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে উহাই সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব :—বার্ষিক যাহাদের এক সহস্র টাকার অধিক আয় নহে, তাহাদের নিকট হইতে যেন ইন্‌কম্ ট্যাক্স গৃহীত না হয়। এলাহাবাদের পণ্ডিত মদনমোহন

মালবীয় বিবিধ সংযুক্তি সহকারে উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় বর্ত্তমান প্রস্তাবটি প্রকৃত পক্ষে ভারতের দরিদ্র সন্তানগণের প্রস্তাব—মহাসমিতির প্রতিনিধিগণ দরিদ্রকে এই কষ্টদায়ক করের অত্যাচার মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন—উহাতে তাঁহাদের অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। শ্রীযুক্ত টি, পি, ক্রাউলি সাহেব একান্ত আমোদজনক ও হাস্য উদ্দীপক বক্তৃতা সহকারে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অনন্তর মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ আয়ার, বহরমপুরের উকিল বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং মধ্য ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ রাও গোবিন্দ দেশ পাণ্ডে ক্রমান্বয়ে উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে সন্ধ্যা সমাগমে সে দিনের জন্য সভার কার্য্য শেষ হইল।

৩য় প্রস্তাব—আহুতি।

২৯ শে ডিসেম্বর :—আজি জন্মভূমির পূজার শেষ দিন। পূর্ব্ব দুই দিনের আহুতি অবাধে সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, আজিকার আহুতিও যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয় তদ্বিষয়ের চিন্তায় আজি সহস্র সহস্র ভক্ত সন্তানের হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে ১০ ঘটিকার পর যজ্ঞগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অমনি সহস্র সহস্র দর্শক ও প্রতিনিধি যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইয়া স্বস্ব স্থানে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। আজিকার সমবেত লোক সংখ্যা পূর্ব্ব দুই দিনের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। আর ৬।৭ ঘণ্টা পরেই মহা যজ্ঞের অবসান হইবে এই ভাবিয়াই বোধ হয় সকলেই প্রফুল্ল মুখ মণ্ডলে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—সকলেই নীরবে আগ্রহ সহকারে জননীর শেষ পূজার সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১১টা বাজিবা মাত্র পুনরায় মহাযজ্ঞের কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্ব প্রথমে সভাপতি সকলকে জানাইলেন, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ইচল করাঞ্জীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বাপুদেব আপ্তে স্বদেশে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি উহা জাতীয় মহা সমিতির নামে উৎসর্গ পূর্ব্বক উহার নেতাগণের হস্তে উহার ভারার্পণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত গৃহ এরূপ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে যেখানে জাতীয় সমিতির কোন অধিবেশনের সম্ভাবনা নাই; তথাপি এরূপ নিঃস্বার্থ দান নিঃসন্দেহ প্রশংসার বিষয়। অনন্তর উক্ত দান গৃহীত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে তিনি সকলের অভিমত জানিতে চাহিলেন। সভাস্থ সকলে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন যে তিনি ভারতের নানাস্থান হইতে এই মঙ্গলময় মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর আনন্দ ও সহানুভূতিপূর্ণ বিস্তর টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু সময়ের অল্পতা এবং কার্য্যাধিক্য বশতঃ তৎসমুদায় পঠিত হইল না।

তৎপরে তিনি প্রকাশ করিলেন যে অনেকে মহাসমিতিতে আলোচনার জন্য বিবিধ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রস্তাব কর্ত্তাগণকে দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে বর্ত্তমান বর্ষে তৎসমুদায়ের মধ্যে একটিও আলোচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্তর তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত জন য়্যাডাম্ নবম প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

নবম প্রস্তাব ঃ—জাতীয় মহাসমিতির বিবেচনায় ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান এবং উচ্চ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার বহুল বিস্তার সাধন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সংপ্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ পূর্ব্বক দেশীয় লোকের হস্তে শিক্ষা দানের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং দায়িত্ব-মুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এদেশের উন্নতি সাধন যদি প্রকৃত প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু ব্যয় হ্রাস ও শিক্ষা বিভাগের ব্যয় আবশ্যকতানুসারে বৃদ্ধি করা উচিত। যদি তাহা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হয় তবে অন্ততঃ শেষোক্ত বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয়ের পরিমাণ কোন ক্রমেই হ্রাস করা এবং দেশীয় লোকের হস্তে শিক্ষা ভার নিক্ষেপ পূর্ব্বক দায় মুক্ত হওয়া শিক্ষিত ও সুসভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত অনুচিত।

তিনি সার গর্ভ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা পূর্ব্বক বলিলেন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের উচ্চ শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা আছে, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের তাড়নে কার্য্যতঃ কোন রূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। উপযুক্ত সাহায্যাভাবে স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কলেজগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। পাঠশালা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাভার মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল্ বোর্ডের উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক গভর্ণমেণ্ট দায়িত্ব মুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছেন। গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা ভিন্ন এই সকল মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল্‌বোর্ড বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত গুরুভার সম্পূর্ণ রূপে বহন করিতে অসমর্থ। উচ্চশিক্ষা হইতেই সকল দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা হইতেই ভারত সন্তানের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার প্রভাবে ভারতের সুষুপ্ত স্বাধীনতা-প্রিয়তা জাগরিত হইয়া উহার উপাসকগণের হৃদয়ে নব অভ্যুদয়ের আশা সঞ্চারিত করিয়াছে। এই সর্ব্ব মঙ্গলময় সুশিক্ষার প্রতি কাহারও অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রিম্বক টেলাং উল্লিখিত প্রস্তাব সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন তিনি যদিও প্রথম প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন যে বর্ত্তমান প্রস্তাবটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়—উচ্চ শিক্ষার প্রভাব ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য কথনই সুচারুরূপে

হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার বহুল বিস্তার ও তৎ প্রতি উৎসাহদানে বিমুখ হওয়া সুসভ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়। ইয়ুরোপের প্রত্যেক সুসভ্যদেশে বিশেষতঃ জর্ম্মনিতে তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট সমগ্রদেশ মধ্যে নিয়মিত রূপে সর্ব্ব প্রকার প্রচলিত শিক্ষাদানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাবর্গের হিত সাধন করিয়া থাকেন। এদেশের গভর্ণমেণ্ট সংপ্রতি শিক্ষাবিভাগের ব্যয় হ্রাস ও স্বয়ং দায়িত্ব-মুক্ত হইবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে। এদেশীয় গভর্ণমেণ্ট যদি ইংলণ্ডের শিক্ষাদান প্রণালীকে আদর্শ জ্ঞানে তথায় উহার প্রভাবে কিরূপ সুফল জন্মিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এদেশের শিক্ষা-বিভাগ সম্বন্ধীয় দূষিত নীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুব্রাহ্মণ্য আয়ার মথুরার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বসু (?) পঞ্জাবের প্রতিনিধি পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ এবং মথুরার প্রতিনিধি পণ্ডিত রাধাচরণ গোস্বামী ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে উহার অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে জানাইলেন, "আজি মহাত্মা গ্ল্যাড্ষ্টোনের জন্মদিন—তিনি আজি অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন।" ক্ষণজন্মা গ্ল্যাড্ষ্টোনের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র যজ্ঞ-গৃহ সহস্র সহস্র লোকের আনন্দ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর তিনি প্রস্তাব করিলেন, স্বাধীনতার প্রিয় উপাসক, বিপন্নের বন্ধু, মহাত্মা গ্ল্যাড্ষ্টোনের জন্মদিন উপলক্ষে মহাসমিতির আনন্দের বার্ত্তা বৈদ্যুতিক তারযোগে তাঁহার নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাবে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ ও দর্শকগণ গভীর আনন্দে প্রাণখুলিয়া মুহুর্মুহুঃ তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জাতীয় মহাসমিতির এই অতুল আনন্দবার্ত্তা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে প্রেরিত হইল।

দশম প্রস্তাব:—ভাগলপুরের জমিদার রায় তেজনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ভারতের অর্থাভাব বিমোচন ও শিল্প শিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন;—ভারতবাসীগণের হিতের জন্য দেশীয় শ্রমজাত দ্রব্যের উন্নতি বিষয়ে উৎসাহ দান এবং সাধারণতঃ শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন জন্য ভারতগভর্ণমেণ্ট সত্বর সুযোগ্য কমিসন নিয়োগ পূর্ব্বক দেশের শ্রমজীবীগণের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়মিতরূপে তদন্ত করুন।

তিনি বলিলেন, তাঁহার বিবেচনায় এই প্রস্তাবটি অন্য সকল প্রস্তাব অপেক্ষা বিশেষ গুরুতর—ইহাতে এদেশের ধনী ও নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষ মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। তৎপরে তিনি সভাপতির অনুমতি অনুসারে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ শিল্প শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু সংক্ষেপে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

অনন্তর শ্রীহট্টের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল একটি সংশোধন প্রস্তাবের অবতারণ করিলেন। তিনি ভারতবাসীগণের দরিদ্রতার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র শ্রমজীবী ভারতবাসীগণের অর্থ সংস্থানের জন্য তাহাদিগকে বিদেশে অথবা দেশের জন শূন্য স্থানে প্রেরণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে শুভদায়ক হইবে না। দরিদ্র কুলিগণের প্রতি সর্ব্বক্ষণ যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়া থাকে অগ্রে তাহার প্রতিবিধান না করিয়া দারিদ্র-দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে অসহায় লোকদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা অনাবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট বিগত ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে স্থানান্তরে লোকচালান (Emigration) সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তিনি তাহার সমালোচনা পূর্ব্বক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে দশম প্রস্তাবে শ্রমজীবীগণের অবস্থা তদন্তের জন্য যে কমিশন নিয়োগের কথা আছে তাহাতে হতভাগ্য কুলিদিগের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আর একটি প্রার্থনা সংযুক্ত হউক।

সুপ্রসিদ্ধ আলি মহম্মদ ভীমজী উক্ত সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বিপিন বাবুর প্রস্তাব সৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেও উহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত সংযোজিত হইতে পারে না। দুইটি পৃথক অসংলগ্ন বিষয় এক প্রস্তাবে পরিণত হইলে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে সভাস্থলে ঘোরতর মতভেদ ও প্রতিবাদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত য়্যাডাম্ উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ পূর্ব্বক বিপিন বাবুর ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রস্তাব-কমিটি হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে লোকচালানের (Emigration) বিষয় সমিতিতে আলোচিত হইবে না; একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সহিত অপর একটি অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সংযোগ নিয়ম-বহির্ভূত। উহা একটি পৃথক প্রস্তাব রূপে আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? অনেকেই তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন। তৎপরে বিপিন বাবু তাঁহার বন্ধুগণের পরামর্শে স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, টি, য়্যাট্‌কিন্স আর একটি সংশোধন-প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগে ও প্রদেশে দুই একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক; উহা হইতে দেশের দরিদ্রতা নিবারিত ও ধন বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত হাউয়ার্ড্ সাহেব জর্ম্মাণ জাতির শিল্প শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও উহার প্রভাবে জর্ম্মনির বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য এবং ভারতেশ্বরীর পরলোকগত স্বামীর স্বীয় পুত্র কন্যাগণের মধ্যে উক্ত শিক্ষা প্রচলনের আস্থা ও অনুরাগের বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক য়্যাট্‌কিন্স সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা এই প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য বলিলেন যে দেশ মধ্যে

শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপনের বিষয় ইতি পূর্ব্বে নবম প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। দশম প্রস্তাবে উহার পুনরালোচনা একান্ত অনাবশ্যক।

তৎপরে লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় মূল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অনেক অংশে দার্শনিক ভাবপূর্ণ এবং উহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, জাতীয় সমিতির বিপক্ষগণ এই বলিয়া উহার প্রতি দোষারোপ করেন যে উহাতে সমাজ ঘটিত প্রস্তাব আলোচিত হয় না, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় বর্ত্তমান প্রস্তাব নিশ্চয়ই সমাজ সম্বন্ধীয়—শিল্প শিক্ষার মধ্যে সমাজ-সংস্কার অথবা ঘোরতর সামাজিক পরিবর্ত্তনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতে পরিশ্রমের মহত্ব বিস্তৃত হইবে, এবং এক্ষণে যে সকল শ্রমজীবীলোক ভদ্র সমাজে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার সহিত দৃষ্ট হইতেছে, পরে তাহাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হইবে, এবং সমাজ হইতে অসার পদ-গর্ব্ব ও বৃথা অহঙ্কার বিলুপ্ত হইবে। উহা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবে। এতদ্ভিন্ন উহার প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের মহান্ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। তিনি উপবিষ্ট হইলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

একাদশ প্রস্তাব ঃ—জাতীয় সমিতির বিবেচনায় মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার অধিকাংশ স্থানে এবং পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন স্থানে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূমির সরকারী রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধনের উপযুক্ত সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দান একান্ত প্রার্থনীয়।

পুণা সার্ব্বজনিক সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরেশ্বর ভিড়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। বয়োধর্ম্মে তাঁহার মস্তকের কেশ শুভ্র বর্ণ এবং শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে; এই বৃদ্ধ বয়সে লোকে সংসার হইতে বিদায় লইয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যান ও আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ উৎসর্গ করিয়া থাকে। পবিত্র জন্মভূমির এমনই আকর্ষণী শক্তি যে এই পরিণত বয়সেও তাঁহার তেজ ও উৎসাহের বিরাম নাই—এখনও তিনি জন্মভূমির সেবা ও স্বদেশবাসীগণের প্রিয়কার্য্য সাধনে শরীর পাত করিতে কৃতসঙ্কল্প! শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার সংশোধন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত ভীমজী ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিনিধির প্রতিবাদে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

দ্বাদশ প্রস্তাবঃ—প্রস্তাবিত বিষয় গুলি গভর্ণর জেনারল ও ভারত-সচিবের সদ্বিবেচনার জন্য প্রেরিত হউক, এবং বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করা হউক যে উহাদের মধ্যে

অধিকাংশ প্রস্তাব ভারত-সাম্রাজ্ঞীর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের চিরস্মরণীয় মহা ঘোষণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সকল প্রস্তাব এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করা হউক। প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পার্লামেণ্ট মহা সভা হইতে একটি অনুসন্ধান—কমিটি সংগঠন পূর্ব্বক সত্বর উহার প্রকৃত অনুসন্ধান গ্রহণ করা হউক।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, জাতীয় মহা সমিতির সুদক্ষনেতা, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি সহস্র কণ্ঠ হইতে গভীর আনন্দ-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীর ভাবে জ্বলন্ত উদ্দীপনার সহিত বলিতে লাগিলেন;—

বৃটেনিয়ার রাজনীতি-জ্ঞান প্রভাবে এদেশে যে অত্যাশ্চর্য্য, অনুপম ও অদ্বিতীয় প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে তাহার শোভা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদন জন্য যে সকল প্রস্তর রাশি আবশ্যক হইবে, আমরা একাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড কর্ত্তন করিতেছি। এক্ষণে ইহা আবশ্যক যে আমরা সেই অতুল প্রাসাদের প্রধান তত্ত্বাবধারককে এবং তাঁহার লণ্ডনস্থ উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট এই সকল প্রস্তর লইয়া যাইব, তাঁহারা উহাদের গুণ ও উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অতএব আমি আপনাদিগের অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য উপস্থিত করিতেছি। এই বলিয়া তিনি উল্লিখিত দ্বাদশ প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং উহার পোষকতার জন্য সংক্ষেপে অনেকগুলি সৎযুক্তি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সার গর্ভ বক্তৃতার শেষভাগে এই বলিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন,—"প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ, আপনাদের প্রার্থনা যদি প্রথমবারে, দ্বিতীয়বারে, কিম্বা তৃতীয়বারে, অথবা ততোধিক সময়ে অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলেও আপনারা ভগ্নোৎসাহ বা হতাশ হইবেন না। পুনঃ পুনঃ বিফল-মনোরথ হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হইবেন না। ন্যায় পথ অবলম্বনে অবিরাম যথাবিধি আন্দোলনে নিযুক্ত থাকিবেন। যে ন্যায়বান গভর্ণমেণ্ট এদেশের সুখশান্তি বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মতঃ দায়ী তাঁহাকে ইহা কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিতে বিধিমতে চেষ্টা করিবেন যে আপনারা যাহা চাহিতেছেন আপনারা তাহা পাইবার সর্ব্বথা উপযোগী। মনে রাখিবেন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ জাতি—যাঁহাদের মধ্যে আমি ভারত-প্রবাসী ইংরেজগণকেও গণ্য করি—তাঁহারা সকলেই সদাশয় ও ন্যায়ানুরাগী; মনে রাখিবেন, যদি আপনারা একবার তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে আপনারা যাহা পাইবার আশা করিতেছেন তাহা নিশ্চয় ন্যায়ানুমোদিত ও সুবিচার সঙ্গত তাহা হইলে অচিরে অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন জন্য সকলে অবিচলিত অধ্যবসায় ও অনুপম উৎসাহ সহকারে সর্ব্বক্ষণ যত্নবান

চনা ও অমিতাচাররূপ ঘোর বিঘ্ন-সঙ্কুল সঙ্কীর্ণ জল-প্রদেশ হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে গমন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সমবেত আকর্ষণে বহিত্র বাহিয়া এই অপূর্ব্ব রাজনৈতিক মহাতরণীকে বিজয় পুলিনে লইয়া যাউন। বোধ হইল বক্তার এই কথাগুলি সকলের হৃদয়ের প্রত্যেক শিরায় উপশিরায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া মহা সমিতির মাননীয় নেতাকে আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়ের প্রীতি উপহার দান করিলেন।

অনন্তর এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর নাথ উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন এবং নবাব জাফর আলি খাঁ ও শ্রীযুক্ত কারন্দিকার (? উহার অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব;—ভারতবর্ষে ঘৃণিত ব্যভিচার বৃত্তির প্রশ্রয়দায়ক দূষিত আইন ও বিধান গুলি বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের সহৃদয় নর নারীগণ যেরূপ অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন জাতীয় মহাসমিতি তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক, এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যে সহানুভূতি ও সহায়তা দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

ক্যাপ্টেন্ বেনন্ তেজের সহিত এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তিনি এই প্রস্তাবের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, মহাসমিতির বিপক্ষগণ এই বলিয়া আমাদের নিন্দা করেন যে আমরা সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের আলোচনা করি না, কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে আমরা সমাজ-ঘটিত বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনায় উদাসীন নহি। বর্ত্তমানে যদিও আমরা প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন করিতে পারি না তথাপি আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনা না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। এই বিষয় উপলক্ষে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোক এ-জন্য বিশেষ উদ্বিগ ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। গভীর প্রতিভাশালী সুবিমল চরিত্র শত শত মনুষ্য ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এই কুৎসিৎ ব্যভিচার প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জনগণের জলন্ত ঘৃণাপূর্ণ নিন্দাবাদের পরেও যদি এক দিনের জন্য এই কলঙ্কিত প্রথা বিদ্যমান থাকিয়া ভারত-শাসনে অপবিত্রতা ও কলঙ্কের কালিমা প্রদান করে তাহা হইলে উহা একান্ত শোচনীয় হইবে—সুসভ্য গবর্ণমেণ্টে দুরপনেয় অপযশ প্রদত্ত হইবে! আমাদের নিন্দাকারীগণের মুখে সর্ব্বদাই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমরা ভারত-ললনাগণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাদিগকে অবনতির অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছি। আমরা অবিমিশ্র ঘৃণার সহিত এই অসার বাক্যের সুতীব্র প্রতিবাদ করিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। প্রত্যেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের আলয়ে

পবিত্রতার আদর্শ ভারত-সিমন্তিনীগণ তাঁহাদের পদের উপযুক্ত সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর ও প্রীতির সহিত সমাদৃত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ সুশিক্ষা দানে তাঁহাদের হৃদয় পরিমার্জ্জিত করিতে না পারিলেও আমরা এক বাক্যে, এক মনে, এক প্রাণে, হৃদয়ের পূর্ণ একাগ্রতার সহিত মুক্তকণ্ঠে ভারতরমণীর শোচনীয় অবনতির প্রশ্রয়দায়ক নিষ্ঠুর, অমানুষিক, কলঙ্কিত পাশব প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর নিন্দাবাদ করিব। কেহ কেহ বলেন এই সকল দূষিত বিধান ভারতবাসী ইয়ুরোপীয় সেনাগণের সাস্থ্য ও শারীরিক উন্নতির জন্য আবশ্যক। আমি দীর্ঘকাল সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছি, আমি উক্ত অসার বাক্যের সম্পূর্ণ রূপে প্রতিবাদ করিতেছি—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে এই সকল জঘণ্য বিধান একান্ত অনাবশ্যক এবং ইয়ুরোপীয় সেনার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

অনন্তর ক্যাপ্টেন্ এ, হিয়ার্শে উক্ত কুৎসিৎ ব্যভিচার-বিধানের ঘোরতর নিন্দাবাদ করিলেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে, ই, হাউয়ার্ড্ উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষে বলিলেন প্রস্তাবিত বিষয়টি নিতান্তই লজ্জাজনক এবং ভদ্র সমাজে উহার বিশেষ আন্দোলন নিঃসন্দেহ সুরুচি-বহির্ভূত। এরূপ কুৎসিৎ প্রথা প্রচলিত থাকিলে সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট দুরপনেয় কলঙ্কে পতিত হইবে। এ স্থলে উহার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আপনারা সকলেই আমার সহিত এক বাক্যে ও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবেন যে আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট অচিরে এই কুৎসিৎ লজ্জাজনক আইন রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলে তাঁহার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইবে। সভাস্থ সকলে এক বাক্যে উহার অনুমোদন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব :—মুসলমান বা হিন্দু প্রতিনিধিগণ এক বাক্যে অথবা প্রায় এক মত অবলম্বন পূর্ব্বক কোন প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা মহা সমিতিতে আলোচিত হইবে না।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ লালু এই প্রস্তাবের অবতারণা পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে গত বৎসর মান্দ্রাজে দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল; ভবিষ্যতে এরূপ বিষয় উপলক্ষে যাহাতে পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষ বা অনৈক্যের কারণ উৎপন্ন না হয় তজ্জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রয়োজন।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বিশেষ উৎসাহ সহকারে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তিনি মুসলমানগণের যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বক যাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের গভীর সদ্ভাব ও সহানুভূতির সুদৃঢ়

করিতে পারেন তদ্বিষয়ে বিস্তর সারগর্ভ কথা বলিলেন। অযোধ্যানাথের উৎসাহ পূর্ণ বক্তৃতার অবসানে সভাস্থলে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর এলাহাবাদের সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী স্বামী আলারাম হিন্দি ভাষায় উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন পূর্ব্বক সকলের বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। তৎপরে মুন্সি নুরুদ্দীন আমেদ উহার অনুমোদন করিলে প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। পরে লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ এবং বেনারসের প্রতিনিধি মুন্সি নসিরুদ্দীন আমেদ হিন্দু ও মুসলমানের সদ্ভাব ও প্রীতি পরিবর্দ্ধন উদ্দেশে এক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় অমীমাংসিত একাদশ প্রস্তাব পুনরালোচনার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখা ভালই হইয়াছে; কিন্তু সভাস্থলে এমন অনেক প্রতিনিধি আছেন যাঁহারা সম্ভবতঃ উক্ত প্রস্তাব সবিশেষ পুনরালোচনার পক্ষপাতী, অতএব তাঁহার একান্ত ইচ্ছা এই যে পরিত্যক্ত প্রস্তাবের একটি সর্ব্ববাদী সম্মত মীমাংসার জন্য উহার পুনরালোচনা হউক।

সভাপতির অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীযুক্ত জে, ই, হাউয়ার্ড্ উক্ত প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ পূর্ব্বক সকলকে উহার গুরুত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে কোন একটি মন্তব্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবটি ধীরভাবে বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচন করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কে,টি, টেলাং এই প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক উহার একটি সংশোধন প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার শুভাশুভ বিবেচনার ভার দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কনগ্রেস্ কমিটির উপর প্রদত্ত হউক, তাঁহারা উহার দোষ গুণের প্রতি স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিলে তদনুসারে উক্ত প্রস্তাব শেষ মীমাংসাহেতু আগামী বর্ষের মহাসমিতিতে পুনরালোচিত হইবে— বর্ত্তমান বর্ষে উহার আলোচনা স্থগিত হউক।

শ্রীযুক্ত হাইয়ার্ড্ উল্লিখিত সুসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন পূর্ব্বক স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। রাজা রামপালসিংহ, সেখ রেজাহোসেন, মুনসি হোসেনবক্স ও নবাব জাফরআলি শেষোক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে উহাই সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে গৃহীত হইল।

পঞ্চদশ প্রস্তাব;—লবণ কর বর্দ্ধিত হওয়ায় দরিদ্র প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট বাড়িয়াছে এজন্য জাতীয়সমিতি প্রকাশ্যভাবে উহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নারায়ণ বিষ্ণু এই প্রস্তাবের অবতারণা পূর্ব্বক দরিদ্র প্রজাগণের কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিলেন। রত্নগিরির উকিল শ্রীযুক্ত এল কটি উহার সমর্থন করিলেন এবং লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি সেখ রেজাহোসেন, বোম্বাইর প্রতিনিধি

মুন্সিহোসেন বক্স সোলাপুরের প্রতিনিধি ডাক্তর নারায়ণ বিষ্ণু, বোম্বাইর প্রতিনিধি গিরিজাশঙ্কর, পঞ্জাবের নারায়ণ সিংহ ও গিরিধারী লাল একে একে উহার অনুমোদন করিলে উহা সকলের সম্মতি অনুসারে গৃহীত হইল।

ষোড়শ প্রস্তাব।—আগামী বর্ষের ২৬শে ডিশেম্বর বোম্বাই প্রেসিডেনসির অন্তর্গত বোম্বাই অথবা পুনানগরে জাতীয় মহা সমিতির পঞ্চম অধিবেশন হইবে।

ভারতবন্ধু, জাতীয় মহা সমিতির শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত হিউম্ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি উত্থিত হইবামাত্র চারিদিক হইতে আনন্দের কোলাহল প্রবাহিত হইতে লাগিল—সমবেত ব্যক্তি মণ্ডলী ভক্তি ও প্রীতির উচ্ছাসে ভরে তাঁহার প্রতি প্রাণগত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তাঁহার পঞ্জাবস্থিত বন্ধুগণের নিতান্ত ইচ্ছা এই যে আগামী বর্ষে পঞ্জাবে মহা সমিতির অধিবেশন হয়। তত্রত্য ৬০ জন প্রতিনিধি তাঁহাদের একাগ্রতার পরিচয় স্বরূপ ইতিমধ্যেই ১৫০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিঘ্ন ও অসুবিধার ভয়ে পঞ্জাবে উহার অধিবেশন না হওয়াই সুসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন। এই বৎসর মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে বহু দূরস্থিত এলাহাবাদ নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইল, আগামী বর্ষে লাহোর নগরে উহার অধিবেশন হইলে ঐ সকল স্থানের প্রতিনিধিগণকে দূরত্ব-জনিত অধিকতর অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইবে। অতএব বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আগামী বর্ষে বোম্বাই অথবা পুনা নগরে উহার অধিবেশন হইবে। পুনা অথবা বোম্বাই কোন স্থান অধিকতর সুবিধাজনক তাহা পরে স্থির হইবে।

ফেরোজসা মেটা উহার সমর্থন পূর্ব্বক বলিলেন যে বোম্বাই নগরে অধিবেশন হইলে তাঁহারা প্রতিনিধিবর্গকে রাজসম্মানের সহিত সাদরে অভ্যর্থনা করিবেন।

পঞ্জাবে মহাসমিতির আগামী অধিবেশন স্থিরীকৃত না হওয়ায় তত্রত্য প্রতিনিধি লাজ পৎ রায় ও অমৃতসরের প্রতিনিধ শ্রীযুক্ত নারায়ণ সিংহ নিতান্ত দুঃখের সহিত উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

সপ্তদশ প্রস্তাব;—মাননীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের অবতারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "আগামী বর্ষের জন্য আমাদের সর্ব্ব সাধারণের মাননীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এবং সুদক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির সাধারণ-কার্য্য সম্পাদক (General Secretary) নিয়োজিত হউন। আপনারা সহৃদয় হিউমকে যেরূপ অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমিও সংক্ষেপে দুই একটী কথায় আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি চারিদিক হইতে কতই আক্রমণ বর্ষিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত তাঁহাকে

আরও কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের সকলের আন্তরিক অচল বিশ্বাস ও অবিচলিত অনুরাগ ও প্রীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সকলে তাঁহার নিকট অসীম ও অনুপম ঋণে আবদ্ধ। তাঁহাকে মহাসমিতির সাধারণ কার্য্য-সম্পাদক স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত আনন্দ চালু ও ত্রিম্বক্ টেলাং আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। সমবেত প্রতিনিধি মণ্ডলী গভীর আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ দণ্ডায়মান হইয়া সুদক্ষ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের প্রস্তাব করিলেন। চারিদিক হইতে গভীর আনন্দের প্রবাহ উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় মহাযজ্ঞ সমাপন ও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। মহাযজ্ঞের উদ্বোধনে তিনি প্রাণ খুলিয়া 'বহুবিধ উদার মতের পরিচয় দান করিয়াছিলেন এক্ষণে উহার অবসানে তিনি কিরূপ অভিমত প্রকাশ করেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয় সহকারে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, অনেকে জাতীয় মহাসমিতিতে কিছু কিছু বলিবার জন্য তাঁহার নিকট অনেকগুলি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা পরিপূরণের কোন সুসঙ্গত কারণ পাইলেন না এজন্য দুঃখের সহিত উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকে মহাসমিতির উপসংহার কালে হিন্দি কবিতা আবৃত্তি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; উহা নিঃসন্দেহ আমোদ জনক, কিন্তু নিয়ম বিরুদ্ধ, এজন্য তিনি তাহাও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনন্তর, মহাসমিতি তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রতিনিধি বর্গকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন যে চতুর্থ মহাসমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়া তিনি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যে নৈতিক ভিত্তির উপর উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত তাহা 'অতি উত্তম' সত্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুমোদিত; তাঁহার বিবেচনায় আর কিছুকাল পরে উহা একটী চিরস্থায়ী সর্ব্বহিতকর সমিতিরূপে পরিগণিত হইবে। এই বৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যে যে সকল অভাব ও অনুদার ব্যবস্থা জনিত অশান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের সংশোধন ও সুসংস্কার একান্ত দুঃসাধ্য। তিনি এদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ মনোযোগ ও চিন্তার সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ভিন্ন এদেশের অভাব ও অশান্তি নিবারিত হইবে না। যে মহান্

ভিত্তির উপর জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দুই একবৎ-সরের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। উপসংহারকালে তিনি উল্লেখ করিলেন যে অভ্যর্থনা কমিটি (Reception Committee) মহাসমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা সকলেই বিশেষ পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত কার্য করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদের সকলেরই নাম উল্লেখ করা সহজ নহে। তাঁহা-দের মধ্যে দুই একজন প্রধান প্রধান কার্য্যকারীর নাম উল্লেখ না করা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত আযোধ্যা নাথ, যাঁহার প্রাণগত যত্নে মহাসমিতির অধিবেশন জন্য লোথার ক্যাস্‌ল্‌ সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং তৎপরে বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, লালা রামচরণ দাস, রাজা রাম পাল সিংহ, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় ও কাপ্টেন বেনন্‌ সাহেব প্রভৃতি মহাসমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই বলিয়া তিনি চতুর্থ মহা-যজ্ঞের অবসান করিলেন। অনন্তর সমবেত পঞ্চ সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও দর্শক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তকণ্ঠে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনবার সমস্বরে ভারতে-শ্বরীর জয়ধ্বনি করিলেন। তৎপরে জাতীয় মহাসমিতির প্রধান নেতা ও অনুষ্ঠাতা-গণের জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ভারতীয় মহাশক্তির মহোৎসবের অবসনে বিজয়া দশমীতে ভক্ত সাধকবৃন্দের হৃদয় যেরূপ বিষণ্ণভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় চতুর্থ মহা-যজ্ঞের অবসানে সহস্র সহস্র প্রতিনিধিগণের হৃদয়ের ভাব ক্ষণকালের জন্য সেইরূপ হইয়াছিল।

মহোৎসাহে, মহাসমারোহে ভারতের চতুর্থ মহাযজ্ঞ সংসাধিত হইল, উপসংহার কালে আমরা সর্ব্ব মঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতার নিকট করযোড়ে সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি এই অপূর্ব্ব মহাসমিতিতে তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ পূর্ণমাত্রায় বর্ষিত হউক। তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভারত-সন্তান আর যেন দুঃখিণী জন্মভূমিকে ভুলিয়া না যায়—যেন এদেশ হইতে অনৈক্য, অসদ্ভাব, দ্বেষ, হিংসা ও আত্ম-বিচ্ছেদ চির-কালের জন্য বিলুপ্ত হয়। তাঁহার আশীর্ব্বাদে এদেশে জলন্ত আত্ম-ত্যাগের পরি-বর্ত্তে আর যেন ঘৃণিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিচয়ে স্বদেশানুরাগী নর নারীর হৃদয় ব্যথিত না হয়। ভারতের ঈশ্বর, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, মঙ্গলময় পিতা আর একবার দুঃখিণী ভারত-ভূমির প্রতি কৃপা-কণা প্রকাশ কর। তোমারই অনুগ্রহে ভারত-ভূমির বিশুষ্ক, প্রাণশূন্য কঙ্কালে নবজীবন ও নবতেজ সঞ্চারিত হইয়াছে—তোমার প্রসাদে যেন ভারতের প্রতি গৃহে চরিত্রের শোভা পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত হয়—ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী যেন তোমার প্রেমময় পবিত্র নামে উন্মাদিত হইয়া হাসিতে হাসিতে জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ ও আত্মবিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীবিজয় লাল দত্ত।

কুড়ানো।

গোল্ডস্মিথ নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদিন তাঁহার দুইজন বন্ধু মুর, এবং বার্ক স্যর জসুয়া রেনল্ডসের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন। তাঁহারা লিষ্টার স্কোয়ারে পৌঁছিয়া দেখিলেন ঐ রাস্তার একটি বাড়ীর জালানায় কতকগুলি বিদেশীয় স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে আর তাহাদের দেখিতে রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গোল্ডস্মিথকেও তাঁহারা এই ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। গোল্ডস্মিথেরও সে দিন রেনাল্ডসের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি এই সময় এই পথ দিয়া নিমন্ত্রণে যাইতে যাইতে ভিড় দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বার্ক তাঁহাকে দেখিয়া মুরকে বলিলেন—"আজ গোল্ডস্মিথকে লইয়া একটু মজা করিতে হইবে।" বলিয়া তাঁহারা গোল্ডস্মিথের আগেই রেনল্ডসের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। গোল্ডস্মিথ এখানে পৌঁছিয়া যখন বার্কের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে গেলেন, তখন বার্ক স্বাভাবিক বন্ধুতার ভাবে তাঁহার সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন না। গোল্ডস্মিথ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিছু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বার্ক তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন কেন?

বার্ক প্রথমে এইরূপ ভাব দেখাইলেন যেন সে কথার উত্তরই তিনি দিতে চাহেন না, অবশেষে গোল্ডস্মিথ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন—"যে লোক রাস্তার মাঝখানে ওরূপ ভয়ানক নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিতে পারে—তাহার সঙ্গে আমাদের আলাপ রাখিতে ইচ্ছা নাই।"

গোল্ডস্মিথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাস্তার মধ্যে ত কিছুই করি নাই।" বার্ক বলিলেন—"কেন? সেই লোকগুলা যখন জানালার দিকে চাহিয়া প্রশংসা করিতেছিল তুমি কি তখন বল নাই—যে, আমার মত বুদ্ধিমান লোকের প্রতি উহাদের চোখ পড়ে না, আর ঐ অযোগ্য স্ত্রীলোক দিগকে প্রশংসা করিতেই উহারা ব্যস্ত। গোল্ডস্মিথ অবাক হইয়া বলিলেন "কখনই না, একথা আমি কখনই বলি নাই।" বার্ক বলিলেন "আচ্ছা তুমি যদি একথা বল নাই তবে আমি কেমন করিয়া ইহা জানিলাম?" গোল্ডস্মিথ জড়সড় হইয়া বলিলেন—"তাহা সত্য, —বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে ঐরূপ ভাবের কথা যেন আমার মন দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহা যে আমি বলিয়াছিলাম—তাহা জানিতাম না।"

* *
*

খলিফ আবদুল মালিক যখন প্রথম রাজ্যারূঢ় হন তখন রাজকার্য্যে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। একদিন রাত্রে নিদ্রা না আসায় তিনি তাঁহার একজন পারিষদকে গল্প করিতে আজ্ঞা করিলেন। সে বলিল—"নিকটবর্ত্তী দুই গ্রামে দুইটি পেচক বাস করিত।

প্রথম গ্রামের পেচক দ্বিতীয় গ্রামের পেচকের কন্যার সহিত নিজপুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রামের পেচক বলিল 'যতক্ষণ তুমি এক শত শূন্য গৃহ আমার কন্যার যৌতুক স্বরূপ না দিতে পার ততক্ষণ আমার কন্যাকে তোমার পুত্রবধূ করিব না।'

প্রথম পেচক বলিল—'আপাততঃ আমি তাহা পারিতেছি না, তবে আর এক বৎসর মাত্র তুমি অপেক্ষা কর, তাহার পর তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।'

এই গল্প শুনিয়া রাজার জ্ঞানোদয় হইল, তিনি সুশাসনে মন দিলেন।

* *
*

মাইকেল এঞ্জিলো একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। মূর্ত্তিটি প্রায় শেষ হইলে পর তাঁহার একটি বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। ইহার কিছু দিন পরে সেই বন্ধুটি আবার যখন আসিলেন, দেখিলেন সেই মূর্ত্তিট ছাড়া গৃহে অন্য মূর্ত্তি নাই। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে শেষ দেখার পর দেখিতেছি তুমি আর কিছুই কর নাই।"

মাইকেল বলিলেন—"তাহা নহে। অনেক কাজ করিয়াছি আমি এই মূর্ত্তিটির এই অংশে রং দিয়াছি,—মুখের এই স্থান কোমল করিয়াছি, মাংসপেশী সকল ঠিক করিয়াছি, ওষ্ঠাধরে ভাব প্রদান করিয়াছি আর শরীরের গঠন বলিষ্ঠ করিয়াছি।"

বন্ধু বলিলেন—আঃ ও সকলইত সামান্য। মাইকেল বলিলেন—"তাহা হইতে পারে, কিন্তু ইহা মনে রাখিও,সামান্য হইতেই মহৎ,আর যাহা মহৎ তাহা সামান্য নহে।"

* *
*

একদিন কোলরিজের কাছ দিয়া একজন পুরাতন কাপড় বিক্রেতা 'পুরকা, পুর্ কা' করিয়া ক্রমাগত হাঁকিয়া যাইতেছিল। কোলরিজ তাহা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—"পুরকা পুরকা না বলিয়া আমাদের মত স্পষ্ট করিয়া পুরাণ কাপড় উচ্চারণ করিতে পার না?

বিক্রিওয়ালা থামিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"মহাশয় আমি ও আপনাদের মত পুরাণ কাপড় বলিতে জানি, কিন্তু ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত মিনিটের মধ্যে ১০বার করিয়া আপনার যদি পুরাণ কাপড় বলিতে হয় তাহা হইলে আপনিও আমার মত পুরকা পুরকা করেন।" এই কথাটা কোলরিজের এত মনে লাগিল—যে তাহার কাছে যে সিলিংটি ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দান করিলেন।

* *
*

কোলরিজ একদিন তাঁহার বন্ধু জন থেলওয়েলের সহিত এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। গল্প করিতে করিতে বলিলেন—"হে প্রজাবন্ধু জন, বিদ্রোহের

পরামর্শের জন্য ইহা বড়ই উত্তম স্থান।" জন উত্তর করিলেন—"না, প্রজাবন্ধু স্যামুয়েল এ স্থানে আসিলে বিদ্রোহের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়।"

* *
*

ফ্রেঞ্চ উপন্যাস লেখক মারিবো এক দিন এক সবলকায় ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বলিলেন "বন্ধুবর, তুমি এমন সুস্থ সবল, কি লজ্জার কথা তুমি কাজ কর্ম্ম না করিয়া ভিক্ষা করিতেছ।"

ভিক্ষুক বলিল—"মহাশয় গো আপনি যদি জানিতেন আমি কিরূপ অলস তাহা হইলে এ কথা বলিতেন না।"

মারিবো তাহা শুনিয়া বলিলেন—"আমি দেখিতেছি তুমি একজন সরল লোক"—বলিয়া তাহাকে অর্দ্ধ ক্রাউন ভিক্ষা দিলেন।

* *
*

পাইরাসের প্রধান মন্ত্রী কাইনিয়াস রাজনীতি বিশারদ এবং সুবক্তা ব্যক্তি ছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট নিজের সমস্ত মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। কি কি আকাঙ্ক্ষা রাজা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছেন এক দিন তাহা কাইনিয়াসকে গল্প করিতে ছিলেন। রাজা বলিলেন—"প্রথমে ইটালির সহিত যুদ্ধ করাই আমার ইচ্ছা। এযুদ্ধে আমার নিশ্চয়ই জয় হইবে। কাইনিয়াস বলিলেন—"তাহার পর!" রাজা বলিলেন, "যদি দেবতারা সদয় হন তাহা হইলে পরে আমরা আফ্রিকা ও কার্থেজ জয় করিব।" মন্ত্রী বলিলেন—"তাহার পর" রাজা বলিলেন—"তাহার পর আমরা বিশ্রাম করিব। প্রতিদিন দেবতাদিগের নিকট বলিদান করিব এবং বন্ধুবর্গ লইয়া আমোদ প্রমোদ করিব।" কাইনিয়াস বলিলেন "মহারাজ, অত আড়ম্বর না করিয়া আমরা ত এখনি তাহা করিতে পারি।"

* *
*

মিষ্টার পপহ্যাম যখন পার্লেমেণ্টের বক্তা ছিলেন—তখন অনেক দিন ধরিয়া একবার লোয়ার হাউস বসিয়াছিল, অথচ কোনই কাজ হয় নাই। একদিন রাজ্ঞী এলিজিবেথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোয়ার হাউসে কি পাশ হইল?" তিনি উত্তর দিলেন "সাতটি সপ্তাহ।"

* *
*

পঞ্চম চার্লস যখন—তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া সেণ্ট জাষ্ট মঠে বাস করিতেছিলেন—তখন যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষার তিনি কালাতিপাত করিতেন। ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে করিতে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"হায় আমি কি নির্ব্বোধ! দুই চারিটি ঘড়িকে দিয়া ঠিক একরূপ সময় রাখাইতে পারি না—আর শত সহস্র মনুষ্যকে এক মত করাইবার জন্য আমি কি না কত রক্তপাত কত অর্থনাশ করিয়াছি!"

রঙ্ ও ভাব।

প্রকৃতিতে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেমন বিভিন্ন সুরের প্রাদুর্ভাব, সেইরূপ স্বতন্ত্র রঙেরও প্রাদুর্ভাব। বসন্তে, বর্ষায়, শরতে এক একটা নূতন রঙ্ প্রকৃতিতে আধিপত্য করে। আমাদের হৃদয়ের উপরেও তাহাদের প্রভাব সামান্য নহে। বিভিন্ন রঙে যেন স্বতন্ত্র ভাব লুকাইয়া আছে, সুরের মতন ধীরে ধীরে তাহারা প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। আমাদের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। প্রকৃতিতে ভাব-বিহীন রঙ্ নাই—রঙ মাত্রেরই সঙ্গে এক একটা ভাবের বিশেষ রকম যোগ আছে। উষার রঙে কেমন একরকম বিমল পবিত্রতার ভাব—সে ভাবে সংসারের কলঙ্ক কোথাও স্পর্শ করে নাই; সন্ধ্যার রঙে স্নেহমাখা শান্তিময় ভাব—প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়; বাসন্তী রঙে ভাব ঢল ঢল টলমল—প্রাণ বদ্ধ থাকিতে পারে না, বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

আমরা সাধারণতঃ ছয় ঋতুতে যে ছয় প্রকার বিভিন্ন রঙের প্রাদুর্ভাব দেখি, তাহা চম্পক, শ্যামল, গোলাপ, ধূসর, ধূসরে অন্ধকার, ঘনীভূত অন্ধকার। বসন্তেই চম্পকের বিশেষ প্রভাব। চম্পকের মত বসন্তের উথলিত হৃদয়। গ্রীষ্মে চারিদিক শ্যামল বর্ণ। প্রখর রবি তাপে সকলই দগ্ধ হইয়া যাইত, কেবল এই শ্যামল বর্ণেই তাহার যাহা কিছু স্নিগ্ধ ভাব। বৈশাখের রঙের সঙ্গে কাঁঠালী চাঁপার অনেকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। সে বিষয় বিস্তারিত রূপে এখন কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। প্রথম আষাঢ়ের রঙ্ গোলাপের মত নহে, কিন্তু বর্ষা ঘনাইয়া আসিলে টুক্‌টুকে গোলাপ বর্ণ বেশ ফুটিয়া উঠে। শরতের সন্ধ্যার মত বর্ণ যেন ছায়া ছায়া। ভাবেও সন্ধ্যার সঙ্গে শরতের বিশেষ সাদৃশ্য। হেমন্ত, শরৎ এবং শীতের সম্মিশ্রণ মাত্র। শীত অন্ধকার।

কিন্তু এই সকল রঙে কি কি বিশেষ বিশেষ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, বলা সহজ নহে। ঋতু বিশেষের ভাব দেখিয়া রঙের ভাব সম্বন্ধে কতকটা বলা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নিঃসংশয় চিত্তে কিছু বলা যায় না। কারণ, প্রতি ঋতুতে ভাবের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার মূলে শুধু রঙ্ নহে, সুর প্রভৃতিও বিদ্যমান। তবে রঙে সুরে মিল খায় বটে। সেই জন্য রঙের প্রভাব কতকটা বুঝিবার সুবিধা বলিতে হইবে।

বাসন্তী রঙে যেমন একটা অধীরতার ভাব আছে, বৈশাখী রঙে সেরূপ কিছু নাই। বাসন্তী সুরে গন্ধেও রঙের মতন অধীরতার ভাব পরিস্ফুট। বসন্তের পাখী, বসন্তের কবি এই অধীরতার গান গাহিয়া গাহিয়া ভগ্নকণ্ঠ। বৈশাখে সেই মলয় সমীরণ বহে বটে, সেই পাখীরাই গাহে বটে, কিন্তু ভিন্ন সুরে,—সে বসন্তের রাগিণী আর নাই।

এ মলয় সমীরণ সে অধীর আকুলতা প্রকাশ করে না, এ বিহগকণ্ঠে সে ব্যাকুল বাসনা ব্যক্ত হয় না। বৈশাখী রঙেও অধীরভাব নাই—বসন্তের মত ঔজ্জ্বল্য না থাকিলেও বৈশাখের রঙে স্নিগ্ধভাব অধিক। জ্যৈষ্ঠের রঙ্ বৈশাখ অপেক্ষা গাঢ়। কিন্তু গাঢ় হইলেও সে রঙের মধ্যে বৈশাখী মাধুরী নাই। তবে মোটামুটী গ্রীষ্মের রঙ্ কতকটা এক। অর্থাৎ অন্যান্য ঋতুর রঙের সঙ্গে তাহার রঙের ধরণে প্রভেদ লক্ষিত হয়।

বর্ষার গোলাপ চম্পক অপেক্ষা কিছু গম্ভীর রঙ্। বসন্তের চম্পক—বড় খোলাখুলি ভাব। চম্পক রঙে আপনার বাহিরে বিস্তৃতির একটা ভাব আছে; গোলাপ আপনার মধ্যেই থাকিতে চায়। চম্পক ছড়াইয়া পড়ে; গোলাপ গুটাইয়া আনে। রঙের কথায় আমরা যাহা বলিলাম, চম্পক ও গোলাপের সৌরভ সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক খাটে। বর্ষার উষায় গ্রীষ্মকালের যুঁই বেলের শ্রীবিকাশ হয় না। কলঙ্কিত আকাশের নীচে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? বসন্তে এ সকল শুভ্র কুসুমের তেমন সৌন্দর্য্য বিকশিত না হৌক্, শ্রীহানি হয় না। চম্পকের মত যদিও যুঁইবেল ছড়াইয়া পড়ে না, তত্রাচ ইহাতে যে ছড়াইয়া পড়ার ভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ষার ফুল কদম্বের ভাব কিরূপ, এইখানে তুলনা করিয়া দেখা যাক্। কদম্ব গোলাপ-গম্ভীর নহে। গোলাপ অপেক্ষা তাহার বিস্তৃতির ভাব আছে। তাই বলিয়া অবশ্য বাসন্তী বিস্তৃতির ভাব কদম্বে নাই। কদম্ব কতকটা আষাঢ়ের রঙ্—শ্রাবণের নহে। চম্পক একেবারে ছড়াইয়া পড়ে, কদম্ব আপনার আশপাশ পর্য্যন্ত, গোলাপ আপনা পর্য্যন্ত।

বর্ষার পর শরৎ—ভাদ্র, আশ্বিন। ভাদ্রমাসকে শরৎ বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু আইন ভঙ্গ না করিয়া তাহাই রাখিয়া দিলাম। বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় সাধারণতঃ প্রথম মাসে কেমন একটী মাধুরী আছে; শরতে তাহা নাই। শরতের মাধুরী শেষে—আশ্বিনে। সে যাহা হৌক্, শরতের সান্ধ্যবর্ণে কি ভাবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্ধ্যার সঙ্গে ভাবেও শরতের সাদৃশ্য আছে। শরতের রঙে কেমন একটী ম্লান ভাব, অথচ স্নেহমাখা। বসন্তের অধীরতা নাই, বর্ষার গুমরিয়া থাকার ভাব নাই, শরতের ম্লানভাবে কি যেন নিষ্কাম পবিত্রতার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। শরতের মুখশ্রী প্রকাশ করিতে পারে, শরতের শুকতারা।

হেমন্ত শরৎ ও শীতের সম্মিশ্রণ—শরতের সন্ধ্যায় শীতের রজনীর ছায়া। হেমন্তকে দেখিলে মনে হয়, শরতের মৃত্যুতে বুঝি বিলাপ গাহিতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার রঙে কি বিশেষ ভাবের প্রাধান্য, তাহা একেবারে ঠিক বলা যায় না। মোটামুটী মনে হয়, হেমন্তে জরজর ভাব খানিকটা আছে। কিন্তু এ ভাব শুধু বিরহিণীর কি সাধারণ, সন্দেহ। সেই জন্য বলিতেছি, হেমন্তের বিষয় জোর করিয়া আমরা কিছু বলিতে পারি না।

শীতের ভাব সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ উঠিতে পারে ; কিন্তু বর্ষার মত শীতের রঙেও যে গুটাইয়া আনার ভাব আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভিজা ভাবের অভাববশতঃ শীতের রঙে বর্ষার কোমলতা দেখা যায় না বটে, তথাপি দুয়ের রঙেই জড়াজড়ি জড়সড় ভাব আছে বলিতে হইবে। যাহা হোক্, বর্ষা ও শীতের ভাবের আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদ বিস্তর। সে সকলের এস্থলে সবিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রঙের উপর ভাবের পরিবর্ত্তন যে অনেকটা নির্ভর করে, তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

গোধূলি ও সন্ধ্যা।

বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যই যদি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির মত সুন্দরী কোথায়? প্রকৃতিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে শৃঙ্খলা এমনি যে, বিপ্লব অনুভব করা যায় না। যে রঙের পর যে রঙ মিলে, যে সুরের পর যে সুর শুনায় ভাল, যে ভাবের পর যে ভাব বসিলে উভয়েরই সৌন্দর্য্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়, প্রকৃতিতে সকলই এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট। অশোভন জাঁক জমক তাহার কোথাও নাই—সর্ব্বত্রই শোভন গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, ভাব আছে। এই জন্যই প্রকৃতিতে লোকের অরুচি ধরে না।

সে যাহা হৌক, প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেখানে যেখানে সাদৃশ্য অনুভূত হয়, সেখানে বিভিন্ন ভাবের বৈসাদৃশ্য সহজে অনুভব করা যায় না। সাদৃশ্যে দুইটী বিভিন্ন ভাব অনেক সময় এক বলিয়া প্রতিভাত হয়। গোধূলি ও সন্ধ্যা এইরূপে প্রায় এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবের মিলন থাকিলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদও অনেক আছে। আমরা একে একে যথা সাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলির রঙে সন্ধ্যার স্নেহময় ভাবের বিশেষ অভাব। তাহাতে একটা আরামের ভাব আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার শান্তি নাই। গোধূলিতে কাজ কর্ম্ম সমাপন হইল, সন্ধ্যায় বিশ্রাম আসিবে। গোধূলি নির্ব্বাণ হইয়া আসার অবস্থা, সন্ধ্যায় দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে—নির্ব্বাপিত দীপশিখায় একটী সূক্ষ্ম সিন্দূর রেখা মাত্র অবশিষ্ট।

গোধূলি পুরাতনের মৃত্যু, সন্ধ্যা নূতন সৃষ্টি। গোধূলির অবসানের মধ্য হইতে সন্ধ্যার নূতন সৃষ্টির বিকাশ হয়। গোধূলির পরে একটা ছেদ পড়িয়াছে। সন্ধ্যা যেন অবসন্ন জগৎকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে—গোধূলি অপেক্ষা সন্ধ্যায় গার্হস্থ্যের-

বিকাশ হইয়াছে। সন্ধ্যায় যেমন প্রাণ পূরিয়া উঠে, গোধূলিতে তেমন নহে। যোগীর চিত্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া আসিতেছে, ইহাই গোধূলির ভাব; এখন তাঁহার সেই ভূমানন্দলাভস্পৃহা বড়ই বলবতী। সন্ধ্যায় প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে—যোগীর মুখে চোখে সেই আনন্দ ভাব দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এ আনন্দে বড়ই স্থির ভাব। উষার আনন্দ ভাবের সহিত ইহার তফাৎ আছে।

গোধূলিতে গির্জ্জার ঘণ্টা বড় মধুর শুনায়, কিন্তু দেবমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা সন্ধ্যাতেই জমে ভাল। শঙ্খের শব্দ গোধূলিতে নিতান্ত কেমন কেমন ঠেকে। গির্জ্জার ঘণ্টায় কি যেন গোধূলির রাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ধীরে ধীরে থামিয়া আসার ভাব আছে। দেবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে বন্দনার গান শুনা যায়—হৃদয় হইতে ভগবানের নাম উঠিতেছে। গোধূলি হৃদয়কে কতকটা সংযত করিয়া আনে; সন্ধ্যায় সংযত হৃদয় সেই প্রেমময়ের ধ্যানে নিযুক্ত হয়।

পূরবী ঠিক সন্ধ্যার রাগিণী—পূরবীর মত সন্ধ্যার ভাব অন্য কোনও রাগিণীতে ব্যক্ত হয় না। যে দেশেরই অধিবাসী হৌক না কেন, পূরবী রাগিণীতে তাহার মনে সন্ধ্যার ভাব উদয় হইবেই। সন্ধ্যার অন্যান্য রাগিণী সন্ধ্যা খানিকটা জমিয়া না আসিলে জমে না। পূরবী রাগিণীতে সন্ধ্যার হৃদয় ঠিক ধরা পড়িয়াছে। গোধূলি ও সন্ধ্যার সন্ধিস্থলে পূরবী।

উষার সহিত সন্ধ্যার যেমন একটা সাদৃশ্য আছে, সূর্য্য উঠিবার পর উষার সহিত গোধূলিরও সেইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে দুয়ের ভাবে যে বিশেষ মিলন আছে তাহা নহে, কিন্তু আকারগত সাদৃশ্য কতকটা আছে। কিন্তু সে কথা যাক্, গোধূলি ও সন্ধ্যার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলিতে বিবাহের ভাব বিশেষ ব্যক্ত; সন্ধ্যায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিনের বর কন্যার লজ্জা সঙ্কোচের ভাব সন্ধ্যায় ততটা নাই। গোধূলিতে মিলনটা তেমন এখনও হয় নাই, কিন্তু এ সেই তাহারই আয়োজন হইতেছে।

সন্ধ্যায় মন খুলিয়া সুখ আছে—যেন মনে হয়, আমার দুঃখ বুঝিবার কেহ আছে। সন্ধ্যার ভাবে আমরা কেমন শান্তি অনুভব করি। সন্ধ্যায় আমরা হৃদয়ের সাড়া পাই—তাই আমাদেরও হৃদয় উন্মুক্ত হয়। বাহিরের সুখ দুঃখ হইতে টানিয়া আনিয়া সন্ধ্যায় আমরা আপনাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করি। বাহির হইতে গৃহে আসিয়া জুড়াই।

গোধূলিতে মন খুলিয়া তেমন তৃপ্তি নাই—সন্ধ্যার মত গোধূলি আমাদের সুখ দুঃখ বুঝে না। গোধূলিতে অনেক ভাব আসিয়া জমে, কিন্তু তাহারা চাপা থাকিয়া যায়। গোধূলিতে ফুল ফুটে ফুটে, সন্ধ্যায় বিকশিত কুসুমের সৌরভ বিকীর্ণ হয়। সন্ধ্যা ভাবের বিকাশ—সন্ধ্যা না হইলে ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না।

সংক্ষেপতঃ গোধূলি স্থিতির দিকে গতি, সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্ব আয়োজন মাত্র। সন্ধ্যায় সব থিতাইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা স্থিতি—শান্তি।

অতির গতি।

অনেকদিন অবধি মানবেরা অতির উপরে খড়্গহস্ত। অতির কাছে সহসা কেহ পা ফেলিতে চাহে না। কিন্তু কুহকিনীর ছলনায় মানবেরা অনেকবার ঠকিয়াছে। এই জন্য গান বাঁধিয়া, বচন রচনা করিয়া তাহারা পথে পথে তাহার নামে নিন্দা গাহিয়া বেড়ায় যে, আর কেহ না ঠেকে। অনেককাল পূর্ব্বে একটা গান রচিত হইয়াছিল,

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা,
অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্ব্বধাঃ
সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।"

তাহার পরে এই সংস্কৃত কবিতার ভাবে আরও গান রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালারও দুই চারিটা বচন পাওয়া যায়। যেমন,

"অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।"
"অতি বাড় বেড় না ঝড়ে প'ড়ে যাবে।"

সংস্কৃত কবিতার সহিত বাঙ্গলা বচন দুইটীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—আর এক পা যাইলেই যেন অনুবাদ হইয়া উঠে। বচন দুইটী ও শ্লোকটীর ভাব একই—অতি কিছুই ভাল নয়। তবে সংস্কৃত কবিতায় উদাহরণগুলি রামায়ণ মহাভারত হইতে গৃহীত। বাঙ্গলায় তাঁতীকুল। তাঁতীকুলের অতিবুদ্ধি সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে, তাহারা উলুবনে সাঁতার দিয়াছিল।

ইংরাজী বচন "Too much of anything is bad" সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতমের অবিকল অনুবাদ। ইংরাজেরা অবশ্য সংস্কৃত পুঁথি খুলিয়া তর্জ্জমা করেন নাই; কিন্তু উভয়-দেশীয় লোকের মনেই এক ভাব আসিয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে মনে হয়, অতি সম্বন্ধে মানবজাতি একমত।

অতি লোভ দর্প দান মান ছাড়া আরও আছে। অতিরূপসী কি অতিগৃহিনী হইলে কি ফল হয় তাহারও শ্লোক আছে।

"অতি বড় রূপসী না পান বর
অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।"

ইংরাজীতে ঠিক এইরূপ বচন আছে কি না জানি না, কিন্তু রূপসী সম্বন্ধে একটা আছে—

"A fair woman and a slashed gown
will find some nail in the way"
"ছেঁড়া-খোঁড়া সাড়ি আর সুন্দরী স্ত্রীলোক
ঘটাবেই পথমাঝে পেরেক-আটক।"

আরও একটা এই ভাবে আছে যে, অতি-রূপসী নির্ব্বুদ্ধি হয়, অতি কালো অহঙ্কারী হয়, ইত্যাদি। মোটামুটি, অতির প্রতি কেহই সদয় নহে।

অতিবক্তারাও ফাঁক যান নাই। তাঁহারা "কথার ঢেঁকি—কাজে ছাই।" কিন্তু ভাগ্যদৃষ্টবশতঃ ইহাঁদের হত হইবার সম্ভাবনা বিরল। তাহা ছাড়া ঘর বর পাইবারও আটক নাই। ইংরাজীতে ও আছে,

"He who talks much must talk in vain"

লেখকেরা এরূপ বচনের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অতি-লেখক সম্বন্ধে কেহ বচন রচনা করে নাই। করিবেই বা কেন? বিড়্ বিড়্ বক্তৃতায় লোকের কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠে, লেখায় ত আর তাহা হয় না। লেখা না পড়িলেই চলে, কিন্তু কাণে তুলা দিয়া রাখা সর্ব্বদা পোষায় না।

আর একটা বচনে অতি ভক্তিকে বিশ্বাস করিতে বারণ। অতিভক্তিতে লোকে নাকি বড়ই গলিয়া যায় তাই বচনটী সাবধান করিয়া দিতেছে,

"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

চোরকে যেমন কেহ বিশ্বাস করে না অতিভক্তিকেও যেন সেইরূপ বিশ্বাস না করে। অতিভক্তির ছলনায় দেবতারাও মুগ্ধ হয়েন। মানুষ ত কোন্ ছার!

অতি কিছুই ভাল নয়। "More than enough is too much" প্রচুরের চেয়ে বেশী বেজায়। অতি সাজসজ্জা, অতি লোকজন, অতি আত্মীয়তা, কোনটাই কাজের নহে। আমাদের কথাই আছেঃ—"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

বেশী লোক থাকিলেই কাজ ভাল হয় না। বচন আছে

"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।"

ইংরাজীতেও আছে—"Too many cooks spoil the broth."

অতিঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। বচন আছে—"Too much familiarity breeds contempt."।

বাঙ্গলায় ঠিক ইহা না থাক্, একটা আছে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।"

অতি ছোটরাই অধিক দুষ্ট হয়। যাহারা বেগুণগাছে আঁক্‌শী দেয় তাহারাই খোঁড়াইয়া বড় হইতে চায়। প্রমাণ,

"যিৎনা ছোটা ইৎনা খোটা।"

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা অতি ভোজন পর্যন্ত বারণ করিয়াছেন—"অতি ভোজনম্ পরিহরণীয়ম্।"

অতি আওয়াজ ফক্কিকার। ইংরাজী বচন আছে—"Empety vessels sound much"

অতিরিক্ত বেদনায় পর্বত মূষিক প্রসব করিয়াছিল, তাহারও এক গল্প আছে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা আজও বলিয়া থাকে, বেশী লেখা পড়া শিখিলে ছেলে বাঁচিবে না।

আমাদের রামশর্ম্মা অতির গতি বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন, "যত হাসি তত কান্না।" সকলেই জানেন, হাসির ধমকে শেষকালে পেটে বেদনা হয়।

কিছুই-নার জন্যই কষ্ট অধিক। কথা আছে, "Much ado about nothing"।

বাঙ্গলা পঞ্জিকায় গোঁফের আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট পুরুষের মুখ দেখিয়া যাত্রা পর্য্যন্ত নিষেধ,

"যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।
এক পা না বেরিও বাপা॥"

এইরূপ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি সকল ভাষাতেই অতির বিপক্ষে দুই দশটা বচন, ও রাশি রাশি গল্প পাওয়া যায়। এই সকল বচন ও গল্প হইতে মানবের অতির প্রতি ঘৃণার ভাব স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঘৃণা করিলেও অতির হস্ত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। অতির মায়ায় সে এক একবার সকলই ভুলিয়া যায়। তাহা না হইলে অনেক বৃথা ঝগড়াঝাঁটি, রক্তপাত, হিংসাদ্বেষ বাঁচিয়া যাইত।

অতির স্বাভাবিক গতি অধঃপাতের মুখে। সে গতির মধ্য হইতে স্বর্গের পথ বাহির করা অসম্ভব। সত্যের পথে, স্বর্গের পথে যাইতে হইলে নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘন করাই অতি-ত্ব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মা ও ছেলে। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম ভাগ খানির ন্যায় এই পুস্তক খানিও মাতা ও সন্তানের পাঠ্য সন্দেহ নাই। কিরূপে সন্তানদিগের যথার্থ শিক্ষা হয় তাহা লেখক গল্পচ্ছলে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে আমোদ ও শিক্ষা দুই একত্রে হয়। তবে ইহার মধ্যে মন, আত্মা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বালকদিগের পক্ষে সুবোধ্য হইয়াছে মনে হয় না।

দুখানি ছবি। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকখানিকে যদিও উৎকৃষ্ট উপন্যাস নামে অভিহিত করা যায় না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি সদুদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায়। নায়িকা "প্রেমময়ীকে" স্বভাব আদর্শ ভাবে গ্রহণ করিলে বঙ্গ সমাজের যথেষ্ট উপকার হয় সন্দেহ নাই।

বাল বিক্রম। পূর্বকাণ্ড। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক প্রণীত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুর্বোধ্য ভাষায় মাইকেলের অনুকরণে পুস্তক খানি লিখিত। পূর্বকাণ্ডে অভিমন্যু কর্তৃক কৌরব পরাজয় শেষ হইয়াছে উত্তর কাণ্ডে অভিমন্যু নিধন হইবে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়, পুস্তকের ছন্দ কোথাও পতন হয় নাই, বর্ণনাও স্থানে স্থানে বেশ হইয়াছে। তথাপি পূর্বকাণ্ড খানি শেষ করিয়া আর উত্তরকাণ্ড পড়িবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে না।

নীতি হার। শ্রীকেদারনাথ সরকার প্রণীত। পুস্তকখানির ভূমিকা এই।

"শৈশবে সুনীতি শিক্ষা না হলে কপালে,
কি সুখ, সন্তোষ, কারো নাহি কোন কালে।
ধন বল বিদ্যা বল, যত কিছু আর
বাড়ায়ে গরব শুধু করে ছারখার,
হইয়া বিবেকহীন ঘোর অত্যাচারে
মিছামিছি জ্বালাতন করে সে সবারে।
তাই, যাতে নীতিশিক্ষা হয় ভেবে মনে
গাঁথিল এ নীতিহার পরম যতনে;
এখন এহতে যদি হয় উপকার
তবেই সুফল হয় যতন আমার।"

লেখকের সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক মত—কিন্তু লেখকের "নীতিহার" তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সহায়তা করিবে সন্দেহ। নূতন পঞ্জিকার মত কবিতা লিখিয়া বালক-বালিকাদের মনে নৈতিক ভাব বিকশিত করা যায় তাহা মনে হয় না—সেজন্যও কবি হওয়া আবশ্যক।

পুণ্যের জয়। নৈতিক দৃশ্যরূপক কাব্য। মনুষ্যের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির কিরূপ সংগ্রাম হয় এই ক্ষুদ্র কাব্যে তাহাই বর্ণীত। পুস্তকের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, ইহার শেষ তেমন হয় নাই, কেমন সমন্বয়ের অভাব। কিন্তু পুস্তক খানিতে কবিত্ব আছে।

গোজীবন। মীর মোশাররফ হোসেন প্রণীত।

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উৎথিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন,—তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরষা করি অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।